নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২
মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

সম্পাদনা
আশা দেবী
অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

শিলালিপি

দ্বিতীয় অধ্যায়

নয়

পরিমল এল তার দিন দুই পরে।

এর ভেতরেই বই দুখানা পড়ে ফেলেছে রঞ্জন, গিলেছে গোগ্রাসে। একখানার নাম 'ফাঁসির ডাক', আর একখানা 'শহীদ সত্যেন'। একখানার ওপরে একটা ফাঁসির দড়ির ছবি—একটি ছেলে হাসিমুখে সে দড়ি গলায় জড়িয়ে নিচ্ছে; আর একখানার মলাটে একটা রিভলভার আঁকা—তার মুখ থেকে লাল আগুন আর কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। বই দুটোর মলাটের দিকে তাকালেই গা শিরশির করে ওঠে।

কিন্তু শুধুই কি মলাট? ভেতরের প্রতিটি পাতায় আশ্চর্য সব লেখা, তার প্রতিটি পংক্তিতে যেন বজ্রের গর্জন, তার প্রতিটি হরফ থেকে যেন রক্তের বিন্দু আর আগুনের কণা পড়ছে ঠিকরে ঠিকরে। রঞ্জনের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগল তার বুকের ভেতরে।

এই তো এতদিন পরে পাওয়া গেল তার সত্যিকারের পথ, উত্তর মিলল মনের ভেতরে সঞ্চিত এতদিনের পুঞ্জ পুঞ্জ জিজ্ঞাসার। উনিশ শো তিরিশ সালের লবণ-সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য, বিলাতী-বর্জন—এই চরকা-লাঞ্ছিত অহিংস-পথ—এ আমাদের জন্যে নয়। এ স্থবিরের ধর্ম, কাপুরুষের মনোবিলাস। পলাশীর মাঠে যে সূর্য ডুবেছিল—তা রক্ত মাখা, রক্তের মধ্য দিয়েই ইংরেজ কোম্পানি সেদিন পথ করে গিয়েছিল সুতানুটি-কলিকাতা-গোবিন্দপুর থেকে দিল্লীর ময়ুর-সিংহাসন পর্যন্ত, কাশ্মীরের তুষার-শুভ্রতা থেকে কুমারিকা-অন্তরীপের নীলিমা-বিস্তার পর্যন্ত। আজ সেই অধিকার থেকে তাকে তাড়াতে হলে সেই রক্তের পথ ছাড়া আর কোনো পথই নেই—উত্তরের শুভ্র তুষার থেকে শুরু করে দক্ষিণের নীল সমুদ্র পর্যন্ত রক্তে আজ রাঙা করে দিতে হবে। দেশ-মাতার যে রূপ আজ আমরা 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে বন্দনা করি তা ষড়ৈশ্বর্যময়ী কমলদল-বিহারিণী কমলার রাজরাজেশ্বরী মূর্তি নয়; সমস্ত ভারতবর্ষের কালো আকাশে তাঁর খেটক-খর্পর প্রসারিত করে দিয়ে দাঁড়িয়েছেন ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা, মহামেঘের মতো বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে তাঁর উত্তাল কেশমালা, রুধিরস্রুতি হচ্ছে তাঁর কণ্ঠবিলম্বী নরমুণ্ডের হারে, রক্তলোলুপার অট্টহাসি ধ্বনিত হচ্ছে দিকে দিকে—'ম্যায় ভুখা হুঁ'—

বইয়ের পাতায় পাতায় সেই চামুণ্ডার আবাহন, ছত্রে ছত্রে সেই ভয়ঙ্করীর বন্দনা। রুদ্ধশ্বাসে রঞ্জন পড়ে যেতে লাগল: "চক্রান্ত, শঠতা এবং প্রচণ্ড দমননীতির সাহায্যে পৌনে দুইশো বছর ধরিয়া ইংরেজ আমাদের শাসন করিতেছে। কিন্তু ইহা শাসন নয়,

শোষণ। রক্তলোভী শয়তানের মতো সে প্রতিমুহূর্তে আমাদের বুকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে, কাড়িয়া লইয়াছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি। দেশ-জোড়া একটা গোলাম-খানা বানাইয়া ইংরেজ আর তার পোষা কুকুরের দল, তার ঘৃণ্য টিকৃটিকিবাহিনী অবাধে রাজত্ব করিতেছে; তাহাদের চাবুকের ঘায়ে যখন পিঠের চামড়া রক্তাক্ত হয়, তাহাদের বুটের লাথি খাইয়া যখন প্লীহা ফাটে, তখনো এই গোলামেরা দাঁত বাহির করিয়া হাসে, সরকারকে সেলাম বাজাইয়া এবং রায়বাহাদুরী খেতাব পাইয়া ধন্য হয়।"

পড়তে পড়তে যেন দম আটকে আসতে লাগল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো পাতার পর পাতা উল্‌টে চলল সে:

"কিন্তু সে গোলামের দলে আমরা নই। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা স্বাধীন মানুষ হইয়া দাঁড়াইব। ভারতবর্ষের এক ইঞ্চি জমিতে একজন ইংরেজেরও জায়গা হইবে না। নীল চাষের নামে যারা বাংলার কৃষককে নির্মমভাবে নির্যাতন করিয়াছে; বাংলার তাঁতীদের আঙুল কাটিয়া যারা আমাদের বুকের ওপর ফাঁদিয়াছে ম্যাঞ্চেস্টারী শোষণ-যন্ত্রের বনিয়াদ; সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের নামে যারা শত শত নিরপরাধ মানুষের তাজা চামড়া উপড়াইয়া হিন্দুর গায়ে গোরুর—আর মুসলমানের গায়ে শুয়োরের ছাল বসাইয়া চর্বি মাখাইয়া জ্যান্ত আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছে, কামানে গোলার বদলে যারা মানুষকে ব্যবহার করিয়াছে; জালিয়ানওয়ালার শত শত নিরস্ত্র অহিংস নরনারীকে মেশিন গান চালাইয়া হত্যা করিতে যাদের বাধে নাই; যাদের ফাঁসিকাঠ আমাদের শত-শহীদের মৃত্যু দিয়া চিহ্নিত, যাদের কারাগারে শত শত দেশসেবক তিলে তিলে আত্মদান করিয়াছে—সেই শয়তানদের জন্য কোনো ক্ষমা আমাদের অভিধানে নাই। ইহার প্রতিটির জন্য আমরা বিচার করিব, এই অত্যাচারের প্রত্যেকটির প্রতিশোধ আমরা লইব। অহিংসার ভাঁওতায় ভুলিয়া দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রিফর্মের অথবা স্বায়ত্তশাসনের কাঁচ-কলা হজম করিতে আমরা রাজী নই। বাঘের মুখের সামনে ছাগলের অহিংস-নৃত্য জাতির অপমান মনুষ্যত্বের অপমান। দেশমাতার পূজা-মণ্ডপে আজ ইংলণ্ডের শাদা-পাঁটাদের বলি দিয়াই আমরা স্বাধীনতার বোধন করিব।"

এ শুধু লেখা নয়—লেখার মধ্য দিয়ে যেন সেই বলির বাজনা বাজছে। রক্ত চাই—অত্যাচারীর রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে শোধন করে নিতে হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে যতদিন একজন ইংরেজ থাকবে ততদিন জানব আমাদের শৃঙ্খল মোচন হয়নি। আর তার একটিমাত্র উপায় হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লব, রক্তাক্ত ভয়ঙ্করের পথে অভিযাত্রা।

এই ভয়ঙ্কর অভিযানের কাহিনী আছে দ্বিতীয় বইটিতে। আছে ক্ষুদিরামের কথা। তার স্বপ্নে দেখা ক্ষুদিরাম, খেড়ে ছেলে অশ্বিনীর মুখে শোনা 'নিথিলিস্ট্' ক্ষুদিরাম, বৈরাগীর গানের ক্ষুদিরাম। বালক রঞ্জনের অপরিণত ভাব-বিলাসী মন মাত্র কয়েকটি

পাতার মধ্য দিয়ে যেন হাজার হাজার বছরের নিষ্ঠুর কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতার পথ পার হয়ে গেল। আশ্চর্য, কোথায় লুকিয়েছিল এসব, কোথায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল এই অপরূপ জগতের কাহিনী? এই সামান্য কয়েকটি পাতার ইন্দ্রজালের মধ্য দিয়ে অনেকগুলো কালো পর্দা তার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গেল, আবিষ্কৃত হয়ে গেল রহস্যের এক বিশাল রত্নভাণ্ডার।

মা এসে বাইরে থেকে ডাকলেন, ছেলের আজ হল কি?

চমকে উঠল, ধ্বক্ করে দুলে উঠল হৃৎপিণ্ড। নক্ষত্রবেগে বইখানা চালান হয়ে গেল 'সরল জ্যামিতি'র তলায়। মা টের পাননি তো!

মা আবার বললেন, গল্পের বই জুটিয়েছ বুঝি? তাই মনসাতলার দিকে মন নেই?

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইল সে—মা যদি বই দেখতে চান তা হলেই সর্বনাশ। কিন্তু হেঁসেলে হাঁড়ি চাপিয়ে এসে তাঁর দাঁড়াবার সময় ছিল না, মা চলে গেলেন।

আবার বই খুলল রঞ্জন। এক অজ্ঞাত অদ্ভুত জগতের বিচিত্র ইতিহাস। এ ইতিহাস মেলে না ক্লাসে-পড়া তোগলক-বংশ আর লর্ড বেণ্টিঙ্কের সুশাসনের মধ্যে, এ ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না অ্যালফ্রেড্ দি নোব্‌লের মহত্বের বিবরণীতে। মাটির তলায় ক্ষুদিরামের গোপন কারখানার মতো একটি অদৃশ্য পাতালপুরী থেকে কাল-নাগিনীর ফণার মতো এ উদ্যত হয়ে উঠল, এর প্রতিটি পাতায় পাতায় সাপের বিষের তীব্র জ্বালা।

সে পড়ে যেতে লাগল:

"কিন্তু মীরজাফর-আমিরচাঁদ-জগৎশেঠের বংশধরদের মৃত্যু নেই। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল মাণিকতলা বোমার মামলায়। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামী হল রাজসাক্ষী। বিভিন্ন বন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সে ভেতরের খবর বের করবার চেষ্টা করতে লাগল। সত্যেন বসু আর কানাইলাল দত্ত এই বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেবার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

ঘটনার দিন হাসপাতালে অসুস্থ সত্যেন নরেন গোস্বামীকে ডেকে পাঠালেন তার কাছে জবানবন্দী দেবার জন্য। নতুন শিকারের আশায়, নতুন তথ্য জানবার লোভে বিশ্বাসঘাতক নিশ্চিন্ত মনে দেখা করতে গেল। দু-চারটে কথার পরই সত্যেন রিভলবার বের করে গুলি করলেন, আহত দেশদ্রোহী আর্তনাদ করে ছুটে বেরুল।

কিন্তু মাঝপথে মৃত্যুদুতের মতো আবির্ভূত হলেন কানাইলাল। রিভলবার হাতে তিনি অনুসরণ করলেন পলাতক বিশ্বাসহন্তাকে। জেলারের আফিসে পৌঁছুবার আগেই জাতির কলঙ্ক নরেন গোস্বামীর রক্তাক্ত মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ইংরেজের কাছ থেকে ইনাম পাওয়ার আগেই ঘরশত্রু বিভীষণ দলের বিপ্লবী বীরদের কাছ থেকে পেল তার দেশদ্রোহিতার চরম পুরস্কার।"

ঠিক হয়েছে। অসহ্য আক্রোশে গর্জন করে মন বললে, ঠিক হয়েছে। আজ এমন করেই একটার পর একটা দেশের শত্রুদের নিপাত করা দরকার। দেশ জুড়ে নরেন গোস্বামীর রক্তবীজেরা টিকটিকিরূপে ছড়িয়ে আছে, তারা নিজেদের শত্রু—তারা জাতির আবর্জনা। এই আবর্জনাগুলো পরিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ একটা অসম্ভব কল্পনা, একটা অবান্তর ব্যাপার।

রক্তের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ছুটতে লাগল। সেও যদি এই মুহূর্তে একটা রিভলবার হাতে পায় তাহলে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। ক্ষুদিরাম, সত্যেন, বীরেন গুপ্ত, গোপীনাথ সাহা কিংবা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর মতো সেও বেরিয়ে পড়তে পারে হত্যার অভিযানে। একটা রিভলবারে কটা গুলি থাকে—পাঁচটা, ছটা? যদি ছটা গুলি থাকে তা হলে তার পাঁচটা দিয়ে সে পাঁচজন বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করবে, আর বাকিটা—বাকি বুলেটটা সে খরচ করবে নিজের বুকে, হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে বীর প্রফুল্ল চাকীর মতো।

দেশের জন্যে মরা। সে কি আশ্চর্য গৌরব—সে কি অপূর্ব সার্থকতা। ফাঁসির দড়ি হোক গলার মণিহার, পিস্তলের গুলি হোক দেশমায়ের আশীর্বাদ। নতুন দিনের স্বাধীন ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লেখা হবে অক্ষয় অক্ষরে, সে ইতিহাসের পাতায় জলজল করতে থাকবে আরো অগণিত শহীদের সঙ্গে তারও নাম। সেদিন দেশের ছেলেরা তারও উদ্দেশে প্রণাম জানাবে, 'ফাঁসির সত্যেনে'র সঙ্গে আর একটি নামও লেখা হয়ে যাবে: 'ফাঁসির রঞ্জন'।

রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। মনটা একটু অন্তর্মুখী হলেই তার পুরোনো পাগলামি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করে যেতে ইচ্ছে করে। পায়চারি করতে করতে আউড়ে চলল:

"সুমুখে যে আসে সরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে,
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন
পিছে পড়ে থাকে চরণ-চিহ্ন
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয় বহ্নি ধূমে—"

আচমকা থেমে গেল রঞ্জন। বেছে বেছে এই লাইনগুলোই তার মনে পড়ল কেন, মাত্র দু-তিনবার পড়া 'গুরুগোবিন্দ' কবিতার পংক্তি তার মনের ভেতরে এমন ভাবে বাঁধাই বা পড়ে গেল কী করে? স্মৃতি-শক্তির গর্ব অবশ্য করতে পারে সে, বাড়ির 'চয়নিকা'খানা প্রায় তার কণ্ঠস্থ। কিন্তু নিতান্তই পরের বাড়িতে বসে পড়া এই কবিতাটা

এমনভাবে তার স্মৃতির ভেতরে এত সহজে বাসা বেঁধে নিলে কেমন করে ?

মনের আকাশে থমথম করছিল ঝোড়ো মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে যেন গলে পড়ল এক টুকরো জ্যোৎস্না। অদ্ভুতভাবে একটা মোড় ঘুরে গেল চিন্তাটা। চোখের সামনে ছবির মতো দেখা দিল একখানা বিশ্রীরকম সাজানো বাড়ি, ফুলে ফুলে ভরা তার বাগান, সে বাগানের মাঝখানে হেনার ঝোপ। একটুখানি জমিতে ঝলমল করছে শিশিরে ধোয়া উজ্জ্বল ঘন-ঘাসের আনন্দ, চেনে বাঁধা ছোট একটি চিতি-হরিণ, তার দুটি গভীর নীল চোখে অফুরন্ত স্নেহ। সেই ফুল, সেই হেনার লতা, বাতাসে টাট্‌কা ফোটা গোলাপ আর ধূপের গন্ধ, ফুলে ফুলে ছোট বড় প্রজাপতি। গল্পের মতো ওই জগৎটাকে রঞ্জুর ভালো লাগেনি, বড় অস্বাভাবিক, বড় বেশি সাজানো মনে হয়েছে। তবু ওই মেয়েটি—যার ভালো নাম সংঘমিত্রা, ডাকনাম মিতা ?

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল, সংঘমিত্রা নয়, মিতাই ভালো। দুটি হাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়েছিল, আশ্চর্য, নমস্কার জানিয়েছিল ছোট আর ছেলেমানুষ রঞ্জুকে।

আচ্ছা, মিতা কি পড়েছে এই সব বই, এমনি করে ভেবেছে তারও মতো ? তাই সম্ভব, নিশ্চয়ই তাই। পরিমলের বোন সে, পরিমলের মতো একই চিন্তায়, একই সুরে তারও মন বাঁধা। ভাবতে ইচ্ছা করে এই বইগুলো পড়ে মিতারও কি তার মতো উত্তেজনা জাগে রিভলবার হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে, 'অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি ?' ছোট মেয়ে মিতা, পোষা হরিণের সঙ্গে যে মিতার মিতালি, সেও কি—

রঞ্জু, রঞ্জন ?

বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকল কে।

রক্ত চমকে উঠল সর্বাঙ্গে। পরিমল ? দরজা খুলে রঞ্জন বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দায় : কে ?

কিন্তু পরিমল নয়। পাকামি-ভরা গালের পাশ দিয়ে ভ্যাংচানির ভঙ্গিতে আধখানা জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে ভোনা। সঙ্গে সঙ্গে দলটিও ঠিক আছে তার—কালী, খাঁদু, পূর্ণ। ভবেন মজুমদারের সেই কেলেঙ্কারিটা কবে চুকে-বুকে গেছে, দলবলের মধ্যে ভোনা আবার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার হয়ে উঠেছে মনসাতলা মার্বেল পার্টির একচ্ছত্র নেতা।

বিরক্তিতে বিস্বাদ হয়ে গেল মন : ডাকছিস্ কেন ?

ভোনা জিভের ডগাটায় একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে সেই পুরোনো কবিতার লাইন দুটো শুনিয়ে দিলে :

> Jim is a good dog
> Everyday he catches a frog—

—হ্যালো গুড্ ডগ জিম, কী করছিস ?

রঞ্জন বললে, সকালবেলা কী ইয়ার্কি এ সব ?

—এ সব ইয়ার্কি নয় ? ওরে বাবা, ভালো ছেলে এখন ধম্মো কথা শুনতে চায়। শুনবি ধম্মো কথা ? সংস্কৃত ?—ভোনা বিশ্রী মুখভঙ্গি করে শুরু করলে, ওঁ শম্ন আপো ধন্বন্যা শমন সন্তনুপ্যা, শন্নো সমুদ্রিয়া আপঃ শমন সন্তকুপ্যা—

কিছুদিন আগে পৈতে হয়েছে ভোনার, তারই খানিকটা মন্ত্র গড়গড় করে আউড়ে গেল সে।

খাঁদু বাধা দিয়ে বললে, থাম্ না, কেন বাজে কথা বলছিস। শোন্ রঞ্জু, আজ সন্ধ্যের পর বেরুতে হবে।

—কেন ?

—বাঃ, তুই আছিস কোথায় রে ? আজ যে নষ্টচন্দ্র। অতুল ঘোষের লিচু বাগানে আজ—হুঁ-হুঁ।

মনটা কালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দিনের পর দিন এই দলটা সম্পর্কে তার অশ্রদ্ধা বেড়েই চলেছে সমান ভাবে। সেই কুৎসিত কদর্য কথাগুলোকে সে ভোলেনি, ভোলেনি গোষ্ঠের মেলার সে অতিরিক্ত অভিজ্ঞতাটা। তবুও সে বিরক্তিটা চাপা পড়ে গিয়ে একটা নতুন শ্রদ্ধা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—লেগেছিল একটা আলোর ঝলক। 'ঝাণ্ডা উঁচে রহে হামারা'। ছাব্বিশে জানুয়ারীর স্বাধীনতার সংকল্প। পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছে ভোনা। তারও পরে—

ভবেন মজুমদার। পেছনে পেছনে ক্যানেস্তারার শোভাযাত্রা। তার পরে আবার যেমন ছিল ঠিক সেই রকম। বান ডেকেছিল, এসেছিল নতুন আত্রাইয়ের দেশ-ভাসানো নতুন বন্যা—একাকার হয়ে গিয়েছিল গ্রাম-প্রান্তর, নদী-নালা, দিগ্‌দিগন্ত। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ নেমে গেল সে জল। পড়ে রইল সেই পচা ডোবা, সেই দুর্গন্ধ জল, কচুরিপানা, আর ব্যাঙাচির ঝাঁক। মনসাতলা থেকে সেই মার্বেলে ফাটানোর শব্দ : 'হাত ইস্টেট্‌—উড্‌ডু কিপ্'—' আজ আবার সেই পুরোনোর পুনরাবৃত্তি—অতুল ঘোষের লিচু বাগানের নষ্টচন্দ্র।

বললে, না।

—না কেন ? চমৎকার লিচু, ভালো মজঃফরপুরী লিচু। একটা খেলে আর ভুলতে পারবি না। আর ভালোছেলেগিরি করতে হবে না, সন্ধ্যেবেলা ডেকে নিয়ে যাবো, কেমন ?

রঞ্জন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল—না। কটু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এদের দিকে। শুধু এরা খারাপ ছেলে বলেই নয়, আজ একটা নতুন ধাক্কায়, নতুন একটা আশ্চর্য পথের সংকেতে এদের সঙ্গে তার পার্থক্যটা চিহ্নিত হয়ে গেছে আরো স্পষ্টরেখায়। এই মনসাতলা নয়, ভয়ে

ভরা কাঞ্চননদীর বালিডাঙা নয়, এই শহর মুকুন্দপুরের খোয়াওঠা রাস্তা, নড়বড়ে ল্যাম্প্‌ পোস্ট্‌, বাজারের নোংরা মারোয়াড়ীপট্টি কিংবা ইটবারকরা একতলা জীর্ণ বাড়িগুলোও নয়। অন্ধকার রাত্রে নক্ষত্রভরা আকাশে প্রসারিত আকাশগঙ্গার মতো আজ তার মনের যাত্রা শুরু হয়েছে অপরিচয়ের ছায়াপথে। আলো-আঁধারের অচেনালোকে সেখানে বিকট শব্দে বোমা ফেটে পড়েছে ফুলঝুরির মতো, ছুরির নীল উজ্জ্বল ফলার মতো রিভলবারের ছুটন্ত আগুন ; ফাঁসিকাঠ দেখেনি—তবুও সে চিনতে পারছে ফাঁসির দড়িতে দুলছে উজ্জ্বল কয়েকটি জ্যোতির্ময় মূর্তি—ওরা কারা? ক্ষুদিরাম? সত্যেন বসু? কানাইলাল? বীরেন গুপ্ত?

এই ভোনা, এই কালী, খাঁদু আর পূর্ণ—এরা সে অপূর্ব ছায়ালোকের কল্পনাও করতে পারে না। নিতান্ত নিচুতলার জীব এরা, এরা করুণার পাত্র। বললে, মাপ করতে হবে ভাই, ও সবের মধ্যে আমি নেই।

—অঃ?—গালের পাশ দিয়ে জিভ বের করে ভেংচে দিলে ভোনা, পিট্‌পিট্‌ করে উঠল শয়তানী-ভরা চোখ দুটো। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, থাকো বাবা, ঘরে বসে গুড্‌ কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাও তাহলে। চলে আয় খাঁদু, ওই গঙ্গাফড়িংটাকে দিয়ে কাজ হবে না দেখছি।

চলে গেল দলটা। যেতে যেতে উচ্চঃস্বরে গান ধরল ভোনা :

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে'—

খাঁদু চিৎকার করে উঠল, এন্‌কোর, এন্‌কোর। আবার—এগেইন্‌।

ইস্কুল ছুটি। দুপুরে নিঃসাড় পায়ে সে বেরিয়ে এল খিড়্‌কি দরজা দিয়ে, এসে বসল ঠাণ্ডা ছায়ায় ঘেরা পাখিডাকা নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। বই দুটো সঙ্গে করে এনেছে, আর এনেছে খাতা পেনসিল। খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল রেললাইনের কালো রেখা দুটোর দিকে, মোটা মোটা পাতার আড়ালে গাঢ় সবুজ উজ্জ্বল কচি বাতাবী-গুলোর দিকে, যেখানে আমগাছে পুষ্ট একটা লতার সঙ্গে পাকা একটা লাল টুকটুকে বন-কাঁকুড় দুলছে, তার দিকে। তার পর পেন্‌সিলের পেছনটাকে কামড়ালো খানিক-ক্ষণ, গোটা কয়েক দাঁতের দাগ ফেলল, খাতার মলাটে এলোমেলোভাবে একটা পাখি আঁকল, সেটা হাঁস আর ময়ূরের মাঝামাঝি একটা প্রাণী, নিজের নামটা জড়ানো ইংরেজিতে সই করবার চেষ্টা করলে বারকতক, তারও পরে লিখতে শুরু করল।

কতক্ষণ লিখেছিল খেয়াল নেই হঠাৎ পেছনে শুনল হাসির শব্দ। কেমন ভয় করল, থরথর করে কেঁপে উঠল হাতটা, পেন্‌সিল গড়িয়ে পড়ল নিচে।

আর কে? পরিমল। এম্‌নি করে চমক লাগিয়ে দিতেই ভালবাসে।

সেই পরিচিত হাসিতে ঝল্‌মলে পরিমলের মুখ। বললে, ধরে ফেলেছি।

খাতাটা সে লুকোবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এর মধ্যেই সেটাকে ঝাঁ করে ছিনিয়ে নিয়েছে পরিমল। তারপর দু পা দূরে সরে গিয়ে, যাতে রঞ্জন কেড়ে নিতে না পারে, উল্‌টে-পাল্‌টে একটা কবিতা সে আবিষ্কার করে বসল: 'কানাইলাল'।

—'কানাইলাল'? বড় বড় চোখ করে রঞ্জনের মুখের ওপরে দৃষ্টি ফেলল পরিমল: কানাইলালকে নিয়ে তুই কবিতা লিখছিস কেন রে?

—তোমার কী। খাতাটা ফেরত দাও।

—দাঁড়া, দাঁড়া, ভারী ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে যে।—পরিমল আরম্ভ করল:

মৃত্যুর রূপ এত সুন্দর এ কথা জানিনি আগে,
চিরচঞ্চল প্রাণের লীলায় মত্ত-পিনাকী জাগে।
বেদনা-বিহ্বত কাজল নয়নে
বিদ্যুৎশিখা হেরি ক্ষণে ক্ষণে
একটি মানবে যুগমানবের মূর্ত প্রতীক হেরি,
মৃত্যুর মাঝে বাজায়ে গেল সে সত্যের জয়ভেরী।

—আরে, আরে!—পরিমলের কৌতুকভরা সরস কণ্ঠ হঠাৎ শ্রদ্ধা আর মুগ্ধতায় নিবিড় হয়ে উঠল: এ যে সত্যিকারের একজন নীরব কবিকে আবিষ্কার করা গেল! এত ভালো তুই লিখতে পারিস তা তো জানতাম না। বলতুম টুকলি করেছিস, কিন্তু তা তো বলতে পারি না। কারণ কানাইলালকে নিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত কবিতা লেখেনি, এ ব্যাপারে তুই-ই বাংলার প্রথম কবি। ভালো কথা, পিনাকী মানে কি রে?

রঞ্জু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, থাক, রেখে দে।

—রেখে দেব, বলিস কী! এ যে আবিষ্কার! ইউরেকা!

শস্যশ্যামলা বাংলা মায়ের স্নেহ-অঞ্চলতলে,
রুদ্র বিষাণ উঠেছে বাজিয়া, খড়্গ উঠেছে জলে!
এই সব কচি কিশোরের প্রাণে
আছিল স্বপ্ন কোথা কোন্‌খানে
ধ্বংসের হেন উগ্র পিপাসা বহ্নির এই জ্বালা,
রচিল কেমনে বুকের রক্তে মায়ের বরণ-মালা!

—না, এ কবিতা জোরে পড়া যাবে না।—পরিমল নীরবে লেখাটার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল। পড়া যখন শেষ হল, তখন কেমন বিষণ্ণের মতো চুপ করে রইল সে, কোনো কথা বললে না, ভালো মন্দ মন্তব্যও করলে না কিছু। মাটি থেকে একটা চোর-

কাঁটার শিষ তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললে, তুই যা লিখেছিস তা কি তুই বিশ্বাস করিস রঞ্জু?

—কেন করব না?

পরিমল ছোট্ট করে হাসল: ঠিক তা নয়। বই দুটো তুই পড়েছিস তা বুঝতে পারছি। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় খানিকটা লিখে যাওয়া এক জিনিস, আর তাকে মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করা একেবারে আলাদা ব্যাপার। এ সব উচ্ছ্বাসের কোনোও দাম নেই, কাজের বেলায় দেখা যায় সবটাই ফাঁকি।

পরিমলের বলার ধরনের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে অপমানিত বোধ করলে রঞ্জন, তেতে উঠল মন। হঠাৎ শিরদাঁড়াটা সোজা করে বললে, তোকে কে বলল এর সবটাই উচ্ছ্বাস?

—না, এম্নি।—পরিমল কথাটাকে ঘুরিয়ে নিলে, থাক ও-সব। কেমন লাগল বই দুটো?

ক্ষুণ্ন জবাব এল: চমৎকার। আর বই নেই এ রকম? সেই 'পথের দাবী'?

—আছে, সবই আছে। দেব আস্তে আস্তে। কিন্তু পরিমল আবার ঘুরিয়ে নিল কথাটাকে: আজ বিকেলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি এক জায়গায়?

—কোথায়?

—পুবপাড়ায় আমাদের একটা ক্লাব আছে, লাইব্রেরীও। নাম 'তরুণ সমিতি'।

ক্ষুদিরাম কানাইলালের সঙ্গে যে মন আকাশগঙ্গার স্রোতে স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার 'তরুণ সমিতি'র পরিণতিটা ভালো লাগল না। হতাশভাবে রঞ্জন বললে, কী হয় সেখানে?

—এক্সারসাইজ, হয়, বক্সিং হয়, লাঠি আর ছোরা খেলাও শেখানো হয়। তা ছাড়া লাইব্রেরীতে অনেক ভালো ভালো বই আছে, তুই তো পড়তে ভালবাসিস।

আগ্রহ আবার সজাগ হয়ে উঠল: এ সব বই পাওয়া যাবে? এই ফাঁসির ডাক, এই শহীদ সত্যেন?

—পাগল নাকি রে? কী ছেলেমানুষ তুই!—পরিমল হাসল: এ সব যে বাজেয়াপ্ত বই। এগুলো রাখলে পুলিস ধরবে না?

—বাজেয়াপ্ত বই!—বইগুলো যে সাধারণ নয়, তা তো বুঝতে পেরেছে পড়েই। কিন্তু 'বাজেয়াপ্ত' কথাটা—আর তার সঙ্গে পুলিসের যোগাযোগের উল্লেখ শুনে যেন সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠল তার।

পরিমল মিটিমিটি হাসল: হ্যাঁ, বাজেয়াপ্ত বই।

—তবে এ সব বই তুমিই বা পেলে কোথায়? তুমিও কি পুলিসের ভয় করো না?

—চুক্—জিভে আর তালুতে মিলিয়ে হতাশভরা একটা শব্দ করলে পরিমল: তুই একেবারে হোপ্‌লেস। বড্ড বেশি তোর কৌতূহল। এত সহজেই কি সব কথা জানা যায়—না জানতে দেওয়া যায়? ধৈর্য ধরতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়, তৈরি করে নিতে হয় মনকে। সে সব হবে পরে। কিন্তু একটা কথা তোকে বলি রঞ্জু। এ কবিতা যদি লিখতে হয় তা হলে সামলে চলিস। এ সমস্ত বই পড়া অন্যায়। এ রকম কবিতা লেখাও তার চাইতে কম অন্যায় নয় কিন্তু।

মুখ গোঁজ করে রঞ্জন বললে, আমি কাউকে ভয় করি না।

পরিমল বললে, বোকার মতো কথা হল রে। এ তোর অহিংস খদ্দর-মার্কা ব্যাপার নয় যে হৈ চৈ করতে করতে জেলে যাবি আর কাশীর ষাঁড়ের মতো ফুলের মালা চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে আসবি। সি-আই-ডির ঘা-কতক হাণ্টার, আর হাতের নোখে গোটা কয়েক পিন্ ফুটলেই বুঝতে পারবি কত ধানে কত চাল বেরোয়।

চুপ করে রইল রঞ্জন। কল্পনার ছায়াপথের আশেপাশে আরো কতগুলো নতুন জিনিসের আভাস পাচ্ছে মন। কিছু একটা প্রায় বুঝতে পারছে, অথচ ধরতে পারছে না। মনের এ অবস্থাটা অসহ্য সবচাইতে। হাতের নাগালের মুখোমুখি একটা পাকাফলের মতো। ছোঁয়া যায়, ছেঁড়া যায় না অথচ।

উঠে পড়ল পরিমল।

—বই দুটো তো পড়া হয়ে গেছে, আমি নিয়ে চললাম।

—নতুন বই?

—পরে দেব। আর ভালো কথা, যাবি তুই আজকে আমাদের ক্লাবে? ঘণ্টা দেড়েক পরে ডাকতে আসব।

—আসিস।

পরিমল চলে গেল। পেন্‌সিল মুখে দিয়ে রঞ্জন ভ্রূকুটি-ভরা চোখে নিরীক্ষণ করতে লাগল সদ্যোরচিত কবিতাকে। এ কি সত্যিই একটা সাময়িক আবেগ, না রক্তে রক্তে শিকড় মেলে দেওয়া দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ একটা প্রতীতি?

পুবপাড়ার তরুণ সমিতি ভারী সুন্দর জায়গায়।

একটা পুরোনো সেকেলে জমিদার বাড়ি। মোটা মোটা থাম, উঁচু উঁচু খিলান। দোতলা অতিকায় বাড়িটার ওপরতলাটা প্রায় ধ্বসে পড়েছে, ভাঙা ছাতের ওপরে ঘাস গজিয়েছে, গজিয়েছে বট পাকুড়ের চারা। শাদা বাড়িটার সর্বাঙ্গ কাল্‌চে সবুজ শ্যাওলায় ছাওয়া, তার ভেতর দিয়ে সরু মোটা অসংখ্য সাপের মতো ছড়িয়ে আছে বাদামী রঙের শিকড়। নিচের তলায় কতগুলো ঘর এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তবে বালাই নেই জানালা কবাটের। বছর সাতেক আগেও এই জমিদার বংশের অবশিষ্ট দুজন নাকি এ বাড়িতে

বাস করত—বিধবা মা, কুমারী মেয়ে আর হিন্দুস্থানী চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল মা আর মেয়ে গলাকাটা অবস্থায় খাটের ওপরে পড়ে আছে, ঘরময় রক্ত। আর বাক্সপ্যাটরাগুলো সব ভাঙা—হিন্দুস্থানী চাকরটাও অদৃশ্য।

সেই থেকে এই বাড়ি পরিত্যক্ত। কোন দাবিদার একে অধিকার করতে আসেনি। খুন আর ভাঙাচুরো অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভূতুড়ে বাড়ি বলে এর নাম রটেছে। ছড়িয়েছে নানারকম অবান্তর আর অলৌকিক কাহিনী। সামনে একটা ছোট মাঠ, কোমরসমান ঘাস আর বিছুটির জঙ্গল মাথা তুলেছে। তা ছাড়া চারপাশে ঝুপসী আমের বাগান। সেকেলে সমস্ত জংলা গাছ—এককালে হয়তো ভালো আম হত, কিন্তু এখন যা হয় তা দুর্দান্ত টক আর পোকা লাগা। সর্বভুক্ ছেলেরা পর্যন্ত এ বাগানের দিকে পা বাড়ায় না, অবশ্য ভূতের ভয়ও যে এক-আধটু না আছে এমন কথাও বলা যায় না।

কিন্তু 'তরুণ সমিতি'র ছেলেরা একটু গোঁয়ার, তাই বেছে বেছে এই নির্জন অস্বস্তিভরা জায়গাতেই গড়ে তুলেছে তাদের আখড়া। বিছুটি আর ঘাসবনভরা মাঠটাকে কোদাল দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করে ফেলেছে, বসিয়েছে প্যারালাল বার, রিং ঝুলিয়েছে, দুলিয়েছে বক্সিংয়ের বালির বস্তা। তা ছাড়া খেলার ব্যবস্থাও আছে, এক-পাশে করা হয়েছে দাড়িয়াবান্ধা (গাদী) আর ব্যাড্‌মিণ্টনের ঘর। লাইব্রেরীটা তবে এখানে নয়, সেটা পাড়ার মধ্যে ক্লাবের একজন মেম্বারের বাড়িতে।

ওরা দুজনে 'তরুণ সমিতি'র জিম্‌ন্যাষ্টিক ক্লাবে গিয়ে যখন পৌঁছুল, তখন চারদিকে শান্ত-বিকেল। ঝুপসী আমবাগানের আড়ালে বেলাশেষের সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে ভীরুর মতো। ক্লাবের প্রায় পনেরো-বিশটি ছেলে একান্ত অভিনিবেশ সহকারে শরীরচর্চায় ব্যস্ত। কয়েকজন কুমীরের মতো লম্বা শুয়ে হুস্ হুস্ করে বুক-ডন দিচ্ছে, একজন ঝুলছে রিংয়ের সঙ্গে, আর একজন প্যারালাল বারে হাঁটু ভাঁজ করে আটকে দিয়ে মাথা নিচে ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে—ঠিক ছবিতে দেখা শিম্পাঞ্জীর মতো। একজন দু হাতে দুটো বক্সিং গ্লাভ্‌স পরে ধাঁই ধাঁই করে ঘুষি বসাচ্ছে ঝুলন্ত বালির বস্তায়। পরিমল পরে বলেছিল, অমনি করলে নাকি ঘুষির ওজন বাড়ে। আর আখড়ায় ঢুকতেই সব চাইতে আগে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে একটা আশ্চর্য মানুষ। কুচকুচে কালো রঙ, ছ ফুট লম্বা একজন যুবক। চওড়া চিতানো বুক—যেন লোহায় গড়া চেহারা। মাথার ওপর মস্ত একখানা লাঠি নিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে—এত জোরে ঘোরাচ্ছে যে লাঠিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু চোখে পড়ছে যে একটা বিরাট চাকার সূক্ষ্ম উড়ন্ত রেখা। দৃঢ় বিশাল শরীরের পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ছোট বড় অসংখ্য 'মাস্‌ল' ঢেউয়ের মতো উঠছে পড়ছে, বাইসেপগুলো ফুলে ফুলে উঠছে এক একটা লোহার পিণ্ডের মতো। তিন-চারটি ছেলে লাঠি দিয়ে তার মাথায় ঘা দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই প্রচণ্ড অশরীরী ঘূর্ণির

কাছে গিয়ে চটাস্ চটাস্ করে তাদের হাতের লাঠিগুলো ঠিকরে ফিরে আসছে, একজনের লাঠি তো ছিটকে বেরিয়েই চলে গেল হাত থেকে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রঞ্জন। বললে, অদ্ভুত।

পরিমলও সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল। প্রতিধ্বনি করে বললে, অদ্ভুত, তাই না? উনিই বেণুদা, আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারী। বলতে গেলে ক্লাবের সব।

কথাটা পরিমল না বলে দিলেও রঞ্জন বুঝতে পারত। ওই স্বাস্থ্য, লাঠির ওপর অমন অপূর্ব দখল—কে আর ক্লাবের সেক্রেটারী হবে এ লোক ছাড়া।

সশ্রদ্ধভাবে পরিমল বলে চলল, এক লাঠির যে কতরকম কসরৎ উনি জানেন তার সংখ্যা নেই। আর শুধুই কি লাঠি? বক্সিংয়ের সময় ওঁর একটা মাঝারি সাইজের ঘুষি খেলে পনেরো মিনিট ধরে আমাদের মাথা ঘুরতে থাকে। রিং বারের এমন ফিগার নেই যা করতে পারেন না। এক নাগাড়ে দেড়শো ডন দিতে পারেন—একটু কষ্ট হয় না।

একটু পরেই লাঠি খেলা বন্ধ হল। কালো কুচকুচে একটা মূর্তির ওপরে বার্নিশ তেলের মতো ঘাম চকচক করছিল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেললেন বেণুদা, এগিয়ে এলেন সেদিকে যেখানে ওরা দুজনে দাঁড়িয়েছিল। পরিমল কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ভরাট গম্ভীর গলায় কথা কয়ে উঠলেন বেণুদা।

—তুমি, রঞ্জন না?

মৃদু ভয় এবং গভীর বিস্ময়ের একটা মিশ্র অনুভূতি দোলা খেয়ে গেল মনে। কথার জবাব দিতে গিয়েও দিতে পারল না, কেমন যেন ধরে এল গলাটা।

বেণুদা এবারে হাসলেন: আমাদের জিমন্যাস্টিক ক্লাব কেমন দেখছ রঞ্জন?

—খুব ভালো। কিন্তু—এতক্ষণে জড়তাটা কাটিয়ে উঠতে পারল সে: আপনি নাম জানলেন কেমন করে আমার?

বেণুদা শুধু হাসলেন, উত্তর দিলেন না কথাটার। তারপর বললেন, আমাদের ক্লাবের মেম্বার হবে তো?

পরিমলই জবাব দিলে রঞ্জনের হয়ে। সোৎসাহে বললে, নিশ্চয় হবে। সেই জন্যেই ওকে ধরে নিয়ে এলাম।

—বেশ, বেশ, খুব ভালো কথা।—ভরাট গম্ভীর গলায় বেণুদা বললেন, শরীর ভালো করা চাই সবার আগে। গায়ে যার জোর নেই, সে-ই পড়ে পড়ে মার খায়। আর যে বলবান, পৃথিবীতে গড়ে ওঠে তারই অধিকার। কী বলো রঞ্জন? ঠিক নয়?

রঞ্জন মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয়।

ঘাসের ওপরে বসলেন বেণুদা, পাশে বসল ওরা দুজন। বেণুদার ঘামে ভেজা শরীর থেকে একটা গন্ধ আসতে লাগল নাকে। কিন্তু ওই গন্ধটার ভেতরেও যেন পাওয়া গেল

শক্তির পরিচয়, পৌরুষের ব্যঞ্জনা।

বেণুদা বলে চললেন, তাই বলে অবশ্য আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য এই নয় যে শুধু শরীরকেই ডাগড়া করতে হবে। সে শরীর কাবলীরও আছে, পাঞ্জাবীরও আছে। কিন্তু ফিজিক উইদাউট্ ব্রেন অ্যাণ্ড্ অ্যাক্টিভিটি—কোনো দামই নেই তার। শরীরকে আমরা ভালো করব নিশ্চয়। কিন্তু তা শুধু নিজেদের জন্যে নয়। অন্য দশজনের জন্যে, সমাজের জন্যে। আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য সব রঞ্জনকে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছ তো পরিমল ?

পরিমল অপ্রতিভ হয়ে মাথা নাড়ল, না।

বেণুদা ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন পরিমলের দিকে, পরিমল লজ্জা পেল। বেণুদা বলে চললেন, আমরা সব রকম সোশ্যাল সার্ভিস্ করবার দায়িত্বও নিয়েছি। ধরো নার্সিং। কোথাও কারুর অসুখ-বিসুখ করলে আমাদের ক্লাবের মেম্বাররাই নার্সিং করতে যায়। কেউ যদি অন্যায় করে তার প্রতিবাদ করব আমরা। দুষ্টের দমন করা আমাদের মস্ত একটা কাজ। শহরের গুণ্ডা-বদমায়েসরা যাতে আমাদের নামে ভয়ে কাঁপে, সে ব্যবস্থাও আমরা করব। এ তো গেল শরীরচর্চার দিক। তা ছাড়া আমাদের লাইব্রেরী আছে, সেখানে বাছা বাছা বই রেখেছি আমরা। দেশের ছেলেরা যাতে মানুষ হয়, তাদের শরীর আর মস্তিষ্ক একই সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে, এই হল আপাতত আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পরিমল, ফেরবার পথে তুমি রঞ্জনকে আমাদের লাইব্রেরী দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।

পরিমল মাথা নেড়ে জানালো, আচ্ছা।

বেণুদা উঠে এগিয়ে গেলেন প্যারালাল বারের দিকে। পরিমল চাপা গলায় জানতে চাইলে : কেমন দেখলি ভাই বেণুদাকে ?

এখানে এসে যে একটি কথা ক্রমাগতই রঞ্জনের মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, সেই কথাটাই বলতে পারল সে : চমৎকার।

পরিমল সায় দিয়ে বললে, হাঁ, চমৎকার। একটু বেশি করে মিশলেই বুঝতে পারবি কী রকম প্রাণখোলা মানুষ।

ভোনা, কালী কিংবা খাঁদুর একটা নোংরা আবহাওয়া ছাড়িয়ে, নিজের ভেতরে আত্মসম্পূর্ণ রূপকল্পনার জগতের বাইরে এসে, যেন আজ সে দাঁড়িয়েছে একটা নতুন পৃথিবীর সম্মুখে। যেন হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখা সেই আত্রাইয়ের বান। কোথায় ছিল এতদিন এই ছেলেরা, এই ক্লাব ? স্বাস্থ্য সরলতা ইতরতা নেই; দুর্বুদ্ধি নেই, বিড়ি খাওয়ার উৎসাহ নেই, নষ্টচন্দ্রের সুযোগ নিয়ে পরের বাগানের ফল-পাকড় লুটতরাজ করবার মতো স্পৃহাও নেই কারুর। রঞ্জন যেন বায়োস্কোপের ছবি দেখছে সমস্ত। রিংয়ে বারবেল, ব্যাড্-মিণ্টন আর দাড়িয়াবান্ধায়, ছোট বড় লাঠিতে বারো-তেরো বছরের ছেলে থেকে শুরু করে কুড়ি-[illegible] বছরের যুবক [illegible] লাগে, অপরিচিত মনে

হয়। কিন্তু এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তবু কেমন করে এদের সঙ্গে একটা মানসিক সহযোগিতা ঘটে গেছে, এদের একান্ত ভাবে বোধ হচ্ছে নিজের দলের লোক বলে।

তবু কোথায় সূক্ষ্ম অতৃপ্তিবোধ। একটা ছোট কাঁটা যেন খর্ খর্ করছে পায়ের পাতার নিচে। কিছুতেই ভুলতে পারেনি সেই 'ফাঁসির ডাক' আর 'শহীদ সত্যেন'। বুকের শিথিল শিরাগুলোকে যেন একটা প্রকাণ্ড ধনুকে ছিলার মতো জুড়ে দিয়ে প্রচণ্ড টঙ্কার দিয়েছে কেউ। তার মন্দ্রে প্রতিটি রোমকূপ পর্যন্ত গম্‌গম্ করে উঠেছে এখন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে ফণা নাড়া দিয়েছে বাসুকী নাগ, দেশ ঘুমিয়ে পড়ল বলেই তো সে বশ মানতে চায় না। ওই বইগুলো যেন তার কাছে কোন এক যাদুকর সাপুড়ের তুবড়ী বাঁশির মাতাল করা ডাক পৌঁছে দিয়েছে। কিছু একটা করতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই, তৃপ্তি তো নেইই।

কেমন যেন আশা হয়েছিল, এই ক্লাব তার সন্ধান বলে দেবে। এইখানেই কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে গুপ্ত দরজা, যার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেই মাটির বন্ধন বিদীর্ণ হয়ে পাতালপুরীর আনন্দ খুলে যায়,—দেখা যায় গল্পে শোনা সাদা মার্বেলপাথরের একটা অতলান্ত সিঁড়ি বিশাল অজগরের মতো পাক খেতে খেতে কোথায় নেমে গেছে—নেমে গেছে ক্ষুদিরামের কামানের কারখানায়। কিন্তু শুধু শরীর ভালো করতে হবে, শুধু মগজকে উন্নত করতে হবে। এর বেশি কিছু নয়? রাত জেগে কতগুলো রোগীর সেবা করাই কি তরুণ সমিতির শেষ কথা? বোমার ফুলঝুরি, ছুরির নীলোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ফলকের মতো রিভলবারের এক ঝলক আগুন আর ছায়ামূর্তির মতো ফাঁসিকাঠে বিকীর্ণ যে আকাশগঙ্গা—সে কত দূরে, কেমন করে স্পর্শ করা যায় তাকে?

সমস্ত আখড়াটা অদ্ভুত কতগুলো ধ্বনিতে মুখর। রঞ্জন অন্যমনস্কভাবে শুনতে লাগল।

—শির্, তামেচা, বাহেরা—

লাঠির ঠকঠক আওয়াজ।

ব্যাড্‌মিণ্টনের কোর্ট থেকে শব্দ: ফাইভ অল।

ধপাধপ করে ঘুষি পড়ছে বক্সিংয়ের বালির বস্তায়।

আস্তে আস্তে নেমে আসছে বেলা। আমবাগানের ডাইনি চুলের মতো বন পাতার আড়ালে লাল সূর্য ডুবে গেল। পরিমল কী ভাবছিল, রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, তুই এক্‌সারসাইজ্ করবি না?

—নাঃ, আজ আর নয়। কাল কুস্তি করে গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, বিশ্রাম নিচ্ছি আজকের দিনটা।

—ওঃ।

আবার চুপচাপ। পরিমল কেমন গম্ভীর হয়ে আছে, রঞ্জনের মনের ভেতরে আবার

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই আগুন-জ্বলা বইগুলো, কতগুলি অগ্নিপতঙ্গের মতো তাদের চলন্ত আর জ্বলন্ত অক্ষর। পরিমল জানে। ওই সুরঙ্গ পথটা তার জানা আছে। কেন সে বলে দেয় না তাহলে ? কেন সে এমন করে দূরে দূরে সরিয়ে রাখছে ওকে ?

চল্ রঞ্জু, এবারে ওঠা যাক্—

উঠতে ইচ্ছে করছে না। ক্লান্ত স্বরে বললে, এখনি ?

—আর একটু বসবি ? কিন্তু লাইব্রেরী যে আবার বন্ধ হয়ে যাবে ওদিকে।

—ওঃ, চল্ তা হলে—

ওরা উঠতে যাবে, এমন সময় কাণ্ড হয়ে গেল একটা।

একটি ছেলে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে এল ছুটতে ছুটতে : বেণুদা, বেণুদা !

মাটিতে ঝুঁকে পড়ে বেণুদা তখন একটা ভারী বারবেল তুলছিলেন, ধপাৎ করে সেটাকে ফেলে দিলেন মাটিতে। বললেন, ব্যাপার কী, কী হয়েছে ?

—ফণীর মার ঘর থেকে সব জিনিসপত্র রাস্তায় টান মেরে ফেলে দিচ্ছে। বাক্স-প্যাঁটরা, বাসন-কোসন সমস্ত।

ছ ফুট উঁচু লোহার মানুষ বেণুদা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তীরের বেগে। এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত। লাঠির আওয়াজ, ব্যাড্‌মিণ্টন কোর্টের হাঁকাহাঁকি, চারপাশের ছোট বড় কথা আর হাসি কিছু কোলাহল। পোড়ো জমিদারবাড়ি আর ঘাসে-ছাওয়া মাঠটার ওপর দিয়ে যেন একটা কঠিন স্তব্ধতা নেমে এল।

—কে ফেলে দিচ্ছে ? হালদার ?—বেণুদার গলা গম্‌গম্ করে উঠল, প্রতিধ্বনি কাঁপতে লাগল ভাঙ্গা বাড়িটার ঘরে ঘরে গুম্‌গুম্ শব্দে : হালদার ফেলে দিচ্ছে ?

—শুধু হালদার নয়, তার সঙ্গে আরো চার-পাঁচটা যণ্ডা লোক। লাঠিও নিয়ে এসেছে।

—পাড়ার লোকে কী করছে ?

—দাঁত বের করে দেখছে সব, হাসছে। ফণী বাধা দিতে গিয়েছিল, একটা লোক তাকে এমন মেরেছে যে তার নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত—

দূত তার সংবাদটা আর শেষ করতে পারল না। তার আগেই বেণুদা গর্জন করে উঠলেন।

—অ্যাটেন্‌শন।

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব ব্যাপার ঘটে গেল একটা। ক্লাবের যেখানে যে ছিল, ব্যাড্‌মিণ্টন আর দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট থেকে রিং পর্যন্ত যারা এতক্ষণ নিতান্ত নিস্পৃহভাবে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, নক্ষত্রবেগে ছুটে এল তারা। ড্রিলের ভঙ্গিতে সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল মাঠের মাঝখানে।

—লেফ্‌ট টার্ন—

একসঙ্গে কতগুলো পায়ের শব্দ করে দলটা ঘুরে গেল।

কার যেন উত্তেজিত স্বর শোনা গেল : লাঠি নেব বেণুদা ?

—নো। কুইক্ মার্চ।

সঙ্গে সঙ্গে বেণুদাকে অনুসরণ করে দলটা এগিয়ে চলল।

রঞ্জন বসেছিল অভিভূতভাবে। কিছুই বুঝতে পারেনি। এতক্ষণ বায়োস্কোপের ছবি দেখছিল, এখন যেন তারই রোমাঞ্চক একটা অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এর পরে ?

রঞ্জনের কাঁধে আল্‌গাভাবে হাত ছোঁয়ালে পরিমল, ডাকলে, রঞ্জু ?

—অ্যাঁ ?

—চল্।

—কিন্তু কোথায় ?

—তরুণ সমিতি কী করতে চায় তার পরিচয় পাবি।

ততক্ষণে একটা কিছু আঁচ করে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে মন : মারামারি হবে নাকি ভাই?

—বড্ড বকাস তুই রঞ্জু, তাড়াতাড়ি চলে আয় না—পরিমলের কথায় উত্তাপ আর বিরক্তি স্পষ্টভাবে ফুটে বেরুল। দলটা অনেক এগিয়ে গেছে, ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলে পেছনে পেছনে। তারপর দু-তিন মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছল পাড়ার ভেতর, এই রহস্যময় ঘটনার অকুস্থলে।

কেমন একটা গোলমেলে আর বিশৃঙ্খল ব্যাপার। ছোট একখানা মেটে বাড়ি—গরীবের বাড়ি যে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সেই বাড়ির ভেতর থেকে চার-পাঁচজন লোক ঘরের খাটবিছানা থেকে আরম্ভ করে তৈজসপত্র যা কিছু বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। টাকমাথা খাটো চেহারার একটা লোক নির্দেশ দিচ্ছে তাদের। একজন বিধবা ভদ্রমহিলা চিৎকার করে কাঁদছেন, একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে মাটিতে বসে আছে নির্জীবের মতো, তার গায়ে ছিটের জামাটায় রক্তের ছোপ। আর একটু দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার ভদ্রলোকেরা, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই—যেন মেলায় কুমোরের দোকানে সাজানো একরাশ ধোঁপধাপ জই পুতুল।

বেণুদার দলটা গিয়ে পৌঁছতেই টাকমাথা লোকটা তাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। তার ছোট ছোট চোখ দুটো দেখতে পেল রঞ্জন—সেই পড়ন্ত বেলাতেও দেখতে পেল কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মতো তার ভ্রূ দুটো বেঁকে গেল দুদিকে।

বেণুদা বললেন, হালদার মশাই, কী এসব ?

হালদার ঝাঁজালোভাবে বললে, তা দিয়ে দরকার কী আপনার ?

বেণুদা হাসলেন। কালো মুখের ভেতর দিয়ে এক ঝলক শাদা শাদা দাঁত বেরিয়ে এল নিষ্ঠুর ভাবে : দরকার আছে বই কি। শুনুন, বিধবার ওপর এসব জুলুমবাজি চলবে না।

—নাঃ, চলবে না ?—বিশ্রী একটা জাম্বুবানের মতো দাঁত খিঁচুনি দিলে হালদার : যেন পুলিস সাহেব এসেছেন। আমার বাড়ি, আমার ঘর, বিনা ভাড়ায় ছ'মাস থাকতে দিয়েছি—সেই দয়াই হল আমার কাল। এখন নড়তে চাইছে না, ইয়ার্কি নাকি ?

বেণুদা নিরীহ হয়ে বললেন, কিন্তু এভাবে ওদের বার করে দিলে ওরা যাবে কোথায় ?

—যেখানে খুশি। কিন্তু আপনারাই বা কেন মাতব্বরী করতে এসেছেন ? নিজের চরকায় তেল দিন না মশাই।

—আপনি ওদের জোর করে তাড়িয়ে দেবেন ?

—হ্যাঁ, দেব দেব।—হালদার খাটালের মোষের মতো মাটিতে পা ঠুকল দুপ্‌দাপ্‌ করে : আমার বাড়ি থেকে বের করে দেব আমি।

—কিন্তু ওরা যাবে কোথায় ? আপনি ভদ্রলোক—উনি ভদ্রঘরের মেয়ে, কোথায় গিয়ে উনি দাঁড়াবেন ?

হালদার এবারে চেঁচিয়ে উঠল।

—আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক। গাঁয়ে মানে না অথচ মোড়লি করতে এসেছেন। ভদ্রভাবে উঠে যেতে বলেছি, তখন তো যায়ই নি, আবার মেজাজ কত। ধম্মো আছে, আইন আছে। `জোর জুলুম চলবে না। ওঃ, ভারী আমার ভদ্রলোকের মেয়ে রে। ওর দাঁড়াবার জায়গা আমায় বাত্‌লে দিতে হবে। বেশ তো, দাঁড়ান না গিয়ে কোনো বস্তিতে, কিংবা খোলাপট্টিতে—

—চুপ রও অসভ্য জানোয়ার—

সার্কাসে বাঘের গর্জন শুনেছিল, সেটা এবার শুনল মানুষের গলায়। বেণুদার একটা প্রবল ঘুষিতে তিন হাত দূরে ঠিকরে পড়ল হালদার, দাঁত ছরকুটে চিত্‌ হয়ে পড়ল মাটিতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভেতরে যে লোকগুলো জিনিসপত্র টানাটানি করছিল, তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বাইরে। দুজনের হাতে দুখানা ছোরা ঝকঝক করে উঠল, পেশাদার গুণ্ডা ওরা—এর জন্যেই এসেছিল তৈরি হয়ে।

তারপর শুরু হয়ে গেল কুরুক্ষেত্র।

ভিড়ের মধ্যে ছোরাসুদ্ধ একটা হাত উঠল, আর একখানা হাত পেছন থেকে টেনে নামিয়ে নিলে। চিৎকার, কোলাহল। কয়েকটা আর্তনাদের শব্দ তীরের মতো চিরে দিলে আকাশকে, সমবেত ভদ্রলোকেরা বাসাভাঙা কাকের মতো আওয়াজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন। ওই পুতুলগুলো জীবন্ত তা হলে।

মারামারি, কিল চড় ঘুষি চলছে, পরিমল কোথায় ছিটকে চলে গেছে। রঞ্জনের বুক কাঁপছে বাঁশ পাতার মতো, হাঁটুর কাছটা যেন ভেঙে আসতে চাইছে আতঙ্কে, গা দিয়ে দর-দর করে ঘাম পড়ছে। কী করতে যাচ্ছিল খেয়াল নেই, মনেও নেই—খুব সম্ভব ছুটে

পালাবারই উদ্দেশ্য ছিল তার। কিন্তু তার আগেই কপালের ডানদিকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা যেন আকাশ থেকে ঠিক্‌রে বাজের মতো ছোঁ দিয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় চোখ বুজে এল তার, পরক্ষণেই সব ঝাপ্‌সা আর অস্পষ্ট—কোনো বোধই আর জেগে রইল না শরীরের কোনোখানে।

দশ

জরিপাড় শাড়ির একটুখানি আঁচল, খানিকটা টিংচার আয়োডিনের গন্ধ, একখানা সরু হাতে কয়েক গাছা চুড়ির ঝিলিক আর মাথায় পাখার মিষ্টি বাতাস, প্রথম অস্বচ্ছ চেতনায় এগুলোই আভাসিত হয়ে উঠল ছায়া-ছায়া ভাবে। তারও পরে টের পাওয়া গেল কপালের ডান দিকে একটা টনটনে যন্ত্রণা, অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—একটুও কি কমেনি ?

কোমল হাল্‌কা গলায় জিজ্ঞাসা।

এবারে চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে মেলল রঞ্জন।

—মা ?

কিন্তু মা তো নয়। অচেনা ঘর, অচেনা পরিবেষ্টনী। মাথার কাছে টিপয়ের ওপরে লণ্ঠনের আলো। শ্যামল একখানি মিষ্টি মুখ, কপালে সিঁদুরের টিপ। বয়েসে ছোটদির মতো হবে, কিন্তু চোখেমুখে মার মতোই স্নেহগভীর আকুলতা।

—বাড়ি যাবে ? একটু সুস্থ হও, বাড়ি পাঠিয়ে দেব বই কি।

তখন মনে পড়ল। মনে পড়ল পুবপাড়ার জিমনাষ্টিক ক্লাব, কুইক মার্চ, হালদারের দলের সঙ্গে সেই মারামারি। ছুটে পালাবার কথা ভেবেছিল, আচমকা একটা চোট লাগল মাথায়, তারপরেই চারদিকের পৃথিবীটা দুলে উঠল, হঠাৎ চলতে শুরু করা একটা গাড়ির চাকার মতো ঘুরে উঠল সমস্ত, তারও পরে—

সব শাদা—সব অন্ধকার! একেবারে ছেলেবেলায়, অশরীরী অবিনাশবাবুর হাতছানিতে সেই ভাঙা আশ্রমের পাশে সেই অভিজ্ঞতা। অন্ধকার সরে গিয়ে যখন আলো পড়ল, তখন দেখা গেল শাড়ির আঁচল, একটি মিষ্টি স্নেহ-করুণ মুখ, আর উৎকণ্ঠাভরা প্রশ্ন: একটুও কমেনি ?

এর পরে চিন্তাধারাটা বয়ে গেল খরগতিতে। উঠে বসল বিছানায়। এবারে সমস্ত ঘরটা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। ঘরে শুধু সেই মেয়েটি নয়, ওদিকে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন বেণুদা। বিছানায় তার পায়ের কাছে পরিমলও বসে আছে, যতটা বিষণ্ণ তার চেয়েও বিপন্ন মুখ যেন, অই জলে পড়েছে।

সাগ্রহে পরিমল বললে, কি রে, ভালো লাগছে একটু? তোকে ওখানে নিয়ে যাওয়াই ভুল হয়েছিল আমার।

হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত কাপুরুষ আর দুর্বল বলে বোধ হল, মনের ভেতরে বিঁধল অপমানবোধের একটা সূক্ষ্ম কাঁটা। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে পা-টা টলে গেল একবার, কিন্তু রঞ্জু সামলে নিল নিজেকে। বেশ সহজ সতেজ গলায় বললে, না আমার কিছু হয়নি।

—না হওয়াই উচিত।—গম্ভীর গমগমে গলায় কথাটা বললেন বেণুদা, হাসলেন। —এত সহজেই কি দমে গেলে চলে? আজকাল ছেলেরা তো আর ননীর পুতুল নয়, তাদের হতে হবে আয়রনম্যান।

—তুমি থামো তো দাদা। মহিলাটি ভ্রূভঙ্গি করলেন: ও-সব বক্তৃতা রেখে দাও। ছেলেটাকে তো প্রায় মেরে ফেলবারই দাখিল করেছিলে তোমরা। সকলেই তো তোমাদের মতো আয়রনম্যান নয়, গোঁয়ারও নয়। ও-সব সকলের সয় না বাপু।

পরিমল হেসে উঠল: করুণাদি, আপনি কিন্তু রঞ্জুকে অপমান করলেন।

—অপমান! কেন?—করুণাদি একবার কৌতুকভরা চোখ বুলিয়ে নিলেন রঞ্জনের ওপরে, তারপরে তাকালেন পরিমলের মুখের দিকে: এতে অপমানটা হল কোন্‌খানে?

—বাঃ, অপমান নয়? ওকে আপনি দুর্বল বললেন, কিন্তু ও সেটা নিশ্চয়ই মেনে নিতে রাজী হবে না।

—উঃ দাদা—বেণুদার দিকে ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি প্রসারিত করলেন করুণাদি: তোমার শিষ্যদের কী বক্তৃতা দিতেই যে তুমি শিখিয়েছ! আর কিছু না হোক কথার চোটেই এরা ভারত উদ্ধার করে ফেলবে দেখছি। বক্তৃতা দিয়েই ইংরেজকে একেবারে ধুলোর মতো উড়িয়ে দেবে ভারতবর্ষ থেকে।

ঘর সুদ্ধ সবাই হাসল, এমন কি রঞ্জনও। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এই যে প্রসঙ্গটা উঠেছে তার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না সে; কেমন অপ্রতিভ, কেমন সংকুচিত মনে হচ্ছে যেন। সত্যিই তো, সে যে দুর্বল, তার যে শক্তি নেই এটা তো পরিষ্কার ধরা পড়ে গেল সকলের কাছে। না হয় লেগেছে একটা লাঠি কিংবা ইঁটের চোট, তাই বলে অমনভাবে বোকার মতো অজ্ঞান হয়ে পড়াটা উচিত হয়নি তার, উচিত হয়নি একটা গভীর করুণা আর সমবেদনার প্রার্থীরূপে নিজেকে সকলের সামনে ধরে দিতে। দেখেছে ফাঁসির দড়ির স্বপ্ন, বুক পেতে নিতে চেয়েছে এগিয়ে চলার পথের সব চাইতে রূঢ় আঘাত; গুরুগোবিন্দের মতো 'তুরঙ্গসম অন্ধ-নিয়তি'র রশ্মি আঁকড়ে তাকে ছোটাতে চেয়েছে মৃত্যুর চড়াই উত্‌রাই চুরমার করে। কিন্তু এ কি হল! সকলের কাছে তো ধরা পড়ে গেল তার দুর্বলতা, তার অশক্ত পঙ্গুতা!

এ ঘরে আর থাকা চলে না—অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে মনে পড়েছে

বাড়ির কথাও। বেরিয়েছে সেই বিকেল চারটেয়, অথচ ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে এখন দেখা যাচ্ছে পৌনে আটটা। বাড়িতে কৈফিয়তের কথাটা ভাবতেই আশংকায় তালু অবধি শুকিয়ে উঠল তার।

—বাড়ি চল পরিমল।

করুণাদি বললেন, বোসো, একটু চা খেয়ে তাজা হয়ে যাও।

—নাঃ, চা আমি খাব না।

বেণুদা বললেন, তা হলে একটা গাড়ি ডেকে আনো পরিমল। ও হেঁটে যেতে পারবে না।

—কিছু দরকার নেই। আমি বেশ হাঁটতে পারব, আমার কিছু হয়নি।

করুণাদি এগিয়ে এলেন, নরম আঙুলে একবার কপালের ব্যাণ্ডেজটা পরীক্ষা করে দেখলেন রঞ্জনের। চমৎকার ভালো লাগল স্পর্শের এই অনুভূতিটুকু। ভারী নরম, ভারী কোমল করুণাদির হাতের ছোঁয়া। কেমন যেন ঘুম জড়িয়ে আসে, ব্যথা জুড়িয়ে যায়, মনে হয় মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছেলেবেলায় ঘুম পাড়ানোর আগে।

—আচ্ছা এসো ভাই।—করুণাদি হাসলেন : তাই বলে আমাদেরও ভুলে যেয়ো না। পরিচয়টা তো হল, পরিমলের সঙ্গে এসো মাঝে মাঝে এখানে, কেমন ?—করুণাদি একটু থামলেন, ছায়াজড়ানো চোখে বললেন, তাই বলে অজ্ঞান অবস্থায় নয়, বেশ ভালো ছেলের মতো আর লক্ষ্মী হয়ে।

এত সুন্দর লাগল কথাগুলি। বুকের ভেতর কেমন ছলছলিয়ে উঠল, কেন যেন ইচ্ছে করল হেঁট হয়ে সে করুণাদির পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু কেমন বাড়াবাড়ি ঠেকবে, সবাই কী ভাববেন কে জানে। তবু আচমকা একটা খেয়ালের মতো বোধ হল অজ্ঞান হয়ে এলেও নেহাৎ মন্দ হয় না সেটা। অন্তত করুণাদির এই হাতের ছোঁয়াটা পাওয়া যাবে এবং এও নেহাৎ মন্দ একটা জিনিস নয়।

—আচ্ছা, আসব।

লণ্ঠন ধরলেন করুণাদি, আগে আগে চললেন বেণুদা, মাঝখানে রঞ্জন। আর এতক্ষণে জায়গাটাকে চিনতে পারল। ওই তো বড়ালদের মন্দিরটা, বরদাবাবুর বাগান, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় টিপ টিপ করে জ্বলছে কেরোসিনের আলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বেণুদা বললেন, রঞ্জন।

—উঁ ?

—ব্যথা পেয়েছ সত্যি, কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ো না। জানোই তো:

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ?

রঞ্জন চুপ করে রইল, কী জবাব দেবার আছে ভেবে পেল না।

বেণুদা বললেন, আচ্ছা তবে যাও। রাত হয়ে গেছে, আর দেরি কোরো না। পরিমল, ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে কৈফিয়তের হাত থেকে বাঁচিয়ে তবে তোমার ছুটি, বুঝেছো?

পরিমল মাথা নাড়ল।

দু পা এগিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক: রঞ্জন?

করুণাদি। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন লণ্ঠন হাতে। শাড়ির জরিপাড়টা চিক চিক করছে আলোয়, কানের একটা গয়না উঠছে ঝিলমিল করে। সুকুমার শ্যামল মুখের ওপরে প্রতিটি ভাঁজে আর রেখায় আরো গভীর, নিবিড় ছায়া যেন লুটিয়ে পড়েছে।

বললেন, ভুলো না রঞ্জন, আবার এসো, কেমন?

—আসব, নিশ্চয় আসব। রঞ্জনের গলা আবেগে বেশ খেয়ে গেল এবারে।

বেণুদার পাশে, লণ্ঠন হাতে তখনো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন করুণাদি। কিন্তু আর পেছন ফিরে তাকানো চলে না, এবার এগোতেই হবে বাড়ির দিকে।

ল্যাম্পপোস্টের মিটমিটে ভূতুড়ে আলোয়, খোয়া-ওঠা প্রায় নির্জন পথ দিয়ে চলল দুজনে। পরিমল যেমন মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে চুপ করে থাকে, তেমনি নিঃশব্দেই চলেছে পাশাপাশি। ল্যাম্পপোস্ট যত পেছনে সরছে তত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে নিজেদের ছায়া, অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘতর হয়ে, আবার আর একটা পোস্টের কাছাকাছি আসতেই পায়ের নিচে গোল হয়ে জড়ো হচ্ছে সেটা—ছড়িয়ে পড়ছে পাশে পাশে।

কিন্তু কতক্ষণ আর ভালো লাগে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে চলা? রঞ্জন অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করল, ওটা বেণুদার বাড়ি, না?

—হুঁ।

—করুণাদি কে ভাই?

পরিমল সংক্ষেপে বললে, বেণুদার বোন—আমাদের সকলের দিদি।

—বেশ করুণাদি, না?—রঞ্জন সাগ্রহে পরিমলের দিকে তাকালো, করুণাদি সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চায় বিস্তীর্ণ ভাবে। সমর্থন চায় নিজের বিশ্বাসের।

—হুঁ।—একটু থামল পরিমল: কিন্তু ভারী কষ্টের জীবন করুণাদির—ভারী ব্যথার জীবন।

—কষ্ট, ব্যথা! রঞ্জন চমকে উঠল: কেন?

—আর একদিন বলব—শ্রান্ত স্বরে জবাব দিলে পরিমল।

ক্ষুণ্ণভাবে চুপ করে রইল রঞ্জন। ওই এক দোষ পরিমলের। পরে বলব, আর একদিন বলব। আভাস দেয়, অথচ স্পষ্ট করে না, ঠেলে দিতে থাকে জিজ্ঞাসার

আকুল কালো অন্ধকারের মধ্যে। এ এক বিশ্রী লুকোচুরি খেলা—সমস্ত মনকে ক্লান্তিতে অবশ করে দেয়, বিকল করে দেয় বিরক্তিতে।

এগারো

এক একটি দিন। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন। একটি সূর্যোদয় থেকে আর একটি উদয়রাগ পর্যন্ত সৌরগোলকের পরিক্রমা। চব্বিশটি ঘণ্টা দিয়ে ছকে কাটা দিন—নানা রঙের দিন। আলাদা আলাদা রূপ, নতুন ভাবনা, নতুন সংঘাত। পরিচিত পৃথিবীতে অজস্র অগণিত অপরিচয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো। তিলে তিলে পলে পলে নিজেকে জানা, নিজের শক্তিকে, দুর্বলতাকেও।

নানা রঙের খণ্ড ছিন্ন দিন। বহু-বিচিত্রে পরিকীর্ণ, স্বাতন্ত্র্যে সীমাঙ্কিত। তারপর দূরে সরে এলে মনে হয় যেন কোনো অন্ধকার রাত্রিতে চলন্ত ট্রেনের সে যাত্রী। কালি ঢালা বন-বনান্তরে গ্রাম-গ্রামান্তের একটা নির্বিশেষ অবিচ্ছিন্নতা যেন ধরা দেয় চোখের সামনে। সেই অচ্ছেদ চলিষ্ণুতার ভেতরে দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া ছোট স্টেশনের এলোমেলো আলোর মতো নির্বিশেষের মধ্যেও কোনো বিশেষের মোহময়তা। সুদূর অতীতে বিস্মৃতপ্রায় রূপদক্ষের হাতে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল শলা-ছেদনী ঝকমক করে ওঠে শিলালিপির পাষাণপটে। সমস্ত মানসিকতার সঙ্গে সেদিন যাদের যোগ ছিল—হয়তো অলক্ষ্য, হয়তো নিছক অর্থহীনভাবে—আজ তাদের সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি ধরা পড়ে গেছে; পাওয়া গেছে মানসিক সংযোগের সেই সূক্ষ্মসূত্রটি—সেদিন অজানিতে যার অঙ্কুর পড়েছিল, আজ তা পল্লবিত হয়ে জীবনের বীথি দিয়েছে রচনা করে। আর সেই ছায়াবিস্তারের নিচে শুকিয়ে মরে গেছে অনেক গুল্ম, অনেক নতুন চারার নতুন পাতা—যেগুলিকে হয়তো সেদিন ভুল হয়েছিল আগামী কালের বনস্পতি ভেবে।

সেদিনকার সেই মারামারি ব্যাপারটা অনেকখানি গড়িয়েছিল অবশ্য। শেষ পর্যন্ত পুলিসও এসেছিল। হালদারকে ধমকে দিয়ে গেছে, একটা নামমাত্র ভাড়ার ব্যবস্থাও ফণীর মার কাছ থেকে করে দিয়েছেন কোতোয়ালী থানার অফিসার ইন্‌চার্জ স্বয়ং। হালদার গজর গজর করে বলেছে, এভাবে অন্যায় জুলুম যদি গরীবের ওপর হয় স্যার।

দারোগা ধমক দিয়েছেন: বেশি কথা বাড়াবেন না মশাই। গুণ্ডা এনে হাম্‌লা করেছিলেন, মারামারির ব্যবস্থা করেছিলেন। ফের বকবক করেন তো ট্রেসপাস্‌, গুণ্ডা আইন আর রায়টিঙের চার্জে চালান করে দেব। শহরের মানী ব্যবসায়ী বলে এ যাত্রা আপনাকে ছেড়ে দিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি হুঁশিয়ার হবেন।

তারপরেই সরে পড়েছে হালদার। তবে যাবার সময় কাঁকড়া বিছের ল্যাজের মতো ভ্রূজোড়া নাচিয়ে বলে গেছে, যদি দিন পাই তবে ওই তরুণ সমিতির ছোকরাদেরও

একবার আমি দেখে নেব। এ অপমান ভোলবার বান্দা নই আমি।

তবে দারোগার নিরপেক্ষতাআছে। বেণুদাকেও তিনি থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে নিষেধ করে দিয়েছেন এসব অনধিকারচর্চা করতে। যদি কোথাও কোনো অন্যায় ঘটে, তার জন্যে পুলিস আছে এবং এই কারণেই গভর্ণমেণ্ট পুলিস ডিপার্টমেণ্টকে পোষণ করে থাকেন। কিছু করণীয় থাকলে থানাতেই একটা খবর দেওয়া উচিত, নিজেদের হাতে আইনের ভার নেওয়াটা বে-আইনী।

বেণুদা হাসিমুখে বলেছেন, আচ্ছা মনে থাকবে।

দারোগা আরো দু-চারটে কথা বলেছেন বেণুদাকে, কিন্তু গলা নামিয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে। হিতৈষী বন্ধুর মতো তিনি বেণুদাকে জানিয়েছেন যে তরুণ সমিতির কার্যবিধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং এই ক্লাবটির পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে শুভার্থী হিসেবে তিনি বেণুদাকে সংযত এবং সাবধান থাকবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বেণুদা বলেছেন, অনুরোধ তিনি ভুলবেন না।

মোটামুটি ভাবে ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ওখানেই। আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রঞ্জন বাড়িতে এসে পৌঁছতে যে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুরমা গলা ছেড়ে আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছিলেন, তার সব সুরাহা করে দিয়েছে পরিমল। বেশ চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং কথাটা সত্যিও বটে, যে এই নিরীহ ভালমানুষটির কোনো দোষই ছিল না। পথে দু দলের মধ্যে মারামারি হচ্ছিল, তারই একটা ঢিল ছিটকে এসে রঞ্জনের কপালে লেগে যায়, তাই—

তাই দুরন্ত ছেলের ওপর একপ্রস্থ বকুনি বর্ষণ করেই বড়রা ক্ষান্ত হয়েছেন। কপাল ভালো, বাবা এক সপ্তাহ থেকে মফঃস্বলে, তাই জেরার সামনে পড়তে হয়নি। নইলে হয়তো পরিমলের সঙ্গে মেশা কিংবা তরুণ সমিতিতে যাতায়াত করাটাও বন্ধ করে দিতেন তিনি।

পরিমল পরের দিন সকালেই খবর নিতে এল। মাথাটায় অল্প অল্প যন্ত্রণা, তখনো নির্জীবভাবে বিছানায় পড়ে ছিল রঞ্জন। পরিমল চলে এল একেবারে শোয়ার ঘরেই— ছোট বোন আধুলী ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

পরিমলকে দেখে খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল রঞ্জন: আয়, আয়।

বিছানার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল পরিমল: আছিস কেমন ?

রঞ্জন ততক্ষণে গায়ের চাদরটা সরিয়ে উঠে বসেছে। অপ্রতিভভাবে বললে, ভালোই আছি।

—যন্ত্রণা-টন্ত্রণা বিশেষ কিছু নেই তো ?

—না।

—যাক্, বাঁচালি—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পরিমল : দস্তুরমতো আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি তুই। যা করে পড়ে গেলি আর যে ভাবে রক্ত ছুটল—দেখে তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। শেষকালে—

লজ্জিত রঞ্জন নীরবে কড়ে আঙুলের নোখটাকে কামড়াতে লাগল।

পরিমল বললে, ওই জন্যেই তো তোকে বলি চলে আয় আমাদের জিমনাষ্টিক ক্লাবে। শরীর শক্ত হবে, বুকে বল আসবে। একটা ঘা খেয়েই অমন অজ্ঞান হয়ে পড়বি না।

—হ্যাঁ, আমি ক্লাবের মেম্বার হবো—আস্তে আস্তে, যেন ঘোরের মধ্যে পরিমলের কথার জবাব দিলে রঞ্জন। শুধু শরীরটা শক্ত করবার জন্যে নয়, শুধু একটা ঘা খেয়ে অতি সহজেই অজ্ঞান হয়ে পড়বার অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যেও নয়। একটা প্রকাণ্ড দশাসই জোয়ান—ভীমভবানী কিংবা রামমূর্তি হওয়ার বাসনাও নেই। সত্যি বলতে কি, হাত পায়ের ডুমো ডুমো মাসল ফুলিয়ে, বুকের ওপর একটা পাঁচটনী রোলার চাপিয়ে কিংবা দু হাতে দুখানা চল্‌তি মোটর টেনে ধরে যারা কসরৎ দেখায়, সেই সব অতিকায় জোয়ানেরা কোনো মোহ জাগায় না রঞ্জনের মনে। কেমন স্থূল মনে হয়, নিজের শরীরকে অত করে দেখানোর মধ্যে কোথায় যেন একটা অশালীনতা বোধ করে সে। আসলে তরুণ সমিতি তার ভেতরে কেমন একটা বিচিত্র প্রলোভন জাগিয়েছে—সৃষ্টি করেছে একটা নেশার মাদকতা। ওখানকার ছেলেরা, ওখানকার জীবন, ভূতুড়ে জমিদার বাড়ির পরিবেশে ওই আখড়াটা, বেণুদা, বেণুদার একটি কথার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলের লাইন বেঁধে এসে দাঁড়ানো—আর তারপরে মার্চ করে চলা—এদের সবগুলি একসঙ্গে মিলে কিসের একটা রোমাঞ্চিত চাঞ্চল্য জাগিয়েছে তার চেতনায়। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা? ঠিক কী সে জানে না, অথচ এটা জানে যে তরুণ সমিতির ছেলেদের সঙ্গে তার মনের চমৎকার সহযোগিতা ঘটে গেছে তার অজান্তেই।

আস্তে আস্তে বললে, লাইব্রেরীতে যাওয়া হল না যে।

—তুইই তো বাগড়া দিলি। নইলে চমৎকার যাওয়া যেত আজকে।

—বেশ তো, তাই চলো না হয়।

—ধ্যেৎ, আজ কী করে হয়। তুই তো উঠতেই পারবি না।

জোর গলায় রঞ্জন বললে—আমার কিচ্ছু হয়নি, আমি ঠিক আছি।

—তুই ঠিক থাকলে কী হবে, বাড়ি থেকেই তো যেতে দেবে না তোকে।

—ঠিক দেবে—সে ব্যবস্থা আমি করব এখন।

—আচ্ছা দেখি—চুপ করে খানিকক্ষণ কী ভাবল পরিমল। তারপর অল্প একটু হেসে বললে, আজ সকালেই বেণুদা এসেছিলেন তোর খোঁজ নিতে—করুণাদি পাঠিয়ে-

ছিলেন তাঁকে।

—করুণাদি ? রঞ্জুর মনটা হঠাৎ যেন ছলছল করে উঠল। মনে পড়ল অচেনা ঘর, লণ্ঠনের আলো, শাড়ির পাড়, কয়েকগাছা চুড়ি আর মায়ের মতো স্নেহভরা মিষ্টি কণ্ঠ।

—বেণুদাকে নিয়ে এলে না কেন ?

—আর একদিন আসবেন বললেন।

রঞ্জুর আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সামলে নিলে। করুণাদি কি আসতে পারেন না তাকে দেখতে ! এলে কিন্তু বড় ভালো হত। অল্প জ্বর হয়েছিল রাত্রে আর সেই জ্বরের ঘোরেই করুণাদি সম্পর্কে একটা বেদনাসিক্ত কৌতূহল সমস্ত রাত মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরেছে তার। করুণাদির জীবন নাকি বড় কষ্টের, ভারী দুঃখের। কিন্তু কিসের কষ্ট, কিসের দুঃখ তার ? বেণুদার বোন—করুণাদির মতো মানুষ—সংসারে এমন কী আছে যা তাঁকে ব্যথা দিতে পারে ?

করুণাদির যোগাযোগে আর একটি নামও চমকে উঠল চেতনায়—সে মিতা, সংঘমিত্রা। দু হাত তুলে যে প্রথম নমস্কার করেছিল তাকে। আচ্ছা, মিতা কি জানে তার এই আঘাতের ইতিহাস ? একটু কি দুঃখিত হয়নি, একটুখানিও কি চিন্তিত হয়নি তার জন্যে ?

কিন্তু মিতার কথাটা জিজ্ঞাসা করা তো আরো অসম্ভব। কেন কে জানে, একবার একটুখানি দেখা ওই মেয়েটির কথা মনে পড়লেই কেমন যেন কষ্ট হয় তার। ড্রাগনের প্রাসাদে বন্দিনী রাজকন্যা। অচেনা অস্বস্তির দেশ থেকে তাকে মুক্ত করে চেনার মাটিতে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আনবে কে ? সে নিজেই ?

মিতার প্রসঙ্গটা মনের ভেতর উঁকি মারতেই অকারণে লজ্জা পেল সে। তার পরেই সে চিন্তার মোড়টা ঘুরিয়ে নিলে, জিজ্ঞাসা করল, মারামারির কী হল ভাই ?

পরিমল বললে। হালদারের কথা, দারোগার কথা, বেণুদার কথা। আর পরিমলের সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর ভেতর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে উঠল : তরুণ সমিতি সম্পর্কে কী সন্দেহ করেন দারোগা ? আর এর উদ্দেশ্যকেই বা এমন বিপজ্জনক বলে মনে করেন কেন গভর্ণমেণ্ট ?

কিন্তু এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক। রঞ্জন জানে কী বলবে পরিমল। তেমনি ঘুরিয়ে জবাব দেবে, আজ থাক, আর একদিন বলব সে কথা।—আর একদিন ! রঞ্জন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এই আর একদিনের উৎপীড়নে। মাটির তলায় পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ পথ খুলবার মন্ত্রটা নিশ্চয়ই জানা আছে পরিমলের কিন্তু সে বলবে না, খালি প্রতীক্ষায় আকুল করে রাখবে, অস্বস্তিতে বিতৃষ্ণ করে রাখবে মন। তার চাইতে কৌতূহলকে সংযত করে রাখাই ভাল।

শুধু বললে, নতুন বই দিবি না আমাকে?

পরিমল চোখ তুলে সতর্কভাবে তাকিয়ে নিলে ঘরের চারদিকে। আস্তে আস্তে বলল, চুপ। সে হবে পরে, কিন্তু সত্যিই আজ বিকেলে যাবি তুই লাইব্রেরীতে?

—হুঁ, যাব।

—ডাকতে আসব?

—না। কেউ টের পেলে বেরুতে দেবে না। তার চাইতে আমিই এক ফাঁকে যাবো তোদের বাড়িতে--তোকে ডেকে নেব'খন।

—কিন্তু না বলে গেলে বাড়িতে তো বকাবকি করবে।

রঞ্জন হাসল। সদ্যোপড়া রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন আউড়ে বললে,

পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে—

পরিমল হাসল প্রসন্নভাবে। ওর মুখের ওপর কেমন একটা মেঘ আড়াল দিয়ে ঘনিয়ে ছিল, সেটা যেন উড়ে গেল একটা হালকা বাতাসে। বললে, কবি, জীবনে সবটাই কাব্য নয়। আঘাত যখন আসে তখন ওই কাব্যের ওপর দিয়েই তাকে কাটিয়ে দেওয়া যায় না।

—তা জানি।—আবেগভরে রঞ্জন বললে, তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতেও পারব।

পরিমলের চোখে কৌতুক চকচক করে উঠল, কানাইলালের ওপর কবিতা লিখেই?

—না। দরকার হলে কানাইলালের মতো পিস্তলও ধরতে পারব।

—বটে বটে।—একটা আঙুল ঠোঁটের ওপর দিয়ে পরিমল বললে, স্‌স্‌। অত জোরে নয়। পিস্তল ধরবার অত সাহসই যদি থাকে, তা হলে সময়মতো তারও পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

শরীরের মধ্যে যেন ঝড়াৎ করে খানিকটা বিদ্যুৎ বয়ে গেল—ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুলগুলো পর্যন্ত। খোঁচা খাওয়া সাপের গর্জনের মতো একটা তীব্র উত্তেজিত শব্দ করে উঠল রঞ্জন।

—পরিমল!

কিন্তু ততক্ষণে পরিমল উঠে দাঁড়িয়েছে। অনেকটা বেশি বলে ফেলেছে, অসংযত হয়ে অনধিকার চর্চা করে ফেলেছে অনেকখানি। বললে, থাক ওসব। আমি চললাম।

নিরুত্তাপ কঠিন গলা। রঞ্জন টের পেল একটু আগেকার অসংযত শিথিলতার ওপরে পাথরের মতো নিষ্ঠুর কঠিনতা এসেছে ঘনিয়ে। একে ঠেলে দেওয়া যাবে না, কোনো অনুরোধ-উপরোধেও স্থানভ্রষ্ট করা যাবে না একে।

দাঁতে দাঁত চাপল সে শক্তভাবে, যেন অত্যন্ত বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সামনে বাধা পেয়ে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। পরিমল আবার বললে, আমি চলি।

—আচ্ছা।

—বিকেলে যাবি তো?

—যাব।

—আচ্ছা—

পরিমল বেরিয়ে যাচ্ছিল, পেছন থেকে রঞ্জন ডাকল: শোন্?

—কিছু বলবি?

একটা ঢোক গিলে নিয়ে রঞ্জন বললে, বেণুদা আর করুণাদিকে বলিস আমি ভালোই আছি।

—বলব।

বেরিয়ে গেল পরিমল, একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটা।

কিন্তু তখন মনের মধ্যে যেন ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে রঞ্জনের। সারা শরীরে রক্ত উছলে উছলে উঠছে, তার ঝাঁজ যেন ছড়িয়ে পড়ছে তার নাক মুখ থেকে, একটা জ্বরের মতো উত্তাপ যেন অকস্মাৎ দেখা দিয়েছে তার ত্বকের ওপর। পেয়েছে—যা চেয়েছিল, তার সন্ধান পেয়েছে, মিলেছে বহু প্রত্যাশিত আর প্রতীক্ষিত গোপন মণিকোঠার সন্ধান। পাথরের বাধা চকিতের মধ্যে আড়াল করে দিয়েছে দৃষ্টিকে; কিন্তু ওইটুকুর ফাঁক দিয়েই সে দেখে নিয়েছে সেই আশ্চর্য জগতের একটুখানি আভাস। কোথায় দুর্নিরীক্ষ্য আকাশ-গঙ্গার মতো—সহস্র কোটি মাইলেরও ওপারের প্রসারিত ছায়া-সরণির মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে সেই বিচিত্র পথ। সেখানে বোমার ফুলঝুরি ফুলের মতো ফুটে পড়ল, পিস্তলের আগুন ছুটে গেল নীলিমোজ্জ্বল একটা সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলকের মতো—ফাঁসি কাঠে দুলে উঠল জ্যোতির্ময় শহীদদের ছায়ামূর্তি।

এবার সে পথ তারও পথ। শুধু আর একটু অপেক্ষা করতে হবে—আরো একটু তৈরি করে নিতে হবে নিজেকে।

মায়ের নজর কিন্তু যেমন কড়া, তেমনি সজাগ। খিড়কি দরজা দিয়ে নিরাপদে সরে পড়ছিল, মা ঠিক ধরে ফেললেন যথাসময়ে।

—এই ছেলে, মাথায় ফেট্টি বেঁধে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

—একটু মনসাতলায় যাবো মা—তো-তো করে জবাব দিলে রঞ্জন।

—ঠিক মনসাতলায় তো? একটুও এদিক ওদিক নয়?

জোর করেই মিথ্যে কথা বললে। সাধারণত তার মুখে আসে না, কেমন ধরা পড়ে যায় বোকার মতো। কিন্তু আজ বলে ফেললে, আর বললে যেন অবলীলাক্রমেই। মনের মধ্যে অন্য রকম জোর এসেছে একটা, বুকের মধ্যে কী একটা জিনিস টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, চিরদিনের নিরীহ ভালো ছেলেটির ভেতরে ঘূর্ণি হাওয়ায় মাতলামির মতো

ঘটে গেছে কেমন বিপর্যয় ব্যাপার।

—না মা—সজোর গলায় রঞ্জন বললে, আর কোথাও যাব না।

—মনে থাকে যেন। আর সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে—কেমন?

—আচ্ছা।

পথে বেরুতেই খাঁচার পাখির মতো ছাড়া পেল মন। শরীরটা একটু আড়ষ্ট বোধ হচ্ছিল, আঘাতের গ্লানিটা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি এখনো। তবু এই আড়ষ্টতাটা কাটাবার জন্যেই যেন সে হেঁটে চলল আরো জোর পায়ে।

—উকু—উকু—উকু—

ঠিক যেন বানরের ডাক। শূন্য থেকে ভেসে এল বলে মনে হল। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে, তাকালো চারদিকে।

—উকু—উকু—হুক্কা—হুয়া—

বানর আর শেয়াল এক সঙ্গে ডাকছে। কিন্তু তারা তো পাখি নয় যে আকাশ থেকে ডাকবে। তা হলে নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু ডাকছে কোত্থেকে?

হতভম্বভাবে চারিদিকে তাকাতেই প্রশ্নটার জবাব মিলল। রেলওয়ে গুমটিটার পাশে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার মাথা সজোরে দুলছে। তার ওপর দিয়ে গুটি তিনেক বানরের মতো মুখ কাঁচা তেঁতুল চিবুতে চিবুতে দাঁত খিঁচোচ্ছে রঞ্জুকে। ভোনা অ্যাণ্ড্ পার্টি। বেশ আছে।

ভোনা চিৎকার করে 'বাহে' ভাষায় বললে, কুন্ঠে থাকি মাথা ফাটাই আইলু বাহে? ও গঙ্গাফড়িং, শুনিছেন?

নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চটে আছে ওর ওপরে। তাই অকারণ পুলকে এই পেছু-লাগা। জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে হন্‌হনিয়ে চলে গেল রঞ্জন।

—হুক্কা—হুয়া—হুয়া—ধ্বনিটা যেন পেছন থেকে তাড়া করে আসতে লাগল।

আসল সমস্যাটা দেখা দিল এর পরে। এতক্ষণ মনে ছিল না কিন্তু ভারী অস্বস্তি লাগল এবারে। একে তো বড়লোকের বাড়ি, আদব-কায়দা নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা। এ সব বাড়ির সামনে আসতে ভয় করে রঞ্জনের, কেমন নার্ভাস বোধ হয় নিজেকে। তার ওপর আবার ডাকতে হবে পরিমলকে। পরিমলের বাবা মোটা চেহারার লোক, দুর্দান্ত মেজাজ, হঠাৎ চাকর লেলিয়ে দেবেন কিনা কে জানে। কেন বড়লোক হল পরিমল? হল ভিন্ন জাতের? তাই তো খাপ খাওয়াতে পারে না, খটকা থেকে যায়। তাই মিতাও বন্দী রাজকন্যার মতো—

শেষ কথাটা ভাবতেই রাঙা হয়ে উঠল কপাল, কুঁকড়ে গেল সমস্ত উৎসাহ। বড় দূরে মিতা—বিশ্রীরকম একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। তাই তার সঙ্গে মিতালির লোভ থাকলেও

হওয়া অসম্ভব। এমন একটা প্রাচীর—যা পার হওয়া যায় না, এমন একটা ব্যবধান—অতিক্রম করা দুঃসাধ্য যেটাকে।

রাস্তার ওপরে ল্যাম্প-পোস্টটার তলায় দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল সে।

সামনে ফুলেভরা বাগান। প্রজাপতি উড়ছে, অল্প অল্প বাতাস লেগে একটা গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ল ঝুর ঝুর করে। ঢেউ-তোলা পাঁচিলটার ওপরে একটা দোয়েল যেন তার বিব্রত অবস্থা দেখে কৌতুকে লেজ নাচাতে লাগল।

বিরক্তিভাবে সাজানো আর ওদের সঙ্গে বিশ্রী ব্যবধান গড়ে রাখা বাড়িটার দিকে মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধিৎসু আর আকুল দৃষ্টি ফেলতে লাগল সে। ওই তো দোতলায় পরিমলের পড়বার ঘর, জানালাটা খোলা, তার সামনেকার টেবিলটাকেও এখান থেকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রঞ্জন ভাবল, ওখানে যদি একবার পরিমল এসে দাঁড়ায়, তবে একটা হাতছানি দিয়েও অন্তত—

নাঃ, বৃথা। পরিমল যেন পণ করেছে জানালার সামনে এসে দাঁড়াবে না। এত বড় বাড়িতে কি একটা জনমানুষও নেই। একবার দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা পশ্চিমা চাকর, উৎসাহভরে তাকে ডাকতে যাবে, কিন্তু বরাত খারাপ, কী মনে করে লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় বেকুবের মতো? ইতিমধ্যে আবার উকিল সারদাবাবুর ঢ্যাঙা ফোর্ড গাড়িটা ঘটর ঘটর করে চলে গেল রাস্তা দিয়ে—লাল ধুলোয় একেবারে স্নান করিয়ে গেল।

খক্‌-খক্‌-খক্‌। নাকে মুখে একরাশ ধুলো এসে ঢুকেছে।

আর তো পারা যায় না। এগিয়ে গিয়ে একবার দেবে নাকি বুক ঠুকে? নাকি ফিরে চলে যাবে, অথবা সোজা চলে যাবে তরুণ সমিতির জিমনাষ্টিক ক্লাবের উদ্দেশ্যে? কিন্তু সেও পরাজয়—আত্মসম্মানে ভয়ঙ্কর বাধছে। মহাঝামেলাতেই পড়া গেল যা হোক।

কিন্তু এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল যেন যাদুমন্ত্রের বলে।

—নমস্কার—

কানের কাছে যেন কাঞ্চন-নদীর ছোট্ট একটি ঢেউ ছলাৎ শব্দে ভেঙে পড়ল।

পরনে নীল রঙের শাড়ি, কপালে কাঁচপোকার টিপ, পায়ে শাদা স্ট্র্যাপের বার্মা চটি। হাতে উল আর ক্রুশ-কাঁটা, কোথা থেকে যেন সেলাই শিখে এল—কুমারী, সংঘমিত্রা লাহিড়ী।

চমকটা সামলে নিলে রঞ্জন, দ্বিতীয় বারের সাক্ষাতে খানিকটা সহজ ভাব এসে পড়েছে নিজের মধ্যে। প্রতিনমস্কার জানিয়ে পাশ কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কিশোরী মেয়েটি আসতে আসতে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে। হাসিমুখে

বললে, এখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। কেন বলুন তো।

—এই, এই—মানে—

—দাদাকে ডাকছিলেন, না?

একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল, কিন্তু কেমন একটা লজ্জায় চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না মিতার দিকে। রঞ্জন তেমনি বিব্রতভাবে বললে, হ্যাঁ, এই—

—তবে রাস্তাতে দাঁড়িয়েছিলেন কেন? ডাকলেই পারতেন।

—এই ভাবছিলাম—

—চলুন, চলুন, আসুন আমার সঙ্গে—

বার্মা চটির একটা মৃদু শব্দে খোয়া-ওঠা পথটা মুখর করে মিতা বাড়ির দিকে চলল, রঞ্জন অনুসরণ করলে তাকে।

—আপনি ভারী লাজুক।

মেয়েদের কাছ থেকে লাজুক অপবাদ পৌরুষে ঘা দেয়। কিশোর মনের ওপর থেকে বোঝা সরে গেল। এবারে সে সোজা দৃষ্টি তুলে ধরল মিতার দিকে: কেন বলছেন এ কথা?

—বাঃ, সেদিন কী রকম ছুটে পালিয়ে গেলেন। আজ আবার এসে রাস্তার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন।—গেটের কবাটটা খুলতে খুলতে মিতা বলে ফেলল: কবিদের বুঝি এইরকম লজ্জা থাকে?

—কবি।—থমকে দাঁড়িয়ে গেল পা।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ,—কবি।—মিতা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল: কিছু জানি না ভাবছেন? শুনেছি দাদার কাছে। চমৎকার কবিতা লেখেন আপনি—একদিন আপনার কবিতা শোনাতে হবে।

—বাজে কথা—ঘাবড়ে জবাব দিলে সে।

—বাজে কথা বইকি। আপনি তো স্বীকার করবেনই না—যা আপনার লজ্জা? আমিই না হয় একদিন আপনাদের বাড়ি গিয়ে কবিতার খাতা চুরি করে আনব। জানেন, কবিতা পড়তে ভালবাসি আমি।

জানে। 'কথা ও কাহিনী'র পাতা উলটেই তা বুঝতে পেরেছে।

মিতা বললে, বসুন এই বাইরের ঘরে। দাদাকে ডেকে দিচ্ছি আমি।

হলঘরের মাঝখানে বিহ্বল রঞ্জনকে দাঁড় করিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে চটুল ছন্দে উঠে গেল ওপরে—চটির শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে এল তার।

দাঁড়িয়ে থাকবে কি বসে পড়বে ভাবতে ভাবতে দেখল কখন এক ফাঁকে একটা গদিমোড়া চেয়ারেই বসে পড়েছে। নিজেকে এলিয়ে দিয়ে মনে হল যেন অনেকক্ষণ কঠিন পরিশ্রমের পরে এইমাত্র বিশ্রাম পেল সে। তারপর তাকিয়ে দেখতে লাগল ঘরটাকে।

তেমনি করেই সাজানো, বাইরের বাগানটায় ফুল-পাতার বিন্যাসের সঙ্গে ঘরের সজ্জাও যেন স্বর মিলিয়েছে। আজকে সেই ধূপের গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে না—কিন্তু তার রেশ যেন থমকে আছে চারদিকে। পাথরের মূর্তিগুলো তেমনি শোভা পাচ্ছে ছোটবড় টিপয়ের ওপরে। এ বাড়ি তার ভালো লাগে না. তবুও আজ ভালো লাগলো। এক কোণে একটা নতুন মূর্তি—যেটা আগের দিন চোখে পড়েনি। ও মূর্তিটা চেনা—নটরাজ, একটা মাসিকপত্রে ওর ছবি দেখেছে। অপূর্ব লাগে ওই মূর্তির ভঙ্গিটা, কেমন রোমাঞ্চ জাগে ওর চারিদিকের শিখা বিচ্ছুরিত বহ্নিবলয়ের দিকে তাকিয়ে। 'হে নটরাজ নৃত্য করো'—। প্রলয়ংকর—ওদের সংকল্পের অধিদেবতা।

কিন্তু মিতা যেন কী করে ফেলেছে ওর,—জলে দোলা লাগবার মতো কেমন ছল-ছলিয়ে উঠছে শরীর। কবি রঞ্জনের পরিচয় পেয়েছে, কৌতুক করেছে তাই নিয়ে। যেটা তার একান্ত নিজের জিনিস, যা খানিকটা লজ্জাভরা ব্যথার মতো সে অতি যত্নে আগলে রেখেছে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে কেমন নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়, যেন আশা করাই যায় না মিতার কাছ থেকে। কিন্তু ইচ্ছা করেই কি এই নিষ্ঠুরতা করেছে মিতা, না সত্যি সত্যিই সে কবিতা লেখে শুনে শ্রদ্ধাবোধ করেছে তার সম্পর্কে?

আবার মিতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে চেষ্টা করল রঞ্জন। একসঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করল অনেক কিছু। আসবার সময় তো আজ বাগানে হরিণটাকে চোখে পড়ল না। নিশ্চয় বাড়ির ভেতরে আছে। কী নীল ওর চোখ দুটো—ভোরবেলাকার আকাশের সঙ্গে মিল আছে সে চোখের, ভিজে ভিজে নীল—যেন সকালের শিশিরধোয়া আকাশের রঙ। ওই নটরাজ মূর্তির যে ছবি দেখেছিল পত্রিকার পাতায়—কী যেন একটা কবিতার লাইন লেখা ছিল তার নিচে? 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে'—। এত দেরি করছে কেন পরিমল?

মিতা—না মিতার সম্পর্কে আর ভাববে না রঞ্জন। হঠাৎ ছেলেবেলার একটা ছবি দেখা দিল চোখে। ঊষা। আঙুলের ডগায় তেঁতুলের আচার চাটতে চাটতে আসছে। বিয়ে দিয়েছিল অশ্বিনী, কচুবনে ছাতনাতলা করে বিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে—আর মন্ত্র পড়েছিল। কী চমৎকার সে মন্ত্র। তারপর বিয়ের শোভাযাত্রা, আর তার বিয়োগান্ত পরিণতি।

আবছা একটুখানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তার বৌ। এখন তারই মতো বড় হয়েছে নিশ্চয়, আর কারো বৌ হয়েছে কিনা কে বলবে। আচ্ছা, ঊষার রঙও বেশ টুক-টুকে ফর্সা ছিল। মনে হয় যেন তার সঙ্গে মিতার মিল আছে, যেন সেদিনের ঊষাই আজ কুমারী সংঘমিত্রা হয়ে—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ভাবতে ভাবতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে মন। নিজেকে বোধ হতে

লাগল অত্যন্ত অসভ্য, অপরিসীম বর্বর। সে কি ভোনার স্তরে গিয়ে নামল ? রায়-বাড়ির বিমলাকে নিয়ে যে কুৎসিত কথা ওরা বলাবলি করেছিল, ও যেন প্রায় ওই ছেলেগুলোর পর্যায়েই নেমে এসেছে। ছিঃ ছিঃ—এ বাড়িতে আসবার সে অযোগ্য, ভদ্রসমাজে মেশাই তার উচিত নয়। ভোনাদের সঙ্গে ওই তেঁতুল গাছের ডগায় উঠে বসাই উচিত ছিল তার।

আত্মধিক্কারের পর্বটা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। ধক করে উঠল বুক—মিতা ? যেন তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করল চেয়ারের কুশনের ভেতরে—যে ভাবনা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে তার—কেমন করে কথা বলবে সে মিতার সঙ্গে ? কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে শব্দটা আরো নিচে নামতেই পরম তৃপ্তিতে খানিকটা বাতাস টেনে নিল ফুসফুসে। এ মিতার পায়ের আওয়াজ নয়, সে লঘুতা নেই এতে। পরিমল নামছে বোধ হয়।

সত্যিই পরিমল।

জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে নামল সেঃ একটু দেরি হল। কিন্তু মিতা যে বললে তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলি—সত্যি নাকি রে ?

—ধ্যেৎ।

—শোন্, লজ্জার কিছু নেই। এখানে এসে সোজা ডাক দিবি আমাকে—কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু উঠে পড়লি যে ? বোস, চা খেয়ে নিই।

—না ভাই, আজ আর চা খাব না—

—কেন, আপত্তি কী ?

—এমনিই।

কিন্তু এমনিই নয়। এ বাড়িতে আর বসতে ইচ্ছে করছে না রঞ্জনের, বেরিয়ে যেতে পারলেই খুশি হয়। একটু আগেকার বিশ্রী ভাবনাটার রেশ কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না, এখানে যতক্ষণ থাকবে যাবেও না!

—তবে চল্—

দুজনে রাস্তায় এসে পা দিল। আঃ, বাঁচা গেল যেন! চেনা, অভ্যস্ত নিজস্ব জগৎ। মাথার ওপরের আকাশটা। ধুলো আর খোয়ায় ভরা পথ। কাঠের উইয়ে-খাওয়া পোস্টের ওপরে ফাটা আর কালিমাখা কেরোসিনের আলো।

—লাইব্রেরীতে যাবি তো ?

—সেই জন্যই তো এলাম।

—বাড়িতে কেউ কিছু বলেনি ?

—মা ধরেছিলেন। ফাঁকি দিয়ে এলাম।

পরিমল হাসল, কিন্তু বিষণ্ণভাবে।

—আমার মা নেই, তাই ফাঁকি দেওয়ার দরকার হয় না কাউকে।

মা নেই শুনলে কষ্ট হয়। আরো পরিমলের মা। রঞ্জু পড়ার ঘরে তাঁর ছবি দেখেছে। অমন সুন্দর মাকে হারানো সত্যি সত্যি দুর্ভাগ্যের কথা, সহানুভূতি বোধ হল পরিমলের জন্যে।

—কতদিন মারা গেছেন তোমার মা?

—অনেক দিন। ভালোকরেমনেওপড়েনা।—পরিমল ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল।

ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল রঞ্জন। নিজের মায়ের মুখখানা ভেসে উঠল মনের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে করুণাদিও। আজ একবার গেলে কেমন হয় করুণাদির ওখানে? কিন্তু কে জানে কী ভাববেন তিনি।

পথ চলতে লাগল দুজনে। একটা খয়েরী-রঙের কোট-পরা লোক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইকেলে, অনর্থক ক্রিং ক্রিং করে বেলটা বাজালো একবার। পরিমলের চলার ভঙ্গিটা শিথিল হয়ে এল, কঠিন তীব্র দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সাইকেলটার দিকে—যতক্ষণ না পথের একটা মোড় ঘুরে মিলিয়ে গেল সেটা।

পরিমলের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করলে রঞ্জন।

—চিনিস লোকটাকে?

—হুঁ।

—কে ও?

পরিমলের দৃষ্টি এবার সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল রঞ্জনের মুখে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললে, কুকুর।

—কুকুর। সে কি?

—পরে বুঝবি—পরিমল দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে শব্দ করলে: একদিন ওই বুলডগগুলোকে ঠাণ্ডা করতে হবে। চিরকাল এভাবে তো চলবে না, আমাদের দিনও আসবেই। সেদিন সব চাইতে আগে ধনেশ্বরের পালা।

—ধনেশ্বর কে?

—সবচেয়ে ধেড়ে কুকুরটা।

—কিছুই বুঝলাম না ভাই—হতাশভাবে রঞ্জু জবাব দিলে।

—তুই কবিতা লিখলে কী হবে, ভারী মোটামগজ তোর—কথার সুরে মৃদু তিরস্কার মিশিয়ে পরিমল বললে, ওরা টিকটিকির দল—দিনরাত শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেশের কথা যারা এতটুকু ভাবতে চেষ্টা করে, তাদের গলা টিপে ধরাই এদের পেশা। আর প্রভু-পুরস্কার পায় কিছু হাড়-মাংস, দুনিয়ার সব চাইতে কুৎসিত জানোয়ার।

এতক্ষণে কথাটা বুঝল রঞ্জন। কেমন ছমছম করে উঠল মন। তাদের পেছনেই

লাগেনি তো লোকটা ? বাজেয়াপ্ত বই পড়াশুনো করে সে—'ফাঁসির ডাক', 'শহীদ সত্যেন'। আইনের দিক থেকে এগুলো অপরাধ—পরিমলই বলে দিয়েছে, ধরা পড়লে খুব সুখের দাঁড়াবে না অবস্থাটা।

যেমন ভয় করল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি একটা প্রখর বিদ্বেষ বিষিয়ে উঠল মুখ-না-দেখা খয়েরী রঙের কোট-পরা সেই অপরিচিত সাইকেলের আরোহী সম্পর্কে। লোকটা যেন শনিগ্রহের মতো মনের দিগন্তে সঞ্চার করে দিয়ে গেল অশুভ-সংকেত।

—বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তো কত লোককে মেরেছে, ঠাণ্ডা করে দিতে পারে না এদের ?

—দেবে, দেবে।—নির্জন পথটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে নিলে পরিমল : সকলের *হিসেবই তৈরি আছে, কেউ বাদ যাবে না। ওদের বিচারের সময়ও আসবে।*

রঞ্জন আস্তে আস্তে বললে, যদি আজ কানাইলাল থাকত—

—*কানাইলাল শুধু কি একজন ?* চারিদিকে হাজার হাজার কানাইলাল তৈরিই আছে—শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা। কিন্তু—পরিমল নিজের উত্তেজনাটাকে সংযত করে নিলে : রাস্তায় এসব আলোচনা নয় রঞ্জু, মুশকিল হতে পারে।

বুকের ভেতরে লাফাতে লাগল হৃৎপিণ্ড। ভুল নেই আর, সংশয়ের অবকাশ নেই কণামাত্র। একটু একটু করে নিজের অজ্ঞাতেই পরিমল ধরা দিচ্ছে তার কাছে, আত্মপ্রকাশ করছে। এইবার শুধু আস্তে আস্তে জেনে নিতে হবে চিচিং ফাঁকের মন্ত্রটা। তাড়াতাড়ি করলে হবে না, পরিমল বলবে, আর একদিন। তা ছাড়া তরুণ সমিতি সম্বন্ধে দারোগা যা বলেছেন—

সদর রাস্তা ছেড়ে দুজনে পাড়ার মধ্যে ঢুকল। প্রায় অচেনা পাড়া, কালেভদ্রে এসেছে দু-একবার, বারোয়ারী সরস্বতী কিংবা দুর্গাঠাকুর দেখতে। পাড়ার দুটি-চারটি ছেলের চেনা মুখও চোখে পড়ল, কিন্তু আলাপ নেই তার। এমনিতেই তার নিরালা আর ভীরু স্বভাব—নিজের পাড়াতেই তার ঘনিষ্ঠতাটা সীমাবদ্ধ। তরুণ সমিতির চার-পাঁচটি ছেলেও তার ওই রকম মুখ-চেনা, তাদের দুজন রঞ্জনদেরই স্কুলে পড়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে।

কয়েকখানা বাড়ি পেরোতেই চোখে পড়ল সাইনবোর্ড। তরুণ সমিতি পাঠাগার, স্থাপিত : ১৩৩৬ সাল।

মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। ভেতরে খানকয়েক বেঞ্চি আর একটা লম্বা টেবিল দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। সেই টেবিলটার দুদিকে বসে একদল ছেলে হল্লা জমিয়েছে।

পরিমল বললে, এই আমাদের লাইব্রেরী! আয় ভেতরে।

ভেতরে ঢুকল ওরা। ভীরু চোখে রঞ্জু একবার দেখে নিলে এই নতুন পরিবেশটাকে। ঘরের দুদিকে দেওয়াল ঘেঁষে গোটা চারেক বড় বড় বইয়ের আলমারি। একদিকে এক-

খানা ছোট টেবিলের সামনে চশমা-পরা আধবুড়োএকজন ভদ্রলোক খাতায় লিখে লিখে বই দিচ্ছেন দু-তিনটি ছেলেকে। জনকয়েক সামনের লম্বা টেবিলটায় বসে খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকা পড়ছে, একজন একখানা পত্রিকা উঁচু করে ধরে জোর গলায় কী পড়ে শোনাচ্ছে আর একজনকে। পত্রিকাটার প্রচ্ছদপট রঞ্জন দেখতে পেল, তার নাম 'স্বাধীনতা'। একটি বলিষ্ঠদেহ পুরুষ—বেণুদার মতো চেহারা—দু'হাতে বাঁধা লোহার শিকল ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলছে। 'স্বাধীনতা'—আজ রঞ্জন জানে, সেদিন ওই 'স্বাধীনতা'ই ছিল 'যুগান্তর' দলের অগ্নিময় মর্মবাণী।

দেওয়ালে কতগুলো ছবি।—মানুষের ছবি। তাদের কাউকে কাউকে রঞ্জন চিনেছে, একজন ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে পরিচিত, অবিনাশবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন—*মহাত্মা গান্ধী। আর একজনকেও চিনেছে, সত্যবতী গোয়েঙ্কা, দিনকয়েক* আগে খবরের কাগজ তাঁর ছবিতে ছবিতে ছেয়ে গিয়েছিল—সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রথম কারাবরণ করেছিলেন বাংলা দেশ থেকে। তা ছাড়া দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, রবীন্দ্রনাথও আছেন। বাকি যাঁরা, তাঁদের না চিনলেও তাঁরা যে সবাই মস্ত বড় মানুষ এটা বুঝতে কষ্ট হল না।

ছবি ছাড়াও লাল-নীল কালিতে লেখা নানা রকমের পোস্টার।

—বন্দে মাতরম্—
—ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে—
—ওরে তুই ওঠ্ আজি,
আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি?
—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।
—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার—
—আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ—
—দিন আগত ওই,
ভারত তবু কই?

এম্নি সব লেখা—দেওয়াল একেবারে ছেয়ে রেখেছে। আধ ঘণ্টা ধরে ওগুলোই পড়া যায় মন দিয়ে।

—Freedom is our birthright
—Equality, Liberty and Fraternity—

Arise, awake and stop not till
the goal is reached—

প্রত্যেকটি লেখার ভেতরেই একটা নিশ্চিত দৃঢ়তা, নিষ্ঠুর সংকল্প যেন ব্যঞ্জিত হয়ে পড়ছে। ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ সমিতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছে, শুধু গল্প আর উপন্যাস পড়া, শুধু বসে বসে আড্ডা দেওয়া আর বথামি করা—এইটেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সত্যও নয়। মানুষ হতে হবে, বীর হতে হবে, দেশের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে নিজেকে। জিমন্যাষ্টিক ক্লাবে গিয়ে দেখেছিল শরীরকে ভালো করবার আয়োজন,এখানে এসে দেখল মনকেও সুস্থপ্রশস্তকরে নেওয়ারব্যবস্থা।

বড় ভাল লাগল।

ওরা ঘরে ঢুকতে কেউ কেউ ওদের দিকে তাকালে, কিন্তু কোনো কথা বললে না। শুধু দু-একজনের জিজ্ঞাসু চোখের জবাবে মৃদু হাসল পরিমল, তারপর বললে, চল্ রঞ্জু, তোকে আলাপ করিয়ে দিই আমাদের লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে।

চশমা-পরা ভদ্রলোকটি তখন ছেলেদের বিদায় করে দিয়ে খাতার পাতা উল্‌টে উল্‌টে কী দেখছিলেন গভীর মনোযোগে। পরিমল সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ না তুলেই বললেন, হুঁ, কী বই ?

পরিমল হেসে উঠল : বই নয় ক্ষিতীশদা, মানুষ।

—মানুষ—অ্যাঁ ?—ক্ষিতীশদা এবারে চোখ তুললেন, বললেন, ও পরিমল ? বেশ, বেশ। তারপর, সঙ্গে এ কাকে এনেছ ? কোনোদিন দেখিনি তো একে—বন্ধু নাকি তোমাদের ?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধু রঞ্জন চ্যাটার্জি। মেম্বার হবে।

—মেম্বার হবে ? বেশ বেশ।—ক্ষিতীশদা সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের এক পাশ থেকে একখানা রসিদ বই টেনে আনলেন : ভর্তি ফী আট আনা, আর এ মাসের চাঁদা দু আনা—এই দশ আনা লাগবে।

পরিমল এবার জোরে হেসে উঠল : আচ্ছা মানুষ তো আপনি ক্ষিতীশদা। খালি বই আর চাঁদা, চাঁদা আর বই। ওকে নিয়ে এলাম কোথায় আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি কাবলীওয়ালার মতো চাঁদা চেয়ে বসলেন।

—ওহো, তাও তো, তাও তো—

যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন ক্ষিতীশদা। বললেন, বোসো বোসো, ওই টুল দুটো টেনে নিয়ে বোসো দুজনে। বেশ বেশ।

বোঝা গেল 'বেশ বেশ' কথা দুটো ক্ষিতীশদার মুদ্রাদোষ। ওরা বসতেই তিনি কেমন শান্ত আর নিরীহ চোখে চশমার মধ্য দিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। কিছু একটা

বলতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা উত্তেজিত উগ্র কণ্ঠস্বরে থেমে গেলেন তিনি, পরম বিরক্তিভরে ভ্রূকুটি করে তাকালেন আর একদিকে।

'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাঠক সেই ছেলেটি। পড়তে পড়তে তার উৎসাহ যেন আর বাগ মানছে না। গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে শুরু করেছে :

'সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এ শিক্ষা আমরা ভুলব না। ভুলব না জাতির প্রাণশক্তির এই অকারণ অপব্যবহার। মহাত্মা গান্ধীর ভ্রান্ত নেতৃত্ব দেশকে দিনের পর দিন কাপুরুষতার পথেই ঠেলে দেবে। I have committed a Himalayan blunder বলে যিনি আজ নিজের অপরাধের বোঝা স্খালন করতে চাইছেন—'

—ওরে থাম্ থাম্, কানের পোকা তাড়িয়ে ছাড়লি যে মণ্টু।

মণ্টু থামল। বললে, খুব জোর লিখেছে কিন্তু ক্ষিতীশদা।

—জোর লিখেছে বলেই অত জোরে জোরে পড়তে হবে নাকি? একটু মনে মনে পড়্, বাপু, ঝালাপালা করে দিলি যে।

মণ্টু মনে মনে পড়ল না বটে, কিন্তু স্বর নামিয়ে নিলে। আর ক্ষিতীশদা লোকটিকে বেশ লাগল রঞ্জনের, যেমন নিরীহ তেমনি গোবেচারা। ইস্কুলের ড্রয়িং মাস্টার ড্রয়িং মাস্টার ভাব, তরুণ সমিতির এই আগ্নেয় আর উগ্র পরিবেশের ভেতরে কেমন যেন আকস্মিক আর বেমানান বলে বোধ হয় তাঁকে।

ক্ষিতীশদা পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টান টেনে নিলেন। বললেন, কী নাম বললে যেন? রঞ্জন চ্যাটার্জি, না?

—হুঁ—রঞ্জনের হয়ে পরিমল জবাব দিলে : ও ভারী বই পড়তে ভালবাসে। আপনাকে ভালো বই দেখে দিতে হবে।

—তা দেব। বেশ বেশ। অক্ষয় দত্তের বই আছে, ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ আছে—

—আঃ, আপনি একেবারে হোপ্‌লেস ক্ষিতীশদা।

ক্ষিতীশদা নস্যির আমেজে সর্দি টানার মতো একটা আরামের শব্দ করলেন নাকে।

—আমি একেবারে হোপ্‌লেস? বেশ বেশ। তা ওসব বই পছন্দ না হলে অন্য জিনিসও আছে—মেঘনাদবধ, বৃত্র-সংহার—

—উঃ, ক্ষিতীশদা থামুন। আপনি যে কেন মধুসূদনের যুগে জন্মাননি তাই ভাবি। ওসব ছাড়া একালে বুঝি আর পড়বার মতো বই নেই কিছু?

—একাল?—ক্ষিতীশদা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন : ওই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র? ওদের লেখা আমি পড়ি না, ওরা লিখতেই জানে না। যাই বলো, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পরে বাংলা দেশে সাহিত্য বলে আর কিছু লেখাই হল না।

এমন করে কথাটা বললেন ক্ষিতীশদা যে, পরিমলের সঙ্গে রঞ্জনও হেসে উঠল

এবারে। আচ্ছা মজার মানুষ তো। তরুণ সমিতির মতো কড়া লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হয়েও একেবারে সেকালে পড়ে আছেন—আশে-পাশে সমস্ত পৃথিবীটাই যে বদলে যাচ্ছে দিনের পর দিন, খেয়ালই করেননি সেটা।

—হয়েছে, থাক—সদয়ভাবে পরিমল বললে, আপনাকে আর সাহিত্য-চর্চা করতে হবে না। কিন্তু রঞ্জু তো চাঁদা আনেনি, আমার কার্ডেই ওকে দুটো বই দিন।

—তোমার কার্ডে? তা বেশ বেশ।—ক্ষিতীশদা বড় খাতাটার পাতা উল্‌টে চললেন: কোনো বই-টই ইস্যু করা নেই তো?

—না, দেখুন না—

—খাতাটা উল্‌টে-পাল্‌টে নিশ্চিন্ত হলেন ক্ষিতীশদা: বেশ বলো, কী বই নেবে? পরিমল ক্যাটালগ খুলে চোখ বুলোতে লাগল।

—এটা আছে? শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ'?

—না ইস্যুড্।

—বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী?

—ওটাও বাইরে।

—নির্বাসিতের আত্মকথা?

ক্ষিতীশদা একটা হাই তুলে বললেন, দিলীপ নিয়ে গেছে।

—ধ্যেৎ, ভালো বইগুলো সব বাইরে।—পরিমল বিরক্ত গলায় বললে, এটা—সিন্‌ফিন্?

—হুঁ, আছে।

—যাক্, মন্দের ভালো। আর এটা পাওয়া যাবে—বিমল সেনের 'মা'?

—এইমাত্র ফেরত এল। একটু দেরি হলে আর পেতে না।

বই দুটো নিয়ে পরিমল বললে, নে রঞ্জু।

—বাঃ, তুই নিবি না একখানাও?

—আমার ওসব পড়া।

ক্ষিতীশদা আবার একটা হাই তুললেন, তারপর আর এক হাতে তুড়ি বাজিয়ে বাড়িয়ে নিলেন নিজের আয়ুটাকে। অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, কী যে সব বাজে বই পড়ো—কিচ্ছু হয় না। তার চাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' নিয়ে যাও, পড়লে কাজ হবে।

—ও জ্ঞানটা আপনার জন্যেই তোলা থাকল ক্ষিতীশদা—পরিমল খোঁচা দিলে।

—আমার জন্যে? তা বেশ বেশ। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের দোষই এই—ভালো কথা কানে নিতে চায় না।

—হুঁ—দুঃখের কথাই বটে—সায় দিয়ে পরিমল বললে, চল্, রঞ্জু, এবার জিমন্যাস্টিক

ক্লাবের দিকে যাওয়া যাক।

—জিমন্যাস্টিক ক্লাবে—এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে নিলে রঞ্জন : কিন্তু আজ আর নয় ভাই। মাকে মিথ্যে কথা বলে চলে এসেছি, দেরি করে গেলে ধরা পড়ে যাব নিশ্চয়।

—তাও বটে। কিন্তু করুণাদির সঙ্গে দেখা করবি না একবার? তোকে যেতে বলেছিলেন কিন্তু।

করুণাদি! সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন আবেগে আর আগ্রহে আকুল হয়ে উঠল। মায়ের মতো সেবা করেছিলেন, স্নেহ-ঝরা নরম আঙুল আহত কপালে বুলিয়ে দিয়ে যেন সমস্ত যন্ত্রণা তার মুছে নিয়েছিলেন। কী আশ্চর্য ভাবে দুজন দেখা দিয়েছে তার কিশোর জীবনের দিকচক্রে। একজন মিতা, আর একজন করুণাদি। অতটুকু মেয়ে মিতা, বয়েসে তো তারই সমান, তবু মিতাকে কেমন ভয় করে—কেমন যেন নিজেকে অপ্রস্তুত আর বিপন্ন বলে মনে হয় ওর সামনে দাঁড়ালে। আর করুণাদি। প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে মনের, ছোড়দির মতো চেহারা, মায়ের মতো মন।

ক্ষিতীশদাকে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল ওরা। ক্ষিতীশদা বললেন, চললে, বেশ বেশ। আবার কাল এসো। আর মনে করে দশ আনা পয়সা এনো, আট আনা ভর্তি ফী আর দু আনা চাঁদা।

—উঃ, কী দুর্দান্ত লাইব্রেরীয়ান! এর চাইতে কাবলীওয়ালাও ভালো!—মন্তব্য করলে পরিমল।

ক্ষিতীশদা জবাবে একমুখ প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

পথে বেরিয়ে রঞ্জন বললে, অনেক বই আছে তো লাইব্রেরীতে।

—তা মন্দ নয়, আরো বাড়বে—অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল পরিমল।

পথ চলতে চলতে হাতের বইটা দেখছিল রঞ্জন। জিজ্ঞাসা করলে, সিন্‌ফিন্ কী ভাই?

—পড়েই দ্যাখ্ না। তোর ওই দোষ রঞ্জু. ভারী অধৈর্য।

বেণুদার বাসার দরজায় কড়া নাড়ল পরিমল।

—কে?

তীক্ষ্ণস্বরে সাড়া এল বাইরের ঘর থেকে। বেণুদার গলা।

পরিমল সবিস্ময়ে বললে, ব্যাপার কী, বেণুদা এখনো ক্লাবে যাননি?

—কে?—আবার সাড়া এল তীক্ষ্ণ গলায়।

—আমি পরিমল, আর রঞ্জু।

—ওঃ একটু দাঁড়াও।

মিনিট তিনেক চুপচাপ বাইরে দাঁড়ানোর পর দরজা খুলে গেল। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বেরুল তিন-চারজন ছেলে, ওরা এতক্ষণ কিছু আলোচনা করছিল ওখানে। ওদের

দুজনকে চিনল রঞ্জন, জিমন্যাস্টিক ক্লাবে দেখেছে। বাকি দুজন একেবারে অচেনা। নীরবে বেরিয়ে এল ওরা, কোনোদিকে তাকালো না। হনহন করে এগিয়ে চলে গেল।

বেণুদা বললেন, এসো, ভেতরে এসো।

সেদিন শোবার ঘর দেখেছিল, আজ দেখল বাইরের ঘর। ঘরে চেয়ার টেবিল নেই, চওড়া খাটে ময়লা চাদর পাতা। কিন্তু খাটটা দেখে বোঝা যায় আর যাই হোক ওর ওপরে কেউ শোয় না, কারুর শোয়াও চলে না। রাশি রাশি বই আর খবরের কাগজ। খাটের বারো-আনী বইতে ঢাকা, কতক ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। ঘরের একদিকে হেলান দেওয়া পিতলের তার দিয়ে গিঁটে গিঁটে বাঁধানো কালো কুচকুচে একখানা অতিকায় লাঠি। দেওয়ালে একটা হুকের সঙ্গে ঝকঝকে উজ্জ্বল একখানা ভোজালি ঝুলছে।

বইয়ের স্তূপ সরিয়ে বেণুদা ওদের বসতে দিলেন। কিন্তু প্রসন্নমুখ বেণুদার আজকের চেহারা দেখে দুজনেই চমকে উঠল একসঙ্গে। তাঁর চোখে একটা লালের আভা—আগ্নেয় দীপ্তির মতো কী যেন ঝকমক করে খেলে যাচ্ছে সেখানে। চাপা দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, গেঞ্জির নিচে দুলে দুলে উঠছে চওড়া বুকটা। যেন এইমাত্র খানিকটা কঠিন পরিশ্রম করেছেন তিনি—সমস্ত মুখে একটা তীব্র উত্তেজনা জলজল করছে।

—কী হয়েছে বেণুদা ?

—উঁ ?—বেণুদা তীক্ষ্ণ চোখে পরিমলের দিকে তাকালেন।

—কী হল ?

গভীর একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে বেণুদা বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মুখের চেহারা বদলে গেল পরিমলের। দরজা বন্ধ করবার জন্যে সে উঠে দাঁড়ালো, আর সেই সঙ্গে কেমন তির্যকভাবে তাকালো রঞ্জনের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল রঞ্জন। কোনো বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, সে কথার ভেতরে তার থাকা উচিত নয়। অতএব—

রঞ্জন সূক্ষ্ম অভিমান আর আহত আত্মমর্যাদা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো : আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি।

—দরকার নেই—বোসো।

মৃদু বিস্ময়ে পরিমল বললে, ও থাকবে ?

—থাকুক।

চোখের কোণা দিয়ে পরিমল ইঙ্গিত করলে রঞ্জনকে। ভাবটা বুঝতে পারা গেল। সে ভাগ্যবান, পরীক্ষার প্রথম ধাপটা সে অত্যন্ত সহজেই পার হয়ে গেছে।

করুণাদির কথা মনে মাথা চাড়া দিচ্ছিল—প্রশ্নও জেগেছিল। কিন্তু এখানে এসে স্বাভাবিক একটা সংকোচ বোধ হচ্ছে তার। তাছাড়া বেণুদার মুখের এই থমথমে ভাব,

এই কঠিন গাম্ভীর্য তাকে বিহ্বল করে ফেলেছে। ঠিক এই রকম মুখের চেহারা সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—যেদিন তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যেই যেন তাঁর কড়াইয়ের নৌকো ভাসিয়েছিলেন বানে ভাসা আত্রাইয়ের ঘোলা স্রোতে। আর সেই রাত্রি—যেদিন উঠোনে স্তূপাকার বিলিতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব করেছিলেন বাবা, আগুনের শিখাগুলো থেকে থেকে তাঁর শ্বেত পাথরে গড়া প্রাণহীন মূর্তির মতো চেহারার ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে খেলা করে গিয়েছিল।

বেণুদা বললেন, খবর শুনেছ ?

—না তো। কী হয়েছে ?—বিস্মিত আর উদ্‌গ্রীব শোনালো পরিমলের স্বর।

—শোনো, অনন্ত সিং সারেণ্ডার করেছেন।

—তাহলে কী হবে এখন ?—পরিমল জানতে চাইল।

ওরা দুজনে বেণুদার মুখের দিকে অসংলগ্ন ভাবে তাকিয়ে রইল।

বেণুদা বললেন, সেজন্য ওদের ভাবনা নেই। অনন্ত সিং ভালোই করেছেন—অনেক রিপ্রেশন থেকে বাঁচবে কতগুলো নিরীহ মানুষ। তা ছাড়া মাস্টারদা রয়েছেন এখনও—ওঁদের আগুন কেউ নেবাতে পারবে না। শুধু আমরাই কিছু করতে পারছি না—

বেণুদার কথা থেকে যেন একটা অজ্ঞাত আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকবে ঠিকরে পড়তে লাগল রঞ্জনের মনে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না, অথচ অনন্ত সিং নামটা চেনা হয়ে গেছে এর মধ্যে। ঝড় আসবার আগে যেমন আকাশের এককোণায় খানিকটা নিকষ-কালো মেঘ ঘোষণা করে গেছে তার অনিবার্য সূচনা।

হঠাৎ রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে বেণুদা বললেন, তুমি সব জানো রঞ্জন ?

—কাগজে পড়েছি।

—না, কাগজে সব খবর নেই। আরও অনেক জানবার আছে। শোনো।

বেণুদা বলতে শুরু করলেন। এ সেই আকাশগঙ্গার ইতিহাস—কল্পনার ছায়া পথের এক অপূর্ব কাহিনী। কিন্তু কোথায় লাগে এর কাছে শহীদ সত্যেন, ক্ষুদিরাম আর কানাইলাল ? 'ফাঁসির ডাকে' যে আগুন-ঝরা আহ্বান—সে আহ্বানের চাইতেও লক্ষ গুণ প্রবল হয়ে এ ডাক কানে এল যেন কামানের গর্জনের মতো। আকাশগঙ্গার ছায়াপথে জ্যোতির্ময়তা নয়—সেখানে আগুনের তরঙ্গ উঠছে। তিরিশসালের বন্যা নয়, উনিশ শো তিরিশ সালে সত্যাগ্রহের প্রাণবন্যাও নয়, এ যা এল তার নাম প্রলয়।

টর্চের আলোয় আর পিস্তলের গর্জনে মুখরিত হল অস্ত্রাগার। শাদা অফিসার রিভলভার হাতে বিপ্লবীদের বাধা দিতে এলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুসফুস ছিঁড়ে বুলেট গেল বেরিয়ে, বাধা দেবার আশা মিটে গেল তাঁর। তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে শহরের বুকের ওপর চলতে লাগল স্বাধীনতার শিকলভাঙা তাণ্ডব। টেলিগ্রাফ-টেলিফোনলাইন

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, উপড়ে গেল রেলপথ। পলাশীর পাপের পর আর সিপাহীবিদ্রোহের ভুলের পর এই আবার নতুন করে জাগল আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বীর্যবান বিপুল ভারতবর্ষ—জাগল তার প্রাণশক্তি। এক রাত্রের মধ্যে চট্টগ্রামের বুকের ওপর থেকে পরাধীনতার কালো অপমান মুছে গেল—স্বাধীন, স্বতন্ত্র। 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা'—এ মন্ত্রকে সার্থক করল চট্টলা, তার পাহাড়ের চূড়োয় উড়তে লাগল মুক্তির রক্ত-পতাকা, আর তার ছায়া কাঁপতে লাগল কলোচ্ছলা কর্ণফুলীর জলে।

প্রাণ নিল, প্রাণ দিল তারা! ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে গেল। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, মাস্টারদা। কিন্তু তারা কোথায়—কেন তারা পেছিয়ে?

তীব্র চাপা গলায় কথাগুলো বলে গেলেন বেণুদা। গমগম করতে লাগল ঘর। তরল অন্ধকারের মতো ঘন ছায়া ঘরের মধ্যে। শুধু দেওয়াল আর ছাদের সংযোগে জাফ্‌রিকাটা ছোট স্কাইলাইট থেকে একটা অস্পষ্ট আলো এসে ঝিলমিল করতে লাগল ভোজালির উজ্জ্বল ফলায়, তেল-চকচকে লাঠির পিতল-বাঁধানো গাঁটে গাঁটে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর হঠাৎ যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন বেণুদা, ফিরে এলেন তাঁর স্বাভাবিকতায়। ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে তিনি হেসে উঠলেন, কালো মুখের ভেতরে অদ্ভুত শাদা দেখালো দাঁতের সারি। একটা ম্যাজিক যেন পলকে বদলে দিয়েছে মানুষটিকে।

—ওই যাঃ—আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে। তারপর, রঞ্জন?

আচমকা একটা ধাক্কা লেগে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো শিউরে উঠল সে।

—আমায় বলছেন?

—হাঁ—হাঁ।—একটু আগে যে বেণুদা কথা কইছিলেন একটা বারুদঠাসা কামানের মতো, তিনি যেন সম্পূর্ণ অন্য লোক: মাথা কেমন তোমার? সব ঠিক হয়ে গেছে?

ঘাড় নাড়ল। *ঠিক হয়ে গেছে।*

—করুণা *তোমার খবরের জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আর খালি খালি* বকাবকি করছিল আমাকে। যাক—এবারে আমি দায় থেকে রেহাই পেলাম। করুণাকে ডেকে দেখিয়ে দিই তার ফার্স্ট এইড্‌ বেশ কাজ দিয়েছে।

বেণুদা চেঁচিয়ে ডাকলেন, করুণা, করুণা—

—আসছি—করুণাদির সাড়া পাওয়া গেল। তারপর মিনিটখানেকের মধ্যেই আঁচলে হাত মুছতে মুছতে করুণাদি ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

বেণুদা বললেন, এই নে, তোর আসামী হাজির। কিছু ভয় নেই, একেবারে ঠিক হয়ে গেছে।

—ঠিক হয়ে গেছে ? বাঃ লক্ষ্মী ছেলে।—সস্নেহে করুণাদি হাসলেন। মাথা নিচু করে রইল রঞ্জন। করুণাদির স্নেহ ভালো লাগে, কিন্তু সেই সঙ্গে অস্বস্তিও লাগে যেন। তেরো বছর বয়স হল তার—একেবারে ছেলেমানুষ সে নয়; সে নমস্কার পেয়েছে মিতার কাছ থেকে, মনের ভেতরে এসেছে বড় হয়ে উঠবার গর্ববোধ—পৃথিবীর কাছে এখন সে দাবি করতে চায় পৌরুষের স্বীকৃতি। কিন্তু করুণাদির স্নেহে সে স্বীকার কোথাও নেই। আছে ছেলেমানুষের অসহায়তা আর দুর্বলতার ওপরে একটা নিবিড় মমতা মাত্র।

করুণাদি বললেন, যা রক্ত পড়ছিল তাতে একদিনেই এমন তাজা হয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি।

কথাটা কেড়ে নিলেন বেণুদা : হতেই হবে। কার জিমন্যাস্টিক ক্লাবের মেম্বার সেটা দেখতে হবে তো। একদিন লাগালে শরীর শক্ত হয়ে যায়।

—থাক, হয়েছে। ওকে আর হাওয়া লাগাতে হবে না তোমাকে। রঞ্জন, এসো তো ভাই।

বেণুদা বললেন, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ?

—আমার জুরিসডিক্‌শনে। তোমার সংসর্গ থেকে ওকে বাঁচানো দরকার।—করুণাদি হাসলেন: কাল রাত্রে চা খায়নি, আজ গরম গরম সিঙাড়া ভাজছি, খেয়ে যাবে।

পরিমল কলরব করে বললে, বা রে, এ কি পার্শিয়ালিটি ? মাথা ফাটিয়েই ও সিঙাড়া খাওয়ার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল ? আর আমরা যে—

—দুষ্টু ছেলেদের আমি খেতে দিই না—দুষ্টুমি করে হাসলেন করুণাদি : তবে ভালো ছেলের বন্ধু হিসেবে দু-একটা পেলেও পেতে পারো।

—ভেতরে আসব ?

—উঁহু—রান্নাঘরে শুধু আমি আর রঞ্জন। এসো ভাই—

রঞ্জন অনুসরণ করল করুণাদিকে। ভুলে গেল দেরি হয়ে যাচ্ছে, মনে পড়ল না মাকে ফাঁকি দিয়ে আজ পালিয়ে এসেছে এখানে। তা ছাড়া চট্টগ্রামের যে আগুন একটু লকলক করছিল এই ঘরের মধ্যে, তার উত্তাপ যেন সমস্ত শরীরটাতে জ্বলছিল তখনো। একটু ছায়া চাই—বিশ্রাম চাই একটুখানি। সে ছায়া-বিশ্রামের আভাস স্নিগ্ধ হয়ে আছে করুণাদির চোখে।

পরিমল পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, তোকে হিংসে হচ্ছে রঞ্জু। তিন বছরে আমি যা পারিনি, তুই যে একদিনেই তা করে নিলি !

করুণাদি বললেন, তার জন্যে ভালো মানুষ হওয়া দরকার।

—আচ্ছা, আচ্ছা, মনে থাকল।

—হুঁ, মনে থাকবে বইকি।—করুণাদি হাসলেন: কিন্তু এসো ভাই রঞ্জন,

কড়াতেই ঘি পুড়ে যাচ্ছে আমার।

ভেতরের উঠোনটায় পা দিতে শেষবারের জন্যে কানে এল পরিমলের অসহায় গলায় আকৃতি : ওরে পেটুক, সব সিঙাড়াগুলোই যেন খেয়ে ফেলিস নে, দুটো-চারটে রাখিস আমাদের জন্যে—

সংঘমিত্রা আর করুণাদি। একজন সরিয়ে দেয়, একজন মায়ের মতো কাছে টেনে আনে। শিলালিপির কঠিন পাথরের ওপরে রেখায়িত হয়ে ওঠে অপ্রত্যাশিত কবিতার ছন্দ।

বারো

দেখতে দেখতে পুরো ছটা মাস হাওয়ায় ডানা মেলে দিয়ে উড়ে গেল। উড়ে গেল নতুন উড়তে শেখা বিস্ময় আর উত্তেজনার আনন্দে চঞ্চল একটা হলদে পাখির মতো।

ছ'মাসের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেছে ষাটটা বছরের অভিজ্ঞতা। তরুণ সমিতি আর তার জিমন্যাস্টিক ক্লাবের ব্যাপার দুর্বোধ্য রহস্য নয় এখন আর। সুড়ঙ্গ-পথের গোপন দরজাটি মুক্ত হয়ে গেছে দৃষ্টির সম্মুখে, আকাশগঙ্গার ছায়াপথে সেও আজ জ্যোতির্ময় মানুষগুলির সহযাত্রী।

ভোনা, কালী, খাঁদু—এদের সম্বন্ধে করুণা হয় এখন। চোখের সামনেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এরা ; কিন্তু কোন সত্যিকারের সত্তা নেই এদের, কোন স্বীকৃত মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব। তোমার আমার এই দেশ—কিন্তু এ কোন্ দেশ ? এর বুকের ওপর দিয়ে হাড়পাঁজরা গুঁড়ো করে গড়িয়ে চলছে একটা হাজারমনী রোলারের মতো ইংরেজের শাসন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর শক্তি হরণ করে নিয়ে এরা দেশজোড়া কোটি কোটি নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ড সৃষ্টি করেছে ; আর কোথায় দুটি-একটি জাগ্রত প্রাণ বেঁচে আছে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে, তাদের সন্ধানে লাগিয়েছে টিকটিকির বাহিনীকে। বোবা দেশ—পুতুলের দেশ। দিন আনে দিন খায়, পাপের বোঝার মতো জীবনের ভার হয়ে বেড়ায়। ইস্কুলের ক্লাসে পড়ানো হয় 'ইংরেজের সুশাসন', ভারত-সম্রাট আর লাট-সায়েবদের সুখ্যাতির কোলাহলে ইতিহাস পাল্লা দেয় পরস্পরের সঙ্গে। পাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে হৈ হৈ করে। অশ্লীল আলোচনা করে, শাদা দেওয়ালে লেখে কুৎসিত কথা। প্রেমপত্র তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে পাশের বাড়ির মেয়ের দিকে আর গার্লস্ স্কুলের ঘোড়ার গাড়ি দেখলে আকুল কণ্ঠে লায়লা-মজনুর গান ধরে।

এই কি দেশ ? এ কাদের দেশ ? অবিনাশবাবুর শেখানো গানের কলিটা স্মৃতির নিস্তরঙ্গতার ওপর বহুদূর থেকে দোলা-লাগা মৃদু ঢেউয়ের মতো কাঁপে : "স্বদেশ স্বদেশ

করিস কারে এদেশ তোদের নয় —"

কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার যখন ছিল তখন রাস্তায় একদিন গান গাইতে গাইতে বেরিয়েছিল, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ"। আজ তার উল্‌টোটাই মনে আসে। মনে আসে সমস্ত দেশের দিকে তাকিয়ে, ভোনা-কালী-খাঁদুর সমান উৎসাহে বিমৃশি-প্রসঙ্গ আলোচনা আর মনসাতলায় মার্বেলে ফাটানো দেখে।

—উড্‌ড্‌কিপ—

—হাত-ইস্টেট—

পাশাপাশি ছবি ভেসে থাকে : Freedom is our birthright!

—জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত—

যেতে যেতে যখন দলটার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে যায়, তখন একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ, একটা আলাদা গৌরবে সমস্ত প্রাণটা জলজল করতে থাকে রঞ্জনের। ওরা জানে না, ওদের পাশাপাশি থেকেও আজ কোন্ একটা আশ্চর্য অগ্নিশতদলে রঞ্জনের অধিষ্ঠান, কোন্ দুর্গম দুরূহ পথ দিয়ে আজ তার জয়যাত্রা, মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়, নবজীবনের তীর্থ-তোরণের অভিসারে। ওপরে আগুন-ঝরা আকাশ, সামনে রক্তের ফেনিল সমুদ্র। মনে হয় একটা নতুন, অতি প্রখর দীপ্তিতে আজ মণ্ডিত হয়ে উঠছে যেন। সে বিদ্রোহী, সে বিপ্লবী। ওদের ক্ষুদ্রতার পাশাপাশি সীমাহীন গৌরবে আকাশে তুলে ধরেছে তার জয়োদ্ধত মস্তক। তার পায়ের চাপে পাতালে টলমল করে উঠেছে বাসুকীনাগের সহস্রশির। কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' আবৃত্তি করে বলতে ইচ্ছে করে :

"মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত-জয়শ্রীর।
বল বীর,
আমি চির-উন্নত শির।"

কিন্তু এ গৌরব সহজেই অর্জিত হয়নি তার।

পড়ার টেবিলে বসে ছয় মাসের হিসাব করছিল সে—বাতাসে অ্যাল্‌জেব্রার খোলা পাতাগুলো উড়ে চলছিল। 'পথের দাবী' এল, 'সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব কাহিনী' এল, এল মৃত্যুবিজয়ী গদর দল'—এল আরো অজস্র, আরো রাশি রাশি বই। তারপর সেই বইগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লাগল পরিমল, যেন বাজিয়ে দেখতে চাইল তাকে। তারও পরে একদিন সন্ধ্যার সময় জিমন্যাস্টিক ক্লাবের ছেলেরা যখন ফিরল বাড়ির দিকে, তখন বেণুদা বললেন, একটু দাঁড়িয়ে যেয়ো রঞ্জন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভূতুড়ে জমিদারবাড়ির সেই নির্জনতায়, অন্ধকার-হয়ে-আসা চাল্‌তে গাছের তলায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন বেণুদা। মনে আছে, বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পিটছিল, শরীরের প্রতিটি কণাকেও সজাগ আর প্রখর করে রেখেছিল রঞ্জন, একটি কথাও শুনতে

ভুল না হয়, একটি শব্দও হারিয়ে না যায় এক পলকের অমনোযোগে।

—আমাদের এই যুগান্তর পার্টি। মানিকতলা বোমার মামলার ইতিহাস পড়েছ তো? সেদিনের সেই বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়ে যায়নি। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বাঘা যতীনের পার্টি। সে মরতে পারে না, আমরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, যতদিন স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ না হয় ততদিন বাঁচিয়ে রাখবই। এই পার্টির সভ্য হওয়ার গৌরব কি তুমি চাও না?

—নিশ্চয়ই চাই।

—ভয় পাবে না?

—না।

—মনে রেখো, এ শুধু বোমা-রিভলভার নিয়ে মৃত্যুর রোমান্স নয়। এর দুঃখ অনেক, দায় অনেক। চারদিকে শত্রু, বাতাসেরও কান আছে, বিশ্বাসঘাতকতা পদে পদে। পুলিসের হাতে পড়লে টর্চারের সীমা থাকবে না, বেত থেকে শুরু করে নাকের ভেতরে পাইপ বসিয়ে পাম্প করা পর্যন্ত কোনো কিছু বাদ দেবে না ওরা। সে নির্যাতন সয়ে থাকতে পারবে, দলের খবর বলে দেবে না?

—না।

—আচ্ছা, পরীক্ষা হবে। ছেলেমানুষ, ছোটেখাটো কাজই দেব এখন। আর মনে রেখো, অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করবে না, যতটুকু তোমাকে জানতে দেওয়া হবে তার বেশি কখনো জানতে চাইবে না। যে কাজ তোমাকে দেওয়া হবে তার অতিরিক্ত কোনো কিছুতে হাত দিতে চেষ্টা করবে না। আর সব চেয়ে বড় কথা হল ব্রহ্মচর্য—বিপ্লবীদের চরিত্র থাকবে খাঁটি সোনার মতো উজ্জ্বল। চরিত্রহীন আর বিশ্বাসঘাতকের একই বিচার করি আমরা, একই দণ্ড দিই—সে হল মৃত্যু।

মৃত্যু। এক টিপ নস্যি নিয়ে আঙুলের ডগা থেকে গুঁড়োগুলো উদাসীনতার সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন বেণুদা। কিন্তু যে ক্ষুরধার নেশা তখন রক্তের মধ্যে দপদপ করছে, হৃৎপিণ্ড ফুলে ফুলে উঠছে যে ক্ষ্যাপা উত্তেজনায়, তার কাছে মৃত্যু কথাটার কোনো গুরুত্বই বোধ হয়নি তো। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'—এই তো এ পথের সংকল্প-বাক্য। ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়া কিংবা পুলিসের গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত মৃত্যুশয্যাশায়ী বীর নলিনী বাগচীর মতো বলতে পারা: "Don't disturb please, let me die peacefully"—এ তো সব চেয়ে বড় প্রলোভন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুর প্রশ্ন তার কাছে অর্থহীন, চরিত্র সম্পর্কে সাবধানবাণী সম্পূর্ণই অনাবশ্যক।

আসলে ছেলেমানুষ কথাটাই আপত্তিজনক। ছেলেমানুষ বলেই কি শুধু ছোটখাটো

কাজের অধিকারী? সামসুল আলমকে মেরেছিল যে বীরেন গুপ্ত সে তার চাইতে ক'বছরের বড়ই বা? চট্টগ্রামের টেগ্‌রা তো তারই সমবয়সী। তবে হাতে একটা রিভলভার পেলে সেই বা কেন ওদের মতো একটা অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে পারবে না? একটা পাঁচঘরা রিভলভার উজাড় করে শেষ করে দিতে পারবে না টিকটিকিদের সর্দার বিপ্লবীদের চিরশত্রু সেই পেটমোটা আর হুলোমুখো ধনেশ্বর শর্মাকে? অথবা তাদের জিলাস্কুলে যখন কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে শাদা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে উপস্থিত হন, তখন সেও কি নিতে পারে না জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ? নিতে পারে না বিদ্রোহী চট্টগ্রাম আর কাঁথি লবণ-আন্দোলনে সত্যাগ্রহী মেদিনীপুরে অকথ্য নির্যাতনের প্রতিহিংসা?

কিশোর রঞ্জন, ছেলেমানুষ রঞ্জন। তার মনের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয় চট্টগ্রামের রক্তাক্ত শহীদের মূর্তি, কানে আসে তাদের মায়েদের উতরোল কান্না। ছবি চোখে আসে পাঞ্জাবের প্রকাশ্য রাজপথে কাঠের ফ্রেমে হাত-পা বেঁধে ছেলেবুড়োকে নির্বিচারে বেত মারা হচ্ছে—যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলে চোখে মুখে জল দিয়ে সচেতন করে আবার বেত মারবার পালা—ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠে আসছে শরীরের চামড়া; রাস্তা দিয়ে পুরুষ মেয়েকে জানোয়ারের মতো হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে, আপত্তি করলেই পিঠে পড়ছে কাঁটাওলা বুটের লাথি। মাঘের প্রচণ্ড শীতের রাত্রে মেদিনী-পুরের গ্রামসুদ্ধ নিরীহ নরনারীকে তাড়া করে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে পচা পুকুরের জলে, বারো বছরের ছেলেকে বস্তায় পুরে নদীর জলে চুবিয়ে চুবিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

এই শাসন—এরা শাসক। ছেলেমানুষ রঞ্জনের মনে হয়, তার সমস্ত শরীর যদি বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি হত তাহলে একটা বোমার মতো ফেটে সে চৌচির হয়ে যেত, উড়িয়ে নিয়ে যেত এদের ঝাড়সুদ্ধ। সে ছেলেমানুষ। তার হাতে যদি একটা রিভলভার থাকে তাহলে সেও প্রমাণ করে দিতে পারে যে সে আর কারোও চাইতেই কোনো অংশে ছোট নয়, হেয়ও নয়।

তার বিকারগ্রস্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বেণুদা হেসেছিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে সব।

—আমাকে আগে রিভলভার ছোঁড়া শিখিয়ে দিতে হবে বেণুদা।

—রিভলভার?—বেণুদা আবার একটিপ নস্যির গুঁড়োগুলো ছড়িয়ে দিলেন হাওয়ায়ঃ সে তো অত সহজ নয় ভাই। বিপ্লবীদল বলেই কি অমন কথায় কথায় রিভলভার যোগাড় করা যায়? অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় একটা রিভলভার সংগ্রহ করতে, ঢের রিস্ক নিতে হয়, বিস্তর তার দাম। আচ্ছা, সময় হলে দেখা যাবে সে সব, ও শিখিয়ে দিতে আধঘণ্টা সময়ও লাগবে না। এখুনি তো আর মানুষ মারতে যাচ্ছ না, অন্য কাজ শেখো তার আগে।

অন্য কাজ। হ্যাঁ, দিন তিনেক পরেই কাজ পেয়েছিল রঞ্জন। বেণুদার আদেশ পরিমলই জানিয়ে গেল এসে। আজকের কাজ পারা না পারার ওপরেই সমস্ত পরিচয় নির্ভর করছে রঞ্জনের।

বেণুদা চিঠিখানা দিয়েছেন খামে করে। এই চিঠিখানা নিয়ে রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে সাহানগরের পুরানো সাহেবী কবরখানাটায় যেতে হবে তাকে। ঠিক মাঝখানে যে শাদা কবরটার ওপরে শ্বেতপাথরের বাইবেল খোলা আছে, তারই ওপরে বসে প্রতীক্ষা করতে হবে অন্তত দু'ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে কোনো লোক যদি এসে তার কাছে চিঠি চায় তবে রঞ্জন সে চিঠি তাকে দেবে, আর নইলে বইয়ের ওপরে একটুকরো ইট চাপা দিয়ে রেখে আসবে। ইচ্ছে করলে একটা আলো নিতে পারে সঙ্গে—কিন্তু পারতপক্ষে সে আলো জ্বালাতে পারবে না।

রাত সাড়ে বারোটায় সাহানগরের কবরখানায়। সে কবরখানাকে সে দেখেছিল গোষ্ঠের মেলায় যাওয়ার পথে, এমনিতেই কী ভূতুড়ে, কী থমথমে তার চেহারা। মৃত্যু-বিলাসী বীরের বুকও ছমছম করে উঠল একবার, গেঞ্জির তলায় ঘাম ফুটে বেরুতে চাইল শরীরে।

পরিমল মুখ টিপে হাসল, কি রে, পারবি না? ভয় করছে নাকি? তাহলে বরং আমি বেণুদাকে গিয়ে বলি—

পৌরুষ দপদপ করে জ্বলে উঠল রক্তের মধ্যে: নিশ্চয় পারব।

মৃদু ব্যঙ্গভরা গলায় পরিমল বললে, থাক্ না, কাজ কী বাপু! ও কবরখানাটা ভূতের আড্ডা, বহু লোকে ওখানে ভয় পেয়েছে।

—তা পাক, আমি পাবো না।

—বলা ওরকম সোজা কিনা! আমি শুনেছি বছর তিনেক আগে একটা চৌকিদার যাচ্ছিল ওরই পাশের রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ দেখল মেটে মেটে জ্যোৎস্নায় ওই কবরখানায় দাঁড়িয়ে উঠল তালগাছের সমান উঁচু একটা সাহেবের মূর্তি! আর কি ভয়ানক, তার কাঁধের ওপরে মাথাই নেই! তারপর একটা লম্বা হাত সে বাড়িয়ে দিলে, সে হাতে একটা কালো টুপি আর সেই টুপির মধ্যে তার মুণ্ডুটা বসানো—

অনর্থক কতগুলো আবোলতাবোল গল্প বলে ভয় ধরিয়ে দিতে চাইলে পরিমল। বুকের ভেতরে একবার ছাঁৎ করে উঠলেও ভয়ের একটুকুও ফুটতে দিলে না রঞ্জন। জোর গলায় বললে, টুপিতে মাথা থাক বা না থাক তাতে আমার বয়েই গেল।

—কিন্তু তোর মাথাটা যেন থাকে—ভেবে দেখিস ভালো করে—

চলে গেল। যাওয়ার সময় নাক কুঁচ্‌কে এমন বিশ্রী করে হাসল যে অপমানে পিত্ত পর্যন্ত তেতে উঠল রঞ্জনের। যেন ওর মুখ দেখেই পরিমল বুঝে নিয়েছে এ কাজ ওকে

দিয়ে সম্ভব নয়।

না, ভূত মানবে না সে, ভয় করবে না। কিসের ভূত, কোথায় ভূত? ওসব কতগুলো আজগুবী গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃষ্টির বিভ্রম থেকেই এই সব এলোপাথাড়ি গল্প মানুষ ছড়িয়ে বেড়ায় চারদিকে। আর যদি সত্যি সত্যিই ভূত বলে কিছু থাকে, তাহলে সাহসী মানুষকে সে চিরকাল সেলাম ঠুকেই এড়িয়ে চলে। আরে, ভূতেরও তো প্রাণের ভয় বলে জিনিস আছে একটা। নিজের রসিকতা দিয়ে নিজেকেই আশ্বস্ত করতে প্রয়াস পেলো সে।

তারপর সেই রাত্রি। তার কথা ভোলবার নয় জীবনে।

বাইরের পড়ার ঘর থেকে বেরুতে রাত্রে অবশ্য অসুবিধে হল না। সে আর দাদা—দুজনে এঘরে শোয়। দিন তিনেক আগে কী একটা কাজে দাদা কলকাতায় গেছে, কাজেই পালাতে কোন বিঘ্ন নেই। আরো বাইরের ঘর—ভেতরের দরজায় খিল দিয়ে রাখলে বাড়ির কাকপক্ষীতেও টের পাবে না কাণ্ডটা।

আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরকার সাড়া-শব্দ থেমে এল, শব্দ এল ঘরে ঘরে হুড়কো পড়ার। মা একবার ডাক দিয়ে গেলেন: খাওয়ার জল লাগবে রঞ্জু?

—না মা।

ঘরে টিম টিম করে লণ্ঠন জ্বলছে, তার উত্তেজিত মনের অনিশ্চয়তার মতো। রঞ্জন তার সজাগ প্রখর দৃষ্টি মেলে রেখেছে টেবিলের ওপরকার টাইমপিস্‌টার দিকে। টিক্ টিক্ টিক্। ঘড়ি চলছে, সময় লাফিয়ে যাচ্ছে যেন ক্যাঙারুর মতো। সাড়ে এগারোটা ছাড়িয়ে ছোট্ট কাঁটাটা ঝুঁকেছে পৌনে বারোটার দিকে, বড় কাঁটাটা যেন ছিটকে ছিটকে এগিয়ে যাচ্ছে সম্মুখের দিকে।

ঘড়িটার শব্দটা মিশছে হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে—তাড়া খাওয়া ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে চলছে সময়।

—টিক্ টিক্ টিক্—টিক্ টিক্ টিক্—

বারোটা বাজতে দশ মিনিট।

বালিশের নিচে হাত দিলে রঞ্জন। চ্যাপ্টা ফ্ল্যাশ লাইটটা ঠিক আছে সেখানে, ইস্কুলের টিফিনের পয়সা জমিয়ে সখ করে কিনেছিল সেটা। আজ ব্যাটারী বদলেছে, একটা নতুন বাল্‌ব সেই সঙ্গে। এই কঠোর দুর্গম অভিযানে এইটেই তার পথের সাথী—তার নির্ভরযোগ্য একমাত্র সহচর।

—টিক্ টিক্ টিক্—

নেমে পড়ল বিছানা থেকে। ভয়ের থেকে উত্তেজনা এখন বেশি হয়ে উঠেছে, রক্তের মধ্যে মাতলামো শুরু করেছে অ্যাডভেঞ্চারের অন্ধ কামনা। সন্ধ্যের সময়েই বড়

ঘরের আল্‌না থেকে এক ফাঁকে নিজের জামাটা হাতসাফাই করে এনেছে, তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল চিঠিটা ঠিক আছে সেখানে। তারপর অতি নিঃশব্দে সে জামাটা গায়ে পরে নিলে, ফ্ল্যাশ লাইট নিলে হাতে; আরো সাবধানে লণ্ঠনটাকে একেবারে কমিয়ে দিয়ে বেড়ালের মতো মখমলমসৃণ পায়ে চলে এল বাইরে।

থমথমে অদ্ভুত রাত। একটা ডাইনি যেন অন্ধকারে চুল মেলে বসে আছে উবু হয়ে। একটু দূরেই যে কেরোসিনের আলোটা ছিল. সেটা কখন নিবে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ধুলোভরা পথ অন্ধকারে লুটিয়ে আছে মূর্ছিতের মতো। জলজলে তারায় ভরা কালো আকাশ—চাঁদ নেই। সন্ধ্যার সময় একটা ফালি উঠেছিল, কখন যেন ডুব দিয়েছে পশ্চিমের গাছগাছালির আড়ালে।

নির্জন রাস্তা, যেন নিদ্রালি মন্ত্র পড়ে দিয়েছে ডাইনিটা। নিজের জুতোর শব্দেও বুক ছাঁৎ ছাঁৎ করে উঠছে। পথের ধারে গাছগুলোর ভূতুড়ে ছায়া বাতাসে দুলছে। তার পায়ের আওয়াজে খ্যাঁচ্‌খেঁচে ঝগড়াটে আওয়াজ তুলে টেলিগ্রাফের তার থেকে প্যাঁচা উড়ে গেল একটা। পথের এদিক থেকে ওদিক ছুটে চলে গেল শেয়াল। একবার থেমে দাঁড়িয়ে যেন জিজ্ঞাসাভরা দৃষ্টিতে তাকালো রঞ্জনের দিকে, অন্ধকারে কী ভয়ঙ্কর একটা নীলচে আলোয় চোখ দুটো জ্বলছে তার, কত বড় বড় যে দেখাচ্ছে!

শহরের এদিকটা ফাঁকা ফাঁকা। এলোমেলো ছড়ানো শাদা শাদা কোঠা বাড়িগুলো, টিনের চালা—অন্ধকারের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে আছে সমস্ত, কোথাও একটা আলো জ্বলছে না পর্যন্ত। শুধু এখানে ওখানে ঝলমলে জোনাকির রাশ। তারই মাঝখান দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো হেঁটে চলল রঞ্জন; কোথা থেকে শুধু একটা কুকুর তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে যেন তাকে সতর্ক করে দিলে।

কিন্তু আজ পৃথিবীকে ভয় হচ্ছে না, প্রকৃতিকেও না। আজ ভয় মানুষকেই। কোট-পরা সাইকেলে চড়া সেই লোকটাকে। ওরাও নিশাচর, ওরাও রাত্রির আড়ালে শেয়ালের মতো শিকার খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু শেয়ালের চোখের চাইতে ওদের দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ, ওদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আরো স্পর্শসজাগ। পাথর-চাপা দেশের বুকের আড়ালে কোথাও একটুখানি আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠেছে, কোথায় একটি প্রাণের ভেতর জেগেছে প্রতিবাদ, দিনরাত তাই তাদের একমাত্র সন্ধান। সেই আগুনকে নিবিয়ে দেবে, সেই প্রাণটিকে রোধ করে দেবে ফাঁসির দড়িতে। তার বিনিময়ে পাবে কিছু কালো রঙের টাকা, আর রক্তমাখানো কয়েক টুকরো রুটি। যীশুহন্তা জুডাসের স্বর্ণমুদ্রা।

খোয়া-ওঠা পথ শেষ হয়ে গেছে—দৃষ্টির আড়ালে সরে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির শেষ ল্যাম্প-পোস্টটাও। এবার শুধু ধুলো-ভরা রাস্তা, দুপাশে ঘন জঙ্গলের মতো বাগান। বাতাসে কট্‌ কট্‌ শর্‌ শর্‌ করে একটা অস্বস্তি-জাগানো শব্দ উঠছে বাঁশবনে। রাত্রির

অন্ধকারে বাঁশবনগুলোকে কেমন খারাপ লাগে। ছেলেবেলায় শোনা গল্প মনে পড়ে। রাস্তার ওপর লম্বা হয়ে এলিয়ে আছে মস্ত একটা বাঁশ, অসতর্ক পথিক যেই সেটা ডিঙোবার উদ্যোগ করে, অমনি ভূতুড়ে বাঁশটা তীব্র বেগে উঠে পড়ে ওপর দিকে, মানুষটাকে ধনুক থেকে ছুটে বেরুনো একটা তীরের মতো ছুঁড়ে দেয় আকাশে, তারপর—

দুত্তোর—ভয় পাচ্ছে নাকি সে? বিপ্লবী রঞ্জন—'ঝড় বাদলে আঁধার রাতে' একলা চলার পথিক রঞ্জন। পরিমলের সেই উদ্ভট গল্পগুলোর রেশ কি এখনো ছড়িয়ে আছে মনের মধ্যে? জোরে, আরো জোরে হাঁটো। 'Cowards die many a times'—

শোঁ—শোঁ—শোঁ—

শরীর-কাঁপানো কনকনে বাতাস এল একটা। কোনো মড়ার শীতল দেশ থেকে ফুসফুসভরা মৃত্যুহিম বাতাস এনে যেন তীব্র নিশ্বাসে ছড়িয়ে দিলে ডাইনিটা। পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়ে একটা বিস্তীর্ণ বালির ডাঙায় নেমে পড়েছে। তারার আলোয় ঝিকঝিক করছে বালি, চিকমিক করছে অভ্রের কুঁচি। ঘন বঁইচির বনে জোনাকির রোশনাই। জলের একটা জলন্ত সর্পিলতা উঠছে ঝিলিক দিয়ে। কাঞ্চন।

কাঞ্চন! এর জলে কালী বাস করেন। নরবলির তৃষ্ণা এখনো মেটেনি তাঁর। কাঁপা একটা লোহার চোঙ গুম গুম করে বসে যাচ্ছে জলের অতল গভীরতায়—শেষবারের মতো ভেসে এল কতগুলো মানুষের বিশৃঙ্খল আর্তি। গায়ের হাড়গুলোতে হঠাৎ ঝমর ঝমর করে ঝাঁকানি বাজল রঞ্জনের।

না—এ তো দুর্বলতা। 'আমরা করব না ভয়, করব না—' জিমন্যাস্টিক ক্লাবের ছেলেদের মার্চিং সং মনে পড়ল। আরও জোর পায়ে হাঁটতে হবে। বিপ্লবীকে ভয় পেলে চলবে না।

এত অন্ধকার, তবু আশ্চর্যভাবে স্বচ্ছ হয়ে গেছে চোখের দৃষ্টি। বেশ চেনা যায় পথ, অনেকটা অবধি চোখ চলে। দূরে পাহাড়ের মতো কী যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, জমা হয়ে আছে যেন পুঞ্জিত খানিকটা অমাবস্যা। বুঝতে বাকি রইল না। সাহানগর কবরখানার উঁচু প্রাচীর।

আর একবার কলরব জেগে উঠল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। আর একবার শুরু হয়ে গেল রক্তের চঞ্চলতা। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে ওঠে ওখানে। পরিমলের সেই বিশ্রী গল্পটা। ছেলেবেলায় তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলেন অবিনাশবাবু—

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রঞ্জন। অবিনাশবাবু। কিন্তু আজ তো সেই মানুষটিকে চিনেছে সে। আজ তো বুঝেছে তাঁর কথার অর্থ। সেদিন তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা তো এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। না—ভয় নেই। আজ যদি তার পথের সঙ্গী কেউ থাকে তবে অবিনাশবাবুই আছেন।

আরো জোর পা—আরো জোরে চলো। ভয়ের শেষ সীমাটা পৌঁছেছে বলেই আর ভয় নেই তার। এগিয়ে চলল রঞ্জন।

যেন ঘুমন্তের মতোই চলেছিল এতক্ষণ। চলেছিল একটা নেশার মধ্যে। যখন থামল তখন একেবারে সেই ভয়ঙ্কর কবরখানার ভাঙা গেটটার সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছে।

চারদিকে নানা আকারের ভাঙা সমাধি। কতদিনের কত মৃত্যু এখানে নিস্তব্ধ হয়ে আছে কে জানে। কাদের নিশ্বাস যেন গায়ে লাগে। প্রতিটি কবরের মধ্য থেকে যেন এখনি উঠে আসবে কারা।

ওখানে ওগুলো কী জ্বলছে? জোনাকি না কতগুলো চোখ?

—'আমরা করব না ভয়, করব না—'

জপ করতে লাগল রঞ্জন। কিন্তু শ্বেতপাথরের সে কবরটা কোথায়? আর কোথায় সেটা—যেখানে পিটার হপ্‌কিন্স্‌ যীশুর শান্তিময় ক্রোড় লাভ করেছিলেন? এই ভয়ঙ্কর রাত্রে সেখানে কি আশ্রয় পেতে পারে না সেও?

হাতের ফ্ল্যাশ-লাইটটা জ্বালাতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল। মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল চকিতের মধ্যে।

একটা শাদা কবরের ওপর থেকে শাদা একটা মূর্তি আস্তে আস্তে উঠে আসছে। হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। আর—আর—তার হাত দুটো সামনের দিকে—রঞ্জুর দিকেই প্রসারিত।

কী বলে চিৎকার করে উঠেছিল, কী ভাবে টলে পড়ে যাচ্ছিল সে, মনেও পড়ে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কে তাকে পেছন থেকে বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয় দিলে।

—ভূত?

না, বেণুদা।

পাঁচ সাত মিনিট পরে যখন প্রকৃতিস্থ হল সে, তখন লজ্জায় আর অপমানে সে যেন মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। বিপ্লবী রঞ্জনের চোখ দিয়েও জল নেমে এসেছে।

—বেণুদা, আমি কাপুরুষ।

বেণুদা হাসলেন, তাই নাকি?

—আমি ভীরু, ভয় পেয়েছিলাম। আমাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিন।

অন্ধকারকে উচ্চকিত করে দিয়ে বেণুদা হেসে উঠলেন: দূর পাগলা।

—আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে বেণুদা।

বেণুদা সস্নেহে রঞ্জনের ঘাড়ে হাত রাখলেন: ভয় পাওয়াটা লজ্জার নয় ভাই, মানুষমাত্রেই ভয় পায়। যে বলে আমি কখনো ভয় পাইনি, সে মিথ্যেবাদী।

—কিন্তু—

ততক্ষণে ফিরে চলেছে দুজনে। বেণুদা বললেন, তোমার ভয় আছে কিনা এ আমি পরীক্ষা করতে চাইনি, কতটা সাহস আছে তাই পরখ করতে চেয়েছিলাম। পরীক্ষায় উতরে গেছ তুমি। লজ্জার কিছু নেই, তোমার মতো বয়েসে এতটা পথ আমিই এভাবে আসতাম না।

কথাটার ভেতরে সান্ত্বনা আছে, আশ্বাসও। তবুও কোথায় খোঁচা লাগে যেন। সে ছেলেমানুষ, আর তারই একটা নির্দিষ্ট সীমা মেনে নিয়ে বেণুদা বিচার করেন তাকে। তাই তার এতটুকু ভয়ের জন্যে তিনি ক্ষমা করতে পেরেছেন রঞ্জনকে। কিন্তু তিনি নিজে যে এভাবে একা চলে এসেছেন, কই, তাঁর তো ভয় করেনি। ছেলেমানুষি করে কেটে যাবে তার, কবে সে পাবে টেগ্‌রার মতো বীরের মর্যাদা? কবে সে টেগার্টের মতো শত্রুর ওপরে গুলি ছুঁড়ে অমর মৃত্যুর গৌরব লাভ করতে পারবে?

অনেকটা পা নিঃশব্দে এগিয়ে এল দুজনে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: বেণুদা?

—অ্যাঁ?

—চট্টগ্রামের মতো কি আমরাও পারি না?

—পারি বইকি।—বেণুদা সস্নেহে বললেন, কিন্তু তার জন্যে তো তৈরি হওয়া চাই। অকারণে কতগুলো প্রাণ দিয়ে তো কোনো লাভ নেই ভাই। দেশের জন্যে মরতে পারা নিশ্চয় গৌরব, কিন্তু মরাটাই তো আমাদের আসল লক্ষ্য নয়। ভালো করে আমরা বাঁচতে চাই বলেই তো বেছে নিয়েছি এই রক্তের পথ।

আবার চুপ করে গেল রঞ্জন। বেণুদাকে ঠিক ধরতে পারে না, মাঝে মাঝে কেমন উল্‌টোপাল্‌টা মনে হয় তাঁর কথাগুলো।

হঠাৎ বেণুদা বললেন, গান জানো রঞ্জু?

—গান!—আশ্চর্য লাগল রঞ্জনের। ঠিক এমনি একটা অবস্থায় গান জানা না জানার প্রশ্নটা যেন অশোভন আর খাপছাড়া বলে মনে হল তার।

বেণুদা আবার বললেন, হাঁ গান। রাত্রির অন্ধকারে এমনি পথ চলার সময় গানের চেয়ে বড় পাথেয় আর কী আছে? একেবারেই গাইতে পারো না তুমি?

তেমনি বিহ্বল বিস্মিতভাবে রঞ্জন বললে, না।

—আচ্ছা, তবে আমিই গাই। আমার গলা ভাল নয়, তাই বলে সমালোচনা কোরো না কিন্তু।

চাপা কণ্ঠে বেণুদা গান ধরলেন:

সকল কলুষতামসহর
জয় হোক তব জয়,

অমৃতবারি সিঞ্চন কর
নিখিল ভুবনময়—

এবার তার বিস্ময় আর সীমা মানল না। অন্ধকার পথ। কাঞ্চন নদীর দিক থেকে শোঁ শোঁ করে আসছে বাতাসের ঝলক। পথের দুধারে গাছের ঘন ছায়ায় রাত্রি আছে সঞ্চিত হয়ে। নিষিদ্ধ পথচারণার একটা রোমাঞ্চ-জাগানো অপূর্ব উন্মাদনা দুলে দুলে ফিরছে রক্তের মধ্যে—এমন সময় এ কি গান, এ কেমন গান?

আবেগ-আকুল কণ্ঠে বেণুদা গেয়ে চললেন :

করুণাময় মাগি শরণ
দুর্গতিভয় করহ হরণ
দাও দুঃখ বন্ধ-তরণ
মুক্তির পরিচয়—

একটা আশ্চর্য গভীরতা এই গানে, একটা নিবিড় আর গভীর মাদকতা। যেন অভিভূত হয়ে এল রঞ্জনের চেতনা। অন্ধকারে বেণুদাকে ভালো করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না তাঁর কালো পাথরে গড়া পেশল দীর্ঘ শরীরকে, সংকল্পে আগ্নেয় চোখের দৃষ্টিকেও। এ কি সেই মানুষ, যিনি তরুণ সমিতির বাছা বাছা ছেলে-গুলোকে গড়ে তুলেছেন অসঙ্কোচে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে, দুর্গম সংকটে-ভরা রক্তাক্ত পথে এগিয়ে চলবার জন্যে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল অবিনাশবাবুকে। এমনি বিভোর হয়ে গান গাইতেন—ঝাপ্‌সা ছবির মতো মনে আসে এমনি করে গভীর আর নিবিড় হয়ে আসত তাঁর গলা। তাঁর মুখেই তো শুনেছিল, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে'। সে গানের সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল আছে এই গানের। শুধু এইটুকুই নয়, আরো মিল আছে। সেই অবিনাশবাবুই যখন স্বেচ্ছায় মরণের দিকে এগিয়ে গেলেন তখন কোনো ভয়, কোনো সংকট তো তাঁকে ফেরাতে পারেনি।

যেন চমকে গেল রঞ্জন। কার পাশে পাশে, কার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে? অবিনাশ-বাবুর পুনর্জন্ম হয়েছে কি বেণুদার মধ্যে, স্বরাজের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন তিনি?

—কী ভাবছ?

ঘোরটা কেটে গেল। লজ্জিতভাবে জবাব দিলে, কিছু না।

—গানটা ভালো লাগল না তো?

—চমৎকার।

বেণুদার কী যেন হয়েছে আজ। অত গভীর, অমন কঠিন মানুষটার মধ্যে এসেছে একটা ছেলেমানুষি খুশির জোয়ার। বললেন, তুমি কম্প্লিমেণ্ট দিলেই কি আমি বিশ্বাস

করব ? নিজের ভীমসেনী গলা নিজেই চিনি আমি।

—না, সত্যিই চমৎকার।

—যাক, অন্তত একজন গুণগ্রাহী পাওয়া গেল - বেণুদা তরল গলায় বললেন : বাড়িতে তো গান গাইবার উপায় নেই। আমি শুরু করলেই করুণা তেড়ে আসে। তবু সুযোগ পেয়ে তোমাকে একটা শুনিয়ে দেওয়া গেল।

—করুণাদি বুঝি ভালো গাইতে পারেন ?—রঞ্জন উৎসাহী হয়ে উঠল।

—আমার চাইতে ভালো নিশ্চয়ই। ও আমার শত্রু হলেও সেটা অস্বীকার করা যায় না—বেণুদা হাসলেন, হাসিতে যোগ দিলে রঞ্জন।

—মিউ মিউ—

রাস্তার পাশ থেকে ভীরু কান্নার মতো আওয়াজ ভেসে এল একটা। বেণুদা থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

—মিউ মিউ –

রঞ্জন বললে, ও কিছু না, বেড়ালছানা।

বেণুদা বললেন, দাও তো তোমার টর্চটা।

টর্চ জ্বালতেই চোখে পড়ল পথের ধারে শুকনো একটি কাঁচা ড্রেনের মাঝখানে ছাই-রঙের একটি বেড়ালের বাচ্ছা। একেবারেই শিশু, এখনো মায়ের দুধ ছেড়েছে কিনা বলা শক্ত। টর্চের আলোয় কেমন অভিভূত হয়ে গেছে. তাকিয়ে আছে কেমন করুণ অসহায় দৃষ্টিতে। ক্ষীণভাবে আবার কান্নাভরা গলায় যেন বললে, মিউ। চারিদিকের এই অন্ধকার, এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে বুঝেছে নিজের নিরুপায় অবস্থা. খিদেয় আকুল হয়ে হয়তো বা নিষ্ফল কান্নায় খুঁজে ফিরছে নিজের হারানো মাকেই। যে মার বুকের ভেতর ওর আশ্রয় আছে, আশ্বাসও আছে।

বেণুদা ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালেন বাচ্চাটার দিকে। পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বেণুদা ধরে তাকে একেবারে নিজের বুকের কাছে তুলে আনলেন।

—আহা, একেবারে কচি বাচ্ছা! শেয়ালে কেন যে এতক্ষণ খায়নি তাই আশ্চর্য!

রঞ্জন বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করল, আপনি কী করবেন ওটা দিয়ে ?

—বাড়িতে নিয়ে যাব।—যে গলা সে কখনো শোনেনি, সেই গলা : অন্তত বাঁচাবার চেষ্টা করব। কিন্তু এখন আর নয় ভাই। শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছি, এক রাস্তা দিয়ে দুজনে পাড়ায় ঢোকাটা ঠিক হবে না। আমি এই বাগানটা দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সোজা চলে যাও।

পরক্ষণেই সে দেখল—বাগানের কালো ছায়ার মধ্যে আরো কালো একটা ছায়ার মতোই বেণুদা মিলিয়ে গেলেন।

কিন্তু—

ছ মাস পরে আজ টেবিলে বসে রঞ্জন ভাবছে—পাথরে গড়া বোধ হয় বেণুদার মন। স্নেহ নেই, প্রীতি নেই, দুর্বলতাও নেই এক বিন্দু। চোখের দিকে একবার তাকালেই আর বলে দিতে হয় না যে সামান্য অপরাধেও এঁর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। বেণুদাকে সম্পূর্ণ করে জানবার আগে যে প্রীতি জেগেছিল তাঁর সম্পর্কে, জেগেছিল কিছুটা মোহ. এখন সেগুলো সব কেটে গিয়ে যেন বৈশাখী সূর্যের খানিকটা ধারালো আলো এসে পড়েছে চোখে। এখন ভয় করে বেণুদাকে। মনে হয় একটা অদ্ভুত আর অসহ্য অস্থিরতা জেগেছে তাঁর মধ্যে। দুর্নিবার খানিকটা শক্তির উচ্ছ্বাস আর বাগ মানতে চাইছে না তাঁর বুকের ভেতরে, যেন অন্ধ আবেগে ঘুষি মারতে চাইছে একটা পাথরের দেওয়ালে। হয় সেটাকে ভাঙবে, নইলে এই আপ্রাণ প্রয়াসে রক্তাক্ত করে দেবে নিজের হাতের মুঠোটাকেই। চট্টগ্রামের রক্ত ডাক পাঠাচ্ছে, উনিশ শো তিরিশ সালের অহিংস সত্যাগ্রহ পরাজয়ের একটা কুৎসিত অপচ্ছায়া—এই ছায়াটাকে দূর না করা পর্যন্ত শান্তি নেই, বিশ্রামও নেই।

গোষ্ঠের মেলায় একখানা সাবান চুরির অপরাধ একদিন সমস্ত বোধকে রেখেছিল বিষাক্ত করে। অথচ আজ—এই তো মাত্র সাতদিন আগেকার কথা। মনে পড়লে এখনো বুক ধ্বক করে ওঠে। দৈবাৎ রক্ষা পাওয়া গেছে, আর একটু হলেই কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।

বিকেলবেলা কাজীপাড়ার পথ দিয়ে আসবার সময় বিধুবাবু ডাকলেন। বললেন—কি রে, পথ দিয়ে যাস অথচ বাড়িতে একবার পা দিতে নেই তোদের ?

কেমন দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হন বিধুবাবু। তিরিশ বছর ধরে মোক্তারী করছেন এই শহরে, পশারও যে করেছেন তার প্রমাণ মেলে পরিপুষ্ট ভুঁড়ি আর তৈলাক্ত গোলালো মুখে। নতুন কোঠাবাড়ি একখানা তুলেছেন সম্প্রতি—বেশ সুখেই আছেন। কিন্তু পারিবারিক যোগাযোগটা ওঁদের সঙ্গে ক্ষীণ—বাবা মনের দিক থেকে বিধুবাবুকে পছন্দ করেন না।

রঞ্জনও না। কেমন হ্যা হ্যা করে হাসেন বিধুবাবু, কেমন বিশ্রী করে চেঁচিয়ে কথা বলেন। সাহেব আর আদালত ছাড়া কোনো আলোচনা করতে চান না, করতে পারেনও না। তা ছাড়া মোটা নাকের ভেতর দিয়ে সব সময়ে নস্যির লালচে লালচে রস গড়ায়, সেদিকে তাকালে কেমন গা বমি-বমি করতে থাকে তার।

তবু বিধুবাবু ডাকলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও রঞ্জনকে তাঁর বাড়িতে পা দিতে হল।

বিধুবাবু বললেন, আসতে হয়, খবরটাও নিতে হয়। পথ দিয়ে প্রায়ই তো যাস দেখি। আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি সেটাও তো জানা দরকার।

অভিমানভরে কথাটা বলে কোঁচার খুঁটে নস্যির রস মুছে ফেললেন বিধুবাবু, গা ঘিন-

ঘিন করে উঠল রঞ্জনের।

—আয় আয়, ভেতরে আয়—

ভেতরে ঢুকতেই কানে এল ভয়ঙ্কর একটা শব্দ—যেন আছাড় দিয়ে দিয়ে কাঁসার বাসন ভাঙছে কেউ। কিন্তু না—বাসন ভাঙছে না। চিৎকার করছেন বিধুবাবুর স্ত্রী—ওর মাসিমা।

বিধুবাবুর স্ফীতি দেখে যদি তাঁর পশার অনুমান করা চলে, তবে তাঁর স্ত্রীর চেহারা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের বহরটারই ইঙ্গিত করে বোধ হয়। ভদ্রমহিলা মুটিয়েছেন একটা গজ-হস্তীর মতো, দরজা দিয়ে অনেক কষ্ট করে বোধ হয় ঘরে ঢুকতে হয় তাঁকে। গলার আওয়াজে হৃৎকম্প হয়।

সম্প্রতি আছেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে। তাঁর নতুন কোঠাবাড়ির দেওয়াল থেকে খানিকটা চুন বালি খসে পড়েছে, কী করে ভেঙে ফেলেছে চাকর। মাসিমা হিন্দী করে বলছেন, তোমরা তনখা কাট্‌কে চুন ঔর বালিকা দাম হামি আদায় করেঙ্গা—

গলার স্বর নামল রঞ্জনকে দেখে। খাটো কাপড়ের আঁচলটা টেনে মাথায় একটা ঘোমটা দেবার বৃথা চেষ্টা করলেন, তারপর সস্নেহে বললেন, এতদিন পরে বুঝি মাসিমাকে মনে পড়ল? আয় আয়—বোস্—

'বোস্' তো বটে, কিন্তু বসবার জায়গা কই? খাটখানার প্রায় সবটা জুড়েই যে তিনি বসে আছেন। ইতস্তত করে পাশে একটুখানি জায়গা করে নিলে রঞ্জন।

বাইরে মক্কেল বসে ছিল, রঞ্জনকে ঘর-জোড়া স্ত্রীর কাছে জিম্মা করে দিয়ে বিধুবাবু তাদের শিকার করতে গেছেন। সুতরাং আপাতত চাকরকে রেহাই দিয়ে মাসিমা রঞ্জনের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

—বাড়ির সবাই কেমন?

রঞ্জন সংক্ষেপে জবাব দিলে, ভালো।

—সরোজের শরীর কেমন আজকাল?

—মা? ভালোই আছেন।

মাসিমা গজর গজর করতে লাগলেন: একদিন তো আসতেও পারে বেড়াতে। আমি না হয় গতর নিয়ে নড়তেই পারি না, তাই বলে কি আত্মীয়-কুটুমকে অমন করে ভুলে থাকে। বলিস সরোজকে, একদিন যেন আসে।

—আচ্ছা বলব।

—আর তা ছাড়া—মাসিমা আবার আরম্ভ করলেন এবং ফিরে এলেন নিজের স্বধর্মে: এই তো নতুন বাড়ি করলাম। করকরে পাঁচটি হাজার টাকা বেরিয়ে গেল—বুকের রক্ত জল করা টাকা। অথচ একটু কি দয়া মায়া আছে হতচ্ছাড়া চাকরবাকর-

গুলোর ? এর মধ্যেই সিমেন্টের চটা উঠিয়েছে, চূন-বালি খসিয়েছে, পানের পিক ফেলেছে পাঁচিলে ; দেওয়ালে লাগিয়েছে মাথার তেলের দাগ। আমার কি আর মরণ আছে, সব সময় চোখে রাখতে হয়।

—হুঁ।

মাসিমা বললেন, ওই—আবার ওই পোড়ারমুখো কয়লা ভাঙতে গিয়ে দিলে বুঝি উঠোনটা শেষ করে। তুই একটু বোস্ বাবা, আসছি আমি। সুস্থির হয়ে কথাবার্তা বলব তোর সঙ্গে।

এরাও বড়লোক বটে। তবু কোথায় একটা কুশ্রী কাঙালীপনা আছে এদের, টাকা যেন আরো প্রকট করে তুলেছে সেটাকে। এই জন্যেই কি বাবা এদের দেখতে পারেন না?

কিন্তু চিন্তাটা হঠাৎ চমকে গেল। শুধু দুটো চোখই নয়, সমস্ত মনটাও যেন আকুল লুব্ধতায় গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল ঘরের কোণে বড আলমারির নিচেকার খোলা বড় টানাটার ওপরে।

টানার মধ্যে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে একটা দোনলা বন্দুক—পালিশ করা নলটা ঝকঝক করছে তার। খোলা বন্দুকটার চারপাশে ছড়ানো আছে 'ইলি' আর 'ম্যাণ্টনের' একরাশ কার্তুজ।

রক্তাক্ত উত্তেজিত মুখে চারদিকে তাকালো রঞ্জন। ঘরে কেউ নেই। দূরে উঠোনে রঞ্জনের দিকে পিঠ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে মাসিমা—হাত নেড়ে বাসন-ফাটানো গলায় বক্তৃতা দিচ্ছেন চাকরকে। বাইরের ঘর থেকে চ্যাঁচানো গলাও ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে বিধুবাবুর : দেওয়ানী মামলায় একটা ছেড়ে অমন দশটা তারিখ নিতেই হয়। আরে, সাক্ষীসাবুদকে তৈরি করতে হলেও—

মনের সামনে ভয়ঙ্কর একখানা মুখ দেখা দিল যেন বায়স্কোপের ছবির মতো। চোখে আগুন, চাপা ঠোঁটে বিপ্লবী চট্টগ্রামের রক্তাক্ত প্রতিশ্রুতি।

—অস্ত্র চাই আমাদের, প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র চাই। বন্দুক, রিভলভার, কার্ট্রিজ। প্রত্যেকটি বিপ্লবীর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে না পারলে দুটো একটা চোরা-গোপ্তা খুন করে লাভ নেই কোনো। সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে যদি আমরা চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে পারি তা হলে দু ঘণ্টায় ইংরেজ পালাতে পথ পাবে না। দরকার শুধু অস্ত্র, যেমন করে হোক সে অস্ত্র আমাদের যোগাড় করতেই হবে।

হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। নিজের রক্ত ফুটেছে, তার শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে সে। অতি সন্তর্পণে দেরাজের দিকে এগিয়ে গেল সে, দু-হাতে মুঠো করে দশ-বারোটা টোটা তুলে নিয়ে জামার দু পকেটে ফেলল। তারপর তেমনি নিঃশব্দে নিজের জায়গায় এসে বসল। মাথার ভেতর রক্ত গরম হয়ে উঠেছে, অথচ মনে হচ্ছে একটা আশ্চর্য ঠাণ্ডায়

হাত পা যেন এলিয়ে আসছে তার।

মাসিমা ফিরে এলেন। এখুনি হয়তো দেরাজের দিকে নজর পড়বে তাঁর, এখুনি হয়তো বলে বসবেন টোটাগুলো কেমন কম কম বলে বোধ হচ্ছে না? তারপর তার পকেটের দিকে তাকিয়ে যদি—

এর পরে মাসিমা কী বলেছিলেন এবং কী জবাব দিয়েছিল, ভালো করে সে কথা মনেও নেই তার। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কাটা ঠেলে ঠেলে উঠছে, যেন একটা শক্ত থাবার মতো তার গলাটাকে টিপে টিপে ধরবার চেষ্টা করছে—কথা কইতেও কষ্ট বোধ হচ্ছে তার।

হঠাৎ এক সময় সে নিতান্তই আচমকা উঠে দাঁড়ালো: আচ্ছা, আজ যাই—

—একটু চা খেয়ে যাবি না? জল চাপাতে বললাম যে।

—চা তো আমি খাই না।

—ওঃ, খাস্ না?—মাসিমা যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন এক পেয়ালা চায়ের বাজে খরচের হাত থেকে বেঁচে গেলেন তিনি, চুন বালির নতুন আস্তর বসানোর খানিকটা খরচ উঠে আসবে এর থেকে। বললেন, তা বেশ, ছেলেবেলায় ও সব বদ্অভ্যেস না থাকাটাই ভালো।

—আমি চলি তা হলে—

—আচ্ছা আয় তবে। সরোজকে আসতে বলিস—

—বলব—

দুর্বল পায়ে বেরিয়ে এল রঞ্জন। শরীরটা কেমন ঝিম ঝিম করছে উত্তেজনায়, প্রথম সন্ধ্যায় সবে জ্বলে ওঠা মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের আলোটাকে কেমন ঝাপসা লাগছে, যেন ওর ওপরে জমেছে বৃষ্টির গুঁড়ো। জামার নিচের পকেট দুটোকে অতিরিক্ত ভারী মনে হচ্ছে, কার্তুজগুলোর পেতলের ক্যাপে ঘষা লেগে কেমন একটা অস্পষ্ট ক্লিচ্ ক্লিচ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে, খর্ খর্ করে অল্প অল্প আওয়াজ দিয়ে উঠল ভেতরকার ছররাগুলো। সভয়ে দুটো পকেটকে চেপে ধরে এবার জোরে চলতে আরম্ভ করল রঞ্জন। বিধুবাবু মক্কেল নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে আছেন, ওকে দেখতে পেলেন না। দেখা দেবার মতো অবস্থাও নয় তার—দীর্ঘজীবী হোক বিধুবাবুর দেওয়ানী মামলার মক্কেলরা।

পথের দুধারে ঘর বাড়ি মানুষগুলো যেন ছায়াবাজীর মতো নাচছে, গাছপালার ছোঁ' লাগা আকাশটা দুলছে নাগরদোলায়। কারো চোখের দিকে চোখ তুলতে পারছে না মনে হচ্ছে সকলে যেন তীক্ষ্ণতীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই পকেট দুটোর দিকে। হঠাৎ যেন শরীরের ওজনটা অতিরিক্ত হালকা হয়ে গেছে তার, পা দুখানা তার নিজের ইচ্ছেয় চলছে না—হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে কাগজের টুকরোর মতো। অতিরিক্ত উত্তেজনায় সমস্ত মস্তিষ্কটাই তার ফাঁকা হয়ে গেছে, তাই শরীর থেকে লোপ পেয়েছে মাধ্যাকর্ষণবোধ।

সাইকেল চড়া সেই লোকটা। এতদিনে নামটাও জানা হয়ে গেছে তার, আই-বি কনস্টেবল ইয়াদ আলী। ভাগাড়ের সন্ধানে উড়ন্ত শকুনের মতো চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ এসে যদি পথরোধ করে দাঁড়ায়, যদি বলে দাঁড়াও, তোমার পকেট দুটো একবার সার্চ করে দেখব?

দিশেহারার মতো রঞ্জন চলতে লাগল। ধাক্কা লেগে গেল একজন পথচারীর সঙ্গে, সে ধমক দিয়ে উঠল: অমন করে হাঁটছ কেন খোকা, একটু চোখ চেয়ে চলতে পারো না।

গোষ্ঠের মেলায় চুরির অংশ নিয়েছিল, আজ সে নিজেই চুরি করেছে। চুরি করেছে রঞ্জন—একটা মিথ্যা কথা বলতেও যার বুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। আশ্চর্য বদলে গেছে জীবনবোধ, বদলে গেছে জীবনের দৃষ্টি। আজ জেনেছে বৃহত্তর, মহত্তর সত্যের জন্যে এ সমস্ত ছোট কাজ করায় কোনো অপরাধ নেই। এ তার দায়িত্ব, এ তার কর্তব্যের অঙ্গ। হত্যার চেয়ে বড় পাপ নেই, কিন্তু 'পথের দাবী'র সব্যসাচী তো সেই হত্যারই রুদ্রবন্দনা গেয়েছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়েই স্বাধীনতার পুষ্পাঞ্জলি। হাজার হাজার মানুষের শবদেহ বিছিয়ে সেই রক্তধারার ওপরেই গড়ে ওঠে সেতু। তাই নিজের জন্যে যা অপরাধ, দেশের জন্যে তাই পরম পুণ্য। একদিন চুরি করে নিজেকে কলঙ্কিত বোধ করেছিল, আজ গৌরবান্বিত মনে হচ্ছে, আজ মনে হচ্ছে মহাসাগরে তুফান তুলতে একটুখানি ঢেউয়ের দোলা সেও জাগিয়ে দিতে পারে হয়তো।

—এমন হন্ হন্ করে কোথায় চললি গঙ্গাফড়িং?

পাথরের মতো পা থেমে গেল রঞ্জনের। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিরও একটা নিঃশ্বাস পড়ল। ভোনা। গলায় একটা রুমাল বেঁধেছে গুণ্ডার মতো করে, একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

—কোন্ লঙ্কা জয় করতে যাচ্ছ বৎস?

সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ালো ভোনা। পাকামি-ভরা মুখটা বুড়ো মানুষের মুখের মতো দেখাচ্ছে এখন, যেন একেবারে ভবেন মজুমদার। আশ্চর্য, আট ন মাস আগে এই ভোনাই বেরিয়েছিল নন্-কো-অপারেশন আর বিদেশী বয়কট করতে, এই ভোনাই সিগারেটের স্তূপে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শুধু ভোনাই নয়, আবার তো লোকের মুখে মুখে তেমনি করে সিগারেট জ্বলছে, মদের দোকানে তেমনি তো চলেছে লোকের আনাগোনা। তা হলে? বেণুদার কথাই ঠিক। সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিজেকে ফাঁকি, দেশকেও ফাঁকি। বেনোজলের মতো তো এসেই মিলিয়ে যায়, চিহ্নও রাখে না। বানের ঘোলা জল নয়, রক্ত-সমুদ্রের দোলা চাই এবারে।

কিন্তু নিচের দুটো পকেটভরা তার টোটা। আর সাইকেলে চড়ে ইয়াদ আলী সারা সহরটা চষে বেড়াচ্ছে। রঞ্জন আরো জোরে এগিয়ে চলল।

—বেণুদা, বেণুদা ?

বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছুল তখন হাঁপাচ্ছে সে। সদর দরজা খুলে হাসিমুখে করুণাদি এসে হাজির : এমন ব্যতিব্যস্ত হলে যে ? ব্যাপার কী ?

—খুব জরুরি দরকার।

—কী দরকার ?

সত্যি কথাটা বলা যাবে না, কিন্তু মায়ের মতো দৃষ্টি যাঁর চোখে সেই করুণাদির কাছে মিথ্যেও বলা চলে না। উত্তর দিল না, দাঁড়িয়ে রইল মাথা নিচু করে।

করুণাদি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী দরকার ?

—বেণুদাকে বলব।

—ওঃ—করুণাদি কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। বললেন, ভেতরে এসো ভাই।

ভেতরে ঢুকতে করুণাদি দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। তারপর একখানা হাত রাখলেন ওর কাঁধের ওপর। আস্তে আস্তে বললেন, তোমাকে ছোট ভাইয়ের মতো বলেই জানি। একটা সত্যি কথা বলবে ?

সন্দেহে বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, কপালে ঘাম ফুটে বেরুল বিন্দু বিন্দু করে।

—বলুন।

—তুমি কি শেষ পর্যন্ত ওই দলে গিয়ে ভিড়েছ ?

রঞ্জন নির্বাক।

—ও পথে যেয়ো না, ও ছেড়ে দাও।

বেণুদার বোনের মুখে কথাটা শোনাল নতুন রকম। বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে ধরল রঞ্জন। এ কার কাছে কী শুনছে সে।

—হ্যাঁ ভাই, ছেড়ে দাও।—সন্ধ্যার অন্ধকারে, একটু দূরের লণ্ঠনের ক্ষীণ আবছায়া আলোতেও দেখতে পেলো করুণাদির চোখ অশ্রুতে চক চক করছে : কেন এ সর্বনাশা খেলায় নেমে পড়েছ ? এ যজ্ঞে কি সবাইকে বলি দিতে হবে—কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না ?

ভয়ঙ্কর চমকে উঠল সে। কী একটা বলতে গিয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। তার কপালের ওপর করুণাদির এক ফোঁটা চোখের জল এসে পড়েছে। একবিন্দু তরল আগুন যেন।

সীমাহীন বিস্ময় আর বেদনায় সারা বুকটা যেন মোচড় খেয়ে গেল : আপনি কাঁদছেন করুণাদি ?

—হাঁ, কাঁদছি—করুণাদি আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন : কেন যে কাঁদছি আজ তুমি

তা বুঝতে পারবে না। এই আগুনে কত ফুলের মতো ছেলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যাদের বাঁচা উচিত ছিল, তারাই মরেছে সব চেয়ে আগে। কী লাভ হল এতে?

বিস্ময় ব্যাকুল হয়ে রঞ্জন বললে, করুণাদি, আমি তো—

—না, কিছু বুঝতে পারবে না। তুমি বুঝতে পারবে না আজ কেন আমার স্বামী থেকেও নেই, কেন আমি দিনরাত এমন করে তুষের জ্বালায় জ্বলছি। শুধু তোমাকে একটা কথা বলব ভাই। তুমি কবি—তুমি গুণী। তুমি বাঁচবার চেষ্টা করো, মরার লোভকে জয় করতে চেষ্টা করো। ঢের বেশি কাজ হবে তাতে। এ তোমার পথ নয় ভাই, এ রক্তের পথে তুমি যেয়ো না।

আরে—এ কী হল! করুণাদি হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে গেলেন। ওর সামনেই উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে শুরু করে দিলেন তিনি, কান্নার বেগে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল।

আর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জন। কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু বিধুবাবুর ড্রয়ার থেকে চুরি করা যে কার্তুজগুলোকে এতক্ষণ নিজের বিজয়ের প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যেন একটা অর্থহীন ব্যর্থতায় তারা সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, আকীর্ণ হয়ে গেছে কলঙ্কিত শূন্যতায়।

তেরো

সময় উড়ে চলেছে, পাখা মেলে দেওয়া সোনালী রঙের সময়। না—সোনালী নয়, আগ্নেয় রঙের সময়। বাংলা দেশের প্রতি প্রান্তে প্রান্তে অগ্নিগিরির আত্মবিদারণের সূচনা। ডাকাতি, ষড়যন্ত্র আর অস্ত্র আবিষ্কার, শ্বেতাঙ্গ অফিসারের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তে রাঙা হয়ে যাচ্ছে মেদিনীপুরের খেলার মাঠের সবুজ ঘাস, রক্তে কলঙ্কিত হয়ে গেছে অহমিকার দুর্গ রাইটার্স বিলডিঙের ঝকঝকে মেঝে পর্যন্ত। হাওয়ায় ভেসে গেছে তিন বছর সময়। এর মধ্যে ম্যাট্রিক পাস করেছে সে, পাসের পর শহরে গিয়ে ভর্তি হয়েছে কলেজে, তারপর গরমের ছুটিতে ফিরেছে মুকুন্দপুরে।

অন্তরীণবন্দী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় চোখ তুলে তাকায় সামনের দিকে। পদ্মার ঘোলা জল কালো হয়ে এল। দূরের সমস্ত উঁচু মাঠটার চূড়ো যেন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। গাং-শালিকেরা প্রবল কলরবে ঘরে ফিরে আসছে। দূর থেকে কার গানের সুর শোনা যায়, বোধ হয় ডাক্তার বাবুর মেয়ে সীতা।

অল্প অল্প বাতাস। সে বাতাসে যেন মনের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলোও উড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। কোলের ওপরে খোলা বইটার অক্ষরগুলো একটু একটু করে অস্পষ্ট হয়ে এল।...

—টক্ টক্ টক্—

দরজায় তিনটে টোকা দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। একেই বাড়িটা আমবাগানের নির্জনতার মধ্যে, বেশ রাত হয়েছে তার ওপরে। এত অন্ধকার যে নিজেকেই ভালো করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

—টক্ টক্ টক্—

আবার টোকা দিলে। সামনের কালো দরজাটা কোনো শব্দ না করে যেন বাতাসে খুলে গেল।

—কে ?

—আমি রঞ্জন।

—ওঃ, ভেতরে আসুন।

নারীকণ্ঠ। কিন্তু যে বলছে—অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না তাকে। নিঃশব্দে আবার পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, একটা টর্চের আলো হঠাৎ জ্বলে উঠে উঠোনের ওদিকটাতে একটা ঘর পর্যন্ত পথের মতো প্রসারিত হয়ে গেল। অদৃশ্য মেয়েটি আবার বললে, ওই ঘরে চলে যান।

যন্ত্র-চালিতের মতো ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল রঞ্জন। দরজা ভেজানো, ফাঁক দিয়ে মিটমিটে লণ্ঠনের আলো আসছে। কবাটে আবার গোটাকতক টোকা দিতেই বেণুদার চাপা গম্ভীর গলা কানে এল : কাম্ ইন্।

ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা। যারা বসে আছে, লণ্ঠনের আলোয় ভালো করে তাদের দেখা যায় না, কিন্তু তার ভেতরেও নির্ভুল আর নিঃসন্দেহভাবে চিনে নেওয়া যায় বেণুদাকে।

বেণুদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন : কে ?

—আমি রঞ্জন।

—বেশ, বোসো।

স্তব্ধ কঠিন গলা। স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের আভাস তাঁর স্বরে কোথাও নেই। অল্প অল্প আলোয় সমস্ত ঘরটায় একটা রহস্যঘনতার আমেজ। এখানে, এইমুহূর্তে যারা বসে আছে, তারা পথে ঘাটে দেখা চেনা মানুষ নয় আর। পাতালের পথে, ছেলেবেলার কল্পনার সেই মাটির তলাকার বোমার কারখানার এরা মানুষ—ক্ষুদিরামের কামানের উত্তরাধিকারী। এরা নিহিলিস্ট্—এরা মিচেল কলিন্‌সের সহকর্মী, সিনফিনের কর্মী, সান্-ইয়াৎ-সেনের ইয়ং-চায়না আর বকুসার বিপ্লবীদের এরা প্রতিভূ। মুস্তাফা কামাল এদেরই অনুপ্রেরণা।

অন্ধকারের মধ্যে এক কোণায় বসে পড়ল সে। বেণুদা চাপা গলায় শুরু করলেন : টাকা আমাদের চাই। আমাদের যার যা ছিল সাধ্যমতো সবাই তা দিয়েছি।

অথচ পরশু কলকাতায় জাহাজ আসবে, মালও আসবে। অন্তত আরো হাজার দেড়েক টাকা যোগাড় না করলেই নয়। পরিমল ?

ঘরের এক কোণ থেকে পরিমলের ছায়ামূর্তি জবাব দিলে, আমি যেমন করে হোক শ দুই জোগাড় করব।

—থ্যাঙ্ক ইউ। বেণুদা হাসলেন : পার্টি তো তোমাকে বরাবরই দোহন করে আসছে, তোমার ওপরে আর বেশি চাপ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আর কেউ—

ঘরের সকলে মাথা নিচু করে রইল।

বেণুদা বললেন, সকলের অবস্থাই আমি জানি। সোনার বোতাম থেকে ঘটিবাটি পর্যন্ত বিক্রি করেও টাকা দিয়েছে অনেকে। কী যে করা যায়—। চারদিকে যে রকম ধরপাকড় আর গণ্ডগোল, কোনো ডাকাতির রিস্কও চট করে নিতে পারছি না এখন। কিন্তু এ অবস্থায়—

—আমি সামান্য কিছু দিতে চাই—

ঘরের সকলের দৃষ্টি ফিরে গেল একসঙ্গে—রঞ্জনেরও। এ সেই অদৃশ্য মেয়েটির গলা। লণ্ঠনের আবছায়া আলোয় চোখ এতক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এবার সে তাকে দেখতে পেলো।

লম্বা চেহারার রোগা মেয়ে। কালো পাড়ের একখানা শাদা শাড়ি তার পরনে। এগিয়ে এল নিঃশব্দ একটা ছায়ার মতো। কেমন যেন মনে হল, অন্ধকারের মধ্য থেকে যেমন হঠাৎ সে বেরিয়ে এসেছে তেমনি আকস্মিকভাবেই আবার কোথায় মিলিয়ে যেতে পারে।

—সুতপা ?—স্নিগ্ধ বিস্মিত গলায় বেণুদা বললেন, কী দেবে তুমি ?

হাত থেকে ছোট একটা আংটি খুলে সুতপা বেণুদার পায়ের কাছে এগিয়ে দিলে : এইটে।

—এই আংটি ?—বেণুদার স্বরে ব্যথা ফুটে বেরুল : এইটে তুমি দিতে চাও ?

সুতপা ঘাড় নাড়ল—কথা বললে না।

—কিন্তু—বেণুদা বিব্রত স্বরে বললেন, এ তো নিতে পারব না।

মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল সুতপা : কেন ?

তেমনি বিব্রতভাবে বেণুদা বললেন, এ তো তোমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। আমি জানি এর সত্যিকারের দাম কত। এ বরং নাই নিলাম সুতপা।

সুতপার চাপা গলা অন্ধকারে যেন শিস দিয়ে উঠল চাবুকের আওয়াজের মতো।

—তাহলে কি মনে করব পার্টিকে এটুকু দেবার অধিকারও আমার নেই ? মনে করব, আমি পার্টির করুণার পাত্র ?

ঘরের প্রত্যেকটি মানুষ নিঃশব্দ হয়ে বসে রইল, এমন কি বেণুদাও। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার সেই ধারালো গলা শোনা গেল: হয়তো দাম এর বেশি নয়, আর সেই জন্যেই—

এবার বেণুদা জবাব দিলেন। শান্ত, বিষণ্ণ আর গভীর তাঁর কণ্ঠ। বললেন, না, এর এত বেশি দাম যে এর ঋণ পার্টি কোনোদিন শোধ করতে পারবে না। হার দিয়েছ, চুড়ি খুলে দিয়েছ, জানি, নিজের বলতে শুধু এইটুকুই তোমার ছিলো। তবু আমি এ নিলাম সুতপা। আমরা আজ এর দাম দিতে পারবনা, কিন্তু দেশ হয়তো দেবে একদিন।

অনুমান ভুল হয়নি রঞ্জনের। চক্ষের পলক না ফেলতেই দেখল ছায়ামূর্তি তেমনি নিঃশব্দ অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। যেন একটা কালো খাপের ভেতর থেকে ক্ষণিকের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেই আবার আত্মগোপন করেছে একখানা তীক্ষ্ণধার তলোয়ার। কিন্তু তলোয়ার যে, কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

—নাঃ, একটা অ্যাটেম্প্‌ট্ নিতেই হয় তা হলে—বেণুদার স্বর। কিন্তু রঞ্জু ভাবছিল অন্য কথা। মিতা, করুণা, আর সুতপা। একজন রূপকথা, একজন মায়ের চোখ, আর একজন আগুনের একটা অপ্রত্যাশিত ঝলক। কাউকেই ধরা যায় না, অথচ তিন-জনকে কেন্দ্র করেই কল্পনা খেয়াল খুশিতে তার জাল বুনে চলে, হারিয়ে যায় অসীম আর অর্থহীন কৌতূহলের গভীরে। আর মিতা—কী অদ্ভুতভাবে ছোট হয়ে যায় এদের কাছে—হয়ে যায় কী মূল্যহীন। তবু—তবু, মিতা কেন সুতপা হয় না?

কিন্তু কৌতূহলজনক কিছু একটা অপেক্ষা করছিল হালদারের জন্যও।

সেই হালদার। ফণীর মাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর ব্যাপারে সেই অত্যুৎসাহী লোকটি: শহরে সোনাচাঁদির ব্যবসা, বেশ কিছু টাকাকড়ি জমিয়েছে বলে গুণ্ডার দল ভাড়া করে আনে কথায় কথায়। আর 'তরুণ সমিতি'র ওপরে হাড়ে হাড়ে চটে আছে, শাসিয়ে দিয়েছে বাগে পেলে এদের সে দেখে নেবে।

কিন্তু তার আগে তার নিজেরই যে দিন এগিয়ে আসছিল সে কথা জানত না হালদার।

শীতের রাত নেমেছে। উত্তর বাংলার শীত—হাড় জমানো ঠাণ্ডায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের ঝাপটার মতো উত্তুরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে শোঁ শোঁ করে। যেন ঘা দিয়ে যাচ্ছে কোনো প্রেত-ঈগলের মৃত্যু-হিমাক্ত ডানা—রোমকূপগুলো তার স্পর্শে কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে, শরীরের যে জায়গাগুলো খালি তারা যেন অসাড় হয়ে খসে পড়তে চায়, ঠোঁট মুখ ফেটে রক্ত পড়তে থাকে।

একটি লোক নেই রাস্তায়। শুধু খোয়া-ওঠা পথে খর্ খর্ খট্ খট্ আওয়াজ তুলে ঘোড়ার গাড়ি একটা চলে গেল ওদিকের চৌমাথা দিয়ে। কোথায় কেঁউ কেঁউ করে

কেঁদে উঠছে একটা শীতার্ত কুকুর। যেন অদেহী কতগুলো ছায়ামূর্তি চলা-ফেরা করছে, চারদিকে তাদের তুষারস্পর্শ সঞ্চার করে। মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো যথানিয়মে নিবে যাচ্ছে একটার পর একটা।

আর নেমেছে কুয়াশা। সন্ধ্যার কয়লার ধোঁয়া আর রাত্রির হিম একসঙ্গে মিশে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে চারপাশে। ঝাপসা ধোঁয়াটে আবরণ চোখের দৃষ্টিতে দেয় জ্বালা ধরিয়ে। ফর্সিটায় শেষ টান দিয়ে মস্ত একটা আরামের হাই তুলল হালদার, একবার অন্যমনস্কভাবে তাকালো পথের দিকে।

এত রাত্রে আর খদ্দের আসবে না।

—ওরে জগা, ক্যাশটা দে দেখি।

ক্যাশবাক্স এগিয়ে দিলে জগা। প্রলুব্ধভাবে নোটগুলো গুণতে গুণতে হালদার একবার তাকালেন নিজের আয়রন সেফগুলোর দিকে। বললেন, দরজাটাও বন্ধ করে দে—

দরজা আর বন্ধ করতে হল না অবশ্য। সেদিকে দু পা এগিয়েই জগা সঙ্গে সঙ্গে তিন পা পেছিয়ে এল। তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে আতঙ্কে।

হালদার ধমক দিলেন: কি রে ভুত দেখলি নাকি?

জগাকে কিছু বলতে হল না, নিজেও দেখলেন হালদার। হাত দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁর, টাকাপয়সাগুলো হরির লুটের মতো ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে গড়িয়ে গেল মেঝেতে।

দরজা দিয়ে খদ্দের ঢুকছে জনচারেক। মুখে তাদের কালো কাপড়ের মুখোশ-পরা। দুজনের হাতে দুখানা বড় বড় বারো ইঞ্চি ছোরা; বাকি দুজন দুটি ছোট ছোট কালো নল সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নল দুটি দেখতে ছোট হলেও ওদের চেনে বইকি হালদার। ওই নল লণ্ডনের রাজদরবারের ওপরেও বেলশাজ্যার্স ফিস্টের অদৃশ্য হস্তলেখার মতো ছড়িয়েছে অশুভ অপচ্ছায়া।

জগা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে কাউণ্টারের তলায় ঢুকেছে, ভয় পেয়ে লেজগুটানো কুকুর যেমন করে পালিয়ে আসে সেই রকম। হালদারের মুখের চেহারা অবর্ণনীয়, তার দাঁতে আওয়াজ উঠছে খট্ খট্ শব্দে। মুহূর্তের মধ্যে যেন তুষার-মেরুর শীতলতা সঞ্চিত হয়েছে ঘরটায়।

—একটা কথা বললেই গুলি করব।—চাপা তীক্ষ্ণস্বরে একজন বললে, দেখি ক্যাশবাক্স—

নিরুত্তরে ক্যাশবাক্স এগিয়ে দিলে হালদার।

—সিন্দুকের চাবি।

একটা বুকফাটা কান্না বেরিয়ে আসবার উপক্রম করেছিল হালদারের, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন লাফিয়ে একটা কালো নল এগিয়ে এল তার কপালের দিকে। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল হালদার।

মাত্র মিনিট তিনেক সময়। দু হাতে মুখ ঢেকে রইল হালদার, এই শীতের দিনেও কপাল বেয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরে পড়ছে তার। কাউন্টারের তলায় কুকুরের ছানার মতো অব্যক্ত একটা কুঁ্যই কুঁ্যই শব্দ করছে জগা—অজ্ঞান হয়ে গেছে খুব সম্ভব।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় একজন আর একবার মুখ ফেরালো হালদারের দিকে। বললে, দরজার বাইরেই পাহারা দিচ্ছি আমরা। কোনো সাড়াশব্দ করেছ কিংবা বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছ—কি সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেব।

হালদার জবাব দিলে না। জগার মত সেও জ্ঞান হারিয়েছে বোধ হয়।

দরজার শিকলটা টেনে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চারজন। কোনোখানে কারো সাড়াশব্দ নেই, শুধু শীতার্ত কুকুরটার একটা কান্না উঠছে অবিশ্রাম। আর পথের ওপর কনকনে শীতে শাদা কুয়াশা নিরবচ্ছিন্ন কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে, ঝাপ্‌টা মারছে মৃত ঈগলের প্রেত-ডানা, খোয়া-ওঠা পথের ওপর টপ টপ করে ঝরে যাচ্ছে বরফ-গলা শিশিরবিন্দু।

ঘরের মধ্যে বিস্ফারিত চোখে হালদার ওই কালোকালোনলেরছায়াদেখতেলাগল।

আজ রাত্রে আর ঘুম আসবে না।

লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে রঞ্জন। লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখা হয়েছে, অন্ধকার ঘরে ওইটুকুই শুধু একটুখানি আলোকবৃত্ত। কিন্তু তার চোখের সামনে যেন আলোর কণা—ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। তারপর ধুলোর মতো আরো সূক্ষ্ম হয়ে রেণু রেণু হয়ে পাক খাচ্ছে জ্যোতির ঘূর্ণির মতো। পা দুটো এখনো বড় বেশি ঠাণ্ডা—পেরিয়ে এসেছে মেরু-মৃত্তিকার তুহিনতা, পায়ের পাতা শরীরের একটু ওপরদিকে ছোঁয়ালেই ঠাণ্ডায় শিউরে উঠছে চামড়া।

ঘুম আসবে না। মাথার মধ্যে বিপর্যয় কাণ্ড চলেছে—ছিঁড়ে পড়তে চাইছে রগগুলো। একটা কালো শীতল সাপের মতো কী যেন চেতনায় শিউরে শিউরে উঠছে। আজ তার প্রথম হাতে-খড়ি। রক্ত-ঝরা দুর্গম পথে এই প্রথম অভিসার শুরু হল।

ডাকাতি।

সে ডাকাতি করেছে। হালদারের দোকানে হানা দিয়ে টাকায় গয়নায় হাজার তিনেক টাকার মতো সংগ্রহ করা হয়েছে আজ। এ ছাড়া উপায় ছিল না। জরুরি তাগিদ, জরুরি প্রয়োজন। কলকাতায় জাহাজ এসে পৌঁছেছে, আর অপেক্ষা করলে কতকগুলো ভালো ভালো জিনিস যেত হাতছাড়া হয়ে।

ডাকাতি করেছে সে। ভালো মানুষ রঞ্জন, লাজুক রঞ্জন। ছেলেবেলায় হাড়গিলা পাখির ডাক শুনে যে ভয় পেয়েছিল—সেই মানুষ। তাকে হাতছানি দিয়েছিল ডাহুক-ডাকা কালীসন্ধ্যায় অশরীরী অবিনাশবাবু, নির্জন কাঞ্চন নদীর ধারে একা একা আসতে তার আতঙ্কের সীমা ছিল না। এমন কি এই সেদিন, মাত্র দু বছর আগেও সে নির্ভয়ে গোমেজ সাহেবের কুঠি-বাড়ির ববরখানায় আসতে সাহস পায়নি, সে আজ ডাকাতি করল।

কী জীবন ছিল। চোখ ভরা ছিল মালঞ্চমালা-পাশাবতীর স্বপ্ন; খিড়কির বাগানের ঠাণ্ডা ছায়ায় চাইগাদার পাশে বসে একা একা ভাবতে ভালো লাগত, ভালো লাগত বুক ভরে বাতাবী-ফুলের গন্ধভরা বাতাস টেনে নিতে; রেললাইনের চলন্ত গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কল্পনা-বিহ্বল মন কোথা থেকে কোথায় যে ভেসে যেত তার, ভূগোলের পাতায় পড়া কোন্ তুষার-মেরুর আশ্চর্য বিস্তারে, কোন্ আফ্রিকার নীল জঙ্গলে, পাহাড়ের বুকের মধ্যে গর্জে গর্জে ওঠা কোন্ দূর ফেনিল কলর্যাডো নদীর ধারে ধারে। তারপর সংঘমিত্রা। না—মিতা। হেনার কুঞ্জে সাজানো সেই বাগানটা—সেখানে একটা চিতি হরিণ, আর হরিণের মতো যার চোখের দৃষ্টি—

অথচ কী হল। সেইখানেই সে পেল মৃত্যুর দীক্ষা। পেল 'পথের দাবী'র পথ। আজ সেদিনের নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, আজ সেদিনের মনটাকে ইচ্ছে যায় করুণা করতে। বিপ্লবী, নির্ভীক। রবীন্দ্রনাথের সেই পংক্তিগুলো মনে পড়ে:

"চাবো না সম্মুখে মোরা, মানিব না বন্ধন-ক্রন্দন
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল-উন্মত্ততা
উৎকণ্ঠ ভরি—"

হাঁ, তাই। মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততাই আজ কণ্ঠভরে পান করে নিতে হবে। মদ সে খায়নি কিন্তু এর চাইতেও তীব্র কি তার নেশা, তার জ্বালা কি এর চাইতেও উদগ্র? সেদিনের সেই কিশোর স্বপ্ন-বিভোর রঞ্জু চিরদিনের জন্য তলিয়ে যাক, হারিয়ে যাক। মরণের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী রঞ্জন রচনা করে যাক তার আত্ম-কাহিনী: "মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন ইতিহাস—"

কিন্তু ডাকাতি?

বাইরে কিসের শব্দ? কেউ হাঁটছে না?

চকিত হয়ে সে বিছানায় উঠে বসল—বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস আরম্ভ হয়ে গেছে।

ওই পায়ের শব্দটা যেন হৃৎপিণ্ড থেকে উঠে আসছে, উঠে আসছে তার শ্বাসনালী চেপে ধরতে, তার নিশ্বাস রুদ্ধ করতে। রক্ত-মাখানো কয়েক টুকরো রুটি আর কয়েকটা কালো টাকার লোভ চারদিকে জাল ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে টিকটিকির সর্দার সেই ধনেশ্বরটা। আর ছাই রঙের কোট পরা ইয়াদ আলী, বর্ণচোরা আরো অজস্র—দেশের হৃৎপিণ্ডে যেখানে এতটুকুও প্রাণ ধুক ধুক করছে, উড়ন্ত শকুনের মতো চক্র দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারি ওপরে ছোঁ দিয়ে পড়বার জন্যে। তাদেরই কেউ বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো।

—টপ টপ—

না। টিনের চালের ওপর থেকে বরফ-গলা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচের মরা ঘাসের ওপর। কিন্তু তবু ওদের বিশ্বাস নেই। শহরে এর মধ্যেই পাঁচ-সাতটা বন্দুক চুরি হয়ে গেছে, দুটো ডাকাতিও হয়েছে গ্রামের দিকে। এখন যেন হন্যে কুকুরের মতো ঘুরছে ধনেশ্বর। কোনোটাব কিছু কিনারা করতে পারেনি, তাই অনবরত সার্চ চলেছে শহরে, দুবার সার্চ করেছে বেণুদার বাড়িতেই। আর আছে সংশোধিত ফৌজদারী আইন, শহরের অনুশীলন দলটাকে প্রায় বেড়েন দিয়ে জেলে নিয়ে ঢুকিয়েছে। শুধু ওদের এখানেই এখনো নাক গলায়নি, সবসুদ্ধ একসঙ্গে নিয়ে জাল টানবার মতলব আছে কিনা কে জানে। অন্তত বেণুদার যে আর খুব বেশি বাকি নেই একথা নিজেই তো তিনি বলছিলেন সেদিন।

ধ্যাৎ—কী বাজে ভাবনা এসব। ভয় পাচ্ছে নাকি রঞ্জন? ভয় পাচ্ছে জেলে যেতে? আজকে যে ডাকাতি করেছে, ধরা পড়লে তার শাস্তিটা কল্পনা করে কি আতঙ্কে বুকের মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে আসছে তার? না—কোনো ভয় নেই, কোন আশঙ্কাই নেই তার। জেলকে ভয় করবে না, কেঁপে উঠবে না সি-আই-ডির হাজার অত্যাচারের আতঙ্ককর সম্ভাবনায়। দূর কালাপানির ওপারে বিভীষিকাভরা আন্দামান। প্রাগৈতিহাসিক লস্ট ওয়ার্লডের মতো অমানুষিক বিভীষিকায় ভরা। অথচ আজ তাই নতুন একটা রামধনুকের দ্বীপের মতো তাকে মায়াময় আহ্বান পাঠাচ্ছে। যেদিন ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে সে হাসিমুখে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে বিপ্লবী কানাইলালের মতো, অন্যান্য শহীদদের মতো তারও স্থান হবে কোনো জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিলোকে, সেদিনের চেয়ে কোন্ বড় গৌরব আছে আর?

কোনো বন্ধন আছে কি? কোনো মোহ? বিপ্লবীর পিছুটান থাকতে নেই। কতবার সে তো নিজের খেয়ালে আবৃত্তি করেছে—"ঝড়ের গর্জন মাঝে, বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে।" কবিতার খাতায় ছন্দে ছন্দে রূপ দিয়েছে তার সেই অনুপ্রেরণাকে: বন্ধন নয়, ক্রন্দন নয়, মুক্তির স্পন্দন—

তবুও—

তবুও কে? মিত্রা?

হঠাৎ রঞ্জু চঞ্চল হয়ে উঠল। এই তিন বছরে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে এসেছে মিতার সংস্রবে, মেশবার সুযোগও পেয়েছে। জেনেছে পরিমলের বোনও পিছিয়ে নেই, সেও ওদেরই একজন। সেও সূর্যমুখী—তারও তপস্যা আগ্নেয় তপস্যা। তবু—

মিতা বড় হয়েছে, উঠেছে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে। ছেলেমানুষ রঞ্জু আজকে হয়েছে তরুণ, সেদিনকার ছোট মেয়েটি আজকের তরুণী। তার শান্ত চোখে ধার এসেছে এখন। চলায় যেন ঢেউ লাগে আজকাল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে, একটা পদ ভুলে যাওয়া গান যেন মনের ভেতবে রচনা করে সুরের কুয়াশা।

আস্তে আস্তে একটা ঘোর এসে মনকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। এখানে নয়—এখানে নয়। এ পৃথিবীতে মিতা কেউ নয় ওর। এ সাজানো আলমারি থেকে মিতাকে বের করে আনতে হবে রক্তঝরা জীবনেব মাটিতে। ভাবতে ইচ্ছে করে জালালাবাদ পাহাড়ে কিংবা ময়ূবভঞ্জের জঙ্গলে বুড়ীবালাম নদীর একটা পরিবেশ; সমস্ত শরীর জ্বলছে যেন মশালের মতো, টগবগিয়ে ফুটছে রক্ত। কারণ, ওদিকে টিলা আব জঙ্গলের আড়ালে এগিয়ে আসছে পুলিস বাহিনী।

—আর্মস্ কম্‌রেড্‌স—

কম্‌রেড্‌স্। মাত্র দুজন। ও আর মিতা। পাশাপাশি দুজনে দাঁড়িয়েছে। একবার শুধু পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা, তারপরই ওদের রিভলভার গর্জন করে উঠল। প্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ লড়াই। হঠাৎ একটা গুলি এসে বুকে লাগল—হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে গেল—মৃত্যুর তপ্ত পরোয়ানা। পরম শান্তিতে চোখ বুজবার আগে শেষবারের মতো দেখল নীল আকাশ আর মিতার চোখ একাকার হয়ে যাচ্ছে—

ধ্যাৎ—কোনো মানে হয় না। কী যে হয়েছে, কিছুতেই ওই মেয়েটাকে মন থেকে বিসর্জন দিতে পারে না, একটা নেশা যেন ঝিমঝিম ঝিমঝিম করে রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। না—কোনো সঙ্গী নেই বিপ্লবীর। একলা পথেরই সে যাত্রী: "এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা—"

কিন্তু ডাকাতি।

হালদারের মুখটা মনে পড়ছে। কী অদ্ভুত বিবর্ণ আর বিকৃত। যদি ধরা পড়ে? কাল সকালে যদি পুলিস আসে?

উঠে বসল রঞ্জন। ভয় পাচ্ছে—দুর্বল হয়ে পড়েছে নিঃসন্দেহ। না—এ চলবে না। বিধুবাবুর বাড়ি থেকে যেদিন টোটা চুরি করেছিল, সেদিন কি এর চাইতেও বেশি বুক কেঁপেছিল তাব? ধরা পড়ুক—দ্বীপান্তর হোক, ফাঁসি হোক। আর নয়। 'অমর-মরণ রক্ত-চরণে ডাক দিয়েছে, ভয়ের জঞ্জালে আগুন ধরিয়ে দাও আজকে।'

ঘুম আসবে না নিশ্চয়ই। লিখলে কেমন হয়? মনের এই অস্থিরতা খানিকটা কেটে

যাবে হয়তো। প্রথম ডাকাতির অভিজ্ঞতা যেন স্নায়ুগুলোকে তার এখনো বিপর্যস্ত আর বিশৃঙ্খল করে রেখেছে।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসল :

পুঞ্জিত হল ঘন দুর্যোগ
তিমিরে হারালো চন্দ্র,
মহারুদ্রের কাল-মন্দিরা
বেজে ওঠে মেঘমন্দ্র।
মত্ত-সিন্ধু করি ঝংকৃত,
কার ধনু আজ হল টংকৃত
থরো থরো করি কাঁপে দিগ্বধূ
রজনী বিগত-তন্দ্র—

বেশ লাগছে লিখতে। নিজের লেখার ঝঙ্কার নিজের কানেই উঠছে রনরনিয়ে। মিতা তার কবিতা পড়ে বলেছে, বিপ্লবী বাংলার বিপ্লবী কবি সে। নজরুলের মতো সেও বাজাবে অগ্নিবীণা, প্রলয়-শিখা জ্বালিয়ে দেবে, ভাঙার গানে শতখান করে দেবে কারাগারের লৌহকপাটকে। কবি—

কিন্তু—কবি।

—এ পথ তোমার নয় ভাই, এ রক্তের পথ তোমার নয়—

করুণাদির কথা। মায়ের মতো দুটি মমতা-শীতল চোখে তাঁর জল নেমে এসেছিল সেদিন। মুখখানা ভালো করে চেনা যাচ্ছিল না, তার ওপর যেন একটা অদৃশ্য মাকড়সা তার কুশ্রী পা টেনে জাল রচনা করেছিল একটা। সেই সন্ধ্যায় কেন কে জানে করুণাদি অদ্ভুতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, হারিয়ে ফেলেছিলেন নিজের স্বাভাবিকতা। যে কথাগুলো বলেছিলেন তাদের বেশির ভাগেরই কোনো মানে বুঝতে পারেনি সে। যেন করুণাদিরই অর্থ বোঝা যায় না। আজ মনে হয় একটা স্বপ্নই বুঝি দেখেছিল সে।

স্বপ্ন ছাড়া আর কী। তারপরে তো করুণাদি কোনো কথাই বলেননি আর। শুধু ও সম্পর্কে নয়, কেমন হয়ে গেলেন আজকাল—বেশি কথাই বলেন না। সেই স্নেহ আছে, চোখের সেই স্নিগ্ধতাও আছে ঠিক আগের মতোই। তাঁর কাছে গেলে তেমনি করেই মাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় ছোড়দিকে। অথচ—অথচ, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। আর একদিনও মনে হয়েছিল একা একা বসে তিনি কাঁদছেন—রঞ্জুকে দেখেই চোখ মুছে ফেললেন।

—কী ভাই, দেশের স্বাধীনতা এনে ফেলেছো?

খুব হালকা আর সহজভাবে কথাটাকে বলতে চাইলেন কিন্তু সে সহজ সুর তাঁর

কথায় বাজল না। নিজেরই কেমন অপ্রস্তুত লাগে আজকাল। করুণাদির সামনে বড্ড অপরাধী বলে বোধ হতে থাকে, চোখের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস হয় না।

—তুমি কবি, তুমি শিল্পী। এ সর্বনাশা খেয়াল তুমি ছেড়ে দাও—

কেন এই কথা? আর এ কথার সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের ব্যর্থতার সম্পর্কই বা কী? কোথায় কী একটা লুকিয়ে আছে করুণাদির, একটা রহস্যময় গভীরতা ঘিরে আছে তাঁকে। সেটাকে জানা যায় না বলেই যেন তাকে কেন্দ্র করে একটা ব্যবধান মাথা তুলেছে আজকাল।

পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন।

—তুই বলেছিলি ভারী দুঃখের জীবন করুণাদির। কিসের দুঃখ রে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল পরিমল। বললে, অল্প অল্প শুনেছি, ঠিক জানি না। তবে যেটুকু জানি সেটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

—তবে থাক।

কিন্তু কেমন যেন লাগে। নিজের লেখা কবিতাগুলোর পেছন থেকে যেন উঁকি দেয় কারো ভৎ‍র্সনাভরা দৃষ্টি। সত্যিই কি ভুল পথ। কবির জন্যে অস্ত্র নয়, কল্পনা-বিলাসীর জন্য নয় শিবিরের প্রস্তুতি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসমাপ্ত কবিতাটা বন্ধ করে ফেলল রঞ্জু। বাইরে থেকে এল মোরগের ডাক। জানালার ফাঁকে ফাঁকে ঘরে এসে লুটিয়ে পড়ল ভোরের আলো।

দিন কয়েকের মধ্যেই জোর ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেল শহরে।

হালদার কোম্পানির দোকান লুঠ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে চারিদিকে। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা আর কখনো ঘটেনি মুকুন্দপুরের জীবনে। কোতোয়ালী থানা থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরের মধ্যে এই ডাকাতি। তাড়াতাড়ি এর একটা সুরাহা না করতে পারলে—ওঃ লর্ড, দি ব্রিটিশ প্রেস্টিজ ইজ লস্ট ফর গুড্।

পুলিসের দাপটে দিনকতক একেবারে তটস্থ রইল সমস্ত। ধনেশ্বরের আহারনিদ্রা বন্ধ হয়েছে, সাইকেল দাবড়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে দিন-রাত। লোকটাকে দেখলেই গায়ের মধ্যে নিসপিস করে। গুলি করে নয়, গলা টিপে খুন করতে ইচ্ছে হয় লোকটাকে। অথবা কোনো কালী-মন্দিরের সামনে বাজনা বাজিয়ে নরবলি দিতে। কল্পনায় ভেসে ওঠে লোকটার আর্তনাদ, প্রাণের জন্য ওদের পায়ের কাছে মাথা কোটা।

ধরেছে অনেককেই। কিন্তু আশ্চর্য, যাদের ধরা উচিত ছিল তাদের টিকিটি ছুঁতে পারেনি এ পর্যন্ত। 'তরুণ সমিতি'র লাইব্রেরী এসে খুঁজেছে তছনছ করে, জিমন্যাস্টিক ক্লাবের কয়েকজন তাগড়া তাগড়া ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। ধনেশ্বর নিজে এসে দেখা করে গেছে বেণুদার বাড়িতে। কী বলে গেছে সেই জানে। পরিমলকে

জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারেনি রঞ্জু।

মনের মধ্যে যতই জোর আনতে চেষ্টা করুক—বুক ধড়ফড় করে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠে, যেন শুনতে পায় পুলিসের বুটের শব্দ। স্বপ্নে দেখে ধনেশ্বর ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছে। ঘুম ভেঙে যায়, নিজের দুর্বলতায় নিজেরই লজ্জার সীমা থাকে না।

করুণাদির কথাই কি ঠিক? সে কি পথের অযোগ্য?

কিন্তু এ অযোগ্যতা মেনে নেওয়ার চাইতে আত্মহত্যা করাও ভালো।

'তরুণ সমিতি'র লাইব্রেরী আজকাল বন্ধ। জিম্‌ন্যাস্টিক ক্লাবে একসারসাইজও হয় না আজকাল। এখন দেখাশুনো, কথাবার্তা সব আড়ালে, সব রাত্রির অন্ধকারে। আনন্দ, উত্তেজনা আর ভয়ের একটা গুরুভার যেন সব সময়ে হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে বসে থাকে এখন। ফাঁসিকাঠের জ্যোতির্ময় পথটা ক্রমশ যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে দৃষ্টির সামনে। পরিমলের সঙ্গে একবার দেখা করা জরুরি দরকার।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, শীতের আকাশে জমেছে খানিকটা থমথমে বাদলের সংকেত। বিদ্যুতের রক্তাক্ত কণা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে একপাল পাগলা হাতীর মতো একদল ঝোড়ো মেঘকে।

বাড়ি থেকে বেরুনো দরকার। কিন্তু এখন আর শাসন নেই তেমন। ছ' মাস আগে বেদনাভরা বন্ধনমুক্তি হয়ে গেছে, তিন দিনের জ্বরে মা হারিয়ে গেলেন। সেই থেকে বাবারও কী হয়েছে—বাইরে বাইরেই ঘোরেন, বাড়িতে আসেন মাসে দুদিন কি একদিন। দাদা তার থিয়েটারের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত, মেজদা বরাবর কলকাতায় মামার কাছে থেকে লেখাপড়া করে—সেও ছুটি-ছাটায় আসে এখানে। বাড়িতে ছোট বোনেরা আর ঠাকুরমা ছাড়া তত্ত্বাবধানের লোক নেই কেউ। কিন্তু ঠাকুরমা। দুবেলা পা ছড়িয়ে বসে তাঁর কান্না চলে মায়ের জন্যে। মাকে হারানোর চাইতে ও কান্নাটাকে আরো বেশি অসহ্য, আরো দুঃসহ মনে হয়।

তবু একদিক থেকে এই ভালো। অবাধ মুক্তি—স্বাধীনতা। যতক্ষণ খুশি বাইরে থাকো, যেখানে খুশি যাও। তিরিশ সালের বন্যায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রা করতে চেয়েছিল সমুদ্রের অভিসারে, বিপ্লবীর আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল সব কিছু বাঁধনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে অজানিতের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। মায়ের জন্য অসহ্য কষ্ট হয় মধ্যে মধ্যে, ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে এক এক দিন রাত্রে—তবু এই ভালো। অনেকটা ক্ষতিকে মেনে না নিলে অনেক বড়কে পাওয়া যায় না, মহত্তর দুঃখই তো বয়ে আনে মহত্তম গৌরব।

তাই আকাশে মেঘ দেখেও বেরিয়ে পড়ল। ঠাকুরমা যথানিয়মে তাঁর বিলাপ আরম্ভ

করে দিয়েছেন। ওই কান্নাটা যেন মাথার মধ্যে হাতুড়ি ঠোকার মতো আঘাত করতে থাকে। মানুষ মরলে আর ফিরে আসে না। তবু ওই কান্নার জের টেনে কেন এই ব্যর্থ শোককে জীইয়ে রাখা? কী সার্থকতা আছে—যে ক্ষত আপনা থেকেই শুকিয়ে আসছে তাকে বারে বারে খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত করবার?

পথ অন্ধকার। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া ভিজে ভিজে লাগছে—তারই ঝাপটায় বোধ হয় নিবে গেছে রাস্তার আলোগুলো। বিদ্যুতের হাসি চমকে চমকে উঠছে। গুর্ গুর্ করে মেঘের একটা ছোট ডাক কানে এল।

সব মৃত্যুই কি মনে রাখবার মতো? অন্যমনস্ক ভাবে চলতে লাগল রঞ্জন। জীবনে প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সে দেখেছে অবিনাশবাবুর ভেতর, মৃত্যুর মৃত্যুহীন কাহিনী পড়েছে 'শহীদ সত্যেন', 'ফাঁসির ডাক'—আরো অজস্র বইয়ের পাতায় পাতায়। সে মৃত্যু দেয় বাঁচবার প্রেরণা, দশজন দেশকর্মীর বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে ওঠে দশ লক্ষ পরাধীন মানুষের মুক্তির অমৃতরসায়ন। কিন্তু মার মৃত্যু শুধুই ব্যথা মাত্র, তাতে করে দুঃখ ছাড়া আর কোনো পাথেয়ই তো মেলে না।

ভুলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু ঠাকুরমা ভুলতে পারে না, ভুলতে দেনও না কাউকে।

—টিপ্ টিপ্ টিপ—

বৃষ্টি নামছে। শীতের বৃষ্টি, ভিজলেই নিমোনিয়া। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল পরিমলদের বাইরের ঘরে। আর ঘরে পা দিতেই বাগানের হেনার ঝাড়ের ওপর বৃষ্টির জোর ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ল, একটু দেরি করলেই ভিজিয়ে একেবারে ভূত করে দিত।

বাইরের ঘরটা প্রায় খালি। উঁচু একটা লম্বা তেপায়ার মাথায় ঘষা-কাচে ঘেরা বিচিত্র চেহারার একটা আলো জ্বলছে—সেই আলোয় যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে নৃত্যরত নটরাজের ব্রোঞ্জ মূর্তিটা। আর বাইরের সদ্য বৃষ্টিভেজা ধুলোর গন্ধের সঙ্গে ঘরের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে মহীশূর চন্দনের সৌরভ। অস্বস্তি ভরা বাড়ি—পা দিতেই বিশ্রী লাগে।

আলোর ঠিক নিচে সেটিতে হেলান দিয়ে শুয়ে বন্দিনী রাজকন্যা; ওকে ঢুকতে দেখে বইটা নামিয়ে রেখে মিষ্টি করে হাসল।

—খুব বেঁচে গেছো, একটু হলেই ভিজিয়ে দিত।

—হুঁ—বড় জোর বৃষ্টিটা এসে পড়েছে—রঞ্জন পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

তেমনি হেসে মিতা বলল, তারপর এই বৃষ্টির মধ্যে কী মনে করে?

—কয়েকটা জরুরি কথা আছে। পরিমল কোথায়?

—দাদা তো বাড়িতে নেই।

—বাড়িতে নেই? কোথায় বেরিয়েছে?

—বাবার সঙ্গে। বাবা গাড়ি নিয়ে ওঁর এক মক্কেলের বাড়িতে গেছেন নরোত্তমপুরে —সেখানে নেমন্তন্ন আছে। দাদাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। ফিরতে রাত হবে— বৃষ্টি-বাদলা বেশি হলে আজ নাও ফিরতে পারেন।

—তাই তো। - চিন্তিত মুখে রঞ্জন বললে, কী করা যায়?

—খুব বিপদে পড়েছ, তাই না?—মিতা এবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল: বেশ হয়েছে। যা বৃষ্টি নেমেছে, সহজে পালাতে পারবে না। আবৃত্তি শোনাও বসে বসে

—অত শখ নেই আমার—এক্ষুণি বাড়ি যেতে হবে।

—কেন, এত তাড়া কিসের?

—বাঃ, তাড়া থাকবে না? আর পনেরো-ষোলো দিন বাদে কলেজ খুলছে—কিচ্ছু পড়িনি। ওদিকে একটা পরীক্ষা রয়েছে আবার।

মিতা ভ্রূভঙ্গি করলে: উঃ, কী প্রচণ্ড পাঠানুরাগ। তবু যদি লজিকের খাতায় এক দিস্তা কবিতা না থাকত।

—ফাজলেমি কোরো না এখন, মুড নেই—বিরস ভাবে রঞ্জন বললে, দোহাই লক্ষ্মীটি, চট্‌পট্ একটা ছাতার ব্যবস্থা করো দেখি।

মিতা গম্ভীর হয়ে বললে, ছাতাটাতা নেই আমাদের। তবে আমার একটা প্যারাসোল আছে সেইটে নিতে পারো।

—তা হলে ভিজেই যাবো আমি—বীরের মতো উঠে দাঁড়ালো সে।

—যাক, অত বীরত্বে কাজ নেই—মিতা কৌতুকভরা গলায় বললে, ফলটা তো জানি। স্রেফ দশটি দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে। কেমন বৃষ্টি নেমেছে দেখছ না?

সত্যি কালো আকাশটা যেন গলে গলে পড়ছে আজ। বাইরের হেনার কুঞ্জে উদ্দাম মাতামাতি। জল আর বাতাসের গর্জন উঠছে ক্ষ্যাপা কতগুলো জানোয়ারের আর্তনাদের মতো। বিদ্যুতের আলোর কোটি অভ্রের তীরের মতো ঝলকে উঠছে বর্ষার ধারা। ছাতাও কোনো কাজ দেবে না এখন।

মিতা বললে, দেখছ তো?

—হুঁ।

—তা হলে?

—তাই তো।—মিতার মুখের দিকে বিব্রত জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালো রঞ্জন, আর তখনই দৃষ্টিটা সেইখানেই রইল স্থির হয়ে।

হঠাৎ যেন 'ফেয়ারি টেলসে'র একটা ছবি দেখল ঘষা কাচের বাতিটার আলোতে। পাতলা ঠোঁট দুটিতে ছোট হাসির রেখা, দুটি চোখে বিদ্যুতের চুরি করা আলো, সুবর্ণরেখা দুখানি হাত যেন ঘরের ভেতরে সাজানো ওই সব মূর্তিগুলোর মতো শ্বেত

পাথরে নিখুঁত ভাবে খোদাই করা। ফিকে লাল রঙের শাড়ি সে ছবিখানার পটভূমি।

পশমী ফিতে বাঁধা একটা বেণী গলার পাশ দিয়ে ঘুরে তার বুকের ওপরে এসে পড়েছে, দু আঙুলে সেই বেণীটা নিয়ে খেলছে সে।

বাইরের বৃষ্টির শব্দ। ঘরের ভেতরে ধূপের গন্ধ। রঙীন ছবি। এক মুহূর্তে সবটা মিলিয়ে যেন কেমন অবাস্তব বলে মনে হল তার। অকারণে ইচ্ছে করতে লাগল ওই ছবিটাকে যেন স্পর্শ করে, ওই হাত দুটো হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে দেখে সত্যিই তাদের প্রাণ আছে কি না। সত্যিই কি ওটা একটা ডল পুতুল না বন্দিনী রাজকন্যা?

ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে মিতা হঠাৎ লজ্জা পেল।

—রঞ্জনদা?

—উঁ?—ঘোর ভেঙে লজ্জিত মানুষটি জেগে উঠল।

—কী ভাবছিলে? নরম গলায় জানতে চাইলে মিতা।

কিন্তু এতক্ষণে নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে সে। না—এ ভালো কথা নয়। মিতাকে দেখলে এযেকী একটা বিপর্যয় ঘটে যায় নিজের ভেতর—নিজেই বুঝতে পারে না সে। মনে হয় পুলিসের ভয়ের চাইতেও আরো একটা বড় ভয় আছে কোথাও, আছে আরো কোনো ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা। কী যেন এসে শরীরটাকে আচ্ছন্ন করে ধরে, বছর দুই আগে না জেনে এক গ্লাস সিদ্ধি খাওয়ার পরে যেমন হয়েছিল, তেমনি ঘোর ঘোর লাগে সমস্ত চেতনায়। আর তাই থেকেই কি আসে ওই স্বপ্ন? ছেলেবেলার উষার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় সংঘমিত্রার মুখখানা, কল্পনা জাগে বুড়ীবালামের ধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে?

অসীম লজ্জায় ভাবতে লাগল এ বাড়িতে আর আসবে না সে। আর কখনো মুখ তুলে চাইবে না ওই মেয়েটির দিকে। মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক নয়, কোথাও একটা অপরাধ লুকিয়ে আছে এর আড়ালে।

—রঞ্জনদা?

—অ্যাঁ?

—আবৃত্তি করবে না?

—ভালো লাগছে না।

—ওঃ—মিতাও চুপ করে রইল। তারও যেন রঞ্জুর মনের ছোঁয়া লেগেছে, সেও বুঝি স্পষ্ট করে কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। দুজনেই বসে রইল মাথা নিচু করে, শুধু থেকে থেকে আঙুলে বেণীটাকে জড়িয়ে চলল মিতা।

—ইস্—বৃষ্টির ছাট আসছে যে—

মিতা এগিয়ে এসেছে এ পাশের বড় জানালাটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু জানালার

কজ্জায় কেমন মরচে পড়ে শক্ত হয়ে গেছে, কিছুতেই সেটা বন্ধ হয় না।

—সরো আমি দেখছি—

উঠে পড়ল রঞ্জন : সরো—

জানালাটা এবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল ঘটনাটা। কেমন করে তার হাতের মধ্যে যে আর একখানা হাত এসে পড়ল কে জানে। মুঠোর ভেতর সে হাতখানা যেন গলে গেল মাখনের মতো।

শরীরে বিদ্যুৎ চমকে গেল, আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল মিতার মুখের ওপর ধারালো ঝলক দিয়ে। রঞ্জু টের পেল, তার হাতের মধ্যে ছোট পাখির মতো একখানা হাত কাঁপছে, মিতাও কি কাঁপছে?

—ছিঃ—এ কি হচ্ছে।

মনের মধ্যে বেণুদার গর্জন শোনা গেল, আকাশে শোনা গেল মেঘের ধমকানি। এবার রঞ্জুও কেঁপে উঠল। হাত ধরেনি, একটা সাপ ধরেছে মুঠোর মধ্যে। চকিতে হাতটা ছেড়ে দিয়ে দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল, দাঁড়াল এসে বৃষ্টির ছাটলাগা অন্ধকার বারান্দাটায়। ঘরের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়াটা কী হয়েছে দেখবার জন্য পেছন ফিরে একবারও সে তাকাতে পারল না আর।

চোদ্দ

'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'। পদ্মার পাড়ে নির্জন ক্যাম্পে বসে ভাবছে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

নানা রঙের দিন। উদয়াস্তের সীমা-চিহ্ন দিয়ে আঁকা। এক একটি দিন যেন একটি করে পর্দা সরিয়ে নিয়েছে আরো গভীর, আরো নিবিড়, আরো বিচিত্র এক একটি অজানিতের ওপর থেকে। প্রতিদিন নিজেকে আবিষ্কার করা হয়েছে তিলে তিলে, নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি করে জেনেছি পৃথিবীকেও। আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জানলাম।

'আমার চেতনার পান্নার রঙে পৃথিবী হল সবুজ', রবীন্দ্রনাথের কথা। শুধু চেতনার পান্নার রঙ নয়, চুনির রঙও বটে। দিকে দিকে দেশে দেশে সবুজ মাটির ওপর ক্ষরিত হয়ে পড়েছে চুনির মতো, পদ্মরাগের মতো মানুষের রক্ত। এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ইয়োরোপের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ওপর। আমেরিকার কালো নিগ্রোদের কালো রক্তে তৈরি হচ্ছে পীচের পথ, ডেট্রয়েটের মোটরের পেট্রল যোগাচ্ছে রক্তের নির্যাস। তাই চামড়া বাঁচাবার জন্ত

একদল হয়েছে পোষা বুলডগ, আর একদল নীরক্ত বর্ণহীন একসার ছায়ামূর্তি। শুধু সুড়ঙ্গের অন্ধকারে, কালো অরণ্যের ছায়ায়, কারাগারের আড়ালে, দ্বীপান্তরের ওপারে জন কয়েক সত্যিকারের মানুষ তপস্যা করে চলেছে ; প্রতীক্ষা করে চলেছে রক্ত-সমুদ্রে অবগাহন করে সভ্যতার দিকচক্রে কবে দেখা দেবে নতুন সূর্য। তাদের চেতনার পান্নার রঙে উদ্ভাসিত হয়েছে নতুন পৃথিবী। চুনীর রক্তরাগ মুছে গেছে, সবুজ আর নতুন ফসলে ভরা রক্তের মালিন্যহীন উত্তর সাগর দক্ষিণ সাগর পরিব্যাপ্ত মহাপৃথিবী।

কিন্তু সে কবে ? কত দেরি তার ?

নানা রঙের দিনগুলি তার উত্তর এনেছে নানা ভাবে। কখনো আশার উত্তেজনায় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠেছে হৃৎপিণ্ড, মনে হয়েছে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে যেতে আর তো দেরি নেই। 'বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ ?' জালিয়ানওয়ালাবাগে যত রক্ত ঝরেছে, তার হিসেবনিকেশ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ চট্টগ্রাম। আয়ার্ল্যাণ্ড ছেড়ে একদিন মানে মানে পালাতে পথ পায়নি ইংরেজ ; আমেরিকায় ঘাড়ধাক্কা খেয়ে সিংহের জাতি একদিন ভীরু কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পাড়ি দিয়েছে আটল্যান্টিক ; বুয়র যুদ্ধে সামান্য কয়েকজন চাষার বলিষ্ঠ প্রতিরোধের গর্জনে 'রুল্ ব্রিটানিয়া'র জয়সঙ্গীত আপনা থেকেই রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে গেছে।

আমরাও পারব। নিশ্চয় পারব। এত বড় ভারতবর্ষ আমাদের, এই কোটি কোটি মানুষের দেশ। আজ যারা ঘুমিয়ে আছে, রুদ্রভৈরবের পদাঘাতে তারা জাগবেই। সব্য-সাচী দুঃখ করেছিল : কসাইখানা থেকে গোরুর মাংস গোরুতেই বয়ে আনে, বিদেশীর হুকুমে দেশের মানুষই দেশপ্রেমীর গলায় পরিয়ে দেয় ফাঁসির দড়ি। কিন্তু এ দুঃখও একদিন থাকবে না। নিজেদের অপরাধ, নিজেদের লজ্জার ভারে তারা একদিন মিশে যাবে মাটিতে। 'জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ, পুড়বে সকল বন্ধ'—

তবুও—

দ্বিধা আসে। কতটুকু শক্তি আমাদের, কীই বা সামর্থ্য। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স তার সং-শোধিত ফৌজদারী আইনের নাম নিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। কতটুকু দাম বিনয় বসু, দীনেশ মজুমদার, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত অথবা প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের আত্মদানের ? কোন্ মূল্য আছে অনন্তহরি, প্রমোদরঞ্জন, কাকোরীর রাজেন লাহিড়ী, আসফাকউল্লা আর লাহোরের ভগৎসিংহের আত্মবলির ? দেশের সাধারণ মানুষ—যাদের নিয়ে দেশ ; যাদের মুক্তি দেবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় আমরা ঘর ছাড়লাম, কী কৃতজ্ঞতা পেলাম তাদের কাছ থেকে ? সুযোগ সুবিধে পেলেই তারা ইন্‌ফর্মার হয়, নেত্র সেনের মতো অবলীলাক্রমে ধরিয়ে দেয় পুলিসের হাতে, ভারতবাসী আই-বি পুলিস মিথ্যে ষড়যন্ত্র মামলা তৈরী করে, সওয়াল করে ভারতবাসী পাবলিক্ প্রসিকিউটার, শাস্তি দেয় কালো

বিচারক। তবে কার জন্য এই স্বাধীনতা সংগ্রাম, কিসের সমর্থনে ?

বছর দেড়েক আগে একটা বিচিত্র বই পড়েছে রঞ্জন। নতুন নেতার হাতে গড়া একটা দেশ। অদ্ভুত বই। কথাগুলো ভালো বোঝা যায়নি। যিনি লিখেছেন তিনি ভালো করে বোঝাতেও পারেননি। তবু চমক লেগেছে। সমস্ত মানুষের রাষ্ট্র, তোমার আমার চাষার শ্রমিকে সকলের গড়া রাষ্ট্র। ছোট বড় কেউ কোথাও নেই। সকলের জন্যই সেখানে সব।

বিশ্বাস হয়নি। রূপকথার গল্পের চেয়েও আরো অবিশ্বাস্য আর অসম্ভব বলে মনে হয়েছে সে লেখা। এ কি সম্ভব ? এমন কি হতে পারে ? তোমার আমার সকলের দেশ। কেউ বড়লোক নেই, কেউ ছোট নয় কারুর চাইতে। এ কী করে হয় ?

বেণুদাকে প্রশ্ন করেছিল : এ কী করে হয় ?

বেণুদা বলেছিলেন, ঠিক জানি না।

—আপনার মনে হয় সম্ভব ?

—ঠিক ভেবে দেখিনি এখনো।—অনাসক্তভাবে বেণুদা জবাব দিয়েছিলেন : তবে যতটা শুনেছি—ওরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে রাশিয়ায়। তার ফল কী হবে তা অবশ্য এখনো নিশ্চয় করে বলা শক্ত।

—কিন্তু কী চমৎকার!—উচ্ছ্বসিত ভাবে রঞ্জন বলেছিল : যদি এ সম্ভব হয়—

বেণুদা চিন্তিত মুখে বলেছিলেন : যতটা ভাবছ অত চমৎকার হয়তো নয়। ও সম্বন্ধে দু-একটা লেখা আমি হালে পড়েছি ইংরেজি কাগজে। ওরা নাকি সাম্যবাদের নামে মানুষের ওপরে বড় বেশি অত্যাচার করছে। ঘর থেকে নিরীহ মানুষকে পথে বের করে দিচ্ছে, টাকাপয়সা লুঠ করছে। এমন কি মেয়েদের সতীত্বের মূল্য পর্যন্ত রাখছে না, তাদেরও সোসিয়ালাইজড্ করে ফেলেছে।

রঞ্জন শিউরে উঠল।

কী ভয়ানক!

বেণুদা বললেন, হ্যাঁ, ইংরেজি কাগজগুলো তাই লিখছে। আরো বলছে যে ওদের যিনি সত্যিকারের নেতা ছিলেন, মতভেদ হয়েছে বলে চক্রান্ত করে দেশ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই এখনি এত খুশি হয়ো না, পৃথিবীর লোকেরা কেউই ওদের ভালো বলছে না।

রঞ্জন চুপ করে রইল। কেমন ব্যথাবোধ হয়, কেমন যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। বিমলির প্রসঙ্গ তুলে ভোনার দল যেমন একদিন কালি ছিটিয়ে দিয়েছিল মালঞ্চমালার স্বপ্নে, তেমনি করে এই নতুন স্বপ্ন-বিলাসকেও যেন কলঙ্কিত করে দিলেন বেণুদা। মেয়েদের সতীত্বের যারা মূল্য দেয় না, তাদের সাম্যবাদের কী দাম ?

তবু—

তবু শুধু ওইটুকু বাদ দিলে কী চমৎকার হত। বড়লোকের টাকাপয়সা কেড়ে নিক, কোনো আপত্তি নেই তার—হালদার, বিধুবাবু, বাজারের নবীনমাধব সাহা কিংবা মাধোলাল দাগা মারোয়াড়ী—এদের সর্বস্ব লুট করে নিলেও খুশি হবে রঞ্জন। শীতের দিনে এই শহরের রাস্তাতেই তো ভিখিরীকে ঠাণ্ডায় জমে মরে যেতে দেখেছে সে—কী ক্ষতি হয় রামনগর জমিদার বাড়িটাকে দখল করে ওখানে ওই সব ঘর-ছাড়া মানুষের মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে দিলে? আমার রাষ্ট্র—এ বোধ যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোকের প্রাণের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠত! কতবড় কাজ হত তা হলে, কত সহজ হয়ে যেত!

কিন্তু ওই সতীত্বের কথা! সব আলোকে যেন কালো করে দেয়।

—আর—বেণুদা বলেছিলেন: ওসব বড় বড় কথা ভাববার সময় আমাদের নেই এখন। আগে তো ইংরেজ তাড়াতে হবে। তারপর দেখা যাবে কতটা সম্ভব ও-সমস্ত।

তা তো বটে। কিন্তু ইংরেজ তাড়ানো কী সোজা? কত অস্ত্র, কত সৈন্য-সামন্ত, কত বড় প্রতিরোধ! তার সামনে কী করে দাঁড়াবে তারা, বাধা দেবে কোন্ শক্তিতে? তিরিশ সালের বন্যার মতো তিরিশের অহিংস আন্দোলনও শুধু কতগুলো অপমৃত্যুরই স্বাক্ষর রেখে গেল, তার বেশি কিছুই না। এ রক্তের বন্যাও কী শেষ পর্যন্ত তাই হবে? বারে বারে যেমন ব্যর্থ হয়েছে—ব্যর্থ হয়েছে গদর দলের অভিযান, সিপাহী ব্যারাকে পিংলের বিদ্রোহের চেষ্টা, রাসবিহারী ঘোষ, বাঘা যতীনের আপ্রাণ প্রয়াস—আর চট্টগ্রামের প্রাণবলি?

—নাঃ—

নিজের মনকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে রঞ্জন। বিপ্লবের রঙীন স্বপ্ন কাজের জটিল পথে এসে ঘা খাচ্ছে বারে বারে। ক্লান্তি, হতাশা, নৈরাশ্য। মৃত্যুর রোমান্স্ কেটে গেছে, মাঝে মাঝে পীড়িত বোধ হয় নিজেকে। কতদিন চলবে এইভাবে? শুধু চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে চলা, শুধু ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা, বড় জোর দুটো একটা ডাকাতি আর দিনরাত পৃথিবীসুদ্ধ মানুষকে অবিশ্বাস করে চলা?

দেশের কাজ করছি, অথচ সমস্ত দেশ বাধা দিচ্ছে—আশ্চর্য।

উনিশশো তিরিশের আন্দোলন তো এ বাধা দেয়নি। লম্পট ব্রিজবিহারী থেকে শুরু করে রেল স্টেশনের কুলি পর্যন্ত সাড়া দিয়েছিল সেদিন—এমন কি, ভোনার মতো ছেলেও দেশমায়ের বন্দনা গেয়েছিল: 'তু হামারা দিল্‌কা রোশনী, তু হামারা জান—'

তবে? এই রক্তঝরা পথে তারা নেই কেন? ভয় পায়? তাও তো বিশ্বাস হয় না। সেই মদের দোকানের সামনে বোতলের ঘা খেয়ে যার মাথা ফেটেছিল, ক্লাসের সেরা ছেলে মৃগাঙ্ক—যে পুলিসের লাঠির মুখে সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল, তারা কি

তাদের চাইতেও কাপুরুষ? তবে? অথচ সে পথেও কি দেশ তার সব প্রশ্নের জবাব পেল? না, পায়নি। সে তো মৃগাঙ্কই বলেছে পরিষ্কার ভাষায়: কেন বুঝিনি চৌরিচৌরার অর্থ, বার্দৌলির মানে?

কী চৌরিচৌরা, কোথায় বার্দৌলি, মহাত্মা গান্ধীসম্পর্কে কেন অমন তীব্র অসন্তোষ আর বিক্ষোভ মৃগাঙ্কের মনে, কেন আর একবার চিৎকার করে সে বলেছিল: It is a betrayal, betrayal to Revolution?

আজকের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় উত্তর পেয়েছে তার, নিঃসঙ্গ এই অন্তরীণ-বন্দী জেনেছে সে সত্যকে। কিন্তু সেদিনের রঞ্জু জানত না। কেউ জানায়নি তাকে।

ওই বইটাই মাথার মধ্যে ঘোরে। যদি ওরকম হত—সমস্ত মানুষের রাষ্ট্রে ছোট বড় সব মানুষ একসঙ্গে এগিয়ে আসত লড়াইয়ের জন্যে? কত সোজা হয়ে যেত এই কাজ। এই রক্তঝরা জটিল নিঃশব্দ যাত্রা যদি রূপায়িত হত লক্ষ কোটি মানুষের জয়যাত্রায়?

'আয় আয় আয় ডাকিতেছি সবে, আসিতেছে সবে ছুটে'—

গুরু গোবিন্দ। রাশিয়ার লেনিন। কিন্তু এদেশে কে আছে? কে দেশের সব মানুষকে এনে ফেলতে পারে এক মহাবিপ্লবের প্রাণ-বন্যায়?

ধ্যেৎ। সব বাজে। মনের মধ্যে পেছিয়ে পড়ার পঙ্গু ভাববিলাস। এ হওয়া উচিত নয় কিছুতেই। এর পেছনে কি আছে করুণাদির সেই দুর্বোধ্য কথাগুলোর কোনো প্রেরণা? কবি-শিল্পীর জন্য এই ক্রান্তির কালো মেঘ নয়, তার শুধু সৃষ্টি, শুধু গান, শুধু সঙ্কল্প?

কিন্তুরবীন্দ্রনাথের কথাওতো মনে পড়ে। 'কবি, তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ'—

তবু করুণাদিকে ভোলা যায় না। ওই কথাগুলোর আড়াল থেকে কী একটা উঁকি দেয়, মনকে যেন পিনের ঘা দিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে থাকে। কিসের ব্যর্থতা করুণাদির? এই বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটাই বা কোন্‌খানে? বেণুদার বোনের মুখে এই নৈরাশ্যবাদ মনে হয় অবোধ্য, মনে হয় প্রহেলিকার মতো।

আর তা ছাড়া তার কবিতার সত্যিকারের মর্যাদা তো পেয়েছে সে। বিপ্লবী বাংলার কবি—এই সম্মান তাকে দিয়েছে আর একজন, দিয়েছে তার প্রতিভার সব চেয়ে বড় পুরস্কার।

হঠাৎ ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল বুক।

না—মিতা নয়। এবার থেকে মিতাকে সে মুছেই ফেলে দেবে মন থেকে। সেই বর্ষার সন্ধ্যা। আচমকা একটা ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায় ছবির হাতখানা ফুলের মালা হয়ে রঞ্জুর মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিল। তার চোখ দুটি, তার মুখখানা। সে তো কোনো বিপ্লবী নায়িকার নয়, সে মুখের সঙ্গে মিল আছে তার প্রথম বধূ সেই ছোট মেয়ে উষার, সে চোখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে সূর্যের শেষ আলোয় রাঙা নারিকেল-বীথি-মর্মরিত কোনো

ড্রাগন-দ্বীপে বন্দিনী রাজকন্যার।

চরিত্রহীন আর বিশ্বাসঘাতকের একই দণ্ড আমরা দিই—সে মৃত্যুদণ্ড।

বেণুদার গলা। গলা নয়, বাঘের গর্জন। কী সাংঘাতিক অপরাধ করতে যাচ্ছিল! সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথর করে। মিতা নয়, লেনিনের রাশিয়াও নয়। 'একলা চলো, একলা চলো'—। হাত নয়, সাপ। নিজেকে বাঁচাও ওই সাপের বিষাক্ত স্পর্শ থেকে।

ইতিমধ্যে একদিন আর একটা ঘটনা ঘটে গেল।

শনিবার। অরোরা বায়োস্কোপ হল থেকে ওরা বেরুল 'জ্যাক অ্যাণ্ড দি বিন ট্রি' আর 'চার্জ অব্ দি লাইট ব্রিগ্রেড্' দেখে। বেশ ছোটখাটো একটি দল ওদের। রঞ্জন, পরিমল, জিম্ন্যাস্টিক ক্লাবের ষণ্ডা ছেলে রোহিণী আর বিশ্বনাথ।

পরিমল বললে, আয়, একটা করে লেমোনেড্ খাওয়া যাক সবাই।

লেমোনেডের সন্ধানে রেস্তোরাঁর দিকে এগোতেই একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। ভেতরের বেঞ্চে চার-পাঁচটি ছেলে খুব তরিবৎ করে চা আর চপ-কাটলেট খাচ্ছিল। ওরা অনুশীলনের ছেলে, কাজের চাইতে নাকি চেঁচামেচি ওদের বেশি, আর পুলিসের হাতে বোকার মতো পটাপট ধরা পড়তেও ওরা ওস্তাদ। এ জন্যে রঞ্জনরা ওদের করুণা করে—অশ্রদ্ধাও করে। আর এম্নি মজার ব্যাপার, ওরাও নাকি এদের দলের সম্পর্কে ঘোষণা করে থাকে অনুরূপ ধারণা।

ওরা চপ-কাটলেট খাক বা না খাক সেটা বড় কথা নয়। সব চাইতে যেটা আশ্চর্য—তা হল ওদের দলের মধ্যেই বসে আছে অজয় দত্ত।

অজয় দত্ত! ওদের নতুন রিক্রুট ছেলে, সে কেমন করে গিয়ে ভিড়ল অনুশীলনের ওই ছোকরাদের পাল্লায়? লেমোনেড্ আর খাওয়া হল না, এরা কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে রইল।

তারপরে একটা গর্জন করল রোহিণী: হোয়াট দ্যাট? হাউ ইজ্ ইট?

ক্লাসে বরাবর ইংরেজিতে ফেল করে ছোকরা। তাই গালিগালাজ করবার সময় ইংরেজি ছাড়া তার মুখ দিয়ে আর কিছু বেরুতে চায় না।

অনুশীলনের দলটা মুখ ফিরিয়ে তাকালো এদিকে—দেখল এদের। মুহূর্তের জন্যে অজয় দত্তের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল. সে তৎক্ষণাৎ মাথা ঘুরিয়ে নিলে অপরাধীর মতো।

রোহিণী বললে, অজয়, কাম্ অ্যাওয়ে।

ও-দলের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়ালো অলসভাবে, একবার আড়মোড়া ভাঙল। তারও জিম্ন্যাস্টিক-করা শক্ত চেহারা, আড়ে বহরে রোহিণীর কাছাকাছিই হবে সে। মারামারির ব্যাপারে শহরের নামকরা ছেলে—বিশু নন্দী।

বিশু নন্দীর গায়ে একটা কলারওয়ালা গেঞ্জি—নিচে চওড়া বুকখানা। ক্ষুদে ক্ষুদে

চোখে একটা আশ্চর্য উদাসীনতা, খাড়া দুটো চোয়ালে উদ্যত খাঁড়ার মতো ভঙ্গি।

বিশু নন্দী শান্ত গলায় বললে, কেটে পড়ো চাঁদ, তোমাদের পাখি পালিয়েছে।—তারপর এমনভাবে হাই তুলল, যেন গোটা কয়েক মাছি তাড়ানোর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি উদ্যম ব্যয় করতে সে রাজী নয়।

রোহিণীর চোখে আগুনের হল্‌কা: নো—সার্টেন্‌লি নট্।

বিশু নন্দী তেম্‌নি শান্ত স্বরে বললে, ইয়েস। তারপর সেনাপতির ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়িয়ে আদেশ করলে, চলো সব।—অনুশীলনের দলটা উঠে ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরিমল ডাকলে, অজয়, শোনো।

অজয় জবাব দিলে না, শুনতেই পায়নি যেন। কিন্তু জবাব দিলে বিশু নন্দী। কথা বললে না, তার বদলে মুখ ঘুরিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসির চাইতে জুতোর ঘা-ও সহ্য করা সহজ। যেন একটা ধারালো র‍্যাঁদা ঘষে ওদের পিঠের চামড়া সুদ্ধ ছুলে দিয়ে গেল একেবারে।

তাও সহ্য হত, কিন্তু বিশু নন্দীর একজন সহচর যাওয়ার আগে মন্তব্য করে গেল: কাওয়ার্ড পার্টি।

কাওয়ার্ড পার্টি। রোহিণী গর্জন করে বললে, দি লাস্ট স্ট্র ইন্ ক্যামেলব্যাক্।

ইংরেজিটা ভুল বলেছে রোহিণী, একবার ইচ্ছে করল সংশোধন করে দেয় কথাটাকে। কিন্তু রোহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভ্রম সংশোধনের সাহস হল না আর। খুন চড়েছে রোহিণীর মাথায়, রক্ত চড়েছে চোখে। দাঁতে দাঁতে একটা অদ্ভুত শব্দ করল সে, যেন ধারালো একটা অস্ত্র দিয়ে কেউ আঁচড় কাটছে শক্ত পাথরের গায়ে।

—ফলো মি ফ্রেণ্ডস্—

পরিমল বললে, মারামারি করবে নাকি?

—মারামারি। না তো কি এই ইনসাল্ট পকেটিং করব?

—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?—জিজ্ঞাসা করল রঞ্জন।

—কাওয়ার্ডস গো ব্যাক।—খোলার ওপর থেকে ছিটকে পড়া খইয়ের মতো জবাব দিলে রোহিণী: আমাকে গাল দিলে আমি ডাইজেস্ট করতে পারতাম, কিন্তু তাই বলে পার্টিকে অপমান? দে উইল হ্যাভ্ এ গুড্ লেসন।

—তবু—

—নো—নো।—রোহিণী এবারে হুঙ্কার ছাড়ল: রিভেঞ্জ চাই। আই হ্যাভ লস্ট মাই টেম্পারেচার—ফলো মি অর গো ব্যাক্।

কথাটা টেম্পারেচার নয়, টেম্পার—রঞ্জন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হন

হন্ হন্ করে এগিয়েছে রোহিণী। সুতরাং অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। বুক দুর দুর করছে, কাঁপছে হাত পা। মনে পড়ছে বিশু নন্দীর জল্লাদের মতো চেহারাটা। তবু পেছুলে চলবে না—পার্টিকে অপমান।

পরিমল একবার বললে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু।

রোহিণী শুনতে পেল না, শুনলে ইংরেজি বুকনি ঝেড়ে দিত একটা। কিন্তু বেশিদূর এগোতেও হল না ওদের। সামনেই একটা নির্জন জায়গা, তার ডান দিকে জেলখানার মস্ত মাঠ, বাঁ ধারে প্রকাণ্ড আমের বাগান। সেই আমবাগানের ভেতর দিয়ে একটা পায়েচলা পথ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্নায় দেখা গেল দলটা চলেছে সেই পথ দিয়ে।

রোহিণী জোর পায়ে হাঁটছিল। প্রায় কাছেই এসে একটা হাঁক দিলে: স্টপ।

ওরা থেমে দাঁড়ালো। আলো-আঁধারিতে দেখা গেল নক্ষত্রগতিতে ফিরে দাঁড়ালো বিশু নন্দী।

রোহিণী বললে, কে বলেছে কাওয়ার্ড পার্টি?

বিশু নন্দী শান্ত গলায় বললে, আমি।

—ড্যাম্ উইথ অনুশীলন পার্টি।—

বিশু নন্দী বললে, কাম অন্।

তারপরই যা ঘটল সেটা একটু আগেই দেখা চার্জ অব লাইট ব্রিগেডের চাইতেও রোমাঞ্চকর ও ক্ষিপ্র। আকাশ থেকে যেন ঘুষির পর ঘুষি উড়ে যেতে লাগল, রঞ্জন চোখ বুজে হাত ছুঁড়ে যেতে লাগল। আঘাত করবার উদ্দেশ্যে নয়, আত্মরক্ষার জন্যে।

বাপ্—

বিশু নন্দী বসে পড়ল মাটিতে। নাক চেপে ধরেছে এক হাতে, বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ফিকে ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখা গেল তার নাক বেয়ে নেমে আসছে কালো একটা সরু ধারা—রক্ত। রোহিণীও ততক্ষণে মাতালের মতো টলছে।

হঠাৎ কতকগুলো মানুষের গলার আওয়াজ—কারা যেন আসছে। মুহূর্তে দু-দল দু-দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল, অনেকখানি রাস্তা পালিয়ে পথের ওপর যখন ওরা এসে দাঁড়ালো, তখন ক্ষত-বিক্ষত রোহিণীকে যেন চেনা যায় না। বিশু নন্দীর হাতও ভালোই চলেছে। প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে রোহিণী বললে, খুব শিক্ষা দিয়েছি ব্যাটাদের। কাওয়ার্ডস্।

পরিমল মৃদু হাসল: শিক্ষা কে বেশি পেয়েছে বলা শক্ত। কিন্তু থাক, যথেষ্ট হয়েছে। চলো এবার।

আবার বিষণ্ণ হয়ে গেছে মন।

বিশু নন্দীর দল মার খেয়েছে, মেরেছেও ওদের। একটা শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেল। কিন্তু কেন এই মারামারি? কেন এই নিজেদের মধ্যে এমন রুচিহীন বিরোধ? সবাই তো দেশকর্মী, সবাই তো দেশের জন্যে প্রাণ দিতেই এগিয়ে এসেছে। লক্ষ্য এক, পথও এক। তবু এই বিভেদ কেন? কর্মী হিসেবে বিশু নন্দী কোনোদিক থেকেই রোহিণীর চাইতে খাটো নয়, বরং অনেক বড়। অনুশীলন দলের আরো দু-চারজন যাদের সে চিনত, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই শ্রদ্ধা আছে তার। শহরের বহু সেরা ছেলে ওদের দলে, রঞ্জনদের মতোই তারা খাঁটি আর অক্লান্ত কর্মী। তবু কেন এই অশোভন মারামারি? একই পরাধীন দেশের মানুষ, একই শোষণযন্ত্রে শোষিত হচ্ছে সবাই, একই কাঁটামারা বুটের নিচে দলে যাচ্ছে সকলের হৃৎপিণ্ড। আর তার প্রতিকারের জন্যে একই পথ সকলে বেছে নিয়েছে। তবে?

প্রতি পদে পদে বিরোধ। সেই বইতে পড়া অদ্ভুত মানুষটিকে মনে পড়ে। জাতি-বর্ণ-অর্থগৌরবহীন মানুষের রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্র কি গড়ে উঠেছিল এম্‌নি দলাদলি আর বিভেদের মধ্যে দিয়েই? কে জানে।

বাড়ি ফেরার পথে পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা ভাই, এ কি ভালো?

পরিমল জবাব দিলে, ভালো মন্দ জানি না, এই নিয়ম।

—নিয়ম! নিয়ম কেন?

—তা ছাড়া আর কী? আমরা ভালো ছেলে রিক্রুট করব, তাকে ওরা ভাঙিয়ে নেবে? আর আমরা সয়ে যাব সেটা?

—তাই বলে নিজেদের মধ্যে এভাবে মারামারি করতে হবে?

স্বরে বেদনা প্রকাশ পেল তার।

—মারামারি তো ভালো, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায় কোথাও কোথাও। চট্টগ্রামে তো মেরেই ফেলল একটি ছেলেকে।

—সর্বনাশ!—রঞ্জন শিউরে উঠল।

—কেন, ভয় করছে নাকি বিশু নন্দীকে?—পরিমল খোঁচা দিয়ে হাসল।

—না, বিশু নন্দীকে ভয় নয়—রঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেল: নিজেদের জন্যেই ভয় করছে। এইভাবে মারামারি করতে থাকলে সব উৎসাহ যে এখানেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধটা হবে কেমন করে?

—সে ভাবনা দাদারা ভাববেন, আমরা নই।

তা বটে, দাদারা ভাববেন! এতদিনে এ সত্যটা অন্তত আবিষ্কার করেছে যে তাদের ভাববার জন্যে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই আর—সে দায়িত্ব দাদারাই মাথায় তুলে নিয়েছেন। তারা শুধুই সৈনিক, ভাববার দায় তাদের নয়, তাদের কর্তব্য শুধু

আদেশ পালন করে যাওয়া। চিঠি দিয়ে এসো, অমুকের সঙ্গে দেখা করে অমুক খবরটা দিয়ে এসো, সাইকেল চুরি করো, বন্দুক চুরি করো, আর এক-আধটা বড় কাজ—যেমন হালদারের ওপরে এক হাত নেওয়া—এ জাতীয় সুযোগ কখনো কখনো যদি জুটে যায় তবে তার চাইতে সৌভাগ্যের কথা আর কিছুই নেই।

প্রশ্ন কোরো না, কৌতূহল পোষণ কোরো না মনের মধ্যে। শুধু মন্ত্রগুপ্তি, শুধু আয়রন ডিসিপ্লিন। কিন্তু তবুও প্রশ্ন আসে, নির্বোধ মন জর্জরিত হয় কৌতূহলের তাড়নায়। আর জেগে থাকে অস্বস্তি, অতি তীব্র অস্বস্তি। অস্বীকার করে লাভ নেই, খানিকটা আশাভঙ্গ হয়েছে যেন ? কল্পনা-প্রখর অনুভূতি-স্পন্দিত তার চেতনা; জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল দূরচারী রূপকথার জগতে বন্ধনবিহীন যাত্রার স্বপ্নাতুর সম্ভাবনায়। এলেন অবিনাশবাবু, সেই স্বপ্নে এনে দিলেন আর এক অদেখা সমুদ্রের আলোড়ন। বকুল বনের গন্ধভরা ছায়ার নিচে ঘাসের ওপর বসে অশ্বিনী শুনিয়েছিল 'নিখিলিস্ট্' আর ক্ষুদিরামের গল্প—সে তো আরো আশ্চর্য রূপকথা। তারপর এল তিরিশ সালের বন্যা। সেই বন্যায় মন ভেসে গেল—সেই বন্যা তাকে প্রথম ডাক দিলে সর্বনাশা ভাঙনের অভিসারে, সর্বধ্বংসী একটা বিপুল প্রবাহে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার দুরন্ত প্রেরণায়। আর সেই বন্যারই জীবন্ত-রূপ সে দেখল উনিশশো তিরিশ সালে। উনিশশো তিরিশ সাল। অন্নপূর্ণা ভারতবর্ষে দেখা দিলেন রুধিরাপ্লুতা ছিন্নমস্তারূপিণী হয়ে।

এল পরিমল। শোনালো জ্যোতির্ময় আকাশ-গঙ্গার বাণী—যেখানে রিভলভারের মুখে ছুরির ফলার মতো ধারালো নীল আগুন, যেখানে রক্তের প্রবাহে শতদলের মতো ফুটে আছে শত শহীদের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড, যেখানে বীরের কণ্ঠে বরণের মণি-মালিকার মতো ডাক পাঠাচ্ছে ফাঁসির রশি। সে কি উন্মাদনা, নিজের বুকের ভেতরে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো কী যেন ফেটে পড়তে চায়। টেগরা, বীরেন গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য—আরো, আরো অনেকে। কিন্তু—

কিন্তু কোথায় সে উত্তেজনা ? কোথায় সে কাজের রক্তমাতাল পরিকল্পনা ? শুধু কথা, শুধু সতর্কতা, শুধু দুটো-একটা অস্ত্র আর কিছু অর্থ সংগ্রহের আকুলতা। অথচ কত কাজ তো চোখের সামনেই আছে। গুলি করা যায় ওই টিকটিকির সর্দার বুলডগ্ ধনেশ্বরটাকে, অনায়াসেই তাদের স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় শেষ করে দেওয়া চলে জেলার শাদা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, কিন্তু কিছুই হয়না। যথেষ্ট শক্তি আমাদের নেই, এভাবে আমরা নিজেদের ক্ষতি করতে পারি না। শুধু অতি ধীরে অতি সাবধানে চলা।

চট্টগ্রাম ?

ওদের কথা আলাদা। বেণুদা জবাব দিয়েছিলেন, একেবারেই আলাদা ব্যাপার ওদের। সব দলগুলোকে ওরা একসঙ্গে মিলিয়ে অত বড় কাজে হাত দিতে পেরেছিল।

তা ছাড়া সব বাছা বাছা নেতা ওদের—ওদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা হয় না।

কেন হয় না? ভাবতে চেষ্টা করল রঞ্জন। চট্টগ্রাম যদি মিলতে পেরেছিল, তা হলে আমরাই বা পারি না কেন? কোথায় আমাদের বাধে? অনুশীলনের ওরা তো দেশের শত্রু নয়।

—না, তা নয়। ওরা ওরাই, 'আমরা আমরাই'—সংক্ষেপে রঞ্জনের সংশয়ের জবাব দিলে পরিমল।

—কিন্তু ওরা আমরা কি কখনো একসঙ্গে মিলতে পারব না?

—সে দাদারা বলতে পারবেন।

বাস্তবিক, যা দাদাদের বলা উচিত, তা আমাদের বলতে চেষ্টা করাটা অনধিকার-চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মন খুশি হয় না, অনবরত খুঁতখুঁত করতে থাকে।

—আর এইভাবে মারামারি চালাতে হবে?

—হ্যাঁ, দরকার হলে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল: এ রকম করে চালালে দেশের স্বাধীনতা শুধু স্বপ্নই থাকবে। কোনোদিনই তো আসবে না—আসাতে পারবেও না।

—রঞ্জু!

রঞ্জন চমকে উঠল। তীব্র একটা দৃষ্টি পরিমল ফেলেছে তার মুখের ওপর।

থতমত লাগল: অ্যাঁঃ?

—আমাদের অধিকারের একটা সীমা আছে, তা ছাড়িয়ে যেয়ো না।

ঠিক কথা। রঞ্জন রইল চুপ করে।

পরিমল কঠিনভাবে বললে, ওঁরা যা বলবেন আমরা তাই করব। সমালোচনার স্পর্ধা আমাদের মুখে শোভা পায় না। তা ছাড়া এ বিপ্লববাদের পথ, ছেলেখেলা নয়।

পরিমল আর কোনো কথা বললে না, রঞ্জনও না। বলবার কিছু নেই। কিন্তু সত্যিই কি নেই? আদেশ দাও নেতা, আমরা পালন করে যাব। তোমাদের হুকুমে মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তো সব সময়েই প্রস্তুত আছি। তবু একটিমাত্র জিজ্ঞাসা: এই আত্মবিরোধ, এই দলাদলি—এ কি অনিবার্য?

নাঃ—আর পারা যায় না নিজেকে নিয়ে। বাড়িতে ফিরে ভাবতে লাগল, সত্যিই সে অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যায় মাঝে মাঝে। উত্তেজনার খানিকটা ভাবালুতা নিয়ে এ পথে চলা যাবে না, ভাবতে হবে অনেক, বিচার করতে হবে তার চাইতেও অনেক বেশি। ইচ্ছে হলেই তো চারদিকে বিপ্লবের খানিকটা দাবানল জ্বালিয়ে দেওয়া যায় না। তার জন্যে অস্ত্র চাই, চাই প্রস্তুতি।

নিশ্চয় করুণাদির প্রভাব। করুণাদি সম্পর্কে তার মনে যে স্বাভাবিক দুর্বলতা

আছে এ সব তারি প্রতিক্রিয়া। সন্ধ্যার অন্ধকারে, টোটা চুরি করার উত্তেজনায় বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ স্নায়ু নিয়ে তাঁর চোখে সে জল দেখেছিল। আভাস পেয়েছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনের অতি গভীর একটা দুর্জ্ঞেয় বেদনার, শুনেছিল তাঁর অশ্রুভরা আকৃতি : এ পথ তোমার নয় ভাই—এ তুমি ছেড়ে দাও—

চুলোয় যাক—চুলোয় যাক সমস্ত। অগ্নিদীক্ষা যে নিয়েছে তার আর ফেরবার রাস্তা নেই। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি। নেতার আদেশ। মুক্তি না পাও, মৃত্যুকে বরণ করে নাও।

প্রশ্ন নয়, সংশয়ও না।

করুণাদি ? তাঁর স্নেহ ?

নিজের মনের জন্যেই তোলা থাক—বিপ্লবী রঞ্জনের জন্যে নয়।

এরই দিন তিনেক বাদে বেণুদা ডেকে পাঠালেন।

—শোনো, একটা জরুরি কাজ করতে হবে তোমাকে।

আগ্রহ-ব্যাকুল মুখে তাকিয়ে রইল রঞ্জন। কাজ করতে হবে। একটা কঠিন, দুরূহ, রোমাঞ্চকর কাজ? রক্ত দিয়ে যা চিহ্নিত, জীবনের মূল্য দিয়ে যা সমাপ্ত করা চলে? সমস্ত প্রাণ দোলা খেয়ে উঠল। এই ছোট ছোট কাজের খুঁটিনাটি নয়, যার ভেতর দিয়ে আত্ম-ঘোষণা আর আত্মপ্রতিষ্ঠা করা চলে—দু'হাত ভরে দাও সেই কাজের গৌরবে।

—পারবে কিনা বুঝতে পারছি না—বেণুদা চিন্তিত আর শান্ত জিজ্ঞাসায় ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—পারব, নিশ্চয়ই পারব।

—বেশ, ভালো কথা। একদিনের জন্যে তোমাকে বাইরে যেতে হবে একটু। বাড়ি থেকে যেতে দেবে ?

—তা দেবে।—বিষণ্ণভাবে রঞ্জন হাসল। মা নেই, ঠাকুরমার অবস্থা প্রায় অপ্রকৃতিস্থ ; বাবা যেন দিনের পর দিন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যাচ্ছেন। বেদনাভরা বন্ধন-মুক্তি ঘটে গেছে তার।

—তা হলে আজ সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে একবার রংপুর যেতে হবে তোমাকে। স্টেশনে একটি মেয়ে আসবে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, নামিয়ে নেবে রংপুর স্টেশনে। আর কিছুই করতে হবে না। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করবে, তারপর যে ফেরার ট্রেন পাবে তাইতেই করে চলে আসবে।

—শুধু এই ?

—হ্যাঁ, শুধু এই।—রঞ্জনের আশাহত মুখের চেহারাটা লক্ষ্য করে বেণুদা হাসলেন : তাই বলে কাজটা একেবারে বাজে নয়, অত্যন্ত জরুরি। কিছু জিনিসপত্র যাচ্ছে। পারবে তো ?

রঞ্জন ঘাড় নাড়ল।

—তবে এই নাও টাকা। বেশিই দিলাম। দুখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট করবে।

—সেকেণ্ড ক্লাস?

—হ্যাঁ, সেকেণ্ড ক্লাস।—বেণুদার মুখে আবার মৃদু হাসির রেখা দেখা দিলে: অনেকখানি বাজে খরচের পাট বাঁচাতে হলে কখনো কখনো একটু বেশি খরচ করতে হয়। আচ্ছা, যাও তুমি।

রঞ্জন চলে এল। জরুরি কাজের আশ্বাস মিলেছে বটে, কিন্তু খুশি হয়নি মন। পদ্ধতিটাই খারাপ লাগছে। একটা মেয়ের খবরদারী করা, তাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। তা হোক—নিজের ভিতরে আর সে প্রশ্ন তুলবে না। নিজয়ের সংশয়ের ভারটা যেন নিজের মনের ওপরেই প্রতিদিন চেপে বসছে তার। সুতরাং যথাসম্ভব উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টা করলে সে, একটা বৃহৎ এবং মহৎ কাজের অধিকার লাভের গৌরবে অনুপ্রাণিত হতে চাইল।

স্টেশনে এল একটু আগেই, সাড়ে ছটার সময়। দুখানা টিকিট করে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করতে লাগল। কিন্তু লোকের ভিড়ে বেশিক্ষণ চলা-ফেরা করতে ভালো লাগে না। ধনেশ্বরের টিকটিকিরা ট্রেনগুলোর ওপর কড়া নজর রাখে তাদের।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল প্ল্যাটফর্মের একটা কোণায়। এদিকটা প্রায় অন্ধকার, স্টেশনের নাম লেখা ঝাপ্‌সা আলোটায় বিশেষ কিছু পরিচ্ছন্ন ভাবে চোখে পড়ে না। শুধু একপাশে স্তূপাকার প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে, আর তাদের ভেতর থেকে উঠছে পচা মাছের একটা চিমসে কটু গন্ধ।

পেছন থেকে কে আস্তে স্পর্শ করল তাকে। চমকে উঠল সে, ফিরে দাঁড়ালো নক্ষত্রবেগে।

একটি দশ-বারো বছরের ছোট ছেলে। আস্তে আস্তে বললে, আপনাকে ডাকছে।

—কে?

আঙুল বাড়িয়ে প্যাকিং বাক্সের স্তূপের একদিক দেখিয়ে দিলে ছেলেটি, তারপর চলে গেল জোর পায়ে।

রঞ্জন এগিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে প্রায় মিলিয়ে দিয়ে একটি মেয়ে বসে আছে।

—রঞ্জনবাবু?

—হ্যাঁ, আমি।

—টিকেট করেছেন?

—হুঁ।

—ট্রেন এলে গাড়ির সামনে দাঁড়াবেন। আমি উঠলে তার দু-মিনিট পরে উঠবেন অন্তত। এমন ভাব দেখাবেন না, যেন একসঙ্গে যাচ্ছি আমরা।

—আচ্ছা—

—বেশ, আপনি যান—

রঞ্জন সরে এল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও চিনতে ভুল হয়নি তার। ছায়ামূর্তির মতো দেখা দিয়েই সে ছায়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, পলকের জন্যে যেন ঝলসে উঠেছিল একখানা খাপখোলা তলোয়ার। গলার স্বরে তীক্ষ্ণ তেজস্বিতা, যেন বেণুদার প্রতিধ্বনি। সুতপা। সুতপা।

করুণাদিকে চেনে, সংঘমিত্রা তার মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই মেয়ে? এক লহমায় দেখলেই চেনা যায়, এ আগুন, এ চট্টগ্রামের প্রীতিলতার দলের। বুড়িবালামের তীরে দাঁড়িয়ে যদি পুলিসের গুলির সামনে কেউ বুক পেতে দিতে পারে তা হলে তা এই মেয়ে পারবে, মিতা নয়। কিন্তু এর পাশে দাঁড়ানো। না—সে জোর নেই তার।

—ঠন্-ঠন্-ঠনা ঠন্—

ঘণ্টা পড়ল—প্রথম ঘণ্টা। প্ল্যাটফর্মের ওপর তেমনি সতর্ক পদচারণা আর মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা ধনেশ্বরের লোক কোথাও থাবা গেড়ে অপেক্ষা করছে কিনা। সুতপা। হাতের শেষ আংটি তার মায়ের স্মৃতিচিহ্নও অসংকোচে পার্টির কাজে বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও তো দেখা দিলে না। নিজের জন্যে কিছু রাখবার নেই, একটুকুও না। অথচ মিতা। পাশাপাশি একটা অবাঞ্ছিত তুলনাবোধ দেখা দিয়ে ভাবনাকে হঠাৎ বিতৃষ্ণ করে তুলল। মিতার সারা গায়ে ঝলমল করছে গয়না, দামী শাড়ি আর সুগন্ধে সে অপরূপ হয়ে আছে। কতটুকু তার ত্যাগ? দেশের সম্পর্কে খানিকটা সৌখিন সহানুভূতি ছাড়া—

অশ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। অশ্রদ্ধা এল মিতার এপর, এল নিজের সম্পর্কেও। মিতা সুন্দর, মিতা অপরূপ, হঠাৎ প্রাণ পেয়ে ওঠা একটা ফেয়ারি টেল্স। আবেশ-জাগানো গন্ধ তার চুলে, তার নিঃশ্বাসে। তবু—

মুহূর্তের আচ্ছন্নতায় যেন বিবশ হয়ে আসতে চাইল শরীর। কিন্তু প্রবলভাবে একটা ধিক্কার দিয়ে নিজেকে সজাগ করে তুলল সে। হোক সুন্দর, তবু সে একটা পুতুলের চাইতে তো বেশি নয়। দোলাক মনকে, কিন্তু বিপ্লবীর জীবনে পথ চলার প্রেরণা তো সে দেয় না। সে পরিমলের বোন, তাই তার একমাত্র গৌরব।

—'প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী'—

নজরুলের লাইন। কিন্তু সে বিজয়লক্ষ্মী কি মিতা? চোখে ঘুম ঘনিয়ে আসে মনে হয়, ওর কথা ভাবতে ইচ্ছে করে সন্ধ্যার আকাশের মোহ জাগানো 'সাতভাই চম্পা'র দিকে

তাকিয়ে তাকিয়ে। না, কোনো দিন মিতা তরবারি তুলে দেবে না হাতে। কপালে রক্তচন্দন আর মাথায় উষ্ণীষ পরিয়ে তাকে বিদায় দেবে না কোনো জালালাবাদ অথবা বুড়িবালামের কঠিন অভিযাত্রায়। না, মিতাকে তার ঘৃণা করা উচিত। ড্র্যাগন-দ্বীপের বন্দিনী রাজকন্যা আর বেঁচে নেই—একটা শব ছাড়া সে আর কিছুই নয়।

তবে?

—ঠন্-ঠন্-ঠনাঠ্-ঠন্-ন্-ন্—

দু নম্বর ঘণ্টি। চকিত হয়ে উঠল। দূরে সার্চলাইটের আলো ঝলমলিয়ে উঠেছে, কাঞ্চননদীর ব্রীজে গুম গুম শব্দ। ট্রেন এসে পড়ল।

ঘটাং ঘট্। লাইন ক্লিয়ার। ঝড়ের মতো শব্দ করে আমিনগাঁ-এলাহাবাদ প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়ালো।

সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট খুঁজে পেতে দেরি হল না। সামনে যেটা সেটাতে কিছু লোক আছে। আর একটু এগিয়ে আর একখানা—একেবারে খালি।

—সরুন, উঠতে দিন—

মেয়েলি গলার ধমক। সরে পাশের ইণ্টার ক্লাসটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে রঞ্জন। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখল না—দেখবার প্রয়োজন নেই। নিরাসক্তভাবে সে অপেক্ষা করতে লাগল, যেন গাড়িটার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই তার।

অল্প স্টপেজ। গণ্ডগোলে আর কুলির চিৎকারে কোথা দিয়ে চলে গেল সময়। গার্ডের বাঁশি বাজল. সাড়া দিলে ইঞ্জিনের হুইশিল, গাড়ি নড়ল। চল্তি গাড়িটার হাতল ধরে উঠে পড়ল রঞ্জন।

—আসুন, বসুন—

সুতপা ডাকল।

এবারে পরিষ্কার দেখা গেল খাপখোলা তলোয়ারকে। ছোট কামরা, গাড়িতে আর দ্বিতীয় যাত্রী নেই। মুখোমুখি দুখানা লম্বা সিট। ওদিকের সিটে গাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে সুতপা। পা তুলে দিয়েছে বেঞ্চির ওপরে, একখানা শাদা আলোয়ানে ঢেকে নিয়েছে কোমর পর্যন্ত। জানালার ওপর বাহু রেখে কপালের পাশে হাত দিয়ে বসেছে নিশ্চিন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে।

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসে পড়ুন।—সুতপা হাসল: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি পাহারা দিচ্ছেন নাকি?

—না তা নয়—সপ্রতিভ জবাব দিয়ে সে বসে পড়ল।

মেয়েদের সম্পর্কে এমনিতেই তার সংকোচ বেশি, আর মিতার স্পর্শ সে সংকোচ আরো বেশি বাড়িয়ে তুলেছে আজকাল। কেমন চোখ তুলে তাকাতে পারে না মেয়েদের

দিকে, ভয় করে। জাতটাকে সে বুঝতে পারে না, এদের সম্পর্কে রয়েছে তার একটা সভয় জিজ্ঞাসা। হালে মিতা তার এই ভয়টাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

চোরা-চাহনি তুলে একবার দেখে নিলে স্বতপাকে। জানালার বাইরে চেয়ে আছে, দেখছে পেছনে ছিটকে ছিটকে সরে যাওয়া শহরের আলোগুলোকে। চিন্তামগ্ন একটা নিবিষ্ট ভঙ্গি তার। এখানে বসবার সঙ্গে সঙ্গে যেন হারিয়ে ফেলেছে বাইরের পরিবেশকে, তলিয়ে গেছে নিজের একটা অতলস্পর্শ গভীরতার আড়ালে। যেন চারিদিকে রচনা করেছে একটা কঠিন ব্যূহ, একটা দুর্ভেদ্য আবরণ। সে আবরণ ভাঙা যায় না, তার ভেতর দিয়ে ওর কাছে এগোবার মতো এতটুকু পথও খোলা নেই।

চোরাদৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখতে লাগল রঞ্জন।

বয়েসে ওদের চাইতে বেশ বড়ই হবে। ঠিক ফর্সা নয়, ঝকঝকে মাজা রঙ। চোখা নাক, টানা টানা চোখ; পাতলা ঠোঁট দুটো শক্ত ভাবে চাপা, হেলানো গ্রীবায় যেন একটা গর্বিত ভঙ্গি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তার। মাথার চুল বেশি বড় নয়, তাও রুক্ষ, খোঁপাটা ভেঙে কাঁধের উপর আলুথালু হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে। সম্পূর্ণ নিরাভরণ, হাতে গাছ কয়েক রূপোর চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু আভরণ নাই থাক, মনে হল, হয়তো কল্পনার খেয়ালেই মনে হল: স্বতপার কৃশ মসৃণ শরীরে একটা তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্য ঝকঝক করছে। মেয়েদের মধ্যে এ উজ্জ্বলতা সে কোনো দিন দেখেনি। চট্টগ্রামের বিপ্লবী মেয়েদের কথা জেনেছে, জেনেছে কুমিল্লার সেই দুটি মেয়ের কাহিনী: যাদের রিভলভারের গুলিতে শাদা সাহেব খাবি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। ওই সব মেয়েদের সম্পর্কে একটা বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা জেগেছিল তার, স্বতপাকে দেখে যেন সে জিজ্ঞাসার উত্তর মিলল।

তলোয়ার? তার চাইতে আরো বেশি। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ভেরা ফিগনার। মাদাম হালিদা এদিব। আরো কে আছে?

—ঝরাং ঝরাং—

ট্রেন দ্রুত চলেছে, শুরু হয়েছে ঝাঁকুনি। মিটারগেজের দুল্‌কি-চলা গাড়ি। স্বতপা দৃষ্টি ফেরালো, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

—শুনুন?

স্বতপা ডাকছে।

—কিছু বলছিলেন?

একটা ছোট স্যুটকেস রঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বতপা বললে, এটা রাখুন আপনার কাছে। দরকারী জিনিস আছে। ধরতে এলে কিন্তু ওটা নিয়েই লাফিয়ে পড়তে হবে ট্রেন থেকে—অল্প হাসল স্বতপা।

আবার চুপচাপ। কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। সুতপা কী ভাবছে সেই জানে, অন্তত ইচ্ছে করেই ওদিক থেকে নিজের মনোযোগ সরিয়ে রেখেছে। ট্রেন চলেছে অন্ধকারের সমুদ্রে একটা অতিকায় জন্তুর মতো সাঁতার দিয়ে ; এক-আধটা আলোর টুকরো ফেনার ফুলের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কী আছে সুটকেসের মধ্যে ? বোমা ? রিভলভার ? নাইট্রিক অ্যাসিড্ ?

—শুনুন ?

আবার ডাকল সুতপা। আবার চকিতে মুখ ফেরালো রঞ্জন।

—শুনেছি খুব ভালো কবিতা লেখেন আপনি।

রাঙা হয়ে গেল রঞ্জন : কে বলেছে ?

—সবাই। আপনি জানেন না, আপনার বৈপ্লবিক কবিখ্যাতি কী ভয়ানক ছড়িয়ে পড়েছে।

বৈপ্লবিক কবিখ্যাতি। কথাটা যেন ঠাট্টার মতো শোনালো। সন্দিগ্ধ ভাবে সুতপার মুখের চেহারাটা একবার লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলে সে। মিতার মুখে যা সত্যিকারের খ্যাতির মতো মনকে প্রসন্ন করে তুলত, সুতপার কাছে তা বিদ্রূপের মতো লাগে। দুজনের জাত আলাদা। একজন মুগ্ধ, একজন প্রখর ; একজনকে মানায় ছবির মতো বাগানটায়, যেখানে সে ছবির মতোই প্রাণহীন। আর একজনকে দেখা যায় কোনো ঝোড়ো রাত্রিতে—কোনো তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের তলোয়ারের মতো খর-আলোয়। কিন্তু—

সুতপা হেসে উঠল : লজ্জা পেলেন তো। কিন্তু বিপ্লবীর তো এভাবে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়।—হাসিটা মাঝখানেই থেমে গেল, কথার সুরে এল গভীরতা : সমস্ত সংসারকে তুচ্ছ করে তার মাথা তুলে দাঁড়ানো উচিত। জয় করা উচিত ভয়কে, দুর্বলতাকে। লজ্জাটা তার অলঙ্কার নয়, অসম্মান।

রঞ্জন হঠাৎ দৃষ্টিটা তুলে ধরল সোজাভাবে। শিল্পীর অহমিকায় ঘা লেগেছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার সংশয় আছে, কিন্তু মেয়েদের উপদেশে তার শ্রদ্ধা নেই। তা ছাড়া সুতপা করুণাদি নয়—একটা অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ হল চকিতের মধ্যে।

—কিন্তু নিজেকে বেশি করে প্রচার করাই কি খুব বড় জিনিস ? জোর এক—জোরের ভানটা আলাদা।

সুতপার মুখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বেশ বোঝা গেল, ছেলেটিকে আরো ছেলেমানুষ বলে আশা করেছিল সে। যেন কথা বলবার ঝোঁক চেপে গেল রঞ্জনের। সতেজ আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবে বলে গেল : জোর যেদিন আসবে সেদিন নিজেকে প্রচার করব বই কি। কিন্তু যতদিন তা না আসে ততদিন অপেক্ষা করাই কি ভালো নয় ?

—বেশ, অপেক্ষা করুন।—স্থতপা যেন পরাভূত বোধ করলে নিজেকে : কিন্তু সময় যখন আসবে তখন যেন সংকোচে নিজেকে আড়াল করে রাখবেন না।

—নিশ্চয়ই রাখব না।

স্থতপা এবার স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে হাসল : কবির সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। একদিন তর্ক করব আপনার সঙ্গে। কিন্তু জানেন, আমিও একসময়ে কবিতা লিখতাম।

—সত্যি ? এতক্ষণের সংশয় কাটিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল রঞ্জন : তবে লেখেন না কেন আজকাল ?

—লিখি না কেন ? বাঃ, আপনারা লিখতে দিলেন কই ?

—মানে ?

—মানে ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় হঠাৎ নিজের প্রতিভার ওপরে শ্রদ্ধা জেগে গেল। একগাদা কবিতা পাঠালাম নানা মাসিক পত্রিকায়। কিছু ফেরত এল, কিছু এল না।

—সেগুলো তবে ছাপা হল বুঝি ?

—না—শান্ত হাসিতে স্থতপার মুখ আরো বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল : গেল সম্পাদকের বাজে-কাগজের ঝুড়িতে। ফেরত দেবার দরকারও বোধ করলেন না তাঁরা।

—অন্যায়, বাস্তবিক।

স্থতপা কিন্তু সহানুভূতিটা গায়ে মাখল না : অন্যায় কিছু হয়নি। সম্পাদকেরা বুদ্ধিমান লোক, আমার কবিতা সম্বন্ধে তাঁরা স্নেহে অন্ধ ছিলেন না। অতএব কবিতা-গুলো তাদের যোগ্য মর্যাদাই পেয়েছিল। সে যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আর। পৌঁছতে তো এখনো ঘণ্টা তিনেক দেরি আছে, ভালো করে শুয়ে পড়ুন।

রঞ্জন বুঝতে পারল। যত সহজে কথাটা আরম্ভ করেছিল স্থতপা, তত সহজেই সেটাকে সে থামিয়ে দিতে চায়। বিপ্লবিনী স্থতপা, তার নিরাভরণ দেহের চারদিকে যেন বিকীর্ণ করে রেখেছে একটা আগ্নেয়বৃত্ত ; সে বৃত্তের থেকে চকিতের জন্য বাইরে এসে পড়েছিল সহজ মানুষের কাছাকাছি, তাই যেন আবার নিজেকে সংকুচিত করে নিলে সে। যেন থাবা দিয়ে থামিয়ে দিলে অন্তরঙ্গতার স্বাভাবিক অগ্রগতিটাকে।

—আমার ঘুম আসবে না এখন, আপনি শুয়ে পড়ুন।

—আচ্ছা—

আর একটি কথাও বললে না স্থতপা। চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর চোখের ওপর হাত দিয়ে আড়াল করে ধরলে আলোটাকে।

রঞ্জন প্রশ্ন করলে, চোখে লাগছে ? নিবিয়ে দেব আলোটা ?

—না, না—প্রায় আর্তস্বরে কথাটা বললে স্থতপা। তীব্র সন্ধানী চোখে তাকাল ওর দিকে, প্রায় আধখানা উঠে বসল ক্ষিপ্রগতিতে। তারপরেই কোমল হয়ে এল দৃষ্টি, স্নিগ্ধ

হাসির রেখা দেখা দিলে ঠোঁটের কোণায়। না, ভুল হয়নি, একেবারে ছেলেমানুষই বটে।

—দরকার হলে নেবাতে পারেন—মৃদুস্বরে জবাব দিয়ে এবারে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু আলো নেবাল না রঞ্জন। তার চেতনা তখন ছড়িয়ে পড়েছে বাইরের দিকে—প্রবাহিত অন্ধকারের স্রোতের মধ্যে। হঠাৎ মনে একটা নতুন প্রশ্ন জেগেছে। আলো নেবাবার কথায় অমন করে চমকে উঠল কেন সুতপা? বিপ্লবী মেয়ে, আগুনের মতো ধারালো মেয়ে, সে খালি খালি অন্ধকারকে ভয় পায় কেন?

সুতপার সঙ্গে পরিচয়টা হল এই ভাবেই। কিন্তু পরিণতি যা ঘটল তা অভাবনীয়।

একটু একটু করে কী ভাবে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল সেটা মনে পড়ে না। কিন্তু একটা জিনিস বেশ মনে আছে, দেখা হলেই ঠোকাঠুকি বাধত। ওকে খোঁচা দিয়ে একটা আশ্চর্য কৌতুক বোধ করত সুতপা।

—কবিরা ভয়ঙ্কর মিথ্যেবাদী।

ফ্যাঁচ করে উঠল রঞ্জন: কিসে বুঝলেন?

অত সাজিয়ে কথা বলা দেখে। ছন্দ দিয়ে যারা কথা গুছিয়ে তোলে, সত্যের চাইতে গোছানোর দিকেই তাদের নজর থাকে বেশি। অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধার রাত্তিরে তারা পূর্ণিমা নিয়ে কবিতা লেখে।

—আপনার তো হিংসে হবেই। সম্পাদকেরা লেখা ফেরত দিয়েছে কিনা।

সুতপা হেসে উঠত। ধারালো ঝকঝকে হাসি।

—তর্ক করতে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ? এটা বে-আইনি।

—বা রে, আপনি যা-তা বলবেন তাই বলে?

আর একদিন।

সুতপা বলে বসল, আপনি কয় মণ ওজন তুলতে পারেন? বিশ মণ?

—পাগল নাকি? কোনো মানুষে তা পারে।

—আপনি পারেন—কবিরা নিশ্চয় পারে।

আক্রমণের গতিটা বুঝতে না পেরে বিস্মিতদৃষ্টিতে রঞ্জন তাকিয়ে রইল: তার মানে?

—মানে, পরিমল এসেছিল।

—তবু কিছু বোঝা গেল না।

—বোঝা গেল না, না?—মুখ টিপে টিপে তীক্ষ্ণ হাসি হাসল সুতপা: পরিমল এসে একেবারে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। বললে, রঞ্জু যা একটা কবিতা লিখেছে তা একেবারে প্রলয়ঙ্কর।

মনে মনে পরিমলের ওপর অত্যন্ত চটে গিয়ে বিব্রতমুখে রঞ্জন বললে, যাঃ।

—যাঃ ? তবে এ লাইনগুলো কার ?

'হিমালয় ধরে দেব নাড়াচাড়া, সাগরে তুলব ঘোর তুফান ?'

রঞ্জু ততক্ষণে রক্তবর্ণ।

স্তপা সকৌতুকে বললে, হিমালয় ধরে যে নাড়াচাড়া দিতে চায় সে বিশ-পঁচিশ মণ ওজন তুলতে পারবে না ?

—বাঃ, ওটা যে কবিতা।

—ওই জন্তেই তো বলছিলাম কবিরা মিথ্যেবাদী।

—কী আশ্চর্য, আপনি—মানে—কী আশ্চর্য—অস্বস্তির আর সীমা রইল না। এমন ভাবে যে লোক কবিতার ব্যাখ্যা করে তার সঙ্গে তর্ক চলবে কী উপায়ে। একেবারেই অরসিকেষু।

তবু তর্ক চলত। রাগ হয়ে যেত, ভাল লাগত তবু। মিতা নয়, করুণাদি নয়—এ একেবারে আলাদা জাতের মেয়ে। মিতার কাছে গেলে কেমন নার্ভাস হয়ে যেতে হয়, করুণাদির প্রভাব মনকে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে ফেলে। কিন্তু স্তপার কাছে এক ধরনের সমধর্মিতা মেলে—কোথায় যেন খুঁজে পাওয়া যায় মানসিক সংযোগ।

কিন্তু একটা জিনিস মাঝে মাঝে ভারী খারাপ লাগে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় স্তপা। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। মুখের ওপর স্তব্ধ মেঘাচ্ছন্নতার মতো কী একটা আসে ঘনিয়ে, চোখ দুটো কোথায় যেন তলিয়ে যায় তার। মনে হয় আপাতত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে হারিয়ে গেছে কোনো একটা অতলান্ত সমুদ্রের গভীরে, সরে গেছে কোনো এক দুর্লক্ষ্য নীহারিকার আলোক-লোকে। মুখের একপাশে পড়া লণ্ঠনের আলোয় কেমন অসমাপ্ত, খণ্ডিত দেখাচ্ছে তাকে—তার সম্পূর্ণ সত্তাটা চলে গেছে তার বোধের বাইরে, তার বিচারের সীমারেখা পার হয়ে।

আর তখনি উঠে পড়ে সে। তখনি মনে পড়ে স্তপার মুহূর্তগুলোতে এখানে তার প্রবেশ নিষেধ—সে একান্তভাবে অনধিকারী। বলে, আচ্ছা তবে আমি আজ চলি—

স্তপা জবাব দেয় না—শুধু মাথা নাড়ে। নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যায় রঞ্জন, বুঝতে পারে না যে এত উজ্জ্বল এত সহজ—হঠাৎ তার ভেতরে অমনভাবে কিসের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। কোনখান থেকে আসে রাহু—সূর্যের আলোকে আড়াল করে দেয় একটা কালো আবরণ বিছিয়ে দিয়ে ?

মন এলোমেলো ভাবনার জাল বুনতে চায়।

কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল একদিন।

স্তপা একটা বই পড়তে চেয়েছিল ওর কাছে। বইটা যোগাড় করে নিয়ে এল

হুপুরের দিকে।

রোদে ভরা বাড়িটায় স্তব্ধতা। স্থতপার দাদা অবনী রায় অফিসে বেরিয়ে গেছেন। অবনী ওদের দলের উৎসাহী কর্মী। বাড়িতে এক বিধবা মাসী থাকেন, তিনি কিছু দেখেও দেখেন না। তাই নানা কারণে এ বাড়িতেই জরুরি সভাসমিতিগুলো বসত।

মাসিমা বারান্দায় বসে টাকুতে পৈতে কাটছিলেন। রঞ্জনকে দেখে বললেন, খুকুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? ওর তো জর হয়েছে।

—জর? কবে থেকে?

—কাল রাত্তির থেকে। খুব জর এসেছে।

—তাই নাকি?—রঞ্জন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল: একটা বই দিতে এসেছিলাম যে—

—যাও না, শুয়ে আছে ও ঘরে—। যদি জেগে থাকে দেখা করে যাও।

সাবধানে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল সে, আস্তে ধাক্কা দিয়ে খুলল ভেজানো দরজাটা।

বালিশের ওপর রুক্ষ চুলগুলো মেলে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে স্থতপা। এক হাতে কপালটা ঢাকা, আর একটা নিরাভরণ বাহু শিথিলভাবে এলিয়ে দিয়েছে পাশে। কোমর অবধি টানা চাদরটা বিস্রস্তভাবে পড়ে আছে—একটা আশ্চর্য করুণতা যেন ঘিরে ধরেছে তার রোগশয্যাকে। তলোয়ারের মতো ধারালো মেয়েটিকে কী অসহায় বলে বোধ হচ্ছে, কী অবিশ্বাস্য দেখাচ্ছে এখন এই ক্লান্ত আত্মনিবেদনের ভঙ্গিটা। তেমনি সাবধানেই ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু সামান্য একটু শব্দ হল পায়ের চটিটায়। আর চোখ মেলে তাকালো স্থতপা। জরের ধমকে টকটকে লাল দুটো চোখ।

—কে?—দুর্বল গলায় ডাক এল।

—আমি রঞ্জন।

—ওঃ, আসুন।

—নাঃ, আপনি অসুস্থ। আজ আর বিরক্ত করব না। এই বইটা রেখে চলে যাচ্ছি।

—না—না, যাবেন না—হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনায় স্থতপা যেন বিছানা থেকে আধখানা উঠে বসতে চাইল: আপনি যাবেন না। আজকে আপনাকে আমার ভয়ঙ্কর দরকার।

জরতপ্ত চোখের দৃষ্টি আর স্বরের উত্তেজনায় যেন চমক লাগল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে।

—আসুন—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো রঞ্জন এগিয়ে এল।

—বসুন।

একটা টুল টেনে নিয়ে রঞ্জু দ্বিধাভরে বসল। বললে, আপনি অসুস্থ, এ অবস্থায়

আপনাকে বিব্রত করা—

—না, না। স্বতপা মাথা নাড়ল : আমি আপনাকে খুঁজছিলুম।

—কেন খুঁজছিলেন আমাকে ?

—জানেন, আমি আর বাঁচব না।

রঞ্জু সভয়ে বললে, ছিঃ, ছিঃ, এসব কী কথা বলছেন আপনি। জ্বর হয়েছে, দু-দিন পরেই ছেড়ে যাবে।

—না, যাবে না।—স্বতপার আরক্ত চোখ দিয়ে আগুনের আভার মতো জ্বরের উত্তাপ ঠিকরে পড়তে লাগল : আমি আর বাঁচব না।

ভয় করতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল স্বতপার কপালে একটুখানি হাত বুলিয়ে দেয় সে, জলের পটি লাগিয়ে দেয় একটা। কিন্তু অগ্নিকন্যাকে ছোঁবার শক্তি নেই, ভয়ে জমাট হয়ে বসে রইল সে।

ফিস্ ফিস্ করে স্বতপা বললে, আপনি কবি, আপনি লেখক। আমি মরে গেলে আপনি একটা গল্প লিখবেন ?

—গল্প ?

জ্বরের ঘোরে স্বতপার স্বর কাঁপতে লাগল : হাঁ, গল্প। বলুন লিখবেন আপনি ?

বিপন্ন মুখে রঞ্জন বললে, ওসব থাক এখন। পরে আর একদিন হবে না হয়।

—না, না, আর একদিন নয়। আর কোনোদিন হয়তো সুযোগই ঘটবে না। বলুন, আপনি লিখবেন এ গল্প ?

রঞ্জন হাল ছেড়ে দিলে। বিশীর্ণ স্বরে বললে, কী গল্প ?

জ্বরতপ্ত গলায় পাগলের মতো যেন প্রলাপ বকে গেল স্বতপা। শুনতে শুনতে সমস্ত শরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রেমের গল্প। ভাবতে পারে কেউ, স্বতপা বলছে প্রেমের গল্প। উজ্জ্বল তলোয়ারের ধারালো ফলা মুহূর্তে কোমল আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে রজনীগন্ধার বৃন্তের মতো। মশালের মুখে আগুন জ্বলছে না, ফুলের বুকে টলোমলো করছে ভোরের শিশির।

এ প্রলাপ শোনা উচিত নয়, উঠে যাওয়া উচিত এখান থেকে। এখনি, এই মুহূর্তেই। একটা নিষিদ্ধ অন্তঃপুরে ঢোকবার অনুভূতি হচ্ছে। ধক্ ধক্ করে আওয়াজ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে, গরম হয়ে উঠেছে কান দুটো। স্বতপার আগুন-ঝরা অমানুষিক রক্ত-চোখ দুটোর দিকে চাইতে পারল না সে, বসে রইল নত মস্তকে।

সেই পুরনো, বহু পুরনো গল্প। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। একসঙ্গে তারা কলেজে পড়ত, একসঙ্গে তারা আলোচনা করত, একসঙ্গে চা-ও খেত মাঝে মাঝে। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই এল প্রেম।

তারও পর একদিন যখন নদীর ওপারে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, বালির চরে কাশফুলগুলোকে যখন শেষ আলোর একরাশ সোনার মতো মনে হচ্ছে, চারদিক নির্জনতার শান্তিতে তলিয়ে আছে, সেই দুর্বল মুহূর্তের অবকাশে ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরল।

ঘাসবন থেকে সাপে ছোবল মারল যেন। হাত ছিনিয়ে সরে গেল মেয়েটি : না—না।

—না কেন ? ছেলেটি আহত হয়ে বললে, তুমি তো আমাকে—

—না, না।—মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল।

—এর মানে ?

—জানতে চেয়ো না। অসহায় স্বরে মেয়েটি বললে : তুমি বুঝবে না।

কঠোর হয়ে উঠল ছেলেটির মুখ : তা হলে কী তুমি আর কাউকে ?

দু হাতে মুখ ঢেকে বললে, না, তা নয়।

—তবে কি আমরা বিপ্লবী, সেই জন্যেই ? কিন্তু মৃত্যুর পথেও যদি আমরা পাশাপাশি চলতে পারি, তার চেয়ে বড় আর কী আছে ?

—না, ওসব কিছুই নয়।

ছেলেটি অধীর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল : বলো, সব খুলে বলো আমাকে।

—আমি পারবো না।—কান্নার মধ্যে জবাব এল মেয়েটির।

—আচ্ছা বেশ—ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারে মেয়েটিই তার হাত চেপে ধরল। চোখের জল মুছে ফেলে অদ্ভুত স্বরে বলল, তবে শোনো। আমি বিবাহিত।

—বিবাহিত। ছেলেটি চমকে উঠল : কই জানতাম না তো। এ কথা তো বলোনি।

—বলতে পারিনি।—মৃতকণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিলে।

—আমায় ক্ষমা কোরো—আমি জানতাম না।—ছেলেটি চলে যাওয়ার উপক্রম করল।

—না, না, যেয়ো না। যখন অর্ধেকটি শুনেছ, তখন সব কথাই শুনে যাও। তেমনি মৃতস্বরে মেয়েটি বলল, তুমি জানো, আমার স্বামী কে ?

—কী হবে জেনে ?—শ্রান্ত ভাবে ছেলেটি বললে।

—তবু তোমার জানা দরকার। শোনো, আমার স্বামী নীলমাধব।

—নীলমাধব ?

—হ্যাঁ, পাথরের ঠাকুর।

চমকে উঠল ছেলেটি : তুমি কি আমায় ঠাট্টা করছ ?

—না, ঠাট্টা নয়। এর চাইতে বড় সত্যি কথা আমি জীবনে কখনো বলিনি।—ছেলেটির মনে হল কেমন যেন অপরিচিত হয়ে গেছে মেয়েটির গলার স্বর, যেন কোন্ বহুদূর দিগন্তের ওপার থেকে সে কথা কইছে।

—একটা আশ্চর্য কাহিনী শোনো। তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, কিন্তু আমার

জীবনে এ কাহিনী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে আছে। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব নিবেদন করে দিয়ে তিনি ধন্য হতে চেয়েছিলেন। তাই ছেলেবেলায় আমাকেও তিনি নীলমাধবের পায়ে সঁপে দিয়েছেন। আমি দেবদাসী, আমার বিয়ে করবার অধিকার নেই।

আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল যেন। ছেলেটির কণ্ঠ থেকে শুধু অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ বেরুল একটা। দুর্ভেদ্য কঠিন স্তব্ধতায় চারদিক গেল আচ্ছন্ন হয়ে, উঠল অতি তীব্র ঝিঁঝির ডাক, নদীর ওপারে সূর্যের শেষ আলোও মিলিয়ে গেল।

স্তব্ধতা ভেঙে অবরুদ্ধ স্বরে ছেলেটি বললে, বাজে।

—না।

—এ সংস্কার তুমি মানো?

তেমনি বহু দূরের থেকে, যেন এই চর আর নদীর ওপার থেকেই মেয়েটির গলা ভেসে এল: না।

—তা হলে কেন এ সংস্কার ভাঙবে না তুমি?

—পারব না। সে জোর আর আমার নেই—কান্নার চাইতেও মর্মান্তিক বর্ণহীন শীতলতা তার স্বরে: মানতে পারি না, ভাঙতেও পারি না।

—বিপ্লবীর সমস্ত শক্তি দিয়েও নয়?

—উপায় নেই।

মেয়েটিই উঠে দাঁড়ালো এবার—মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল, ছুটে পালিয়ে যেতে চায় সে।

আগুনভরা প্রলাপ জড়ানো-চোখে স্তুতপা গল্প শেষ করল।

মন্ত্রমুগ্ধ রঞ্জন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। যান্ত্রিক স্বরে বলে ফেলল: বেণুদা?

আর তক্ষুনি, সেই মুহূর্তেই স্তুতপা যেন চেতনা লাভ করল। হঠাৎ যেন বিকার কেটে গেছে তার, যেন চকিতে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে।

তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে স্তুতপা চেঁচিয়ে উঠল: যান—যান আপনি—

রঞ্জন আর অপেক্ষা করল না।

পথ দিয়ে চলতে চলতে নিজের চোখ সে কচলালো বার কয়েক। এ সত্যি নয়, এ স্বপ্ন। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেই সাবানের বুদ্বুদের মতো ভেঙে পড়বে এর রঙ।—স্তুতপার নিরাভরণ দীপ্ত দেহে তলোয়ারের ঝলক; তার চারদিকে আগ্নেয়-বৃত্ত। বেণুদা—লোহায় গড়া নিষ্ঠুর মানুষ। ভালোবাসা আর সংস্কারের বেড়ায় বন্দিনী স্তুতপা, শপথ নিয়েছে দাসত্বের শিকল ভাঙবার—অথচ যাকে ভালোবাসে সংস্কার ভেঙে তার কাছে এগিয়ে যাওয়ার জোর নেই তার—জোর নেই স্তুতপার।

তাই কি অত করে সংস্কার ভাঙবার কথাটা বলেছিল সে? শক্ত করে নিতে চাইছিল নিজের দুর্বলতার ভিত্তি? আর—আর এই জন্তেই কি গাড়ির আলো নেবাবার কথায় ভয় পেয়েছিল সে?

একটা অর্থহীন কল-কোলাহলে সমস্ত ভাবনাগুলো যেন একাকার হয়ে গেল।

পনেরো

আরো ছ মাস? ছ মাস, না আরো কম? ঠিক খেয়াল নেই, ভালো করে মনে পড়ে না এতদিন পরে। নানা রঙের দিনগুলি পাখা মেলেছে, উড়ে গেছে ঝড়ের বাতাসে। উনিশশো তিরিশ সালের বন্তা—তেরশো তিরিশ সালের বন্তা। জীবনে বন্তার বেগ এসেছে, এসেছে খরপ্রবাহ।

স্বতপা। একটা রাত্রির আশ্চর্য স্বপ্ন যেন। এখনো ঠিক বোঝা যায় না সেদিন সে-কথাগুলো সে সত্যি সত্যিই শুনেছিল কিনা।

তারপর আর দেখা হয়নি, দেখা করবার সুযোগও ঘটেনি। টাইফয়েড্ থেকে ওঠবার পরে স্বতপা চলে গেছে দেওঘর, সে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল। কিন্তু বেণুদার দিকে আজ-কাল সে তাকায় একটা নতুন প্রশ্ন নিয়ে, তার অর্থ বোধ করতে চায় একটা নতুন জিজ্ঞাসার আলোকে। কেন যেন মনে পড়ে—বহুদিন আগেকার একটা রাত্রির কথা। কবরখানা থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ তাঁর সেই গান: "করুণাময়, মাগি শরণ।" সেই অসহায় বেড়ালের ছানাটাকে খানা থেকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নেওয়া, পাথরের আড়ালে ভেঙে ফুটে ওঠা একটা ফুলের মতো কোমলতা। মনে হয় সেদিনকার সে ব্যবহারের যেন অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে—যেন কী একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া গেছে তার।

আর স্বতপার সে আংটি দেওয়া। সে কি শুধু পার্টির জন্তে সর্বস্ব দেবার আকুলতা? অথবা আরো কিছু আছে তার আড়ালে, আরো কোনো গভীরতর আত্ম-নিবেদন? শুধু আংটি দেওয়া, না সেই সঙ্গে—

নিজের মনকে শাসানি দিলে একবার। এ শুধু অনধিকার চর্চা নয়, পাকামিও বটে। হালে কতগুলো বাংলা উপন্যাস পড়ে এইগুলো আজকাল তাল পাকাচ্ছে তার মগজের মধ্যে। এসব ভুলে যাওয়া উচিত। সৈনিক, শুধু কাজ করো, শুধু নেতার আদেশ পালন করো। যদি ক্লান্ত লাগে, জেনো নিজের দুর্বলতা; যদি কোনো ব্যাপারে সংশয় জাগে, জেনো সে তোমার বুদ্ধির বাইরে।

অনেকদিন কবিতা লেখেনি। আজ আবার কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসল। কিন্তু কিছু আসছে না। দু'লাইন লিখল, কেটে দিলে আবার। একটা নতুন ছন্দ গানের

স্বরের মতো গুনগুনিয়ে উঠছে—

দূর গিরি-সঙ্কট দুর্গম পথরেখা একা পথে শঙ্কিত যাত্রী,
তবু তো উদয়রাগে রঞ্জিত গিরিচূড়া অবসিত দুর্যোগ রাত্রি—

নাঃ—এ শুধু কথা—এতে প্রাণ নেই। শব্দের ঝঙ্কার কানে লাগে, মন দোলায় না। দুর্গম পথে একক যাত্রীর মনেও কি তেমন করে দোলা লাগে না আর?

—March on, march on friend—there calls the martyr's heaven —

ভালো কথা, করুণাদি ডেকেছিলেন। আজকাল করুণাদি যেন মন থেকে সরে গেছেন খানিকটা। সরে গেছেন—না নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বলা শক্ত। কোথায় একটা ব্যবধান এসে যেন আড়াল করে ধরেছে শক্ত হাতে। কার দোষ? রঞ্জনের? বেণুদার বোন কি বিপ্লবীর পথ চলাকে মেনে নিতে পারেননি মন থেকে?

তবু একবার ঘুরে আসা যাক।

বাইরের ঘরে দরজা বন্ধ করে বৈঠক করছিলেন বেণুদা। দাদারা সবাই এসেছেন—এ আলোচনায় ওরা যোগ দিতে পারে না, এটা ওপরতলার ব্যাপার। একটা থমথমে গাম্ভীর্য সকলের মুখে। বুঝতে পারে। চারদিক থেকে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে একটা। সেই ডাকাতিটার পরে পুলিসের তাণ্ডব চলছে অবিরাম, এর মধ্যেই বার তিনেক সার্চ হয়েছে বেণুদার বাড়ি। দলের আট-দশজন ছেলে হাজতে। বেণুদাকে এখনো ধরেনি, বোধ হয় আরো উদ্যোগ আয়োজন করে জাল গুটোবার মতলব আছে ধনেশ্বরের। সবাই সেটা জানে। কাজেই ঘন ঘন জরুরী বৈঠক বসেছে আজকাল। কী করা যাবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। টাকা দরকার—দরকার অর্গানাইজেশনকে আরো শক্ত করা। তারই কোনো প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে বোধ হয়।

বেণুদা বললেন, ভেতরে যাও।

শীতের রোদে স্নান করা সকাল। মিষ্টি, নরম, কবোষ্ণ। বারান্দায় সে রোদ পড়েছে, আর সদ্যোস্নান করা চুল এলিয়ে দিয়ে রোদের দিকে পিঠ করে কী যেন সেলাই করছেন করুণাদি।

—করুণাদি?

—রঞ্জন? এসো—হাসিমুখে অভ্যর্থনা এল।

—আমাকে ডেকেছিলেন?—মাদুরে একপাশে বসে পড়ল।

—হ্যাঁ, ডেকেছিলাম বইকি। পিঠে করেছি কাল রাত্রে, ব্রাহ্মণভোজন না করালে পুণ্য হবে না।

—তাই বেছে বেছে আমাকে বুঝি ব্রাহ্মণ পেলেন?

—তা বইকি। বেশ ছোটখাটো ব্রাহ্মণ—অগস্ত্যের মতো খায় না, কিন্তু খেয়ে খুশি হয়।

রঞ্জন হাসল : পরিমল শুনলে কিন্তু চটে যাবে।

—ওই হতভাগা? করুণাদি সস্নেহে বললেন, ওর কথা আর বোলো না। ওকে ডাকতে হয় না, আপনি এসে জুটে যায়। কাল রাত্রে এসে অর্ধেক সাবাড় করে গেছে।

—বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে? কী বিশ্বাসঘাতক।

—ওই তো। চিনে রাখো কেমন বন্ধু তোমার—হেসে করুণাদি উঠে গেলেন।

রঞ্জন ভাবতে লাগল। এখানে এসে হঠাৎ যেন মনে হল আবার ফিরে পেয়েছে বাড়ির স্নিগ্ধতা, সেখানকার মমতাভরা নিবিড় আশ্রয়—যা ছিল মা বেঁচে থাকা পর্যন্ত। এখন আর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। অসহ্য লাগে ঠাকুরমার কান্না। সমস্তই একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে, দু'মাস থেকে বাবার চিঠিপত্র আসে না, শোনা যায় ইদানীং নাকী যোগসাধনা শুরু করেছেন তিনি।

আজ বড় ভালো লাগল এখানে। আরো ভালো লাগল—অনেকদিন পরে যেন আবার খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছেন করুণাদি। সেই পুরনো হাসি, সেই স্নেহের স্নিগ্ধ উত্তাপ, সকালবেলাকার মিষ্টি নরম রোদের মতো কবোষ্ণ অনুভূতি।

করুণাদি পিঠে নিয়ে এলেন।

—এত?

—খেয়ে নাও।

—পারবো না তো।

—আর দর বাড়াতে হবে না—খেয়ে নাও।—করুণাদি ধমক দিলেন।

খেতে খেতে উঠোনের দিকে তাকালো রঞ্জন। এক কোণে কতগুলো গাঁদা ফুল ফুটেছে—এত রাশি রাশি ফুটেছে যে পাতাগুলোকে পর্যন্ত দেখা যায় না। শিশিরে ভিজে ভিজে ফুলগুলো, সকালের রোদ এখনো সে শিশির শুকিয়ে নিতে পারেনি। কতগুলো পায়রা নিশ্চিন্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে কী যেন। ইঁদারার ধারে একটা পেঁপে গাছ, তিন-চারটে শালিক কিচির-মিচির করছে তার ওপরে।

শান্তি, বিশ্রাম। যেন করুণাদি তাঁর নিজের চারপাশে একটা মধুচক্র রচনা করে রেখেছেন। আর বাইরের ঘর। এর একেবারে বিপরীত। অকৃপণ সূর্যের আলোকে রুদ্ধ করে দিয়ে, এই গাঁদা ফুলে ভরা ভোরের শিশিরকে অস্বীকার করে যেখানে একটা আগ্নেয় পরিবেশ। জটিল তর্ক, কুটিল সমস্যা। সুন্দর স্নেহভরা ঘরের মোহ নয়, ঝড়ের ক্ষ্যাপামিলাগা সমুদ্রের ডাক; পায়রার খুঁটে খুঁটে খুদ খাওয়া নয়, কাঁটার পথ দিয়ে রক্তাক্ত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলা।

—জানো, আমি চলে যাচ্ছি?

গলায় পিঠে আটকে গেল, বেরুল একটা অব্যক্ত শব্দ।

—হ্যাঁ, সত্যিই চলে যাচ্ছি।

রঞ্জন চক্ষের পলকে খাবারের থালা থেকে হাত গুটিয়ে নিলে: যাঃ।

—না, মিথ্যে বলিনি। সকালের নরম রোদে ভারী করুণ আর ক্লান্ত মনে হল করুণাদির চোখ: চলে যেতেই হবে ভাই, থাকতে পারব না।

—কিন্তু কোথায় যাবেন?

—কোথায়? করুণাদি প্রাণহীন একটা নীরক্ত হাসি টেনে আনতে চেষ্টা করলেন ঠোঁটের আগায়: কেন, আমার শ্বশুরবাড়িতে? মেয়েমানুষকে বিয়ে হলে যেখানে যেতে হয় সেখানেই।

তা বটে। এর ওপর যে কোনো প্রশ্নই অবান্তর মনে হয়। কিন্তু এর জন্যে যেন প্রস্তুতি ছিল না বোধের মধ্যে। করুণাদিরও শ্বশুরবাড়ি আছে, যেখানে মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে তাঁকে সংসারের কাজকর্ম করতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে স্বামী-পুত্রের, যেখানে করুণাদি অতি সাধারণ, একেবারেই সাধারণ।

—ওঃ, জানতাম না।—নির্বোধের মতো উচ্চারণ করলে রঞ্জন। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। জ্বলন্ত রৌদ্রের মধ্যে, অতি প্রখর আগুনের কণার মতো বালু-ছড়ানো দিগ্‌বিস্তার মরুভূমির পথ দিয়ে আজ যাত্রা শুরু। ক্লান্ত লাগে মাঝে মাঝে, আশ্রয় আর আশ্বাসের আশায় আকুলি-বিকুলি জাগে মনের মধ্যে। সেই আশ্রয় সে পেয়েছিল করুণাদির মধ্যে, মরুভূমির মধ্যে ছায়ার দাক্ষিণ্য দিয়েছিল এই পান্থ-পাদপ।

—রঞ্জন?

ধরা গলায় করুণাদি ডাকলেন।

চোখ তুলতে পারল না রঞ্জন। ওই গলার স্বর সে চেনে, ওর সঙ্গে তার মনের আড়ালে সেই সূক্ষ্ম অপরাধবোধটা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

—আমি চলে যাচ্ছি ভাই। তোমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু না গিয়ে আর উপায় নেই আমার।

নীরবতা। শিশির-ভেজা গাঁদা ফুলগুলোতে ঝিকঝিক করছে সোনার মতো একটা উজ্জ্বল দীপ্তি। তেমনি ধান খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে পায়রারা।

অবশ স্বরে করুণাদি বললেন, তোমাকে একটা কথা অনেকদিন ধরে বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি। হয়তো আজও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সারাক্ষণ আমার বুক কাঁপে। যে আগুনে সারাক্ষণ আমি জ্বলছি, ভয় করে একদিন সে আগুনে তোমরা জ্বলে না যাও।

সেই পুরনো কথা। সেই দুর্বোধ্য ইঙ্গিত।

রঞ্জন মাথা নত করে বসে রইল। ব্যথিত একটা জিজ্ঞাসা এসেছে গলার কাছে, আকুলতার একটা আবেশ রণরণিয়ে উঠেছে রক্তের গভীরে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায় না, শুধু আচ্ছন্নের মতো থাকতে হয় চুপ করে।

—কাল আমি চলে যাব। হয়তো কোনোদিন আর দেখা হবে না তোমার সঙ্গে।—কান্নায় কেঁপে উঠল করুণাদির গলা: কিন্তু কথাটা মনে রেখো ভাই। সব পথ সকলের জন্যে নয়। পারো তো বেরিয়ে চলে এসো এই আগুনের ভেতর থেকে, বাঁচতে চেষ্টা কোরো গুণীর মতো, শিল্পীর মতো। মরতে পারা সব চেয়ে সহজ কিন্তু মহৎ হয়ে বাঁচতে জানা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন।

বিহ্বলভাবে মাথা নিচু করে তেমনি বসে রঞ্জন। তারপর যখন চোখ তুলল তখন দেখল সামনে করুণাদি নেই। কানে এল ঘরের ভেতর কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অসহায় যন্ত্রণায়।

দু কান ভরে সেই কান্না আর বুক ভরে সেই যন্ত্রণা—সেই দুর্বোধ্য যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে। সকালের সোনার আলো চোখের সামনে কালো হয়ে গেছে তার। সামনে মরুভূমির পথটা ধু ধু করছে—পাদপাদপের ছায়ার চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও।

পরিমল খবর দিলে পরের দিন। করুণাদি চলে গেছেন সকালের ট্রেনে। যাওয়ার আগে আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন রঞ্জনকে, করে গেছেন তার কল্যাণ কামনা।

মাকে হারানোর ব্যথাটা যেন বুকের মধ্যে আবার মোচড় দিয়ে উঠল তার। যাওয়ার সময় কেন সে একবার দেখা করতে পারল না করুণাদির সঙ্গে, নিতে পারল না তাঁর পায়ের ধুলো?

না—কিছু না ওসব। 'একলা চলো রে।' কোনো বন্ধন নেই বিপ্লবীর জীবনে। মোহ তুচ্ছ, অর্থহীন। ঝড়ের গর্জনকে ছাপিয়ে আজ শুধু বিচ্ছেদের হাহাকারই মুখরিত হচ্ছে দিকে দিকে।

'বন্দরের কাল হল শেষ।'

তারও পরের দিন ওদের বাসার সামনে সাইকেলের একটা বেল বাজল ক্রিং ক্রিং করে।

ইয়াদ আলী। ছাই রঙের কোট গায়ে সেই লোকটা।

ব্যঙ্গ-মিশ্রিত একটা কুটিল হাসি হাসলে ইয়াদ আলী: বড়বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এখুনি আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে আই-বি অফিসে।

ঝড়ের হাওয়া উঠল প্রথম।

দুরু দুরু বুকে ঢুকল রঞ্জন। নিজের পা দুটোকে অসাড় বলে মনে হচ্ছে। কপালের দু'পাশে একটা মুমূর্ষু সাপের শেষ বিক্ষোভের মতো পাক খাচ্ছে রগ দুটো, বুকের মধ্যে শব্দ উঠছে রেলের ইঞ্জিনের মতো।

ইয়াদ আলী বললে, বড়বাবু এনেছি।

—হুম্—

যেন চোঙার ভেতর দিয়ে শব্দ বেরুল একটা। সে শব্দে সমস্ত ঘরটা গম্ গম্ করে উঠল।

সামনে মস্ত একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। স্তূপাকার কাগজপত্র, ফাইল। একটা পেতলের অ্যাশট্রের ওপর চুরুট পুড়ছে, ঘরে ভাসছে চুরুটের তীব্র উগ্র গন্ধ। বাঁ হাতের ঠিক পাশেই পড়ে আছে একটা রিভলভার, ধনেশ্বর কী লিখে চলেছে মন দিয়ে।

রঞ্জন দাঁড়িয়ে রইল যেন বলির অপেক্ষায়।

—হুম—

আবার সেই চোঙার আওয়াজ। এতক্ষণে চোখ তুলল গোয়েন্দা সর্দার ধনেশ্বর। প্রখর ভয়ঙ্কর চোখ, তাতে কেমন লালের আভাস। বুলডগের মতো সমস্ত মুখের চেহারা, ভারী মুখের দু'পাশে শিকারী বেড়ালের মতো একজোড়া খাড়া খাড়া গোঁফ ছড়িয়ে আছে। ফর্সা রঙ, ফুলো ফুলো গাল দুটোয় গোলাপী আভা। মুখের ভেতর থেকে ঝলক দিলে দুটো সোনা বাঁধানো দাঁত—তেড়ে কামড়াতে আসছে যেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ধনেশ্বর হাসল। কল্পনা করা যায়, ধনেশ্বর হাসল? তবুও হাসল যে কোনো ভুল নেই। যেন শেয়ালে হাঁস চুরি করে খেয়ে চেটে নিলে ঠোঁটের রক্ত।

বুলডগটা ঘোঁৎ করে বললে, বোসো।—এবার আর চোঙার আওয়াজ নয়, সুতরাং অনুমান করা গেল সে গলার স্বরে কোমলতা আনবারই চেষ্টা করছে।

ভয়ের মধ্যেও কেমন বিস্ময় বোধ হচ্ছে। হঠাৎ এ জাতীয় সমাদরের মানে কী?

—আমি তোমার কাকাবাবু হই।—আবার সস্নেহে ঘোঁৎ করে বললে ধনেশ্বর।

কাকাবাবু! এবার বিস্ময়ের চমকটা রঞ্জন চেষ্টা করেও গোপন করতে পারল না। আম কাঁঠালের মতো কাকাবাবু নামে ব্যাপারটা যে গাছে গাছে ফলে—এটা কিন্তু জানা ছিল না। ধনেশ্বর কাকাবাবু হতে চাইছে! কে জানে ইয়াদ আলীও হয়তো বলবে, আমি তোমার মামা হই। তারপর সাক্ষাৎ যমদূত সামনে আবির্ভূত হয়ে যদি বলে আমি তোমার 'তালুইমশায়' তা হলেও তো আশ্চর্য হওয়ার কারণ থাকবে না।

কিন্তু কাকাবাবুর স্নেহ উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং বসতে হল।

বুলডগ্ কাকাবাবু খামোকা মুখটাকে খানিকটা খুলে আবার ঘোঁৎ করে বন্ধ করে

ফেলল, যেন মশা গিলে নিলে একটা। কেমন থতমত লাগল। পরে অবশ্য লক্ষ্য করে দেখেছিল ওটা ওর মুদ্রাদোষ।

—হ্যাঁ, আমি তোমার কাকাবাবু। তোমার বাবার কাছেই প্রথম এ-এস্‌-আই ছিলাম আমি। ছেলেবেলায় কতবার গেছি তোমাদের ওখানে, তোমরা তখন কত ছোট ছিলে। এই এতটুকু দেখেছি তোমাদের।

আত্মীয়তার রসালাপ মন দিয়ে শুনে যেতে লাগল রঞ্জন। কোনো জবাব দিলে না।

—তোমার মা, আমাদের বৌদি—যেন স্বর্গের দেবী ছিলেন। আহা-হা—ধনেশ্বরের গলায় করুণতার আমেজ লাগল: যখন শুনলাম তিনি আর ইহজগতে নেই, তখন কী যে কষ্ট হল বলবার নয়। ভাবলাম, আহা, এখন এই নাবালক শিশুদের যে কে দেখবে।

প্রায় বলে ফেলছিল—এমন সোনার কাকাবাবু থাকতে ভাবনা কী, কিন্তু কথাটার প্রতিক্রিয়াটা আন্দাজ করতে না পেরে ধনেশ্বরের অনুকরণে রঞ্জনও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে আবেগটাকে সামলে নিলে ধনেশ্বর। তারপর তেমনি করুণ কোমল গলায় বললে, তুমি আমার আপনার লোক, একেবারে ঘরের ছেলে। তাই ভাবছিলাম তোমাকে ডেকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব। কাকাবাবুর কাছে তো লজ্জার কিছু নেই, জবাবগুলো দেবে আশা করি।

কপালের রগ দুটো আবার মোচড় খেয়ে উঠল, আবার ধড়াস করে শব্দ হল বুকের ভেতরে। ঝুলির ভেতরে বেড়াল নড়ে উঠেছে, সেও নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল।

—ইয়াদ মিঞা।—ধনেশ্বর ডাকল।

—স্যার?

—কিছু খাবার আর চায়ের ব্যবস্থা করুন দেখি।

—আমি কিছু খাব না—শুকনো স্বরে রঞ্জন বলতে চেষ্টা করল।

—খাও না, কাকাবাবুর সামনে লজ্জা কী। যান ইয়াদ মিঞা—

—হ্যাঁ স্যার, আনাচ্ছি এক্ষুণি—ইয়াদ আলী বেরিয়ে গেল।

ছাইদানী থেকে চুরুটটা তুলে নিলে ধনেশ্বর। একটা টান দিয়ে খানিক উগ্রগন্ধ ধোঁয়া প্রায় রঞ্জুর মুখের ওপরেই ছড়িয়ে দিলে সে: শহরে আজকাল একদল বদছেলের আমদানী হয়েছে, জানো বোধ হয়।

রঞ্জন আধখানা দৃষ্টিতে দ্বিধাগ্রস্তের মতো একবার তাকালো শুধু।

—এই সব ছেলের—ধনেশ্বরের গলায় এবারে উত্তাপ সঞ্চার হল: মরবার জন্যে পাখনা গজিয়েছে। এদের ধারণা হয়েছে যে এরা দুটো পিস্তল আর চারটে বোমা দিয়ে ইংরেজকে তাড়াতে পারবে। ব্রিটিশ লায়ন অত দুর্বল নয়, ইচ্ছে করলে একদিনে

কামানের মুখে ওরা ভারতবর্ষকে চষে ফেলতে পারে। সমর্থনের জন্যে রঞ্জুর মুখের ওপর পূর্ণদৃষ্টি ফেলল ধনেশ্বর : কী বলো, পারে না ?

রঞ্জন সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, পারে বইকি। ইংরেজের পরাক্রম সম্পর্কে তারও মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

—তবেই দেখো, এসবের কোনো মানে হয় না। হয় ?

রঞ্জন জানালো, না, হয় না।

ধনেশ্বর হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত গলায় ফিসফিস করে বললে, ঘ্যাখো, স্বাধীনতা সবাই চায়। আমরা পুলিসের লোক, আমরাই কী জানি না যে ইংরেজ কী ভাবে শোষণ করছে আমাদের, হরণ করছে আমাদের মনুষ্যত্ব ? আমাদেরও অপমানবোধ আছে, আমাদের রক্তে পরাধীনতার জ্বালা আছে—যেন থিয়েটারের ঢঙে বলে চলল : ইংরেজকে তাড়াতে পারলে আমরাও কম খুশি হবো না।

বিমূঢ় হয়ে গেল রঞ্জন। ভূতের মুখে হরি-সংকীর্তন শুনছে যে।

—কিন্তু—আবেগভরে ধনেশ্বর বললে, কিন্তু সনাতন ভারতবর্ষ আমাদের। অহিংসা, ত্যাগ, প্রেমের দেশ। এই দেশের মাটিতে জন্মেছিলেন বুদ্ধ, নানক, মহাবীর, চৈতন্য। এঁরা সব অহিংসা আর ক্ষমার পূজারী। মহাবীরের যাঁরা শিষ্য তাঁরা তো একটা পোকা পর্যন্ত মারতে কষ্ট পান। খাটে তাঁরা 'খটমল'—মানে ছারপোকা পোষেন। কামড়ে জেরবার করে দিলেও টুঁ শব্দটি করেন না কখনো।

রিভলভারের ঝকঝকে নলটার দিকে চোখ পড়ল রঞ্জনের। অহিংসা আর প্রেমের আবহাওয়ার সঙ্গে কী চমৎকার খাপ খাচ্ছে। একটা বুলডগ যদি জপের মালা হাতে নিয়ে তপস্যায় বসে, তা হলে তার মুখের চেহারায় কী এই ধার্মিক কাকাবাবুর মতো একটা ঐশ্বরিক ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে ?

—আহা—শ্রীচৈতন্য। টপ্ করে আবার একটা মশা খেয়ে নিলে ধনেশ্বর : জগাই মাধাইকে বললেন, 'মেরেছো কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না।'

কথাটা শ্রীচৈতন্য বলেননি, বলেছেন নিত্যানন্দ। কিন্তু রোহিণীর ইংরেজি বিদ্যার মতো ধনেশ্বরের ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা করাও বৃথা।

—হুঁ—সংক্ষেপে সমর্থন করলে রঞ্জন।

—আর এই ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীক হলেন ত্যাগের অবতার মহাত্মা গান্ধী। অহিংসা—প্রেম। রক্ত দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে, জয় করতে হবে তার অন্তরের পশুত্বকে। এ শুধু মহাত্মার কথা নয়, সমস্ত দেশেরও প্রাণের কথা। কী বলো ?

—ঠিক।

তত্ত্বালোচনায় বাধা পড়ল। উর্দিপরা একটা চাপরাশী ঢুকল ঘরে, টেবিলের ওপর দু প্লেট মিষ্টি আর চা সাজিয়ে দিয়ে গেল। আহা, আসল কাকাবাবু যে নয়, কে বলবে।

খাও, খাও—সস্নেহে বললে ধনেশ্বর। স্থান কাল পাত্র অনুকূল নয়, তবু কেন কে জানে হঠাৎ করুণাদিকে তার মনে পড়ে গেল।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম—ধনেশ্বর চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, তাই এই অহিংসার দেশে যারা রক্তপাতের কল্পনা করে তারা ভারতবর্ষের শত্রু। এই শত্রুদের ক্ষমা করা উচিত নয়, কারণ এরা মহাত্মার পবিত্র আদর্শের অসম্মান করে। দেশের আদর্শকে বজায় রাখবার জন্যে এইসব লোককে অবিলম্বে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

গায়ের লোমকূপগুলো শিরশিরিয়ে উঠল রঞ্জনের। ঝুলির ভেতর থেকে বেড়ালটা উঁকি দিয়েছে।

—জানোই তো—চায়ের কাপ শেষ করে একটা থ্যাবড়া আঙুলে চুরুটে টোকা দিলে ধনেশ্বর, শব্দ করে খানিকটা ছাই পড়ল কাপের তলানিতে : আমাদের এই শহরেও দেশের সেই শত্রুরা ঘাঁটি বসিয়েছে। বন্দুক রিভলবার চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে এদিকে ওদিকে। এখন থেকেই এই ছোকরাদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে, তুমি আমার আত্মীয়, আশা করি, আমাকে সাহায্য করবে।

ঝুলির ভেতর থেকে একলাফে বেরিয়ে পড়ল বেড়ালটা।

—আমি—আমি—জড়ানো গলায় রঞ্জন বললে : আমি তো—

—হ্যাঁ তুমি। ধনেশ্বর হাসিমুখে জবাব দিলে। কিন্তু অবচেতন মনটা হঠাৎ টের পেল—এই মুহূর্তে ধনেশ্বরের চোখ দুটো পোকাধরা টিকটিকির মতো সজাগ হয়ে উঠেছে : তোমাদের 'তরুণ-সমিতি' সম্পর্কে গোটা কয়েক খবর চাই। আশা করি, কাকাবাবুর কাছে মিথ্যে বলবে না তুমি।

ভয়াতুর চোখে রঞ্জন তাকিয়ে রইল। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

—তুমি 'তরুণ-সমিতি'র মেম্বার তো ?

নিরুত্তরে হেলাল ঘাড়টা। হাঁ, সে মেম্বার।

—তোমাদের লাইব্রেরীয়ান্ ক্ষিতিশ চক্রবর্তীকে চেনো আশা করি ?

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী। সব গোলমেলে মনে হল। ক্ষিতীশ চক্রবর্তী—ক্ষিতীশদা। 'তরুণ-সমিতি'র মধ্যে সব চেয়ে নিরীহ আর গোবেচারা লোক। বঙ্কিম আর মাইকেল নিয়ে পড়ে আছেন—যেন একশো বছর আগেকার মানুষ। ওরা ক্ষিতীশদাকে করুণা করে। ভদ্রলোক শুধু 'কৃষ্ণচরিত্র' পড়ে আর খাতা লিখেই কাটালেন, ঘুণাক্ষরেও জানলেন না চারপাশে কী ভয়ঙ্কর একটা অগ্নিচক্র চলেছে আবর্তিত হয়ে। ওঁকে ওরা এড়িয়ে চলে সযত্নে, কোনো জরুরী কথার সময় ওঁকে আসতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে চুপ

করে যায়। সেই ক্ষিতীশদার কথা জানতে চাইছে ধনেশ্বর। লোকটার কি মাথা খারাপ। অথচ যে নামটার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল—

—চেনো নিশ্চয় তাকে।

—হাঁ, চিনি বইকি।—মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল রঞ্জনের।

—কেমন লোক ?—ধনেশ্বরের গলায় চোঙাটা আবার উঠল গম্‌গমিয়ে।

রঞ্জন সবিস্ময়ে বললে, খুব ভালো গোবেচারা লোক।

—খুব ভালো গোবেচারা লোক—অ্যাঁ ? ধনেশ্বরের মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল : খুব গোবেচারা লোক। ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না, অথচ আজ পার্বতীপুর স্টেশনে ওই লোকটিকেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে—তা জানো ?

রঞ্জন অব্যক্ত শব্দ করল একটা।

—ওই ভালো লোকটির আসল নাম ক্ষিতীশ চক্রবর্তী নয়। চমকাচ্ছ ? তবে আরো শোনো। ওর নাম মণি মুখার্জি, এলাহাবাদের বিখ্যাত টেররিস্ট্ নেতা। রবারি, কন্‌স্পিরেসি এগেনস্ট্ ক্রাউন, আর্মস অ্যাক্ট আর পোলিটিক্যাল মার্ডারের চার্জে আজ পাঁচ বছর ধরে ওকে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। উই হ্যাভ্ গট্ হিম অ্যাট লাস্ট। সঙ্গে একজোড়া লোডেড রিভলভারও ছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোডেড রিভলভার। ফাঁসি না হোক ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ হয়ে যাবে নিশ্চয়। বুঝেছ হে।

কাঠ হয়ে রইল রঞ্জন। ক্ষিতীশদা—নিরীহ নির্বোধ সেই লাইব্রেরীয়ান। কথা বলতে বলতে বার বার 'বেশ বেশ' বলেন, বাড়িয়ে দেন চাঁদার খাতা আর গুণগান করেন বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের। সেই ক্ষিতীশদার ভেতরে লুকিয়ে ছিল এই বিপুল অগ্নি-যন্ত্রণার ইতিহাস। রূপকথা-বিভোর মন কোন্ নতুন রূপকথা শুনছে আবার।

না, না, এ বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

ধনেশ্বর বললে, ওই লোকটা, মানে চীফ্ অর্গানাইজার অব্ দি পার্টি, তরুণ সমিতির ভেতর কতটা এগিয়েছে তাই জানতে চাই আমি। আশা করি, তোমার কাছ থেকে পাকা খবর পাব একটা।

বিস্ময়টাকে সামলে নিয়ে রঞ্জন দৃঢ় হয়ে গেছে এতক্ষণে। মন্ত্রগুপ্তি, বিপ্লবীর শপথ, বিপ্লবীর সংকল্প। কখনো দলের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করব না, প্রাণ গেলেও করব না সত্যভঙ্গ। হাজার অত্যাচার আসুক, আসুক মর্মান্তিক শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণা, বুকের ভেতর বজ্রের মতো কঠিন প্রাচীর গড়ে তুলে রক্ষা করব সেই গোপনতাকে। মনে রাখব আমার একটু মাত্র দুর্বলতার অবকাশে এত আয়োজন আমাদের বৃথা হয়ে যাবে, একটু মাত্র অসতর্কতার অমার্জনীয় অপরাধে মিথ্যে হয়ে যাবে শত শত শহীদের আত্মদান।

চাপা কঠিন ঠোঁটে বললে, কী খবর চান ?

—তরুণ সমিতির আসল উদ্দেশ্য কী ? তার প্ল্যান আর প্রোগ্রামই বা কী ?

নিরীহ নির্বোধের জবাব এল : কেন ভালো ভালো বই পড়া, জিমন্যাস্টিক্ করা এই সব।

ঘোঁৎ করে আবার শব্দ করলে বুলডগটা, কোঁৎ করে একটা মশা খেয়ে নিলে। তারপর দু-পাশের ঝাঁটা গোঁফগুলোকে সজারু কাঁটার মতো ছড়িয়ে দিয়ে হাসল : আরে, এ তো সবাই জানে। কিন্তু যা সবাই জানে না, সেই রকম দুটো চারটে খবর চাই যে—বোকা ছেলে।—কাকাবাবুর স্বরে স্নিগ্ধ ভৎর্সনার আমেজ : কী কী ভালো বই পড়ে ? এই সব ?

তারপর গড়গড় করে কতগুলো বইয়ের নাম আউড়ে গেল ধনেশ্বর। বিস্ময়ে চমকে উঠল মন। আশ্চর্য, ঠিক এই বইগুলোই প্রথম তাকে পড়িয়েছিল পরিমল, এই বইগুলোর আগুনঝরা লেখা ছড়িয়েই রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল রঞ্জনের। আশ্চর্য, ঠিক বেছে বেছেই তো বইগুলোর নাম করে যাচ্ছে ধনেশ্বর।

—না, এসব বই আমি কোনোদিন দেখিনি।

—দেখোনি!—ধনেশ্বরের মুখের থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, কাঁটা-ফোলানো সজারুটা আবার রূপ পেল ঝাঁটা গোঁফে : মিথ্যে বোলো না। তুমি আমার আপনার লোক, আমার ঘরের ছেলের মতো। সেই জন্যেই যাতে তোমার সব দিক থেকে ভালো হয় সেই চেষ্টা করছি আমি। সত্যি বলো, এ সব বই তুমি দেখোনি ?

—না।

ধনেশ্বরের চোখ দুটো নেচে উঠল, যেন রঞ্জুর পেছনে দাঁড়ানো কাউকে চোখ টিপল সে।

—না ? বেশ। কিন্তু এঞ্জিনিয়ার কামিনীবাবুর বাড়ি থেকে তাঁর বন্দুকটা চুরি করেছে কে তা জানো ?

—না, তাও জানি না।

—হালদারের দোকানে ডাকাতিতে কে কে ছিল বলতে পারো ?

—না।

—না ? অ্যাঁ—খোঁচা-খাওয়া বিরক্ত বানরের মতো একটা খ্যাঁচানো আওয়াজ করলে এবার ধনেশ্বর, সোনা-বাঁধানো দাঁত দুটো যেন সামনের দিকে এগিয়ে এল একেবারে কামড়ে দেবার জন্যে। বললে, শোনো। তুমি আমার নিজের লোক বলেই ভদ্রভাবে তোমার কাছে সব কথার উত্তর চাইছি। যদি এখনো না দাও, তা হলে তা আদায় করবার উপায় আমার জানা আছে। কিন্তু ওসবের মধ্যে যেতে চাই না, যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।

—আমি কিছুই জানি না।

ধনেশ্বরের আগ্নেয় চোখটা আবার হাসিতে কোমল হয়ে এল। মুখের ওপর ঝাঁটা গোঁফ আবার সজারুর মতো পেখম মেলল: আমি বুঝতে পারছি, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ। ওই গুণ্ডা ছেলেগুলো টের পেলে মারধোর করতে পারে। কিন্তু জেনো,—ধনেশ্বরের স্বর আবার উদাত্ত: যতক্ষণ কাকাবাবু আছে ততক্ষণ তোমার আঙুলের ডগাটিও কেউ ছুঁতে পারবে না। আর তা ছাড়া যে স্টেটমেণ্ট্ তুমি দেবে, পৃথিবীর কেউ তা জানতে পারবে না এ সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাকো।

ধনেশ্বর একটা কাগজ কলম টেনে নিলে: তুমি সব বলো, আমি লিখে যাই।

—আমার বলবার তো কিছুই নেই।

ধনেশ্বর কলমটা নামিয়ে রাখল। হিপ্‌নটাইজ করবার আগে যেমন করে তাকায় যাদুকর, তেমনি বলে চলল: ভেবে দেখো তোমাদের সংসারের অবস্থা। তোমার মায়ের শোকে বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে আছেন। এ অবস্থায় যদি তোমাকে জেলে যেতে হয়, তা হলে—আহা দেবতুল্য মানুষ—ধনেশ্বর আবেগ-ভরে বললে: তা হলে তিনি হার্টফেল করে মরবেন। বলো, এখন কি তাঁকে তোমার এমন 'শক' দেওয়া উচিত? যা জানো বলো। এ স্টেটমেণ্টের খবর আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানবে না—নিশ্চিন্ত থাকো। বুঝেছ?

—আমি কিছুই জানি না।

—আমার কাছে মিথ্যে বলতে চেষ্টা কোরো না। জেনে রেখো, বাতাসেও আমার কান পাতা আছে। একদিন সব খবর আমি পাবই। আজ যদি সব কথা বলো, তা হলে জেনো সেদিন তোমার কোন ভয় নেই, বরং ভালো একটা চাকরি-বাকরি যাতে পাও তার ব্যবস্থাই আমি করে দেব।

—কিন্তু কিছুই আমার জানা নেই।

—Shut up! ধনেশ্বর এবার ফেটে পড়ল: ছেলেখেলা কোরো না, এ ছেলেখেলার জায়গা নয়। আপনার লোক বলেই এতক্ষণ প্রশ্রয় দিয়েছি—But no more! স্টেট্‌মেণ্টটা দিয়ে চলে যাও—you will remain under the safest protection of the British Government! আর যদি পরে ধরা পড়ো, ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, দ্বীপান্তরে যেতে হবে and you will have no sympathy from anywhere—বুঝতে পারছ?

—আমি কিছুই জানি না।

—জানো না? তবে কী করলে তুমি জানো সে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইয়াদ মিঞা?

—স্যার?

—আমার হাণ্টার। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

হাণ্টার এল। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে দৃঢ় করে স্থির হয়ে বসে রইল রঞ্জন। শুধু তার ঠোঁটের কোণা দুটো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল—তার বেশি কিছুই না।

—জবাব দেবে না ?

—আমি জানি না।

—Take it then—গর্জন করে ধনেশ্বর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মনের ভেতরে যখন আগুন জ্বলে, পরাধীনতার অপমানে সমস্ত বুক যখন পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে, তখন কি শরীরে আর কোনো অনুভূতিই জেগে থাকে না ? শুধু পাথরের গায়ে ঘা দিয়ে সে আঘাত ঠিকরে ফিরে আসে, শুধু একটা কঠিন জড়পিণ্ডকে ক্রুদ্ধ হতাশায় ঘুষি মেরে নিজেকেই আহত করে তোলা হয় ?

তাই কিছুই টের পেলে না সে। এমন কি নিজের নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে বুকের জামাটাকে ভিজিয়ে দিলে, তখনো না। তারপর এক সময় সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল, ঘরটা ঘুরতে লাগল চোখের সামনে, বুলডগের হিংস্র বীভৎস মুখটা ক্রমে ক্রমে আসতে লাগল অস্পষ্ট হয়ে। তার ওপর শুধু রাশি রাশি হলদে কুয়াশা, আর কিছুই নেই।

একেবারে কিছুই নেই।

মিতা বললে, খুব লেগেছিল, না ?

অল্প করে হাসল রঞ্জন : টের পাইনি। ওটা কাকাবাবুর স্নেহের শাসন কিনা।

—টের পাওনি ? কী সর্বনাশ !—মিতা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : এমন করে মারল তবু টের পাওনি ! আশ্চর্য তোমরা মানুষ বাপু। অসাধ্য কাজ নেই তোমাদের।

—টের পেলেই বা কী ? রঞ্জন আবার হাসল : কুকুরে যখন কামড়ায় তখন সে কামড়াবেই। সে কামড়ে জ্বালা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার জন্যে ছটফট করলে কুকুরটাকে মূল্য দেওয়া হয়।

মিতা বললে, উঃ, ওরা কি মানুষ ?

—না। ওরা প্রভুভক্ত। মানুষ ওদের চাইতে সম্মানের জীব।

—তা সত্যি।

সশ্রদ্ধ শঙ্কায় রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মিতা। তার দৃষ্টিতে বীরপূজার মুগ্ধ অনুরাগ। ওর এত বীরত্বে বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছে সে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এমন কি এই ব্যাপারে সেদিনকার সেই সন্ধ্যার ইতিহাসটাকেও সে ভুলে গেছে হয়তো। ভুলে গেছে সেই মাতাল বাতাস আর বৃষ্টির পাগলামিতে কেমন করে তার একখানা হাত হাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল রঞ্জনের।

—ওরা কি সকলের ওপরই এমনি করে নাকি ?

—হয়তো করে—ঠিক জানি না। তবে যাদের অ্যারেস্ট করে রাখে তাদের ওপর অত্যাচারটা চলে আরো বেশি রকমের। কারণ সেটা নিরাপদ—বাইরে জানাজানি হওয়ার ভয় নেই।

—কী ভয়ানক!—রুদ্ধস্বরে জবাব দিলে মিতা : কিন্তু বড় বড় সবাই থাকতে হঠাৎ বেছে বেছে তোমার ওপর নজর পড়ল কেন?

—কারণটা সহজ। ভেবেছিল আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে সুবিধে করে নেবে।

—কী শয়তান।

—তা ছাড়া বড়রা শক্ত, তাদের নোয়ানো যায় না। দুর্বলদের ভেতর থেকেই অ্যাপ্রুভার যোগাড় করা সহজ হয় কিনা। ও তো একটা পুরনো টেক্‌নিক্।

মিতা আতঙ্কিত আর বেদনার্ত চোখে চেয়ে রইল অন্যমনস্কের মতো। সে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে বর্ষার সন্ধ্যার সেই আকস্মিক বিভ্রান্তিটুকুকেও। হয়তো বিভ্রান্তি তারও নয়, একান্তভাবেই সেটা রঞ্জনেরই, তারই নিজের মনের একটা নিরর্থক দুর্বলতা। যা ঘটেছিল তা একান্তই আকস্মিক। আর তার জন্যই সেটাকে এত সহজভাবে নিতে পেরেছে মিতা।

কিন্তু রঞ্জন কেন পারছে না ওই রকম সহজভাবে নিতে? কেন এমনভাবে তার বুকের ভেতরটা ঢেউ খাচ্ছে? কেন মনের ভেতরে সেটা ঝিমঝিম করছে সারাক্ষণ? অনেকদিন পরে কেন বারে বারে মনে পড়ছে সেই শিশু-কল্পনার নীল চশমার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া চাঁপার পাপড়ির মতো দিনগুলোকে? সেই জানলায় এসে বসা নীল পাখিটাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে, ভোরে ফোটা শিউলির মতো উষার মুখখানাকে। আর এতদিন পরে আকাশ থেকে কেন আসে সাত ভাই চম্পার হাতছানি? জ্যোতির্ময় আকাশগঙ্গার স্রোতে ভেসে যেতে একরাশ বুনো-ফুল কেন তাকে পথ ভোলায় আজকে?

তাই যতই সহজভাবে কথা বলতে চাইছে সে, সহজ তো হতে পারছে না কিছুতেই। প্রতিটি কথার সে জবাব দিচ্ছে বটে, কিন্তু সে জবাব শুধু ঠোঁট নড়া, শুধুই গলার কয়েকটা অভ্যস্ত শব্দ। আসল কথা, উঠে পালাবার জন্যে ছটফটানি জেগেছে। মিতার কাছে একা বসে থাকবার মতো সাহস নেই, শক্তিও নেই তার। আশ্চর্য! সেই ভীরু ছেলেটি এই তিন বৎসরে তো কত বদলে গেছে। আজ আর মৃত্যুবিলাস নেই। দীক্ষা পেয়েছে কঠোর, ক্লান্তিকর আর দুর্গম পথযাত্রার। ধনেশ্বরের হাণ্টারের ঘা যখন একটার পর একটা এসে পড়েছিল, যখন টের পাচ্ছিল তার বুকের জামায় রক্তের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ করে, তখনও অনুভব করেছিল তার শরীরের কোনো যন্ত্রণা নেই—যেন তা পরিণত হয়ে গেছে পাথরে। সে বিপ্লবী, সে নির্ভয়। কিন্তু তিন বছর আগে মিতার কাছে এসে যে দুর্বল সংশয় তাকে কুঁকড়ে দিয়েছিল, আজও কেন সে নিস্তার পাচ্ছে না তার হাত থেকে?

কেন আজও সে এখানে এসে যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ় হয়ে উঠতে পারল না ?

মিতা বললে, ক্ষিতীশদাকে আমিও দেখেছি। খুব নিরীহ মানুষ বলে মনে হয়েছিল। দাদাও বলত, ক্ষিতীশদা এসবের মধ্যে নেই। কিন্তু আশ্চর্য।

—হুঁ।

নাঃ, ভালো লাগছে না। উঠে পড়াই উচিত। আরো কী অদ্ভুত যোগাযোগ—এ বাড়িতে যেদিনই সে আসবে সেদিনই কি পরিমল ইচ্ছে করে থাকবে না বাড়িতে ? আর ঠিক এই সন্ধ্যার সময় এত বড় বাড়িটা এমনি নির্জন হয়ে যাবে একটা প্রাকৃতিক নিয়মে ? মিতার বাবা তাঁদের ক্লাবে যাবেন টেনিস আর ব্রিজ খেলতে, ওর পিসিমা জপের মালা নিয়ে পূজোর ঘরে দরজা বন্ধ করবেন—আর চাকরগুলো সব এদিকে ওদিকে জটলা পাকাবে ? শুধু ও আর মিতাই মুখোমুখি বসে থাকবে—আর কেউ নয় ?

আজও পালাচ্ছিল কিন্তু মিতাই ডেকে আনল। ডেকে আনল ওপরে পড়ার ঘরে। কেন ডেকে এনেছে সে তা জানে ; তার মুখ থেকে ধনেশ্বরের বিবরণ পুরোপুরি শুনবার একটা নির্দোষ কৌতূহল এটা বুঝতে পেরেও স্বাভাবিক হতে পারা যাচ্ছে না, ওর কথার জবাব দিতে গিয়ে দৃষ্টি যেন ঘন হয়ে আসছে—ভারী হয়ে উঠছে নিজের গলার স্বর। নিজের এক একটা কথায় নিজেই চমকে উঠছে সে।

—পরিমল কখন ফিরবে ?

—বাবা ক্লাব থেকে আসবার আগে। কিন্তু সে আটটাও বাজতে পারে, সাড়ে আটটাও বাজতে পারে।

—তা হলে আজ যাই—

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় মিতা অস্ফুট একটা শব্দ করল : এ কি, কপাল দিয়ে যে রক্ত পড়ছে তোমার !

চুলের তলায় খানিকটা কেটে গিয়েছে। হয়তো ধনেশ্বরের হাণ্টারে, নয়তো অন্য কোনো কারণে। শিরাগুলোর স্ফীত উত্তেজনায় বোধ হয় তার মুখ খুলে গিয়ে রক্ত নামছে গড়িয়ে।

—কী সর্বনাশ। দাঁড়াও দাঁড়াও, আইডিন দিয়ে দিচ্ছি।

—থাক, দরকার নেই।

—দরকার নেই বললেই হয় ? দাঁড়াও, পাগলামি কোরো না।—মিতা ছুটে গিয়ে আইডিনের শিশি নিয়ে এল। এগিয়ে এল কাছে, আঙুলের স্পর্শ লাগল কপালে—শরীর শিউরে উঠল রঞ্জনের। মিতার শাড়ি আর চুল থেকে একটা নেশা ধরানো গন্ধ যেন স্পর্শ করল তার স্নায়ুকে। হৃৎপিণ্ডের ভেতর কাঞ্চন নদীর ছোট ঢেউয়ের মতো কী যেন কলকল শব্দে ভেঙে পড়তে লাগল।

শেষরাত্রের শিশির-ঝরা গলায় মিতা বললে, রঞ্জনদা ?

—বলো।

—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

—কেন ?

—জানি না—প্রায় নিঃশব্দ স্বর : শুধু ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে একটা। ওরা এমন নিষ্ঠুরের মতো তোমাকে মারল কেন রঞ্জনদা, কেন তোমাকে মারল ?

ঘরের শান্ত আলোয় মিতার দু চোখে শিশির টলমল করতে লাগল : তুমি জানো, আমার কী অসহ্য কষ্ট হচ্ছে ? রঞ্জনদা, তুমি আসবে বলে আমি পথ চেয়ে থাকি, তুমি চলে যাওয়ার পর আমার মন এত খারাপ হয়ে যায়। তোমাকে ওরা মারল। রঞ্জনদা—

চোখ বেয়ে নেমে এল জল। শিশির পড়া থেকে বর্ষণ। আর মাথাটা যেন আপনা থেকেই রঞ্জনের বুকের মধ্যে এসে পড়ল : রঞ্জনদা !

একটা সাইক্লোনের দমকায়, একটা ভয়ানক ভূমিকম্পে টলমল করে উঠল পৃথিবী। সব চেয়ে পুরনো কবিতা সব চেয়ে নতুন সুরে গান গেয়ে উঠল, একরাশ ঘূর্ণি হাওয়ার মাতলামিতে সব কিছু ওলট-পালট করে দিলে। চুম্বনের পর চুম্বনের ব্যাকুলতায় সমাপ্ত হয়ে গেল এতদিনের সমস্ত অসমাপ্ত কবিতা, কপালের রক্তচিহ্নটা তার বিপ্লবিনী নায়িকার ললাটে এঁকে দিলে জীবন-বন্ধনের সীমান্তরাগ।

ষোল

"এখন যে কী ভয়ানক কাজ পড়েছে, তা লিখে তোমায় বোঝাতে পারব না। সারাটা দিন বাইরে ছুটাছুটি করে এই ফিরে এলাম। এখন রাত প্রায় নটা। ঘরে ঢুকে আলোটা জেলেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

পালপাড়ার সেই চালের কলগুলোর কথা মনে আছে তো তোমার ? ওখানে একটা ইউনিয়ান করেছি আমরা। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে, আমি এক্ষুনি সেখানে বক্তৃতা দিয়ে এলাম ? তোমার হাসি পাচ্ছে তো ? কিন্তু জানো—যাদের কাছে বলেছি তারা একটুও হাসেনি। কী অদ্ভুত আলোয় জলছিল তাদের চোখ, কী কঠিন হয়ে উঠেছিল তাদের মুখের চেহারাটা। থেকে থেকে হাত মুঠো করে ধরছিল তারা—আমার মনে হচ্ছিল যেন মুঠির ভেতর বজ্র পেয়েছে কুড়িয়ে। আশ্চর্য, এত বড় শক্তিকে আমরা এতকাল ভুলেছিলাম কী করে।

আমাদের শান্তিদাকে মনে আছে—সেই Fire-brand শান্তি মৌলিক ? সে আজকাল সন্ন্যাসী হয়েছে—গেরুয়া পরে, শুনছি একটা ব্রহ্মচর্য আশ্রম খুলবে। রাজনীতির নাম

শুনলে তেলে-বেগুনে জলে ওঠে। বলে, পরমার্থ ছাড়া পথ নেই। সুতপাদির খবর আরো ইণ্টারেস্টিং। সে তোমায় পরে লিখব।

দাদা গ্রামে গ্রামে ঘুরছে, ন'মাসে ছ'মাসে একদিন ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। এখানকার যত কাজের ঝক্কি আমাকেই পোয়াতে হচ্ছে।

এত কাজ—এত অদ্ভুত ভালো লাগে কাজ করতে। তবুও তোমাকে এই যে চিঠি লিখতে বসেছি, বাইরে চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকার থেকে এই যে ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে, এখন ভাবি, তুমি পাশে থাকলে কত কাজ যে আরও করতে পারতাম। একটা উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধ্যা মনে পড়ে? সেদিন তোমাকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম—মনে হয়েছিল তুমি একটা বিষাক্ত কালো সাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ মনে হয় তুমিই আমার সবচেয়ে বড় ইন্‌সপিরেশন।

তুমি কবে আসবে? সবাইকেই তো ছেড়ে দিচ্ছে একে একে, তোমাকে কবে ছাড়বে?

কিন্তু সত্যি, কবে আসবে তুমি?"

চিঠিটা যত্ন করে খামে ভাঁজ করে রাখল রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মিতা অপেক্ষা করে আছে। আজ আর ব্যবধান নেই—আজ দুজনের মাঝখানে জীবনের একটা নিশ্চিত পথ তৈরি হয়ে গেছে। পরিমল আর মিতাকে ওদের বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মিতা একটা স্কুলে মাস্টারী করে, পরিমল ঘোরে গ্রামে গ্রামে। রূপকথার মেয়ে আজ মাটির কন্যা। আজ আর অবাস্তব কোনো স্বপ্ন-চারণার মধ্য দিয়ে পৌঁছতে হয় না তার কাছে। মাটির মাধ্যাকর্ষণে ছায়া-তরুতে সার্থক হয়েছে আকাশী অর্কিড। কিন্তু সেই—সেদিন?···

সেদিন যখন ওই বাড়িটা থেকে রঞ্জন বেরিয়ে এল, তখন চোখে সব ঝাপসা দেখছে সে। হঠাৎ চারদিকে থরে থরে কুয়াশা নেমে এসেছে যেন। একটা শাদা শূন্যতা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো রূপ নেই তখন। শুধু বাইরের নয়, মনের ভেতরে তাকিয়েও সে আর কিছুই যেন খুঁজে পেলো না। সে আর কোথাও নেই—কোনোখানেই কিছু আর অবশিষ্ট নেই তার। শরীর-মন—সব কিছুর সমষ্টিভূত সত্তা হঠাৎ যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেছে বাইরের এই গাঢ় গভীর কুয়াশায়।

চরিত্রহীন—বিশ্বাসঘাতক! কামান গর্জনের মতো শব্দ উঠছে দু কান ভরে। আকাশে উড়তে উড়তে শাপগ্রস্ত দেবদূত আছড়ে পড়ছে অসীম শূন্যতার ভেতর দিয়ে; সূর্যের অগ্নিধারায় পাখা পুড়ে গেছে দুঃসাহসী আইকারাসের। সে পড়ছে—ছুটে পড়ছে—তীব্র ভয়ঙ্কর বেগে পড়ছে কেন্দ্রস্খলিত উল্কার মতো। হুহু করে বাতাসের কান্না ঝাপট মারছে—আর বহু নিচে মৃত্যু-সমুদ্রের কালো তরঙ্গ চুম্বকের মতো টেনে নিচ্ছে তাকে—অমোঘ পরিণামের সংকেত শোনা যাচ্ছে তার উদ্বেল অট্টহাসিতে।

কী হল—এ কী হল!

তাকে ডাক দিয়েছিল পরাধীন দেশ ; ডাক পাঠিয়েছিল তেত্রিশ কোটি অত্যাচারিত মানুষের অসহায় কান্না। সেদিন কালী-খাঁদু-ভোনার অপরিচ্ছন্ন পরিধি থেকে বেরিয়ে এসে পেয়েছিল শহীদ স্বর্গের অধিকার। আর আজ ?

বেণুদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না—পুড়ে যাবে তার চোখের আগুনে। পরিমলের মুখের দিকে তাকাবার আগে মিলিয়ে যাবে মাটিতে। আজ সে নরেন গোঁসাই, নেত্র সেনের সগোত্র, বিপ্লবের আন্দোলনের রক্তপত্রে আর একটি কালির বিন্দু।

বেণুদার দুর্বলতার খবর সে জানে। কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা। অনির্বাণ আগুনের পাশে একটা পোড়া ছাইয়ের টুকরো। স্বতপার পাশে মিতা। সেও ওই আগুনের কাছে একটুকরো ছাইয়ের অতিরিক্ত কিছু নয়।

কাকে ভেবেছিল সে ড্রাগন-দ্বীপের বন্দিনী রাজকন্যা। ওই ফুল আর ধূপের গন্ধভরা বাড়িটা—যেখানে পা দিতে বোধ করত অনধিকারীর সংকোচ—সত্যি কি ও বাড়িটাকে চিনতে পেরেছিল সেদিন ? নিজের কাছেই ফাঁকি ছিল বইকি। লোভ জেগেছিল তার—রূপকথাবিলাসী পা দিয়েছিল আর একটা রূপকথার দেশে ; যার মূল নেই ক্ষুধিত ভারতবর্ষের মাটিতে—যার সঙ্গে সংযোগ নেই কোটি লাঞ্ছিতের রক্তনাড়ীর। সব রূপকথাই আজ ফেটে মিলিয়ে যাচ্ছে বেলুনের মতো—এও গেল। কিন্তু শুধু গেলই না—সেই সঙ্গে চূর্ণ চূর্ণ করে, কণায় কণায় রঞ্জনকেও মিলিয়ে দিল যে। চরম মূল্য দিয়ে লাভ করল তার পরম অভিজ্ঞতা।

এলোমেলো ভাবে পা ফেলে চলতে লাগল রঞ্জন। কোথায় যাবে মনে নেই, কোথায় যাচ্ছে জানে না। হঠাৎ সে টের পেল, তার কপালের একটা জায়গায় অসহ্য যন্ত্রণা চমকে চমকে যাচ্ছে, পিঠে-হাতে-পায়ে টনটন করছে ব্যথা। মনে পড়ল ধনেশ্বরের হাণ্টারের কথা। এতক্ষণ তাকে ঘিরে ছিল একটা গৌরবের বর্ম ; সমস্ত ঘা সেই অক্ষয় কবচকুণ্ডলে প্রতিহত হয়ে পড়ে গেছে ঠিকরে ঠিকরে। কিন্তু সে বর্ম আজ হারিয়েছে রঞ্জন। তাই ওই হাণ্টারের ঘাগুলো এখন এসে পড়েছে নির্ভুল লক্ষ্যে—থেঁতলে দিচ্ছে তার মাংস।

পথের দু'পাশ থেকে কখন যে অনেক পেছনে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির ঝাপসা ল্যাম্পগুলো, কখন যে পায়ের নিচ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে কংক্রীটের রাস্তাটা, টেরও পায়নি সে। শিশিরভেজা ধুলো এখন জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে হাঁটু পর্যন্ত। দু'ধার থেকে জংলা বাগান তাকে জড়িয়ে ধরছে ঘন কালো ছায়ার আলিঙ্গনে। শুধু সামনের নীলকৃষ্ণ আকাশে দপ দপ করছে সিংহরাশি। শীতল, কঠিন নক্ষত্রমালা থেকে বর্শাফলকের মতো তীক্ষ্ণ আলো ছুটে আসছে রঞ্জনের দিকে।

কোথায় চলেছে এই পথ ? জানবারও দরকার নেই আর। সেই ছেলেবেলার মতো আজও নিশি পেয়েছে তাকে। ভয়ের মধ্য দিয়ে ডেকে নিয়ে অবিনাশবাবু দিয়েছিলেন

নির্ভয়তার মন্ত্র। কিন্তু আজ সে চলেছে কোথায়? সেই গল্পে পড়ার মতো শয়তান কি তার হাত ধরে সশরীরে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের ইন্‌ফার্নোতে?

ড্রাগন-দ্বীপের রাজকন্যা! দুটো হাত এত জোরে রঞ্জন মুঠো করে ধরল যে মণিবন্ধের কাছে রক্তবাহী শিরা দুটো যেন ফেটে যেতে চাইল তার। এই হাতে কাউকে এখন সে খুন করতে চায়। কিন্তু কাকে?

না—ড্রাগন-দ্বীপের রাজকন্যা নয়। ও মায়ারাক্ষসীর মারণ-মন্ত্র। এতদিন পরে হেনরা কুঞ্জের আড়ালে, ছবির মতো সাজানো ওই বাড়িটাতে সে চিনতে পেরেছে পাশাবতীর রাক্ষসী রূপ। কঙ্গোর জঙ্গলে লোভী মক্ষিকাকে মৃত্যু-ফুলের ডাক; পৌরাণিক দ্বীপ থেকে সাইরেনের বাঁশি।

কঠিন মুঠির নিচে দপ দপ করছে থেমে দাঁড়ানো ঘন-রক্তের উচ্ছ্বাস। যেন আগুন জ্বলে যাচ্ছে সারা গায়ে। মিতার ছোঁয়া সারা শরীরকে কুরে কুরে খাচ্ছে তার। নিজের ওপরে অসহ্য ঘৃণায় মোমের মতো পুড়ে পুড়ে গলে যাচ্ছে সে।

কিন্তু স্বতপা আর বেণুদা—

চোপরও বেয়াদব! আকাশফাটা একটা গর্জন যেন শুনতে পেল সে। ও নিয়ে ভাববার কোনো অধিকার নেই তোমার। কী তুমি? একটা বুদ্বুদ মাত্র। ছেলেবেলা থেকে শুধু নানা রঙে রঙিয়েই উঠছ। কী ত্যাগ করেছ, কী মূল্য তুমি দিয়েছ দেশকে? আজ আগুনের সঙ্গে তুলনা করে নিজের সাফাই গাইতে চাও।

কিন্তু কিছুই কি করবার নেই?

আছে। মনের মধ্যে ফেটে পড়ল বোমা, থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। আছে, উপায় আছে। একমাত্র উপায়। কাল সূর্যের আলো ফোটবার আগে, তার কালো মুখখানা সকলের চোখের সামনে ধরা পড়বার আগেই, তা করে ফেলা যায়।

কোনো মানে হয় না দ্বিধা করবার। নিজের বিচার যদি নিজে সে না করতে পারে, পার্টি করবেই। বিপ্লবের রক্তপত্রে ছড়িয়ে যাবে আর একটি কালির বিন্দু। তার আগেই—

চারদিকে তাকিয়ে দেখল সে। আরো জঙ্গল, আরো অন্ধকার, আরো রাত্রি। সামনের ঘন গাছপালার আড়ালে সিংহরাশি প্রায় হারিয়ে গেছে— তবু তার বর্শা-ফলকের মতো আলো এদিক ওদিক ঠিকরে আসছে তাকে লক্ষ্য করে। যেন জঙ্গলের আড়াল থেকে কতগুলো ক্ষুধার্ত জানোয়ারের লুব্ধ দৃষ্টি।

দু'পাশের বাঁশবন বাতাসে উঠল কট্‌কট্‌ করে—ঘুণে কাটা গর্তের ভেতর হাওয়া ঢুকে কোথা থেকে গোঙানির মতো খানিকটা কান্না বয়ে এল। সত্যিই কি কাঁদছে কেউ? কে কাঁদছে? তার দেশ? তার সত্য? তার ব্রতভ্রষ্ট মন?

সেই অন্ধকারে—সেই ভেজা ধুলোর ওপরেই বসে পড়ল রঞ্জন। সেও ডুবে যাচ্ছে

অন্ধকারে। ডুবে যাচ্ছে দেহ, তলিয়ে যাচ্ছে মন—মিলিয়ে যাচ্ছে কোনো অতল সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতায়। বুক-পিঠের দুদিক থেকে দুখানা ভারী পাথর ক্রমশ চেপে ধরছে তাকে—দম আটকে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে বুকের পাঁজরাগুলো ; পেছন থেকে একটা অমানুষিক শক্তি যেন হিমাক্ত কঠোর মুষ্টিতে চাপ দিয়ে ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলতে চাইছে মেরুদণ্ডকে।

মনে আছে, বাজি রেখে একবার ডুব দিয়েছিল মজুমদারদের বড় দীঘির মাঝখানটায়। মাটি তুলবে জলের তলা থেকে। পায়ের ধাক্কায় ওপরের জল সরিয়ে যতই নেমে যাচ্ছে, ততই দু'ধারের ঘোলাটে কাচের মতো জল তার বুক পিঠ চেপে ধরেছে, নাকের মধ্য দিয়ে টনটন করে ফেটে আসতে চাইছে রক্ত—অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে চাইছে কানের ভেতরে। ঠিক তাই। আজো ঠিক সেই যন্ত্রণা। সেদিন সে ভেসে উঠতে পেরেছিল আবার, কিন্তু আজ ?

হ্যাঁ—ঠিকই হয়েছে। আত্মহত্যাই সে করবে। এই ডুবে যাওয়ার যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটিয়ে দেবে নিজের হাতেই। চৈতন্যের দরজাটাকে বন্ধ করে দেবে সজোরে।

আবার সে উঠে দাঁড়ালো। শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে হঠাৎ—দৃঢ় হয়ে গেছে পেশীগুলি। এই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে নিঃশব্দে। কেউ আর কখনো তাকে খুঁজে পাবে না।

মৃদু পা ফেলে পথ থেকে সে নেমে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

এত অন্ধকারেও ক্রমশ চোখে আবছা দৃষ্টি ফুটছে একটা। পায়ের নিচে ঝোপঝাড়, কাঁটা লতা বিছুটির বন সব একাকার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বড় বড় ঝাঁকড়া গাছগুলো ক্রমশ আলাদা হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের সমগ্রতা থেকে। এলোমেলো বাতাস দিচ্ছে, মাথার ওপর থেকে মধ্যে মধ্যে পাতার কালো পর্দা সরে গিয়ে দেখা দিচ্ছে ছেঁড়া ছেঁড়া নক্ষত্রভরা আকাশ। সিংহরাশি নয়—কী ওটা ? সাতভাই চম্পা ?

না, সাতভাই চম্পা আর নয়। তার জীবন নিংড়ে ওই সাতভাই চম্পা দাম আদায় করে নিয়েছে। ওই স্বপ্নে-উড়ন্ত আইকারাসের পাখা পুড়েছে সূর্যের অভিশাপে। জ্বলন্ত সিংহরাশির চোখে ঘৃণাভরা ধিক্কার—বেণুদা।

আবার মাথার মধ্যে সমস্ত বোধগুলো যাচ্ছে একাকার হয়ে। অন্ধকারের মধ্যে বস্তু-পিণ্ডের বন্ধন ছিঁড়ে রেণু রেণু হয়ে ঠিকরে পড়ছে তার সমগ্র সত্তা। চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে রইল সে—শুধু শুনতে লাগল বাতাসের শব্দ—অন্ধকারের অর্থহীন বনমর্মর আর তীব্র ঝিঁঝির ডাক।

উঠে দাঁড়ালো তারপরে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল সুবিধে মতো একটা মোটা ডাল আছে কি না। হাঁ, আছে, অস্বচ্ছ দৃষ্টিতেও সে দেখতে পেল তা।

তেড়াবেঁকা একটা রুক্ষ চেহারার বেঁটে ধরনের গাছ—পাতাগুলো পাতলা পাতলা—অন্ধকারের একটা মস্ত বড় জালের মতো মাথাটা। বাবলা গাছ বোধ হচ্ছে।

যে গাছই হোক, তাতে আটকাবে না। তা ছাড়া বাবলার ডাল শক্ত—ভেঙেও পড়বে না সহজে। আশ্চর্য—মনের ভেতরে এত বিশৃঙ্খলার ভিড়, কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে কত যুক্তিসহ আর সরল হয়ে গেছে চিন্তাটা। আত্মহত্যার আরো অনেক কাহিনী তো শুনেছে রঞ্জন। ক্ষেপে গিয়ে মানুষে আত্মহত্যা করে, অসংলগ্ন মস্তিষ্কের তাড়নায় নিজের হাতে সমাপ্ত করে নিজেকে। তবু কী নির্ভুলভাবে সমাপ্ত করে যায় কাজটা। অসীম ধৈর্য ধরে রেললাইনে ঘাড় পেতে দিয়ে প্রতীক্ষা করে, কড়িকাঠে শক্ত করে দড়ির গিঁট বাঁধতে তো এতটুকুও ভুল হয় না।

আজ সন্ধ্যাতেও এই অজগর জঙ্গলে পা বাড়াতে ভয় পেতো সে। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার ভয়-ভাবনা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। একটা অন্ধকার কালো সেতুর ঠিক মাঝখানটিতে সে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপরে বাবলার ডালে কাপড়ের একটা ফাঁস পরাতে পারলেই—এই ব্যবধানটুকু যাবে পার হয়ে। তারপর ?

ক্রমশ একটা নেশার বিহ্বলতা এসে যেন ঘন হতে লাগল তার স্নায়ুকুণ্ডলীর ভেতরে। মাত্র এক পা—এক পা বাড়াতে পারলেই ছাড়িয়ে গেল অনিশ্চয়তার সীমান্ত। কী আছে তারপর ? কোথায় থাকবে সে—কী রূপ নিয়ে বেঁচে থাকবে তার মনোময় অস্তিত্ব ?

অস্থিরতার কলধ্বনি জেগে উঠছে রক্তের গতি-ধারায়। উঁচু ডাঙার ওপর দাঁড়িয়ে নিচের খর গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত্ততা। আর নয়।

পরনের কাপড়টাকে টেনে টেনে পরীক্ষা করল একবার। ছিঁড়বে না—নতুন কাপড়। তারপর আর একবার সন্ধানী চোখে দেখে নিতে চাইল ওপরের বাবলার ডালটাকে।

হঠাৎ পায়ের কাছে তীক্ষ্ণ হিংস্রতায় শিস দিয়ে উঠল কেউ। খটাৎ করে একটা প্রচণ্ড ঠোকর ডান পায়ের জুতো ঘেঁষে পড়ল গাছের গুঁড়িটার ওপরে। লাফিয়ে সরে গেল রঞ্জন।

হ্যাঁ—সাপ।

নিশাচরের মতো অভ্যস্ত চোখের বিহ্বল দৃষ্টিতেও, দেখতে পেলো সে। দেখল, তরল অন্ধকারের বুক চিরে আরো কালো একটা অন্ধকারের শিখা দুলে দুলে উঠছে—ফুঁসছে আরণ্যক জিঘাংসায়। দুটো জ্বলন্ত জোনাকির কণা একবার বাঁয়ে হেলছে, আর একবার ডাইনে।

ইচ্ছে হল ছুটে পালায়, কিন্তু পারল না। সারা শরীরটা ভারী হয়ে গেছে জগদ্দল পাথরের মতো। পরক্ষণেই আরো দু পা পিছিয়ে গেল সে। অন্ধকারের শিখাটা আবার সোজা হয়ে উঠল, জ্বলন্ত জোনাকির কণা দুটো ঝিকিয়ে উঠল আর একবার—ঠকাস্ করে মাটি-ফাটানো আর একটা ছোবল পড়ল শুকনো ঝরা-পাতার ওপরে।

বুঝতে পেরেছে দৌড়ে পালানো যাবে না। চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল—জোরে ছুটবার উপায় নেই। পেছন ফিরলেই নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু একটা সাপের মুখে? নিশ্চয়ই না। কাপুরুষের মতো এত বড় পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া যাবে না কোনো মতেই।

শরীরের কোষে কোষে কেন্দ্রিত শক্তি একটা প্রচণ্ড ঝটকায় যেন মুক্তি পেয়ে গেল—বন্যার মতো উপচে গেল তা। কুমীরের খিলের মতো দাঁতের দুটো পাটি তার সজোরে আটকে বসেছে। ছোবল মারবার জন্যে সাপটা সর্‌সর্‌ করে আরো খানিক এগিয়ে আসতেই জুতো-পরা পায়ে একটা লাথি ছুঁড়ল সে—ছুঁড়ল অমানুষিক শক্তিতে।

সাঁৎ করে একটা বরফের চাবুক লাগল জুতোর ওপরকার অনাবৃত অংশটুকুতে। যেন, কেটে বসে গেল মাংসের ভেতর। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তীরের মতো উড়ে গেল সাপটা, ঝপাৎ করে একটা আওয়াজ শোনা গেল দশ-পনেরো হাত দূরে। কোনো ডোবা-টোবার মধ্যে গিয়ে পড়েছে নিশ্চয়।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল রঞ্জন। ছুটে চলল সিংহরাশির ধিক্কার পেছনে ফেলে—ছায়ার প্রেতলোক থেকে মুকুন্দপুরের মিটমিটে ল্যাম্প-পোস্টের আলোয়। সাপটা কি পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে এখনো? ঘা-খাওয়া গোখরো তো শত্রুকে ক্ষমা করতে পারে না। আরো জোরে সে ছুটতে লাগল—ভিজে ধুলোর রাশ ঠেলে পলাতক একটা জানোয়ারের মতো।

কিন্তু আত্মহত্যা?

না। মৃত্যুকে সম্মুখে দেখেছে বলে আত্মহত্যা করতে পারবে না সে।

কিন্তু সমাধান এল শেষ পর্যন্ত।

সমস্ত সমস্যার, সমস্ত সংশয়ের। দ্বন্দ্বের এই আকুলতা, এই আকৃতি-বিকৃতি একদিন আর একটা প্রবল ঝড়ের মধ্যে তার মুক্তি পেল। চারদিক থেকে যে হতাশা, যে ক্লান্তি ঘিরে আসছিল, পার্টির সামনে ঘন হয়ে আসছিল যে অন্ধকার—একদিন বজ্রের আলোয় সে অন্ধকার গেল বিদীর্ণ হয়ে। বিদীর্ণ হয়ে গেল রঞ্জনের মনেও সঞ্চিত স্তব্ধ তমসার গ্লানি।

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে জালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওদের নেতা। শহরে বিপ্লবী দলগুলোর অস্তিত্ব প্রায় না থাকার মতোই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সেদিন অনুশীলন দলকে একেবারে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেছে ধনেশ্বর। জেলের মধ্যে নিয়ে নাকি বিশু নন্দীকে এমন মার মেরেছে যে রক্ত-আমাশায় সে মরো-মরো—। ওদিকে 'তরুণ সমিতি'র ভালো ছেলেরা প্রায় সব ধনেশ্বরের নজরে পড়ে গেছে। কিছু ধরেছে, বাকি যাকে পাচ্ছে তাকেই ডেকে নিয়ে নির্বিচারে চালাচ্ছে হাণ্টার। ধনেশ্বরের দাপটে শহর সন্ত্রস্ত, সে-ই এস্‌-পি, সে-ই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। দুর্ধর্ষ পরাক্রমে এক ঘাটে জল

খাচ্ছে বাঘে গোরুতে।

হরিনারায়ণ ঘোষের ছেলে অমরকেও একদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই রকম বেধড়ক পিটিয়েছে ধনেশ্বর। হরিনারায়ণ ঘোষ মামলা করতে চেয়েছিলেন ধনেশ্বরের নামে—ক্রিমিন্যাল অ্যাসাল্ট্ আর ইনজুরির চার্জে। কিন্তু শহরের কোনো উকিল তাঁর মামলা নিতে চায়নি; শিউরে উঠে বলেছে—বলেন কি মশায়, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ! ধনেশ্বর শর্মার নামে কেস করতে বলছেন! একবার যদি শানর নজর পড়ে তা হলে আর রক্ষা আছে! দেবে সং-ফৌ-আইনে ঠেলে! চলে যান মশাই, ওসব ঝামেলা আর বাড়াবেন না।

—তাই বলে এই অত্যাচার সয়ে যেতে হবে?

—হবেই তো!—প্রাজ্ঞ উকিলেরা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছেন তাঁকে: খালি খালি মাথা গরম করে কী করবেন মশাই? এখন তো ওদেরই রাজত্ব। শুধু ছেলেকেই ঠেঙিয়েছে, এইটেকেই ভাগ্য বলে জানবেন। বেশি লাফালাফি করেন তো আপনাকেও ধরে একদিন হাতের সুখ করে নেবে।

হরিনারায়ণ ঘোষ তবু দিন কয়েক তর্জন গর্জন করেছিলেন—তাঁর বৈঠকখানায় আর মনসাতলার বৈঠকে বসে। কিন্তু তারপর একদিন তাঁর বাড়ি সার্চ হল। সার্চ করালো ধনেশ্বর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তারও পরে কী হল কে জানে, আশ্চর্যভাবে নীরব হয়ে গেছেন হরিনারায়ণ, বুঝতে পেরেছেন বোবার শত্রু নেই।

কিন্তু এ অসহ্য—এ অবস্থা দুর্বিষহ।

ওদের শক্তি টগবগ করে ফোটে। জিঘাংসায় প্রতি মুহূর্তে মন কালো আর ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছে করে লোকটাকে সাবাড় করে দিতে। না—তাও নয়। শ্মশানকালীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ছাগলের মতো হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দিতে।

শুধু দাদারা থামিয়ে রাখেন ছেলেদের: না, না।

—না কেন?

—কী লাভ?—বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে দাদারা জবাব দেন: অনেকগুলোই তো সাবাড় করা হয়েছে এদিকে ওদিকে। কিন্তু ওরা রক্তবীজের ঝাড়, ফুরোবে না। ওতে করে লাভের মধ্যে খানিকটা রিপ্রেশনই ডেকে আনা হবে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য যাবে পিছিয়ে।

রিপ্রেশন! ছেলেরা বুঝতে পারে না। রিপ্রেশনের আর বাকিই বা কোথায়। শহরের প্রত্যেকটা ছেলের জীবন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু ধনেশ্বর আর ইয়াদ আলীর মতো চেনা মুখই নয়, বর্ণচোরারা চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে মাছি-মশার মতো। খেলার মাঠ থেকে স্কুলের ক্লাস পর্যন্ত অবাধ গতিবিধি তাদের। বাতাসে পর্যন্ত তাদের

কান পাতা। উৎপাতের চোটে মানুষের আহার নিদ্রা বন্ধ হওয়ার জো।

আর সার্চ করা! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক একটা বাড়িতে সে যে কী প্রেত-তাণ্ডব, ভাষায় তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা তো খুঁজছেই, তারপর খাটের পায়া ভেঙে দেখেছে ভেতরে ফোকর আছে কিনা; বালিশ-তোশক ছিঁড়ে তুলোর মধ্যে লুকোনো রিভলভার খুঁজছে; অকারণ-আনন্দে আচমকা বাঁধানো মেঝের খানিকটা খুঁড়ে ফেলছে গোটাকয়েক তাজা বোমা পাওয়ার আশায়, ইঁদারার ভেতর ঝালাওয়ালা নামিয়ে এমন অবস্থা করে তুলছে যে সাতদিন আর জল খাওয়ার উপায় থাকছে না গৃহস্থের। রিভলভার না পাক, ঠ্যাং ধরে গোটাকতক ব্যাঙ্‌কেই ছুঁড়ে দিচ্ছে কুয়োর ওপর।

আর পারা যায় না। কী কষ্টে যে অস্ত্রশস্ত্রগুলোকে সামলে রাখতে হচ্ছে সে ওরাই জানে। শুধু একদিন একটা দৃশ্য দেখে বড় আরাম পেয়েছিল রঞ্জন, সমস্ত ঘটনাটা ভারী মনোরম বোধ হয়েছিল তার। উকিল সারদাবাবুর বাড়িতে সার্চ। কী মনে করে—বোধ হয় একজোড়া তাজা পিস্তলের আশায়ই একটা কনেস্টবল্ নর্দমার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে, তারপর পরক্ষণেই "আঁই দাদ্দা: মর্ গইরে"—বলে লাফিয়ে উঠল।

তারপর তার সে কী নৃত্য গীত। কাঁকড়া বিছের কামড়—তার আরামটুকু মনে রাখবার মতো। দৃশ্যটা ভারী উপভোগ করেছিল সেদিন। মনে হয়েছিল ধনেশ্বরকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে তার গায়ে গোটাকয়েক কাঁকড়া বিছে ছেড়ে দিলে কেমন হয় ব্যাপারটা?

কিন্তু সে যাই হোক—এখন এ অবস্থার একটা প্রতিকার দরকার।

যা বোঝা যাচ্ছে জেলে সকলকেই যেতে হবে। দেশব্যাপী যে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা ছিল নেতাদের, যে প্রত্যাশা ছিল ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে চট্টগ্রামের মতো অগ্নিযজ্ঞ জাগিয়ে রাতারাতি ইংরেজের শাসন পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া—সে আশাকে এখন মরীচিকা মনে হয়, মনে হয় তা আকাশ-কুসুমের চেয়ে বেশি নয়। এ হয় না, এ হতে পারে না। সামান্যতম চেষ্টাও পুলিসের সদা শানানো চোখ আর ঘরশত্রু বিভীষণের চেষ্টায় ধরা পড়ে যাচ্ছে, দুর্বল সহকর্মী দু'ঘা মার খেয়েই কোর্টে দাঁড়াচ্ছে অ্যাপ্রুভার হয়ে। দেশের স্বাধীনতার পথে দেশের মানুষের বাধাই দাঁড়াচ্ছে সব চেয়ে প্রবল হয়ে। তিরিশ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মতো কেউ একে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। অস্ত্র চাই—সে জন্যে চাই টাকা। কিন্তু টাকা দেবে কে? নিতে হবে ডাকাতি করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চরম বিয়োগান্ত তার পরিণাম।

আর তা ছাড়া নিজেদের মধ্যেই কি ত্রুটি আছে কম? অবধি নেই দলাদলির। প্রত্যেকেই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকেই কাজে নেমেছে প্রাণের ভেতর আগুন

জেলে, নিজের সর্বস্ব বিসর্জনের সংকল্প করে। কিন্তু এই মৃত্যুঞ্জয়, এই নির্ভীক মানুষগুলো কেন নিজেদের মুক্ত করতে পারে না দলাদলির ক্ষুদ্রতা থেকে? পরে রঞ্জন জেনেছে, শুধু এই দুটো দলই নয়—আরো আট-দশটা দল-উপদল আছে এবং পরস্পর সম্পর্কে তাদের বিদ্বেষ আর সন্দেহের যেন অন্ত নেই। শুধু তাই নয়। সংগঠন একটু জোর বেঁধেছে কিংবা হাতে দুটো একটা অস্ত্র এসেছে—তা হলেই আর যেন বীরত্বের লোভ সামলাতে পারে না তারা। অকারণে দুটো চারটে মানুষকে হত্যা করে বসে এবং সেই প্রত্যক্ষ ফলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটাই ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায়।

দেশের বিরোধিতা, বিশ্বাসদ্রোহিতা, আর নিজেদের ভুলভ্রান্তি; একসঙ্গে মিলতে পারে না, তাই বড় প্ল্যান নিতে পারে না কোথাও। ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মোহ—দাদা হওয়ার প্রলোভন কত লোককে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে—বাড়িয়ে চলে সংখ্যাতীত উপদল। আজকে রঞ্জন জানে, আজকে রঞ্জন বিচার করতে পারে, সেদিনকার অত নিষ্ঠা, অত আত্মদান, অমন বীরত্বের পরিণামও কেন অত বড় শোচনীয় ব্যর্থতায় হারিয়ে গেল।

তা ছাড়া সব চাইতে বড় কারণ যেটা, সেটা বুঝেছিল অনেক পরে। তার আভাস এনেছিল সেই রহস্যময় বইটা, কিন্তু সে ইঙ্গিত সেদিন ধরবার সাধ্যও হয়তো ছিল না কারো। তাই—

তাই নেতাদের মধ্যে হতাশা, নেতাদের চোখেও যেন অসহায় আক্রোশের একটা কাতরতা। ধনেশ্বরের দাপটে সমস্ত যেন ভেঙে পড়বার উপক্রম। নিজের মধ্যে যে বিচিত্র একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে, চারদিকের এই সংঘাতের কাছে তাও যেন ছোট হয়ে গেছে।

অতএব—

অতএব একটা কিছু করো। যেমন করে হোক অন্তত আত্মঘোষণা করতে হবেই। কিছু অস্ত্র চাই, আর সেই অস্ত্রের মুখে প্রকাণ্ড একটা ঘা দিয়ে যাব দেশকে। আর কিছু না হোক একটা বিরাট প্রোপাগাণ্ডার মূল্য আছে তার, অন্তত আজকের এই অগ্নিক্ষরা রক্তঝরা অভিজ্ঞতার পরিণাম থেকে আগামী দিনের মানুষ তার পথ চলবার সংকেতটি খুঁজে নিতে পারবে। আমাদের শবদেহের ওপর দিয়েই গড়ে উঠুক তাদের উদয়াচলের সোপান।

টাকা চাই, চাই অস্ত্র।

জিমন্যাস্টিক ক্লাবের সেই পোড়ো বাড়িটার অন্ধকারে গ্রহণ করা হল চরম সিদ্ধান্ত। মথুরানাথ পোদ্দার। মস্ত জোতদার, সম্প্রতি রায়সাহেব হয়েছে পুলিসকে সাহায্য করে আর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে খানা খাইয়ে। তার কাছ থেকেই কিছু সংগ্রহ করে আনতে হবে। প্রথমে সবিনয়ে প্রার্থনা করে হবে সিন্দুকের চাবিটা, যদি সেটা সহজে না পাওয়া

যায় তা হলে বলপূর্বক যাতে চাঁদাটা সংগ্রহ করা যায়, তৈরি হয়ে যেতে হবে তারই জন্যে।

সুতরাং আগামী কাল রাত বারোটা।

মনের মধ্যে গোপন-পাপের অনুভূতিটা বিঁধছে যন্ত্রণার মতো। কিছু বলতে পারেনি, স্বীকারোক্তি করতে পারেনি নিজের অপরাধের। আজ তিনদিন ধরে যেন একটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। দলের মধ্যে নৈরাশ্য, তার মনের ভেতরেও যন্ত্রণাভরা অস্থিরতা। বেণুদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে। পরিমলের দিকে চোখ পড়লে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় সে। ধনেশ্বরের হাতে অবিচলিতভাবে মার খেয়ে যে বীরত্বগৌরব সে বয়ে এনেছিল, নিজের অপরাধের কালি ছড়িয়ে নিজেই তাকে কলঙ্কিত করে দিয়েছে।

তবু মনে হচ্ছে আর দেরি নেই। সময় এল এগিয়ে, এল তার সমস্ত মানসিক যন্ত্রণার উপশমের মুহূর্ত। মারবার পরে ধনেশ্বরই তার পরিচর্যা করেছে, মাথায় জল দিয়েছে, রক্ত মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে, এক চুলের ভেতরে একটুখানি কাটা জায়গা ছাড়া আর কোথাও নিজের কীর্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন না থাকে—সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছে তার জন্যে। তারপর আর এক কাপ গরম চা খাইয়ে তাকে বিদায় দিয়েছে। আর বলে দিয়েছে, আজ মুখ খুললে না, কিন্তু সেজন্যে ভেবো না তোমার দুর্গতি এর ওপর দিয়েই শেষ হল। আজ শুধু ছুঁইয়ে রাখলাম। আমার হিসেব-নিকেশ তৈরী হচ্ছে—যথাসময়ে চুনো-পুঁটি থেকে শুরু করে রাঘব বোয়াল পর্যন্ত কেউ বাদ যাবে না।—রিভলভারটা হাতের ওপর লোফালুফি করতে করতে গর্জন করেছিল বুলডগের মতো : সেদিন টের পাবে ধোলাই কাকে বলে। আজ এই নমুনাটুকু দিলাম শুধু অনুতাপের সুযোগ দেবার জন্যে। কিন্তু লাস্ট চান্স্ এখনো আছে, নিজের ভালো চাও তো এসে সব কনফেস করে যেয়ো। আর যদি না করো—শহরের প্রত্যেকটি জায়গায় আমার চোখ খোলা আছে, সব আমি দেখতে পাচ্ছি—এর পরের বার সমস্ত আদায় করে নেব সুদে আসলে।

ধনেশ্বর মিথ্যে শাসায়নি। মিথ্যে শাসানোর মতো লোকই সে নয়। হাঁ—দেরি নেই আর। তারও নয়, পার্টিরও নয়। হঠাৎ মনে হচ্ছে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর—আর—অনুতপ্ত ক্ষুব্ধ বোধ বার বার বলতে লাগল সেদিন যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে, তাই ভালো। আজ মনে হচ্ছে ফাঁসির দড়ি তার পুরস্কার না হোক, তার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মহত্যা করতে পারে না, স্বীকারোক্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ডকে আহ্বান করে নেবার শক্তি নেই তার—কাজেই সে দণ্ড ধনেশ্বরের হাত দিয়েই নেমে আসুক।

রাত প্রায় বারোটা হবে।

শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে একটা মজা দীঘির উঁচু পাড়ের ওপরে জমা হয়েছে সকলে। মরা মরা জ্যোৎস্নায় বৃত্তাকারে ঘিরে দীর্ঘদেহ তালগাছের প্রেতচ্ছায়া। পেছনে ধু ধু মাঠের বুকে সাবধানের সংকেত-বাণীর মতো আলেয়ার চোখ জ্বলছে দপ দপ

করে। মজা দীঘির বুকে অজস্র পদ্মপাতা আর কল্মিদামে বাতাস ফেলছে ত্রস্ত নিশ্বাস। আর স্তব্ধতা।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে চক্রান্তের মতো স্তব্ধতা।

তালগাছের প্রলম্বিত ছায়াগুলোর নিচে আধশোয়া ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে সবাই। অসহ্য, নিষ্ঠুর প্রতীক্ষা। বুকের তলায় একটা ছোট কাঁটাঝোপের তীক্ষ্ণ আঁচড় লাগছে রঞ্জনের। একটু সরে গেলে হয়, কিন্তু সাহস হচ্ছে না। যতক্ষণ আদেশ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নড়তে-চড়তেও পারবে না ওরা।

আট জোড়া চোখ স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দীঘির ওপারে বড় দোতলা বাড়িটার দিকে। ওর একটা জানালায় আলো জ্বলছে এখনো—সেটা নেভবার প্রতীক্ষা। বাড়ির সমস্ত লোক আগে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুক। একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করা দরকার। এমন হানা দিতে হবে, এত ক্ষিপ্র বেগে যে মথুরা পোদ্দার তার বন্দুকটা হাতে পর্যন্ত তুলে নেবার সময় পাবে না। তা ছাড়া গ্রাম এখনো জেগে, মাঠের ভেতর দিয়ে দু-চারটে লণ্ঠন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে এখনো। ওদের গতি-বিধিটাও একটু কমে আসুক।

অসহ্য দীর্ঘ মুহূর্তগুলো—অসহ্যতর প্রতীক্ষা। পরস্পরের নিশ্বাসে চমকে উঠছে সবাই। তালগাছের শুকনো পাতায় এক আধটু বাতাসের শব্দও থেকে থেকে হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিচ্ছে—যেন শুকনো পাতার ওপর পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছে কেউ। বুকের নিচে কাঁটার ঝোপটা হিংস্রভাবে আঘাত করছে প্রতিবাদের মতো। ওগুলো কি মশাল নাকি? মশাল জেলে কেউ কি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে? না—না, আলেয়া।

—রেডি।

একটা চাবুকের মতো শব্দ এসে পড়ল তালগাছের নিচে জমাট ছায়াচ্ছন্নতাকে তাড়না করে। মুহূর্তে নিজেদের অস্ত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে নক্ষত্রবেগে উঠে দাঁড়ালো দলটা। উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হ্যাঁ,—আলো নিবেছে ওপরতলার জানালাটার।

—ওয়ান—টু—থ্রী—

সার বেঁধে দু পা এগিয়েছে সবাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন পাথর হয়ে গেছে। চারদিকের স্তব্ধতা চকিতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বন্দুকের গম্ভীর কঠিন শব্দে।

—পুলিস।

একসঙ্গে সমবেত আর্তনাদ বেরুল: পুলিস।

—দুম্—দুম্—

ওপার থেকে বন্দুকের সাড়া।

—বিট্রেয়াল।—বেণুদা গর্জন করে উঠলেন আহত জানোয়ারের মতো: রোহিণী।

—ঠাস্ ঠাস্ —

এপার থেকে এদের রিভলভার জবাব দিলে। বৃথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ওদের রাইফেল এদের অব্যর্থ সন্ধানে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে, কিন্তু রিভলভারের রেঞ্জ দীঘির অর্ধেকও গিয়ে পৌঁছুবে না।

—ট্রুপ ডিস্পার্স্—

কিন্তু পালাবে কোন্ পথে? এদিক থেকেও রাইফেল সাড়া দিয়েছে, আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি কোথাও। একটা বজ্রকণ্ঠের আদেশ এল: Surrender!

—No surrender! Troop disperse—

রাইফেল আর রিভলভারের শব্দ -রাত্রি কাঁপছে, আকাশ কাঁপছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে খণ্ডপ্রলয়। শরীরের রক্ত যেন আগুন হয়ে জলছে—বিট্রেয়াল! বিশ্বাসঘাতকতা করেছে রোহিণীই। কিছুদিন থেকেই তার ওপর সন্দেহ জাগছিল, এতদিনে সন্দেহটা পরিণত হয়েছে নিশ্চিত প্রত্যয়ে।

—ট্রুপ ডিস্পার্স্—

ছুট্ ছুট্। যেদিকে পারো। প্রাণ থাকতে ধরা দিয়ো না। বিদ্যুৎশিখার মতো বড় বড় টর্চের সন্ধানী আলোতে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, বজ্রের মতো উঠছে রাইফেলের গর্জন। ছুট্ ছুট্। রঞ্জনের পেছনেই চাপা আর্তনাদ করে কে যেন পড়ে গেল। পড়ুক—থেমে দাঁড়িয়ো না। Let him die a hero's death!

রোহিণী। এই মুহূর্তে তাকে হাতে পাওয়া গেলে বাঘের নখের মতো তার গলায় থাবা বসিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা যেত। বিট্রেয়ার! বিশ্বাস-ঘাতক! নরেন গোস্বামীদের কি মৃত্যু নেই?

—ছুট্—ছুট্—ছুট্—

—We are lost friends—but we will win!

…রাত শেষ হয়ে আসছে। মরা চাঁদের জ্যোৎস্না হেলে পড়েছে পশ্চিমে। বুক সমান উঁচু বিন্নাঘাসের বনের মধ্যে শান্তিতে শুয়ে আছেন বেণুদা। ম্লান জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত শান্ত সে মুখ। হিংস্রতা নেই,—পরাধীনতার জ্বালা আর অপমান -সমস্ত নিষে গেছে। কালো পাথরে গড়া কঠোর শরীরে একটা আশ্চর্য কোমলতা ছড়িয়ে পড়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে গেছে বিন্নাঘাস, কাঁধের পাশ দিয়ে এখনো গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। আশ্চর্য, ওই রকম একটা মারাত্মক ক্ষত বয়েও কী করে এতটা পথ তিনি ছুটে এসেছিলেন?

মৃত্যু। অবিনাশবাবুর মৃত্যু মনে আছে, এই আর একটা মৃত্যু দেখল রঞ্জন। ছিন্নমস্তা ভারতবর্ষের পায়ে আর একটি রুধিরাঞ্জলি। স্বাধীন হোক দেশ, স্বতন্ত্র হোক ভারতবর্ষ। এই মৃত্যু আর রক্তের মধ্য দিয়েই মুক্তির রাজপথ এগিয়ে আসুক।

দুঃখ নয়, শোকও নয়।

কী আশ্চর্য শান্তি মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বেণুদার অমনি প্রশান্ত কোমল মুখ কি আর একদিন দেখেছিল রঞ্জন? না, অন্ধকারে তা আচ্ছন্ন ছিল সেদিন?

"করুণাময় মাগি শরণ, দুর্গতি ভয় করহ হরণ
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়—"

মুক্তি এল। এল দুঃখ দুর্গতির অবসান। শেষ চন্দ্রের ক্ষীণ আলোয় পৃথিবী শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। বেণুদাকেও ঘুমুতে দাও। বিশ্রাম করতে দাও সারাজীবন অশ্রান্ত বিপ্লবীকে।

নীরবে উঠে দাঁড়ালো ওরা তিনজন; রঞ্জন, পরিমল আর বিশ্বনাথ।

কোথায় যাব?

ঘরের বন্ধন ছিঁড়েছে। বন্দরের কাল হল শেষ। এবার নিরুদ্দেশ যাত্রা। তিনজনে তিন দিকে। যদি সুযোগ হয় পরশু গঙ্গাপুরের উপেন রাজবংশীর বাড়িতে মিলব আমরা। নইলে এখানেই শেষ দেখা, চিরদিনের মতো বিদায়।

বেণুদার ঘুমন্ত মুখের দিকে ওরা আর একবার তাকালো। তারপর ঘাসবন ভেঙে অন্ধের মতো তিনজনে হেঁটে চলল তিন দিকে। মাটির তলার অন্ধকারে শুরু হল নতুন জীবনের আর এক অধ্যায়।

শুধু একটা জিনিস বাকি দুজনে টের পায়নি। দরকারী কাগজ আর অস্ত্রশস্ত্র সরাতে গিয়ে বেণুদার পকেটে রঞ্জন পেয়েছে একটা ছোট আংটি। কার আংটি সে জানে। কেন বেণুদা আজও ও আংটিটাকে বিক্রি করতে পারেননি তাও বোধ হয় বুঝতে বাকি নেই আর।

বিপ্লবী শহীদের এই দুর্বলতাটুকু দেশ-জননী নিশ্চয় ক্ষমা করবেন—! শান্তিতে ঘুমুক বেণুদা, ঘুমুক পরম আর নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। রঞ্জন জেনেছে, কিন্তু এ আংটির খবর পৃথিবীর আর কেউ জানবে না—কেউ না।

আর যদি কোনোদিন পারে, তবে এ আংটি সে ফিরিয়ে দেবে সুতপাকে।

সতের

মাটির তলায় অন্ধকারের নতুন জীবনের আর এক অধ্যায়।

সারাদিন কাটল একটা জঙ্গলের মধ্যে। যা চেহারা খুলেছে দিনে পথ দিয়ে চলা যাবে না! বুকের কাছে জামাটায় রক্তের দাগ লেগেছে—বেণুদার রক্ত। পায়ে জুতো নেই, পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। নিতান্ত নির্বোধ লোকের চোখ পড়লেও সন্দেহ জেগে উঠবে তার।

যেমন ক্ষিদে—তেমনি ক্লান্তি। ঘাড়ের ওপর থেকে মাথাটা যেন খসে পড়তে চাইছে। থেকে থেকে অন্ধকারে ডুবে আসে চোখের দৃষ্টি। বাড়ির কথা মনে পড়ে। নরম বিছানা—দু'মুঠো ভাত, কয়েক ঘণ্টা বিভোর হয়ে ঘুমুনো। উৎকণ্ঠা নেই, আশঙ্কা নেই, মাতলামি নেই বুকের ভেতরে। বিশ্রাম, গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে তলিয়ে যাওয়ার মতো অতলান্ত বিশ্রাম।

বিশ্রাম। এও বিশ্রাম বইকি। যেন সব কাজ শেষ হয়ে গেছে—যেন এত দিনের জীবনটা একটা স্বপ্নের মতো সুদূর। কোথায় আত্রাই—কোথায় তার নীল জলে টকটকে রাঙা শিমূলের ফুল দক্ষিণা বাতাসে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। কোথায় আলেয়া-দীঘির ওপারে রাঙা মাটির পথটা এগিয়ে চলে গেছে হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড় পেরিয়ে। অথবা মহাপৃথিবীর পথ—ভূগোলের পাতায় পড়া কন্যাকুমারী আর তুষার-শৃঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে যার অজানা পরিক্রমা!

কাঞ্চনের কাকচক্ষু জল—সে স্বপ্ন। শহর মুকুন্দপুর—কোথাও কি তা আছে, কোথাও কি ছিল? মিত্রা—করুণাদি—স্বতপা। ঘুমের ঘোরে যেন কতগুলো ছায়ামূর্তি অতি লঘুছন্দে তার চেতনার ওপরে পদচারণা করে গেছে। আজ এই মুহূর্তে একটা মৃদুগন্ধের আমেজের মতো তারা মনের মধ্যে ঘুরে ফিরছে, আর কোথাও নেই তারা—আর কিছুই নেই।

যেন চটক ভাঙে। নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—আমি কে? ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় বৈরাগ্যভরা একটা শান্ত জিজ্ঞাসা। আমি কোথায় ছিলাম?

আশ্চর্য মানুষের মন। যেন কিছুই হয়নি—যেন এই ঘন মহুয়াবনের মধ্যে, এই নিরালা নির্জন ছায়ায় সে একজন নতুন মানুষ। তার পৃথিবী আলাদা—তার পরিচয় আলাদা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন মনে পড়েছে:

"আমি এলাম ভাঙল তোমার ঘুম—
ফুটল শূন্যে তারায় তারায় আনন্দ কুসুম—"

আমি এলাম। এলাম নতুন হয়ে—আবিষ্কার করলাম নিজেকে এক অজানা নতুন জগতের পরিবেশে। কিন্তু কার ঘুম ভাঙল? পৃথিবীর? আকাশের? এই মহুয়াবনের?

অনেকদিন পরে কবি রঞ্জন জেগে উঠেছে—সাড়া দিচ্ছে হারানো দিনের সেই স্বপ্ন-শিল্পী। চরম বিপর্যয়ের ভেতরেই কি এমনি চূড়ান্ত করে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেল তার মন? কঠিনতম জগতের মাটিতে বাস করেও যে চিরকাল মনের মধ্যে খুঁজে ফিরছে স্বপ্নের ছায়াপথকে, এই একান্ত নিভৃত আর বিচিত্র অবকাশে সে কি নিজের সেই অপরূপ

জগৎটাতে ফিরে গেছে ?

আজ তার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। আশ্চর্য, আজ এই মুহূর্তে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে তার। অদ্ভুত মানুষের মন। এতদিন ধরে যে নানা টান-পোড়ানের মধ্যে বুক দুলছিল, সঞ্চিত হয়েছিল যা কিছু সংশয় আর সমস্যা, কে যেন তাদের সব কিছুর ওপর দিয়ে টেনে দিয়েছে একটা সমাপ্তির সীমারেখা। সব মিলিয়ে গেছে, সব ছায়া হয়ে গেছে—পাক খেয়ে মিলিয়ে গেছে একরাশ কুয়াশার মতো।

এই মহুয়াবনের মধ্যে, এই ঝিরঝিরে বাতাসে এ কি তার নবজন্ম ? পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাথার ওপরে স্নিগ্ধ নীল আকাশ ; ডালে ডালে হরিয়ালের নাচ। ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির আওয়াজ শোনার মতো মহুয়া পড়বার শব্দ, একটা মিষ্টি স্বপ্নের আমেজের মতো মহুয়ার বিহ্বল গন্ধ। বাতাসেও যেন মহুয়ার নেশা ছড়িয়ে পড়েছে, আড়ষ্ট হয়ে আসছে চোখের পাতা। গান তো গাইতে জানে না, একটা কাগজ কলম থাকলে নিশ্চয় কবিতা লিখত।

কী কবিতা ? 'আমি এলাম, ভাঙল তোমার ঘুম'—রবীন্দ্রনাথের লাইন। ওই লাইনটা ওরও মনের ভেতরে ঘা দিয়ে দিয়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলতে চাইছে। একটা সুরের পাগলা দমকা হাওয়া এসে অন্য সুরের দরজা খুলে দিতে চাইছে যেন।

অথচ—

অথচ কী বিচিত্র একটা অবস্থা। কোথা থেকে কোথায় এসেছে সে—কী আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য বিপর্যয়ের পথ বেয়ে। তবু এখন যেন কিছুই নেই। ফিরে এসেছে স্মৃতির গভীরে হারিয়ে যাওয়া আত্রাই—তালবীথির ঘন নিবিড় বৈঁচিবনের ছবি। ছেলেবেলায় প্রকৃতি হাতছানি দিয়েছিল, মন ভুলিয়েছিল তালবীথির সংকেত দেওয়া দিগন্তের ইঙ্গিতে। আজ তারা রঞ্জনকে ফিরে পেল, সেও ফিরে পেয়েছে তাদের।

পৃথিবী। চারদিকে প্রকৃতি তাকে পরিপূর্ণ করে জড়িয়ে নিয়েছে আজ। শহর মকুন্দপুর—বিপ্লবীর স্বপ্ন। কিছুই নেই। এই তো প্রকৃতি—যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, নেই সমস্যা, নেই সংঘাত। এইখানেই কি এতদিনের হারিয়ে-যাওয়া মন ফিরে পেলো নিজেকে, কবি রঞ্জন ফিরে এল নিজের সত্তায় !

লাল মাটির ছোট বড় টিলা। তারই ওপরে সারি সারি মহুয়ার গাছ। আকাশে রোদ বাড়ছে—দুপুরের উত্তাপে যেন ঘন হয়ে উঠছে গন্ধের নেশা, আরো তীব্র হয়ে উঠছে, আরো নিবিড়। দুটো টিলার মাঝখানে একটা নিচু গর্তের মতো জায়গা—চারপাশে মহুয়াপাতার ছায়া—সেইখানে চুপ করে শুয়ে আছে রঞ্জন। শুয়ে আছে স্বপ্নব্যাকুল অর্ধমুদ্রিত চোখ মেলে।

সময় কেটে যাচ্ছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে রোদ দোলা খেয়ে চলেছে মুখের ওপর। কেউ নেই কোথাও—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধের মতোই উঁচু রাস্তাটা থেকে

অনেক দূরে সরে এই মহুয়াবনের মধ্যে আসবার সম্ভাবনাও নেই কারো। 'আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে।' কে এল? কবিতাটার অর্থ জানে না রঞ্জন, তবু মনে হল একটা কিছু যেন সে বুঝতে পেরেছে এই মুহূর্তে। বহুকালের একটা বন্ধ জানালা হঠাৎ খুলে গিয়ে রোদের ঝলকানির মতো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এর মর্মকথা। কে এল? আমি এলাম, তাই কি প্রকৃতি আবার ফিরে এল আমার কাছে? যে আকাশে রক্তের বহ্নি-শিখা শুধু ঝলমল করত সেদিন, আজ কি সেখানে নতুন করে: "ফুটবে শূন্যে তারায় তারায় আনন্দ কুসুম?"

হঠাৎ চমকে উঠল সে। আত্মদর্শনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অতি বাস্তব, অতি ভংকর একটা সম্ভাবনার সংকেতে। খট্ খট্ করে দ্রুত কতগুলো পায়ের শব্দ।

রক্তে বিদ্যুৎ বইল। তীরের মত উঠে বসল রঞ্জন।

না—মানুষ নেই কোথাও। একপাল ছাগল ছুটে আসছে, শুধু ডাকছে ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে। কিন্তু একপাল ছাগল? পেছনে নিশ্চয় রাখাল আসছে। শরীরটা আতঙ্কে শক্ত হয়ে এল।

কিন্তু না—রাখাল তো নেই। ওদের পেছনে তাড়া করে আসছে পাটকিলে রঙের দুটো শেয়াল। মাত্র দুটো শেয়াল—আয়তনেও এমন কিছু বড় নয়; কিন্তু তাদেরই ভয়ে এতগুলো ছাগল পালিয়ে আসছে এমন করে! অথচ একবার যদি বড় বড় শিংগুলো বাঁকিয়ে ফিরে দাঁড়াতো—

স্বাভাবিক একটা সংস্কারবশেই উঠে দাঁড়ালো সে। গোটা দুই ঢিল ছুঁড়ল শেয়াল দুটোকে লক্ষ্য করে। ফলে শেয়ালগুলো ছুটল জঙ্গলের দিকে, আর ছাগলের পাল মহুয়াবন পেরিয়ে সেজো বেরিয়ে গেল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উদ্দেশে।

আবার শুয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় বনের মধ্যে থেকে ছাগলের আর্তনাদ উঠল: ব্যা-ব্যা—

সে কি! সবগুলোই যে রাস্তার দিকে ছুটে গেল! তবে?

উঠে পড়ল আবার—মহুয়াবনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল ছাগলের ডাক অনুসরণ করে। খানিকটা এগোতেই একটা চমৎকার দৃশ্য পড়ল চোখে।

করিৎকর্মা জাত শেয়াল—কোনো সন্দেহ নেই এ বিষয়ে। কোন্ ফাঁকে দলছাড়া একটা মস্ত ছাগলকে এদিকে তাড়িয়ে এনেছে, খেয়াল করতে পারেনি সে। সামনেই একটা ঘোলা পচা ডোবা, যূথভ্রষ্টকে একেবারে তারই ভেতরে নিয়ে গিয়ে নামিয়েছে। একগলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আর্ত চিৎকার তুলেছে ছাগলটা, আর শেয়াল দুটো ঝপঝপ করে জল ভেঙে এগিয়েছে তার দিকে। আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায়, অবর্ণনীয় আতঙ্কে অসহায় প্রাণীটা থরথর করে কাঁপছে।

আবার একটা তাড়া দিতেই জল থেকে উঠে জঙ্গলের দিকে সরে পড়ল শেয়াল দুটো। ছাগলটা জলের মধ্যে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—যেন মুক্তির ব্যাপারটা এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর উঠে এল কাঁপতে কাঁপতে, ছুটে পালিয়ে গেল মহুয়াবন পার হয়ে।

নিজের জায়গায় ফিরে এল সে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ পিছলে পিছলে পড়ছে লাল মাটির টিলার এখানে ওখানে, জলছে ছোট ছোট কাঁকর, রাশি রাশি বালি-পাথরের টুকরো। নির্জন বন ভরে শুকনো পাতার ওপর টুপটাপ করে মহুয়া পড়বার শব্দ ; ডালে ডালে হরিয়ালের নাচ। উত্তপ্ত মদির গন্ধ নেশায় আবিষ্ট করে আনতে চায়, ভারী হয়ে আসতে চায় চোখের পাতা।

কিন্তু বনের স্বপ্ন কেটে গেছে, মন থেকে মুছে গেছে প্রকৃতি-বিলাস। এমন সুন্দর, এমন আশ্চর্য কবিতায়-ভরা দুপুরের মোহ-মদির মহুয়াবনের মধ্য থেকে কালো হিংসার একটা ছায়ামূর্তি মাথা তুলেছে ; এক মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে সমস্ত।

সব এক—সব একরকম। কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই জটিলতায় জর্জরিত শহর মুকুন্দপুরের সঙ্গে এই কাব্যময় অপরূপ মহুয়া-বীথিকার। এক নীতি—একটিমাত্র সত্য। ওই শেয়াল দুটো চেনা, প্রতিদিনই তো আশে-পাশে ঘুরে বড়ায় ওই ছাগলের পাল। ছত্রিশ কোটি মানুষ আমরা—একবার যদি মাথা তুলে দাঁড়াই তা হলে কতক্ষণ সময় লাগে এই বিদেশী অত্যাচারের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে ? কিন্তু আমরা কোন-দিনই দাঁড়াবো না, ওই ধনেশ্বর আর তার সাদা মালিকের দল এমনি করেই আমাদের ঠেলে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে অনিবার্য অপঘাতের মধ্যে।

অকস্মাৎ মহুয়াবনের এই গন্ধভরা বাতাসকে অত্যন্ত বিষাক্ত বলে মনে হল, মনে হল ঝিরঝিরে মহুয়ার পাতায় যেন কাদের চক্রান্তভরা একটা কুটিল ফিস্‌ফিসানি কানে আসছে। জলজল রোদের ফালিগুলোতে বুঝি কোনো একটা হিংস্র শ্বাপদ থাবা মেলে রেখেছে তার। প্রকৃতি! প্রকৃতির যেন একটা নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ল তার কাছে। আজ এই নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির বুকে একটি প্রাণীর প্রাণ বাঁচাতে একজন মানুষের প্রয়োজন হল। আশ্চর্য, পৃথিবীর হিংসাকে যে জয় করতে পারল সে একজন মানুষ।

ঘোর ভেঙে গেল। হঠাৎ আর একটা রাত্রির কথা মনে পড়ল তার। চিন্তার মোড়টা ঘুরে গেল সম্পূর্ণ অন্যদিকে।

মনে পড়ল বাবার সঙ্গে গোরুর গাড়িতে করে ফিরছিল আলোয়াখাওয়ার মেলা দেখে। মাঝরাত্রে নামল প্রচণ্ড ঝড় আর প্রবল বৃষ্টি। বাতাসের ঘায়ে চট উড়ে গিয়ে বৃষ্টির ঝাপটায় সব ভিজে যেতে লাগল, কাপড়ের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল গায়ে। মনে হতে লাগল দুপাশের মাতাল কালো অরণ্য এক্ষুনি বা ভেঙে পড়বে

তাদের ওপর—পিষে তাদের চুরমার করে দেবে।

তবু গাড়ি চলছিল। হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ। পা ভেঙে বসে পড়ল বলদ, বুক-সমান কাদায় গাড়ির চাকা আটকে গেছে। গাড়োয়ান শুষ্ক কণ্ঠে বলল, পিছারির গাড়ি না আসিলে গাড়ি উঠিবে না বাবু। বড় ভারী 'ডহ' আছে।

প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মতো ঘন জঙ্গলকে ঝাঁকাচ্ছে ক্ষ্যাপা ঝড়।

কালো অন্ধকার, আকাশে কড়্ কড়্ করে ফেটে যাচ্ছে একটা অতিকায় ইস্পাতের পাত। গাড়িতে বসে ভিজতে ভিজতে অসহায় আকুলতার সঙ্গে মনে হয়েছিল কোনো মন্ত্রবলে কি এখন ফিরে যাওয়া যায় না তাদের মুকুন্দপুরের বাড়িতে, ঘরের স্নিগ্ধ নিরাপদ আশ্রয়ে? খর-বিদ্যুৎ-ঝল্‌সে-যাওয়া চোখের সেদিন প্রথম প্রকৃতিকে শত্রু মনে হয়েছিল তার, সেদিন প্রথম—

স্মৃতির মধ্য থেকে ভেসে এল কিছুদিন আগে পড়া মাসিকপত্রের একটা প্রবন্ধ। একজন বিদেশী বিদ্রোহী কবি বলছেন নিজের আত্মজীবনীতে: "অন্ধকারে আমরা পথ হারাইলাম। চারিদিকে ঘন কুয়াশা ও নিবিড় অরণ্য। কাঁটালতায় সর্বাঙ্গ ছিঁড়িয়া যাইতেছে। নির্জন আরণ্যক পাহাড়ে আমরা একান্ত অসহায়। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটি বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলো আসিয়া পড়িল। আর সেই মুহূর্ত হইতে একদিকে যেমন আমি প্রকৃতিকে ঘৃণা করিতে শিখিলাম, তেম্‌নি সেই সঙ্গে শিখিলাম বিজ্ঞানকে ভালোবাসিতে—"

এই তো সত্য। এই প্রকৃতিপ্রেম, এই মুগ্ধতা—নিজেকে ফাঁকি দেওয়া, জীবনকে বঞ্চনা করা। প্রকৃতির পরিণতিই তো শহর মুকুন্দপুর। সেই মুকুন্দপুরকে আরো বড়, আরো বিস্তীর্ণ করাই তো বিপ্লবীর স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতবর্ষের সত্যিকারের স্বাধীনতা। কাঞ্চনের নাল জলে কালী থাকে কিনা রঞ্জন তা জানে না, জানবার কৌতূহলও আর অবশিষ্ট নেই এখন; তবে এটা আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে সেই অলৌকিক ভয়ের চেয়ে ঢের সত্য ওই লোহার পুলটা, ক্ষুধিতা কালীর চাইতে ঢের বেশি সত্য গাড়ির কামরায় ঘুমন্ত আর নিশ্চিন্ত মানুষগুলো।

'আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—'

ঘুম ভাঙবে বইকি। কিন্তু নিজে ঘুমিয়ে পড়ে নয়, প্রকৃতিকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে দিয়ে। শিলালিপির ফলকে প্রথম ফুটে উঠল জীবনবোধের অক্ষয় স্বাক্ষর।

না—প্রকৃতি নয়। মিথ্যে হয়ে যাক মহুয়াফুলের এই মাদকতা, এই নেশার উত্তপ্ততা। আজ সত্য হয়ে উঠুক শহর জনপদের ধুলো, গাড়ির চাকার শব্দ, আর সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ, অজস্র সংঘাত-চঞ্চল অসংখ্য, অগণিত মানুষ!

নিশিরাত্রি। ঘুম ভেঙে গেল একটা বিশ্রী গোলমালে।

ধড়মড় করে উঠে বসল রঞ্জন। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে। তা হলে কি সত্যিই পুলিস এসে পড়ল? বিছানার তলা থেকে রিভলভারটা নিয়ে সে খাটিয়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। চেম্বারে একটা টোটা থাকা পর্যন্ত 'সারেণ্ডার' করবে না।

দরজায় টোকা পড়ল আস্তে আস্তে।

—কে? কে?

—ডর নি খাও বাবু, আমি ফৈয়জ।

আশ্রয়দাতা ফৈয়জ মোল্লা। ওদের দলের সঙ্গে ফৈয়জের কী একটা যোগাযোগ ছিল, তারই সূত্র ধরে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌচ্ছেছে রঞ্জন, আশ্রয় পেয়েছে।

—বাইরে কিসের গণ্ডগোল ফৈয়জ ভাই? পুলিস নাকি?

—না না, তোমার ডর নাই। দুই ভাই জমি লিই কাজিয়া করোছে।

—মারামারি হচ্ছে বুঝি?

—হাঁ, হচে। তুমি নি ডরাও, শুতি থাকো।

লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ উঠছে, উঠছে পৈশাচিক চিৎকার। রঞ্জন জানতে চাইল সভয়ে: খুনোখুনি হবে নাকি!

দরজা ঠেলে এতক্ষণে লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকেছে ফৈয়জ হেসে বললে, হবা পারে।

—সর্বনাশ! সে কি! আমি যাচ্ছি—

—ক্যানে ব্যস্ত হচ্ছেন?—ফৈয়জ হাসল: বহুৎ মানুষ জড়ো হই গেইছেন, তুমি ঠ্যাকাবা নি পারিবেন মানুসিলাক। ফের তো তুমাক্ একটা বল্লম মারি দিবে হয়। যাবা দাও—যাবা দাও। অমন ত এইঠে হামেশাই হছে।

কথাটা ঠিক। তা ছাড়া খেয়ালই ছিল না সে ফেরারী—এখানে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে। এ অবস্থায় ওদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঙ্গা-টাঙ্গা থামানো তো যাবেই না, বরং দাঙ্গার মধ্যে নিজেকে নিয়েই ঝামেলা বেধে যাবে।

ক্ষুব্ধ হতাশায় বললে, কিন্তু দুই ভাই মারামারি করছে! আপন ভাই?

—না তো কী!—ফৈয়জ হতাশভরে বললে, জমি বড় বদ চীজ জী। আর অদেরও দোষ নাই। পাছত্ শয়তান লাগিলে কী করিবে উমরা?

—শয়তান?

—শয়তান তো। জোতদার আমীন মুন্সীর ঘর দেখেন নাই? ওই উদিকে পাকা দালান, বড় বড় ধানের মরাই? ভারী বদমাস উ। ই জমিটা বড় ভালো জমি—ইটা লিবার মতলব করোছে। তাই মতলব দিই দিই দোনা ভাইয়ের কাজিয়াটা লাগাইলে। দুটো একটা খুন হেবে, জেল হেবে, মামলা করি করি সবাই হই যিবে, তো পই জমিটা অর প্যাটত্ যাই সাঁন্ধাইবে।

—চমৎকার মতলব—খাসা মতলব।

—খাসা তো!

দূরের থেকে চিৎকার আর লাঠির শব্দ আসছে সমানে। একটা অবর্ণনীয় ভয় আর বেদনায় যেন পাথর হয়ে বসে রইল সে। ফৈয়জ মোল্লা ক্লান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

—এই করিই তো হামাদের চাষার সর্বনাশ হছে বাবু। হামাদের ভালোমন্দ হামরা বুঝি না, উয়ারা য্যামন করি হামাদের নাচায়, সেই পাকে হামরা নাচোছি। উয়ারা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাই দেয়, হামরা মারামারি আর কাজিয়া করি, মাথা ফাটাই। ফের অরা 'দেওনিয়া' (উকিল-মোক্তারের দালাল) হই হামাদের শহরত্ উকিলের পাস লিই যায়, মামলা করি, সব হামাদের চলি যায় অদেরই প্যাটে। এই তো সবঠে হছে বাবু—দুনিয়াটা এমনি করিই চলোছে!

দুনিয়াটা এম্‌নি করেই চলছে বটে। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে রিভলভারটা আঁকড়ে ধরলে রঞ্জন।

—তোমরা কেন দল বাঁধো না? কেন নিজেদের মধ্যে মারামারি করো? সবাই মিলে একজোট হয়ে নেমে পড়লে দুদিনেই তো ঠাণ্ডা করে দিতে পারো এই সব শয়তানদের!

—হায় হায় বাবু, এত বুদ্ধি যদি চাষার হইত, তবে তো মানুষই হইত উয়ারা—কপালে করাঘাত করলে ফৈয়জ।

—হুঁ:—

চুপ করে রইল রঞ্জন। স্মৃতির পটে ছবি ভেসে উঠেছে, দেখা দিয়েছে পিছনে ফেলে আসা বিস্মৃতপ্রায় শৈশবের একখানা ছবি। নিশিকান্ত। ধনঞ্জয় পণ্ডিত যাকে মুখ ভেংচে বলতেন: নিশ্‌শি-খান্ত। যার কানে হাত দিতে গিয়ে সে অগ্নিস্পৃষ্টের মতো হাত সরিয়ে এনেছিল। যে নির্বোধ পরম সহিষ্ণু নিশিকান্ত একদিন দায়ের কোপ বসিয়েছিল আপন খুড়োর গলায়, চাপ চাপ রক্ত দেখে মাথা আতঙ্কে ঘুরে উঠেছিল তার। রঙ্—খুন খারাপীর রঙ্।

বাইরে থেকে চিৎকার আসছে সমানে। সে নিশিকান্ত আর আজকের দিনের এই দাঙ্গা—এদের পেছনে একই সত্য—একমাত্র ইতিহাস। কিন্তু সেদিনকার নিশিকান্ত অগ্নিপুত্তলি হয়ে শুধু নিজের খুড়োকেই আঘাত করতে পেরেছিল, আজকের এরাও আত্মঘাতটাকেই জেনেছে একমাত্র সত্য বলে। কিন্তু কোনোদিন এই আগ্নেয় মানুষগুলো কি একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠবে না, জ্বালিয়ে শেষ করে দিতে পারবে না পৃথিবীর যত আমীন মুন্‌সীদের?

ফৈয়জ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: আচ্ছা বাবু?

—বলো।

—তোমরা তো দেশ থাকি ইংরাজক তাড়াবা চাহেন ?

—হ্যাঁ, সে তো চাই।

—কিন্তু হামাদের কী হেবে ?

—কেন, দেশ স্বাধীন হবে।

—হুঁ—সি তো হেবে—ফৈয়জ অপরাধীর মতো বললে, সিটা হেবে কি না হেবে উট লিয়ে হামরা ভাবি না। ইংরেজ গেলে আমীন মুন্সীর কাজ থাকি হামাদের জমি জিরাতগুলান্ কি ফিরি আসিবে ? প্যাট ভরি খাবা পামু হামরা ? কহেন বাবু, হামরা চাষী মানুষ, সিটাই হামাদের কহেন।

রঞ্জু চুপ করে রইল, জবাব দিলে না।

—ইটা যদি না হৈল্ তো ফের ইংরাজ গেলেই কি ফের রহিলেই কি ? হামাদের খাজ্‌না তো ইংরাজ ল্যায় না, ল্যায় তশিলদারে। সার্টিফিকিট—সিতো করে জমিদার। হামাদের সব খাই ল্যায় আমীন মুন্সী আর মহাজন—ইংরাজ তো ল্যায় না। কহেন, ইংরাজ গেলেই ইগিলা সব মিটিবে কী ?

চুপ করেই সে রইল। আশ্চর্য সব প্রশ্ন করেছে ফৈয়জ মোল্লা, আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিত। এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুতি নেই তার, তার জানা নেই এ সবের উত্তর। কিন্তু—কিন্তু—বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে হল : তাই তো। এদের শত্রু তো ইংরেজ নয়। এদের যারা প্রত্যক্ষ শত্রু তাদের হাত থেকে এই মানুষগুলিকে বাঁচাবার জন্যে কোন পথের নির্দেশ দিতে পেরেছে ওরা ? তাই কি বিপ্লবীদের এত বড় আত্মত্যাগের আহ্বানেও সাড়া দিতে পারেনি দেশের সমস্ত মানুষ ? তাই কি এত রক্ত —এত মৃত্যু শুধু ব্যর্থ হয়ে গেছে, দেশের মর্মকেন্দ্রে তা বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য দিতে পারেনি জাগিয়ে ? ফৈয়জ মোল্লার ঐ প্রশ্নের জবাব বেণুদা তো কোনোদিন দেননি।

তবে ?

সেই বইটা। সেই অবহেলিত, প্রায় দুর্বোধ্য কাগজের মলাট দেওয়া চটি বইটা। সব বুঝতে পারেনি—কিন্তু হঠাৎ যেন মনে হল সেই সতীত্বহীন দেশের মানুষগুলো অন্তত এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছিল। কিন্তু।—

রঞ্জন কোন কথা বলতে পারল না : শুধু তেম্‌নি নিথর হয়ে বসে শুনতে লাগল বাইরে জনতার রাক্ষস-গর্জন।

প্রায় তিনটা মাস দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল যেন।

কী করে যে এই সময়টা কেটে গেল ভাবতেও আশ্চর্য লাগে দস্তুরমতো। তিন মাস আগেকার ভীরু, সুখী মানুষটি আজ কোনো দিক থেকে নিজেকে চিনতে পারে না। কী অদ্ভুত ভাবে এক একটা দিন কেটে গেছে তার। জঙ্গল—সে তো আছেই, গাছের ডালে

রাত্রিবাসও হয়েছে। এমন দিন গেছে যে নদীর জল খেয়েই খিদে মেটাতে হয়েছে তাকে। পোড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছে, দিন কাটিয়েছে একটা উবুড় করা ভাঙা নৌকোর তলায়। একদিন রাত্রে চৌকিদারের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল রাস্তার একটা কালভার্টের নিচে। এককোমর পচা দুর্গন্ধ জল সেখানে। সর্বাঙ্গে পাঁচ-সাতশো জোঁক ধরেছিল সেদিন, মশায় নাক মুখ ফুলে দিয়েছিল মনে আছে। দুর্ভোগের চূড়ান্ত হয়েছিল বললেও যেন কথাটাকে কম বলা হয়।

আর মানুষ! কত রকমের মানুষ—কত আশ্চর্য মানুষ।

হাটের গাড়ির লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের গাড়িতে উঠে পথ পাড়ি দিয়েছে; হাটখোলার চালাঘরে ছেঁড়া চট মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়েছে, সকলের সঙ্গে চিবিয়ে মুড়ি আর ছোলাভাজা খেয়েছে। একদিন কয়েকটা লোক তাকে তাড়া করল, এক যাত্রার আসরে ভিড়ে গিয়ে রক্ষা পেল সেযাত্রা। দুপুরবেলায় ক্লান্ত-পথ্ চলতে চলতে জল আর বাতাসা খেল জলসত্র থেকে, বাবুর বাড়ির নাটমন্দিরের অন্ধকারে কোণায় বসে খেল প্রসাদ। কত জায়গায়, কত রকম ভাবে আশ্রয় জুটল তার। দুবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, একবার সে রেহাই পেয়েছে, সেটা নিতান্ত দৈব-ঘটনা বলে মনে হয় যেন।

কিন্তু আর নয় —আর সে পারছে না।

কতদিন এমনভাবে চলবে লুকোচুরি—চলবে এমন করে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের একটা ক্লান্ত কঠোর বোঝা বয়ে বেড়ানো? বিপ্লবী উল্কার এইভাবেই কি পরিনির্বাণ ঘটল শেষে? দলের সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একমাত্র একটুখানি সংযোগসূত্র ছিল পরিমল, সেও ধরা পড়েছে। নিজের সম্পর্কে একটা নিরাসক্তি এসেছে আজকাল. ক্লান্তি এসেছে, এসেছে হতাশা।

সে একা। সে ছেলেমানুষ—অন্তত বেণুদা এই কথাই বলতেন! একটা রিভলভার দিয়ে কী করতে পারবে সে—করতে পারবে কোন্ মহৎ এবং বৃহৎ কাজ?

শুধু মনে হচ্ছে, কিছুই হল না, কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। যেমন করে বারে বারে এত সৈনিকের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি করে ওরাও তলিয়ে যাবে অর্থহীন ব্যর্থতার আড়ালে। দেশ কোনোদিন স্বাধীন হবে না—কোনোদিনই না।

কোনো দিনই না?

এ কথা ভাবা অসম্ভব। ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন পর্যন্ত সকলেই কি ছুটেছিলেন একটা অবাস্তব আলেয়ার পেছনে! এ যদি সত্য হয় তা হলে জীবনের কোনো মূল্য থাকে না, থাকে না এতটুকুও মূল্য। 'বীরের এ রক্তস্রোত—মাতার এ অশ্রুধারা—'

কিন্তু অস্বস্তি লাগছে। আগের স্টেশনে একটা লোক তার কামরার সামনে দিয়ে পায়চারি করে গেছে বারকতক। লোকটার চোখের দৃষ্টি যেন কেমন কেমন, মনকে

সংশয়ী করে তোলে। এই তিন মাসের মধ্যে যে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ সে বয়ে এল, তাতে শিকারীর চোখ সে চিনতে পারে দেখলেই।

সুতরাং গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হবে। সরে পড়তে হবে যত শীগ্‌গির সম্ভব। রঞ্জন গলা বার করে চলন্ত গাড়ি থেকে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে মেল ট্রেন—চলেছে যেন ঝড়ের ছন্দে। মুখ বার করতেই রাত্রির বাতাস এসে উড়ন্ত একটা কালো বাদুড়ের ডানার মতো ঝাপ্‌টা মেরে দিলে গালে কপালে।

কতগুলো আলো উঠল ঝলমলিয়ে। লাল সবুজ নানা রঙের আলো। একরাশ সিগন্যাল। ঘট ঘট করে একটা বিমিশ্র আওয়াজ পাওয়া গেল গাড়ির চাকার, আর লাইনের জোড়ে জোড়ে। স্টেশন।

মেল ট্রেন এসে দাঁড়াল। স্টেশনের নামটা পড়া যাচ্ছে না, কিন্তু কুলির চিৎকার উঠেছে। নাটোর—নাটোর!

নাটোর! কী একটা স্মৃতি চেতনার মধ্যে নড়ে উঠল চকিতে সরীসৃপ গতিতে। একটা চমক লাগা দুর্বোধ্য প্রেরণায় রঞ্জন হঠাৎ নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। চলল অন্ধকার প্ল্যাটফর্মটার পাশ দিয়ে এগিয়ে।

রাত খুব বেশি হয়নি। শহরের ভেতরে এসে যখন ঢুকল প্রায় তখন সাড়ে নটার মতো হবে। খুব কি দেরি হয়ে গেছে? বোধ হয় না। অন্তত করুণাদিকে বিরক্ত করবার পক্ষে নিশ্চয়ই যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে যায়নি।

ঠিকানাটা যোগাড় করতে অসুবিধে হল না বিশেষ। গোটা দুই মোড় ঘুরতেই একটা কাঁচা ড্রেনের পাশে একতলা পুরনো বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ির সামনেই একটা ল্যাম্পপোস্ট, তার ম্লান আলোয় দেখা গেল নেম-প্লেট, ক্ষয়ে-যাওয়া কালো টিনের পাতের ওপর বিবর্ণ কতগুলো পুরনো অক্ষর; এ. এন. ঘটক, বি-এল। উকিল, নাটোর।

একবার মাত্র দ্বিধা। তারপর মনকে শক্ত করে কড়ায় ঝাঁকুনি দিলে।

দরজা খুলে গেল। উদ্‌ঘাটিত হল একটি উকিলের পুরনো সেরেস্তা। ভাঙা চেয়ার, ময়লা টেবিল, কাচভাঙা আলমারিতে রাশীকৃত বই আর পুরনো কাগজপত্র। চশমাচোখে পাকাচুল এক ভদ্রলোক দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন লণ্ঠন হাতে। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, কী চাই?

—আমি করুণাদির সঙ্গে দেখা করব।

—করুণাদি! মানে বৌমা? কোত্থেকে আসছেন আপনি?—ভদ্রলোকের ভ্রূরেখা আরো কুঞ্চিত হয়ে উঠল এবারে।

—আমি তাঁর দেশের লোক।

—আচ্ছা বসুন, খবর দিচ্ছি—

সামনেই একটা আধভাঙা বেঞ্চি, খুব সম্ভব মক্কেলদের জন্যে। তারই ওপর বসে পড়ল সে। কী করে বসেছে নিজেই যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। এ কি ভালো হল? ভালো হল এমন করে ঝোঁকের মাথায় এখানে চলে আসা? তাছাড়া, তাছাড়া—হঠাৎ চমকে উঠল: বেণুদার মৃত্যুর কথা সে ভুলে গেল কী করে? সে শোকের আঘাত করুণাদির বুকে কী ভাবে বেজেছে তা তো কল্পনা করা অসম্ভব নয়। এর পরে কেমন করে সে করুণাদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, কেমন করে সে—

মনে হল উঠে পালিয়ে যায়, এক মুহূর্ত এখানে তার বসা উচিত নয়। করুণাদি এ পথ তাকে ছাড়তে বলেছিলেন। এই পথ সম্পর্কে অমানুষিক ভয় ছিল তাঁর, ছিল সীমাহীন আতঙ্ক। আর এর জন্যে তাঁকেই দিতে হল চরম মূল্য, পরিশোধ করতে হল এর সমস্ত ঋণ—

উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় ওপাশের দরজার পরদা ঠেলে করুণাদি এসে দাঁড়ালেন।

—এ কি, এ কি রঞ্জন!

কাঁপা অনিশ্চিত গলায় রঞ্জন বললে, আমি ফেরারি করুণাদি, এখন আমার নাম প্রবোধ।

কেমন অদ্ভুত একটা শূন্য বেদনাময় দৃষ্টিতে তাকালেন করুণাদি। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ে উঠল তাঁর, কয়েক মুহূর্ত একটা শব্দও বেরুল না। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললেন, এসো ভাই, ভেতরে এসো।

রঞ্জন দ্বিধা করতে লাগলো।

—কোনো লজ্জা নেই, এসো প্রবোধ। লণ্ঠন হাতে সেই বৃদ্ধ ফিরে এসেছেন। চোখে তাঁর তেমনি ক্রূর সংশয়ীয় দৃষ্টি। করুণাদি বললেন, এ আমার মামাতো ভাই প্রবোধ, ওঁকে প্রণাম করো।

যন্ত্রচালিতের মতো বৃদ্ধকে প্রণাম করল।

এ. এন. ঘটক তবু ভ্রূ কুঞ্চিত করেই রইলেন। তারপর বিস্বাদ-বিরক্ত গলায় বললেন, জয়োস্তু!

লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় একটা টুলের ওপর স্থির হয়ে বসে আছে রঞ্জন। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে আছেন করুণাদি, একটা কথা ফুটছে না কারো মুখে।

শুধু পাশের ঘর থেকে উঠছে অবিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল চিৎকার: মেরে ফেললে, মেরে ফেললে আমাকে। অদ্ভুত, অমানুষিক চিৎকার। মানুষের গলা নয়, যেন প্রেতের কণ্ঠ। শব্দটা যেন পৃথিবী থেকে আসছে না, ঠেলে উঠছে পাতালের কোনো গভীর অন্ধকার থেকে। এক একটা চিৎকারে যেন গায়ের ভেতরে হিম হয়ে আসে—শুষে খেল, সব রক্ত শুষে খেল আমার—

অশ্রু-করুণ চোখ এতক্ষণে রঞ্জনের দিকে ফেরালেন করুণাদি: ওই শুনছ তো?

উনিই আমার স্বামী।

রঞ্জন অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নেই ভাই—করুণাদি বিকৃতভাবে হাসলেন: এইটেই সত্য। আজ এর চাইতে বড় সত্য আমার আর কিছুই নেই।

—আমি যাব ওঘরে?

—কী লাভ?—তেমনি হাসির রেখাটা করুণাদির মুখখানাকে বীভৎস করে রইল: পাগলকে দেখে কী করবে? ও একটা দুঃস্বপ্ন—শুধু মনকেই কালো করে দেবে তোমার, তার বেশি কিছুই নয়।

—কিন্তু কেন? কেন এমন হল?

দু হাতে মুখ ঢাকলেন করুণাদি। তারপর যখন হাত সরিয়ে নিলেন তখন দেখা গেল গালের পাশ দিয়ে তাঁর বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

—ভেবেছিলাম অনেক দিন আগেই তোমাকে সেকথা বলব ভাই। কিন্তু বলতে পারি নি, মুখে আটকে আসত। আজ আর দ্বিধা নেই, আজ যখন তুমি এসে পড়েছ তখন তোমাকে সব কথা বলবার জন্যই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছি। দাদার মৃত্যুকে আমি মেনে নিয়েছি, ও যে ঘটবে তা আমি জানতাম। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে এই যে দারুণ যন্ত্রণা, তিলে তিলে এই যে আমার শাস্তি—

শেষ হল না কথাটা। পাশের ঘর থেকে তেমনি পৈশাচিক আকাশ-ফাটানো চিৎকার উঠল: ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো নীলকণ্ঠ। আমার রক্ত খেয়ো না, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও নীলকণ্ঠ—

করুণাদি বললেন, শোনো।

আর একটা আশ্চর্য ভয়ঙ্কর কাহিনীর যবনিকা উঠল দৃষ্টির সামনে। বাইরের ঝাঁ ঝাঁ রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সে কাহিনী ঘরের মধ্যে যেন বিস্তার করে দিলে একটা হিম আতঙ্কের জাল।

অমিয় ঘটক। যেমন শক্তিমান, তেমনি বেপরোয়া মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে এখানে বসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু ওটা তার খেলামাত্র, তার সত্যিকারের পরিচয় ছিল একেবারেই আলাদা।

বিপ্লবী দলের নেতা সে। যেমন কঠোর, তেমনি নিষ্ঠুর। তার কাছ থেকেই বেণু চৌধুরী প্রথম এ পথের দীক্ষা গ্রহণ করে। সে-ই বেণু চৌধুরীকে রিভলভার ছুঁড়তে শিখিয়েছিল নিজের হাতে।

করুণাদির কিছু উপায় ছিল না। অমন শক্তিমান স্বামীর ইচ্ছাকে বাধা দেবার মতো জোর কোথাও ছিল না তাঁর মধ্যে। বিপ্লবী নেতা অমিয় ঘটক। তার পথ নিশ্চিত,

তাঁর সঙ্কল্প ভাটল।

দলের একটি ছেলে ছিল নীলকণ্ঠ। প্রিয়দর্শন তরুণ। গান গাইতে, বাঁশি বাজাতে পারত। সকলেই ভালোবাসত তাকে, অমিয় ঘটক ভালোবাসত সব চাইতে বেশি। কবি, শিল্পী নীলকণ্ঠ। রঞ্জনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল তার, তাই প্রথম দিন তাকে দেখেই করুণাদি অমন করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু কবি-শিল্পীর দুর্বলতা একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল অপ্রত্যাশিত একটা ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে। যেন হুড়মুড় করে আকাশটা এসে ভেঙে পড়ল মাথায়। নীলকণ্ঠের পাশের বাড়িতে একটি মেয়ে পড়ত ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে, আর তাকে গান শেখাত নীলকণ্ঠ। একদিন খবর পাওয়া গেল আত্মহত্যা করেছে মেয়েটি। আর —আর সে গর্ভবতী ছিল।

দিন তিনেক পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করল নীলকণ্ঠ। কিন্তু অমিয় ঘটকের চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারল না বেশিদিন। শহরের একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে এক বর্ষার রাত্রে বিচার হল নীলকণ্ঠের।

সে বিচারের ফলাফল যা যা হওয়া উচিত তাই হল। অনেক চিৎকার করেছিল নীলকণ্ঠ—অনেক কেঁদেছিল। কিন্তু নির্জন বাগান আর বৃষ্টির শব্দে সে চিৎকার কারো কানে যায়নি : সে কান্নায় অমিয় ঘটকের পাথরে গড়া মনে আঁচড় পড়েনি এতটুকুও।

কপালে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে গুলি করা হল নীলকণ্ঠকে। নিঃশব্দে পড়ে গেল সে। তারপর টুকরো টুকরো করে মাছ কোটার মতো করে কাটা হল তাকে—বস্তার মধ্যে ইটের টুকরো পুরে ফেলে দেওয়া হল বিলের মধ্যে। সারারাত নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিতে রক্তের একটা বিন্দুও অবশিষ্ট রইল না কোনখানে।

পরদিন থেকে নীলকণ্ঠ নিরুদ্দেশ। সঙ্গতভাবে যা মনে করা উচিত তাই মনে করল সকলে। এই কেলেঙ্কারির পর স্বাভাবিকভাবেই ভয়ে আর লজ্জায় সে দেশছাড়া হয়েছে। কয়েকদিন আলোচনা করল, বাপ মা কান্নাকাটি করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, "নীলু, ফিরে আয়" তারপর তাকে ভুলেও গেল কিছুদিনের মধ্যেই।

কিন্তু একজন ভুলল না, ভুলতেও পারল না। সে অমিয় ঘটক।

পরের রাত থেকেই সে আর ঘুমুতে পারল না।

ঘুম এলেই স্বপ্ন দেখে। দেখে অতি ভয়ঙ্কর, পৈশাচিক একটা স্বপ্ন।

পাশে এসে দাঁড়ালো নীলকণ্ঠ। তার সর্বাঙ্গে রক্ত, তার চোখ দুটো জ্বলন্ত রক্তের পিণ্ড। কিছুক্ষণ সেই রক্তপিণ্ডের আগুন সে ছড়াতে লাগল অমিয় ঘটকের গায়ে। তারপর এক লাফে সোজা তার বুকের ওপর চেপে বসল।

সেইখানেই শেষ নয়। তারপরই যা ঘটল তা সৃষ্টির পরমতম বিভীষিকা। অতি বড় বীভৎস কল্পনাতেও সে বিভীষিকা ফুটে ওঠে না।

আস্তে আস্তে নীলকণ্ঠের মুখটা লম্বা হতে লাগল। ক্রমে তা মশার হুলের মতো দীর্ঘ স্থচালো হয়ে উঠল, তারপর সেই স্থচালো মুখটা সে বিঁধিয়ে দিলে অমিয় ঘটকের গলায়। তার চোখের রক্তপিণ্ড থেকে আগুন ছুটে পড়তে লাগল, সে শুষে খেতে লাগল অমিয় ঘটকের গলার রক্ত।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে জেগে উঠল অমিয় ঘটক।

কিন্তু শুধু এক রাত্রিই নয়। একদিন, দুদিন, তিনদিন। প্রতি রাত্রে ওই একই স্বপ্ন, একই বিভীষিকার পুনরাবৃত্তি। বস্তুবাদী কঠোর অমিয় ঘটক মাদুলী-তাবিজ নিলে, রোজা ডাকালো। ছুটে বেড়াল ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে। কিন্তু নীলকণ্ঠ তাকে ছাড়ে না। প্রতি রাত্রে, চোখে একটুখানি ঘুমের আমেজ নামলেই সে আসে, একটা গুরুভার পাথরের মতো চেপে বসে বুকের ওপর, তার মুখখানাকে স্থচালো দীর্ঘায়িত করে অমিয় ঘটকের রক্ত শুষে খায়।

অমিয় ঘটক পাগল হয়ে গেল।

পাঁচ বছর ছিল রাঁচীতে। ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় ডাক্তারে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছু হয়নি। ডাক্তারেরা বলেছে: Insanity—একটা প্রবল Psychological reaction-এর ফল। Beyond medical science।

কাহিনী শেষ হল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ শিখাটা আরো অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তেল নেই নিশ্চয়। বাইরে সীমাহীন স্তব্ধতায় পৃথিবী পড়েছে আচ্ছন্ন হয়ে। করুণাদির মুখ দেখা যাচ্ছে না।

—নীলকণ্ঠ, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। বাঁচাও আমাকে—

অমানুষিক প্রেতায়িত চিৎকার। আতঙ্কে দাঁতে দাঁত বাজতে লাগল রঞ্জনের। সে দেখতে পাচ্ছে—চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রক্তাক্ত নীলকণ্ঠের দানবীয় মূর্তিটাকে। তার চোখ নেই, তা অগ্নিপিণ্ড, আর তাই থেকে গলিত আগুনের মতো রক্ত ক্ষরিত হয়ে পড়ছে। মুখটাকে স্থচালো প্রলম্বিত করে সে পিশাচমূর্তিটা রক্ত শুষে খাচ্ছে, মেটাতে চাইছে তার দানবীয় পিপাসা।

—নীলকণ্ঠ, আর নয়—আর নয়—

না, আর নয়। এ বাড়ি যেন ভূতে পাওয়া। করুণাদিও যেন ভূতগ্রস্ত। কাল ভোর না হতেই এ অভিশপ্ত পরিবেশ ছেড়ে চলে যাবে, এক মুহূর্তও আর থাকবে না···

···সকালে নাটোর স্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে কাঁধে হাত পড়ল তার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফিরে তাকালো।

দুটো রিভলভার উদ্যত হয়ে আছে তার দিকে, আট-দশজন পুলিস এসে ঘেরাও

করেছে। যাক্, কিছুই আর করবার নেই তাহলে।

ট্রেনের সেই লোকটা মিষ্টি করে হাসল : আজ সাতদিন বড় ভুগিয়েছেন আমাদের। এবারে চলুন।

—চলুন—শান্ত স্বরেই উত্তর দিলে রঞ্জন।

আঠারো

জেল হাজতেই দেখা করতে এল ধনেশ্বর।

তীক্ষ্ণ চোখ দুটো বার কয়েক নেচে উঠল তার, তারপরেই কোঁৎ করে একটা মশা গিলে নিলে।

ধনেশ্বর হাসল : ফিরে এলে তা হলে। বেশ বেশ।

লোহার কপাটের মতো ঠোঁট দুটোকে শক্ত করে চেপে রইল রঞ্জন, উত্তর দিলে না।

—ভালো কথা তখন কানে গেল না—এবার ট্রান্সপোর্টেশন ফর্ লাইফ—সেইটেই সুখের হবে, কী বলো? ওয়েল, উই উইল্ মিট্ র্যাদার অন্—

তারপর যে দেখাসাক্ষাৎগুলো ঘটেছিল তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। প্রথম দিন যখন ধনেশ্বরের হান্টার গায়ে পড়েছিল, তার চাইতে অনেক শক্ত হয়ে গেছে শরীর, অনেক দৃঢ় হয়েছে মন। দাঁতের ওপর দাঁত রেখে অসহ্যতম যন্ত্রণাকে সহ্য করবার অভ্যাসটাও আয়ত্ত করতে পেরেছে। শেষ পর্যন্ত হালই ছেড়ে দিলে ধনেশ্বর। চিনতে পেরেছে। বুঝেছে এভাবে সুবিধে হবে না। যতই ঘা পড়ছে ততই শক্ত হয়ে এঁটে বসছে কংক্রীটের ভিতের মতো। চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিংস্রভাবে চুরুটের গোড়াটা কামড়ে ধরলে শেষ পর্যন্ত।

—কিছু বলবে না?

—জানি না।

—কোনো স্টেট্‌মেন্ট দেবে না?

—যা বলেছি এই আমার স্টেট্‌মেন্ট।

হঠাৎ ধনেশ্বর হা-হা করে হেসে উঠল। বুলডগের মতো ভারী মুখের পেশীগুলো হাসির ধমকে খেলে খেলে যেতে লাগল ঢেউয়ের মতো। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়েও বিস্মিত ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে তাকাতে ইচ্ছে করল হঠাৎ।

—তুমি বলবে না, কিন্তু সব খবর পৌঁছে গেছে আমাদের কাছে। ইয়েস, এভ্‌রি ডিটেল্ অব ইট্।

রঞ্জন শুনতে লাগল।

—পরিমল লাহিড়ী সব কন্‌ফেস করেছে। হালদারের দোকানে ডাকাতি, বরদাবাবুর বন্দুক চুরি—

—পরিমল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—পরিমল :—ধনেশ্বর এবার ঝাঁ করে সামনে ঝুঁকে পড়ল : ইয়োর বুজ্‌ম্ ফ্রেণ্ড্। কে কে ছিল, কেমন করে প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল—সব বলে দিয়েছে, এভ্‌রিথিং!

চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে উদার ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল। তারপর মিটিমিটি বাঁকা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল কথাটার প্রতিক্রিয়া। আর বাঁ হাতের তর্জনীটা দিয়ে অধৈর্যভাবে খুঁটতে লাগল রিভলভারের চামড়ার খাপের বোতামটা।

শরীরে মর্ফিয়ার ইঞ্জেকশন দিয়ে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলো অসাড় করে দিয়েছে কেউ। নিজের কানকে বিশ্বাস করা যায় না, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি যেন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এও সম্ভব? পরিমল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দলের সব কথা ফাঁস করে দিয়ে চরম সর্বনাশ করে বসেছে তার। রঞ্জুর মনে হল পায়ের তলা থেকে ঘরের মেজেটা যেন কেউ টেনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি।

ধনেশ্বরের চোখে জলের পূর্বাভাস ঝিলিক দিয়ে উঠল। ওষুধ ধরেছে বলেই মনে হয়। উৎসাহিতভাবে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে বললে, তা হলে সব বলেই ফেলো এবার। লুকোবার চেষ্টা করে আর কী ফল হবে?

ঠোঁট দুটো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নড়ে উঠল একবার—কিন্তু কোনো শব্দ বেরুল না।

—এখনো জবাব দিচ্ছ না? ভেবে দেখো, সব তো জেনেই ফেলেছি। এখন তোমার স্টেটমেণ্ট্ না পেলেও কেস্ দাঁড় করাতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। বরং তাতে তোমারই লাভ হত, কন্‌ভিক্‌শনটা হয়তো কিছু light হতে পারত।

মনের মধ্যে একটা তোলপাড় চলেছে। শাস্তি কম হবে সেজন্যে নয়, পরিমলের কৃতঘ্নতায় সমস্ত মানসিকতার ভিত্তিটাতেই মস্ত একটা চিড় খেয়েছে তার। এমনিই কি সবাই, রোহিণীর সঙ্গে পরিমলের কি পার্থক্য নেই বিন্দুমাত্রও? তা হলে কিসের ভরসায় সে এই বিপ্লবের পথে নেমে এসেছিল, কোন্ প্রত্যয়ে, কোন্ শক্তিতে?

কথা বলতে যাচ্ছিল, হয়তো কিছু একটা বলেও ফেলত, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না অত্যুৎসাহী ধনেশ্বরই।

টোকা দিয়ে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে, কিছুই আর লুকোতে পারবে না। এমন কি রূপসার পথে যে মেল রবারিটা হয় তাতে তোমাদের দলের যারা ছিল তাদের নামও আমার জানা হয়ে গেছে।

চকিতে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল রঞ্জনের, চোখের পলকে সরে গেল রাহুর ছায়াটা। কৌতুকের এবং স্বস্তির এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস এসে মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ধনেশ্বরের চালাকিটা ধরে ফেলেছে। সব মিথ্যে বলছে, বলছে খুশিমতো বানিয়ে বানিয়ে। রূপসার মেল-ডাকাতিটা ওদের দল থেকে মোটেই করা হয়নি, করেছিল নিশ্চিন্তপুরের আর একটা দল। ওদের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, পরিমলের পক্ষে সে দলের কারুর নাম জানাও সম্ভব নয়। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, কাঁধ থেকে ভূত নেমে গেল একটা। হাজার আঘাতেও যা টলেনি, মাত্র একটি উপর-চালাকিতে তা আর একটু হলেই ভেঙে পড়েছিল।

পীড়িত মুখে রঞ্জু হাসল : তা হতে পারে।

—এর পরে তোমার আমায় কোনো কথাই বলতে বাধা নেই নিশ্চয়?

—কিন্তু কোনো কথাই তো আমার জানা নেই।

—জানা নেই—না?—আশ্চর্য, এবার আর রাগ করলে না ধনেশ্বর, অভ্যস্ত রীতিতে সিংহের মতো গর্জনও নয়। নিঃশব্দে হাতের কলমটা টেবিলের ওপর সে নামিয়ে রাখল : মানে বলবে না?

রঞ্জন জবাব দিলে না।

—বেশ, ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ তা হলে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না—চেয়ারে শিথিলভাবে শরীরকে এলিয়ে দিলে ধনেশ্বর : ইয়াদ মিঞা?

—জী?

—নিয়ে যান একে—

হাজতে উৎপাত করেও যখন সুবিধে হল না, তখন নিরুপায় ধনেশ্বর তাকে পাঠালো জেলখানায়। এখন একেবারেই একা সে। তাকে সকলের চাইতে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে, রাখা হয়েছে 'সেলে'। একা নিঃসঙ্গ দিন কাটে—দিন কাটে তার ঘরটার মুখোমুখি কম্পাউণ্ডের ওপারে ফাঁসির 'সেল'টার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ফাঁসির সেল খালি। ওর শূন্যতার মধ্যে কেমন একটা অশুভতা আছে, থেকে থেকে হঠাৎ যেন মনে হয় ওই ঘরটার ভেতর কী কতগুলো মূর্তি নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। গা ছম ছম করে ওঠে—বোধ হতে থাকে ওর মধ্যে প্রেতাত্মার পদসঞ্চার শুনতে পাচ্ছে সে।

এ ঘরে যেদিন প্রথম এসে পৌঁছুল, সেদিন রাত হয়ে গিয়েছিল। ওই ঘরটায় কী আছে না আছে তা তার নজর পড়েনি, পড়বার মতো অবস্থাও তার ছিল না তখন। কম্বলের বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য আর অসীম শ্রান্তিতে জড়িয়ে এসেছিল তার চোখ দুটো।

ঘুম ভাঙল শেষ রাত্রিতে। ভাঙল একটা আর্ত কান্নায়।

—এ ভগবান বাঁচায় দে—বাঁচায় দে—

সে চিৎকারের তুলনা নেই—ভাষায় তার ব্যাখ্যা হয় না। সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। গায়ের ভেতর যেন তির তির করে বইতে শুরু করেছিল ঠাণ্ডা বরফের প্রবাহ।

বুঝিয়ে দিল সেনট্রি। টর্চের আলো রঞ্জুর ভীত-বিহ্বল মুখের ওপর ফেলে বললে, খুব খারাপ লাগছে, না বাবু?

—ও কিসের কান্না সেনট্রি? কে কাঁদছে?

—ফাঁসীর আসামী বাবু। ফাঁস দিতে নিয়ে গেল।

ফাঁস দিতে নিয়ে গেল। চারদিকে যেন নিঃশব্দ অথচ অনুভববেদ্য একটা ঝাঁঝরের আওয়াজ উঠল ঝম্ ঝম্ করে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল রক্ত।

—বাঁচায় দে রাম—জান বাঁচায় দে—

জান্তব আর্তনাদে জেলখানার স্তব্ধ বাতাসটা শিউরে শিউরে উঠছে—পাষাণপুরীর চারদিকে ওই কান্না মাথা ঠুকে মরছে। মানুষের কাছে আজ আর আবেদন জানিয়ে কোনো ফল নেই, তাই বাঁচবার শেষ আক্ষেপ নির্বোধ কাতরতায় পৌঁছে দিচ্ছে ভগবানের দরবারে।

চারদিকে পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে কান্নাটা—নিস্তব্ধ জেলখানার ওপর ছড়িয়ে পড়ছে মড়কলাগা কোনো গ্রামে মাঝরাতে হঠাৎ ভয় পাওয়া কুকুরের গোঙানির মতো। ও কান্না এখন আর মানুষের গলা থেকে বেরুচ্ছে না, যেন সেই কুকুরটার গলা টিপে ধরেছে কোনো ছায়ামূর্তির অশরীরী থাবা।

সেনট্রি শব্দ করে থুথু ফেলল মাটিতে। বললে, রাম, রাম, সীতারাম!—কথার শেষে গলাটা কেঁপে কেঁপে রেশ খেয়ে গেল। যেন ভয় পেয়েছে।

—হায় রাম—বাঁচায় দে রে—

অনেক দূর থেকে আসছে চিৎকার। সে যে কী ঠিক বোঝানো যায় না।

শরীরের মধ্যে ঝম্ ঝম্ করে সেই নিঃশব্দ বাজনা—সেই কুকুরটার আকৃতি। আরো মনে পড়ছে ছেলেবেলায় তার একটা বেড়ালের বাচ্চাকে শেয়ালে নিয়ে গিয়েছিল, বহু-দূর থেকে তার কান্না এমনি করেই ভেসে এসেছিল অন্ধকারে। দু হাতে কান চেপে ধরল রঞ্জন, কম্বলে মুখ ঢেকে পড়ে রইল মূর্ছিতের মতো। তারপর কখন মোম-মাখানো দড়ি লোকটার কণ্ঠনালীতে চেপে বসেছে, তার আর্তনাদকে রুদ্ধ করে দিয়েছে, রঞ্জন তা টেরও পায়নি। ওয়ার্ডারের হাঁকে মূর্ছাভঙ্গ হয়েছে তার।

আপাতত ওই ফাঁসির সেল স্তব্ধতায় ঢাকা। যেন মড়কলাগা গ্রামে স্তব্ধতার বেষ্টনী। কিন্তু ওর আড়ালে কত মানুষের আকুল কান্না মিশে আছে কে জানে। ওর দেওয়ালের গায়ে শেষ চেষ্টায় তারা আঘাত করেছে, মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে ওর

লোহার গরাদে, ওর মরচের ওপর মানুষের রক্ত কালো কালো স্তর ফেলেছে। দিনের পর দিন। অপঘাত আর অভিসম্পাত দিয়ে গুণ্ঠিত ওই ঘরটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে কেমন ঝিম ধরে আসে, কেমন যেন নেশা লাগে। হঠাৎ খানিকটা চাপ বাঁধা রক্ত দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো।

জেলখানা। শুধু মানুষকে ফাঁসিই দেয় না। তার চাইতে আরো সাংঘাতিক, আরো ভয়ঙ্কর। তিলে তিলে গলা টিপে মারে মানুষের হৃদয়কে, বোধকে। অল্প অল্প বিষ খাইয়ে দিনের পর দিন হননের একটা পৈশাচিক প্রক্রিয়া চলছে এখানে। বিচারের নামে নরমেধ। গ্ল্যাডিয়েটর প্রথার বর্বরতা আজ আর নেই ; আছে নৃশংসতর নীতি —বিচারের দিনের আলো দিয়ে রাতের অন্ধকারে ভ্যাম্পায়ার দিয়ে রক্ত চুষে খাওয়ানোকে ঢেকে রাখা।

শুধু কি ওই লোকটারই কান্না ? ওই কি শুধু চিৎকার করে বলছে : বাঁচায় দে, বাঁচায় দে রাম ?

শুধু ওই ফাঁসির সেলটাই ? না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জেলখানাতেই ওই আর্তনাদ গুমরে গুমরে উঠেছে ?

—হায় রাম জান বাঁচায় দে—

হঠাৎ ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। আর দুর্বলতা নেই। একসঙ্গে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে, অনেক কিছুর অর্থ যেন জলের মতো সহজ হয়ে গেছে। বিপ্লবীর কাজ শেষ হয়নি—শেষ হয়নি কিছুই। সব নতুন করে শুরু করতে হবে। দেশজোড়া এই জেলখানাটাকে ভেঙে ফেলতে না পারলে আর নিষ্কৃতি নেই। বাইরের জেলখানা, মনের জেলখানা।

সেনট্রিটা বীরপদভরে চারদিক কাঁপিয়ে চলাফেরা করছিল—মাঝে মাঝে বক্র আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো—দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

যেন কী একটা তার বক্তব্য আছে।

জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবে ?

অপ্রতিভ ভাবে হাসল সেনট্রি। হাসিটা শুধু নতুন নয়—অপরিচিত ঠেকল। এমন জায়গায় এ হাসি যেন প্রত্যাশা করা যায় না।

—না, কিছু নয়—খট্ খট্ করে দু পা এগিয়ে গিয়েই সে আবার ফিরে এল। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে বিশ্বস্ত গলায়, আপনারা সাঁচ ইংরেজ তাড়াতে পারবেন বাবু ?

রঞ্জনের মুখ মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল : এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ ?

—না এম্‌নি—কয়েক সেকেণ্ড সেনট্রি অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

আস্তে আস্তে বললে, পারলে আপনারাই পারবেন বাবু। মেদিনীপুর জেলে একজন স্বদেশী বাবুর ফাঁসি দেখেছি আমি। জোর গলায় পরে চেঁচিয়ে বলেছিল—'বন্দে মাতরম্‌—'

বলেই, আবার সে অপরাধীর মতো দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে গেল।

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রঞ্জন। এ স্বরে কৃত্রিমতা নেই, ফাঁকি নেই। নরকের দূত মাত্রেই নারকীয় নয়। পাথরের আড়ালে চাপা পড়েছে বলেই অপঘাত ঘটেনি পাতাল গঙ্গার।

সেনট্রি ফিরে এসেছে। ওর মুখোমুখি এবার চোখ তুলে দাঁড়িয়ে গেল সে।

তার দৃষ্টি এবার আলাদা। হঠাৎ যেন তার দুটি চোখে চকমকি ঠুকে দিয়েছে কেউ।

চাপা ইস্পাতী গলায় বললে, আমার ঠাকুরদা কানপুরে লড়াই করেছিল মিউটিনি-তে। ইংরেজ ধরে তাকে ফাঁস দিয়েছিল। কিন্তু—

—সরকার, সেলাম—

জেলখানার ও প্রান্তটা অবারিত হয়ে উঠল। জেলার অথবা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ এগিয়ে আসছে কেউ। হঠাৎ সেনট্রির মুখের চেহারা বদলে গেল, ফিরে এল স্বাভাবিক যান্ত্রিক নির্লিপ্ততা।

—ঠিক সে রহো—

পা দুটো জড়ো করে অ্যাটেন্‌শনের ভঙ্গিতে খটাস্‌ করে একটা জোর আওয়াজ তুলল সে। তারপর অত্যন্ত দ্রুতবেগে মার্চ করে চলে গেল জেলখানার লম্বা করিডোরটা দিয়ে।

চোখের তারা দুটো ঝলমল করে উঠল রঞ্জনের। আর ভয় নেই, আর দ্বিধা নেই। শক্ত বনিয়াদের নিচেই সংকেত করছে ভেঙে চুরমার করে দেবার চোরাবালি। আজ নিষ্প্রাণ পাথরের পিণ্ড বলে মনে হচ্ছে, তার ভেতরে ধুঁইয়ে উঠছে আগ্নেয়গিরি। মিউটিনিতে যে রক্ত একবার দপ দপ করে জ্বলে উঠেছিল, আজও তার দাহতা নষ্ট হয়নি। ইন্ধন পেলেই জ্বলে উঠবে। লাভা জমেও ঢাকা পড়েনি ক্রেটারের জ্বালামুখী।

না, আজ আর ধনেশ্বরকে তার ভয় নেই। সব ঠিক আছে। সব নির্ভুল।

ভয় সত্যিই নেই।

পরের দিন যখন ধনেশ্বর জেলখানায় এসে আবার তাকে ডেকে পাঠালো, তখন সে শিউরে উঠল তার মুখের চেহারা দেখে। আশ্চর্য, একদিনেই কেমন যেন বদলে গেছে ধনেশ্বর। হঠাৎ যেন কেমন বুড়ো হয়ে গেছে, চোখের কোণে কালির পোঁচড়া পড়েছে, কুঞ্চন লেগেছে গালের চামড়ায়। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে ধনেশ্বরকে, মনে হচ্ছে সে অসুস্থ।

দুজন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে এসেছিল। ধনেশ্বর বললে, বাইরে দাঁড়াও তোমরা।

সেলাম করে তারা ঘরের বাইরে চলে গেল।

—বোসো রঞ্জন—একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে ধনেশ্বর।

—বসব ?—আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

—হ্যাঁ—বোসো।—অন্যমনস্কভাবে ধনেশ্বর জবাব দিলে।

রঞ্জন বসল না। চাপা ঠোঁটে উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, কেন মিথ্যে পীড়াপীড়ি করছেন ? স্টেটমেণ্ট আমি দেব না।

—দরকার নেই—তেমনি অন্যমনস্ক স্বরে ধনেশ্বর বললে, বোসো, কথা আছে।

কথার ভঙ্গিটা এত নতুন রকমের ঠেকল যে বিস্ময়ের সীমা রইল না। এও কি একটা নতুন কায়দা, স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করবার অভিনব পদ্ধতি কোনো ? কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বসল—প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ধনেশ্বর হাসল। অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত বিষণ্ণ হাসি। হঠাৎ রঞ্জু আবিষ্কার করল ধনেশ্বরের রগের কাছে একগোছা পাকা চুল নড়ছে বাতাসে, যা এতদিন ওর নজরে পড়েনি। ম্লানস্বরে বললে, হয় না— হবার নয়।

—কী হবার নয় ?—ঝোঁকের মাথায় এগিয়ে আসা প্রশ্নের বেগটা রঞ্জন সামলাতে পারল না।

—কিছুই হয় না—ধনেশ্বরের হাসিটা যেন কান্নায় রূপ পেল এবার। পকেট থেকে একটা হলদে রঙের লেফাফা বাড়িয়ে দিলে সে ওর দিকে। বললে, পড়ো।

বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল : পরিমলের স্বীকারোক্তি ?

—না, পড়ো।

বারকয়েক দ্বিধাভরে ধনেশ্বরের দিকে তাকিয়ে রঞ্জন খামটা তুলে নিলে।

একটা টেলিগ্রাম।

—এটা পড়ব আমি ?

আবছা গলায় ধনেশ্বর বললে, পড়তেই তো দিলাম।

টেলিগ্রামটা খুলল রঞ্জন। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দ : "Ajit died of explosion while making bombs, come sharp—Dhiren."

—এর মানে ?—সন্দেহে ভ্রূকুঞ্চিত করে রঞ্জন বললে, আমাকে এ টেলিগ্রাম দেখাবার অর্থ কী ? কোনো অজিতকে তো আমি চিনি নে।

—না, তুমি চিনবে না।—তেমনি কান্নাভরা বিচিত্র হাসি হাসল ধনেশ্বর : আমার ভাগ্নে। নিজের ছেলের চাইতেও বেশি ভালোবাসতাম।

অজ্ঞাতেই একটা দুর্বোধ্য শব্দ করল রঞ্জন।

নিষ্প্রাণ ধরা গলায় ধনেশ্বর বললে, কে জানত, অজিতকে পর্যন্ত আমি ঠেকাতে পারব না ? কিছুই হয় না—কিছুই করবার জো নেই। জানো, অজিতকে আমি নিজের হাতে মানুষ করতে চেয়েছিলাম।—ধনেশ্বরের কথার শেষ দিকটা থর থর করে কেঁপে উঠল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রঞ্জন।

—তোমার দোষ নেই, কারুরই দোষ নেই। যে দিন এসেছে, এমনিই হবে। কেউ কিছু করতে পারবে না, কেউ ঠেকাতে পারবে না—হঠাৎ ধনেশ্বর বললে, আচ্ছা, তুমি যাও—আর তোমাকে দরকার নেই।

পুলিস দুটো এগিয়ে এল, এস্কর্ট করে নিয়ে চলল তাকে সেলের দিকে। যেতে যেতে পেছন ফিরে রঞ্জন দেখল—টেবিলের ওপর দু হাতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধনেশ্বর। রগের পাশে অদ্ভুত চকচক করছে পাকা চুলের গোছাটা।

—হায় রাম, বাঁচায় দে—যারা ফাঁসি দেয়, আজ এ কান্না তাদেরও।

উনিশ

আট বছর। আট বছর পরে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনে বর্তমানের মধ্যে।

অনেকখানি সরে গেছে পদ্মা—এখান থেকে তার মূল প্রবাহটা অনেক দূরে। তিমির পেটের মতো ধবধবে শাদা আর উজ্জ্বল বালুচর ছড়িয়ে আছে চক্রবাল পর্যন্ত—নৌকোর পাল আর স্টীমারের কালো কালো চোঙা বয়ে আনে নদীর সংকেত। এদিকটাতে এলোমেলো ভাবে দুলছে কুলের জঙ্গল, টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে সবুজ হয়ে আছে ফুটি আর তরমুজের ক্ষেত। বাংলাদেশের বড় একখানা মানচিত্রে গঙ্গার ব-দ্বীপের মতো বালুচরের ভেতর দিয়ে এসে পড়েছে এলোমেলো জল-রেখা। তাদের আনাচে-কানাচে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে প্রতীক্ষা করে আছে বড় ছোট নানা জাতের বক—চোখে সন্ধানী দৃষ্টি, মাছের নিশানা পেলেই জলে ছোঁ মারবে। ভাঙা পাড়ের গায়ে গায়ে গাং-শালিকের গর্ত, তার কোনো কোনোটায় মেছো আলাদ, জলো ঢোঁড়া আর মেঠো-ইঁদুরের আস্তানা। আধডোবা ভাউলের জীর্ণ মাস্তলে পান্নারঙের মাছরাঙা রয়েছে ধ্যানস্থ হয়ে।

হাতে যখন কাজ থাকে না আর পড়তে পড়তে মাথা যখন ঝিমঝিম করে ওঠে, তখন বই বন্ধ করে সে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকায় সম্মুখের দিকে। পদ্মার চরে দিনান্ত। বাঁ দিকে অনেক দূরে একটা পুরনো মঠের চূড়ো কালো হয়ে আসছে রাত্রির রঙে। তার পেছনে সুপুরির বন ক্রমেই একাকার আর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, ভাঙা পাড়ের গায়ে কোলাহল তুলেছে ঘরমুখো গাংশালিক। একটির পর একটি বক পদ্মার চর ছেড়ে উঠেছে আকাশে,

তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার করে ডানা মেলে দিচ্ছে ম্লানায়মান দিগন্তের দিকে।

উঁচু মঠটার নীরব নিঃসঙ্গ গম্ভীরতার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে রঞ্জন। সেই পুরনো গল্প। কোন্ ধনগর্বিত সন্তান নাকি মায়ের চিতায় মঠ তুলে দিয়ে দম্ভ করেছিল : মাতৃঋণ শোধ করলাম! এতবড় স্পর্ধা ক্ষমা করেননি আকাশের দেবতারা —মঠের চূড়ো কথার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল মাটিতে। মাতৃঋণ শোধ হয় না—কেউ শোধ করতে পারেনি কোনোদিন। শ্রদ্ধা নিয়েছে সংস্কারের রূপ।

ওটার দিকে তাকিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগে। ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটাও যেন ওর চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাক খায়—হঠাৎ ছুটে আসা একটা দমকা বাতাসে হঠাৎ প্রাণ পাওয়া অতীত প্রেতশ্বাস ফেলে চলে যায়।

চাকর এসে আলো রেখেছে ডেক চেয়ারের হাতলে, রেখেছে খবরের কাগজ আর একখানা খাম। হলদে রঙের লেফাফা—মিতার চিঠি। ওই কোণাকুনি করে ঠিকানা লেখবার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি—এটা একান্তই মিতার নিজস্ব ধরন।

—ডাক এল বুঝি?

—হাঁ বাবু, এই মাত্তর।

অতি যত্নে খামের কোণা ছিঁড়ে সে বার করলে চিঠিটা।

"কাল রাত্রে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। মনে হল দরজার কড়া নড়ছে, তুমি বুঝি এলে। আমি তখন কতগুলো চিঠি নিয়ে ব্যস্ত, শব্দটা শুনে চমকে উঠলাম। যদিও জানি সবটাই মনের ভুল, তবু উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম। একরাশ বৃষ্টির ছাট এসে চোখে-মুখে পড়ল, বিদ্যুৎ-চমকে—হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার এমনি একটা ঝোড়ো সন্ধ্যার কথা। হয়তো তোমার মনে নেই—কিন্তু সেদিনটাকে আমি কখনো ভুলতে পারব না। কী বিশ্রী, অথচ কী অদ্ভুত সন্ধ্যা।

বাস্তবিক তোমাকে না হলে চলছে না। মাঝে মাঝে এক-একটা এমন সমস্যার মধ্যে পড়ি। ভাবি, তুমি থাকলে সব কত সহজ হয়ে যেত। আচ্ছা, এত তো রাশি রাশি কাজ, তবু যখন তখন তুমি আমায় অন্যমনস্ক করে দাও কেন বলো দেখি?

—ভালো কথা। কাল সুতপাদি'র সঙ্গে দেখা হয়েছে। কী ভয়ংকর মোটা হয়ে গেছেন, ভাবতে পারবে না। আজকাল উনি এখানকার একজন নেত্রী—একটা মস্ত মোটরে চড়ে 'হরিজন বিদ্যামন্দির' উদ্বোধন করতে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন, ভয়ংকর চটে আছেন কিনা আমাদের ওপর।

সে সব পরে জানাব। কিন্তু তুমি কবে আসবে, সত্যি বলো তো? মাঝে মাঝে কেন যে খারাপ লাগে। ধানকল ইউনিয়নের সেক্রেটারী নয়, তোমার মিতা জানতে চাইছে, কবে আসবে তুমি?"

একটা নিশ্বাস ফেলে চিঠিটা বন্ধ করল সে। খুলল খবরের কাগজটা। একটা বিরাট হট্টগোলের মতো সমস্ত কাগজটা অর্থহীন কোলাহল ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলা দেশে অশান্তি। রাজনৈতিক দরকষাকষি। পার্লিয়ামেণ্টে হোম-সেক্রেটারীর অপভাষণে চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি। ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ও বিরোধীদলের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম। মোহনবাগানের অপ্রত্যাশিত পরাজয়—গোলরক্ষকের নির্বুদ্ধিতাতেই শেষ মুহূর্তে এই বিপর্যয় ঘটে গেল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের লীডারে পাট সম্পর্কে সরকারী নীতির সুতীব্র সমালোচনা—কচুরিপানা সম্বন্ধে নির্বোধ গবেষণা খানিকটা। বসিরহাটের বার লাইব্রেরী গৃহে একটি বিষধর সর্প নিহত। আসানসোলে বেকার যুবকের আত্মহত্যা। কাটোয়া লাইনের কোন্ এক স্টেশনে আলোর যথোচিত সুবন্দোবস্ত না থাকায় যাত্রীদের ধনপ্রাণ বিপন্ন—পত্র-প্রেরকের সোচ্ছ্বাস ক্রন্দন, যদিও "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।"

চোখ বুলিয়ে কাগজটা নামিয়ে রাখল। মন ভরে না। এ কি বাংলা দেশের খবর? বিপ্লবী রঞ্জন আজ নানা বিচিত্র অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের বাংলা-দেশকে দেখতে পেয়েছে। সে দেশ তো রুধিরাপ্লুতা ছিন্নমস্তা নয়, তা বিপ্লবীর কল্প-স্বর্গও নয়। যে লেনিনের নাম প্রথম শৈশবে ক্ষুদিরামের মতো একটা রূপকথা হয়েই তার সামনে এসে দেখা দিয়েছিল, আজ সেই লেনিনকে জেনেছে সে। জেনেছে তাঁর আদর্শের স্বরূপকে, চিনেছে তাঁর হাতে গড়া দেশটাকেও। আর সেই দেশের সঙ্গে তুলনা করেই এই খবরের কাগজগুলোকে একেবারে অসত্য বলে মনে হয়। মনে হয়, এ সব শুধু আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয় হয়তো।

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে এ দেশ তোদের নয়—"

সেই ছেলেবেলায় অবিনাশবাবুর গান। কিন্তু গানটা যে আজো সমান সত্য, এই খবরের কাগজগুলো যেন সেইটেই দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে।

জেল-জীবনটা মনে পড়ে। আত্মদর্শনটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেইখানেই। চোখে পড়েছিল স্রোত কেটে গেলে কী কর্দমাক্ত খানিকটা ঘোলা জল পড়ে থাকে—না থাকে স্রোত, না থাকে প্রাণ।

দাদারা কেউ কেউ গীতার মধ্যে তলিয়ে গেলেন। কেউ কেউ বাবুঝলেন 'অহিংসা পরমো ধর্ম'—খদ্দরের সুতো দিয়েই স্বাধীনতা ধরবার ফাঁদ পাততে হবে—রক্তপাতের মূঢ়তাই হল সব ব্যর্থতার কারণ। আর একদল তখনো চূড়ান্ত উগ্রপন্থী, তাঁরা পিংলের মতো সিপাহী-ব্যারাকে বিদ্রোহ ছড়াবেন, আর একবার চেষ্টা করবেন 'ম্যাভেরিক' জাহাজকে আমদানি করতে।

কয়েকজন আবার জেলেই পাতিয়ে বসলেন গৃহস্থালী। মাসোহারার মোটা টাকায়

তাঁর জীবনের অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা মেটাবার সাধনায় উঠলেন তৎপর হয়ে। স্নো, পাউডার, সেন্ট, সিল্কের পাঞ্জাবি তো আছেই—দশ আঙুলে দশ-দশটা আংটিও কারু কারু শোভা পেতে লাগল। তাঁদের দিন কাটত সিল্কের পাঞ্জাবি পাট করতে, ঘর্মাক্ত দেহে গ্লেজকিডের জুতো পালিশ করতে। রাজনীতির চাইতে মুরগির কাটলেট-সংক্রান্ত আলোচনাটাই তাঁরা পছন্দ করতেন বেশি।

এদেরই একজন—অভিরাম মুখুয্যে যখন গলায় একটা সোনার হার পরে দর্শন দিলেন, সেদিন আর সহ্য হয়নি রঞ্জনের।

—অভিরামদা, শেষে গলায় একটা হার অবধি দোলালেন! লোকে বলবে কী!

প্রচুর ঘি, মাখন আর মাংসে সমৃদ্ধ চর্বি-চিক্কণ গাল দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলেন অভিরামদা। একবিন্দু অপ্রতিভতা নেই, নেই একটি কণা সংকোচ।

হা-হা করে হেসে অভিরামদা বললেন, আরে ভায়া, বাড়িতে মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। জেল থেকে বেরিয়ে তার বিয়ে দিতে হবে। এ হার কি আর নিজের জন্যে গড়িয়েছি—তখন কাজে লাগবে। বেয়াই হারামজাদা তো ছেড়ে কথা কইবে না, শ্বশুরবাড়ির টাকায় তুষ্ট করতে হবে মেয়ের শ্বশুরকে। তা ছাড়া তোমাদের বৌদি এতকাল বিরহ-যন্ত্রণা সইছেন, তাঁকেও দুটো-একটা আংটি উপহার দিতে হবে তো!

এর ওপর আর কোনো কথা বলা চলে না। শুধু সমস্ত মন যেন কালো হয়ে গেছে অশুচিতার গ্লানিতে। যাদের অলিম্পিক মশালের শিখার মতো অনির্বাণ বলে বিশ্বাস হয়েছিল, দেখা গেল তারা শুধু হাউই,—খানিকটা ছাইয়ের কালো পিণ্ড ছাড়া কিছুই তাদের অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু সবাই নয়।

বাংলা থেকে বহুদূরে সেই ক্যাম্প মনে পড়ে। চার বছর ছিল, ওখান থেকেই বি. এ. পাস করে সে।

খাড়া উঁচু প্রাচীরের ওপর আকাশ দেখা যায়। কিন্তু বাংলার আকাশের মতো চোখ জুড়ানো নীল সে নয়। কেমন পিঙ্গল আর রৌদ্রদগ্ধ—রুক্ষ, অনুর্বর পৃথিবীর দিকে কুপিত দৃষ্টিতে আকাশ চেয়ে আছে।

ক্যাম্পের বাইরে সুপারিন্টেডেন্টের অফিসে দু-একবার যাওয়ার সময় দেখেছে চারিদিকে। ধু ধু করা রিক্ততা। বহুদূরে আবছাভাবে এক-আধটা দারিদ্র্যজীর্ণ গ্রামের ক্ষীণ আভাস, গাছপালার বিরলশ্রী। আরো দূরে শীর্ণধারা নদীর একটা সংকেতও যেন পাওয়া যায়। এই বন্দী জীবনের সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিল আছে তাদের।

শুধু এক-আধদিন যখন রৌদ্রে-পিঙ্গল আকাশে পড়ত মেঘের ছায়া, ঘনিয়ে আসত বর্ষার কালো মেঘ, তখন কোথা থেকে দু-চারটে ময়ূর এসে উড়ে বসত ক্যাম্পের উঁচু

পাঁচিলের ওপর, বসত টাওয়ারটার মাথায়। নানা রঙের পেখম মেলে দিয়ে নাচত—একটা অন্য পৃথিবীর খবর যেন বয়ে আনত তাদের কাছে। মরু-মৃত্তিকা যেন রূপ আর প্রাণের অভিনন্দন পাঠিয়ে দিত।

সেই রকম এক-একটা সময় ভারী খারাপ লাগত—হঠাৎ যেন অসহ্য হয়ে উঠত বন্দিত্বের এই বন্ধন-যন্ত্রণা। বিস্বাদ একটা তিক্ততায় চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করত—স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে যেত। ঘরে গিয়ে দু-চার লাইন কবিতা মেলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শুয়ে পড়ত বিছানায়।

কিন্তু এই অবসাদগুলো বড় খারাপ, বড় ভয়ঙ্কর এই চুপ করে থাকা, এই একা একা বিস্বাদ ভাবনার মধ্যে তলিয়ে থাকা—এ লক্ষণগুলো মারাত্মক। এর ফলে এক-জনের মস্তিষ্ক-বিকার ঘটতে দেখেছে সে। বক্সার ক্যাম্পে আর একজন কী ভাবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সে কথাও সে ভোলেনি।

হঠাৎ কেউ হয়তো বিকট বেসুরো গলায় একটা গান ধরে বসত—কেটে যেত ঘোরটা। চোখে পড়ত, ক্যাম্পের নানা ঘরে ছোট ছোট দলে হয়তো ক্লাস বসে গেছে। উত্তেজিত আলোচনা চলেছে—বুদ্ধিতে আর দীপ্ত-সংকল্পে জ্বলজ্বল করে উঠেছে চোখ-গুলো। সঙ্গে সঙ্গে উদগ্র সুরাসারের মতো কী একটা সঞ্চারিত হয়ে যেত শরীরে—শিথিল শিরাগুলোর মধ্যে দ্রুততালে রক্ত ছুটে চলত যেন স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করে করে।

সেও এসে বসত দলের মধ্যে। গীতি-কবিতা নয়, জীবন-কাব্য। নিরাশ হলে চলবে না। Nothing to loose but your shackles, যারা ভয় পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, যারা কাজের দায়িত্ব বইতে না পেরে যোগ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে—তারা থামলেও আমরা তো থামব না। এতদিনেই তো আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হয়েছে। এবারে কাজ আলাদা, পথও আলাদা। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে সেই পথই ধরব আমরা। মধ্যবিত্ত বিপ্লব-বিলাসে আর ক্ষ্যাপামির হাউই ওড়াবো না, প্রাণবন্ত করে তুলব ঘুমন্ত অগ্নিশিখরকে। ফৈয়জ মোল্লার যে প্রশ্নের জবাব বেণুদা দিতে পারেননি—সে জবাব পৌঁছে দেব সারা মানুষের দরবারে দরবারে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে কত কথা ভেবেছে রঞ্জন। রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে বিস্তীর্ণ তমসা—বাংলা দেশের মতো ঝিঁঝির ডাক নেই, নেই শেয়ালের প্রহর-ঘোষণা। নিয়ন্ত্রিত তালে সেনট্রির বুটের শব্দ কানে আসে—মনে পড়ে যায় তার বাংলা দেশ এখান থেকে স্বপ্নের মতো সুদূর। কিন্তু একদিন সেখানে ফিরে যাবে সে। কাজ করবে, ঝাঁপ দিয়ে পড়বে তার সত্যিকারের সমস্যাগুলোর মধ্যে। মুষ্টিমেয়ের মৃত অঙ্কুরকে বনস্পতিতে প্রাণিত করবে সমষ্টির কর্ষণায়।

ফিরে তো এসেছে। এসেছে সেই ছায়াবীথি আর নদীর উল্লাসে ভরা তার 'সার্থক

'জনমে'র পুণ্যপীঠে। কিন্তু চোখের সামনে আপাতত কী রূপ দেখতে পাচ্ছে সেই বাংলা দেশের ? ব্যবস্থাপক সভায় যে বিতর্ক-বিধ্বস্ত দেশের মন্ত্রিত্ব-সঙ্কট আজ চরমে উঠেছে, পড়েছে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস, তার সঙ্গে কোথায় এর যোজনা-সূত্র ? এই থানায় আজ দু বছর ধরে সে অন্তরীণ হয়ে আছে। ওই তো বাঁ দিকে নিকারীদের ছোট গ্রামটার আলো মিটমিট করছে, তার পাশেই নমঃশূদ্র পাড়া। এই দু বছরের ভেতরেই পাড়া দুটোর কী সুস্পষ্ট রূপান্তরই না চোখে পড়ল। প্রতি বছর বর্ষায় বান ডাকে পদ্মার স্রোতে—চর ডুবিয়ে হা হা করে ঘোলাজল ছুটে আসে, ভয় করে থানাটাকেও ভেঙে নামিয়ে না দেয়। পদ্মার বান ডাকে, কিন্তু কই, ওদের জীবনে তো বান ডাকল না! ওদের জগতে কোথায় সেই গিরিশিখর—বপ্রক্রীড়াশাল গজের মতো মেঘ গর্জে পাহাড় ফেটে যেখান থেকে ঢল নামবে। এই পদ্মার বাতাসেও কোথা থেকে আসে ম্যালেরিয়ার বীজ—কোথা থেকে আসে মারীর বিষস্পর্শ—কে বলতে পারে সে কথা ? ওই গ্রাম দুটোর অতীত সমৃদ্ধি এখনো বোঝা যায়—রাশি রাশি পোড়া ভিটে থেকে, জীর্ণশীর্ণ আটচালা ঘর দেখে। কিন্তু যে ভিটে একবার মানুষ-ছাড়া হল তা আর ভরে উঠল না, যে টিনের চাল বাতাসে একবার উড়ে গেল সে আর ফিরে এল না নিজের জায়গাতে। শ্রাবণ মাসে 'মনসার গান' এবার আর সমারোহ করে হয়নি ওখানে, নিকারীপাড়া থেকে শোনা যায়নি সম্মিলিত দেশী কাওয়ালী :

"আওরতেরা ডাবা বাজাইয়ে গান করে সুরে,
একদিন হজরতের ঘরে, একদিন নবীজীর ঘরে।
আছিল জয়নাল বিবি, আর ছিল খোদিজা বিবি,
আর ছিল কুন্‌ছুন্‌ বিবি, নবীজীর ঘরে—"

কিছুই নেই, কিছুই বেঁচে নেই। শুধু আশ্বিন-কার্তিক আর ফাল্গুন-চৈত্রে ওদিকের শ্মশানঘাটটায় চিতা জলেছে অনেক বেশি ; গোরস্থানের দিক থেকে রাত্রে অনেক প্রবল হয়ে উঠেছে শেয়ালের কলস্বর।

এই বাংলা দেশ মন্ত্রিসভায় এর সত্যিকারের সংকট রূপিত হয় না, কচুরিপানার সমস্যাও হয়তো এর জীয়ন-কাঠি নয়। এর চারদিকে শুধু বাদুড়ের কালো কালো ডানার মতো নড়ে বেড়াচ্ছে আকারহীন অপচ্ছায়া। এ-দেশের সন্ধান পায়নি বেণুদার আগ্নেয়-স্বপ্ন, 'ফাঁসির ডাকে'র লেখক। আজ চড়া বিদ্যুতের আলোয় কড়া পাওয়ারের চশমা চোখে যারা এ-পি, ইউ-পির সংবাদ ঘেঁটে বাংলা দেশের অবস্থা নিয়ে নিবন্ধ লিখে চলেছে, এই মৃত্যু-জর্জর ব্রাত্য বাংলা তাদের কাছে পাচ্ছে কোন্ সঞ্জীবনীর মন্ত্র, অভাব-পক্ষে কতটুকু সান্ত্বনার বাণী ?

ফৈয়জ মোল্লার প্রশ্ন। এই নিকারীদের প্রশ্ন—নমঃশূদ্রের প্রশ্ন। সমস্ত দেশের

উতরোল প্রশ্ন। কতকাল সে প্রশ্নকে এড়িয়ে চলব আমরা? কতকাল মাইক্রোফোন-ফাটানো বক্তৃতা দিয়ে তলিয়ে রাখব সমষ্টির—সমগ্রের এই বারিধি-কল্লোলিত জিজ্ঞাসাকে?

সমস্ত শরীর জ্বালা করছে, টিপ টিপ করছে কপালটা। ভেতরে কেউ বুঝি পেরেক ঠুকে চলেছে একটার পর একটা। চোখের জন্যেই এমনটা হচ্ছে বোধ হয়। হঠাৎ যেন কেমন একটা দুর্বলতা এসে পড়ে—এখান থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে মিতার পাশটিতে।

কয়েকটা নরম আঙুলের ছোঁয়া বুলিয়ে কেউ আস্তে আস্তে কপালটা টিপে দিলে বেশ হত। কিন্তু না—এসব যা-তা ভাবনার কোনো মানে হয় না। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে কয়েকটা অ্যাসপিরিন আনাতে হবে আবার।

কিন্তু বাংলা দেশ। ডেকে উঠেছে শেয়াল—যেন সমস্ত দেশের শবযাত্রার পথে তুলছে উল্লসিত হরিধ্বনি। আজ যদি সে বাইরে থাকত—কত কাজ করবার ছিল তার। বিপ্লবের অগ্নি-দীক্ষার মধ্য দিয়ে মন তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু অকারণ অপচয় আর সংশয়ের পথ নয়, অমিয় ঘটক, বেণুদা, করুণাদি কিংবা সুতপার ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেও নয়;—সমস্ত মানুষের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, সাধারণ মানুষের যৌথশক্তিতে গড়া নিশ্চয়তার কঠিন বনিয়াদের ওপরে পা দিয়ে। বাস্তবিক, কত কাজ করবার আছে। বিশ্রামের জন্যে মেলা আছে মিতার সহযাত্রী, আর সেই সঙ্গে আছে—সীমাহীন, অজস্র—

—"তুমি কবে আসবে?" মিতার প্রশ্ন। তারও মন মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আজকে। এ আর নয়, এ আর সহ্য হয় না। আর ভালো লাগে না নির্বাপিত উল্কার মতো এই অপমৃত্যুর শাস্তি। কত কাজ—কত কাজ। শেষে মিতাও তাকে পেছনে ফেলে কত এগিয়ে গেল।

—পড়লেন কাগজ?

থানার দারোগা। নিরীহ ভদ্রলোক, অমায়িক, স্বল্পভাষী। সব সময়ে মুখে একটু করে বিনীত হাসি লেগেই আছে তাঁর। রঞ্জনের এই বন্দিত্বের জন্যে যেন তিনিই অপরাধী—এইজাতীয় একটা আত্মনিগ্রহ সব সময়ে তাঁকে কেমন সংকুচিত করে রাখে।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে রঞ্জন বললে, বসুন।

দারোগা বসলেন। ধড়া-চুড়া ছেড়ে একখানা লুঙ্গি আর একটা সিল্কের সার্ট পরে এসেছেন। আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন আর একটা বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে। বললেন, তারপর আজকের কাগজে নতুন খবর-টবর কী আছে বলুন।

রঞ্জন হাসল।

—নতুন খবর আর কী থাকবে। সেই পুরনোর কপচানি।

—তা ঠিক—যা বলেছেন।—আরামের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দারোগা : খবরের কাগজে পড়বার মতো কিছুই থাকে না আজকাল। সব সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়। বিরক্তি ধরে যায়, বুঝলেন ?

দারোগার মনের ভাবটা বুঝতে পারে রঞ্জন। খবরের কাগজে বিশেষ কিছু না থাকলেই খুশি হন তিনি। এত খবর, এত কোলাহল—মানুষের মস্তিষ্ক আর স্মৃতির ওপরে খানিকটা অহেতুক অত্যাচার ছাড়া তো আর কিছুই নয়। কী হবে এত খবর দিয়ে, কোন্ প্রয়োজন এইসব রাশীকৃত সংবাদে ? দৈনন্দিন জীবনে কোলাহলের অন্ত নেই, অভাব নেই সমস্যার। চুরির এজাহার লিখতে হয়, ফেরারীর খবর রাখতে হয়, দাগীদের ওপরে মেলে রাখতে হয় সারাক্ষণের সজাগ দৃষ্টি ; ডাকাতির সংবাদ এলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হয় হন্তদন্ত হয়ে। তার ওপর আবার যদি জাতীয় আর আন্তর্জাতীয় সমস্যা এসে ভিড় করে, তা হলে জীবনধারণ রীতিমতো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই। খবরের কাগজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা—এ আর কিছুই নয়, দৈনিক আলাপের যা হোক একটা মুখবন্ধ মাত্র।

রঞ্জন বললে, আপনার থানার খবর কী ?

—থানার খবর ?—দারোগা এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বসলেন : থানার খবরের আর অভাব আছে কবে ? যে সুখের চাকরি মশাই আমাদের। এই তো সকালে কাশিমপুরে মস্ত একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। আইল ভেঙে লাঙল দিয়েছিল, তাতেই মস্ত হাঙ্গামা হয়ে গেল। দুটো জোর চোট খেয়েছে, তাদের একটা বোধ হয় বাঁচবে না।

—ধরলেন আসামী ?

একটা বড় গোছের হাই তুলে উদাসকণ্ঠে দারোগা বললেন, হ্যাঁ, দুপক্ষের গোটা দশ-বারোকে ধরে চালান করে দিলাম। আর বলেন কেন মশাই, যত ঝকমারির কাজ। সাত জন্মের পাপ না থাকলে দারোগা হয় না কেউ।

রঞ্জন আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনলে মনে পড়ে সেই খুনী নিশিকান্তকে, মনে পড়ে সেই রাত্রে দুই ভায়ের মধ্যে দাঙ্গার কথা—সেই আর্তনাদ আর লাঠির শব্দ। কত দিন চলবে এই আত্মঘাতের পাপ, এই অপবুদ্ধির বিষাক্ত বিদ্বেষ ? নিজেদের মর্মজ্বালায় যে অগ্নি-পুত্তলিকা আজ জ্বলে মরছে তারা কবে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারবে শত্রুর দুর্গচূড়ায় ?

বিষণ্ণভাবে অল্প একটু হাসল সে। বললে, কেন, ইংরেজ রাজত্বে আপনারাই তো সত্যিকারের লাটসাহেব বলে শুনি। এমন সম্মান আর এমন প্রাপ্তিযোগ—

—সম্মান আর প্রাপ্তিযোগ।—দারোগা ভ্রূকুটি করলেন : সেসব এখন লাস্ট সেঞ্চুরির মিথ্, মশাই। সম্মান মানে তো দিনরাত শালা বলছে। আর প্রাপ্তিযোগ।—দারোগা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করলেন: লোকে দুর্দান্ত চালাক হয়েগেছে আজকাল। ঘুষ তো দূরে

থাক, পাঁচটা টাকা সেলামী নিলেই চাকরি রাখা দায় হয়ে ওঠে।

—তা হলে খুব দুঃসময় যাচ্ছে আপনাদের ?

—সে আর বলতে। কী যে দিনকাল পড়েছে মশাই। গাধার মতো খাটনি আর ইন্‌সপেক্টার থেকে শুরু করে তিনশো তেত্রিশ দেবতার পুজো। জান-প্রাণ বেরিয়ে গেল একেবারে।

দূরে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্‌সারির সরকারী ডাক্তার-বাবুর বাসা ওখানে। পাশা খেলায় দুর্দান্ত ঝোঁক ডাক্তারবাবুর। যেদিন সন্ধ্যায় 'কল' থাকে না, সেদিন পাশার ছক আর ঘুঁটি নিয়ে এসে দর্শন দেয় অনিবার্য ভাবে।

দারোগা বললেন, ডাক্তার আসছে।

কিন্তু যে এল সে ডাক্তার নয়। সামনে লণ্ঠন হাতে ডিস্‌পেন্‌সারির সুইপার মধু, পেছনে একটি ষোড়শী—ডাক্তারবাবুর বড় মেয়ে সীতা। একখানা থালার ওপর পরিপাটী করে তিন-চারটি বাটি সাজিয়ে এনেছে। লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে বললে, মা পাঠিয়ে দিলেন।

রঞ্জন বললে, যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে আমার এখানকার রান্নাবান্নার পাট তুলে দিয়ে তোমাদের ওখানেই পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিলে পারি।

তেমনি সলজ্জ শান্তস্বরে সীতা বললে, বেশ তো।

ঘরে ঢুকল সীতা। রঞ্জন জানে এর পরে কী কী করবে ও—ওর কাজগুলো রুটিনের মতো মুখস্থ হয়ে গেছে তার। প্রথমেই টেবিলের ওপর খাবারটা ঢেকে রাখবে, একটা কাচের গ্লাসে গড়িয়ে দেবে এক গ্লাস জল। তারপর তাকিয়ে দেখবে তার বিছানাটার দিকে—দেখবে তার চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল রূপ। বেড্‌কভারটা অর্ধেক লুটিয়ে আছে মাটিতে, বিছানার ওপরে স্তূপাকার বই ছড়ানো। ফাউণ্টেন পেনটা পড়ে আছে খোলা অবস্থায়, বালিশের ওপরে খানিকটা কালি ছিটোনো। সুটকেসের পাল্লাটা আধ হাত ফাঁক হয়ে আছে—হয়তো দুটো-চারটে ইঁদুর এরই মধ্যে নিশ্চিন্তে ঢুকে বসে আছে ওর ভেতরে। এক মুহূর্ত নিশ্চয় ইতস্তত করবে সীতা, তারপর যত্ন করে ঝেড়ে দেবে বিছানাটাকে। বই আর কলম তুলে রাখবে, আটকে দেবে সুটকেসের কল দুটো। এ কাজ সীতার নিত্যদিনের—এ তার অভ্যাস হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতেই একটা নিশ্বাস পড়ল রঞ্জনের। সীতার এই স্নিগ্ধ সেবার দাক্ষিণ্যটুকুর মধ্যে মিতা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—সীতার উপস্থিতি যেন আর একজনকে সঞ্চার করে দেয়।

সীতা বেরিয়ে এল। যাওয়ার সময় বললে, একটু লক্ষ্য রাখবেন, বেড়ালে খেয়ে না যায়।

রঞ্জন মাথা নেড়ে বললে, আচ্ছা।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তোর বাবা কোথায় রে সীতু ?

—বাবা ?—সীতা থেমে দাঁড়ালো। নতমুখে আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে তেমনি শান্ত কোমল গলায় বললে, 'কলে' গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

লণ্ঠনের আলোটা মিলিয়ে গেল ক্রমশ।

—ওঃ, তাহলে আর পাশা জমবে না আজকে। ওঠা যাক, কী বলেন ?

—আসুন।

তিন পা এগিয়ে দারোগা ফিরে তাকালেন একবার: ভালো কথা, কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার ? কোনো কম্‌প্লেন—

—না, না, কম্‌প্লেন নেই কিছু।

—আচ্ছা—দারোগা চলে গেলেন।

রঞ্জন তেমনি ভাবেই বসে রইল নীরব হয়ে। পদ্মার বুক থেকে আসছে ভিজে বাতাস, একটু একটু শিউরে উঠছে লণ্ঠনের শিখাটা। অভিশপ্ত মঠটা অন্ধকারে নিমগ্ন। বালুচর আর জলধারাগুলো যেন তামায় তৈরি—অস্পষ্ট আর অনুজ্জ্বল, তারার আলোয় লালাভ। গাংশালিকের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে—এতক্ষণে নিভৃত কোটরে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওরা। ওধারে নিকারীপাড়ায় একটা আগুনের কুণ্ড জলছে, বোধ হয় জাল দিচ্ছে গাবের রস।

মন আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসে।

কী আশ্চর্য জীবন। কর্মহীন, ঔৎসুক্যহীন—একটা চূড়ান্ত নির্বেদ সমস্ত বোধগুলোকে রেখেছে সমাচ্ছন্ন করে। পাঁচ বছর জেল, দু বছর অর্ডিন্যান্স আর অন্তরীণ-বন্দীর জীবন চলছে এই দ্বিতীয় বৎসর। শহর মুকুন্দপুর এখন একটা অলীক ছায়াবাজির মতো চোখের সামনে নেচে নেচে চলে যায়। কবে একদিন বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, দ্বীপান্তরের পার থেকে কবে কার কান্না এসে স্বপ্নাতুর নিশ্চিন্ত জীবনকে জোয়ারের তরঙ্গে দুলিয়ে দিয়েছিল। পরিমল, বেণুদা, তরুণ সমিতি। বর্ণচোরা ক্ষিতীশ চক্রবর্তী। কর্তব্যের কঠোর সংকল্প। এই মৃত্যুকে ছেদন করতে হবে, দূর করতে হবে এই ভয় আর অন্যায়ের শাসনকে। ওরে ভীরু ওরে মূঢ়, তোমার নিঃসঙ্কোচ মস্তক তোলো আকাশে। মনে রেখো দেবতার দীপ হাতে নিয়ে রুদ্রদূতের মতো আবির্ভূত হয়েছ তুমি। যত শৃঙ্খল, যত বন্ধন, সবাই তোমার চরণ বন্দনা করে নমস্কার জানাচ্ছে। মৃত্যু নেই সত্যের।

সেই সব উন্মত্ত দিন। অগ্নিদীক্ষা। আদর্শের পায়ে নিঃসঙ্কোচ প্রাণবলি। আজ প্রসারিত এই পদ্মার চরে, শান্ত সন্ধ্যায়, তারায় সমুজ্জ্বল এই বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে সে চঞ্চলতা কোথায় ? এখন শুধু অবকাশ আছে, অখণ্ড আর অনন্ত অবকাশ। কবিতা লেখা চলে, রাশি রাশি কবিতা। কিন্তু ভালো লাগে না। এই নিঃসঙ্গতা আর নির্জনতা সৃষ্টিকে উৎসাহ দেয় না, ভাবনা-বিলাসকে নিয়ে গুঞ্জন করে।

মরে যাওয়া নদীর মতো মন্থর—গতিহীন সময়। তাড়া নেই, তাগিদ নেই কিছু। বৃহৎ বাংলা—বৃহত্তর ভারত—কারুর রূপই মনের সামনে দেখা দেয় না বিশ্বরূপ হয়ে। এখানে বাংলা দেশ বলতে ওই মৃতকল্প গ্রাম, ওদের নির্বোধ অগ্রসর জীবন—চিন্তা ভাবনা সব কিছু যেন ওদের সঙ্গেই একাকার হয়ে গেছে। বিপ্লবের বহ্নিময় প্রেরণা নেই, আছে খানিকটা গভীর বেদনা আর নিবিড় সহানুভূতি।

কিন্তু এ তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। এই শান্তি, মনের স্তিমিত মন্থরতা—এর জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করা দরকার। এই কয়েক বছরে অনেক পড়েছে সে, অনেক জেনেছেও। মনের কাছে আজ পরিষ্কার জবাব এসেছে, উত্তর এসেছে সেই রাত্রে ফৈয়জ মোল্লার সেই ব্যথিত প্রশ্নগুলোর। আজ জানে ওই নিকারীদের জীবনেও সেই প্রশ্নগুলোই সত্য হয়ে আছে এবং তাদের জবাব দিতে পারাই আজকের একতম কাজ।

বাইরের পৃথিবী ডাক দিচ্ছে—ডাক দিচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব। এরই মধ্যে মনকে ঝিমিয়ে পড়তে দিলে চলবে কেন তার। এবার আর বেণুদা, সুতপা কিংবা ওদের মতো আরো অনেকের অবক্ষয় নয়, একটা ব্যধিগ্রস্ত উন্মত্ততার সংক্রামকতায় করুণাদির জীবন কান্না দিয়ে ভরিয়ে তোলাও নয়। সে ছিল প্রস্তুতির পর্ব, এখন সত্যিকারের মুহূর্ত এসেছে। অজস্র কাজ, বিশ্রামহীন সংগঠন, আমীন মুন্‌শীদের বিরুদ্ধে ফৈয়জ মোল্লাদের জাগিয়ে তোলা, নিশিকান্তদের অপমানকে আগুনের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া। যাদের জন্যে তিরিশ সালের বন্যায় অবিনাশবাবু নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, যাদের জন্যে এসেছিল উনিশশো তিরিশ সালের অহিংস আন্দোলনের প্রাণবন্যা; আর যাদের প্রায় ভুলে গিয়েই রক্তের বন্যায় যাদের মুক্তি দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন, এমন কি বেণুদা পর্যন্ত।

শুধু বেদনা আর সহানুভূতি নয়। এবার কঠোরতর কাজ, তিলে তিলে গড়ে তোলার কাজ।

চাকর এল। ধ্যান ভাঙিয়ে দিলে এসে।

—বাবু, খেয়ে নিলে হত না? রাত হয়ে গেছে।

দূর সমষ্টি-জীবনের পরিক্রমা থেকে রঞ্জন ফিরে এল তার ইন্টার্নমেন্ট-ক্যাম্পের ডেকচেয়ারে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে উঠে বসল সে।

—আজ তোর ভাত নষ্ট হল কৈলাস। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে গেছে।

কৈলাস জবাবে একগাল হাসল।

—সে আমি আগেই জানতাম বাবু। তাই আজ রান্না করিনি।

হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল। মাছ, মাংস, ডিমভাজা, ঘি-ভাত, একবাটি পায়েস।

এ সব সীতার নিজের হাতেরই রান্না। সীতার মা কিছুদিন থেকে ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত, ওইটুকু মেয়ের ওপরেই সংসারের সমস্ত ভার পড়েছে। বাপ, মা, ভাই, বোন, সকলের পরিচর্যা মিটিয়ে এত রান্না সে করে কখন, আর করেই বা কী করে। চমৎকার এই মেয়েটি। যেমন লক্ষ্মীর মতো চেহারা, তেমনি মিষ্টি স্বভাবটি।

খেতে খেতে চোখ পড়ল বিছানাটার ওপর, তারপর শেল্‌ফের দিকে, স্যুটকেসটার দিকে। একটি কল্যাণী নিপুণ হাতের ছোঁয়া যেন তাদের ওপরে জলজল করছে সোনার লেখার মতো। এই রকম একটি কল্যাণ হাতের স্পর্শ কবে যে জীবনের ক্লান্তিকে মধুময় করে দেবে।

মিতার চিঠি মনে পড়ছে: "তুমি এসো, তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি। তুমি না এলে আমার কাজে জোর পাবো না।" পদ্মার ঘূর্ণির মতো চুরমার করে টেনে নিয়ে যেতে চায় ওই ডাক। জোর তো শুধু দেবে না—জোর নিজেও পাবে।

ছেলেবেলায় অস্বস্তি জাগানো ফুলে ফুলে আলো করা সেই বাড়িটা কি এখনো আছে সেই রকম? শাদা পাথরের টেবিলের ওপর অগ্নিবলয়িত মূর্তিটা এখনো কি রয়েছে সেই-খানটিতেই? সেই মহীশূর ধূপের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে কি বাগানের রাশি রাশি সেই সব শাদা ফিকে লাল আর আশ্চর্য নিবিড় রক্ত রঙের ব্ল্যাক্ প্রিন্স গোলাপের গন্ধ? এখনো কি সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—পাখায় ইন্দ্রধনু-আঁকা বড় পাহাড়ী প্রজাপতি?

আর হরিণটা? টলটলে নীল চোখ? ঘাসের জমিটুকুর ভেতরে বড় বড় কান তুলে উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছে মিতার পায়ের শব্দের জন্যে? না, সব মরে গেছে। ওই পরগাছার রঙীন জেল্লা মিশিয়ে গেছে ধুলোয়। আজকের মিতা ওর থেকে একেবারেই আলাদা। তার ঘুম-ভরা চোখ এখন বুদ্ধিতে প্রখর, শরীরে এখন সূর্য-তপস্বিনীর দীপ্তি। রাজকন্যা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাটির কন্যা। সুতপাদি যা হারিয়েছেন, হয়তো আজ মিতা তাই-ই পেয়েছে। বেণুদা যাকে ভেবেছিলেন আদর্শচ্যুতি—ওদের কাছে তা অর্থহীন মনে হয় এখন। প্রেমকে ওঁরা প্রতিবন্ধক ভেবেছিলেন, কিন্তু নতুন কালের আলোতে আজ তো তা পাথেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্ম-সর্বস্বতা ওরা চায় না, কিন্তু কেন স্বীকার করবে আত্মপ্রবঞ্চনাকে?

পরিমলের গ্রামে রয়েছে মিতার ইউনিয়ান। আরো কত কাজ জমেছে কে জানে। আজ আর ওদের সাধনা সব হারানোর নয়, সব ফিরে পাওয়ার। আজকের নায়িকা শ্মশানে বাসর রচনা করে কপালে বিভূতির টীকা পরিয়ে দেয় না—শ্মশান থেকে সে ডাক দিয়ে আনে পুষ্পিত জীবনের উত্তরণে। একার নয়, সমগ্রের। তাই দুজনের প্রেম দিয়ে আজ আর নীড় রচনা নয়, দুজনের শক্তি দিয়ে সমস্ত মানুষের সংসার গড়বার কাজ। জৈব অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারা:

"Spring through death's iron guard,
Her million blades shall thrust ;
Love that was sleeping, not extinct
Throw off the nightmare crust—"

আর নতুন প্রেমের এই মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পাওয়া :

"Sky-high a signal flame,
The sun returned to power above
A world, but not the same !"

কিন্তু সীতা ?

কেমন খটকা লাগল, কেমন বেদনার্ত হয়ে উঠল মন। একটুখানি সন্দেহ দেখা দিয়েছে যেন। আজকাল যেন অকারণে মেয়েটা লজ্জারক্ত হয়ে ওঠে, কেমন আড়ষ্ট হয়ে আসে চোখের পাতা। মাঝে মাঝে অদ্ভুত গভীর আর সুদূর দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকায়ও মনে হয়। কোনো রকম দুর্বলতা জেগেছে নাকি ওর ?

খচ্ করে একটা কাঁটা বিঁধে গেল বুকের মধ্যে। অসম্ভব নয়, একেবারেই অসম্ভব নয়। তাই কি তার সম্পর্কে এত যত্ন—এত পরিচর্যা ? তাই কি এই ঘর গুছিয়ে দেওয়াটা শুধু গুছিয়ে দেওয়াই নয়, গভীর একটা মমতার মতো আরো কিছু জড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে ?

কী সর্বনাশ, কী ভয়ঙ্কর কথা।

রঞ্জন উঠে পড়ল। মুহূর্তে খাওয়ার স্পৃহাটা মিটে গেছে, মুছে গেছে ক্ষিদের রেশমাত্রও। মাথার মধ্যে কেমন করতে লাগল তার, যেন কতকগুলো লোহার পেরেকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল ক্রমাগত। কপালের রগগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে চাইল টুকরো টুকরো হয়ে।

না, না, এসব বাজে চিন্তাকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এসব আর কিছুই না—একান্তভাবে তারই উইশ্ফুল থিঙ্কিং। বড় ভালো মেয়ে সীতা, ভারী ভালো মেয়ে। কেন তার এমন দুর্ভাগ্য ঘটবে, কেন সে পা দেবে এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশের খাদের মধ্যে ? এসব আর কিছুই নয়—বহুবল্লভ পুরুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি, আত্মপ্রেমের আত্মস্তুতি।

জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিলে বিকৃত এই ভাবনাকে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় এসে বসল রঞ্জন : হ্যাঁ—নিরাশ হলে চলবে না, কোনো রকম অল্প শিথিলতাকেও আর আমল দেওয়া যাবে না। কত কাজ আছে, কত কী করবার আছে তার। বাইরের জগৎ ডাকছে হাতছানি দিয়ে। সমস্ত দেশ রাত্রির কালো আকাশের

মতো যেন গভীর বেদনাতুর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অসহায় বন্দিত্ব, কঠিন শৃঙ্খল। এই বন্দিত্বের হাত থেকে তুমি মুক্ত করো আমাকে, এই শৃঙ্খল দূর করে দাও তুমি। তুমি এসো। রঞ্জনের বুকের মধ্যে বাজতে লাগল একটা আর্ত কলধ্বনি।

বালুচরে শোঁ শোঁ করে কাঁদছে ছেদহীন কুলের জঙ্গল।

রাত কেটে যায়, আসে সকাল। দিনের পর দিন। সময়ের সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, ঢেউ ভাঙে। বৈশাখের শেষাশেষি একদিন নামে অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ ; পদ্মার জল বেড়ে ওঠে, কুলের বন অর্ধমগ্ন দেহ তুলে জেগে থাকে গেরুয়ারাঙা স্রোতের ওপর। নাগিনীর গর্জন লাগে মরা পদ্মার ধারায় ; চড়াগুলো তলিয়ে গিয়ে তিন-চারটি ধারা একটি ধারাতে রূপান্তরিত হয়। উঁচু ডাঙা জলের ঘায়ে ঝুপঝাপ করে ভাঙতে শুরু করে।

সব সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসে। রুটিনে বাঁধা জীবন, কাল কী হবে, পরশু কী হবে, কী হবে তারও পরের দিন—সব আঙুলে গুণে বলবার মতো জীবন। দারোগা আসেন, পাশার ছক পেতে বসেন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার গালে হাত দিয়ে চাল ভাবেন। বারো পাঞ্জা সতেরো পড়তে থানার মুহুরীবাবু আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন বিকচ্ছ হয়ে।

দারোগা মাঝে মাঝে অত্যন্ত উদার ভঙ্গিতে বলেন, কত ভাগ্যে যে আপনাদের মতো লোককে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম রঞ্জনবাবু। পুলিসে চাকরি করতে এসে তো আর ভদ্রলোকের মুখ দেখিনি।

রঞ্জন হাসে : চিরদিনই আমাকে আপনাদের মধ্যে এইভাবে আটকে রাখতে চান নাকি?

দারোগা জিভ কাটেন : ছি, ছি, কী যে বলেন। পুলিসের চাকরি কী যে লজ্জা আর ধিক্কারের ব্যাপার, সেটা তখনই বুঝি—যখন আপনাদের মতো লোককেও আমাদের পাহারা দিয়ে আটকে রাখতে হয়।

রঞ্জন কৌতুক করে বলে, বেশ তো, ছেড়ে দিন না, চলে যাই।

দারোগা ম্লান হয়ে যান। মাথা নিচু করে বলেন, কেন লজ্জা দিচ্ছেন? সবই তো জানেন, আমাদের ক্ষমতার দৌড়ও জানেন। নেহাত পেটের দায় বলেই গোলামী করি, নইলে—

তা সত্যি। আন্তরিকতার স্পষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায়। আইন আর পেষণযন্ত্র মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে পারে, স্বাধীন সত্তা হরণ করতে পারে তার, কিন্তু মনকে তো মেরে ফেলতে পারে না। দেশ, জাতি—অপমান আর নির্যাতন, থেকে থেকে তারও হৃদয়কে এসে দুলিয়ে তোলে। কিন্তু জীবিকা, দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ আর নিষ্ঠুর সমস্যা। সবাই মহামানব হতে পারে না, নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেবার মতো যোগ্যতাও তো থাকে না সকলের। এই সমস্ত মুহূর্তে, দারোগার এই অনুতাপ-বিক্ষ

কণ্ঠস্বরে যেন সেই অপমানিত মানুষটি নিজেকে অতি দুর্বলভাবে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে।

বাস্তবিক এখন ভালো লাগে দারোগা সাহেবকে। রাগ হয় না, অভিযোগ করতে ইচ্ছেও হয় না। সবাই দেবতা নয়, হলে পৃথিবীটার চেহারাটাই তো অসহ্য হয়ে উঠত। সামগ্রিক দেশকে জানবার পরে কবি রঞ্জন এখন মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছে। ত্রুটি বিস্তর রয়েছে মানুষের, আছে স্বার্থবুদ্ধি, আছে প্রচুর সংকীর্ণতা। তবুও মানুষ—মানুষ। সে নিত্যকালের, তাই হৃদয়ের মৃত্যু নেই কখনো। হয়তো এম্‌নি একটা হৃদয় ধনেশ্বরেরও ছিল। ছিল কি ?

ডাক্তারবাবু বলেন, আজ একটু দেরি করে চা খাবেন রঞ্জনবাবু। সীতা বোধ হয় দু-চারটে মিষ্টি তৈরী করেছে, নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবে আপনাকে।

রঞ্জন বলে, সীতা তো রোজই খাওয়াচ্ছে। আজ না হয় কিছু এক্সচেঞ্জ করা যাক। আমার ঘরে দু টিন ভালো ক্রীম-ক্র্যাকার পড়ে আছে, নষ্ট হচ্ছে। নিয়ে যান না, ছেলেপুলেদের—

ডাক্তারবাবু সস্নেহে হাসেন।

—আমি আপনার বাবার বয়সী। ভদ্রতাটা আমার সঙ্গে নাই-ই করলেন। বাড়িতে ছেলেপুলের কি খাওয়ার ত্রুটি আছে একবিন্দু। ওসব বরং আপনারই থাক, একদিন নয় দল বেঁধে সবাই এগুলোকে শেষ করে দিয়ে যাব।

এর ওপর আর কথা চলে না।

দিন কাটে। আকাশে নববর্ষার নীল মেঘ দেখা দেয়। প্রেতায়িত মাঠকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে প্রবল ঘন ধারায় বর্ষণ নামে। পদ্মার পাড় ভাঙে, তার সঙ্গে ভেঙে পড়ে গাংশালিকের বাসা। রাক্ষসী নদীর জল দুলে ওঠে, ফুলে ওঠে, গর্জন করে। বুনো কুলের জঙ্গল কোথায় গেছে তলিয়ে, সেখানে এখন পনেরো হাত লগিরও থই মেলে না। জেলেদের গ্রামগুলো বৃষ্টিতে অস্পষ্ট হয়ে যায়, 'ফটিক-জল' পাখি ঝাঁক বেঁধে নাচতে শুরু করে বর্ষণ-ক্ষরিত কালো আকাশে।

আকাশ, বাতাস, হঠাৎ ক্ষেপে-ওঠা পদ্মা—সকলের সঙ্গে একটা সহজ প্রীতির সম্পর্ক। বই পড়তে পড়তে ক্লান্তি বোধ করলেই বাইরের জগৎটা এসে যেন মিতালি পাতিয়ে নেয় রঞ্জনের মনের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকতে পারে এদের ভেতরে নিমগ্ন হয়ে ; তা ছাড়া দারোগা আছেন, কম্পাউণ্ডার আছেন, ডাক্তার আছেন। একটা বিচিত্র নিশ্চিন্ত পরিবেষ্টনী।

তবুও বন্দীজীবন পীড়িত করে মনকে। খবরের কাগজ বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের সংবাদ বয়ে আনে। আমেদাবাদ আর কানপুরের মিলে মিলে শ্রমিক ধর্মঘট। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা। বিলাতে রক্ষণশীল দলের অনমনীয় মনোভাব। কাজের অন্ত নেই তার। আজ

যদি সে বাইরে থাকত, কত কাজ যে করতে পারত। শক্তি আছে দেহে, প্রচুর উৎসাহ আছে মনে। একথা সত্যি যে কিছুদিন থেকে দেশের নতুন কাজের পদ্ধতির সঙ্গে তার সংযোগ নেই। দেশ যে কতটা এগিয়ে গেছে তা ঝাপসা ঝাপসা ভাবে খানিকটা অনুমান করতে পারে মাত্র, বুঝতে পারে না সঠিকভাবে। আজকের কর্মীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, চিন্তা মিলিয়ে নিতে হয়তো তার সময়ও লাগবে খানিকটা। তা লাগুক, তবু সময়ের দাবি এসে পৌঁছে গেছে, ব্যক্তি মানুষ, আত্মকেন্দ্রিক রঞ্জুকে আজ নিজের জীবন রচনা করতে হবে সমগ্রের মধ্যে, আর দেরি করা চলবে না।

পরিমল তো আছেই। তার ভিলেজ-অর্গ্যানাইজেশন আছে, আরো কত কাজ বাড়িয়ে বসে আছে সে কে জানে। আর আছে মিতা। অবকাশ দিয়ে গড়া কাজ, ভালোবাসা দিয়ে বেষ্টিত কর্তব্য কর্মক্লান্ত মুহূর্তগুলো সঙ্গে সঙ্গে পান্থপাদপ। কাজকে মধুর করবে, চলাকে দেবে গতি। নতুন পৃথিবী গড়বার পথে মূর্তিময়ী সহযাত্রিণী।

—"আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি, কবে আসবে তুমি ?"

কবে আসবে তুমি ? সারা শরীরে কথাটার রেশ বয়ে নিয়ে রঞ্জন পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। হঠাৎ টিনের চালের ওপর ঝম্ ঝম্ করে শব্দ বেজে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে গুমোট করে ছিল আকাশটা, বৃষ্টি নামল এইবারে। ক্যাম্পের সামনে নিমগাছটায় সাড়া পড়ে গেল ধারাস্নানের আনন্দে।

এমনি সময় বাইরে থেকে একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে রঞ্জনের দাওয়ায় এসে উঠল।

—আরে সীতা যে। –আশ্চর্য হয়ে বলল, এই দুপুরবেলায় কী মনে করে ? এসো, এসো, ঘরে এসো।

ভিজে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে সীতা। লজ্জাকরুণ মুখে বললে, মা একটা বই চাইছেন, তাই—

—বই ? তা বোসো, বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

ভীরুর মতো যেন ছোঁয়া বাঁচিয়ে সীতা চেয়ারটার একপাশে বসল। রঞ্জন বললে, বাংলা বই তো বেশি আমার কাছে নেই, দু-একটা পত্রিকা আছে। তাই দিতে পারি।

—দিন—

পত্রিকা নিয়ে সীতা উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল। কিন্তু বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। নাগিনী পদ্মার জল ফুটে উঠছে টগবগ করে, ঝুপঝাপ শব্দে ভেঙে পড়ছে পাড়। রঞ্জন বলল, এই বিষ্টির ভেতর যাবে কী করে ? একটু দাঁড়িয়ে যাও।

চেয়ারের হাতলটা ধরে সীতা দাঁড়িয়ে রইল সসঙ্কোচে। কপালের ওপর নেমে আসা চুলে জলের বিন্দু। লজ্জিত মুখখানাতে যেন পূর্বরাগের রক্তিম স্পর্শ। গভীর কালো

চোখের দৃষ্টি একবার ওর মুখের ওপর ফেলেই মাথা নামাল সীতা। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, সে বিদ্যুৎ যেন তার তরল চোখের ওপরেও চমক লাগিয়ে গেল।

আর চমকে উঠল রঞ্জন। এবারে আর ভুল নেই—আর সন্দেহ নেই কোথাও। এমন দৃষ্টি আর একজনের চোখে সে দেখেছিল, ঠিক এমনি আর একজনের দৃষ্টিই তার সমস্ত জীবনকে আলো করে দিয়েছে। সে মিতা। আজ সাত বছরের ওপার থেকে আবার কার চোখে তা ফিরে এল, ফিরে এল কোন অর্থহীন শূন্যতায়।

অস্বস্তিভরা আতঙ্কে যেন অসাড় হয়ে গেল সে, একটা আকস্মিক প্রবল আঘাত লাগবার মতো তার স্নায়ুগুলো যেন সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে বসেছে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ—নিমগাছটার পাতায় তেমনি সমানে চলেছে ক্ষ্যাপামির উল্লাস। দ্রুত পদধ্বনির মতো হৃৎপিণ্ডে শব্দ উঠছে অবিশ্রাম। আর কেমন অপূর্ব স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে আবার চোখ তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিয়েছে সীতা। তার গালের লালিমা আরো ঘন হয়ে এসেছে, অপরাধীর মতো আঙুলে জড়িয়ে চলেছে আঁচলটাকে।

এ অসম্ভব, এ অসহ্য। অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটাতে হবে এর। এই শান্ত লক্ষ্মীর মতো মেয়েটির মনকে একবিন্দু কালিমার হাত থেকেও বাঁচাতে হবে তাকে।

—আর কিছু বলবে সীতা?

সীতা বললে, হুঁ।

—কী বলবে?—এবার চেষ্টা করেই যেন সহজ হওয়ার ভাবটা আনতে হল গলায়।

প্রায় অস্ফুট স্বরে সীতা বললে, আমি আপনার কাছে পড়ব।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ—সীতার লজ্জিত চোখে এবার অনুনয়ের আকৃতি রূপ পেল: আমাকে একটু ইংরেজি পড়িয়ে দেবেন। যদি আপনার খুব অসুবিধে না হয় তা হলে কাল দুপুর বেলায়—

কাল দুপুর বেলায়! সমস্ত অনুভূতি চমকে উঠল। ফাঁস পড়ছে, এসেছে প্রথম পাক। এখনি একে ছিন্ন করা উচিত। এমনি রূঢ়ভাবে বলে দেওয়া উচিত তার সময় নেই, দুপুর বেলা তার নির্জন ক্যাম্পে একটি কুমারী মেয়েকে পড়াবার বিপজ্জনক দায়িত্ব সে নিতে পারে না।

কিন্তু সীতার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না সে। নিজের মধ্যে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল, নিজের অজ্ঞাতেই তা আশ্চর্য ভাবে স্তিমিত হয়ে গেল।

—আচ্ছা, এসো।

বৃষ্টির জোরটা কমে গেছে, কিন্তু ঝিরঝির করে পড়ছে তখনো। সীতা আর দাঁড়ালো না, দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

বৃষ্টি থামল। বিকেল এল, এল সন্ধ্যা। রঞ্জনের যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না আজ। সমস্ত দেহমন যেমন ক্লান্তি, তেমনি গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার। এ কী হচ্ছে—এ কোন্ দুর্বলতার বীজ বপন করতে যাচ্ছে সে। জানে এর কোনো পরিণাম নেই, নেই এর কোনো সার্থক পরিণতির দ্যোতনা। অনর্থক জীবনে জেগে থাকবে ক্ষতরেখা, অকারণে আর একটি মেয়েকে চিরদিনের মতো ক্ষতিগ্রস্ত করে রেখে যাবে। পড়ানো নিয়ে যার শুরু, তার শেষও কি সেইখানে ?

ছি ছি, এ হতেই পারে না। মন নিয়ে দোলা খাওয়ার মতো কাঁচা বয়েস তার কেটে গেছে। কাজ, অনেক কাজ। দরকার হলে কঠিনভাবে ঘা দিয়ে মোহভঙ্গ ঘটিয়ে দিতে হবে মেয়েটার।

কী করবে কাল ? এলে বলবে, তুমি চলে যাও ? অথবা বলবে—

কিন্তু কিছুই বলবার দরকার হল না আর।

ছপ ছপ করে একরাশ জলকাদা ভেঙে শশব্যস্তে প্রবেশ করলেন দারোগা। আনন্দ-সচ্ছল স্বরে জানালেন, রঞ্জনবাবু, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্।

—কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্!—রঞ্জন চম্‌কে বিছানার ওপর উঠে বসল : ব্যাপার কী ?

—স্বার্থপরের মতো আপনাকে আটকে রাখতে পারলেই খুশি হতাম আমরা। কিন্তু তার উপায় নেই আর।

—হেতু ?

—আপনার রিলিজের অর্ডার এসেছে।

—রিলিজ! চমক আর অবিশ্বাসে উচ্চকিত চোখে চেয়ে রইল রঞ্জন।

—তিন ঘণ্টার মধ্যেই—You are to start! তারপর সকালের ট্রেনে কলকাতা! আলিপুর সেনট্রাল জেল থেকে আপনাকে খালাস দেওয়া হবে। এমার্জেন্সি অর্ডার।

—কিন্তু এত শর্ট নোটিসে ? আমার জিনিসপত্র—

—সব ব্যবস্থা করব, কিছু ভাববেন না। Congratulations again! কিন্তু আমাদের ভুলে যাবেন না রঞ্জনবাবু। অপরাধ অনেক করেছি, যোগ্য মর্যাদাও দিতে পারিনি। সেজন্যে দায়ী আমরা নই, দায়ী আমাদের—যাক, মনে রাখবেন দয়া করে।

লণ্ঠনের আলোয় পুলিসের দারোগার নিষ্ঠুর কঠিন চোখও চকচক করে উঠল নাকি ?

পদ্মার স্রোতে নৌকো ভাসল রাত এগারোটায়।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘটনাটা ঘটল ঠিক তারই পূর্ব মুহূর্তে। যাত্রার সঙ্গী হয়ে এলেন না দারোগা সাহেব স্বয়ং, তার পরিবর্তে এল এ-এস-আই সুধীর দাস।

—কী মশাই, দারোগা সাহেব কোথায় ?

সুধীর যেন একটু একটু হাঁপাচ্ছিল বললে, তিনি আসতে পারলেন না। আমিই এসকর্ট করে নিয়ে যাবো আপনাকে।

—কেন ?

—একটা কাণ্ড হয়ে গেছে মশাই। ওপারে এক জমিদার আছেন, ডাকসাইটে দুঁদে লোক। খুন করাতে পারেন চোখ বুজে, এতকাল তো প্রজাদের ভিটেতে কলাই বুনেই এলেন তিনি। এবারে উল্টে পড়ছে তাঁর পাশা। গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান শ' চারেক লোক মিলে তাঁর বাড়ি অ্যাটাক্ করেছে। তিনিও ভেতর থেকে বন্দুক চালাচ্ছেন সমানে, একটা খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে। সেই খবর পেয়েই দারোগা সাহেব ছুটে গেলেন। ওদিকে আবার আপনাকেও নিয়ে যেতে হবে, তাই আমি এলাম।

—বলেন কি, খণ্ডযুদ্ধ !

সুধীর দাস একটা বিড়ি ধরালো : কে জানে মশাই, হাওয়া যে এখন কোন্ দিকে যাচ্ছে। দুদিন বাদে কী যে ঘটবে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। নইলে এই নমঃশূদ্র আর নিকারীরাও সহায়রামবাবুর মতো বাঘা লোকের বাড়ি অ্যাটাক্ করতে সাহস পায় ! ছোটলোকের যে রকম তেজ বেড়েছে তাতে কোনোদিন বা দুনিয়াটাকেই পাল্‌টে দেয় এরা !—সুধীর বৈরাগ্যভরে বিড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে দিলে।

রঞ্জন চুপ করে রইল। কোথায় যেন একটা সমাধান হয়ে যাচ্ছে। মনের বিশৃঙ্খল সূত্রগুলো যেন জুড়ে যাচ্ছে একসঙ্গে—রূপ নিচ্ছে একটা সুনিশ্চয়তার।

পদ্মার স্রোতে নৌকো চলল এগিয়ে।

আবার বাইরের পৃথিবীতে তার বিস্তৃত উদার আক্রমণ। এই মুক্তি। বুকভরা অশ্রান্ত জোলো বাতাস টেনে নিতে পারছে সে। নৌকো ভেসে চলেছে পদ্মার বন্ধনহীন স্রোত-প্রবাহে। এপাশে আফিঙের বিষাক্ত নেশার মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন বাংলার দেহে তার নতুন কর্মক্ষেত্র ; ওপাশের সীমানাহীন জলের বিস্তারে যেন তারই দুরধিগম্যতার ব্যঞ্জনা।

সীতা কাল দুপুরে আসবে বলে গিয়েছিল।

ও কিছু না। পথ চলতে চলতে অমন দু-চারটে লতা পায়ে জড়িয়ে ধরেই। তাদের ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে চলাই তো জীবন। মুক্তি। ডাকছে জনবহুল, কর্মবহুল পৃথিবী। কতদিন সে দেশের রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সে ক্ষতি পূরণ করে নিতে হবে—সময় নেই তার। ফিরতে পারবে না, পারবে না পেছনের নীড়ে তাকাতে। দেশ জুড়ে চলেছে জন-জগন্নাথের রথ, কালের যাত্রা। সেই রথযাত্রায় পেছনের ভিড় তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে ; নিয়ে যাবে তারই আদর্শ আর ব্রতচর্যার নির্ভুল লক্ষ্যে।

কিন্তু—

ও কিন্তু থাক। সীতা ভুলে যাবে। হয়তো কালই। নয়তো বড় জোর এক বছর। আর

মিতা প্রতীক্ষা করে আছে। সীতার মধ্যে উষার পুনরাবির্ভাব বুঝি দেখেছিল—সাত ভাই চম্পার স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে তা হারিয়ে যাক্। মিতা। রজনীগন্ধার মৃত্যু হয়েছে আত্মবিলাসের রাত্রে। মিতার দৃষ্টি-প্রদীপে আজ সূর্যমুখীর তপস্যা। দুরূহ পথে নিত্য সহচারিণী সে :

"This is our day ; So turn my Comrade turn
Like infant eyes, like sunflower to the light !"

স্রোতের টানে নৌকো চলেছে সম্মুখে। পেছনে থানার আলোটা মিলিয়ে এল—অন্ধকারে তলিয়ে গেল ভাঙা মঠের নির্বাক মূর্তিটা। তমসাবৃত জনপদে বিস্তীর্ণ বিপুল ভারতবর্ষ—তার নতুন কর্মক্ষেত্র, খড়্গধার জলতরঙ্গে গণ-সমুদ্রের ডাক।

কিন্তু ও কি। নৌকোর মধ্যে থেকে হঠাৎ সকলেরই চোখ পড়ল ওদিকের আকাশে। বহুদূরে কোথায় আগুন লেগেছে। দিক্‌চক্রবাল ধরেছে একটা প্রেত-পিঙ্গল মূর্তি—দৈত্যের ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের মতো তার ওপরে থেমে আছে রক্তমেঘ। আগুনের এক-একটা বিসর্পিল শিখা কতগুলো লোলুপ আঙুলের মতো আকাশ থেকে কী যেন ছিনিয়ে নিতে চাইছে।

সচকিতে রঞ্জন বললে, সেই জমিদারবাড়িতেই আগুন লাগল নাকি ? ও সুধীরবাবু।

সুধীরের কপালে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল।

—কে জানে মশাই। তবে সহায়রামবাবুর বাড়িটা ওই দিকেই বটে—শুকনো গলায় সে জবাব দিলে।

রঞ্জনের মন দুলতে লাগল, হঠাৎ আলো হয়ে উঠল দৃষ্টি। অপমানিত নিশিকান্তেরা কি জেগে উঠেছে, আত্মহত্যার হাত থেকে কি মুক্তি পেয়েছে ফৈয়জ মোল্লার দল ? ওই তো—ওই তো তারই সঙ্কেত—আগামী প্রভাতে ক্রান্তি-সূর্য জাগবার আগে অগ্নিদীপিত পূর্বরাগ : "Sky-high a signal flame—"

এর পর ?

এরপর তো একা রঞ্জন আর কোথাও নেই। আর নয় ব্যক্তিসত্তার কাহিনী। এতক্ষণে রঙীন বুদ্‌বুদটা এইবারে মিলিয়ে যাচ্ছে আদিগন্ত খরপ্রবাহে। এরপর সে সকলের। তার ইতিহাস সাড়া দেবে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে, তার পরিচয় সর্বজনীন প্রাণবিক্ষোভে, তার পথের আহ্বান পাঠাচ্ছে ওই রক্তপিঙ্গল শিখালোলুপ আগ্নেয়-দিগন্ত। সীতা আজ মৃত অতীত হয়ে পড়ে রইল কবি রঞ্জুর গীতি-কবিতার খাতায়। আর ওই আগুনের পর্বে মিতা তাকে ডাক দিয়েছে, তার হাতে অনির্বাণ বিপ্লবের রক্তমশাল। ব্যক্তিমানসের এই কাহিনীটুকুই তারই প্রস্তুতি-পর্ব।

অগ্নিরেখ-আকাশের চন্দ্রাতপ মাথার ওপর। আগুনের ফুল্‌কির মতো দপ দপ করে জ্বলছে সত্যের স্বাক্ষর—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নক্ষত্রের শিলালিপি।

লাল মাটি

আমার শৈশবে হারানো মা-কে

'শিলালিপি' উপন্যাসের সঙ্গে 'লাল মাটি'র কাহিনীগত সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, শুধু ভাবগত যোগসূত্র আছে মাত্র। সুতরাং 'লাল মাটি' স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস।

কথামুখ

চৈত্রের বাতাসে ধুলো ওড়ে—রাশি রাশি লাল ধুলো। তালবীথি আর শালবন কাঁপানো দমকা হাওয়া যেন হোলি খেলার উল্লাসে উড়িয়ে দেয় ফাগের গুঁড়ো। বর্ষায় তা-ই রক্তচন্দন ; ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অশথ-বটের একশ বছরের পুরনো ডাল-পালায় বৃষ্টির ঝাপ্টা লাগে—বরিন্দের এই নিঃসীম মাঠকে মনে হয় কোনো কাপালিকের মূর্তি —ডাঁড়া বা নালার মুখ দিয়ে তীরবেগে ছুটে-চলা জলধারা একখানা বাঁকা খড়্গের মতো ঝিলিক মারে বিদ্যুতের উচ্ছলতায়।

কোনো মরা নদীর শুকনো গর্ভের মতো বিলুপ্ত সভ্যতার অস্থিচূর্ণবাহী নরেন্দ্রভূমির মরা মাটি। হঠাৎ কখনো কখনো মনে হয়, একদিন একটা রক্তসমুদ্র ঢেউ তুলে তুলে দুলত এইখানে ; যেন সৃষ্টির আদিতে ফুটন্ত সোরা-গন্ধক-লাভা-তরঙ্গের মতো। তারপর আস্তে আস্তে থেমে গেল তার উৎক্ষেপ, নিবে গেল তার উত্তাপ। রক্ততরঙ্গ রূপায়িত হল উঁচু ডাঙা আর নিচু ঢালের খামখেয়ালীতে। পাল-তোলা সভ্যতার জাহাজ থমকে গেল সেই সঙ্গে, জরাজীর্ণ হতে লাগল ক্ষমাহীন সূর্যের আলোয়—তারপর তার ভাঙা হাড়-পাঁজরা রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে।

আজ বরিন্দের মাঠ প্রত্নবিদের কৌতূহল। এর মজা দীঘির ধারে ধারে আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায় তার সন্ধানী দৃষ্টি। এর সিঁদুর মাখানো থানে থানে মূক অতীত হঠাৎ ওঠে মুখরিত হয়ে। পুরনো বটের কোটর যেখানে ফোঁপরা হয়ে গিয়ে একটা ফাটা পেটের মতো হাঁ করেছে—তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আধখানা শিলাফলক ইতিহাসের অন্ধকারে ফেলে ম্লান মশালের আলো।

লাঙলের ফালে ফালে ওঠে শিলামূর্তি—কেউ সম্পূর্ণ, কেউ খণ্ড খণ্ড। কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে অচল ধর্মচক্র আলোর দিকে চোখ মেলে তাকায় হাজার বছরের ওপার থেকে। ভরা বর্ষায় দীঘির উঁচু পাড়ি কেটে কেটে বৃষ্টির ধারা যখন নামে, তখন তার সঙ্গে হঠাৎ গড়িয়ে আসে একটুকরো স্বর্ণমুদ্রা : 'শ্রীশ্রীধর্মপালস্য'। পাঁচু মিঞার মুরগীর খোঁয়াড়ের তলায় একদিন কুড়িয়ে পাওয়া যায় একখণ্ড উৎকীর্ণ তাম্রপট্ট : 'দেবাচল গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব সোমদত্তকে দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে এই ভূখণ্ড দান করলেন চণ্ডিকানুগৃহীত ক্ষত্রিয়কুলগৌরব ভূস্বামী বসুবন্ধু'।

শুধু তাই নয়, কাঠবাদাম আর পুরনো নিমগাছের ছায়ার নিচে, স্বর্ণলতায় ছাওয়া লাটাবন আর মনসা কাঁটার আবেষ্টনে ভাঙা দরগা তাকিয়ে থাকে প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে। পুরু শ্যাওলার আস্তর-পড়া মসজেদের গম্বুজের ফাটলে ফাটলে অশ্বত্থের শিকড় নামে

নাগপাশের মতো। আলাদ-গোখুরের ফোকরভরা ভাঙাচুরো উঁচু জাঙাল 'শাহী সড়ক' নাম নিয়ে আকাশের দিকে মুখ ভ্যাংচায়।

সভ্যতার শ্মশান এই বরিন্দের মাঠ।

একদা গৌরবান্বিত ছিল জনপদে আর লোকালয়ে; বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে; শিল্পে আর বাণিজ্যে। সেদিনের সেই উজ্জ্বল প্রজ্ঞার নিদর্শনের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রুকনপুরের অতিকায় শিলাগঠিত দীপস্তম্ভ। একমণ ঘি আর একথান কাপড় দিয়ে আজ আর সেই দীপস্তম্ভে প্রদীপ জেলে দেয় না কেউ, কবে একদিন সে প্রদীপ বুক-জলে নিবে গেছে—আর সেই সঙ্গে গৌড়ের প্রাসাদেও ঘটেছে দীপনির্বাণ—বরেন্দ্রভূমির বুকে ছড়িয়ে গেছে বিস্মৃতির নিশিপট।

আর ডাকে বান। বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল নামে বরিন্দের ঢালু মাঠের ওপর। মহাসাগরের রূপ ধরে। দেশী গাড়োয়ানের গরুর গাড়ির লিক তলিয়ে থাকে তিরিশ হাতের জলের নিচে। এলোমেলো বাতাসে বাদাম তোলে পশ্চিমা মাঝিদের নৌকো।

একদিন এই নদীগুলি ছিল বরিন্দের বাণিজ্যপথ—তার জীবনসরণি। কিন্তু শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। পলিমাটি পড়ে গর্ত যতই ভরাট হয়ে উঠছে—ততই বন্যার উচ্ছ্বসিত জলধারাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। অভিশপ্ত বরিন্দের মাঠ যেন আত্মবিস্তার করতে না পেরে আত্মহত্যা করে চলেছে।

বাংলা দেশের প্রাচীনতম মৃত্তিকা। রাঢ়-বঙ্গ যখন অবগুণ্ঠিত জলায় আর বাদাবনে—সেদিন সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত এই লাল মাটি—বরেন্দ্রভূমি। একদিকে যখন কষাড়জঙ্গলের মাঝখানে জলন্ত বাঘের চোখে আর হোগলার চড়ায় কুমীরের লেজ-ঝাপটানিতে প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রাম, তখন এর রাজপথ দিয়ে গৌড়াবনীবাসবের চতুরঙ্গ গৌরবে রণযাত্রা।

জৈন-তীর্থঙ্করদের পদচ্ছায়ায় ভিক্ষু করুণাশ্রীর ধ্যান-বিলীন সৌম্যমূর্তি; সংঘস্থবির মণিভদ্রের উদার কণ্ঠে মুখরিত ত্রিপিটকের পবিত্র বাণী; একলাখী আর সোনা মসজেদের উচ্চশীর্ষ থেকে আজানের প্রভাতী ঘোষণা—একলক্ষ মানুষের সমবেত একটা সশ্রদ্ধ ছবি।

শুধু কি ক্ষয় আর মৃত্যুর ইতিহাস?

না।

বরিন্দের রাঙা-মাটির মাঝখানে দিগবিকীর্ণ একটি দীঘি—দীবোর দীঘি তার নাম।

টি বিচূর্ণ বিধ্বস্ত প্রাচীন প্রাকার: তার নাম ভীমের জাঙাল।

নিঃশব্দ ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে অকস্মাৎ।

রাজা দ্বিতীয় মহীপাল। মহারাজচক্রবর্তী ধর্মপাল-দেবপালের বংশে মূর্তিমান কুল-কলঙ্ক। মদ্যপ, লম্পট, অত্যাচারী। নারীমাংস-লোলুপতায় তার তুলনা নেই। একদিকে যেমন একজন সমৃদ্ধ প্রজা একটি মুহূর্ত শান্তিতে কাটাতে পারে না, অন্যদিকে একটি সুন্দরী নারী নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে না একটি রাত্রিতেও।

তারপর একদিন আগুন জ্বলল। অহল্যা মাটির পাষাণ বুকের ভেতর থেকে বিদীর্ণ হল আগ্নেয়গিরি। বাংলার মাটিতে প্রথম সার্থক গণবিপ্লব—শূদ্রশক্তির উদ্বোধন।

ইতিহাসের পাতায় তার নাম 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ'। শুধু তাই বলে এই বিদ্রোহ একটা বিশেষ শ্রেণীগতই ছিল না, তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিয়েছিল শ্রেণীবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষ; দিব্যোকের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ কৈবর্তশক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজপ্রতাপ—নিজের রক্ত দিয়ে এতদিনের সঞ্চিত ঋণ শোধ করতে হল মহীপালকে। প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি দিব্যোক স্ববলে আয়ত্ত করলেন গৌড়ের সিংহাসন, ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের ভীমভুজ রক্ষা করতে লাগল এই নতুন রাষ্ট্রকে।

দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সে কৈবর্ত-রাষ্ট্র। কিন্তু শত শত বছর পরে আগামী পৃথিবীর সূচনা এঁকে দিয়ে গেছে কাল-পুরুষের অক্ষয় পাণ্ডুলিপিতে। স্বাক্ষর রেখে দিয়ে গেছে গণ-মানবতার—ওই মজে-আসা দীবোর দীঘিতে, আর শিলামণ্ডিত জয়স্তম্ভে, দিগ্‌বিস্তীর্ণ ভীমের জাঙালে। ভবিষ্যতের মানুষের কাছে পূর্বগামীদের প্রেরণা।

সেই প্রেরণাই কি পেয়েছিল তারও কয়েকশো বছর পরে আদিনার সাঁওতালেরা? অনার্য শক্তি কি নতুন করে খুঁজেছিল আত্মপ্রকাশের পথ? জিতু সাঁওতালের ভেতর দিয়ে আত্মঘোষণা করতে চেয়েছিল দিব্যোকের বিদ্রোহী প্রেতসত্তা?

না। লাল মাটি শুধু তো মৃত-কালের একটা স্তব্ধ সমুদ্রই নয়। বরিন্দের মাঠে মাঠে শুধুই তো আকীর্ণ নেই মৃত-সংস্কৃতির পঞ্জরাস্থি। নদীর বাঁধভাঙা বন্যায় বন্যায় শুধুই তো সূচিত হয় না নতুন কোনো আত্মহত্যার ইতিহাস।

লাল মাটি। রক্তচন্দনের তিলক-পরা জটামণ্ডিত কাপালিক। ডাঁড়ার জলধারায় উচ্চকিত তার খর-খড়্গের দীপ্তি। একটা নতুন সত্যের—নতুন পৃথিবীর সাধনাই সে করে চলেছে। মৃত-কালের শবদেহে তার তন্ত্রাসন—নিশিরাত্রের আলেয়ার আলোয় তার চোখ সংস্কৃতির এই বিপুল শ্মশানে অস্থি-অক্ষ সন্ধান করে ফেরে।

আর অন্ধকারে চোখ মেলে রাখে রুকনপুরের দীপস্তম্ভ। তাকিয়ে থাকে দীবোর দীঘির জয়স্তম্ভের দিকে। প্রদীপ আর পতাকা। তারা কত দূরে যারা নতুন করে আবার দীপ জেলে দেবে, কোথায় ঘুমিয়ে আছে তারা—যারা নতুন ধ্বজার ঔদ্ধত্যে স্পর্ধা করবে আকাশকে?

ঝোড়ো হাওয়ায় পুরনো অশ্বত্থ-বটের ডালে-পালায় রুদ্র-তান্ত্রিকের জটা দুলে ওঠে।

মেঘের ডাকে শোনা যায় তার গুরু গুরু স্বর : তারা আসছে।

উগ্র ভয়ঙ্কর আলোয় চারদিক জ্বালিয়ে দিয়ে তালগাছের মাথায় বজ্র পড়ে। চড়চড় করে ফেটে যায় খানিকটা মাটি—তীব্র পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। সামনে বাঁকা খড়্গের মতো ডাঁড়ার জলটা ঝিকিয়ে ওঠে আর একবার, লাল মাটির একটা ঝড় হু হু করে ছুটে যায় দীর্ঘশ্বাসের মতো।

এক

শন্‌-শন্‌-শন্‌—

একটার পর একটা তীর চলেছে। ঘাসের বন ভেঙে-চুরে জানোয়ারটা যতই পালাতে চেষ্টা করুক, আজ আর রক্ষা নেই ওর। সাঁওতালেরা নির্ভুল ব্যূহ-রচনা করেছে চারদিকে। যেন শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ছে ওরা—প্রত্যেকটি তীর গিয়ে লাগছে লক্ষ্যস্থলে।

বুনো শুয়োরটা দেখল আর আত্মগোপনের চেষ্টা করা বৃথা। এদিকের ঘাস-বন তোলপাড় করে সে লাফিয়ে পড়ল বাইরের ফাঁকা মাঠের ভেতরে। ততক্ষণে তার নোংরা বিশাল শরীরটায় গোটাতিনেক তীর কাঁপছে থর থর করে—ঘন রক্ত সারা গায়ে তার জমে আছে রক্তজবার একটা মালার মতো।

নিতান্তই দুর্বুদ্ধি, তাই এই তল্লাটে একটা বুনো ওলের গোড়া খুঁড়তে এসেছিল সে। তাতেও যথেষ্ট হয়নি—একটা রাখাল ছেলেকে একটু দূরে দেখতে পেয়েই ঘোঁত ঘোঁত করে তাড়া করেছিল তাকে। গায়ে বেশি চর্বি থাকার জন্যেই হোক কিংবা রোদের তাপটা একটু বেশি প্রবল বলেই হোক, তার মাথাটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিল তখন। ছোকরাকে আয়ত্তের মধ্যে পেলে ধারালো দাঁতে তার পেটটাকে তৎক্ষণাৎ একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত সে।

কিন্তু কাছাকাছি একটা বাবলাগাছ ছিল, তাই রক্ষা। ছোকরা এক লাফে তাইতেই উঠে বসল। শুধু উঠে বসল তাই নয়—প্রাণপণে চিৎকার শুরু করলে সেখান থেকে।

দূরে কাঁদড়ের পাশ দিয়ে মহুয়া-বনে হরিয়ালের খোঁজে চলেছিল জোয়ান মাঝি একদল। চিৎকারটা কানে গেল তাদের। হৈ হৈ করে দৌড়ে এল তারা।

ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝেছে বুনো শুয়োর। উর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করতেগিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘাসবনের এই ফালিটুকুর মধ্যে। তার পর থেকেই চলেছে এই চক্রব্যূহের আক্রমণ।

নিরুপায় হয়ে মাঠের মধ্যেই সে লাফিয়ে পড়ল তারপর। জবার মালার মতো থকথকে রক্ত তার সারা গায়ে। ঘোঁত ঘোঁত করে আওয়াজটা যন্ত্রণায় গোঙানিতে

পর্যবসিত হয়েছে এতক্ষণে।

শাঁ করে আর একটা তীর এসে বিঁধল তার চোখের ওপর। অন্ধের মতো শেষ-আক্রোশে সম্মুখের লোকটার ওপর সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেল। ছিঁড়ে টুকরো করে দেবে তাকে—নেবে মর্মান্তিক প্রতিহিংসা। কিন্তু সে চেষ্টা করবার আগেই চক্ষের পলকে আর একটা তীক্ষ্ণ ফলক এসে তার ফুসফুসটাকে ভেদ করে দিলে—হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে—থর থর করে কাঁপতে লাগল সারা শরীর।

তীর ছুটে এল শন শন করে—একটার পর একটা। কখন যে নিজের সঙ্কুচিত দেহটাকে প্রসারিত করে দিয়ে চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল, নিজেই জানে না সে। সমস্বরে জয়ধ্বনি তুলল সাঁওতালেরা।

আর ঠিক সেই সময়ে, মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে সকৌতূহলে সেখানে সাইকেলটা থামাল রঞ্জন—কর্মী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আগ্রহ-ভরে জানতে চাইল: কি রে, কি শিকার পেলি তোরা?

—বরা, বাবু—একমুখ হেসে জবাব দিল একজন।

—বেশ বড় তো।—রঞ্জন ভীতি-মেশানো চোখে তাকিয়ে রইল শুয়োরটার দিকে।

—হ্যাঁ বাবু, খুব বড়।—আর একজন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—দাঁতাল। আমরা সময়মতো এসে না পড়লেই শালা উ ছোকরাকে মেরে ফেলত একদম।

রাখাল ছেলেরা তখন কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের দিকে একটা সাদা কাপড়ের ফালি ঝুলছে, তা ছাড়া আর কোনো পরিধেয়ই নেই তার। দু কানে দুটো তামার বীরবৌলি—তার একেবারে আদিম বেশ-বাসের সঙ্গে ও-দুটোকে কেমন বেখাপ্পা বলে মনে হয়। হাতে তার একটা পাচনবাড়ি—উত্তেজিতভাবে তখনো ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল সে।

ওদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এল। অত্যন্ত বীরের মতো সজোরে গোটা দুই লাথি মারল শুয়োরটার পেটের ওপর। ধূলিমলিন কালো পায়ে জড়িয়ে গেল একরাশ জমে-আসা ঘন রক্ত।

বললে, আমাকে মারবি? মার্ শালা, মার্ ইবারে।

রঞ্জন হাসল—খুব জোয়ান দেখছি যে। এই, কি নাম তোর?

পায়ে শুয়োরের রক্ত মেখে ছেলেটা তখনো বীররসে উদ্দীপ্ত। সগর্বে বললে, ধীরুয়া।

একজন জানিয়ে দিল পরিচয়টা—উ টুলকু মাঝির ব্যাটা। উর বাপের কথা জানো না? সেই যে মাঝিটা—ফতে শা পাঠানের পাইককে খুন করে হাজতে গেল?

মনে পড়ল ঘটনাটা। মাত্র বছর দুয়েক আগে। এ অঞ্চলের নামকরা জমিদার ফতে শা পাঠান। দুর্জনে বলে, সোনা দীঘির হাটের পথে নিজের লোক লাগিয়ে বাপকে খুন

করায় সে, তারপর দখল করে জমিদারী। পিতৃহত্যার রক্ত হাতে মেখে নিঃসঙ্কোচে সে তার রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে।

এমন লোকের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক যে খুব মধুর থাকবে না, সে বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাঁওতালরা মোটের ওপর জমিদারের সান্নিধ্য থেকে দূরেই ছিল অনেককাল। কুঁজি-কাঁটা আর ইকড় ঘাসে ভরা পতিত জমিতে বাস্তু বেঁধে বাস করতে অভ্যস্ত এই যাযাবরের দল। সামান্য ক্ষেত-খামার আর শিকার করেই এদের দিন কাটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জমিদার এদের কাছে প্রত্যাশা রাখে না—এরা খুশি মতো এক সের তামাক কিংবা দুটো একটা তিতির নজর দিয়ে আসে কখনো-সখনো।

কিন্তু ফতে শা পাঠানের জমিদারী মেজাজ হঠাৎ যেন দিল্লীর শাহেনশা বাদশাহের মতো চড়ে উঠল। গরুর গাড়ি করে আসতে আসতে তিনি দেখলেন, মাঠের একটা অংশে মটর-কলাই একটি ঘন সবুজের ছবি এঁকে রেখেছে।

ফতে শা জানতে চাইলেন : ও জমি কার?

বিশ্বস্ত বাদিয়া বরকন্দাজ বললে—হুজুরেরই।

—আহাম্মক!—ফতে শা খানিক থুথু ছিটিয়ে বললেন, জমি যে আমার, সে আমি জানি। রায়ত কে?

—জী, সাঁওতাল।

—সাঁওতাল?—একবার চোখ তুলে তাকালেন ফতে শা : খাজনা দেয় কত?

—কিছুই না—

—কিছুই না? কেন?—চোখ লাল করে জানতে চাইলেন ফতে শা : আমার প্রজা, অথচ খাজনা দেয় না?

—জী, ওটা পতিত জমি।

—পতিত জমি?—ফতে শা গর্জন করলেন : কিন্তু খয়রাতী তো নয়। জমি আমার। পতিত হোক যাই হোক—চাষ দিতে কে বলেছিল ওদের? খাজনা চাই।

—সাঁওতালরা ক্ষেপে যাবে হুজুর—

—ডরপোকা কুত্তার দল—চেঁচিয়ে উঠলেন ফতে শা : নেমকহালালের বাচ্চা! সাঁওতালের ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে আছিস। খাজনা চাই আমার—কালই যেন পাইক আসে।

পাইক এল পরের দিন।

ভদ্র ভাষায় কথাবার্তা বললে হয়ত রফা একটা হতে পারত, কিন্তু ফতে শা পাঠানের পাইক-বরকন্দাজদের শিক্ষাদীক্ষা অন্য রকম। তা ছাড়া খুনখারাপী করা বাদিয়া, কাউকে বরদাস্ত করবার বান্দাই নয়। ফলে শেষ পর্যন্ত একটা তীর এসে মহবুব পাইকের

গলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। পুলিস এসে চালানদিলে টুলকুকে—দশ বছর হাজত হয়ে গেল তার।

সেই টুলকুর ব্যাটা এই ধীরুয়া। রঞ্জন একবার অন্যমনস্ক ভাবে তাকাল ধীরুয়ার দিকে। কেউটের বাচ্চা কেউটে? বিষ সঞ্চয় করে প্রস্তুত হচ্ছে দিনের পর দিন—বরিন্দের প্রান্তে প্রান্তে, লাল মাটির টিলার আড়ালে-আবডালে?

চমক ভেঙে গেল।

সাঁওতালদের একজন বললে—বাবু, আজ রাতে আমাদের পাড়ায় তুর নিমন্তন্ন।

—ওই শুয়োর খাওয়াবি বুঝি?

—হাঁ, আর পচাই।

—দুটোর একটাও আমার চলবে না মোড়ল—রঞ্জন হাসল: নেমন্তন্নটা জমা রইল ভবিষ্যতের জন্য। কেমন?

—হাঁ বাবু।

—আচ্ছা—মৃদু হাসল রঞ্জন, শেষবার তাকাল টুলকুর ছেলে ধীরুয়ার দিকে। তারপর আবার সাইকেল হাঁকিয়ে ধরল জয়গড় মহলের পথ—হাতে তার অনেক কাজ এখন।

দুই

ধানসিঁড়ির দেশ এই বরিন্দ।

দূর থেকে মনে হয় যেন অতি বিশাল একটা বৌদ্ধ প্যাগোডা। ঢেউ-তোলা মাটি চলেছে দিক থেকে দিগন্তে—যতদূর চোখ চলে উঁচু-নীচুর খেলা। ঢেউ-তোলা এই মাঠের বুকে লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ধানের সমারোহ, আলের রেখাগুণ্ডি দিয়ে বাঁধা ধানক্ষেতগুলি এক একটা সিঁড়ির মতো নেমে এসেছে। ফসল যখন বাড়-বাড়ন্ত হয়ে ওঠে—শরতের রোদ মেখে হিরণ্যশীর্ষগুলি নুয়ে নুয়ে পড়ে আলের ওপর, তখন মনে হয় বরিন্দের মাঠ জুড়ে কে যেন একটার পর একটা সোনার স্তূপ সাজিয়ে গেছে। আকাশ থেকে এক এক ছড়া পান্নার মালা কে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ওপর—উড়ে পড়ছে গাঢ়-সবুজ নল-টিয়ার ঝাঁক।

এই ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে নেমেছে একটা ফালি পথ। মানুষের পায়ে পায়ে মসৃণ—সূর্যের আলোয় প্রোজ্জ্বল। কোথাও কোথাও পুরু লাল ধুলোর স্তর পড়ে আছে, তার ওপর সরু সরু সর্পিল রেখা জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে। ওর অর্থ বুঝতে গেলে আসতে হবে সন্ধ্যার পরে—যখন তালবনের মাথার ওপর চাঁদটা ভালো করে উঠে আসবে—যখন অল্প অল্প লুলিয়া বাতাসে ভেসে বেড়াবে বহু দূরে ফোটা ঝাঁটি-আকন্দের গন্ধ, সেই সময় জুড়িয়ে যাবে দিনের দাবদাহ—মাটির ফোকরের ভেতর থেকে

একটি একটি করে মুখ বার করবে গোখরো আর কেউটের শিশুরা, বায়ু সেবন করবে, খেলে বেড়াবে খোলা পথটুকুর ওপরে। আর যদি মাটিতে টের পায় কোনো দূরাগত পদ-শব্দের স্পন্দন, তাহলে তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করবে ধানক্ষেতের আড়ালে।

সাইকেলের ব্রেকটা চেপে ধরে এই ঢালু পথ দিয়ে নামছিল রঞ্জন। লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ক্ষেত দুধারে বিস্তীর্ণ, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ধান এবারে হৃতশ্রী। অসময়ে কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়ে পোকা লেগেছে ধানে। শুক্তির বুকে আঁকড়ে রাখা মুক্তোর মতো ধানের স্নেহকোষে সঞ্চিত শস্যকণাটি কেটে খেয়েছে কীটেরা—এলোমেলো বাতাসে রেণুরেণু তুঁষ উড়ে যাচ্ছে। ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল রঞ্জন। গত বছর বন্যায় ফসল গেছে, এবারে যদি পোকায় সর্বনাশ করে, তাহলে মানুষের দুর্গতির কিছু বাকি থাকবে না আর। গেলবার আগাগোড়াই আধিয়ারদের কর্জের ওপর চালাতে হয়েছে; এবারে যদি শোধ না করতে পারে, তাহলে না খেয়ে মরতে হবে দেশসুদ্ধ লোককে।

ধানের ক্ষেতে সবটাই সোনা নেই—তাতে কলঙ্কের দাগ পড়েছে। অথবা কোনো দিনই সোনা ছিল না—ওর ভেতরে সবখানিই খাদ, সবটুকুই কলঙ্ক। দূর থেকে দেখেছে বলেই বুঝতে পারেনি; মনে হয়েছিল, রৌদ্রপীত স্বর্ণাঞ্চল বুকে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন বঙ্গলক্ষ্মী। অনেক কবিতা লেখা হয়েছে তা নিয়ে—অনেক উচ্ছ্বাসে মুখর হয়েছে শহরের বক্তৃতামঞ্চ। কিন্তু ক্রমাগত বর্ষা আর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় ফিকে হতে শুরু করেছে গিলটির রঙ।

কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেমন সন্দেহ হয় একটা আকাল নামছে। আকাশের ওই দিকটাতে মেঘ জমে উঠছে—হয়ত ফাঁকা, হয়ত শেষ রাতের দিকে খানিক বৃষ্টি হতেও পারে। কিন্তু মনে হয় ওটা যেন একটা বিশাল গিন্নী শকুন; সামনের দিকে মেঘের যে অংশটুকুর ওপর রোদ জলছে তা ওরই শানানো ঠোঁট। শবদেহের মতো পৃথিবী পড়ে আছে সম্মুখে—শুকনো কুঞ্চিত চামড়ায় বলিচিহ্নের মতো সাপের রেখা।

এখনই তো তার কাজ। জমি তৈরি হচ্ছে—সময় আসছে এগিয়ে। খাটনিও বড় বেশি পড়েছে কিছুদিন যাবৎ। কুমার ভৈরবনারায়ণের ওখান থেকে বাস এবার তুলতে হল। গীতাপাঠের অভিনয়টা আর চলছে না। কুমার বাহাদুরও এর মধ্যে সন্দেহ করেছেন বলে মনে হয়।

সেদিন সবে যখন কুমার বাহাদুরের আফিঙের মৌজটা বেশ জমে উঠেছে, ডেক-চেয়ারটায় লম্বা হয়ে গড়গড়ার নল নিয়ে তিনি চোখ বুজেছেন, আর বালাখানা তামাকের আমেজে ভারি হয়ে গেছে ঘর, তখন রঞ্জন খুব দরদ দিয়ে তাঁকে গীতা বোঝাচ্ছিল।

কুমার বাহাদুরের ডায়বেটিস আছে। শরীরের কোথাও ইলশে গুঁড়ির ফোঁটার মতো একটা ফুস্কুড়ি দেখলেই আতঙ্কে লাফিয়ে ওঠেন তিনি, চেঁচিয়ে ওঠেন: ডাক্তারকো

বোলাও। আনো ইনসুলিন।—মৃত্যুভয় তাঁর নিত্য সঙ্গী। সেই জন্য রঞ্জন তাঁকে কিছুটা আশ্বাস দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিল।

গলার স্বরে যথাসাধ্য আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করেই সে পড়ে যাচ্ছিল :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি—

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।...

অর্থাৎ কিনা, হে কৌন্তেয়, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে থাকে, তেমনি জীর্ণ শরীরকেও ত্যাগ করে মানুষ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্লোকটা কুমার ভৈরবনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ মৃত্যুর দুর্ভাবনা এতে অনেকটা যেন লাঘব হয়ে আসে। আত্মা অজরামর—এই সত্যটা অধিগত হলে, সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও আসে যে মরেই তিনি পত্রপাঠ ফুরিয়ে যাবেন না, তাঁর জমিদারীর স্বত্ব-স্বামীত্ব ভোগ করবার জন্য আবার দেহধারণ করে ফিরে আসবেন মর্ত্যে।

কিন্তু ডায়বেটিস ভীত কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমার বাহাদুর আজ এমন মনোরম আলোচনাতেও গদগদ হয়ে পড়লেন না। ফরসিতে একটা টান দিয়ে কেমন মিটিমিটি চোখে তাকালেন।

বললেন—আচ্ছা ঠাকুরবাবু।

একদিকে বাবু, অন্যদিকে ঠাকুরমশাই—এই দুই মিলিয়ে হিজলবনীর রাজবাড়িতে এই বিচিত্র নামকরণ হয়েছে রঞ্জনের—ঠাকুরবাবু। কুমার বাহাদুর যেদিন রাত্রে একটু বেশি কারণ করেন সেদিন কখনো কখনো ঠাকুরবাবাও বলে থাকেন। রঞ্জনও পিতৃস্নেহে তাঁকে মোহমুদ্গার শোনাতে আরম্ভ করে। আজ কিন্তু আফিঙের এমন জমাট নেশায় ঠাকুরবাবু সম্ভাষণের মধ্যেও কেমন একটা দূরত্ব ঘনিয়ে রইল।

—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ গড়গড়ায় মৃদুমন্দ চুম্বন করলেন। মুখ খুললেন :

—কাল বুঝি জয়গড় মহলে গিয়েছিলেন আপনি ?

রঞ্জন নড়ে উঠল। সতর্ক হয়ে তাকাল ভৈরবনারায়ণের দিকে।

কিন্তু তাঁর চোখ ততক্ষণে আবার নেশার আবেশে অর্ধনিমীলিত হয়ে এসেছে। মুখে একটা নির্মল নির্লিপ্ততা—গীতাপাঠের নগদ নগদ ফল কিনা কে জানে। শিথিল ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলেন : বেড়িয়ে এলেন বুঝি জয়গড় থেকে ?

রঞ্জন অত্যন্ত সাবধানে উত্তর দিলে। আত্মপ্রকাশ করলে সংক্ষিপ্ততম শব্দে : হুঁ।—আরো কিছু বলবার আগে কুমার বাহাদুরের মনোগত অভিপ্রায়টা জেনে নিতে চায় সে।

কুমার বাহাদুর কিন্তু বেশি কিছু ভাঙলেন না। তেমনি নির্মল নির্লিপ্ত ভাবে বললেন—তাই শুনলাম। তা জয়গড় বেশ ভালো জায়গাই বটে। যেমন ওর মহুয়া-বনটি, তেমনি

ওর নদীর ধার। খাসা জায়গা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কুমার বাহাদুর যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছেন, এইভাবে বললেন : নিন, শুরু করুন তাহলে আবার —হ্যাঁ—কী যেন পড়ছিলেন ? বাসাংসি জীর্ণানি—মানে পুরনো বাসা ত্যাগ করে—

—বাসা নয়, বাস। অর্থাৎ কাপড়। মানে শরীর।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—শরীর।—গড়গড়ার নলটি আবার চুম্বন করেই ছেড়ে দিলেন কুমার বাহাদুর: তবে জয়গড়ে কয়েকটা বেয়াড়া লোক আছে—একবার দেখতে হচ্ছে তাদের। আর সেই কী বলে নগেন ডাক্তারকেও। সে যাক, আপনি পড়ুন। মানে পুরনো শরীর ত্যাগ করে—

যন্ত্রের মতো পড়েছে অগত্যা, যন্ত্রের মতোই ব্যাখ্যা করে গেছে। শুনতে শুনতে ফরসির নল মুখে করেই ঘুমিয়ে গেছেন ভৈরবনারায়ণ। কিন্তু মনের মধ্যে স্বস্তি পায়নি রঞ্জন। কুমার বাহাদুরকে সে যতটা চালাক ভেবেছিল, তিনি তার চাইতে আরো কিছু বেশি। যা বলবার, মাত্র একটি কথাতেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন ; স্পষ্ট করার চাইতে তিনি ইঙ্গিতেরই পক্ষপাতী বেশি।

অতএব বেশিদিন থাকা চলবে না আর। এখন থেকে হুঁশিয়ার না হলে নিজেই জালে পড়ে যাবে। তবু দেখা যাক—।

চিন্তাটা থমকে গেল হঠাৎ। বেশ রূঢ়ভাবেই। ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে—ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথটা সম্পর্কে যে আরো একটু সচেতন থাকা উচিত তা তার মনে ছিল না। অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সাইকেলটা একটা মাটির চাঙাড়ে টক্কর খেল, তারপর সোজা ওকে নিয়ে পাশের ধানক্ষেতে কাত হয়ে পড়ল।

ধানসিঁড়ি সাজানো পালার মতো বরিন্দের মাঠ শব্দ-সুরভিত হয়ে উঠল। আধখানা ভরা কলসীর জলের মতো আওয়াজ তুলে হেসে উঠল একটি মেয়ে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে আর্ত কর্কশধ্বনি তুলে গোটাকয়েক নল-টিয়া ডানা মেলল আকাশে।

হাসছিল কালোশশী।

প্রথম বর্ষায় প্রাণ পেয়ে ওঠা নতুন লতার মতো চেহারা। উজ্জ্বল—পল্লবিত বরিন্দের রোদ-বাতাস আর বৃষ্টিতে সঞ্জীবিত, রসান্বিত মেয়েটি।

রঞ্জন সাইকেল টেনে লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়াতে কালোশশী এগিয়ে এল।

—হাসলি যে ?

কালোশশীর মুখ আবার আলো হয়ে উঠল হাসিতে : অমন করে পড়ে যাবি তুই—হাসব না ?

—আচ্ছা, আচ্ছা—মনে থাকবে।—রঞ্জন গম্ভীর হয়ে উঠল: যাবি তো রাজবাড়িতে—দেখা যাবে তখন। বলে দেব কুমার বাহাদুরকে—টের পাবি।

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কালোশশী। কুমার বাহাদুরের নাম শুনেই যেন তার মুখের আলোটা ফিকে হয়ে এল। উজ্জ্বল দৃষ্টির ওপর নামল আশঙ্কার স্তিমিত ছায়াভাস।

—এই বাবু, গোসা করিসনি। আর হাসব না আমি।

রঞ্জন যেন অপ্রতিভ হল। খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা শিশুকে একটা ভুতুড়ে মুখোশ পরে ভয় দেখানোর অপরাধবোধটা স্পর্শ করল মনকে। সঙ্গে সঙ্গে কুমার ভৈরবনারায়ণের মুখখানা স্মৃতির ওপরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একবার। সাধারণ মানুষের মুখের চাইতে প্রায় দেড়গুণ বড়—টকটকে রাঙা তার রঙ; পুরু একজোড়া ঠোঁটের ভেতর থেকে দাঁতগুলো এমন ভঙ্গিতে বেরিয়ে থাকে যে অকারণ পুলকে সে মুখে এক আঁটি বিচালি গুঁজে দিতে ইচ্ছে করে। হাসির বালাই সেখানে নেই—শুধু খামকা মনে হয় লোকটা বুঝি মাথার ওপর থেকে একজোড়া শিঙ বের করে এখুনি গুঁতিয়ে দেবে কাউকে। কালোশশীর দোষ নেই।

সদয় কণ্ঠে রঞ্জন বললে—আচ্ছা, এযাত্রা মাপ করা গেল। কিন্তু কি নিয়ে যাচ্ছিস তুই? ঝাঁপিতে কি ও?

-একটা মজার জিনিস আছে, দেখবি?—কালোশশীর মুখে আবার আলো ফুটে উঠল।

—মজার জিনিস? দেখি —

কিন্তু 'দেখি' বলে দু-পা এগিয়ে গিয়েই 'বাপ রে' বলে দশ-পা পেছনে লাফিয়ে পড়ল সে। ঝাঁপির ঢাকা খুলতেই ভেতর থেকে তীব্র গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই চাপ-সরে-যাওয়া স্প্রীঙের মতো অসহ্য ক্রোধে ফণা দোলাতে লাগল নীলকৃষ্ণ রঙের বিশাল একটি কেউটে সাপ—তার ফণার ওপরে চক্রচিহ্নটা রোদে ঝলমল করে উঠল।

—কী সর্বনাশ! সাপ!

কালোশশী ততক্ষণে ক্ষিপ্র হাতে ঝাঁপি বন্ধ করে দিয়েছে। বললে—এখুনি ধরলাম কিনা—তাই এত তেজ। কামিয়ে দিতে পারলে আর অত মেজাজ থাকবে না।

—সে কি! এখনো ওর বিষদাঁত আছে তাহলে!—সভয়ে রঞ্জন বললে, যদি কামড়াতো?

—কামড়াবে কেন রে?—সগর্বে কালোশশী বললে, বেদের কাছে কি সাপের চালাকি চলে বাবু? ওর মতন গণ্ডা গণ্ডা সাপ নিয়ে আমার কারবার।—কালোশশী মৃদু হাসল: চারটে পয়সা দিবি বাবু? তাহলে এখনি ওকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে দিই।

—দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।—তেমনি আতঙ্কে রঞ্জন বললে, তোকে চার পয়সা

দিতে যাব কেন ? আমাকে কেউ চারশ টাকা দিলেও আমি ওর খেলা দেখতে রাজী নই !

কালোশশী তেমনি হাসতে লাগল : কিন্তু মরা সাপ নিয়ে খেলা করে কি সুখ আছে বাবু ? এমনি তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম। হাতের তালে তালে নাচবে—ছোবল মারতে চাইলেও পারবে না, তারপর মাটি ঠুকরে ঠুকরে নিজেই কাহিল হয়ে পড়বে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে কালোশশী তাকাল রঞ্জনের দিকে। ছিলে-টেনে-ধরা ধনুকের মতো তার ভ্রূ-রেখা চকিতে প্রসারিত হয়ে গেল ; নিস্তরঙ্গ দীঘির কালো জলে হঠাৎ একটা পাতা উড়ে পড়ার মতো আলো-ভাঙা হালকা ঢেউ খেলে গেল দৃষ্টিতে। আর তখনি কালোশশীর জীবনের যতটুকু ওর জানা, তা মনে পড়ে গেল।

আলোচনাটা অমনি থামিয়ে দিল রঞ্জন। সাইকেলে ওঠবার উপক্রম করে বললে—নে, পথ ছাড়্, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু আমি কাল একবার তোর কাছে যাব বাবু।

—আমার কাছে ! কেন ?

—ভারি বিপদে পড়ে গেছি বাবু—কালোশশী বিশীর্ণ হয়ে গেল : পরশুরাম ফিরে এসেছে।

—পরশুরাম ! তোর আগের স্বামী ?

কালোশশী লজ্জিতভাবে মাথা নামাল : হাঁ। আর বলছে, আমাকে খুন করবে।

—খুন করলেই চলবে ! আইন আছে না ? তুই ভাবিসনি—রঞ্জন আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল তাকে : আচ্ছা, আসিস তাহলে কাল।

পথ ছেড়ে দিয়ে ধানক্ষেতে নেমে দাঁড়িয়েছে কালোশশী, রঞ্জন সাইকেলে প্যাডল করল। উজ্জ্বল মেঠো পথ দিয়ে সাইকেলটা আবার এগিয়ে চলল সবেগে। পেছনে তাকিয়ে দেখল রৌদ্রভরা মাঠের ভেতরে তরুণী সাপুড়ে মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে—তার গলার রুপোর হাঁসুলিতে একখানা বাঁকা তলোয়ারের মতো রোদ ঝলকাচ্ছে।

অদ্ভুত এই মেয়েটা। এদেশী নয়—বাড়ি ওর বাংলা-বিহারের কোনো সীমান্তে। অথবা আসলে ওর কোনো দেশই আছে কিনা সন্দেহ। একটা বেদের দলের সঙ্গে ঘুরত, সেখান থেকে একজনের সঙ্গে পালিয়ে আসে লোকালয়ের স্থিতিতে। কিন্তু স্রোতের মন বাঁধা পড়বে কার কাছে ? তাই একটির পর একটি মানুষের সঞ্চার হচ্ছে ওর জীবনে। কিন্তু ওর সঙ্গে সমান গতিতে পা ফেলে তারা কেউই চলতে পারছে না—একটা বিশাল দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যেন একের পর এক পিছিয়ে পড়ছে তারা। বনহংসীর নীড় গড়বে কে ?

দয়াল দাস, পরশুরাম, লক্ষ্মণ সর্দার। আরো কত আসবে, কত যাবে, কে জানে।

এ হাঁসের পাখায় ক্লান্তি নেই—এক দিগন্ত ছাড়িয়ে আর এক চক্রবাল তাকে ডাক দেয়; এক অরণ্য থেকে আর এক অরণ্যে—এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্তে।

এত কথা রঞ্জনও কি জানত? একটা চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করে পরশুরামকে ধরে আনা হয়েছিল কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছারিতে—সেই সঙ্গে বিলাপ করতে করতে এসেছিল কালোশশী। সেদিন মাধবীলতা জড়ানো একটা খরকণ্টক ফণীমনসা যেন দেখেছিল রঞ্জন—চমক লেগেছিল তার চোখে।

কালোশশী তার মনের ওপর নেপথ্য-প্রভাব বুলিয়েছিল কিনা আজ সেকথা বলতে পারে না। কিন্তু এটা ঠিক যে, অনেকটা তারই চেষ্টায় সেযাত্রা অল্পের ওপর বেঁচে যায় পরশুরাম। মাত্র দরোয়ানের কড়া হাতে গোটাকয়েক থাপ্পড় খেয়েই নিষ্কৃতি পায়—হাজত পর্যন্ত যেতে হয়নি আর। সেই থেকেই তার উপর কৃতজ্ঞ কালোশশী। পরশুরামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবশ্য চুকে-বুকে গেছে অনেককাল—এখন বরং পরশুরাম কালোশশীকেই খুন করবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কিন্তু রঞ্জনের ওপর শ্রদ্ধা অবিচল আছে মেয়েটার। জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার ধার থেকে জাম কুড়িয়ে ফেরবার সময় প্রায়ই ভেট দিয়ে যায় রঞ্জনকে।

বাস্তবিক, অদ্ভুত মেয়েটা। কেমন প্রক্ষিপ্ত মনে হয় যেন।

চলতে চলতে কানের কাছে কথাটা বাজতে লাগল: তাজা সাপ নিয়েখেলতেই তো আরাম।—তাই বটে। প্রতি মুহূর্তেই টাটকা গোখরো সাপই তো খুঁজে ফিরছে কালোশশী। পরশুরামের মতো বিষধরেরা এসে জুটবে তার ঝাঁপিতে—ফণা দুলিয়ে দুলিয়ে খেলা করবে তার রুপোর কাঁকন-পরা হাতের তালে তালে, ছোবলমারবার ব্যর্থ চেষ্টায় আহত হয়ে হয়ে শেষকালে আত্মসমর্পণ করবে নির্জীব পরাজয়ে। আর তখনি সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তাকে—আবার শুরু হবে নতুন করে সাপ-খোঁজার পালা। নিষ্প্রাণ সাপ নিয়ে খেলতে ভালো লাগে না কালোশশীর।

ধানসিঁড়ি পার হয়ে সাইকেলটা এতক্ষণে নেমেছে সমতলে। পেছনে টিলার ওপরে কালোশশীকে আর দেখা যাচ্ছে না।

ফেলে-আসা-পেছনের পৃথিবীটাকে হঠাৎ যেন ঢেকে দিলে সামনে হিজলবনীর জমিদার-বাড়িটা; দূরে মাঠের ভেতর ঝকে উঠল মালিনী নদীর ক্ষীণ আঁকাবাঁকা রেখা। তারই একটা বাঁকের মুখে একপারে হিজলবন, অন্যপারে কুমার ভৈরবনারায়ণের দৌলতখানা।

ফাঁকা মাঠের ভেতর লাল-সাদা বাড়িটা—যেন কোনো জন্তুর একটা রক্তাক্ত পাঁজর পড়ে আছে ওখানে। আশেপাশের দশখানা গ্রামের মালিক—বহু মানুষের দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় অধিপতি কুমার ভৈরবনারায়ণ বাস করেন ওই বাড়িতে। ধানসিঁড়ির দেশে, খোলা আকাশ আর অবারিত মাঠের মাঝখানে যারা মাটি কাটে আর ফসল ফলায়—

ওই বাড়িটা তাদের হৃৎপিণ্ডের ওপর একটা ছোরার মতোই বিঁধে আছে সব সময়।

আর আপাতত ওই বাড়িতেই রঞ্জনের আশ্রয়।

চাকরিটা জুটেও গেছে বিচিত্র উপায়ে। জেল থেকে বেরিয়ে বেকারের মতো ঘুরছিল এদিক ওদিক, এমন সময় কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছেড়ে দিয়েছিল—পেয়ে গেল কাজটা। নামে প্রাইভেট সেক্রেটারি, কিন্তু কাজ গীতাপাঠ করে শোনানো। আফিঙ খেয়ে ঝিমুবার সময় গীতার শ্লোক না হলে কুমার বাহাদুরের নেশা জমে না। আহা—গীতার মতো কি আর জিনিস আছে! মৃত্যুভয় ভুলিয়ে দেয়—আশা হয় বাহাল-তবিয়তে আবার এই পৈতৃক জমিদারীতে আসীন হওয়া যাবে। কেননা আমার বিনাশ নেই:

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ—'

অর্থাৎ কিনা—হে কৌন্তেয়, আত্মা অবিনশ্বর! অস্ত্র দ্বারা এ ছিন্ন হয় না, অগ্নিতে এ দগ্ধ হয় না,—

আকুল হয়ে পড়ে রঞ্জন, বিভোর হয়ে শোনেন কৌন্তেয়। শুধু মধ্যে মধ্যে নাকের ডগায় দু-একটা মাছি এসে বসাতে তন্ময়তার কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটে কুমার বাহাদুরের।

ঘোঁত করে গলায় একটা আওয়াজ বের করে বলেন: অ্যাঁ—কি বলছিলেন? কোথায় আবার আগুন লাগল।

মুখে আসে: তোমার লেজে—কিন্তু প্রকাশ্যে বললে চাকরি থাকে না। সুতরাং বেশ ভদ্র ভাষায় জানাতে হয়: আজ্ঞে না না, আগুন কোথাও লাগেনি। ওই গীতায় বলছে আর কি—মানে আত্মা কখনো দগ্ধ হয় না—

—যাক, বাঁচালেন—সাধারণ মানুষের দেড়া মুখখানায় নিশ্চিন্ত একটা ভঙ্গি ছড়িয়ে আবার ঝিমুতে থাকেন ভৈরবনারায়ণ। মাঝে মাঝে গাল নড়ে ওঠে, যেন জাবর কাটছেন। আড়চোখে দেখতে দেখতে তোতাপাখির মতো রঞ্জন শুরু করে: হে পাণ্ডুপুত্র—

কিন্তু এতদিন ধরে সে বোধ হয় অবিচার করছিল খানিকটা। যতটা ঘুমন্ত ভেবেছিল ভদ্রলোককে, তিনি ততটা নন। নেশার ঘোরেও চোখ মেলে রাখতে জানেন।

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল: পাঁচটা। সর্বনাশ—এখনি চায়ের টেবিলে তার ডাক পড়বে। রঞ্জন দ্রুত সাইকেলটাকে চালিয়ে দিল।

তিন

পাহাড়ের মতো উঁচু ডাঙার ওপর থেকে ওই রকম বিচিত্রই দেখায় বটে বাড়িটাকে। কিন্তু কাছে এগিয়ে এলে ওর মূর্তি একেবারে বদলে যাবে। দেখা যাবে, বাড়িটা একটা আকস্মিক নিঃসঙ্গতা নয়—তার সাতমহলায়, দ্বারী-দৌবারিকে, ডায়নামো আর গ্যারেজে,

ঠাকুর-দালান আর বাই-নাচের রংমহলে, একেবারে জমজমাট। দেউড়ির দারোয়ান সিদ্ধি ঘুঁটতে ঘুঁটতে রামলীলার গান গায়—অন্তঃপুর থেকে চড়া গলায় রেডিয়োতে গানের চিৎকার আসে।

লোক-লস্কর, আমলায়-পেয়াদায় দস্তুরমতো রাজকীয় কারবার। মহাল নেহাত ছোট নয়, প্রায় ষাট হাজার টাকার জমিদারী। আগে আরো ছিল, কিন্তু মদিরা এবং মদিরাক্ষীদের অনুগ্রহে তার অনেকটাই বেহাত হয়ে গেছে। জমিদার ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ অবশ্য পিতৃপুরুষদের এই দুর্বলতার ইতিহাসটুকুকে স্বীকার করে নিতে রাজী নন। গোঁফে চাড়া দিয়ে তিনি বলেন, একসময় দশলাখ টাকার সম্পত্তি ছিল আমাদের। কান্তনগরের যুদ্ধে দিনাজপুরের মহারাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজেব বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা।

—সে সম্পত্তি গেল কোথায়?—কোনো কোনো চাটুকার হয়ত মুগ্ধকণ্ঠে জানতে চায়।

—আরে, সে দেবীসিংহের আমলে।—শোনা কথাকে ইতিহাসের গাম্ভীর্য দিয়ে তার ওপরে রঙ বুলোতে থাকেন কুমার ভৈরবেন্দ্র, সংক্ষেপে ভৈরবনারায়ণ: দেবীসিংহ হল এ তল্লাটের ইজারাদার। জমিদারের তখন যেমন লাঠির জোর, তেমনি টাকার তাকত—কথায় কথায় হাতে মাথা কেটে আনে। দেবীসিংহ দেখল—এদের জব্দ না করলে আর চলছে না। কিস্তির টাকা এমনি চড়িয়ে দিলে যে তা দিতে-দিতেই অনেকের জমিদারী সরকারী লাটে চড়ল। নইলে—হুঁঃ—হঠাৎ ভৈরবনারায়ণ নাকের ওপরে বসা মাছিটাকে হিংস্রভাবে থাবা দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেন: নইলে এতকাল কি আর ইংরেজে রাজ্যিশাসন করত। করতাম আমরা—আমরা!—মাছিটাকে ধরতে না পেরে উত্তেজিত-ভাবে একটা থাবড়া কষিয়ে দেন নিজেরই পেটের ওপরে।

সুতরাং শরীরে আপাততঃ আফিঙের জড়তা থাকলেও মনে জেগে আছে প্রচণ্ড ক্ষাত্রতেজ। গীতা শুনতে শুনতে কখনো কখনো তেতে উঠে কোমরের আলগা কষি দুটোকে বাঁধতে চেষ্টা করেন সজোরে। মনে হয় এক্ষুনি বুঝি যুদ্ধে চললেন। কিন্তু তা করেন না। হাত বাড়িয়ে গাণ্ডীবের বদলে ফরসির নল টেনে নেন, তার পরেই তাঁর পাঞ্চজন্য বাজতে থাকে—মানে সারাবাড়ির লোক ভৈরবনারায়ণের ভৈরব নাসিকা-নিনাদ শুনতে পায়: কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা হয় বটে, কিন্তু সেটা মাছিদের মধ্যে; কৌরবরাজ্য অধিকার করবার জন্যে নয়—তাঁর নাসিকাগ্র দখল করবার সুমহান প্রেরণায়।

তবু বেশ বড় জমিদার। বাইরে প্রচুর নাম-ডাক আছে। এই জমিদারীর এলাকাতেই গোটাকয়েক বড় বড় বিল রয়েছে—অগ্রহায়ণ থেকে বুনো হাঁসের মচ্ছব পড়ে যায় সেখানে। কুমার ভৈরবনারায়ণ বৈষ্ণব, তাঁর বিলে কারও পাখি শিকার করবার নিয়ম নেই। কিন্তু নিয়ম নেই বলেই তার ব্যতিক্রম আছে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রতি বছরই শিকারের জন্য এখানে এসে তাঁবু পাতেন, কখনো কখনো আসেন ডিভিসন্যাল

কমিশনার—বছর বারো আগে লাটসাহেবও একবার এসেছিলেন। সেই স্মরণীয় দিনটির কথা যখনই মনে পড়ে, সেই মুহূর্তেই বীররসোদ্দীপ্ত কুমার ভৈরবনারায়ণের হৃদয় হঠাৎ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যায়। কৌন্তেয় আর সামনে কুরু-সৈন্য দেখতে পান না, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন—

—আহা—অমন সাহেব আর হয় না।

—খুব ভাল সাহেব বুঝি?—মুগ্ধ চাটুকার মুগ্ধতর কণ্ঠে জানতে চায় হাজার বার শোনা সেই পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি—রোমাঞ্চিত হতে চায় সাহেবের প্রায়-অলৌকিক অপূর্ব চরিতগাথা শ্রবণ করে।

—ভালো মানে?—কোমরের কষি আঁটতে আঁটতে আবার উঠে পড়েন ভৈরব-নারায়ণ: একেবারে খাস বিলিতী জিনিস, বুঝলে। একরত্তি ভেজাল নেই কোথাও। কী লম্বা চওড়া আর ক্যায়সা লাল টকটকে চেহারা। কথা তো বলে না—যেন কুঁজের ভারে ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করে ওঠে। আর খাওয়া! একাই একখানা দেড়সেরী খাসির রাং মেরে দিলে হে! হ্যাঁ—একেবারে জাত সাহেব, অমন লাট দেখলেও পুণ্যি হয়।

চাটুকারের স্বরে মুগ্ধতা এবার উচ্ছ্বাস হয়ে গলে পড়ে: তা যা বলেছেন।

—এখনো সব বললাম কই!—কথার মাঝখানে বাধা পড়ায় চটে ওঠেন কুমার বাহাদুর: তুমি তো বড্ড ফ্যাচ ফ্যাচ কর হে, ভারি বাধা দাও।

চাটুকার কাঁচুমাচু মুখ করে বসে থাকে।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম।—সভা শাসন করে আবার শুরু করেন ভৈরবনারায়ণ: তখন বাবা বেঁচে। লাটসাহেব বাবার পিঠ থাবড়ে দিয়ে বলেছিল, ইউ আর এ ভেরি লয়্যাল সার্ভেণ্ট। বাবা আবার একথলি গিনি দিয়ে ওঁকে প্রণাম করেছিলেন কিনা!

চাটুকার আবার কী যেন বলবার জন্যে মুখ খোলে, কিন্তু কুমার বাহাদুরের একটা রুদ্র দৃষ্টি তার ওপর এসে পড়তেই কেমন থেমে যায় থতমত খেয়ে। যে শব্দটা প্রায় ঠোঁটের সামনে এসে পৌঁছেছিল, অদ্ভুত কৌশলে সামলে নেয় সেটাকে—খানিকটা হাওয়া আচমকা গিলে খাওয়ার মতো কোঁত করে একটা শব্দ হয় গলায়।

আজও চায়ের আসরে তারই জের চলছিল।

এই সময়টাতেই একটু প্রকৃতিস্থ থাকেন কুমার বাহাদুর—আফিঙের মৌতাতটা ফিকে হয়ে আসে। নেশা ছেড়ে যাওয়া শিথিল শিরাগুলোর মধ্যে যে মন্থর অবসাদ ঘনিয়ে থাকে, তাকে সতেজ করে তোলবার জন্যেই যেন ভৈরবনারায়ণ এইসব গল্প শুরু করেন—হাজার বার বলা হিউমারের পুনরাবৃত্তি করে আবহাওয়াটাকে সজাগ করে রাখবার প্রয়াস পান।

এক টুকরো কাটা পেঁপে চামচেতে তুলে নিয়ে বলেন—আমি একবার ঘোড়ায় চড়েছিলুম—বুঝলেন ঠাকুরবাবু।

স্বাভাবিক বিতৃষ্ণ অনুভূতির মধ্যেও গলার স্বরে কেমন করে যে একটা কৌতূহলের আমেজ এসে যায় সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর। হঠাৎ কোথাও একটা আঘাত লাগলে তড়িৎগতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মতো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে তার পাগলা একটা হিন্দুস্থানীর কথা মনে পড়ে—লোকটা পুলিসের কনস্টেবল ছিল এক সময়। 'পুলিস সাহেব' শব্দটা কানে গেলেই যেখানে যে অবস্থাতেই সে থাক, ফিরে দাঁড়িয়ে খটাস করে সেলাম ঠুকত একটা।

সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে রঞ্জন বলে, তাই নাকি ? বলুন—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ চারদিকে তাকিয়ে নেন একবার ; লক্ষ্য করেন সকলের চোখ তাঁর ওপর উদগ্র আর সজাগ হয়ে আছে কিনা—সকলের মুখে ফুটে উঠছে কিনা জ্বলন্ত কৌতূহল। তারপর শুরু করেন :

—বুঝলেন, বাবা সেবার নেকমর্দনের মেলা থেকে কিনে আনলেন এক ভূটানী ঘোড়া। যেমন তাকত, তেমনি চাল। কিন্তু কে জানত ঘোড়াটার মাথা খারাপ ! যেমনি চেপে বসেছি, অমনি—

সবাই এর মধ্যে হাসতে শুরু করেছে। যাদের কোনোমতেই হাসি পায়নি, তারা যে কোনো একটা মারাত্মক হাসির কথা ভেবে নিয়ে অন্তত একটুকরো হাস্যরেখা ফোটাবার প্রাণান্তিক চেষ্টা পাচ্ছে ঠোঁটের আগায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মানুষগুলো পাগল হয়ে গেছে নিশ্চয়। নইলে এমন অর্থহীন ভাবে কেউ হাসির প্রতিযোগিতা চালাতে পারে, এ কল্পনাই করা যায় না।

তবু তখনো যেন কেমন একটা সন্দেহ জাগে রঞ্জনের।

হঠাৎ মনে হয় কুমার বাহাদুর বড় বেশি ক্লান্ত—বড় বেশি হতাশায় আচ্ছন্ন তাঁর মন। আফিঙটা তাঁর আত্মরক্ষার একটা প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—যেন তীব্র যন্ত্রণার ওপর মর্ফিয়ার প্রলেপ। কিন্তু সে মর্ফিয়ার নেশা যখন কাটে, তখন যেমন যন্ত্রণায় শরীরের নাড়ীগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চায়, সেই রকম কুমার বাহাদুরও নেশার শেষে নিজের নিরুপায় নিরাশাকে আড়াল করতে চান ওই পুরনো রসিকতার সুড়সুড়ি বুলিয়ে। যেটাকে তাঁর হাস্যভরা মুখ মনে হয়, আসলে সেটা হয়ত মুখোশ মাত্র।

কিন্তু কেন এমন হয় ?

পচন ধরেছে নিজের মধ্যে ! বহুকাল ধরে মানুষের হাড়ে গড়ে তোলা কীর্তিস্তম্ভে ফাটল ধরেছে কি প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুসরণে ? কালের ঝোড়ো হাওয়ায় ক্ষয়ে যাচ্ছে উত্তুঙ্গ গ্রানিটের শিলাস্তর ? হঠাৎ কি টের পাচ্ছেন পায়ের নিচের মাটিটা আসলে

চোরাবালি, এতদিন পরে সরতে শুরু করেছে একটু একটু করে ? কিংবা যে আসনটাকে এতকাল তাঁরা রাজত্ব করবার জন্যে নিশ্চিন্ত ময়ূর-সিংহাসন বলে মনে করেছিলেন—দেখা যাচ্ছে সেটা কোনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ক্রেটার—এতদিন পরে ধুঁইয়ে'উঠছে কোনো রুদ্রসংকেতে ?

অথবা এসব কিছুই না—সবটাই তার নিছক ভাব-বিলাস ? নিজের দৃষ্টির রঙ দিয়ে স্থূলবুদ্ধি একটা আফিমখোর মাংসপিণ্ডকে মননময় করে তোলা ?

ভাববার সময় পাওয়া যায় না—ইতিমধ্যে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলেছেন কুমার বাহাদুর। আরম্ভ করেছেন আর একটি চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তু : আপনারা কেউ ভূত দেখেছেন ?

—ভূত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।—গাল নাচিয়ে নাচিয়ে হাসেন ভৈরবনারায়ণ : জিন, প্রেত কন্ধকাটা এই সব। ঠাকুরবাবু, আপনিও কি কিছু দেখেননি ?

এক মুহূর্তে রঞ্জনের মনে আসে তার ছেলেবেলার দেশকর্মী অবিনাশবাবুর স্মৃতি। আত্রাইয়ের বানে রিলিফ করতে গিয়ে প্রাণ দেন। তবু ডাহুক-ডাকা এক কালীসন্ধ্যে-বেলায় রঞ্জন তাঁর অদৃশ্য গলার ডাক শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। জীবনে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এই স্থূলতার আসরে সে বেদনা-রোমাঞ্চিত স্মৃতিটাকে উদ্‌ঘাটন করতে তার ইচ্ছে হয় না। মাথা নেড়ে বলে—না, আমি কিছু দেখিনি।

—কিছুই না ?

—না—আরো সংক্ষেপে জবাব দিয়ে মুক্তি পেতে চায় রঞ্জন।

—তাহলে আমি জিতেছি আপনার চাইতে—ভৈরবনারায়ণের চোখে মুখে এবার সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে পরম আন্তরিক একটি আত্মপ্রসাদ : হুঁ-হুঁ—এবারে হারিয়েছি আপনাকে।

গীতা-পড়ুয়া পণ্ডিতকে হারানোটা গৌরবের ব্যাপার নিশ্চয়। মন চায় না কুমার বাহাদুরের সে গর্বটাকে খর্ব করতে। প্রসন্নমুখে বলে—বেশ তো, বলুন।

তখন কুমার বাহাদুর কোনো এক চণ্ডীতলার মাঠে নিশীথ রাত্রে দেখা ভূতের গল্প আরম্ভ করে দেন। ফুটফুটে ভরা-জ্যোৎস্নায় নির্জন মাঠে সে পঞ্চাশ হাত লম্বা দুখানি বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল—আর সেই সঙ্গে কি যেন খুঁজে ফিরছিল অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে। রসান দিয়ে কুমার বাহাদুর বলেন : তার আঙুলের নখগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছিল, এক একটা ধারালো ছোরার মতো—

হাসির গল্প, ভূতের গল্প, আফিঙ। সমস্ত শরীরটা সঙ্গতি আর শৃঙ্খলাহীন একটা

বিসদৃশ মাংসপিণ্ড। কানের কাছে প্রতিদিন গীতাপাঠের দুঃসহ অভিনয়। বিচিত্র। একটা অদ্ভুত অসঙ্গতির জগতে যেন কৃত্রিম উপায়ে লোকটা বেঁচে আছে। মৃত্যুমুখী মানুষ নাভিশ্বাস টানছে অক্সিজেন টিউবের সহায়তায়।

কিন্তু রক্তবীজেরা মরেও ফুরোয় না। দেবীসিংহের সাধ্য কি তাদের বিনাশ ঘটায়। আজও স্বাভাবিক নিয়মে সবটা চলতে চলতে হঠাৎ আলোচনা বাঁক নিল একটা।

কথাটা বলে বসলেন রাজা সূর্যনারায়ণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল। সাইনবোর্ডে তিনি নিজের নামের পাশে বসিয়েছেন—এল-এম-এফ, ব্র্যাকেটে পি। 'পি' মানে প্লাকড—একথা তিনি নিজে বুঝিয়ে না দিলে কারুরই বোঝবার উপায় নেই—বরং কোনো একটা বাড়তি উপাধি মনে করে গেঁয়ো লোক আরো বেশি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে।

ভৈরবনারায়ণ একটা হাই তুললে দশবার তুড়ি দেন ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল এল-এম-এফ, ব্র্যাকেটে পি। আজ কিন্তু তিনিই রসভঙ্গ করলেন।

—একটা খবর শুনে এলাম হুজুর।

কুমার বাহাদুর তখন সবে ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পটা শেষ করে ভীষণ ভঙ্গিতে তাঁর শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, দেখতে চাইছেন ভয়ে তাদের কারুর গা দিয়ে ঘাম ছুটছে কিনা। এমন সময় ডাক্তারের এই অবান্তর কথাটায় তিনি ভ্রূকুটি করলেন।

ডাক্তার ঘাবড়ালেন না। কারণ খবরটা জরুরী। এতক্ষণ ধরে বলবার জন্যে তাঁর জিভ নিসপিস করছিল, কিন্তু ভৈরবনারায়ণের গল্প বলবার তোড়ে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি আর কোনোখানে সুবিধেমতো একটা ফাঁক খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

—তুরীদের একটা পঞ্চায়েত বসেছিল কালাপুখরিতে।

—কালাপুখরিতে তুরীদের পঞ্চায়েত!—এবারেও ভৈরবনারায়ণ ভ্রূকুটি করলেন, কিন্তু তার জাত আলাদা। এতক্ষণ ধরে ঝাঁপির মধ্যে যে সাপটা আফিঙের নেশায় ঝিমুচ্ছিল, সে হঠাৎ খোঁচা খেয়ে ফোঁস করে উঠল।—ব্যাটারা ভয়ঙ্কর পাজী—আর ওই সোনাই মণ্ডল—চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ভৈরবনারায়ণ: পঞ্চায়েত বসলেই একটা না একটা কুমতলব বার করে ছাড়বে। কয়েকটাকে দিলাম—বি-এল কেসের আসামী করে ফাঁসিয়ে, তবু যদি একটু হুঁশিয়ার হয় ব্যাটারা। ওদের মাথাগুলো আবার বড় হয়ে উঠেছে দেখছি, ভালো করে ছাঁটাই করতে হবে আর একবার!—হিংস্র স্বগতোক্তিটা শেষ করে জানতে চাইলেন: কিন্তু পঞ্চায়েত কেন?

—কামারহাটির ডাঁড়ার জন্যে।

—বটে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা ঠিক করেছে, তিন-চারশ মানুষ কোদাল ধরে এবার ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করে দেবে—ওদিক দিয়ে আর জল বেরুতে দেবে না।

—বটে—বটে!—কুমার বাহাদুরের স্বরে মর্মঘাতী ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল, হঠাৎ এ রকম সাধু সংকল্প কেন তাদের?

—সে তো তারা হুজুরে জানিয়েছে।

—হুঁ!—কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে থেকে ভৈরবনারায়ণ বললেন—কারণটা আমি শুনেছি। ওরা বলে, বানের জল ওই ডাঁড়ার মুখ দিয়েই আজকাল বেরিয়ে যাচ্ছে, ফলে ওদের ফসলী জমি ডুবে যায়।

—আজ্ঞে, তা নেহাত অন্যায় বলে না—সাহসে ভর করে পোস্টমাস্টার বিভুপদ হাজরা জানাল। কালাপুখরির দিকে তার নিজেরও কিছু ধানী জমি আধিতে আছে, তাই ক্ষতিটা তার গায়েও লাগছিল।

—আরে রাখো ওসব বাজে কথা—কুমার বাহাদুর চটে উঠলেন: দু-চার কাঠা ধানী জমি ডুবলেও ডুবতে পারে, সেটা এমন মারাত্মক ব্যাপার নয়। কিন্তু আমার ক্ষতি কি রকম, সে জান? ওই ডাঁড়া দিয়ে জল না নামলে আমার ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর বিল ভরবে না—বছরে তিন হাজার টাকার জলকর বেমালুম বরবাদ। অমন বাজে আবদার করলে আমি শুনব না—ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব।—সংকল্পে ভয়াল শোনাল তাঁর গলা।

—কিন্তু ওরা তো বলে তিন-চার কাঠা নয়, প্রায় তিন হাজার বিঘে জমির ফসল ওই ডাঁড়ার জলে নষ্ট হয়।—আবার দীনতম প্রতিবাদ ঘোষণা করল বিভুপদ।

—তার মানে? তাহলে কি তুমিই ওদের তাতিয়ে তুলচ?—মুহূর্তে সমস্ত চক্ষুলজ্জার আড়ালটা সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট গলায় সরল প্রশ্ন করলেন ভৈরবনারায়ণ।

বিভুপদ এক মুহূর্তে মাটিতে মিলিয়ে গেল। হেলে সাপের মতো নির্বিষ ভাবে একটু আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছিল, এবারে যেন কেন্নো হয়ে গুটিয়ে গেল নিজের চারপাশে।

—ছিঃ ছিঃ—এটা কি করে বললেন হুজুর! এমন বেয়াদবি আমি কখনো ভাবতে পারি?

—কি জানি, কিছুই বলা যায় না—কুমার বাহাদুর হঠাৎ বিচিত্রভাবে দৃষ্টিটা রঞ্জনের নির্বাক মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন। আর তখনি রঞ্জন বুঝতে পারল, আসলে বিভুপদ তাঁর উপলক্ষ, লক্ষ্যটা অন্যত্র।

আফিঙের নেশায় ঝিমন্ত চোখ কি নিছক একটা ভান?

একবারের জন্য বুকের ভেতরটা নাড়া খেয়ে উঠে পরক্ষণেই স্থির হয়ে গেল তার। আত্মগোপনের চেষ্টা করে লাভ নেই আর। পরশু কুমার বাহাদুর জয়গড়ের ব্যাপার নিয়ে একটা নিরাসক্ত মন্তব্য করেছেন, আজও বিভুপদকে সাবধান করে দিতে গিয়ে তার দিকে হয়ত বা বিনা কারণেই দৃষ্টিক্ষেপ করলেন একটা। কিন্তু অনেক বলার চাইতে এই না-বলা

দৃষ্টির সংকেত অনেক বড় ঝড়ের প্রতীক্ষা করতে থাকে, এ অভিজ্ঞতা নেহাত কম হয়নি জীবনে।

তবু যখন কুমার বাহাদুর একটা ছলনার মুখোশ টেনে রেখেছেন, তখন নিজেকেও সে সুস্পষ্ট করে ধরা দিল না। পরস্পরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বার আগে আরো কিছুক্ষণ ধরে না হয় চলুক না মৈত্রীর ছদ্ম-অভিনয়। বাঁ হাতে ছোরা লুকিয়ে ডান হাতে করমর্দনের পর্ব।

রঞ্জন মাথা নাড়ল। কুমার বাহাদুরের দৃষ্টির উত্তরে মাথা নেড়ে জবাব দিলে, ঠিক।

আলোচনাটা আবার হয়ত শুরু হত পুর্ণোদ্যমে। একটা বক্সিং রিংয়ের ভেতর পরস্পরকে আঘাত করবার আগে চলত আরো খানিকক্ষণ সন্ত্রস্ত পদচারণা। কিন্তু ছেদ পড়ল হঠাৎ।

একজন হিন্দুস্থানী পাইক প্রবেশ করল ঝড়ের বেগে।

—হুজুর, জটাধর সিং খুন হো গিয়া।

—কেয়া!—চর্বির প্রকাণ্ড পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল একটা টেনিস বলের মতো: কেইসে খুন হুয়া? কোন্ খুন কিয়া?

—মালুম হোতা কি, ই গোয়ালা আদমীকে কাম হ্যায়। সব একদম চকনাচুর করকে জঙ্গল মে মুর্দা ফেক দিয়া—

—কাঁহা মুর্দা?—ভৈরবনারায়ণ গর্জন করলেন।

—লে আয়া—দেখিয়ে আপ—রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলে পাইকটা।

—চলো—ভৈরবনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। এখনো মৌতাতের আফিঙ খাননি, চোখ দুটো বাঘের মতো কপিশ আলোয় জলজল করে উঠছে তাঁর।

চার

বেশ নিপুণ হাতেই খুন করেছে লোকটাকে।

অতবড় জোয়ান হিন্দুস্থানীটার পাথুরে মাথাটাকেও গুঁড়ো করে ফেলেছে বাজের মতো নিষ্ঠুর লাঠির ঘায়ে। বীভৎস বিকৃত মুখে রক্ত আর কাদার প্রলেপ। শুধু লাঠি নয়—দু-চার জায়গায় টাঙ্গিও চালিয়েছে মনে হয়। বক্রফলক সেই ধারালো টাঙ্গির আঘাত হাঁ করে আছে ঘাড়ের ওপর। কোনোমতেই বাঁচতে দেওয়া হবে না—এই সংকল্প নিয়েই জটাধর সিংকে খুন করেছে নির্মম ভাবে।

দৃশ্যটার পৈশাচিকতা কয়েক মুহূর্ত পাথর করে রাখল সকলকে। এ হত্যা যেন মানুষে করেনি, এই নিধনের ভেতরে কোথাও যেন চিহ্ন নেই মানবিক কোমলতার; শুদ্ধ

কোনো রক্তসমুদ্রের মতো বরিন্দের বন্য মৃত্তিকায় এ যেন একটা প্রাকৃতিক জিঘাংসা। যেন আচমকা ঝড়ের ঝাপটায় কোনো দিগন্তপ্রহরী তালগাছ ধ্বসে পড়ে একটা মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলার মতো—বুনো শুয়োরের দাঁতে কোনো ছিন্নোদর অপমৃত্যুর বিভীষিকার মতো। কিন্তু এদেশের মাটিতে এই মৃত্যুই যেন স্বাভাবিক, সব চাইতে যুক্তিসঙ্গত।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। স্তব্ধতা চেপে রইল জগদ্দল পাথরের মতো।

রঞ্জনই কথা বললে তারপরে।

—একটু ভুল হয়েছে বোধ হয়—

—কি ভুল?—এমন একটা দৃষ্টিতে ভৈরবনারায়ণ তাকালেন যে তার ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু ও-দৃষ্টিকে ভয় পাবার বয়েস তার কেটে গেছে উনিশশো তিরিশ সালে। এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুধিত চোখে তাকে গিলে খেতে চেয়েছিল ধনেশ্বর—বিপ্লবী যুগের সেই আই-বি ইন্সপেকটার। একটা ছোট বলের মতো হাতের ওপর লোফালুফি করছিল ছয় চেম্বারের লোড করা রিভলবারটাকে—রাইডারের হিংস্র চামড়াটা বাতাস কেটেছিল তীক্ষ্ণ শোঁ শোঁ শব্দে।

সমান দৃষ্টিতেই রঞ্জন তাকাল ভৈরবনারায়ণের চোখের দিকে।

—বডিটা তুলে আনা উচিত হয়নি। পুলিসে খবর দিলেই ভালো হত।

—পুলিস!—ক্রূর ভ্রুকুটি ফুটল ভৈরবনারায়ণের মুখে। তারপর মৃতদেহটার দিকে আগ্নেয় দৃষ্টি ফেলে বললেন—সে খবর একটা দিতে হবে বটে। কিন্তু—একবার থামলেন, বললেন, ভাবছি এর শেষ কোথায়।

আবার স্তব্ধতা। কালান্তক ক্রোধে পাথর হয়ে রইলেন ভৈরবনারায়ণ।

—মুর্দা, বাবু?—সভয়ে জিজ্ঞাসা করল একজন।

—থাক ওখানেই। থানায় একটা খবর দিয়ে আয়। তারা ওটা নিয়ে যা খুশি করুক। কিন্তু আমাদের কাজ শুরু করতে হবে এবার।

পায়ের ভারি চটিটায় শব্দ করে কুমার বাহাদুর ভেতরে চলে গেলেন।

রাত্রে নিজের ঘরে বসে কিছু একটা পড়বার চেষ্টা করছিল রঞ্জন।

গুরুভার বই। লাল পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে মার্জিনে নোট করে পড়তে হয়। কিন্তু আজ আর ওই তর্ক-তত্ত্বের অরণ্যে সে ঢুকতে পারল না। মাথাটা কেমন ভারি হয়ে আছে, পড়তে পড়তে বার বার ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। বইয়ের পংক্তি হঠাৎ যেন ছন্দশৃঙ্খলা হারিয়ে একটা আর একটার ঘাড়ে এসে পড়ছে। অসম্ভব।

উঠে দাঁড়াল সে। বাইরে কৃষ্ণা রাতের মধ্যযাম। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে

সেই অন্ধকারের মধ্যে সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে।

তার ঘরখানা বিশাল বাড়িটার এক প্রান্তে। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির। পুজোর মরশুমগুলো ছাড়া এ মহলটা অনাদরেই ম্লান হয়ে থাকে। মাকড়সার জাল আর রাশি রাশি ঝুলে আবৃত হয়ে যায়, বাঁধানো বেদীর ফাটলে বর্ষার ডুবো মাঠ থেকে দু-একটা গোখরো সাপ এসে বাসাও বাঁধে কখনো কখনো। আর চাপ চাপ অন্ধকার-জড়ানো মণ্ডপের কোণায় আরো ঘন টুকরো টুকরো অন্ধকারের মতো চামচিকে ঝুলে থাকে—বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়, আর দিনান্তিক পাণ্ডুরতা চারদিকে সঞ্চারিত হয়ে এলে কতকগুলো প্রেতসত্তার মতো কদাকার ডানা ঝাপটে ঝাপটে সামনের আমবাগান আর নদী পার হয়ে কোথায় উড়ে যায় কে জানে!

নিজের নির্জন ঘরটিতে বসে বসে রঞ্জন এক একটা সন্ধ্যায় তাদের ডানার শব্দ শোনে। কী যেন একটা অদেহী অস্তিত্ব সঞ্চরমান অন্ধকারকে মুখর করে তোলে। মনে হয়: দেবীসিংহের আমল, অথবা তারও অনেক আগে থেকে এই বাড়িতে বসে যারা জমিদারী করেছে, তারা এখনো এখানকার মায়া কাটাতে পারেনি; চামচিকে হয়ে যক্ষের মতো এ বাড়ির প্রতিটি ইট-পাথরকে চলেছে পাহারা দিয়ে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে পুরনো অভ্যাসের তাগিদে তারা বেরিয়ে পড়ে। নদী পার হয়ে, মাঠ পার হয়ে, তারা চলে যায় গ্রামে গ্রামে—তমসার মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে—চামচিকে নয়—ভ্যাম্পায়ার হয়ে মানুষের রক্ত শুষে খায়।

হঠাৎ ভয় করে। মনে হয় তারও চারদিকে যেন চক্র দিয়ে ফিরছে এই চামচিকেরা। লণ্ঠনের বিমর্ষ হলদে আলো পড়ে দেওয়ালে—নতুন জিনিস দেখতে পায় একটা। পুরনো বাড়ি, কতকালের পুরনো এই দেওয়াল। তার গায়ে এলোমেলো ভাবে অজস্র শ্যাওলার বিসর্পিল সবুজ রেখা পড়েছে। ওই রেখাগুলো হঠাৎ যেন কতকগুলো মুখ হয়ে ওঠে—যেন চামচিকের ডানার শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে তারা। অদ্ভুত অস্বাভাবিক কতকগুলো মুখ—এই মুমূর্ষু প্রাসাদের তারা মৃত প্রতিহারীর দল। ফিস ফিস করে তাদের কথা বলবার শব্দও যেন স্পষ্ট কানে আসে—বাইরের আমবাগানে বাতাস মর্মরিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে, এই সহজ প্রত্যক্ষ সত্যটাকে যেন বিশ্বাস করা যায় না কিছুতে।

এই ভয়! একে ভাঙতে হবে। চুরমার করতে হবে এই প্রেতপূজার বেদীকে। ছাদ-ভাঙা খানিকটা তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্যের আঘাতে মিলিয়ে ছায়া হয়ে যাবে এই চামচিকেরা। আজও মানুষের মনের ওপরে এরা ভর করে আছে—প্রেতের ভর। আজও কুমার বাহাদুরের আটটা বন্দুক আর আটত্রিশজন পাইক পাহারা দিচ্ছে এই পিশাচতন্ত্রকে। কিন্তু কতদিন আর?

কতদিন আর? ঘরের দেওয়ালে সরীসৃপ মুখাকৃতিগুলির দিকে সে তাকাল না,

তাকাল না সবুজ শ্যাওলায় আঁকা সেই বীভৎস প্রেতসত্তাগুলোর দিকে—উড়ন্ত চামচিকের পাখার শব্দ যাদের জাগরণের সংকেত। এখন অনেক রাত। জানালা দিয়ে সে বাইরে সেদিকেই তাকিয়ে রইল—নদীর ওপারে যেখানে পূর্ব দিগন্ত; যেখানে আগুনের পদ্মের মতো সূর্য উঠে তার বিছানার ওপরে সর্বপ্রথম তার আলো ছড়িয়ে দেয়।

প্রভাতী সীমান্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল।

পিশাচ মন্দিরের পাথর ধ্বসছে। তুরীদের পঞ্চায়েত বসেছে কালাপুখরিতে। কামার-হাটির ডাঁড়ার মুখে জল নামতে দিয়ে তারা আর সর্বনাশ করবে না তিন হাজার বিঘে ফসলী জমির। জমিদারের ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর জলকর না ভরলেও তাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই—এবার রুখে দাঁড়িয়েছে তারা। ওদিকে সাঁওতালেরা বুনো শুয়োর মারতে শিখছে—টুলকু সাঁওতালের ছেলে ধীরু সাঁওতাল ধানসিঁড়ির আলপথে খেলা করে বেড়ানো কেউটের শিশুর মতো বিষ সঞ্চয় করছে আস্তে আস্তে। আর তাদের সঙ্গে আজ বাহু মিলিয়েছে ডুবার ঘোষেরা—বাজের মতো লাঠির মুখে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে লোহাপেটা জোয়ান জটাধর সিংয়ের ইস্পাতী মাথাটা।

একটা ছবি মনে পড়ল হঠাৎ।

—হোই বাবু, সামাল।

সাইকেলে করে আসছিল। পেছনে থেকে আবার ডাক এল—সামাল বাবু, সামাল।

কী ব্যাপার? এমন ভাবে সাবধান করে কে?

চারদিকে তাকাতেই ব্যাপারটা বোধগম্য হল তার কাছে।

চৈত্রের মাটি ফাটানো রোদে শুকিয়ে একেবারে খড় হয়ে গেছে চারদিকের বুক-সমান উঁচু ইকড়, বেনা আর শন ঘাসের বন। সেই বনে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে ধু ধু করে জ্বলছে শুকনো ঘাস, কালো ধোঁয়া কুণ্ডলিত হয়ে উঠছে আকাশে। যেন চারদিক থেকে একটা অগ্নিবৃত্ত আসছে ঘিরে ঘিরে।

—সামলে বাবু। আগুনের ভেতর গিয়ে পড়িস না।

সেই আগুনটা যেন আজও আসছে এগিয়ে। কিন্তু ঘাসবন নয়। দাবাগ্নি।

—মচ—মচ—মচ—

নাগরা জুতোর শব্দ। কাঁচা চামড়ার আওয়াজ। ওদিকের লম্বা বারান্দাটা দিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে একটা লণ্ঠনের আলো। মুখ ফিরিয়ে দেখল। প্রহরী। জমিদারবাড়ি পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠুক ঠুক করে লাঠির শব্দ পাওয়া গেল, বারকয়েক শোনা গেল কুঁই কুঁই করে খানিকটা কাতরোক্তি। দারোয়ানের লাঠির ঘা খেয়ে একটা ঘুমন্ত কুকুর পালিয়ে গেল বারান্দা থেকে।

আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল নিশীথ দিগন্তের দিকে। একটা ভোঁতা ছুরির

মতো তমসান্তীর্ণ নদীটা বয়ে যাচ্ছে। ওপারের মাঠটার শেষপ্রান্তে একটা মস্ত বড় আলো—কারা একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে যেন। ঠিক তারই ওপরে আকাশে একটা জলজলে প্রকাণ্ড তারা। ওই তারাটা থেকে খানিকটা আগুন মাটিতে ছিটকে পড়েই কি জলে উঠেছে অমন দাউ দাউ শব্দে ?

নক্ষত্রের আলো, না আগামী দিনের সংকেত ? আকাশের সীমান্তে সীমান্তে যেন ভবিষ্যৎ দিনের প্রত্যাশা। কোথা থেকে কি দলে দলে মানুষ মশাল হাতে আসছে এগিয়ে ? পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—প্রতিটি প্রান্ত থেকে পদক্ষেপ করছে মশালধারী সৈনিকের দল। আসছে—এগিয়ে আসছে।

আচ্ছা—ওই দিকে, নদীর ওপারে ওই অগ্নিকুণ্ডটার কাছাকাছিই কোথাও কি গোয়ালাদের সেই গ্রাম নয় ? সেই গ্রাম—যেখানে লাঠির ঘায়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে জটাধারী সিংয়ের মস্ত শক্ত মাথাটা ? আর শুধু তারই মাথা নয়—সে চোটটা সোজা কুমার ভৈরবনারায়ণেরও ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে।

হ্যাঁ—ওদের দেখেছে রঞ্জন। বরিন্দের আরণ্য-মৃত্তিকায় চিনেছে আর একটি দুর্ধর্ব শক্তিকে। মাথা নোয়ায় না—হার মানতে জানে না। খোলা মাঠ আর খোলা হাওয়ায়, পোষা মহিষের ক্ষীরের মতো ঘন দুধ খেয়ে খেয়ে দরজার কপাটের মতো চওড়া তাদের বুক, প্রতিটি পাঁজর লোহার আগল। 'শাল-প্রাংশু মহাভুজ' আর পুঁথির জগতে বেঁচে নেই, তা নেমে এসেছে জনগণের পৃথিবীতে,—পৌরাণিক ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবান বিপুল সত্তা আজ ওদের মধ্যেই সার্থক হয়েছে—পেয়েছে সর্বোত্তম পূর্ণতা।

আগে ঘর ছিল পশ্চিমের মাটিতে। রক্তের মধ্যে কোন আদিম যাযাবরী প্রেরণায়, কোন জমিদারের অত্যাচারে গ্রাম-নগর-নদী-পাহাড়-বন পেরিয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে কে জানে। কিন্তু শুধু বাসাই বাঁধেনি—শক্ত করে শিকড় মেলেছে মাটিতে—সাঁওতালদের মতো সহজে উৎপাটিত হয়ে যাবে এমন শিথিল মূল নয় এদের। হাতে এদের দশ থেকে বারো হাত পর্যন্ত লম্বা লাঠি ; তার গিঁটে গিঁটে পিতলের তার জড়ানো, বছরের পর বছর সর্ষের তেলে পাকানো। লোহার মতো তা দৃঢ় আর নির্মম—তার দণ্ড চরম দণ্ড।

রঞ্জনকে দেখে খুব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ঘোষেরা।

অদ্ভুত ভাষা বলে। খানিকটা ভাষা হিন্দী, খানিকটা বাংলা। কিছু কিছু সাঁওতালী আর ওঁরাও ভাষার খাদ তার সঙ্গে। রঞ্জনের মনে হয়েছিল বেশ চমৎকার একটা সর্বজনীন ভাষা তৈরি করে ফেলেছে এরা—রাষ্ট্রভাষার সমস্যা ফেলেছে মিটিয়ে।

—ঠাকুর বাবু, নমস্তে।

—নমস্তে। কি খবর তোমাদের ?

—খবর খুব আচ্ছাই।—ঘোষেদের মুরুব্বী যমুনা আহীর বলেছিল : লেকিন থোরা থোরা গণ্ডগোল হচ্ছেন।

—কী গণ্ডগোল হচ্ছেন আবার ?

—বলছি ঠাকুর বাবু। আপনি আচ্ছা আদমি আছেন, আপনি সমঝাবেন। তো আগে আসেন, একটু তামাকু খেয়ে যান।

—আমি তো তামাক খাই না।

—তো ভি আসেন—বসেন একটু—আবার অভ্যর্থনা করল যমুনা আহীর।

আমন্ত্রণটা আর উপেক্ষা করা গেল না। তা ছাড়া পথ চলতে চলতে সেও ভারি ক্লান্তি বোধ করছিল। সারাটা সকাল একনাগাড়ে কড়া নগ্ন রোদ মাথার ওপর নিয়ে সাইকেল করেছে সে—শরীর যেন বইছিল না। একটু বিশ্রাম পেলে মন্দ হয় না। মনের ভেতর থেকে এই জাতীয় একটা তাগিদ ঠেলে উঠছিল বার বার।

তাকিয়ে দেখল আহীরদের বাথানের দিকে। একজোড়া নিমগাছ। এই টিলাটার ওপর ভারি স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়েছে। গাছ দুটো ওরাই লাগিয়েছে সম্ভব। নইলে লাল মাটির এই দেশে এমন করে প্রাকৃতিক খেয়ালে নিমগাছ জন্মায় না। কিন্তু নিজেরাই লাগাক, আর মাটির খেয়ালেই হোক—এই রোদের মাঝখানে তাদের ঠাণ্ডা ছায়া যেন একটা মরুদ্যানের আভাস বয়ে আনে। সেখানে খানদুই দড়ির খাটলি পাতা। ইচ্ছে করল ওই খাটলিদুটোর ওপরে সেও খানিকটা গড়িয়ে নেয়।

খাটলিতে এসেই বসল। যমুনা আহীর তাকে বসিয়ে ঘরে ঢুকল, তার একটু পরেই বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হবে—স্বাস্থ্য আর যৌবন যেন সর্বাঙ্গে প্রখর হয়ে জেগে আছে তার। সুডোল নিখুঁত হাতে মোটা রূপোর বালা, কিন্তু সে বালা অলঙ্কার নয়—অস্ত্র। তার একটি ঘা লাগলে যে কোনো দুর্বিনীত লোভী মানুষের মুখচোখ ভোঁতা হয়ে যাবে চক্ষের নিমেষে। উজ্জ্বল শ্যামকান্তি। সারা শরীরে তার রূপ আছে কি না কে জানে, কিন্তু বরেন্দ্রভূমির জ্বলন্ত রৌদ্র যে বিচ্ছুরিত হয়ে আছে, সন্দেহমাত্র নেই তাতে।

যমুনা আহীরের মেয়ে। ঝুমরি।

চকচকে রূপোর বালা পরা নিটোল হাতে কাঁসার গ্লাস বয়ে এনেছে। রঞ্জনের সামনে ধরে বললে, পীজিয়ে।

—কি এ ?

যমুনা এসে বললে, ওটুকু খেয়ে লিন ঠাকুর বাবু। দুধ আছেন।

—দুধ। দুধ খাব ?

হা হা করে হেসে উঠল যমুনা আহীর—মাঠের মধ্য দিয়ে তীর বেগে ছুটে গেল

হাসিটা। বললে, দুধ তো পিবারই জন্যে। দেখবার জন্যে না আছেন।

মুক্তা-ধবল দাঁত বের করে হাসল ঝুমরি। নিটোল হাতে গেলাসটি আরো কাছে এগিয়ে এল। আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

খাঁটি মহিষের দুধ। মৃদু জ্বাল পড়ে তাতে সঞ্চারিত হয়েছে আরো খানিকটা সুমিষ্ট আস্বাদ। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল সে। মনে হল, সে শুধু দুধই খেল না, তারও সর্বদেহে যেন বরিন্দের মাঠ থেকে আহরিত হল জল-বাতাস-রৌদ্র-স্বাস্থ্য ; কোনো পূর্ণ জীবনের একটা তরঙ্গ ভেঙে পড়ল তারও রক্তের গভীরে।

গ্লাসটা ঝুমরিকে ফিরিয়ে দিলে। তারপর তাকাল যমুনা আহীরের দিকে।

—এইবার তোমার কথা শুনব ঘোষ। কি গণ্ডগোলের কথা বলছিলে ?

যমুনা আহীর বললে : হামারা ঘী দহি তৈয়ার করি। সে সব কি বিনা পয়সায় বিকবার জন্যে ?

—কে বলেছে বিনা পয়সায় বেচবার জন্য ?

—কে বলবে আবার ?—যমুনার মুখের চেহারাটা বিকট হয়ে উঠল : জমিদার বলে। পাইক-পেয়াদারা বলে। একদম জেরবার করে দিচ্ছেন ঠাকুর বাবু।

চারদিকে রোদে-ধোয়া বরিন্দের মাঠ। অপরিমিত আলো, অপরিসীম প্রাণ। হু হু করে হাওয়া বইছে। দূরে-কাছে ঘাসবনের মধ্যে পাহাড়ের নীল রেখার মতো পিঠ তুলে জেগে আছে অতিকায় সব মহিষ—বিরাট বিরাট তাদের শিংগুলো রোদে ঝকঝক করছে। ওই শিংগুলো দেখে ভয় করে। আরণ্যপ্রকৃতি শাসনের মতো যেন উদ্যত আর উদ্ধত হয়ে আছে।

সব কিছু মিলিয়ে নিজের মধ্যেও যেন কি একটা সঞ্চিত হয়ে থাকে। কেমন একটা ধারালো উত্তাপ ইস্পাতের ফলার মতো ঝলকায় রক্তে। আয়নায় নিজেকে দেখতে পাওয়া যায় না, তবু মনে হয় সেই রোদের ছোঁয়ায় অতসী কাঁচের প্রতিফলকের মতো জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো। মনে হয়, হাতে একটি অস্ত্র থাকলে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেও নরহত্যা করতে পারে।

রঞ্জন বললে : জমিদার কি জুলুম করে তোমাদের ওপর ?

—জমিদার ফের কবে হামাদের মাথায় তুলে রাখে ?—বিকট মুখে একটা তিক্ত হাসি হাসল যমুনা আহীর—খাজনা যা ল্যায়—সেটা তো দিচ্ছিলাম। কিন্তু পাইক আসবে—পাঁচ হাঁড়ি দহি লিয়ে যাবে ; কাল পেয়াদা আসবে তো ও ফের পাঁচ সের ঘী লিয়ে যাবে। হামরা তবে কী বিকবার জন্যে এখানে বাথান করে বসে আছি।

—তোমরা গিয়ে নালিশ কর না কেন ?—প্রশ্নটা নিজের কানেই ব্যঙ্গের মতো শোনাল। তবু জিজ্ঞাসা করলে রঞ্জন। কেমন সংস্কার হয়ে গেছে। দেবতায় বিশ্বাস না

থাকলেও ঝুরি-নামা বটগাছের তলায় সিঁদুর-মাখানো থান দেখলে যেমন আপনা থেকেই মাথায় হাত উঠে আসে, তেমনি। ফল হবে না জেনেও একবার প্রার্থনা-নিবেদন।

—শুধু একবার নালিশ? হাজার বার করেছি।—যমুনা বললে, কী হইল? কিছুই না। উলটে হামাদের হাঁকিয়ে দিলে। বললে, ব্যাটারা ঝুটমুট বলছেন—যমুনা আহীরের মুখের ভেতর দাঁতগুলো ক্রোধে কিড়মিড়িয়ে উঠল: জমিদারবাবুদের অমন হাতীর মতন গতর হয় কেমন করে? এমন মোটা হয় কেন? মুফত হামাদের দহি-ঘী না খেলে অমন হয় ঠাকুর বাবু?

কেবল দই-ঘিই নয়—ওই মেদস্ফীত স্বাস্থ্যের পেছনে যে অনেক রক্তশোষণের ইতিহাস—এ কথা রঞ্জনের মনে এল। ভৈরবনারায়ণ আফিঙ খান আর ঝিমোন। কিন্তু সেই ঝিমুনির ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর চোখের দৃষ্টি লোলুপ হয়ে থাকে কোথায় ছোঁ দিয়ে পড়বেন তারই সুযোগ সন্ধানে; বরিন্দের মাঠে তালগাছের মাথার ওপরে বসে থাকা ঝিমন্ত শকুন যেন।

দুধের গ্লাস নিয়ে ঝুমরি ভেতরে চলে গিয়েছিল, এতক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে এল। হাতে হলদে ন্যাকড়া জড়ানো ধূমায়িত একটা ছোট কল্কে। ধোঁয়াটার উগ্র দুর্গন্ধে চারদিকের বাতাস মুহূর্তে আবিল হয়ে উঠল। গাঁজা।

যমুনা আহীর অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ভৎর্সনা-ভরা চোখে তাকাল ঝুমরির দিকে।

—আঃ, এখন কেনো লিয়ে এলি।—যা—এখন রেখে দে—

রঞ্জন বুঝতে পারল, তাকে দেখে চক্ষুলজ্জা হচ্ছে যমুনার। ঠাকুর বাবু সাত্ত্বিক লোক—তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেই অভ্যস্ত; তাঁর সামনে গাঁজার কল্কেতে টান দিতে সংস্কারে বাধছে।

রঞ্জন অভয় দিয়ে বললে, খাও না—লজ্জা কি।

অত্যন্ত অপরাধীর মতো হে হে করে সঙ্কুচিত হাসি হাসল যমুনা। বললে, হামরা ছোটলোক ঠাকুর বাবু, একটু নেশা-ভাং না করলে হামাদের চলে না—

রঞ্জন হাসল: তোমাদের লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই, বড়লোক আর বাবুলোক তোমাদের চেয়ে নেশায় ঢের বেশি ওস্তাদ—তার মনে পড়ল মুকুন্দপুরের উকিল তরণী-বাবুর কথা। নেশায় তিনি এমনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন যে মদ, আফিঙ, এমন কি মর্ফিয়া ইনজেকশনে পর্যন্ত তাঁর আমেজ আসত না। অগত্যা সেই আমেজ আনবার জন্যে একটা বিচিত্র প্রক্রিয়া তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ঝাঁপিতে পুরে পুরে তিনি গোখরো সাপ পুষতেন। সাপুড়ের নির্বিষ মুমূর্ষু সাপ নয়—তাজা, হিংস্র, তীব্র বিষধরের দল। যখন শরীরের ভেতরে অবসাদ জমে উঠত, মন্থর হয়ে যেত রক্তের গতি—দাবি করত স্নায়ুতে স্নায়ুতে অস্বাভাবিক খানিকটা উদ্দীপনা, তখন এই গোখরোর ঝাঁপির ভেতরে হাত দিয়ে

তাদের একটি ছোবল নিতেন তরণীবাবু। আর সেই বিষে সারাটা দিন ঝিম মেরে থাকতেন—বিষের উগ্র যন্ত্রণা তাঁর শরীরে সৃষ্টি করত নেশার একটি স্বর্গীয় আমেজ। রৌদ্রোজ্জ্বল বরিন্দের মাঠের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত মন যেন একটা দার্শনিকতায় ভরে উঠল। শুধু তরণীবাবুই নয়—সারা পৃথিবী জুড়েই চলেছে এই সাপের বিষের নেশা। বিষধরের ছোবল নিয়ে নিয়ে আমেজের মধ্যে তলিয়ে থাকা, এক জাতীয় উন্মাদনায় স্নায়ুকুণ্ডলীকে উত্তেজিত করে তোলা। কুমার ভৈরবনারায়ণ। আরো অনেক কুমার বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, মিল-মালিক। কিন্তু তারপর? এমন কোনো সাপ নেই কি—যাকে নিয়ে শুধু নেশা নেশা খেলাই চলে না? অমোঘ যার বিষ—যে বিষে নেশার ঘোর কখনো ভাঙবে না আর?

আছে বৈ কি। ধানসিঁড়ি ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সিঁথির রেখার মতো পথ। সেই পথে সাদা ধুলোর একটা হালকা আস্তর বিছানো। রাত্রিতে যখন আকাশে চন্দন মাখিয়ে চাঁদ ওঠে—তখন জ্যোৎস্নায় ধুয়ে-যাওয়া সেই ধুলাভরা ফালি পথের ওপর খেলা করতে বেরিয়ে আসে তারা। পথের ওপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে, কিলবিল করে ছুটোছুটি করে, জড়াজড়ি করে পরস্পরের সঙ্গে। অপরিণত ক্ষুদ্র ফণাগুলোকে বাতাসের দিকে সমুদ্যত করে যেন বিষসঞ্চয়ে পুষ্ট করে নিতে চায়। তারপর: তারপর পথের ওপর কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন বাজে—ধানসিঁড়ির কোনো একটা শেষপ্রান্ত থেকে একটি হালকা ছায়া দীর্ঘায়িত হতে হতে এগিয়ে আসে। চক্ষের পলকে ধানক্ষেতের ভেতরে নেমে মাঠের ফাটলে, অধুনা-স্বর্গীয় কোনো কাঁকড়ার বর্ষায় করা গর্তে অথবা বাস্তুহারা কোনো মেঠো ইঁদুরের আস্তানায় মিলিয়ে যায় তারা।

কিন্তু আর কতদিন কেবল ছায়া দেখে ভয় পাবে তারা—আর কতকাল শব্দ শুনে লুকিয়ে যাবে গর্তের আড়ালে?

ঘোর ভাঙল তার।

যমুনা গাঁজার কল্কে নিয়ে টান দিয়েছে, আর সেই সুযোগে এই মানস-মন্থনের পালা শুরু হয়েছে তার। এতক্ষণ পরে কিছু একটা শোনবার প্রত্যাশা করেই যেন সে তাকাল যমুনার মুখের দিকে। খানিকক্ষণ আমেজে বুঁদ হয়ে থাকার পরে যমুনা মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। দুর্গন্ধ খানিকটা পিঙ্গল কুয়াশা মাঠের উত্তাল হাওয়ায় ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যেতে লাগল।

—আরো একটা জরুরী কথা আছে ঠাকুর বাবু—

কল্কেটা নামিয়ে রেখে যমুনা তাকাল। দেখা গেল দুপুরের কড়া রোদের সঙ্গে গাঁজার তীব্র নেশার ঝাঁজ মিশে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছে যমুনার মধ্যে। ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে চোখ দুটো—ঠেলে-ওঠা চোখের রক্তবাহী ছোট ছোট শিরাগুলি স্ফীত

হয়ে ফেটে পড়বার উপক্রম করছে।

—কী জরুরী?

—আমাদের জেনানাদের লিয়ে কী করব ঠাকুর বাবু?

—কেন, তাদের আবার কি হল?

—নজর লাগছে।—চিবিয়ে চিবিয়ে বললে যমুনা আহীর।

হঠাৎ যমুনাকে কেমন ভয়ঙ্কর মনে হল। তার বাথানের মহিষগুলোর মতোই কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড শরীর—ন্যাড়া মাথা, দৃষ্টিতে একটা ক্ষিপ্ত জিঘাংসা।

—সে কি, কার আবার নজর লাগল?

—যার নজর লাগে।—যমুনা এমন তীব্র ভয়ঙ্কর ভাবে রঞ্জনের দিকে তাকাল যে মনে হল বুঝি তারই মধ্যে যমুনা আহীর তার উদ্দিষ্ট সেই প্রতিপক্ষকে দেখতে পাচ্ছে। লোকটার ভ্রূরেখা প্রায় নেই বললেই চলে, আর অনেকটা সেই কারণেই হয়ত স্বাভাবিক মানবিকতা হারিয়েছে তার চোখ থেকে। কোনো বুনো জানোয়ার বুঝি থাবা পেতে বসেছে রঞ্জনের কাছে। একটা দুর্গন্ধ বিষাক্ত উত্তাপের মতো ছোঁয়া দিচ্ছে তার গায়ে: ওই শালা পেয়াদার দল। খালি কি দহি-ঘী লিতে আসে? শালাদের মতলব বহুৎ বুরা—ঠাকুর বাবু।

—বটে!

—হামাদের জরু-বেটীর দিকে বহুৎ খারাপ নজর দেয়। খারাপ বাত-চিত করে। এতদিন সয়ে গেলাম হামরা।—যমুনাব চোখ আদিম হয়ে উঠল: সেদিন মাঠের মধ্যে ঝুমরির হাত ধরেছিল। ঝুমরি হাতের বালার এক ঘা দিয়ে শালার মুখ ফাটিয়ে পালিয়ে এসেছে।—হঠাৎ ক্রোধে রোঁয়া-ফোলানো ভামের মতো সোজা হয়ে উঠে বসল যমুনা আহীর: হামি থাকলে কেবল মুখ ফাটিয়েই পালাতে পারত না—জান ভি মাঠের মধ্যে রেখে যেতে হত।

অভিভাবকের একটা বিজ্ঞ ভঙ্গি নিয়ে রঞ্জন বললে,—ছিঃ ছিঃ, ওসব খুনখারাপির কথা ভাবতে নেই।

—হামরা ভাবি না বাবু—এবার আর ঠাকুর বাবু বললে না যমুনা। ক্রোধে ক্ষোভে ওই জমিদারবাড়ি সংক্রান্ত মানুষগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আত্মীয়তার অনুভূতিও তার মনে জেগে নেই আর। গাঁজার কল্কেটাকে উবুড় করে ঢেলে দিতে দিতে যমুনা বললে, হামরা ভাবি না। কিন্তু খুন চড়ে যায়। দহি-ঘী বিনা পয়সায় লিয়ে যায়—লেও বাবা। ফের ইজ্জতে হাত দিতে চায়?—যমুনা ধু-ধু মাঠেব মধ্যে চোখ ছড়িয়ে দিয়ে বোধ করি জমিদারবাড়িটাকে একবার দেখে নিতে চাইল: হামরা জাতে আহীর বাবু। হামাদের বাপ-ঠাকুর্দা ছিল জোয়ান—ছিল ডাকু। কথায় কথায় জান লিত তারা।

তারা নিত, তাদের বংশধরেরাও আজ নিতে পারে—যমুনার শরীরে যেন এই সত্যটিই ব্যক্ত হয়ে উঠল। রঞ্জন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার মনের মধ্যে জিনিসটা গোপন পাপের মতো বিঁধছে—সে কুমার ভৈরবনারায়ণের অন্নপুষ্ট। তাই যমুনা তাকে মেনে নিতে পারছে না কোনো আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায়; খানিকটা পরিমাণে কাছে এসেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ করে নামতে পারেনি তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির ওপরে। এমনি এক একটা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত মুহূর্তে নিজেকে কেমন ত্রিশঙ্কুর মতো মনে হয় তার। শূন্য আকাশে যে বেশিক্ষণ আর ঝুলে থাকতে পারবে না, তা সে জানে। কিন্তু নিচে পা দিয়ে দাঁড়ানোর মতো মাটিও কি সে খুঁজে পেয়েছে?

রঞ্জন উঠে পড়ল। বললে, আজ চলি যমুনা, আর একদিন আসব।

—কিন্তু হামরা কী করব বাবু?—যমুনা জানতে চাইল।

রঞ্জন ঠিক উত্তর দিতে পারল না। মনে হল, প্রশ্ন করবার আগেই যেন যমুনা নিজের ভেতরেই কর্তব্যটাকে নিশ্চয় করে নিয়েছে।

—যা ভালো মনে হয় তাই কর—

এর বেশি আর কি বলা যায়? ধানসিঁড়ি ক্ষেতের আলপথে বিষ সঞ্চয় করে ফিরছে নাগশিশুরা। তাদের বিষফণাকে কে রোধ করবে? কোনো উপদেশ, কোনো সদিচ্ছাকে মনে হবে ভণ্ডামির মতো, স্বার্থপর প্রবঞ্চনার মতো।

—আচ্ছা চলি—

রঞ্জন বেরিয়ে পড়ল। একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যমুনার মেয়ে ঝুমরি। নাগিনী।

…রঞ্জনের চমক ভাঙল। কত রাত হয়ে গেছে। ঘুমন্ত জমিদারবাড়ি—নাগরা জুতোর মচমচানিও শোনা যাচ্ছে না আর। প্রেত পিতৃপুরুষেরা কোথায় রক্ত শুষে বেড়াচ্ছে কে জানে। জটাধর সিংয়ের খুন কি হিসেব-নিকেশের প্রথম অঙ্কপাত।

না, আর নয়। শুয়ে পড়া যাক এবার।

পাঁচ

একটা মস্ত গড়খাই—প্রায় বুজে এসেছে। কলমীবন আছে, মাঝে মাঝে এক-একটা ঢোঁড়া সাপ ডুব-সাঁতার কাটে শ্যাওলা-ভরা কালো জলের তলায়। গলা উঁচু করে ঘোরে পানকৌড়ি—দূর থেকে কেউটের ফণার মতো দেখায়। পানও নেই, কড়িও নেই—গোটা কতক গেঁড়ি-গুগলি আর এক-আধটা পদ্মচাকাই ভরসা।

গড়খাই পেরিয়ে একটা উঁচু মিনারের ধ্বংসস্তূপ। লোকে বলে বুরুজ। পাল বুরুজ।

হয়ত অবজারভেটরি ছিল পালরাজাদের আমলে। হয়ত এর সমুচ্চ চূড়োয় দাঁড়িয়েই দ্বিতীয় মহীপাল দেখেছিলেন—দিব্যোকের বিদ্রোহী বাহিনীর মশাল রক্তজবার মতো ফুটে উঠছে কালান্তক অন্ধকারে।

পাল-বুরুজ ছাড়িয়ে কিছু কাঁটা বন, লাটার ঝোপ। তলায় তলায় বিকীর্ণ ইট-পাথরের কঙ্কাল। বিধ্বস্ত প্রাসাদের অস্থি-শেষ। নকশা-কাটা ইট, খোদাই-করা গ্রানিট আর কষ্টিপাথরের টুকরো। তারপরে আবার গড়খাইয়ের বৃত্তাকার রেখা। সেইটুকু পেরিয়ে বুনো ওল আর ঘেঁটু ফুলের একরাশ জঙ্গল ভাঙলে পাল নগর শুরু।

নামেই পাল নগর, কিন্তু পালেরা কেউ নেই। দেড়শ ঘর পরাক্রান্ত পাঠানের বাস এখানে। উচ্চারণ করে 'পায়ঠান'—'ঠ'এর ওপর অস্বাভাবিক জোর দেয় একটা। হয়ত ওই জোরটুকু দিয়েই সেদিনের বীরত্বের জের টানতে চায় একটুখানি।

এই পায়ঠানদের নেতা ফতে শা পাঠান। কালো কুচকুচে জোয়ান শরীর। মুখে পুরু গোঁফ, তার দুটি প্রান্ত দংশনোদ্যত কাঁকড়া-বিছের মতো ঊর্ধ্বগামী। প্রসন্ন থাকলে সেই প্রান্ত দুটিকে তিনি পাকাতে থাকেন—উত্তেজনার কারণ ঘটলে টেনে টেনে লম্বা করে যান। দাঙ্গা হাঙ্গামা কাজিয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ। তিন-চারটে দেওয়ানী লড়ছেন কুমার ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে—ফৌজদারীও আছে। 'বাদিয়া মুসলমান' নামে এক শ্রেণীর দুর্দান্ত লোককে এনে বসিয়েছেন পাল বুরুজের উত্তরে একখণ্ড পতিত জমিতে। নামমাত্র খাজনা দেয়—লাঠি ধরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়। হাত খুব পরিষ্কার বাদিয়াদের। হাঁসুয়ার কোপে এত সহজে মাথা নামিয়ে দেয় যে মুণ্ডহীন মানুষটা টেরও পায় না, কখন সে নিঃশব্দে মরে গেল।

পাল নগরের মাঝখানে বেশ বড় আকারের একটি মসজিদ। লাল গম্বুজটা চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে। সারাদিন তার ওপরে জালালী কবুতর চক্র দিয়ে ওড়ে। মিনারের গায়ে দলে দলে বাদুড় ঝুলে থাকে। অনেক কালের পুরনো মসজিদ। যে পাঠান ফকির গাজী হয়ে পাল নগর দখল করেছিলেন, তাঁরই কীর্তি নাকি ওটা।

সমৃদ্ধ পাঠানদের গ্রাম এই পাল নগরে শতকরা নিরানব্বুই জন মুসলমান। এতকাল ছোট একটি মাদ্রাসায় আলেপ-বে-পে ছাড়া আর কোনো শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাই ছিল না। ফতে শা পাঠান গত বছর একটি এম-ই ইস্কুল করেছেন এখানে। পাঁচ-সাতজন মাস্টার এসেছেন গ্রামে—সেই সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর আলোও এসেছে।

ফতে শা পাঠানের বৈঠকখানা-ঘরে মজলিশ বসেছিল। রবিবারের সকাল—ইস্কুল ছুটি। ফতে শা স্বয়ং আছেন, একজন মাস্টারও এসে জুটেছেন। তা ছাড়া দৈনন্দিন আগন্তুক জনকয়েক মাতব্বর ব্যক্তি তো আছেনই।

সামনে একখানা খবরের কাগজ। তাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা দানা বেঁধে উঠেছে।

কথা বলছিলেন আলিমুদ্দিন। পাবনা জেলার লোক—আই-এ পাস না করে নানা জায়গা ঘুরবার পর ইস্কুলের মাস্টারি নিয়ে এসেছেন।

আলিমুদ্দিন বললেন, এ বড় আফসোসের কথা, এখনো পাকিস্তান বোঝেন না আপনারা!

এন্তাজ আলী পাঠান কারবারী লোক। বয়স্ক ব্যক্তি। হাট-বাজারের উপলক্ষ্যে নানা জায়গায় যেতে হয় তাঁকে, ব্যবসায় উপলক্ষ্যে নানা স্তরের লোকের সঙ্গে মেশামেশি আছে। সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষ। মৃদু হেসে বললেন, বুঝব না কেন! নানা রকম কথাই তো শুনছি। শহরে দেখলাম ছোকরারা এরই মধ্যে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আপনি একটু খোলসা করে বলুন দেখি মাস্টার সাহেব ?

আলিমুদ্দিন নড়েচড়ে বসলেন : আসল কথা, আমরা আর ওদের সঙ্গে থাকব না।

—কাদের সঙ্গে ?—এন্তাজ আলী প্রশ্ন করলেন।

—কাদের আবার ? কাফেরদের।

—হিন্দুদের বলুন।—এন্তাজ আলী শুধরে দিলেন।

—ও একই কথা—আলিমুদ্দিন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বক্র দৃষ্টি এন্তাজ আলীর মুখের ওপর ফেলে বললেন, কাফের আর হিঁদুতে কোনো তফাত নেই। তারা পুতুল পুজো করে, হাজার কুসংস্কার মানে, এক জাত এক জাতকে ছুঁলে তাদের নাইতে হয়। তা ছাড়া তারা ইসলামের শত্রু। কাফের কথার আর কী মানে থাকতে পারে, এ ছাড়া!

একটা মস্ত তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া টানছিলেন ফতে শা পাঠান। চোখ দুটো বোজাই ছিল, আলোচনা শুনছিলেন খুব মন দিয়ে। নলটা ছেড়ে দিয়ে চোখ মেলে তাকালেন একবার। সোজা হয়ে উঠে বসলেন খানিকটা—দংশনোদ্যত বিছের লেজের মতো গোঁফটাকে টেনে খানিকটা লম্বা করতে চাইলেন, তারপর বললেন : যা বলেছেন। ও সব ব্যাটাই হারামখোর। সবাই কাফের। আর সব চাইতে বড় কাফের হল হিজলবনীর ওই ভৈরবনারায়ণ।

এন্তাজ আলী সম্পর্কে ফতে শার চাচা, সেদিক থেকে খানিকটা দুঃসাহস তাঁর আছে। তেমনি হাসিমুখেই বললেন, তোমার সঙ্গে মামলা চলছে বলেই বুঝি ?

—না চাচা, আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনারা সেকেলে লোক, বুঝবেনও না এসব। মাস্টার সাহেবই খাঁটি কথা বলছেন।

—বেশ বলুন, শোনা যাক।—এন্তাজ আলী দেওয়ালে গা এলিয়ে দিলেন।

আলিমুদ্দিন অধৈর্য হয়ে উঠলেন : এসব বাজে তর্কের কথা হয়—যুক্তির জিনিস। আমি আরো স্পষ্ট করে বলছি। হিন্দুদের সঙ্গে আলাদা হয়ে নয়া রাষ্ট্র আর নতুন তমদ্দুন তৈরি না করতে পারলে আমাদের কোনো আশা নেই।

—সেদিন এক মৌলবী সাহেব মসজিদে ওয়াজ করে গেলেন। তিনিও ওসব বললেন বটে—ফতে শা পাঠান নিজের সুচিন্তিত মন্তব্য জুড়ে দিলেন।

—ওসব মৌলবী-টৌলবীর কথা ছেড়ে দিন—আলিমুদ্দীন বিরক্ত হয়ে উঠলেন : কিছু বোঝে না, এটা বলতে ওটা বলে—সব মাটি করে দেয়। ধর্ম ছাড়া মাথায় কিছু ঢোকে না। ধর্মের নিন্দা আমি করছি না, কিন্তু এ হল রাজনীতির ব্যাপার। সে যাক। কিন্তু এখনো যদি আপনারা হুঁশিয়ার না হন, তাহলে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

—কে সর্বনাশ করবে, হিন্দুরা?—এন্তাজ আলী বললেন : কেন, মুসলমানের কব্জীর জোর কি একেবারে মরে গেছে?

—ভুল হল চাচা সাহেব। কব্জীর জোরের দরকার আছে, কিন্তু একালে তাই সব নয়। রাজনীতির খেলায় হার হয়ে গেলে কোনো কব্জি আপনাদের বাঁচাতে পারবে না। আর এই বেলাই কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

—কংগ্রেস? কেন কংগ্রেস কি দোষ করল? শুনেছি, এতকাল তো কংগ্রেস আজাদীর জন্যেই লড়াই করে আসছে। সে তো হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী—এন্তাজ আলী আস্তে আস্তে বললেন।

—হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী!—আলিমুদ্দিনের মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠল : গোড়াতে কায়েদে আজমও তাই ভাবতেন। এমন দিন ছিল যেদিন গান্ধীজীর ডান হাত ছিলেন জিন্না সাহেব। কিন্তু যেদিন প্রথম তিনি মুসলমানদের স্বার্থের কথা ভাবতে চাইলেন, সেদিন থেকেই তাঁর বরাতে জুটতে লাগল ঘৃণা, সন্দেহ, নিন্দা। গোড়াতে তিনিও মুসলিম লীগকে ভালো চোখে দেখেননি, কিন্তু পরে বুঝলেন—মুসলমানের খাঁটি বন্ধু যদি কেউ থাকে, তবে তা কংগ্রেস নয়, ওই মুসলিম লীগ।

—কিন্তু কংগ্রেস—

—চাচা সাহেব এতকাল ধরে ওদের একটানা প্রোপাগাণ্ডা শুনতে শুনতে কংগ্রেস ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না।—আলিমুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : আজাদী! কংগ্রেস কোন্ আজাদীর জন্যে লড়াই করে এসেছে এতকাল? হিন্দুর। আমরা পৌত্তলিকতা মানি না, তবু কেন আমাদের উচ্চারণ করতে হবে, 'বন্দে মাতরম্—মাটিকে মা বলব আমরা কোন্ লজ্জায়? কেন আমরা ভাবতে যাব : ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী? বিপ্লবীদের আমি শ্রদ্ধা করি; দেশের জন্য যারা শহীদ হয়েছে, তাদের সালাম করি আমি। কিন্তু কেন বিপ্লবীদের দীক্ষা নেবার সময় কালীমায়ের পায়ে প্রণাম করতে হবে? কেনই বা শপথ নিতে হবে ঐ পুতুলের খাঁড়া মাথায় ঠেকিয়ে?

ফতে শা পাঠান কি বুঝলেন কে জানে। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন, সাবাস!

আলিমুদ্দিন মাস্টার একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেললেন তাঁর দিকে। তারপর এন্তাজ আলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : চাচা সাহেব, ওটা মুসলমানের আজাদীর রাস্তা নয়।

—কিন্তু আজাদী এলে হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই কি তাতে সুরাহা হত না?

—না, একেবারেই না—জোরের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে ফরাশে একটা ছোট্ট কিল বসালেন আলিমুদ্দিন : ইংরেজ দেশ ছাড়বে এটা ঠিক। তার আর বেশিদিন বাদশাহী চলবে না, সে তা বুঝতে পেরেছে। এ কথাও মানি যে তাকে তাড়ানোর পেছনে হিন্দু আর কংগ্রেসেরও অনেকখানি দান আছে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন আসবে সে হবে ত্রিশ কোটি হিন্দুর স্বাধীনতা—দশ কোটি মুসলমানেরও না—কয়েক লাখ শিখেরও নয়। চাকরি-বাকরি সুযোগ-সুবিধা সব জুটবে হিন্দুর ভাগে, মুসলমান পাতের কাঁটাটিও পাবে না। সেটা হবে হিন্দুদের জুলুমশাহী।

—এখন অবশ্যি মুসলমানদের কিছু চাকরি-বাকরির সুবিধে হচ্ছে—ফতে শা অনেকক্ষণ ধরে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন, ফাঁক পেয়ে এইবারে জুড়ে দিলেন কথাটা : নবীপুরের আলতাফ মিঞা এবারে এম এল. এ হয়েছে, বিস্তর চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছে লোককে।

—লীগ মিনিসট্রি রয়েছে যে। হিন্দু মন্ত্রীরা থাকলে হত নাকি ওসব?

—আজাদী হলেও তো লীগ মিনিসট্রি হতে পারে—বলতে চাইলেন এন্তাজ আলী।

—কাঁচা কথা বললেন চাচা সাহেব, একেবারে কাঁচা কথা। আপনার মতো প্রবীণ লোকের কাছ থেকে এ কথা শুনব আশা করিনি। লীগ মিনিসট্রি হবে কোত্থেকে? ভোট পাবেন কেমন করে? তিনগুণ বেশি ভোটে হিন্দুরা গিয়ে বসবে গদিতে—আসবে জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট। একটা কথা বলবার মুখ থাকবে না আমাদের।

—কিন্তু যেসব জায়গায় মুসলমান বেশি, সেখানে তো আমরাই জিতব।

—এইবার পথে এসেছেন—আলিমুদ্দিন হাসলেন : খানিকটা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা। কিন্তু দুটো একটা প্রভিন্সে মুসলিম মেজরিটি নিয়ে আমরা যুঝব কি করে দেশ-জোড়া হিন্দুদের সঙ্গে? তাই যেখানে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, সেই সব প্রদেশ নিয়ে আমাদের নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে—সে রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান।—আলিমুদ্দিনের গলার স্বর ক্রমশ উচ্ছ্বাসে গভীর হয়ে উঠতে লাগল : আমাদের হাত থেকেই ইংরেজ হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়েছিল, যদি এ রাজ্য ফিরে পাওয়া যায়, তাহলে এর সবটাই আমাদের পাওনা। কিন্তু নানা অসুবিধের কথা ভেবে সে দাবি আমরা তুলিনি। আমরা শুধু আমাদের মেজরিটি প্রভিন্স নিয়েই নয়া রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই। তাও কি কম হবে! দশ কোটির মধ্যে অন্তত আট কোটি মুসলমানকে আমরা পাবই। আর তা হবে পৃথিবীর বৃহত্তম ইসলামিক রাষ্ট্র। ইসলামিক রাষ্ট্রই বা বলছি কেন—

ইয়োরোপের কটা দেশে আট কোটি লোক আছে? যে আরবেরা একদিন সারা দুনিয়ার ওপর তলোয়ার ঘুরিয়েছিল, কত ছিল তাদের সংখ্যা?

ফতে শা আরামে গোঁফের প্রান্ত দুটো পাকাতে লাগলেন: বেশক্।

এন্তাজ আলী চুপ করে রইলেন। চিন্তার রেখা ফুটেছে সারা মুখে: আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—কিছু শক্ত নয় বোঝা। শুধু বোঝবার মতো মনটাই তৈরি হয়নি চাচা সাহেব। কিন্তু দিন আসছে, আপনারাও আর ঘুমিয়ে থাকতে পারবেন না।

—আপনারা কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন—এন্তাজ আলী বললেন।

—স্বপ্নকে আমরা সত্য করে তুলব। মহম্মদ ঘোরী, বক্তিয়ার খিলিজীও তাই করেছিলেন।—আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখ মুখ জ্বলতে লাগল: এই স্বপ্নই একদিন আরব থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল। থর থর করে কেঁপেছিল ইয়োরোপ, খ্রীস্টানরা আর্তনাদ তুলেছিল, God, save us from Turks।

—কিন্তু একসঙ্গে কি থাকা যেত না?

—না।—আলিমুদ্দিনের স্বর দৃঢ় হয়ে উঠল: সে কথা কায়েদে আজম ভেবেছিলেন, আমাদের পাকিস্তানের মহাকবি ইক্‌বালও তাই ভেবেছিলেন। একদিন তিনি লিখেছিলেন:

'সারে জঁাহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা।
আব রোদ্ এ গঙ্গা বহ্ দিন হ্যায় য়াদ্ তুঝকো,
উতরো তেরী কিনারোঁ মেঁ কারোয়াঁ হামারা।'

তারপর তাঁর ভুল ভাঙল। বুঝলেন, হিন্দুস্থান তাঁর কেউ নয়, গঙ্গার জলের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই তাঁর। তিনি বললেন, আমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই ও কবিতা লিখেছিলাম আমি। কিন্তু এখন বুঝেছি, পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানের কোনো গতি নেই। তাই ভুল শুধরে তাঁকে লিখতে হল:

'অয়্ গুল্‌সিতান্ এ উন্দুলুস বহ্ দিন হ্যায় য়াদ্ তুঝকো,
থা তেরী ডালীওঁ যেঁ জব আশিয়াঁ হামারা।
মঘরিব কী বাদীওঁ মেঁ গুন্‌জী আজাঁ হামারী—
সারে জঁাহা সে আচ্ছা, পাকিস্তান হামারা।'

দরদ-ভরা গলায়, উচ্চকিত আবৃত্তি করে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার। চমৎকার আবৃত্তি করেন—স্বরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধতা! উর্দু কবিতার ললিত ছন্দ-বিন্যাসে কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটা আবিষ্ট হয়ে রইল।

খানিক পরে নীরবতা ভেঙে ফতে শা প্রশ্ন করলেন, মানে কী হল ওর?

ধিক্কারের দৃষ্টি ফুটে উঠল আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখে : মুসলমানের ছেলে, এইটুকু উর্দু জানেন না! এটা লজ্জার কথা হল সাহেব।

ফতে শা থতমত খেয়ে গেলেন : কিছু কিছু শিখেছিলাম—তা কবে ভুলে গেছি। আমি তো আপনার মতো আর—

—একটু পড়ে নেবেন আবার। শেখা দরকার।—আলিমুদ্দিন খবরের কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন : আমি এবার উঠি, অনেক বেলা হল।

—কিন্তু আলোচনা তো শেষ হল না—এন্তাজ বললেন।

—না, সবে শুরু হল—এবার আলিমুদ্দিনও হাসলেন : আরো অনেক কথা বলতে হবে, আরো অনেক আলোচনা করতে হবে। ভালো কথা, আপনারা সবাই লীগের মেম্বার তো?

এক এন্তাজ আলী ছাড়া সবাই মাথা নিচু করলেন।

—আমি জানতাম—আলিমুদ্দিনের স্বরে অনুকম্পা ফুটে বেরুল : আচ্ছা, কাল আমি চাঁদার খাতা নিয়ে আসব। পাঁচশ পাঠানের এই পাল নগরে লীগের শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে হবে একটা। আচ্ছা, চলি এবার, আদাব।

—আদাব।

আলিমুদ্দিন মাস্টার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বেলা বেড়ে উঠছে। অল্প অল্প হাওয়ায় গুঁড়ো চন্দনের মতো লাল মাটি উড়ছে দিকে দিকে। মিনারের মাথায় ঝুলন্ত বাদুড়গুলোর পেছনে একদল কাক লেগেছে, বাদুড়ের কুশ্রী চিৎকার ছড়িয়ে যাচ্ছে বিকৃত যন্ত্রণায়। একরাশ ধুলো আর কুটো-কাটি বয়ে একটা ঘূর্ণি পাক খেতে খেতে উঠে গেল।

বর্ষার জল শুকিয়ে আসা মাটি থেকে কেমন একটা গন্ধ—একটা উত্তপ্ত গন্ধ। পাড়াগাঁয়ের লোক আলিমুদ্দিন মাস্টার—এই গন্ধটা তাঁর চেনা। এর কেমন একটা নেশা আছে—একটা মাদকতা আছে যেন। মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে, ওই সামনের ঘূর্ণিটার মতোই চিন্তাগুলোকে আবর্তিত করে তোলে। আলিমুদ্দিন মাস্টার ভাবতে ভাবতে পথ চললেন।

'সারে জাঁহা সে আচ্ছা, পাকিস্তান হামারা।' নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, নির্ভুল বিশ্বাস। এর আর ব্যতিক্রম নেই কোথাও। দৃষ্টি চলে গেল পাল বুরুজের উইঢিবি-ঘেরা উঁচু চূড়োটার দিকে। এই গড়ের হিন্দু রাজত্ব যেমন একদিন বিজয়ী মুসলমানের শাণিতাগ্র তলোয়ারে পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েছিল—সেইদিন আবার ফিরে আসছে নতুন করে। পাকিস্তান হামারা।

কোনো সন্ধি? না। কোনো রফা? অসম্ভব। কোনো ঐক্য? অবাস্তব।

কিন্তু এমন কি চিরদিন ছিল? চিরকালই কি এমন চরমপন্থী ছিলেন তিনি?

না, তা নয়। জীবনে তিনিও অনেক করেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা তাঁরও হয়েছে। প্রথম প্রথম যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন কতগুলো ঘটনামাত্র মনে হয়েছিল, আজ তারা ধরা দিয়েছে একটা বিশেষ তাৎপর্যের ভেতরে—আজ আর কিছু জানতে বাকি নেই তাঁর।

মনে আছে, হিন্দুদের ইস্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়ার কথা। যে বেঞ্চে তিনি বসেছিলেন, সেখানকার তিন-চারটি হিন্দু ছেলে খানিক বাদে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল।

ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন বাংলার মাস্টার সারদাবাবু। ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: এই, কি হচ্ছে তোদের?

—বসতে পারছি না।

—কেন?

—ও যে মুসলমান স্যার।

—মুসলমান তো হয়েছে কি?—সারদাবাবুর দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠেছিল।

একজন বলেছিল, ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ স্যার। একেবারে মুসলমানী গন্ধ।

হো-হো করে ক্লাসসুদ্ধ হাসির বন্যায় ভেঙে পড়েছিল। সে হাসি থেকে সারদাবাবুও বাদ যাননি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য—ক্লাসের মুসলমান ছেলেরাও সে হাসিতে যোগ দিয়েছিল।

সারদাবাবু কৃত্রিম ক্রোধে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—যত সব বানরের দল। যা—যা, সামনের ওই বেঞ্চিটাতে বোস গিয়ে।

সেদিন সারা ক্লাসে আর মাথা তুলতে পারেননি আলিমুদ্দিন। কিশোরের প্রথম চেতনায় সে অপমান বিঁধেছিল যেন আগুনের চাবুকে কণ্টকিত আঘাতের মতো। সেই কৈশোরেই মনে হয়েছিল, এ অপমানের জবাব একদিন তাঁকে দিতেই হবে।

তারপরে এ জাতীয় তিক্ত অভিজ্ঞতা বহুবার তাঁর হয়েছে। আঘাতের পর আঘাত এসেছে নানা দিক থেকে—স্পর্শাতুর মন বিদ্রোহ করে উঠেছে বার বার। আরো বড় হয়ে একজন বিদেশী রাজনৈতিক নেতার জীবনচরিত থেকে তাঁর মনের সমর্থন মিলেছিল:

> 'নতুন একটি পরিষ্কার কোট পরিয়া আমি স্কুলে আসিয়াছিলাম। হঠাৎ কোথা হইতে মলিন-বস্ত্র-পরা জীর্ণ-শীর্ণ-দেহ কয়েকটি ছাত্র আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া তাহাদের একজন আমার কোটের উপর খানিকটা থুথু ছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল। সে ব্যবহারের অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই, আজ তাহা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

তিনি বুঝেছিলেন এ বড়লোকের ঐশ্বর্যের প্রতি দরিদ্রের স্বাভাবিক বিদ্বেষ। আর আলিমুদ্দিন বুঝলেন এ শ্রেষ্ঠতার অভিমানে অন্যের আত্মমর্যাদায় নিষ্ঠুর আঘাত। এ আঘাত

একদিন সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে—তাঁর মন ঘোষণা করেছিল।

কিন্তু তখনো তাঁর ভুল সম্পূর্ণ কাটেনি। তখনো তিনি ভেবেছিলেন, সে মর্যাদা ফিরে পাবার পথ সকলের ভেতর দিয়েই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে কৈশোরেই জ্বলে উঠেছিল —উনিশ শো তিরিশ সালের আন্দোলনে যোগ দিয়ে শেষবার তাঁর ভুল ভাঙল।

আলিমুদ্দিন মাস্টার চলতে চলতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন একবার।

উনিশ তো তিরিশ সালের সে ধ্বনির সঙ্গে 'আল্লা হো আকবর' জয় ধ্বনিত হয়েছিল আকাশে বাতাসে। তিন-রঙা পতাকার সবুজ-সংকেত তাঁকে সেদিন দিয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেদিন তিনিও কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন :

'ইসি ঝাণ্ডেকো নীচে নির্‌ভয়,
বোলো ভারত মাতা কী জয়।'

'ভারত মাতা কী জয়।' সেদিন ভারত মাতাকে বন্দনা করতে জিভে জড়তা আসেনি, মনে জাগেনি পৌত্তলিক কুসংস্কারের প্রশ্ন। দেশের মাটিকে খানিকটা নিষ্প্রাণ বস্তুপিণ্ড বলেই মনে হয়নি সেদিন। সুজলাং সুফলাং সুখদাং বরদাং মাতৃকামূর্তি সেদিন দীপিত ছিল দৃষ্টির সম্মুখে। সেদিন ভারতবর্ষের পুজামণ্ডপে এসে অঞ্জলি সাজিয়েছিল : হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানী—

কিন্তু তারপর? সাবানের ফেনায় গড়া বুদ্‌বুদ মায়ার মতো মিলিয়ে গেল।

মনে পড়ছে হিন্দু মেয়েদের স্নিগ্ধ করাঙ্গুলিতে পরিয়ে দেওয়া সেই চন্দনের তিলক। সত্যাগ্রহের পথে নির্ভীক অভিযাত্রীর দল। আনন্দে-উৎসাহে সারা প্রাণ প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই চন্দন-চিহ্নকে সেদিন মনে হয়েছিল গৌরবের জয়টীকা।

মহিষবাথানের নোনা জল দিগন্তে হেলে-পড়া অস্ত চাঁদের আলোয় চিক চিক করে। হু হু করে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে সে জলে কলরোল ওঠে—মনে হয় মন্ত্রোচ্চার উঠছে : 'মোরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। জ্যোৎস্নাঝলকিত কালো ছায়া-ফেলা দীর্ঘকায় তালবীথি সারা রাত মর্মরিত হয়। দূরে আলোর মালা পরে রাত্রির অপ্সরা কলকাতা ঘুমিয়ে থাকে—উৎসব-শেষে রঙ্গমঞ্চে লুটিয়ে পড়া কোনো সালঙ্কারা নর্তকী যেন।

বাতাসে শীত ধরে। তাঁবুর মধ্যে বিনিদ্র চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখা যায় : একটার পর একটা উল্কা ঝরে পড়ছে। বৃশ্চিক রাশি ধীরে ধীরে একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠে ক্রমে পাণ্ডু হতে থাকে। সকাল থেকে আবার সংগ্রাম শুরু। পুলিস আসবে—লাঠি আসবে, প্রিজন ভ্যানের খোলা দরজা অভ্যাগত-বরণের মতো এগিয়ে আসবে হাত বাড়িয়ে।

নিদ্রাহীন চোখে সমস্ত রাত বুকের মধ্যে কি যেন জ্বলতে থাকে। ঠিক জ্বালা নেই—অথচ আশ্চর্য আগ্নেয় অনুভূতি আছে একটা। ঘুম আসে না, তবু স্বপ্ন ভাসতে থাকে।

কন্যাকুমারীর প্রান্তরেখা থেকে সমুদ্রের সফেন জলে স্নান সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন মহাভারতী ; সিংহল তাঁর পায়ের তলায় ফুটে উঠল একটি রক্তকমলের মতো, সিন্ধুশীকর-লিপ্ত কেশজাল ছড়িয়ে পড়ল কারাকোরাম-শিবালিক থেকে খাসীয়া-জয়ন্তীর বেণীবন্ধনে চন্দ্রনাথের সীমান্ত অবধি ।•দক্ষিণ কর প্রসারিত করে তিনি আরব-সমুদ্রের এলিফ্যান্টা থেকে প্রার্থনা করে নিলেন ত্রিশীর্ষ মহাকালের বরাভয়, বাম করের নীবার-মঞ্জরী ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে দিলে গঙ্গাহৃদি শ্যামল বাংলা। উন্নত-কিরীটের তুষারশীর্ষে সৌরদীপ্ত স্বর্ণলেখা জ্বলতে লাগল, আকাশ থেকে আরাত্রিকের রাশি রাশি দেবধূপ নেমে এল কুণ্ডলিত মেঘপুঞ্জের মতো।

তারপর ছয় মাস জেল। আরো ভাস্বর হল স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা হল আরো কঠিন। কিন্তু—

মনে পড়ছে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে, সঙ্গে ছিলেন আর একজন সহকর্মী—হৃষীকেশবাবু।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ির বাইরের লনে ফুটফুটে একটি ছেলে খেলা করছিল। হৃষীকেশ বললেন, তোমার বাবাকে একটা খবর দাও খোকা, দরকারী কাজে আমরা এসেছি।

ছেলেটি ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল। তারপরেই শোনা গিয়েছিল তার উৎসাহিত গলার স্বর : মা, মা, একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান। অপমানে কান দুটো জ্বালা করে উঠল, শরীরের সমস্ত রক্তকণা মুহূর্তে এসে জমা হল মুখের প্রতিটি রোমকূপে।

হৃষীকেশবাবু অপ্রতিভের মতো হাসলেন। যেন কৈফিয়ত দিয়ে বলতে চাইলেন, ছেলেমানুষ!

—না, না, তাতে আর কী হয়েছে!—প্রাণপণে কাষ্ঠহাসি হাসতে হল আলিমুদ্দিনকে। মনে পড়ে গেল সারদাবাবুর ক্লাসের সেই অভিজ্ঞতা : ও যে মুসলমান স্যার!

এক-আধটা নয়, এমন অনেক খুঁটিনাটি। সর্বশেষ অভিজ্ঞতা হল আরো দিনকতক পরে।

হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বটা দানা বেঁধে উঠছিল একটু একটু করে। ভদ্রলোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী, দেশের জন্যে সবকিছু সমর্পণ করে বসে আছেন। তাঁর মা হরিজন-পল্লীতে নাইট-স্কুল করেছেন, তাঁর বোন কল্যাণী স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেত্রী।

আলিদা বলে ডাকত কল্যাণী। নিজের বোন নেই আলিমুদ্দিনের, বড় ভালো লাগত মেয়েটিকে ; আরো লেগেছিল—যেদিন হৃষীকেশবাবুর পাশে বসিয়ে তাঁকেও ভাইফোঁটা দিয়েছিল কল্যাণী : 'যমের দুয়ারে দিলাম কাঁটা—'। চোখ ভরে সেদিন তাঁর জল ঘনিয়ে

এসেছিল, সে কথা আজও তো স্পষ্ট মনে পড়ে।

স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ত কল্যাণী। মধ্যে মধ্যে তাকে দু-চারটে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন আলিমুদ্দিন। হাতে যেদিন কোনো কাজ থাকত না, সেদিন অযাচিত ভাবেই এসে বসতেন হৃষীকেশের বৈঠকখানায়, ঘরে কেউ না থাকলেও খবরের কাগজের পাতা উল্টে সময় কেটে যেত। তারপরে হয়ত হৃষীকেশ অথবা কল্যাণী কেউ এ ঘরে তাঁকে আবিষ্কার করত: বাঃ—এই যে, কখন এলেন আপনি?

· এই তো কিছুক্ষণ হল।

—তবু একবার ডাকেননি। আচ্ছা মানুষ তো! এতদিন ধরেও পরের মতো হয়ে রইলেন।

—পরের মতো নই বলেই তো বিনা নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্তে এসে বসে আছি। বাইরে থেকে কেউ এসেছি, এটাকে তারস্বরে ঘোষণা করতে চাইনি—হেসে জবাব দিতেন আলিমুদ্দিন।

কিন্তু এই নিঃশব্দে আসাটাই কাল হল তারপরে।

কাল? না—না, সেই হল আশীর্বাদ। সত্যকে চিনলেন তিনি, আবিষ্কার করলেন মুখোশের আবরণে লুকিয়ে থাকা বাস্তবের মুখশ্রীকে। মহিষবাথানের শীতার্ত রাত্রিতে জাগ্রৎ-স্বপ্নে দেখা আলোকময়ী মহাভারতীমূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল—আকাশ থেকে ঝরে-পড়া এক একটা উল্কাখণ্ডের মতো।

ঝিমঝিম করে সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল পূর্বদিক থেকে। ভিজতে ভিজতে আলিমুদ্দিন হৃষীকেশবাবুর বৈঠকখানায় এসে উঠলেন। বড় ভালো লাগছে সন্ধ্যাটাকে। কল্যাণীর মায়ের কাছে খিচুড়ি খাওয়ার আবদার করা যেতে পারে, গান শোনবার দাবি করা যেতে পারে কল্যাণীর কাছে।

হৃষীকেশ বৈঠকখানায় নেই। টেবিলে একটা শেজবাতি জ্বলছে। অভ্যাসবশে একটা ইজি-চেয়ারে আরামে এলিয়ে বসলেন আলিমুদ্দিন।

একটা ডাক দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই শব্দটা ভেসে এল। ভেসে এল অলক্ষ্য ব্যাধের স্থিরলক্ষ্য একটি শাণিত তীরের মতো। বৃষ্টির ঝিরঝিরি আর হাওয়ার শন্‌শনানি তাকে প্রতিরোধ করতে পারল না।

—কি দরকার অত মাখামাখি করার? সবটারই একটা সীমা আছে।

হৃষীকেশের মায়ের গলা। হরিজন-পল্লীতে যিনি নাইট-স্কুল করেছেন, নিজের হাতে বোনা সুতোর খদ্দরের শুভ্র শাড়িতে যাঁকে কখনো কখনো ভুল হয়েছে তপতী ভারতবর্ষ মনে করে।

অপরাধিনীর স্বরে জবাব এল কল্যাণীর।

—তোমরাও বড্ড বেশি দোষ ধরছ। কি এমন অন্যায়টা হয়েছে? বাড়িতে নিয়মিত আসেন, এত ভালোবাসেন, দাদা বলে ডাকি—

কল্যাণীর মার স্বর আরো বেশি তীব্র শোনাল। আরো বিষাক্ত।

—ওঃ, একেবারে সাতকেলে দাদা! জ্ঞাত নয়, গোত্তর নয়—ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

চেতনাটা যেন ক্রমশঃ অভিভূত হয়ে পড়ছে। ফাঁসির দড়িতে অবধারিত ভাবে ঝুলে পড়বার পরেও বাঁচবার একটা অন্তিম আক্ষেপের মতো সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করবার চেষ্টা করেছেন আলিমুদ্দিন—চেষ্টা করেছেন একটা মর্মান্তিক আগ্রহে। নিশ্বাস বন্ধ করে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—যেন এখুনি শুনতে পাবেন এ আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নন।

কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা চলল না বেশিক্ষণ। কল্যাণীর মা নিজেই সে স্বপ্নকে ভেঙে খান খান করে দিলেন পরমুহূর্তে।

—দিনরাত আলিদা আর আলিদা—নাম করে করে মেয়ে আমার অজ্ঞান। বেশ তো, দাদা আছে থাক, মাঝে মাঝে আসুক যাক—কিন্তু এ কি! আলিদা একটা অঙ্ক কষে দিন, আলিদা একখানা নতুন গান শুনুন—এ সমস্ত কী! ও জাতের সঙ্গে অমন মাখামাখি কিসের!

ও জাত! ছেলেবেলায় সারদাবাবুর ক্লাসের সেই হাসির আওয়াজটা যেন আকাশ ফেটে ভেঙে পড়ল। দু হাতে কান চেপে ধরে উঠে পড়লেন আলিমুদ্দিন। সমুদ্রের অতল জলে যেন ডুবে যাচ্ছেন তিনি, নিশ্বাস নেবার মতো এতটুকু ফাঁকা আকাশ বুঝি কোনোখানে নেই।

যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে পথে নেমে গেলেন। দিক্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সম্মুখের সব কিছু লক্ষ্যবস্তুকে চিরদিনের মতো তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস সাপের লেজের মতো তাঁর চোখে মুখে ঝাপটা মারতে লাগল, সর্বাঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে লাগল নাইট্রিক অ্যাসিডের জ্বালার মতো। অবশেষে নগ্ন পায়ের বুড়ো আঙুলে যখন নুড়ির একটা ঠোকা লাগল, নখ ফেটে গিয়ে গড়াতে লাগল রক্ত—সেই মুহূর্তে নিজের মধ্যে ফিরে এলেন আলিমুদ্দিন।

: ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ!

: একজন ভদ্রলোক, আর একটা মুসলমান।

: ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

রক্তাক্ত বুড়ো আঙুলটা চেপে বৃষ্টি-ঝরা আকাশের তলায় পথের কাদার ওপরেই বসে

পড়লেন আলিমুদ্দিন। তাঁর ধর্ম জানে, তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা জানে, নিজের বোনের চাইতে আলাদা দৃষ্টিতে কোনোদিন তিনি দেখেননি কল্যাণীকে।

ভালোমন্দ সব সমাজেই আছে। তাঁর নিজের সমাজ পিছিয়ে-পড়া, অনেক দোষ-ত্রুটিও আছে তার। সে কথা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাই বলে সমাজের প্রতিটি মানুষকে কেন এই ঘৃণার আঘাত!

সেই ভাই-ফোঁটার তিলক তো এখনো তাঁর ললাটের স্পর্শানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। সেই 'যমের দুয়ারে দিলাম কাঁটা'—সে তো তাঁরই প্রতি অকৃপণ মঙ্গল-কামনা! তবে?

কাটা নখের অসহ্য যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে তীব্রতর যন্ত্রণার মধ্যে তার উত্তর এল। কল্যাণী আছে, তার কল্যাণ-কামনাও আছে। কিন্তু কল্যাণীর সামনে ভ্রাতৃত্বের সত্যিকারের গৌরব নিয়ে দাঁড়াতে জানলেই তার পূর্ণ ফল আসবে তাঁর হাতে।

কিন্তু সে কেমন করে? কি উপায়ে?

মাথা তুলে দাঁড়াও। ছোট হয়ে নয়, ঘৃণায় অনুকম্পায় নয়, অনুগ্রহের প্রসাদের মধ্যে দিয়েও নয়। সেদিন তাঁকে ছোট করে দেখবার মতো স্পর্ধাও কারুর থাকবে না, যেদিন মক্কা থেকে মস্কো পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলা ইসলামী সমশেরের দীপ্তি পড়বে ভারতবর্ষের মুখে—সেইদিন। সেইদিনই কর্মদেবীর রাখীবন্ধন উৎসব সফল হবে শাহেন শা বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে।

সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনার গতি মোড় ঘুরল। দিন কয়েক সীমাহীন অনিশ্চয়তায় কাটবার পরে পথের নির্দেশ মিলল তাঁর।

'I am first a Mussalman, then an Indian.'

মৌলানা মহম্মদ আলীর উক্তি। দেশের কাজে সমর্পিত-প্রাণ জন-নায়কের স্বপ্নভঙ্গের স্বীকৃতি।

না, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর বিদ্বেষ নেই। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ইংরেজকেই কি তিনি ঘৃণা করেন? না—তা নয়। কিন্তু হিন্দুর যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানকে বিচার করে, ইংরেজের যে মনোভাব ভারতবর্ষকে শাসন করে, তারই বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।

এত বড় হিন্দু সমাজ। নতুন ভারতবর্ষকে গড়েছে, এনে দিয়েছে জাতীয় আন্দোলনের অমর মন্ত্র, আজাদীর শপথ। কেমন করে তিনি ভুলবেন তাঁর সেই অনন্যব্রতী সহকর্মীদের, কেমন করে ভুলবেন তাঁদের কথা—যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুক্তি ঘোষণা করে গেলেন হিন্দু আর মুসলমানের? মহিষবাথান যাত্রার আগে যে বোনেরা কপালে চন্দন-চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, যে মায়ের দল ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, যে কল্যাণীর কল্যাণস্পর্শ তাঁর জীবনের একটা অপরূপ সঞ্চয়, তাদের তিনি ভুলতে পারেন না। শুধু চান—তাদের

কাছে প্রতিদিনের পাওয়া এই ঘৃণার কলঙ্ককে মুছে নিতে, সোজা মাথায়, বলিষ্ঠ পেশল বুকে নিজের পূর্ণ মর্যাদায় দাঁড়াতে। হিন্দু হিন্দুত্বের ধ্বজা বয়ে বেড়াক—মুসলমান কেন ভুলে যাবে তার শেষ নবীর দীপ্ত বাণীকে, ভুলে যাবে তার দিগ্বিজয়ী তলোয়ারকে ?

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। মিত্রতা হয় সমমর্যাদার ভিত্তিতে; সেই সাম্য—সেই মর্যাদাকে আগে নিতে হবে আদায় করে। আগে করতে হবে আত্মপ্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান হামারা—

পথ চলতে চলতে কি এতক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন আলিমুদ্দিন ? এইবার চোখ রগড়ালেন। ফতে শা পাঠানের বৈঠক থেকে বেরিয়ে নিজের খেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে কত দূরে চলে এসেছেন তিনি। পাল বুরুজ অনেক পেছনে পড়ে গেছে, তার চূড়োর ওপর উড়ন্ত জালালী কবুতরগুলোকে এত দূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক একঝাঁক প্রজাপতির মতো।

অতীতের রোমন্থন করতে করতে প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এসেছেন আলিমুদ্দিন। হেঁটে চলেছেন উঁচু-নীচু টিলা জমির লাল ধুলো ভরা পথ দিয়ে। বেলা প্রায় মাথার ওপর। মাঠের ভেতর দিয়ে একটা ঘূর্ণি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে, রৌদ্রদগ্ধ সীমান্তের ওপার থেকে কারুর অদৃশ্য হাতছানি দেখতে পাচ্ছে যেন। একটু দূরেই একটা উঁচু ডাঙার ওপর 'কারবালা'। প্রতি বছর পাল নগরে মহরম শেষ হলে এই কারবালাতেই তাজিয়া বয়ে আনা হয়।

কারবালার পাশেই বাদিয়াদের ছোট একটা গ্রাম : মুস্তাফাপুর। এই এলাকার মানুষগুলি তাঁর ভারি অনুগত, পাল নগরে ফতে শাহের কাছে দরবার করতে গেলে প্রায়ই তাঁর কাছে সেলাম বাজিয়ে আসে। একটা হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে, আর আছে একখানা 'সরল গৃহ-চিকিৎসা'। আপদে-বিপদে, সময়ে অসময়ে কিছু কিছু ওষুধ বিতরণ করে মুস্তাফাপুরের দুর্বিনীত বাদিয়াদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বলতে গেলে এরাই ফতে শার সামরিক শক্তি—দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় লাঠি, হাঁসুয়া আর বে-আইনী গাদা-বন্দুক নিয়ে এরাই সর্বাগ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে। প্রত্যেকের গায়েই দুটো-চারটে আঘাতের চিহ্ন আছে, অনেকেরই নাম তোলা আছে থানার দারোগাবাবুর দাগী আসামীর ফিরিস্তিতে। রাতবিরেতে প্রায়ই চৌকিদার এসে হাঁক পাড়ে : করমুদ্দি, ঘরে আছ ? ও গণি ভুঁইয়া, তোমার খবর কী ?

হোক দাগী, হোক দুরন্ত। তবু ইসলামের এরাই প্রাণশক্তি—মনে মনে প্রত্যাশা রাখেন আলিমুদ্দিন। পাকিস্তানের লড়াইয়ে এরাই আগামী মুহূর্তের জঙ্গী ফৌজ। ইসলামী ঝাণ্ডার এরাই সত্যিকারের উত্তরসাধক।

মুস্তাফাপুরের বস্তিতে ঢুকে পড়লেন আলিমুদ্দিন। এসেছেন যখন, একবার খবর নিয়ে যাওয়া যাক।

বাদিয়াদের বস্তির চেহারা একটু ভিন্ন ধরনের। ক্ষেত-খামার, গাছগাছালি নিয়ে

এদেশের গৃহস্থপল্লীর মতো নয়, প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির একখানা আমবাগান কিংবা একটা এঁদো ডোবার ব্যবধান নেই। এরা অদ্ভুতভাবে দলবদ্ধ—যেন নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের এতটুকু সীমারেখা টেনে রাখতে চায় না। সারি সারি চালাঘর গায়ে-গায়ে সাজানো, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ চলার পথ। সেই চলার পথটুকুও কখনো একটা খাটলি অথবা দুটো-একটা জলচৌকি কিংবা আরো দশটা জিনিসে অবরুদ্ধ। যেন নিজেদের ভেতর দিয়ে কাউকে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে দিতে চায় না—গণ্ডির মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চায়।

—মাস্টার সাহেব যে! আদাব—আদাব।

সম্বর্ধনা এল পাশের একটি ঘরের দাওয়া থেকে। পাকা-দাড়ি এক বৃদ্ধ জলচৌকির ওপর বসে হুঁকো টানছে। কাঁচা-পাকায় মেশানো রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলে পড়েছে তার দু কানের ওপর দিয়ে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং জ্বলন্ত; গা খোলা—হাতের আর কাঁধের পেশীগুলি ভাঙাচুরো অবস্থায় শরীরের নানা জায়গায় শিরাস্নায়ু বাঁধনে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। দেখলেই মনে হয়, শুধু হাওয়াতেই তার বয়েস বাড়েনি, অনেক সমুদ্রের ভেতর দিয়ে পাড়ি জমাতে হয়েছে তাকে।

—আদাব, আদাব। ভালো আছ তো এলাহী?

—জী, আছি একরকম। তা এই দুপুরবেলা এদিকে কোথায়? কোনো রোগী আছে নাকি?

—না, রোগী খুঁজতে এলাম।—আলিমুদ্দিন হাসলেন।

—আসুন, আসুন, উঠে বসুন—এলাহী আহ্বান জানাল: তামুক খান।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দাওয়ায় উঠে বসলেন আলিমুদ্দিন। একটা খাটলির ওপর বসলেন আরাম করে। এলাহীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে তাতে মৃদু-মন্দ টান দিতে দিতে তাঁর মনে হল, আঃ, সত্যিই তিনি বড় ক্লান্ত। সকাল থেকে এখনো কিছু খাওয়া হয়নি, খাওয়ার কথা ভুলেও গিয়েছিলেন। ফতে শাহের বৈঠকখানায় এন্তাজ চাচার সঙ্গে সেই তর্ক-বিতর্ক, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পথে বেরিয়ে আসা। তারপর পথ চলতে চলতে স্মৃতির ওপর থেকে একটার পর একটা আবরণ সরিয়ে দেওয়া। সমস্ত বোধ যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—এখনো বুঝি চান-খাওয়া কিছু হয়নি মাস্টার সাহেবের?—মনের ভাবটা রূপ পেয়ে উঠল এলাহী বক্সের জিজ্ঞাসায়।

—নাঃ—তামাকের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

—সে কি কথা! এলাহী শিউরে উঠল: বেলা তিনপহর যে কখন পেরিয়ে গেছে। তাহলে আমার এখানেই যা হোক কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করি।

—না না, ওসব কিছু করতে হবে না—ধীরে ধীরে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

বললেন, কোনো দরকার নেই ব্যস্ত হবার। একটু বেশি বেলাতেই খাওয়া আমার অভ্যেস।

—তা হোক। একটু চিড়ে-মুড়ির জলপান? নতুন গুড় আছে ঘরে—আগ্রহভরে আবার জানতে চাইল এলাহী।

—বলেছি তো কিছু করতে হবে না—আলিমুদ্দিনের গলার স্বরে এবার যেন বিরক্তিই ফুটে বেরুল। মিনিটখানেক নিঃশব্দে তামাক টেনে জানতে চাইলেন, পাড়ার খবর কি?

—চলছে এক রকম করে।

—এক রকম কেন? ভালো নয়?—হুঁকো নামিয়ে জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন।

এর মধ্যে কখন কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেন একটা নিড়াণি হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছে নিচের ফালি পথটুকুতে। অযাচিত ভাবে সেই-ই একটা ফোড়ন ছেড়ে দিলে কথার মাঝখানে।

—ভালো আমাদের থাকতে দেবে কেন সাহেব। শাহ্ কি তেমন লোক?

আচমকা যেন একটা ঢিল এসে ছিটকে লাগল আলিমুদ্দিনের কপালে। চমকে তাকিয়ে দেখলেন হোসেনের দিকে। কালো মুখের ভেতর থেকে দু সারি সাদা দাঁত বের করে উজ্জ্বল হাসি হাসছে সে।

—কি যা-তা বলছিস বেকুব?—চটে একটা ধমক দিলে এলাহী: শাহ্ আমাদের ভাত দেয় না? আমরা খাই না তার নিমক?

—খুন দিয়ে নিমক পাই চাচা। কিন্তু নিমকের চাইতে খুনের দাম বেশি—হোসেনের সাদা সাদা দাঁতে আবার সেই উজ্জ্বল হাসি। হাসিটাকে ভালো লাগল না আলিমুদ্দিনের।

কেমন যেন অনুভব করলেন এ আক্রমণের লক্ষ্য শুধু শাহ্ই নয়—এর আঘাত তাঁর ওপরেও এসে পড়েছে। মুখ লাল করে বললেন, তোমার যে খুব লম্বা চওড়া কথা শুনতে পাচ্ছি।

—না জনাব, লম্বা কথা আমরা বলব কোত্থেকে। আমরা ছোটলোক, আমরা আছি কেবল খুন দেবার বেলায়, জেলে যাবার বেলায়, আর উপোস করার বেলায়। লম্বা কথা বললেই বা তা শুনছে কে।

ব্যঙ্গোক্তিটা এবার আরো তীব্র, আঘাতটা তাঁর ওপরে আরও প্রত্যক্ষ। রাগে অপমানে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও যোগাল না তাঁর মুখে।

—আদাব মাস্টার সাহেব, চলি—হোসেন আর এক ঝলক সাদা হাসি বিতরণ করে বিদায় নিলে।

—কি আস্পর্ধা!—খানিক পরে সংক্ষেপে বলতে পারলেন মাস্টার।

—তা বটে, ভারি অন্যায়।—এলাহী বক্স মাথা চুলকোতে লাগল : তবে কিনা নেহাত অন্যায় বলেনি। আমরা তো তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছি—

—কি বললে।—হাতের হুঁকোটা ঠক করে নামিয়ে রাখলেন আলিমুদ্দিন : তোমরাও সবাই মিলে ওই সব ভাবছ বুঝি ? মুসলমান হয়ে মতলব আঁটছ নিমকহারামির ?

—তোবা, তোবা।—দু হাতে কানে আঙুল দিলে এলাহী বক্স। জিভ কেটে বললে : জী, না না, ওসব আমরা কখনো বলি না। দুঃখে কষ্টে মানুষের মুখ দিয়ে দু-চারটে এটা-ওটা কথা বেরিয়ে পড়ে আর কি।

—এটা-ওটা কথা ? না না, এটা-ওটা কথাকে তো আস্কার দেওয়া যায় না—কড়া গলায় আলিমুদ্দিন বললেন। মুখে ছায়া পড়েছে, ঘনিয়েছে মেঘ। শাহের খাস জঙ্গী জোয়ানদের মধ্যেও এ কি অতৃপ্তি মাথা তুলছে আজ। চেতনা জাগুক তা তিনিও চান —কিন্তু তার এ কী রূপ! এ রূপের সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি, এর পরিণাম কী তাও তাঁর ধারণার বাইরে। হঠাৎ গভীর একটা আশঙ্কা তিনি অনুভব করলেন। রৌদ্রদগ্ধ চৈত্র-দুপুরে আচমকা কোনো বাদিয়া-পল্লীতে আগুন লাগলে আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া দমকা হাওয়া পরম উল্লাসে একটির পর একটি খড়ের চালে সে আগুনকে বয়ে নিয়ে যায়—আধ ঘণ্টার মধ্যে অত বড় পাড়াটায় পড়ে থাকে শুধু রাশীকৃত ছাইয়ের পিণ্ড। তাই একটা ফুলকিও এখানে ভয়াবহ। শাহ্‌কে বলতে হবে ব্যাপারটা।

হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল।

চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন : ও কি—অসুখ কার ?

—আজ্ঞে না, ও কিছু না—এলাহী বক্স জিনিসটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল যেন।

কিন্তু আবার সেই গোঙানি। আলিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, লুকোতে চাইছ কেন ? অসুখ কার ?

মাথা নত করে এলাহী বক্স বললেন : আমার বড় বেটীর। রাজিয়ার।

—কি অসুখ ?

এলাহী নিরুত্তর রইল।

—অসুখটা কি, তাও বলতে বারণ আছে নাকি ? দরকার হলে আমিও তো চিকিৎসা করতে পারি।

—আপনি পারবেন না জনাব।

—পারব না!

—না। ওর সারা গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে।—অসীম লজ্জায় যেন মাটির মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে জবাব দিলে এলাহী বক্স।

—পারার ঘা! শরীর শিউরে উঠল আলিমুদ্দিনের : ছিঃ, ছিঃ, কী করে হল ?

—শাহের বাড়িতে বাঁদির কাজ করত—সংক্ষেপে উত্তর এল।

—শাহের বাড়িতে!

—জী।—একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাল এলাহী বক্স: শাহ্‌কে ডাকত ধর্মবাপ বলে।—নিষ্প্রাণ শীতল কণ্ঠের উত্তর এল।

ঘরের মধ্যে গোঙানি চলছে। দূরে পোড়া মাটির মাঠ। অভুক্ত পেটে খিদের আগুন জ্বলছে। আলিমুদ্দিন মাস্টারের মনে হল চারদিকের খরধার রোদে কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেনের তীক্ষ্ণ শাণিত হাসিটা যেন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে।

চকমকিতে ঘা না লাগলে কি ঠিকরে পড়ে ফুলকি?

ছয়

রেশমের কুঠিয়াল ক্রু সাহেবের কুঠি এখনো আছে, রেশম নেই।

রেশম নেই, রেশমী সাহেবীয়ানাও নেই। মোটা জিনের আধময়লা স্যুট—গলার টাইটা পর্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে এসেছে। একটা নতুন টাই কেনবার মতো অর্থ-সঙ্গতি এখনো ঘটে ওঠেনি ক্রু সাহেবের। মার্থার যে রঙীন স্কার্টটা সম্প্রতি পেনশন পেয়েছে, তার থেকে একটা ফালি কেটে নিয়ে আত্মসম্মান বাঁচানো যায় কিনা সেই চিন্তাতেই মগ্ন ছিল ক্রু সাহেব।

সামনে একটা ঠ্যাং-ছোট টেবিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে ছোটা হাজরি। একটা মুরগীর ডিম, দু টুকরো মার্থার হোম-মেড নোনতা স্কচ-ব্রেড, দুটি সুপুষ্ট কলা—তাতে দু-চারটি বিচি থাকা অসম্ভব নয়। আর আছে এক কাপ গৌড়ীয় চা, তার বর্ণ কৃষ্ণাভ। সম্প্রতি চিনি পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে, আখের গুড়েই চায়ের মিষ্টতা সাধন করতে হচ্ছে।

মার্থার ঝাড়নের শব্দ। ক্রু সাহেবের ধ্যানভঙ্গ হল।

পরিষ্কার বাংলা ভাষায় মার্থা বললে, চা খাচ্ছ না যে?

করুণ চোখে কালো চায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল ক্রু সাহেব। তারপর বিনীত কণ্ঠে বললে, বড্ড গন্ধ লাগছে। একটু চিনি হয় না মার্থা?

মার্থা ভ্রূভঙ্গি করে বললে, আমার চিনির দোকান আছে, না কল বসিয়েছি একটা?

—না না, তা বলছি না। মানে, যদি কোথাও একটু থাকে-টাকে—

—নিজে খাবার জন্যে লুকিয়ে রেখেছি, কেমন?—খাঁটি বঙ্গনারীর মতো একটা মুখঝামটা মারল মার্থা: আজ তিন হপ্তা ধরে কত চিনি এনে দিয়েছ—মণ খানেক ঘরে জমা করে রেখেছি!

এতক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল ক্রু সাহেবের।—দ্যাখো মার্থা ক্যারু, তোমার ভয়ঙ্কর মুখ

হয়েছে আজকাল। তুমি ভুলে যাচ্ছ—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই মার্থা ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়েছে।

মার্থা ক্যারু। হাঁ, ক্রু সাহেবের আদত নাম ক্যারুই বটে। এ অঞ্চলের লোক গোড়ার দিকে বিকৃতি ঘটিয়ে উচ্চারণ করত কুরু। তারপরে হয়ত কোনো ইংরিজি-শিক্ষিত ব্যক্তি ভুলটা শুধরে দিয়ে বলেছে, নামটা কুরু হতে পারে না—হবে ক্রু; সম্ভব, ট্রেনের কোনো ক্রু সাহেবে তার মনশ্চক্ষের সামনে ভেসে উঠে থাকবে। সেই থেকেই ক্যারু সাহেব ক্রু সাহেবে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে গ্রামের লোকে কেউ কেউ এখনো কুরুই বলে।

মার্থার রঙ-জলে-যাওয়া ফিকে গোলাপী গাউনটা যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর একটা বিড়ির সন্ধানে পেণ্টলুনের পকেটে হাত ঢোকাতে আর একটা নতুন ভয়াবহ সত্যের সন্ধান মিলল। পকেটের নিচেকার সেলাই খুলে গিয়ে কখন একটি বাতায়ন রচিত হয়েছে, আর তার অবারিত পথে বিড়ি-গুলো কোন্ মুক্ত দিগন্তের দিকে ডানা মেলেছে।

অগত্যা প্রচণ্ড একটা ক্রূর মুখভঙ্গি করে ক্রু ওরফে ক্যারু গুড়ের চায়ে একটা চুমুক দিলে। একখানা রুটি তুলে নিয়ে একগ্রাসে গিলল সেটাকে। তারপর আধখানা কলায় কামড় দিয়ে তার বিচিগুলোকে জিভের আগায় সংগ্রহ করতে করতে নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল।···

নীল সমুদ্রের সফেন ঢেউয়ের পর ঢেউ পেরিয়ে টেমস নদীর মোহানা। দূরে ছবির মতো আঁকা টাওয়ার অব লণ্ডন। গোল্ডার্স গ্রীন-এ ঝকঝকে তকতকে একখানা বিশাল বাড়ি: ক্যারুজ ইণ্ডিয়ান সিল্কস্ অ্যাণ্ড ফেবরিক্স্।

কিন্তু ঢেঁকি কি কখনো স্বর্গে যায়? রাশি রাশি শুকনো পাতা, মরা পলু পোকা আর ভাঙা তাঁতের সঙ্গে কবে ভারতবর্ষের নরম মাটির স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে পার্সিভ্যাল ক্যারুর। এতদিনে বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে জানে। আর যদি বেঁচেও থাকে—সেখানকার সংসারে, সেখানকার সমাজের পরিবেশে স্নাইদ্ ক্যারু—অর্থাৎ ক্রু সাহেবের স্থান কোথায়?

—রাস্কেল্। ওল্ড ফুল।—স্বল্পার্জিত ইংরেজি বিদ্যা নিয়ে বাপের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করল ক্রু সাহেব।

রেশমের কুঠি করেছিল পার্সিভ্যাল—কয়েক বছর টাকাও কামিয়েছিল দু হাতে। সেই প্রথম যৌবনে এবং অপরিসীম প্রাচুর্যের ভেতরে তার চোখে রঙ ধরিয়েছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি চাষার মেয়ে। জন্ম হল স্নাইদ্ ক্যারুর। মায়ের রঙ আর বাপের রক্ত নিয়ে। কিন্তু রক্তের প্রতি আকর্ষণের চাইতে রঙের প্রতি বিকর্ষণটাই পার্সিভ্যালের ছিল বেশি। তাই ব্যবসা তুলে দিয়ে এদেশ থেকে যখন চাঁটিবাটি তুলল, তখন স্নাইদ্‌কে

ফেলে গেল রেশমহীন এই রেশমের কুঠিতে। মা-টা আগেই মরেছিল, তাই রক্ষা।

স্মাইদের বয়েস তখন পনের বছর। কেঁদে বলেছিল, বাবা, আমার কী হবে?

অসীম বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করেছিল পার্সিভ্যাল।—কি আবার হবে, বড় হয়েছ, নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করে নাও। ইংল্যাণ্ডে তোমার মতো ধাড়ি ছেলেকে বসিয়ে খাওয়ানো হয় না, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

—কিন্তু—

—কিন্তু কি আবার?—বিরক্তির ভ্রূকুটিটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল পার্সি-ভ্যালের মুখে: তোমাকে তো বাপু আমি দস্তুরমতো প্রপার্টি দিয়ে গেলাম। এই বাড়ি রইল, জমিজমাও কিছু করে রেখেছি। নাউ ট্রাই ইয়োর লাক।

—আমাকে কি কখনও তোমার কাছে নিয়ে যাবে না? আমাদের নেটিভ হোম—ইংল্যাণ্ডে?

নেটিভ হোম—ইংল্যাণ্ড। একটা তির্যক হাসির রেখা প্রকটিত হয়েছিল পার্সি-ভ্যালের ঠোঁটের কোণায়: আচ্ছা হবে, হবে। কিছুদিন পরে তোমায় আমি প্যাসেজ পাঠাব, স্ট্রেট চলে যেয়ো। নাউ গুডবাই মাই বয়—চিয়ার আপ।

সান্ত্বনার মতো শেষবার ছেলেব পিঠ চাপড়ে দিয়ে পার্সিভ্যাল পাল্কিতে গিয়ে উঠল। যতক্ষণ না পথের বাঁকে পাল্কিটা অদৃশ্য হল, ততক্ষণ দেখা গেল সে রুমাল নেড়ে নেড়ে ছেলেকে বিদায়-বাণী জানাচ্ছে।

…জীর্ণ চেয়ারটার ওপর নড়ে-চড়ে বসল ক্রু সাহেব। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একটা শব্দ উঠল। তারপরে আজ একটু একটু করে ষোলটা বছর পার হয়ে গেছে। পাল্কি চলে যাওয়া ওই ধুলোভরা পথটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেটেছে দিনের পর দিন, পেরিয়ে গেছে রাতের পর রাত। যে বটগাছটার তলায় পার্সিভ্যালের আরবী ঘোড়া দুটো বাঁধা থাকত, সেটা উপড়ে পড়ে গেছে ঝড়ে; যে টিনের চালার তলায় চাষারা পলুর দাম নেবার জন্যে এসে দরবার করত, সেখানে এখন অজগর জঙ্গল।

সে প্যাসেজ আজও আসেনি। শুধু বহুদূর লণ্ডনের কোন এক গোল্ডার্স গ্রীনে কি এক ক্যারু কোম্পানির মায়াস্বপ্ন দেখতে দেখতে আজও প্রতীক্ষা করে স্মাইদ্ ক্যারু। আশা নেই, অভ্যাস রয়ে গেছে। আজও কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে মনে হয় পিয়ন এসে দরজার কড়া নাড়ছে: চিঠি-হ্যায়—চিঠি।

—কিসের?

ইংল্যাণ্ডের ডাক-টিকিটমারা লম্বা একখানা খাম। খুলতেই একটুকরো চিঠি: মাই সান, পত্রপাঠ চলে এস। ডাকে দুশো পাউণ্ড পাঠালাম। আমার সমস্ত সম্পত্তির তুমিই উত্তরাধিকারী, এখানে এসে ক্যারুকোম্পানির সব ভার আজথেকে তোমাকেই নিতেহবে।

সে চিঠি এখনো আসেনি। কিন্তু কাল তো আসতে পারে ? কিংবা পরশু ? কিংবা তারও পরের দিন ? কে জানে, কিছুই বলা যায় না। পার্সিভ্যাল ক্যারুর বুকের ভেতর বিবেক কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না, এও কি সম্ভব ?

না, কিছুই বলা যায় না। মরা একটা মেটে সাপের মতো লাল মাটির ওই বিসর্পিল রাস্তাটা নিরুত্তর হয়ে আছে ষোল বছর ধরে। উত্তরের ওই রক্তাভ তারাটি ষোল বছর ধরে সকৌতুকে যেন একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যায়। অন্ধকার ছায়া জমে জমে ওঠা কুঠিবাড়ির কোনো রিক্ত কক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ আকৃতির স্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসে—ভাঙা জানালায় বাতাসের ব্যঙ্গ।

লাল মাটির তপ্ত বাতাসে তপ্ত কামনার কয়েকটা দিন। কালো মায়ের কালো ছেলে। সাদা বাপ পথের ধুলোয় সে দিনগুলোকে ঝেড়ে দিয়ে চলে গেছে। গোল্ডার্স গ্রীন ? আকাশের ছায়াপথের সঙ্গে তার তো পার্থক্য নেই কোথাও।

—চিঠি আছে সাহেব।

ক্রু সাহেব চমকে উঠল। হিজলবনী পোস্ট অফিসের পিয়ন রতন ভুঁইমালী। একখানা খাম দিয়ে সেলাম জানিয়ে গেল। সাহেবের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আজও তাহলে রয়েছে লোকগুলোর।

একখানা খাম। পুরনো অভ্যাসেই ডাক-টিকিটের দিকে প্রথমে তাকাল ক্রু সাহেব। না, না, ইংল্যাণ্ড নয়। ইণ্ডিয়া পোস্টেজ। কলকাতার মোহর-মারা।

কিন্তু খামখানা খুলেই চক্ষুঃস্থির।

'ডিয়ার ক্যারু,

গত বছর ক্রিসমাসের সময় তোমার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছিল, আশা করি, এর মধ্যেই তুমি তা ভুলে যাওনি। তোমার সাহচর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তা ছাড়া তোমার নেমন্তন্নও আমি ভুলিনি—শিকারের অত বড় প্রলোভন ছেড়ে দেওয়া শক্ত। বহুদিন থেকেই আসবার কথা ভাবছি, কিন্তু কাজের চাপে সময় পাইনি। এইবার অফিস থেকে দু সপ্তাহের ছুটি মিলেছে। শুনে সুখী হবে ১৫ তারিখ বিকেলে এখান থেকে রওনা হয়ে ১৬ তারিখ ভোরের ট্রেনে তোমাদের স্টেশনে পৌঁছব। আশা করি, তোমার 'কার'খানা স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। আর তুমি যদি নিজে উপস্থিত থাকতে পার, তাহলে তো আরো ভালো হয়। ভালোবাসা নিয়ো ও মিসেস্ ক্যারুকে জানিও। ইতি—অ্যালবার্ট।'

শুনে সুখী হবে। ক্রু সাহেব পুরো পাঁচ মিনিট বজ্রাহত হয়ে রইল। তারও পরে মনে পড়ল আগামী কাল ১৬ তারিখ এবং কাল সকালেই বোয়ালমারী স্টেশনে বন্দুক কাঁধে অ্যালবার্টের আবির্ভাব ঘটবে। অসাড় শরীরটা আরো অসাড় হয়ে গেল। ছোটা হাজরির যে আধখানা কলা অনেকক্ষণ থেকে হাতের মধ্যে ধরা ছিল, সেটা হঠাৎ টপ

করে গলে পড়ল বুকপকেটের ভেতরে, ক্রু সাহেব টেরও পেল না ঘটনাটা।

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

অপরাধের মধ্যে গত ক্রিসমাসে কলকাতা বেড়াতে গিয়েছিল ক্রু সাহেব। একটা রেস্তোরাঁয় অ্যালবার্টের সঙ্গে আলাপ। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্মার্ট ছেলে, দিলদরিয়া মেজাজ। পেট ভরে ডিনারটা সে-ই খাওয়াল।

একটা পেগ পেটে পড়তেই প্রাকৃতিক নিয়মে অন্তরঙ্গতা এক ধাক্কায় আকাশে গিয়ে উঠল।

একটা বড় বিলিতি ফার্মে চাকরি করে অ্যালবার্ট। শ ছয়েক টাকা মাইনে পায়। ব্যাচিলার মানুষ, ফ্ল্যাটে থাকে, হকি-গল্‌ফ-বেসবল খেলে প্রজাপতি-জীবন কাটিয়ে বেড়ায়। নিজেই বিস্তৃত আত্ম-পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল : তুমি?

এ ক্ষেত্রে নিজের মর্যাদা রাখতেই হয়। দুটো ঢোঁক গিলে ক্রু সাহেব বলেছিল, প্ল্যাণ্টার।

—প্ল্যাণ্টার? তাহলে তো তুমি রীতিমতো বড়লোক হে! কিসের প্ল্যাণ্টার? টী?

—সিল্ক। বেঙ্গল সিল্ক।

—ওঃ—সিল্ক!—অ্যালবার্টের স্বর সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। খুব বড় ফার্ম বুঝি?

—তা একরকম মন্দ নয়।—বিনয় করে কথাটা বলতে গিয়েও আরো দুটো ঢোঁক গিলতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে।

—ইট ইজ এ লাক দ্যাট আই মীট সো বিগ এ প্ল্যাণ্টার!—একটা সিগারেট 'অফার' করে জানতে চেয়েছিল অ্যালবার্ট : কোথায় তোমার ফার্ম?

মিথ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করলে আর ফিরে দাঁড়ানো কঠিন। তা ছাড়া মিথ্যের আর একটা সুবিধে এই যে সত্যের ভ্রূকুটি কোথাও থাকে না বলে অবলীলাক্রমে যতদূরে খুশি চলে যাওয়া যায়—যত ইচ্ছে রঙের ওপর রঙের সোনালি বার্নিশ চাপিয়ে দেওয়া চলে। হাওয়াতেই যদি প্রাসাদ গড়তে হয়, তাহলে একেবারে তাজমহল গড়াই ভালো; কারু-কার্যে খচিত করে, হীরে-জহরতের জেল্লা দিয়ে।

সুতরাং নিজের ফার্মের একটা মায়াময় বর্ণনা দিয়েছিল ক্রু সাহেব। যত দূরে চাও গ্রীন আর গ্রীন। মাঝে মাঝে আখরোটের বন। (এত জিনিস থাকতে হঠাৎ আখরোটের বন কেন মনে এসেছিল সে কথা আজও বলতে পারে না ক্রু সাহেব।) এখানে ওখানে পাম-গাছ—(দেশী তালগাছ আর বিলিতি পামের পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট ছিল না নিজের কাছে) আর ছোট ছোট ব্রুকলেট—কী চমৎকার টলটল তার নীল জল। তাতে কার্প আর রুই মাছ কিলবিল করছে। (অবশ্য ব্রুকলেট বলতে মনে এসেছিল কাদাভরা কাঁদড়ের কথা, তার ভেতরে রাশি রাশি ব্যাঙ আর চ্যাঙের পোনা।) সেই মনোরম পরিবেশের

মধ্যে তার ফার্ম। লাল ইটের বাড়িটি—আঃ—ইট ইজ এ ড্রিম।

শুনে অ্যালবার্টের চোখ জলজল করে উঠেছিল।

—তোমার কার আছে?

—অবশ্য।

—হাউ লাভলি!—খানিকক্ষণ চোখ বুজে ক্রু সাহেবের স্বর্গীয় জগৎটাকে ধ্যান করেছিল অ্যালবার্ট: ইট ইজ এ পিক্‌চার।

—যা বলেছ!—অ্যালবার্টের দেওয়া সিগারেটটার ধুম পান করতে করতে ক্রু সাহেব আরো বলেছিল: রোজ ভোরে উঠে দেখবে দিগন্তে হিমালয়ান রেঞ্জের নীল রেখা। আর সূর্য ওঠবার আগেই সেদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস তোমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাবে।

এতখানি বর্ণনার মধ্যে যা কিছু সত্য লুকানো আছে, এইটুকুতেই। হিমালয়ান রেঞ্জ অবশ্য নয়, রাজমহলের পাহাড়; কিন্তু বুনো হাঁসের ঝাঁক সত্যিই আসে, বিশেষ করে শীতের আমেজ লাগলে ভোরের আকাশ তাদের কণ্ঠকূজন আর পাখার শব্দে প্রায়ই মুখর হয়ে থাকে।

—বুনো হাঁস!—অ্যালবার্ট প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল: মানে গেম বার্ড?

—তাই।

—প্রচুর পাওয়া যায়?

—সারা বাংলা দেশে গেম বার্ডের এমন জায়গা আর নেই। আমার এরিয়ার মধ্যেই তো দু-তিনটে বড় বড় বিল রয়েছে।

—তাহলে তো শিকার করতে যাওয়া যায় তোমার ওখানে।

—এনিটাইম। খুব খুশি হব তুমি এলে। অবশ্য শীতকালে এলেই ভালো হয়—সেইটাই বুনো হাঁসের সীজন কিনা।

—আর বলো না, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে—অ্যালবার্ট থামিয়ে দিয়েছিল লোভ জাগানো বর্ণনাটা। তারপর পকেট থেকে নোটবই বের করে বলেছিল, তোমার ঠিকানা?

এইখানে আবার তিনটে ঢোঁক গিলে নিতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে। এর পর ইচ্ছে হয়েছিল রাশীকৃত মিথ্যার সঙ্গে মিথ্যে পরিচয়টাও দিয়ে বসে। কিন্তু এ সম্পর্কে মনঃস্থির করবার আগেই অসীম বিস্ময়ে দেখতে পেল, নিজের অজ্ঞাতেই কখন সে সত্যিকারের নাম ঠিকানা দিয়ে ফেলেছে।

—সুযোগ পেলেই তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করব আমি—ঠিকানা লেখা শেষ করে চোখ তুলে জানিয়েছিল অ্যালবার্ট।

ধক্ করে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল হৃৎপিণ্ডটা। পরক্ষণেই আচমকা ধাক্কা খাওয়া একটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো অত্যন্ত দ্রুতবেগে দোলা খেয়েছিল বারকয়েক। শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে বলেছিল, আন্তরিক সুখী হব।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ অনুতাপ আর অস্বস্তির সীমা রইল না যেন। তার পর গড়ের মাঠের খোলা হাওয়ায় চলতে চলতে ক্রমশ মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল—অস্বস্তিকর মানসিকতার ওপরে সান্ত্বনার লঘু প্রলেপ পড়তে লাগল একটা। মনে হয়েছিল মদের নেশার এই মুহূর্তগুলো কতদিন বেঁচে থাকবে অ্যালবার্টের স্মৃতির ওপরে? দুদিন পরেই ক্রমশ তা নিষ্প্রভ হয়ে আসবে, তারপরেই একটু একটু করে নিঃসীম বিস্মৃতির গভীরে যাবে হারিয়ে। সান্ত্বনাটা মনের মধ্যে ক্রমশ থিতিয়ে বসতে লাগল, তারপর এক সময়ে নিশ্চিত ভরসায় দানা বেঁধে গেল সেটা।

কিন্তু এক বছর পরে এমন করে যে পালে বাঘ পড়বে তা কে জানত? কে জানত, নেশা করলেও অ্যালবার্টের স্মৃতি সজাগ ও প্রখর থাকে, একটা ড্রিমল্যাণ্ডের আকর্ষণ এতদিন পরেও এমন ভাবে হাতছানি দেয় তাকে?

এখন উপায়?

এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া চলে; আত্মহত্যা করা চলে; আর নয়তো স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার সময় ফাঁকা মাঠের নির্জন জায়গায় সাবাড় করে দেওয়া চলে অ্যালবার্টকে।

কিন্তু কোনোটাই সম্ভব নয় তার।

হেমন্তের এই স্নিগ্ধ-সকালেও ক্রু সাহেবের জামার মধ্যে ঘাম গড়াতে লাগল। দিনের বেলাতেও দুটো কানে ঝি ঝি পোকার ডাক বাজতে লাগল ঝিম ঝিম করে। কালই সেই ভয়ঙ্কর ষোলই তারিখ। কাল সকালেই অ্যালবার্ট এসে দর্শন দেবে বোয়ালমারী স্টেশনে। স্টেশনে না গিয়েও তাকে এড়ানোর উপায় নেই—রেশমের কুঠি বললে এ অঞ্চলে যে কোনো লোকই পথের হদিস বাতলে দেবে তাকে।

মার্থা বারান্দায় এল।

—মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কি এত? ওটা কার চিঠি?

ছোঁ মেরে চিঠি তুলে নেবার আর্টটা মেয়েদের মজ্জাগত এবং সেটা এতই ক্ষিপ্রবেগে যে সামলে নেবার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ক্রু সাহেবও পেল না।

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে মার্থা ক্রু সাহেবের দিকে তাকাল। টানা টানা ভ্রূ দুটি প্রসারিত হয়ে গেছে সীমাহীন বিস্ময়ে।

—এ আবার কী ব্যাপার? অ্যালবার্ট কে?

—ও—ও আমার এক বন্ধুর চিঠি—কান্না চাপবার একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করে

জবাব দিলে ক্রু সাহেব।

—বন্ধু ?

—হ্যাঁ, কলকাতায় গিয়ে আলাপ হয়েছিল।

—কিন্তু,—মার্থা আবার চিঠিটার ওপর দৃষ্টি ফেলল : স্টেশনে কার পাঠাবার কথা লিখেছে।—জ্বালা-ভরা গলায় জানতে চাইল : কোন্ কারটা পাঠাচ্ছ ? বড়খানা, ছোটটা, না মাঝারিটা ?

—ওটা—মানে, ওটা ও ভুল বুঝেছে—ক্রু সাহেব যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল : ভেবেছে আমার মোটর আছে।

—আর শিকারের নিমন্ত্রণটা ?—মার্থার চোখে ইঁদুর-ধরা বেড়ালের মতো খর শ্যেন দৃষ্টি।

—ওটা, বুঝলে না, ওটা—এই কথায় কথায় বলেছিলাম। মানে আমি ঠিক ওকে নিমন্ত্রণ করিনি—

—করনি, না ?—ইঁদুর-ধরা দৃষ্টিটাকে আরো শাণিত করে মার্থা বললে, ওটাও তোমার বন্ধু ভেবে নিয়েছে, কেমন ?

মুখের ঘাম মোছবার জন্যে রুমালের সন্ধানে বুকপকেটে হাত দিয়ে ক্রু সাহেব রুমাল পেল না, পেল সেই কলাটা। সেটাকে হাতে তুলে নিয়ে বিহ্বলভাবে সেদিকেই তাকিয়ে রইল।

আশ্চর্য শান্ত গলায় মার্থা বললে, কাল সকালেই তো এসে পড়ছে। তাকে নিয়ে বুঝি জমিদারের জলায় হাঁস মারতে যাবে ? ভালোই হবে—তুমি আর তোমার বন্ধু অ্যালবার্ট—দুজনকেই ধরে নিয়ে গিয়ে চাবুক হাঁকড়াবে জমিদারের লোক। পার্সি-ভ্যালের দিন আর নেই—সাহেব বলে তোমায় রেয়াত করবে এমন আশাও করো না।

—সে আমি কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছ থেকে অনুমতি নিতে পারব—ক্রু সাহেব অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিলে।

—তা না হয় হল। কিন্তু তোমার এই বন্ধুটির দায়িত্ব নেবে কে শুনি ? গুড়ের চা আর বিচে-কলা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতে হবে নাকি ?

আর্ত অসহায় দৃষ্টিতে মার্থার দিকে তাকাল ক্রু সাহেব—যেন করুণা ভিক্ষা করলে। তারপর বললে, যা হোক একটা উপায় করতেই হবে মার্থা। মস্ত মানী লোক—খাঁটি লর্ড বংশের ছেলে।

—লর্ড বংশের ছেলে!—মার্থার দু চোখে রাশি রাশি জ্বালা ফুটে বেরুল : তোমার বন্ধু-বান্ধব তো লর্ড আর ব্যারন বংশেরই হবে। গোল্ডার্স গ্রীনে তোমাদের কত বড় কারবার, কত বড় বনিয়াদী ব্যবসা : ক্যাক্রজ। তুমিও তো লক্ষপতি লোক। শুধু গুড়

দিয়ে চা খেতে হয়—এই যা দুঃখ।

একটা বীভৎস মুখভঙ্গি করে মার্থা বিদায় নিয়ে গেল। আর দাঁড়াল না।

ঠাট্টা করল—অপমান করে গেল। করবে বইকি—সে অস্ত্র নিজেই যে ওর হাতে তুলে দিয়েছে ক্রু সাহেব। শহরের এক নেটিভ ক্রিশ্চানের মেয়ে মার্থা। প্রেম করবার সময় অনেকগুলো কথাই বাড়িয়ে আর বানিয়ে বলতে হয়েছিল ক্রু সাহেবকে—দেয়ার ইজ নো ল—। বলেছিল, শুধু দিনকয়েকের জন্যে এখানকার কুঠিটা তাকে দেখা-শোনা করতে হচ্ছে; মাস ছয়েক বাদেই লণ্ডন থেকে বাপ তার প্যাসেজ পাঠিয়ে দেবে। তখন এখানকার সব কিছু বিক্রি-বাটা করে সে আর মার্থা জাহাজে গিয়ে উঠবে—তারপরে হোম। হ্যাপি ইংল্যাণ্ড।

কিন্তু ষোল বছর অপেক্ষা করেও যে প্যাসেজ আজও পায়নি ক্রু সাহেব, মাত্র সাত বছরেই তা কোথা থেকে পাবে মার্থা? ক্রু সাহেবের তবু আশা করবার অভ্যাস যায়নি, কিন্তু রূঢ় স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে মার্থার। কখনো কখনো সন্দেহ হয় মার্থা বুঝি তাকে ঘৃণা করে।

আপাতত ও সব ভেবে আর লাভ নেই। মার্থার সমস্যাটা এই মুহূর্তে এত জরুরী নয়। এখন প্রায় শিরে সংক্রান্তি অ্যালবার্ট আসবে। সর্বাগ্রে এক্ষুনি একবার কুমার ভৈরবনারায়ণের ওখানে যাওয়া দরকার।

সাত

পুরনো সাইকেলটায় চড়ে ক্রু সাহেব যখন জমিদার বাড়িতে পৌঁছুল, তখন সেখানে একটা হৈ-চৈ চলছিল। পুলিস। জটাধর সিংয়ের লাশটা আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখন এনকোয়ারী।

দারোগা আসীন আছেন। কনস্টেবল দুজন এমন ভঙ্গিতে লাঠি হাতে দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে যে আচমকা দেখলে কেমন খটকা লাগে। মাথার লাল পাগড়ি দুটো উঁচু হয়ে আছে একজোড়া গিন্নী শকুনের গলার মতো; আর খাকী ইউনিফর্মের সঙ্গে একজোড়া গোঁফ, রক্তাভ চোখ, আর সতর্ক বসবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন দারোগা ফাঁসির হুকুম দেবেন এইবার।

দারোগার কাছ থেকে একটা ভদ্ররকম দূরত্ব বাঁচিয়ে কুমার ভৈরবনারায়ণ। রক্তাক্ত শিরায় আকীর্ণ মোটা নাকটাকে কেমন ঘৃণাভরে কুঞ্চিত করে আছেন তিনি।

ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল, এল. এম. এফ.—ব্র্যাকেটে পি. দাঁড়িয়ে আছেন থতমত ভঙ্গিতে। তার কারণ আছে। নিজের বিদ্যের পরিচয় জাহির করতে গিয়ে বলেছিলেন,

গ্রিভাস হার্ট, স্কাল ফ্রাকচার হয়ে ব্রেইনে—কিন্তু কয়ে তাঁকে এক ধমক লাগিয়েছেন তলাপাত্র।

—থামুন মশাই, আর ওস্তাদী ফলাবেন না। আছেন ভেটিরিনারী সার্জন, তাই থাকুন। নাক গলাতে যাবেন না পুলিসের ব্যাপারে।

—ভেটিরিনারী সার্জন!—সবাই মনে করেছেন একটা চমৎকার রসিকতা, হো হো করে হেসে উঠেছেন স্বয়ং কুমার ভৈরবনারায়ণ পর্যন্ত। কিন্তু হাসতে পারেননি পান্নালাল নিজে। গত সপ্তাহে দারোগাকে তিন পুরিয়া সিডলিজ পাউডার দিয়ে দু টাকা দাম নিয়েছিলেন, তারই শোধ তুলেছেন তারণ তলাপাত্র।

পোস্ট-মাস্টার বিভুপদ হাজরা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন ভৈববনারায়ণের পেছনে। তুরীদের পঞ্চায়েতের প্রসঙ্গ তুলে ধমক খেয়েছিলেন কুমার বাহাদুরের কাছে, স্বযোগ-স্ববিধে পেলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন। আর একটু দূরেই কাছারির সিঁড়ির ওপর নিঃসঙ্গ রঞ্জন বসে আছে দার্শনিকের মতো। মনটা এইমাত্র পরিক্রমা করে এসেছে আদিগন্ত মাঠ; সেখানে টিলার ওপর আহীরদের বস্তি, নিমগাছের ছায়া, যমুনা আহীরের অগ্নিগর্ভ চোখ আর—আর ঝুমরি। নাগিনী? না—ঠিক বলা হল না। নতুন ইন্দ্রপ্রস্থের নতুন পাঞ্চালী। দাবদগ্ধ বরিন্দের মাঠে ছড়িয়ে গেছে তার ক্রোধদাহ—জটাধর সিং আগামী কুরু-প্রান্তরের প্রথম বলি।

দারোগা বাইবেলের সলোমনের মতো ডান হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। হাতে অবশ্য ন্যায়দণ্ড নেই, আছে একটা কপিয়িং পেনসিল। সেইটে দিয়ে সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট লিখছেন, অন্যমনস্কভাবে সামনের দুটো দাঁতও খুঁটছেন এক টুকরো আলুর খোসার সন্ধানে। তারপর বিরক্ত ভাবে যখন মুখ খিঁচোলেন, তখন একটা বেগুনী রঙের দন্তরুচি বিচিত্রভাবে প্রকট হয়ে পড়ল।

পঞ্চমবার তারণ তলাপাত্র জানতে চাইলেন, তাহলে খুনটা করল কে?

ভেটিরিনারী সার্জন ওত পেতেই প্রতীক্ষা করছিলেন যেন। খপ করে বলে বসলেন, সেটা জানবার জন্যেই তো আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে মশাই।

দারোগা চোখ পাকিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অকুস্থলে ঢুকলেন ক্রু সাহেব।

টু প্লাস টু—ইকোয়্যাল টু ফোর। স্যুট এবং সাইকেল—ইকোয়্যাল টু—ডি.এ.পি.-টি.এস.পি. নয় তো? দারোগা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চাপ সরে যাওয়া স্প্রিংয়ের মতো। কনস্টেবলদের জুতোয় খটাস করে আওয়াজ উঠল প্যারেডের 'আ-টিনশন' ভঙ্গিতে।

কোঁচকানো নাকটাকে প্রসন্ন হাসিতে বিস্তৃত করে দিয়ে ভৈরবনারায়ণ বললেন,

ঘাবড়াবেন না, ক্রু সাহেব।

—ক্রু সাহেব? সে আবার কে?—দারোগার স্বর শঙ্কিত: কোনো অফিসার-টফিসার নয় তো?

—না, না, সে সব কিছু না, বাজে লোক—বিভুপদ ভৈরবনারায়ণের বক্তব্যটা ব্যাখ্যা করে দিলেন।

—অঃ, বাজে লোক! —সলোমন আবার সিংহাসন গ্রহণ করলেন। নিজের বোকামির প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই যেন কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ক্রু সাহেবের দিকে।

দেউড়ির পাশে সাইকেলটাকে নামিয়ে রেখে তখন স্মাইদ্ ক্যারু কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। একবার সশঙ্ক চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল।

ভৈরবনারায়ণ ডাকলেন, এস সাহেব, এস—

ক্যারু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল: এসব কি কাণ্ড?

ভৈরবনারায়ণ বললেন, খুন। আমার পাইক জটাধর সিং খুন হয়েছে।

—খু-ন!—ক্রু সাহেবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল একবার, বিবর্ণ হয়ে গেল সমস্ত মুখ। মুহূর্তের জন্যে ঘোলাটে চোখের সামনে সব কিছু চলন্ত ইঞ্জিনের চাকার মতো পাক খেল একটা। তারপর আস্তে আস্তে ঘরবাড়িগুলো স্বাভাবিক হয়ে যখন যথাস্থানে ফিরে এল, তখন:

···জলে ধুয়ে যাওয়া একটা ছবি। কাঁদড়ের কাদার তলে সবটা চলে গিয়েছিল. শুধু একজোড়া পা কিছুতেই ঢাকা পড়েনি। অনেক কাদা আর মাটির চাঙাড় চাপাতে হয়েছিল তার ওপর। তারপর—

—বস, বস সাহেব। অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?

সারা শরীরে মস্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন চৈতন্য ফিরে এল। ও কিছু না। কাঁদড়ের কাদার তলায় একটা বাদামী কঙ্কাল ছাড়া কিছু আর পাওয়া যাবে না এখন। তাও কি কোনো বর্ষার উচ্ছ্বাস এতদিনে টেনে নিয়ে যায়নি মহানন্দার গর্ভে, মহানন্দা থেকে মহাসমুদ্রের অতল লুপ্তিতে?

ক্রু সাহেব বসে পড়ল। কোথায় বসল জানে না। ঠিক পেছনে একটা চেয়ার না থাকলে হয়ত ধরাশায়ীই হতে হত তাকে।

স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরালেন দারোগা। তাকালেন ভৈরবনারায়ণের দিকে।

—ইনি কে?

—ক্রু সাহেব। এর বাপের রেশমের কুঠি ছিল। এখন আর ব্যবসা নেই—তালুকদারী করেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে নামটা—দারোগা একটা মুখভঙ্গি করলেন। ক্রু সাহেব বসে রইল চুপ করে।

আরো দেড় ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্ন করবার পরে তলাপাত্র উঠলেন। কাপ তিনেক চা, রাশীকৃত খাবার, আর তিনটে ডাব খাওয়ার প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে ঢেকুর তুলে বললেন, হুঁ. সোজা কেস। ওই আহীরগুলোরই কাণ্ড। কয়েকটাকে ধরে থানায় নিয়ে গেলেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে।

—আপনার ওদের ঠিক চেনা নেই—খোঁচা দেবার লোভটা সামলাতে পারলেন না পান্নালাল।

—বারো বচ্ছর ক্রিমিন্যাল ঘেঁটে তবে এস. আই. হয়েছি মশাই, গোরু-ঘোড়া ইঞ্জেকশন দিয়ে নয়!—পাল্টা জবাব দিলেন তারণ: কোনো চিন্তামণিকেই চিনতে বাকি নেই আমার। বসে বসে দাদের মলম তৈরি করুন, আমার জন্যে মাথা ঘামাবেন না।

দারোগা বিদায় নিলেন।

মর্মান্তিক অপমানে গর্জাতে গর্জাতে উঠে পড়লেন পান্নালাল। আচ্ছা, আচ্ছা, এক মাঘেই শীত যাবে না। অসুখ-বিসুখের সময় একবার ডেকে পাঠালেই হয়। এমন ওষুধ প্রেসক্রিপশন করবেন যে আজীবন তা মনে থাকবে দারোগার। এবার আর 'সিডলিজ পাউডার' নয়—পাকা ব্যবস্থাই করে দেবেন।

বিভুপদকেও উঠতে হল—তাঁর ডাক খোলবার সময় হয়েছে। ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল একটু একটু করে। ভৈরবনারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ক্রু সাহেব একবার নড়েচড়ে বসল, আর রঞ্জন কাছারির সিঁড়িতে বসে দার্শনিকের নিরাসক্তি নিয়ে একটার পর একটা লবঙ্গ চিবিয়ে চলল।

—তারপর, কী মনে করে ক্রু সাহেব?—ভৈরবনারায়ণ কী একটা ভাবছিলেন। সেই চিন্তার রেশ টেনে, কপালে গোটাকয়েক ভ্রূকুটি জাগিয়ে রেখেই ছড়িয়ে দিলেন প্রশ্নটা।

—নাঃ, কিছু না।—যা বলতে এসেছিল, বলতে পারল না স্যাইদ্ ক্যারু। সবকিছুর বিপর্যয় হয়ে গেছে মনের মধ্যে। অ্যালবার্টের ভয় নেই, সম্মানের ভয় নেই, মার্থার ভয়ও নেই। সব ভয় হারিয়ে গেছে একটা সীমাহীন ভয়ের অতলতায়। কাঁদড়ের কাদার তলা থেকে বেরিয়ে আছে দুটো পা। বাকি শরীরটাকে দেখা যাচ্ছে না—শুধু মৃত্যুযন্ত্রণায় কুঞ্চিত একরাশ হুকের মতো বাঁকাবাঁকা আঙুলগুলিকে কী বীভৎস, কী ভয়ঙ্করই মনে হয়েছিল।

অনেক 'রাজবল্লভ' বর্ষার দিন ঘন নীল মেঘের কজ্জলিত ছায়া ফেলেছে লাল মাটির শিলীভূত রক্তসমুদ্রে; মাটি কেটে কেটে বয়ে গেছে খর-খড়্গের মতো ধারালো জলপ্রবাহ। শুধু মাটিই কাটেনি, কেটেছে মাটির অনেক পঞ্জরাস্থিকেও। আর একটা মাত্র মানুষের কঙ্কাল। বিবর্ণ বাদামী রঙের মাত্র কয়েক টুকরো হাড়ে আজও কি

কোনো স্মারক অবশিষ্ট আছে তার ?

—এমনিই দেখাশোনা করতে এসেছিলে তাহলে ?—আর একটি অর্ধমনস্ক প্রশ্ন ভৈরবনারায়ণের।

—অনেকটা তাই।—একটা ঢোক গিলল ক্রু সাহেব।

—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ?

—নাঃ।

—তোমার প্রজা-পত্তন ঠিক আছে সব ?

—এখনো আছে বলেই তো মনে হয়—সহজ হবার চেষ্টা করতে লাগল ক্রু সাহেব।

—এখনো আছে বটে। কিন্তু বেশি দিন থাকবে তো ?—আত্মজিজ্ঞাসার মতো করেই প্রশ্নটা নিক্ষেপ করলেন ভৈরবনারায়ণ।

—কেন বলছেন এ কথা ?

—সাধে কি আর বলছি !—ভৈরবনারায়ণের গরুর মতো প্রকাণ্ড মুখে যুদ্ধে-আহত ষাঁড়ের মতো একটা বীভৎস কাতরতা ফুটে বেরুল : চারদিকে আগুন জ্বলবার জো হয়েছে সাহেব। এইবেলা ঘর সামলাও, নইলে পরে আর সময় পাবে না।

—আপনারা যখন আছেন, তখন আমাদের আর ভাবনা কী!—ক্রু সাহেবের গলায় একটা চাটুকারিতার আমেজ ফুটে বেরুল : তা ছাড়া বড় গাছেই ঝড় লাগে। আমরা চুনোপুঁটি, আমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই।

—তাই কি ?—ভৈরবনারায়ণ হঠাৎ যেন অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠলেন। একবার আড়চোখে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লবঙ্গ মুখে সে তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

—আপনার কি মনে হয় ? —ক্রু সাহেব জানতে চাইল।

—মনে হয়, সময়টা পাল্‌টে গেছে। আজকাল আর বড় দিয়ে আরম্ভ হয় না। কচু গাছ দিয়ে লোক হাত পাকাতে শুরু করে, তারপর কুড়ুল বসাতে আসে শাল-গাছের গায়ে।

—ঠিক বুঝলাম না কথাটা।

—আরো কি স্পষ্ট করে বলতে হবে ?—আবার রঞ্জনের দিকে আড়চোখে তাকালেন ভৈরবনারায়ণ : আজ জটাধর সিংয়ের মাথায় চোট পড়েছে। কিন্তু ওটা শুধু আরম্ভ—ওর লক্ষ্য আমার মাথা পর্যন্ত।

—এসব কথা কেন আপনি ভাবছেন ?—ক্রু সাহেব কুমার বাহাদুরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল : জমিদারের পাইক-পেয়াদা কখনো কি খুন হয়নি ?

—হয়েছে বই কি। কিন্তু আজকের ব্যাপার তা নয়। আজকাল তুরীদের পঞ্চায়েৎ

বসছে কালাপুখরীতে। জয়গড় মহালের প্রজারা বড় বেশি চড়া কথা বলতে শুরু করেছে।

—আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ?

—ভয় ?—আহত ষাঁড়ের মুখে ক্ষুধার্ত সিংহের হিংস্রতা ফুটে বেরুল : আমার পূর্ব-পুরুষ দিনাজপুরের মহারাজার পক্ষ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল কান্তনগরের যুদ্ধে। ভয় আমাদের রক্তে নেই। লাঠির জোরে আমাদের জমিদারী, লাঠির জোরেই তা রাখব। তবে ঘর-শত্রু বিভীষণ যদি কেউ থাকে, তার ব্যবস্থাটা করতে হবে সকলের আগে।

গলাটা একটু চড়িয়েই শেষ কথাগুলো বললেন কুমার সাহেব, স্পষ্ট শুনতে পেল রঞ্জন। দুটো দাঁতের পাটির মধ্যে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়াল লবঙ্গটা।

ক্রু সাহেব বিচলিত হয়ে বললে, আপনার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝবে পরে। এখন একটা কথা মনে রেখো। একটু একটু করে যারা কাজ শুরু করেছে, তারা ছোটদের দিকেই আগে নজর দেবে। হয়ত আমার আগেই এসে পড়বে তোমার পালা।

—ভেবে দেখব—ক্রু সাহেব উঠে পড়ল।

—চললে ?

—হ্যাঁ, একটু কাজ আছে। কাল পরশু আসব।

অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল ক্রু সাহেব। ক্লান্ত শিথিল ভঙ্গিতে তুলে নিলে পড়ে থাকা সাইকেলটা। না, অ্যালবার্টের কথা সে ভাবছে না। জটাধর সিংয়ের মৃত্যু যে ঝড়ের পূর্বাভাস বয়ে এনেছে তার কথাও না। শুধু সেই জলে-ধুয়ে-যাওয়া ছবিটা। বাদামী হাড়গুলোকে এখনো কি কেটে কেটে নিঃশেষ করতে পারে নি সময়ের ঘুণেরা ?

—ঠাকুর বাবু ?

রঞ্জন চমকে উঠল। কুমার বাহাদুর ডাকছেন।

—মনটা ভারি চঞ্চল হয়ে রয়েছে। চলুন, একটু পড়বেন।

আশ্চর্য কোমল গলার স্বর। প্রীতি আর দাক্ষিণ্যে স্নিগ্ধ। অপূর্ব অভিনয় করতে পারেন কুমার বাহাদুর; অমায়িক করুণায় মধুর হাসি হাসতে পারেন ছুরিতে শান দিতে দিতে।

—গীতা।—নিজের গলার স্বরে বিস্ময়ের চমকটা সে চেষ্টা করেও রোধ করতে পারল না।

—হ্যাঁ, বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ। কী যেন সেই : 'পশ্যামিদেবস্তবদেবদেহে'—

—চলুন—

অনুগত বিনয়ে উঠে দাঁড়াল রঞ্জন।

সন্ধ্যা।

গীতাপাঠ শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বরূপ-দর্শন যোগের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে কখন আফিঙের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন কুমারবাহাদুর। দুজন চাকর এসে প্রাণপণে দলাই-মলাই শুরু করেছে তাঁর হাত-পা। আর সেই ফাঁকে গীতা নামিয়ে রেখে উঠে পড়েছে রঞ্জন।

নিজের ঘরে এসে আলো জেলে দেখল টেবিলের ওপর একটা চিঠি। মিতার চিঠি। ভালোবাসার সেই প্রথম পর্বের মতো আজ আর নীল খামে চিঠি লেখে না মিতা। পৃথিবীর মাটিটা বড় বেশি ধুলোয় আজ আকীর্ণ, তাই অম্লান আকাশের নীল আর চোখে পড়বার উপায় নেই। সেই নীলকে আবার খুঁজে পাবার জন্যেই তো এই ধুলোর ঝড়ের মধ্য দিয়ে পথ চলা; শান্তি আর পরিতৃপ্তির শয্যাতে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখবার জন্যেই তো আজকের এই বিহ্বল জড়তা-ভঙ্গের দাবি।

নীল খাম নেই, তবু ছেলেমানুষি অভ্যাসটা আজও যায়নি মিতার। সেই কোণাকুণি করে ঠিকানা লেখবার একটা বিচিত্র ভঙ্গি। কৈশোরের স্বপ্নরঙ্গিণী সংঘমিত্রা—মিতা। আজ সে মিতাই বটে। তার এই কর্মক্ষেত্রের নতুন উদ্দীপনা।

চিঠিটা খুলল। ঝুঁকে পড়ল তার ওপর :

'শোনো। প্রথমেই কাজের খবর দিই।

মুকুলদা তোমার চিঠি পেয়েছেন। বললেন, লোক এখনো এত কম যে ওখানে যাবার তেমন সুবিধেমতো কাউকে পাঠাতে পারছেন না। তোমাকে ওখান থেকেই যতদূর সম্ভব তৈরি করে নিতে হবে। তবে দু-এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ত দাদাকে একবার পাঠানো যেতে পারে। দাদা গেলে কাজেরও সুবিধে হবে, তুমিও খুশী হবে নিশ্চয়। এ সম্বন্ধে পার্টিকুলারস উনি পরে তোমায় জানাবেন। তোমার সমিতির জন্য বইপত্রও দাদার সঙ্গে যাবে।

এবার তোমাকে একটা ইণ্টারেস্টিং ঘটনা বলি।

সেদিন সুতপাদি এসেছিলেন।

সুতপাদিকে নিশ্চয় ভোলনি। আর ভোলবার কথাও তো নয়। তোমার যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে আছে, তাতে সুতপাদিকে নিয়ে কত কথার জালই না তুমি বুনেছ! আমাদের নেতা বেণুদাকে তিনি ভালোবাসতেন, অথচ জীবনে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলেন না। সুতপাদির ঠাকুরদার একটা আজগুবী খেয়াল, তিনি নাকি ওঁকে গোপীবল্লভের পায়ে নিবেদন করে দিয়েছিলেন।

এ নিয়ে তুমি তো খুব রোমাণ্টিক গল্প লিখেছ। কিন্তু জীবন কি তাই? সেদিনকার বিপ্লববাদের ভেতরে যে রঙ ছিল, সেই রঙের সঙ্গেই একাকার হয়ে ছিল এই দুঃখ-বিলাস।

খুব মোটা হয়ে গেছেন আজকাল—আগেই লিখেছিলাম তোমায়। বড় বড় মোটরে

চড়ে প্রায়ই এখানে ওখানে সভা-সমিতির উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন। চেয়ারে বসলে বেশ মানায় কিন্তু ওঁকে। চমৎকার বক্তৃতাও দিতে শিখেছেন। অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে রাজনীতির এমন একটা সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন যে ওঁর ক্ষমতার ওপর আমার শ্রদ্ধা হল। সেদিন বৈদান্তিক সাম্যবাদের ওপর একটা বক্তৃতা করলেন 'আর্যরক্ষণ সভায়'। কাগজে করে অনেক সংস্কৃত শ্লোক টুকে এনেছিলেন।

ওসব কথা যাক। যা বলছিলাম। আমার কাছে এসেছিলেন কেন জানো? চমকে উঠো না, ওঁর নিজের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে।

হ্যাঁ—ওঁর নিজের বিয়ে। বয়েস তো কম হল না, কতদিন আর এমনকরে প্রতীক্ষায় কাল কাটাবে বেচারা? গোপীবল্লভের কথা ভাবছ? ও কিছু না। স্থতপাদি আজকাল শাস্ত্র পড়ছেন, কাজেই শাস্ত্রমতেই সব কিছুর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন। খুব সম্ভব, তুলসী পাতায় গোপীবল্লভের নাম লিখে ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীর জলে। তা ছাড়া শাস্ত্রমতে গোপীবল্লভের স্ত্রী-ভাগ্য তো নেহাৎ মন্দ নয়—ষোল-শ রয়েইছে, স্থতপাদিকে ছেড়ে দিলে খুব বেশি অস্থবিধে হবে না তাঁর।

কার সঙ্গে বিয়ে? সারদাবাবুর মেজ ছেলে রণদা চক্রবর্তীর সঙ্গে। রণদা চক্রবর্তী এখন এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, গত বছর স্ত্রী মারা যাওয়াতে ভারি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। স্থতপাদি তাঁকে সারা জীবনের মতো সান্ত্বনা দেবার পুণ্যব্রত গ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

আমাকে কিছু উপদেশও দিলেন। বললেন, কী হচ্ছে এসব পাগলামি? ওই সব ছোটলোক ক্ষেপিয়ে দেশ উদ্ধার হয় কোনোদিন? তা ছাড়া এ ভাবেই বা আছিস কেন? রঞ্জনকে আসতে বলে দে এবার, বিয়েটা সেরে নে। বারো বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা—এ তোদের যে কী প্রেম, আমি বুঝি না।

আমি বললাম—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বললাম:

'বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধু তীরে—'

কবিতা শুনে রাগ করে উঠে গেল। বললে, চুলোয় যা। কিন্তু বিয়েয় অবশ্য আসবি। আচ্ছা, সত্যিই কি আমাদের—'

চিঠির বাকিটুকু নিজের মনের কাছেও যেন লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। মিতা—তার সেই ছোট্ট মিতা আজ আর হরিণের সঙ্গে ছুটোছুটি করে না, তার সময় নেই। কিন্তু হরিণের মতো তার মনটি নিজের ভেতর থেকে কখন যে গাঢ় দুটি নীল চোখ

মেলে তাকায়, মিতা নিজেই কি তা জানতে পারে ?

—বাবু।

রঞ্জন হঠাৎ চমকে উঠল। জানলার বাইরে থেকে ডাক আসছে।

—বাবু।

মেয়েলী গলা। বাইরের অন্ধকার বাগানে কে একটি মেয়ে এল এমন সময়ে ?

—কে ?

যে ডাকছিল, সে এগিয়ে এল জানলার কাছে। লণ্ঠনের আলো পড়ল দুটি প্রাণবন্ত চোখের ওপর, একখানা কালো স্মিত মুখশ্রীকে উদ্ভাসিত করে।

কালোশশী।

—কিরে, তুই এই বাগানে ? এই অন্ধকারে ?

—তোকে খবর দিতে এলাম।

—তুই আবার কী খবর দিবি ? পরশুরাম এসেছে নাকি ?

—না—না। আজ রাতে ফের পঞ্চায়েৎ বসবে কালাপুখরীতে। তোকে যাবার কথা বললে সোনাই মণ্ডল।

—কিন্তু—অসীম বিস্ময়ে রঞ্জন বললে, এ খবর নিয়ে এলি কেমন করে ?

কালোশশী মুখ টিপে হাসল, জবাব দিলে না।

—তুই এলি কেন ?

—ওরা তো কেউ এ বাগানে ঢুকে এমন করে খবর দিতে পারত না।

—তা পারত না। কিন্তু তোর এমন সাহস হল কী করে ? যদি পাইক-পেয়াদারা তোকে এই বাগানে ঢুকতে দেখতে পেত, কী হত তখন ?

—আমার ঝাঁপিতে তাজা সাপ থাকে বাবু, তাজা তার বিষ—কালোশশী হাসল।

—তা বটে।

রঞ্জন আর কথা বলতে পারল না। তাজা সাপকে যে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে দিনের পর দিন মাতাল করে নাচাতে পারে, পৃথিবীর কোনো সাপকেই তার ভয় নেই। বিষকন্যা হয়ে যে জন্মেছে, কোনো বিষই তাকে দহন করতে পারে না কোনোদিন।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। তার আগেই অন্ধকারের ভেতর আরো অন্ধকার একটা ছায়ার মতো চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল কালোশশী।

আট

রাত্রে খেতে বসে আলিমুদ্দিন মাস্টার দেখলেন, বেশ বড় বড় পাকা মাছের টুকরো।

—এ মাছ কোথেকে এল?

—শাহ্ পাঠিয়ে দিয়েছে জনাব। ধাওয়ারা আজ বিল থেকে বড় বড় দুটো রুই ধরেছিল।—ভৃত্য জিব্রাইল ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিলে।

শাহ্ পাঠিয়েছে! সামান্য স্কুল-মাস্টারের ওপর ফতে শা পাঠানের কেন এই অযাচিত অনুগ্রহ? হঠাৎ যেন খুলে গেছে সৌভাগ্যের দরজা। দামী হয়ে উঠেছেন তিনি। মূল্য বেড়ে গেছে নিজের—আকস্মিক একটা স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

কারণটা খুঁজে পেতে দেরি হল মনের মধ্যে। শাহের বৈঠকখানায় সকালে সেই বক্তৃতার পুরস্কার এটা। 'পাকিস্তান হামারা'। মুসলমানের জন্য আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র—নতুন মাটিতে বিজয়ী ইসলামী ঝাণ্ডার নবজন্ম। খুশী হবার কারণ আছে বইকি ফতে শা পাঠানের। আবার হয়ত চোখের সামনে স্বপ্ন দেখছে নতুন কোনো শাহী আমলের। পাকিস্তান এলেই আবার গিয়ে চড়াও হবে তখত-এ-তাউসে, হাতে মাথা কাটতে পারবে হাজার হাজার মানুষের।

মাছের একটা টুকরো নাড়তে নাড়তে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন।

না, আর তা হতে দেওয়া যাবে না, আর ফিরে আসবে না সেই স্বর্ণযুগ। তিনি যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে শিকল খুলে যাবে সমস্ত মানুষের। সেখানে গরীবের বুকের রক্ত শুষে টাকার পাহাড়ে চড়ে বসতে পারবে না বখিলের দল, সেখানে কোর-বানীর মাংস সকলে ভাগ করে খাবে, নাদানেরা প্রার্থীর দু হাত ভরে জাকাত দেবে, খুলে দেবে এতিমখানা, বিলিয়ে দেবে সর্বস্ব। সেখানে ইমানদার মানুষ হজরতের মতো পিঠ পেতে দেবে প্রাপ্য কোড়ার হিসেব মিটিয়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু ফতে শা পাঠানেরা কি তাই চায়? জীবনের সমস্ত অসত্য—শোষণ, মিথ্যা, অন্যায়—সব না-পাক্‌কে বর্জন করে এরা কি কামনা করে সেই সত্যিকারের পাকিস্তান?

যদি না চায়, তবে এদের সঙ্গেই আবার শুরু হবে নতুন করে লড়াইয়ের পালা। সে লড়াইয়ের জন্যে মন তৈরিই আছে আলিমুদ্দিন মাস্টারের। এতদিন ধরে সত্যাগ্রহের কঠিন দীক্ষা তো তাঁর ব্যর্থ হয়নি। কোনো অন্যায় সহ্য করব না, কোন ফাঁকি বরদাস্ত করব না। ইংরেজের কাছ থেকে দেশকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে তাকে ফের তুলে দেব না ফতে শা পাঠানের হাতে। শাহী আমলের মোহ আর নেই, প্রতিষ্ঠা করব দীন-দুনিয়ার মানুষের রাজত্ব।

জিব্রাইল আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

—খাচ্ছেন না মাস্টার সাহেব ? কি ভাবছেন ?

—হ্যাঁ, খাচ্ছি—ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়েই আবার একটি ছবি মনে এল। ঝাঁ ঝাঁ রোদ ঠিকরে পড়ছে বাদিয়াদের পাড়ায়। দাওয়ার ওপর অদ্ভুত বিষণ্ণ ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে বসে আছে এলাহী।

: মেয়েটার গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে হুজুর।

: শাহের ওখানে বাঁদীর কাজ করত, শাহ্‌কে ডাকত ধর্মবাপ বলে।

সাদা দাঁত বের করে কেমন বিশ্রী ভাবে হাসছে হোসেন। হাতের ধারালো হাসুয়াটা ঝকঝক করছে।

ধর্মবাপ! তাই বটে। হঠাৎ অসহ্য ঘৃণায় শরীরের মধ্যে মোচড় খেয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের। সানকিতে এই মাছের টুকরোগুলো যেন একটা কুৎসিত ব্যাধির জীবাণুতে আকীর্ণ। মৃত্যুযন্ত্রণায় মলিন একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল দৃষ্টির সামনে। যেন অভিশাপ দিচ্ছে, যেন একটা প্রলয়ের সূচনা আসছে ঘনিয়ে।

আলিমুদ্দিন মাস্টার উঠে পড়লেন।

—ও কি, খেলেন না ?—ক্ষুব্ধ গলায় জানতে চাইল জিব্রাইল।

—না, খেতে পারছি না।—সংক্ষেপে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

—শরীর খারাপ ?

—না, না, সে সব কিছু না।—মুখ ধুতে ধুতে আলিমুদ্দিন আবার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

—কিন্তু মাছটা বড্ড ভালো ছিল জী।—জিব্রাইলের স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ পেল : তবে কি রসুই ভালো হয়নি ?

—না, না, খুব চমৎকার হয়েছে। আমি এমনিই খেতে পারছি না—খড়মের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, তবু শুতে ইচ্ছে করল না। ঘরের মধ্যে কেমন একটা গুমোট গরম একরাশ তপ্ত বাষ্পের মতো জড়ো হয়ে আছে, শুলেও ঘুম আসবে না। তার চাইতে বারান্দার এই তক্তাপোশটাতেই বসা যাক।

বেশ নির্জন জায়গায় বাসাটি। পেছনে একটা আমের বাগান ছাড়া বাকী দুদিকেই মাঠ। বাঁ পাশে একটু দূরেই একটা উঁচু ডাঙার ওপর দশ-বারোটা তাল গাছ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার তলা থেকে কুমীরা বিল শুরু। এই অন্ধকারেও চোখে পড়ল— বিলের একফালি চকচকে জলে তারার ঝাঁক দোল খাচ্ছে।

তক্তাপোশের ওপর ছেঁড়া শতরঞ্জিটায় শরীর এলিয়ে দিলেন আলিমুদ্দিন।

ঘরের ভেতর থেকে একটা কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে বেরিয়ে এল জিব্রাইল। খাটের তলা থেকে টেনে বের করলে গড়গড়াটা, কল্কে চাপাল তার মাথায়, তারপর নলটা

আলিমুদ্দিনের হাতে তুলে দিল।

—মাস্টার সাহেবের মন-মেজাজ কি ভালো নেই?

উদ্বিগ্ন উয়ে উঠেছে জিব্রাইল। ব্যাপারটা বুঝে নিতে চায় ভালো করে, জেনে নিতে চায় মাস্টার সাহেবের মানসিক অবস্থাটা।

—একথা কেন বলছ?—অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন আলিমুদ্দিন।

—না, তাই দেখছি—একটা চৌপাই টেনে নিয়ে সঠিক বুঝে নেবার জন্যে আসন নিয়েছে জিব্রাইল। বিদেশী মাস্টার সাহেবের দেখাশুনো করবার কর্তব্যটা এখানে যখন তারই, তখন সে দায়িত্বকে সে তো অবহেলা করতে পারে না।

—কী হয়েছে তাহলে? কারুর সঙ্গে কোনো রকম ঝগড়াঝাঁটি?

গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে খানিক ধোঁয়া ছেড়ে আলিমুদ্দিন বললেন, মিথ্যে ওসব ভাবছ জিব্রাইল, আমার কিছু হয়নি।

এইবার জিব্রাইল চুপ করল, আলিমুদ্দিনও চুপ করলেন। ধানকাটা মাঠের ওপর দিয়ে কালরাত্রির স্রোত তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলেছে। এই অন্ধকারেও পালনগরের বুরুজটা কালি দিয়ে মোছা একটা ছবির ঝাপসা ছাপের মতো দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণের কোণটায় যেখানে দু-তিনটি আলো দপ দপ করে উঠছে, ওইটেই বাদিয়াদের গ্রাম। ওইখানে এলাহী বক্সের মেয়ে বিষের যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছে।

কিন্তু শুধু কি ওখানেই? আরো কত—কত সংখ্যাতীত, কত দৃষ্টি আর মনের অগোচর, এমনি করে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে বিষ-যন্ত্রণায়। কে তাদের সন্ধান রাখে? আর —আর এদের বনিয়াদের ওপরেই কি গড়ে উঠতে পারে পাকিস্তান—গুলিস্তাঁ হামারা?

সামনে মাঠের পথ দিয়ে দুজন লোক চলছিল লণ্ঠন হাতে। এই চুপ করে বসে থাকার বিরক্তিটা কাটিয়ে ওঠবার জন্যই জিব্রাইল ডাকল: কে যায়?

—জলিল আর রসিদ ধাওয়া।—একজন উত্তর দিল। গলার স্বরটা জড়ানো।

জিব্রাইল বলল, দারু টেনে এসেছে ব্যাটারা।

—মদ?—আলিমুদ্দিন চকিত হয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ, খুব খায়।—জিব্রাইল ঘৃণাকুঞ্চিত মুখে বললে, গোপালপুরের হাটে মাছ বেচতে যায়, সেখান থেকে পেট ভরে টেনে আসে। গোপালপুরের সরকারী দোকানটাকে ওরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে।

—সে কি কথা! মুসলমানের বাচ্চা!—উত্তেজিত শিরাগুলো মুহূর্তে উদ্যত হয়ে উঠল: ডাকো, ডাকো তো ওদের। কী অন্যায়! এদিকে পেট পুরে দুমুঠো খেতে পায় না, অথচ মদের বেলায়—

—এই জলিল, এই রসিদ মিঞা—হাঁক দিলে জিব্রাইল।

—এখন চেঁচিয়ে মরছ কেন মিঞা ? মাছ নেই সঙ্গে—আবার জড়িত উত্তর এল দূর থেকে।

—শুনে যা ব্যাটারা। মাস্টার সাহেব ডাকছেন।

—কে ডাকছেন ?

—মাস্টার সাহেব, মাস্টার সাহেব। শিগ্‌গির আয় এদিকে—

লোক দুটো থামল। নিজেদের মধ্যে কী একটা আলোচনা করল চাপা গলায়। তারপর পেছন ফিরল। ধীরে ধীরে ভীরু পায়ে মাস্টারের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

—আদাব মাস্টার সাহেব!

—আদাব—

সংক্ষেপে প্রতি-অভিবাদন জানিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোক দুটোর দিকে তাকালেন আলিমুদ্দিন। হ্যাঁ, মুখ-চেনা মানুষ। মাছের বাঁক কাঁধে নিয়ে দ্রুতগতিতে এদের পথ দিয়ে চলে যেতে দেখেছেন বহুদিন। কিন্তু বিষণ্ন আলোয় এমন করে এদের মুখগুলিকে দেখবার সুযোগ আগে তাঁর কখনো ঘটেনি।

একজনের বয়েস হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাদা রঙ ধরেছে দাড়িতে। জটা-বাঁধা চুলগুলো লালচে; অতিরিক্ত জল ঘাঁটার স্বাক্ষর, অথচ চুলে কখনো তেল পড়েনি। কালিপড়া চোখের কোটরে বিষণ্ন নির্বাপিত দৃষ্টি। আর একজনের বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ হবে। মিশমিশে কালো রঙ—সারা গা ভর্তি থরথরে চুলকানি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লণ্ঠনের আলোয়—কেমন ঘিন ঘিন করে।

মাস্টারের সামনে লোক দুটো দাঁড়িয়ে রইল বিনীত ভঙ্গিতে। স্পষ্ট দেখা গেল, নেশায় তাদের পা টলছে। অসহ্য ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে উঠলেন মাস্টার।

—তোরা মুসলমান ?

—জী।—লোক দুটো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তাকিয়ে রইল অবোধের দৃষ্টিতে।

—মদ খাস ?—আলিমুদ্দিনের স্বর কঠোর হয়ে উঠল।

—জী।—তেমনি অসংকোচ উত্তর এল।

—জী !—অলিমুদ্দিন জ্বলে উঠলেন : বলতে সরম লাগল না ? মুসলমানের বাচ্চা হয়ে মদ খাস, গুনাহ্‌ হয় তা জানিস ?

নেশার ঝোঁকে তারা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। তারপর বয়স্ক লোকটা—জলিল—মাতালের হাসি হেসে জড়িত গলায় বললে, জী। কিন্তু সবাই খায়। থানার জমাদার সাহেব, শাহ্‌—

মুখের ওপর প্রবল একটা আঘাতের মতো এসে পড়ল কথাটা। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন আলিমুদ্দিন। এ প্রশ্নের এমন একটা উত্তর তিনি আশঙ্কাও করেননি।

একবারের জন্ম মনে হল, এ মানুষগুলোর অপরাধের বিচার করবার অধিকার সত্যি সত্যিই তাঁর আছে তো ?

কিন্তু অবস্থাটাকে সহজ করে দিলে জিব্রাইল।

কষে একটা ধমক দিলে সে।

—মুখ সামলে কথা বল বেয়াকুবের দল। জমাদার সাহেব আর শাহু কি করে, সে খোঁজে তোদের দরকার কি ?

জলিল একটু বিনীত হাসি হাসল : জী, সে তো ঠিক। তবে মাস্টার সাহেব জানতে চাইলেন, তাই বললাম।

গড়গড়ায় আর একটা টান দিয়ে নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে নিলেন আলিমুদ্দিন। বললেন, মদ খাস কিসের জন্তে ?

—সারাদিন হাড়ভাঙা মেহনৎ করে তবে খাব কি জনাব ?—পাল্টা প্রশ্ন এল রসিদের তরফ থেকে।

—কি খাব জনাব ?—জিব্রাইল দাত খিঁচিয়ে উঠল : বলতে লজ্জা করে না ? এদিকে পেটে ভাত নেই, ঘরের চালে খড় নেই, ওদিকে রোজগার সব ঢালা হচ্ছে গোপালপুরের আবগারী দোকানে ! কেন, ওই পয়সা দিয়ে কিনতে পারিস না ভাত-কাপড়, ছাউনি দিতে পারিস না ঘরের চালে ?

—ঘরের চাল !

হঠাৎ লোক দুটো সমস্বরে হাহাকরে হেসে উঠল। অদ্ভুত ভয়ঙ্করভাবে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে লহরে লহরে বয়ে গেল সে হাসির শব্দ; ভয়ানকভাবে চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, গড়গড়ার নলটা খসে পড়ল হাত থেকে। না—এ মাতালের হাসি নয়। একটা বুকফাটা কান্না যেন হাহাকার করে বেরিয়ে এল খানিকটা অট্টহাসির ছদ্মবেশে।

—কী, অমন করে হাসছিস যে ?

তীব্র গলায় আবার একটা ধমক দিতে চেষ্টা করল জিব্রাইল। কিন্তু সে হাসিতে এবার আর তারা দমে গেল না, আবার খানিকটা ক্ষ্যাপার মতো প্রচণ্ড হাসি তরঙ্গিত হয়ে বয়ে গেল অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে।

—ঘর ! ঘর বেঁধে কি হবে ? আজ আছি, কালই চালা কেটে তুলে দেবে শাহু। কি হবে ঘর দিয়ে ?

—চুপ !—বজ্রকণ্ঠে বললে জিব্রাইল।

—চুপ করেই তো আছি মিঞা। আমাদের তো জবান বন্ধ হয়েই আছে। শুধোলে, তাই জবাব দিলাম।

খানিকক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে লোক দুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন। আস্তে আস্তে বললেন, চুপ কর জিব্রাইল। যা বলবার আমি বলছি।

চোখ পাকিয়ে জিব্রাইল বললে, না সাহেব, বড্ড বাড় বেড়েছে লোকগুলোর। শাহুর নামে যা খুশি তাই বলে বেড়াচ্ছে। একবার যদি কানে যায়—

কিন্তু মদের নেশায় ভয়ডর কেটে গেছে লোকগুলোর—মনের ওপর থেকে সরে গেছে আশঙ্কা আর আতঙ্কের সূক্ষ্ম আবরণটা। জীবনে পিছু হটতে হটতে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে আর সরবার উপায় নেই। এবার হয় সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, নইলে হারিয়ে যাবে অতল একটা খাদের ভেতরে।

—মুর্দাকে আবার গোরের ভয়!—তিক্ত কণ্ঠে বললে রসিদ।

জলিল সেই কথাটারই জের টানল: কানে গেলে কি করবে শাহু? ঘর তুলে দেবে, এই তো? তাতে আর কি হবে? বানের পানিতে ভাসতে ভাসতে এসেছি, ভাসতে ভাসতেই চলে যাব। আর মিথ্যে ভয় দেখিয়ো না মিঞা। ব্যাগার খেটে গায়ের রক্ত জল করে দিলাম, জুতোর ঘা খেয়ে পিঠে আর জায়গা নেই কোথাও। কাকে ভয় করব দুনিয়ায়?

—ওই জন্যেই তো দারু খাই। নইলে বাঁচব কি করে?

আলিমুদ্দিন তেমনি তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে, কিছুক্ষণ যেন জিব্রাইলও একটা কথা বলবার মতো খুঁজে পেল না। ভয়ের শেষ সীমান্তে এসে যে মানুষ নির্ভয় হয়ে গেছে, কেমন করে দমিত করা যাবে তাকে? কোন উপায়ে তাকে বশীভূত করা সম্ভব?

আলিমুদ্দিন নিজেকে সংহত করে নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, তবু তো তোরা মুসলমান। মুসলমানের কি মদ খেতে আছে?

—আমরা কি মুসলমান?—তেমনি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল জলিল। লোকটার নেশা কি কেটে গেল নাকি?

—কি বলছিস উল্লুক?—জিব্রাইল নিজেকে সামলাতে পারল না।

—সত্যি কথা শুনলে তোমাদের তো ভালো লাগে না মিঞা। কান কটকট করে। আমরা মুসলমান! তাহলে মসজিদে আমরা ঢুকতে পাই না কেন? কেন নামাজের সময় আমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়?

—সে কি!—আলিমুদ্দিন চমকে উঠলেন।

—ইমাম সাহেব আমাদের দেখলে কেন মুখ ফিরিয়ে চলে যান?—আবার প্রশ্ন করল জলিল।

—কী বলছে এরা? এও কি সম্ভব? এ জিনিস আছে নাকি ইসলামের মধ্যে?—

সীমাহীন বিস্ময়ে কলের পুতুলের মতো যেন কথাগুলো আবৃত্তি করলেন আলিমুদ্দিন, বিস্ফারিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন জিব্রাইলের দিকে।

অপরাধীর মতো নতনেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জিব্রাইল। তারপর বললে, এরা যে ধাওয়া।

—তাতে কী?

—এরা মাছ ধরে।

—বেশ তো।

মাটিতে একবার থুথু ফেলে জিব্রাইল বললে, কাছিমও ধরে। হারাম।

—তাতে এমন কী অপরাধ হল?

—অপরাধ হল না? তোবা তোবা। আপনি বলছেন কি মাস্টার সাহেব?

রসিদ জ্বলে উঠল হঠাৎ।

—মাছ ধরব না, কাছিম ধরব না, তবে খাব কি? তোমরা খেতে দেবে? সে বেলায় তো কোনো চাচার দেখা নেই।

জিব্রাইল বলল, এই—খবরদার!

—না, না, তুমি থাম।—ক্লান্ত অবসন্ন গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, ব্যাপারটা আমাকে একবার ভালো করে সব বুঝে নিতে দাও। সত্যিই কি এদের মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হয় না?

—না।

—হিন্দুদের ছোটজাতের মতো মুসলমান হয়েও এরা অস্পৃশ্য?

—ঠিক তা নয়, তবে—জিব্রাইল দ্বিধা করতে লাগল: তবে, ভেবে দেখতে গেলে অনেকটা তাই দাঁড়ায় বটে। তবে আমাদের আর দোষ কি বলুন, মোল্লাদের ফতোয়া তো মানতেই হবে।

—হ্যাঁ, মোল্লা সাহেবদের ফতোয়া!—রসিদ আবার বিকৃত মুখে বললে, হুকুম দিতে কোনো খরচা নেই। কিন্তু সব মিঞাকেই চিনি। আমাদের জবান দেখলেও তো গুণাহ্ হয়, কিন্তু আমাদের ধরা মাছ তরিবত করে জবানে তুলতে একটুও তো গুণাহ্ হয় না পীর সাহেবদের।

জিব্রাইল কি একটা বলবার জন্ত উদ্যত হয়ে উঠছিল। আলিমুদ্দিন বললেন, থাম। সব আমায় ভালো করে শুনে নিতে দাও। বল রসিদ, আর কি বলবার আছে তোমাদের?

—কি আবার বলব! রসিদের মুখ আরও বিকৃত হয়ে উঠল: বললেই বা কে শুনতে যাচ্ছে আমাদের কথা? আমরা মানুষ নই, মুসলমানও নই, আমরা জানোয়ার। তাই

মরলে পরে সকলের সঙ্গে আল্লাতলীতে আমাদের জায়গা হয় না—আমাদের মুর্দাকে গোর দিতে হয় ভাগাড়ে। গরু-ঘোড়ার মতো আমরা বাঁচি, তাই মরবার পরেও গরু-ঘোড়া ছাড়া আমাদের আর ঠাঁই কোথায়?

—ইয়া আল্লা!—আলিমুদ্দিন মাস্টার স্তব্ধ হয়ে রইলেন: এমন তো কথনো শুনিনি।

—শুনে লাভ কি মাস্টার সাহেব? বেফয়দা সময় নষ্ট হবে।

—হুঁ!—আলিমুদ্দিন চুপ করে রইলেন। দুপুর থেকে পর পর এই দুটো ঘটনা যেন মনের মধ্যে মেঘের মতো এসে ছায়া ফেলেছে। ম্লান করে দিয়েছে উদ্দীপ্ত উৎসাহটাকে—একটা কুয়াশার অস্বচ্ছ আড়াল টেনে নিষ্প্রভ আর বিবর্ণ করে দিচ্ছে পাকিস্তানের উজ্জ্বল স্বপ্নছবিকে। সারা দীন-দুনিয়ার মানুষের যে আজাদ-পৃথিবীর ধ্যান তিনি করে এসেছেন এতকাল, এ কি তারই ভিত্তি? নাকি এ কোনো চোরাবালির বনিয়াদ, যার ওপরে এক মুহূর্তও ভর সইবে না?

—আচ্ছা, আমিই এসবের ব্যবস্থা করছি—একটা নিশ্চিন্ত প্রতিজ্ঞার মতোই যেন স্বগতোক্তি করলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার: এ চলবে না, কোনো মতেই না।

রসিদ ধাওয়া বললে, এবার আমরা চলি মাস্টার সাহেব। রাত হয়ে গেছে।

—একটু দাঁড়াও।—নিবে-যাওয়া গড়গড়ায় ব্যর্থ একটা টান দিয়ে নলটা নামালেন আলিমুদ্দিন: আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। ইস্কুলে পাঠাও তোমাদের চ্যাংড়াদের?

—ইস্কুলে! কি হবে?

—কেন, লেখাপড়া শিখবে। মানুষ হবে।

—খরচ কোত্থেকে আসবে জনাব?

—সে ব্যবস্থা আমি করব—মুঠোর মধ্যে আকস্মিকভাবে যেন অবলম্বন করবার মতো কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন আলিমুদ্দিন: ওদের বিনা পয়সায় পড়বার ব্যবস্থা করে দেব।

—কি হবে সময় নষ্ট করে?—একটা নিরুত্তাপ অবজ্ঞা ফুটে বেরুল জলিলের গলায়: তার চেয়ে তখন বিলে মাছ ধরলে কাজ দেবে।

—না, তা হবে না।—আলিমুদ্দিন কঠিন হয়ে উঠলেন: আমি বলছি। কাল সকালে ধাওয়া-পাড়ার সমস্ত ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে দেবে।

—না সাহেব, সে মেহেরবানিতে আর দরকার নেই। আর আমরা মাছ ব্যাগার দিতে পারব না।

—মাছ ব্যাগার! কে চাইছে?

—বাঃ, চিরকাল তাই তো হয়ে আসছে। বিনা উপকারেই ব্যাগার দিতে দিতে জান বেরিয়ে গেল, উপকার করলে আর রক্ষা আছে?

—বলছে কি, জিব্রাইল?—আলিমুদ্দিন অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন জিব্রাইলের দিকে: এদের মাছও কি এই ভাবে নিয়ে নেওয়া হয় নাকি?

জিব্রাইল অগ্নিবর্ষী চোখে লোকগুলোকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইল: না জনাব, সব কথা বড্ড বাড়িয়ে বলছে এরা। খাজনা তো ঠেকায় বছরে দু-চার গণ্ডা পয়সা, কিছু দেবে না তার বদলে? তোলা দেবে না জমিদারকে, থানার দারোগাকে?

—তোলা!—জলিল দপ করে উঠল: ওকে তোলা বলে! আমাদের মুখের গরাস, পেটের ভাত কেড়ে নেওয়াকে তোলা বলে? এই তো হানিফের বড় ব্যাটাটা মর-মর, সরকারী দাওয়াখানার ডাক্তার সাহেব বললে, শহর থেকে ভালো ওষুধ না আনলে বাঁচানো যাবে না! আজ হানিফের জালে যখন এই বড় বড় দুটো রুই মাছ পড়ল, তখন বেচারা ভাবল, বাজারে গেলে অন্তত দুগণ্ডা টাকা পাবে। কিন্তু পেল কিছু? শাহের পাইক এসে মাছ দুটোই তুলে নিয়ে গেল। আল্লার নাম নিয়ে পায়ে ধরে কাঁদল হানিফ, রোগা ব্যাটাটার দোহাই দিলে, লাথি মেরে মাছ কেড়ে নিয়ে গেল। এর নাম তোলা?

অসহ্য ক্রোধে জিব্রাইল হতবাক হয়ে রইল।

—মরবার পাখনা উঠেছে। এইবার জাহান্নামে যাবি।

—জাহান্নামে মোল্লারা তো আগেই পাঠিয়েছে। নতুন করে আর ভয় কি?—চটাং করে জবাব দিলে রসিদ। তারপর জলিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, চল চাচা, রাত হয়ে গেল।

—হাঁ চল। আচ্ছা মাস্টার সাহেব, আদাব।

কিন্তু মাস্টার সাহেব সেই যে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিলেন, একটা প্রত্যভিবাদন পর্যন্ত তিনি জানাতে পারলেন না। তীব্রতম আঘাত পড়েছে, সাপের বিষের মতো একটা দুর্বিষহ জ্বালা ধরেছে সর্বাঙ্গে। অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত যেন জ্বলে যেতে লাগল। এতদিন পরে, এইবারে মন যেন স্পষ্ট কণ্ঠে তাঁর কাছে উপস্থিত করল একটা নির্মম কঠিন প্রশ্ন: তাঁর সত্যিকারের স্থান কোথায়? ওই শাহের বৈঠকখানায়, না নির্যাতিত এই অমানুষগুলোর বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে?

অস্বস্তিটাকে কাটাবার চেষ্টা করল জিব্রাইল।

—ওসব কথা কানে তুলবেন না মাস্টার সাহেব। মদের ঝোঁকে বলে গেল, কোনো মাথামুণ্ডু নেই ওসবের। কাল সকালেই দেখবেন সোজা ঘাড় আবার নুয়ে পড়েছে মাটিতে। সামনে এসে ভুঁয়ে লুটিয়ে সেলাম বাজাবে তখন—এই বলে রাখলাম।

আলিমুদ্দিন জবাব দিলেন না। অন্ধকার, কালি-ঢালা মাঠ। বিলের জলে তারার ঝাঁক দোল খাচ্ছে। দূরে পাল-বুরুজের চুড়োটা যেন কবরখানার বুকের ভেতরে জেগে আছে নিঃসঙ্গ একটা অতিকায় জিনের মতো। সারি সারি তালগাছ সামনে কাঁদছে রাত্রির

বাতাসে। সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে, মুহূর্তের মধ্যে এলোমেলো আর বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে, জট পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে চিন্তার তন্তুজাল। আবার কি নতুন করে ভাবতে হবে, আবার কি শুরু করতে হবে গোড়া থেকেই?

গুলিস্তাঁ হামারা। কিন্তু কোন্ গুলিস্তাঁ?

ধাওয়ারা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে লণ্ঠনের আলো। এলাহী বক্স, ধাওয়ারা—সেইখানেই কি শেষ? আরো কত—কত সংখ্যাহীন, কত অজস্র?

আর তৎক্ষণাৎ একটা কথা মনে পড়ল বিদ্যুৎ-চমকের মতো।

—ওই মাছগুলো শাহের ওখান থেকেই তো দিয়ে গেছে, না জিব্রাইল?

আকস্মিক প্রশ্নে থতমত খেয়ে জিব্রাইল বললে, জী!

সমস্ত পেটটা পাক দিয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের। মাছ নয়, একটা মুমূর্ষু মানুষের বুকের মাংস যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছেন তিনি! দ্রুতবেগে উঠে চলে গেলেন ভেতর দিকে।

বিহ্বল জিব্রাইল শুনতে পেল আলিমুদ্দিন বমি করছেন!

নয়

কালাপুখরি নাম বটে, কিন্তু সাদা কালো কোনো পুকুরেরই এখন নিশানা নেই কোথাও। কোনো একদিন হয়ত ছিল, কিন্তু কবে মজে বুজে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে বরিন্দের এই ঢেউ-খেলানো মাটির সঙ্গে। তবু কালাপুখরি নামের এই অঞ্চলটাই অপেক্ষাকৃত সমভূমি। রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষতা চোখে লাল ধুলোর ঝাপটা ছুঁড়ে মারে না, স্তব্ধ শূন্যতা মুখর হয় না ক্ষুধার্ত শকুনের কান্নায়। কিছু আম-কাঁঠালের ছায়া আছে, কয়েক ঝাড় বাঁশ আছে; দু-একটা নারকেল গাছও আছে—তবে ফলন ভালো হয় না, ডাবগুলো শাঁসে জলে পুরন্ত হয়ে ওঠবার আগেই কাঠবেড়ালীতে খেয়ে শেষ করে দেয়। কখনো কখনো আকন্দফুলের গন্ধ আসে, বুনো ভাঙের ঝোপে ঝোপে ঘোরে নেশাগ্রস্ত গিরগিটি, বসন্তের বাতাসে বাতাসে আকুল ভাঁটফুলের বনে মরা মাটির স্বপ্ন কামনার মতো রঙীন প্রজাপতির ছোপ লাগে।

আহীরদের পাড়ার সঙ্গে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে একটা। রুক্ষ, উত্তপ্ত, উদগ্র জীবন নয়—চিরপরিচিত বাংলাদেশের মধুমান বিভ্রান্তি। ভাঙ আর গাঁজার নেশায় রাত দুটো পর্যন্ত উদ্দাম আনন্দে গান গায় না এরা; বিকেলের আলো নেববার সঙ্গে সঙ্গে যে রেড়ির তেলের ক্ষীণ দীপ জ্বালায়, পাংশু তারাগুলো আকাশে শাণিত হয়ে ওঠবার আগেই সে প্রদীপ নিবিয়ে স্বপ্নহীন ঘুমের মধ্যে এলিয়ে পড়ে এরা। স্বপ্নহীন? না—ঠিক বলা হল না। রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমের ঘোরে নতুন-চষা মাটির মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এরা স্বপ্ন দেখে—বোরো ধান মঞ্জরীর ভারে ভেঙে পড়ছে, স্বপ্ন দেখে—মেঘে ছাওয়া আকাশের

সীমায় সীমায় একাকার হয়ে গেল মেঘবরণ গমের ক্ষেত।

কিন্তু রাত্রির স্বপ্নের বুকে দিনের ধারালো আলো এসে বিঁধতে থাকে একটার পর একটা সাঁওতালী তীরের মতো। বাঘের থাবার মতো ক্ষেতের ফসলে হাত পড়ে মহাজনের—লোভ নামে জমিদারের। তাও সইছিল এতকাল—অসহ্য হয়ে উঠেছে এইবারে।

কালাপুখরি এবং আশেপাশে আরো প্রায় ছোট বড় পনেরোখানা গ্রাম নিয়ে তুরীদের এলাকা। এই গ্রামগুলির দু পাশে দু হাজার বিঘে ধানী জমি। আর এই মাঠের মধ্য দিয়ে সরীসৃপ তির্যকতায় প্রবাহিত হয়ে গেছে কামারহাটির ডাঁড়া। একটি ছোট সরু খাল—গরমের দিনে শুকনো খটখটে হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও এক-হাঁটু কাদার মধ্যে বাড়তে থাকে ব্যাঙ আর গজাল মাছের সংসার; কিন্তু ডাঁড়ার পরাক্রম দেখা দেয় বর্ষার সময়। হঠাৎ একদিন ঘোলা জলের স্রোত পাক খেতে খেতে ছুটে যায় তার ভেতর দিয়ে—শুকনো ঘাস পাতা আর শ্যাওলা তীরের মতো বয়ে যায় ঝিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারির বিলের দিকে।

এর আগে তুরীরা মাছ ধরত ডাঁড়ায়, নতুন ঘোলা জল বয়ে আসতে দেখলে খুশি হয়ে উঠত তাদের মন। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে বছরের পর বছর ধরে ডাঁড়া নিচ্ছে সর্বনাশীর মূর্তি। নদীর নিচের দিকটায় বালি পড়ে পড়ে ক্রমশ তার ধারা খুঁজছে একটা নতুন মুক্তির মুখ—প্রতি বছর ডাঁড়া দিয়ে আরো বেশি, আরো বেশি করে জল নামছে। এখন বারো মাসই ডাঁড়ায় জল থাকছে, কোথাও কোথাও একমানুষ পর্যন্ত। সন্দেহ হচ্ছে, ডাঁড়ার মধ্য দিয়েই নদী তার নতুন পথ কেটে নিতে চায়!

ফল হয়েছে মারাত্মক। ডাঁড়ার সংকীর্ণ খাতে অত অজস্র জল আর ধরছে না, দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে, বরবাদ করে দিচ্ছে দু হাজার বিঘে জমির ফসল। কিন্তু বিশাল হাঁসমারি আর ঝিরিঙ্গিপুর বিলের জলকরের লোভে জমিদার ভৈরবনারায়ণ এই ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করতে রাজী নন। আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়, আকন্দ আর ভাঁট ফুলের গন্ধে সমাকুল ঘুমন্ত গ্রামগুলিতে তাই এসে লেগেছে আহীরপাড়ার আগ্নেয় উত্তাপ।

শুধু আহীরপাড়া নয়। প্রত্যক্ষ ইন্ধন এসেছে জয়গড় মহাল থেকে।

রাজবংশীরা কিষাণ সমিতি গড়েছে সেখানে। ভৈরবনারায়ণের তরফ থেকে এক-একটা ঘা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুনের ফুলকি। এক আই. এ. আর এল. এম. এফ. পাস ডাক্তার নগেন সরকার বাঁকা বাঁকা কথা কইতে শিখেছে জমিদারের লোকের সঙ্গে। ইস্কুল বসিয়েছে চাষাদের ভেতরে। শুধু তাই নয়। ভৈরবনারায়ণের কনিষ্ঠ কুমার বাহাদুরের অন্নপ্রাশনে একটি বেগার আসেনি জয়গড় মহাল থেকে, আসেনি এক মুঠো বাড়তি নজরানা। নগেন সরকারের কিষাণ সমিতি ঠিক করেছে ন্যায্য পাওনাগণ্ডার একটি পয়সা বেশি দেবে না জমিদারকে।

সেই নগেন ডাক্তার কাঁচা মাটির এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় বাইশ মাইল ভাঙা সাইকেল চালিয়ে এসেছিল কালাপুখরিতে। পঞ্চায়েতের পরামর্শটা তারই। তারপর—

তারপরেই কালাপুখরিতে ধূমায়িত হয়েছে অগ্নি-সম্ভাবনা।

সোনাই মণ্ডলের বাড়ির উঠোনে হয়েছে আজকের বৈঠকের আয়োজন। রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে না এখন, অন্ধকার উঠোনটায় আরক্তিম হয়ে আছে মাটিতে পোঁতা তিনটে মশালের আলো। নগেন ডাক্তার উপস্থিত থাকতে পারেনি, কী একটা বিশেষ কাজের তাড়ায় ফিরে গেছে জয়গড়ে। মশালের আলোয় ভূতের মতো ত্রিশ-চল্লিশটি মানুষ রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

ঝম ঝম করছে রাত। কোনো বাঁশঝাড়ের ঘুণে ছিদ্র করা বেণুরন্ধ্র থেকে এলোমেলো হাওয়ায় উঠছে বেসুরো বাঁশির স্বর। এই চৈত্র মাসেও আমগাছগুলোতে কখনো কখনো ঝপ ঝপ করে বাদুড় পড়ছে, কচি আমের কড়ার সন্ধানেই কিনা কে জানে। বাতাসে বাতাসে মশালের শিখাগুলো দুলে দুলে চঞ্চল ছায়া নাচিয়ে যাচ্ছে, আর মানুষগুলি তলিয়ে বসে আছে স্তব্ধতার মধ্যে। যেন কোনো দেবমন্দিরের সামনে এসে একটা বিচিত্র পবিত্রতার প্রভাবে তারা অভিভূত হয়ে গেছে, কারো মুখে কোনো কথা আসছে না।

—ধু—ধু—ধুম—

কোথাও একটা হুতুম প্যাঁচা ডাকল। ইন্ধন ফুরিয়ে গিয়ে দপ করে নিভে গেল একটা ম্লান মশাল। উঠোনের চঞ্চল আলোটা আরো বিবর্ণ পিঙ্গল হয়ে উঠল। তখন যেন হঠাৎ কথা খুঁজে পেয়ে নড়েচড়ে বসল একজন।

—ঠাকুরবাবু তো এখনো এল না!

সকলের মনে ওই একটি জিজ্ঞাসাই জমে উঠেছিল এতক্ষণ ধরে। তাই কয়েক মুহূর্ত জবাব দিলে না কেউ। তারপর আর একজন একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, কালোশশী খবর দিতে গেছে।

—রেখে দাও তোমার মেয়েমানুষের কারবার। তারপর আবার কালোশশী!—প্রথম লোকটি বললে অবজ্ঞাভরা গলায়।

—না, ঠিক যাবে কালোশশী। কথার খেলাপ করবে না।

—কি করে বুঝলে? বিশ্বাস আছে নাকি ওকে?

—অবিশ্বাসের কী হল? কালোশশী সব পারে—বিড়িতে একটা জোরে টান দিয়ে, আগুনটাকে একেবারে আঙুলের কাছাকাছি নামিয়ে এনে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললে দ্বিতীয় জন।

—কেন, রঙ ধরেছে বুঝি চোখে?—আবহাওয়াটা এতক্ষণে সহজ হয়ে আসছিল। তারই সুযোগ নিয়ে চাপা গলায় টিপ্পনী কাটল কোনো তৃতীয় জন।

—সামলে ভাই সামলে—আর একটি কণ্ঠ।

—ওর ঝাঁপিতে তাজা তাজা গোখরো আর চন্দ্রবোড়া থাকে। বিষদাঁত কামায় না কালোশশী। ছেড়ে দিলেই কিন্তু ছোবল মারবে—তৃতীয় জন আবার বললে রসানি দিয়ে।

দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে এতক্ষণ যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল সোনাই মণ্ডল। ভাবছিল না স্বপ্ন দেখছিল সে-ই বলতে পারে। হঠাৎ মুখ তুলে চাপা গলায় ধমক দিলে একটা।

—এই, কি হচ্ছে এসব ? হাসি-মস্করার সময় নাকি এখন ?

মুহূর্তের মধ্যে আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল সমাবেশের ওপর। ঠিক কথা—অন্যায় হয়ে গেছে। দেবমন্দিরের পবিত্রতার মাঝখানে বসে সুযোগ নিয়েছি অন্যায় প্রগল্‌ভতার।

আবার চারদিকে ঝম ঝম করে বেজে চলল বরেন্দ্রভূমির লাল মাটির ওপরে ঘনীভূত রাত্রি। বেসুরো বাঁশি বাজতে লাগল ঘুণে-কাটা বাঁশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কচি আমের অম্লরসে মুখের স্বাদ বদল করে বাদুর উড়ে চলল নতুন কোনো খাদ্যের সন্ধানে।

একজন উঠে পড়ল।

—মশাল নিবে গেছে। যাই আর একটা জ্বালিয়ে আনি।

ছিঁড়ে যাওয়া কথার সূত্রটায় আর একবার জোড় লাগল। আলোচনার সূচনা যে করেছিল, সে এতক্ষণে তিক্ত গলায় বললে, না, মেয়েমানুষের ওপরে ভরসা করে বসে থাকাই অন্যায় হয়ে গেছে। নিজেদের কাউকে পাঠালেই ভালো হত।

কালোশশীর তরফে যে ওকালতি করছিল এবারে নীরব হয়ে রইল সে। তার নিজের মনেও বোধ হয় খটকা বেধেছে একটু। সত্যিই তো, কি বলা যায় কালোশশীর মতিগতি ? কোন্ দিকে যেতে হয়ত কোথায় চলে গেছে নিজের খেয়ালে। কোন্ পদ্ম-বিলের ধারে সাপ ধরতে গিয়ে হয়ত নিজের সাপের ঝাঁপির ওপরেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে তালগাছের তলায় ; ঘুমের মধ্যে শুনছে কানে কানে প্রেমের চাপা ফিসফিসানির মতো নতুন-ধরা কোনো কালনাগের গর্জানি। তার নতুন প্রেম।

যে উঠে গিয়েছিল, সে আর একটা নতুন মশাল জ্বেলে নিয়ে এল, পুঁতে দিলে নিবে যাওয়া মশালটার জায়গায়। তাজা আর তেজী আলোয় উঠোনটা আভাসিত হয়ে উঠল নতুন করে।

—তাই তো, ঠাকুরবাবুর আসতে বড্ড দেরি হচ্ছে! উদ্বিগ্ন মন্তব্যটা ছেড়ে দিলে একজন।

—ও আর আসবে না। মিছিমিছি বাবুদের কথায় ভুলে এতখানি রাত জাগাই সার।

—একটা মস্ত হাই তুলে গামছার খুঁটে দু ফোঁটা চোখের জল মুছে নিলে প্রথম লোকটি।

তার গলায় বিস্বাদ বিরক্তিটা এবার স্পষ্ট প্রকটিত হয়ে পড়ল, এতটুকুও আর চাপা রইল না।

—মাধো!—কড় কড় করে যেন বাজ ডেকে উঠল সোনাই মণ্ডলের গলায়—সারা সভাটার ওপর দিয়ে আতঙ্কের চমক বয়ে গেল একটা: গরজটা আমাদেরই। আর অত বাবুগিরি থাকলে জমায়েতে আসতে নেই।

মাধো অথবা মাধব কিন্তু বশ মানল না। এবার আরো তিক্ত গলায় বললে, আমাদের বাবুগিরি তুমি কোথায় দেখছ মোড়ল? সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি, এখন তিন পহর রাত হতে চলল। এখনো দেখা নেই। ডাক্তারবাবু তো উস্কানি দিয়ে সরে পড়ল, ঠাকুরবাবু হয়ত নাক ডাকিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণ! মাঝখান থেকে সারারাত বসে বসে আমরা মশা তাড়াচ্ছি।

—দু ক্রোশ ঘাঁটা পার হয়ে আসতে হবে ঠাকুরবাবুকে। চারটিখানি কথা নয়।

মাধব তাচ্ছিল্য-মাখানো স্বরে বললে, তাতিয়ে দেবার বেলায় তো বাবুদের হামেশা গাঁয়ে পা পড়ে আর কষ্ট করার বেলায় বুঝি নয়? তখন আমরা—

সোনাই মণ্ডল আবার ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে, মাধো!

—অত ভয় দেখাচ্ছ কিসের? সত্যি যা তা মুখের ওপর বলব—তীব্র উত্তর এল মাধবের।

—আঃ, থাম্ থাম্ মাধব—

—কেন বাজে বকবক জুড়ে দিলি?

—আরে বাপু, ভালো তো আমাদেরই হবে!

কথার গতি লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে উঠছে সবাই। পাঁচ-সাতটি কণ্ঠে আবহাওয়াটাকে লঘু করে তোলবার প্রয়াস মুখর হয়ে উঠল।

কিন্তু শয়তান চেপে বসেছে মাধবের মাথায়। মাধব বললে, আমরা তো এসব ঝামেলার ভেতর পা বাড়াতে চাইনি। কি হবে খামকা জমিদারকে ঘাঁটিয়ে? অসুবিধে হচ্ছে, জমিতে জল ঢুকছে? বেশ তো, না পোষায় উঠে যাও এখান থেকে। নতুন জমিদারিতে গিয়ে পত্তনি নাও। কিন্তু বাবুরা সব এটা-সেটা বুদ্ধি সেঁধিয়ে দেবে মগজে, আর কাজের বেলা কারো টিকিটি দেখবার জো নেই। যা খুশি তোমরা করো, আমি আর নেই এসবের ভেতরে।

—হতভাগা, উজবুক, বলছিস কি এসব?—দাঁতে দাঁত চেপে বললে সোনাই মণ্ডল।

—যা বলছি, পাকা কথাই বলছি। তোমাদের বুদ্ধিতে আর আমি নেই। জমিদারের দৃষ্টিতে পড়ে ধনে-প্রাণে যাব, তখন ডেকেও জিজ্ঞেস করতে আসবে না বাবু-ভাইয়েরা।

—এই, চুপ কর।

—কী বলছিস যা তা!

—এ তো বেইমানি!

সমাবেশের মধ্য থেকে আবার বিমিশ্র গলায় কলরব উঠল।

—কী, বেইমানি!—এবারে গর্জে উঠল মাধব, সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল: এত করলাম তোমাদের জন্তে আর এখন হয়ে গেলাম বেইমান! বেশ, সেই কথাই ভালো। তোমরা যা খুশি তাই কর। ভাঁড়ায় বাঁধ বাঁধো, জমিদারের সঙ্গে মারামারি কর, ভিটেমাটি সুদ্ধ উচ্ছন্নে যাও, তোমাদের দলে আমি নেই। এই আমি তোমাদের পঞ্চায়েত ছেড়ে চললাম, আর কোনোদিন আমায় ডেকো না।

—মাধো—মাধো—

—বেইমান—

—মাধো—

কিন্তু এক মুহূর্ত আর দাঁড়াল না মাধব, একটি ডাকেরও সাড়া দিল না। এক গাছা লাঠি পড়েছিল হাতের কাছে, সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে গেল বাইরে অন্ধকারের মধ্যে।

আচমকা, অপ্রত্যাশিত ভাবে যেন ঘূর্ণি-হাওয়া বয়ে গেল একটা। চক্ষের নিমেষে ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়ে গেল সমস্ত। ক্রোধে, বিস্ময়ে আর নিরাশায় সভা মূক হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর আত্মস্থ হয়ে, আগুনঝরা গলায় সোনাই বললে, যাক।

—কী সাংঘাতিক মানুষ!

—যাবার জন্তেই ছটফট করছিল। ফাঁক পেয়ে পালিয়ে গেল।

—যাবেই তো। এসব কাজে কি আর সমান বুকের পাটা থাকে সকলের!

—ও আসবে কেন আমাদের ভেতর! ওর ছেলে শহরে গিয়ে কোন সাহেবের আর্দালি হয়েছে, ওর এখন মেজাজ গরম। নেহাত গাঁয়ে থাকে বলেই লজ্জায় পড়ে এসেছিল।

—বেইমান!

সোনাই মণ্ডল একবার তাকাল সভাটার দিকে। নতুন আনা মশালটার উজ্জ্বল দীপ্তিতে তার মাথার পাকা চুলগুলোকে আরো বেশি সাদা দেখাল। চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল দু'খণ্ড কাচের মতো।

—চুপ, সব চুপ!—অদ্ভুত কর্কশ গলায় সে নির্দেশ দিলে। তার গলার আওয়াজেই যেন চমকে উঠে আবার ধু-ধু-ধুম করে আতঙ্কিত জবাব দিলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা হুতুম প্যাচাটা।

ফোঁস ফোঁস করে সাপের মতো কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলল সোনাই মণ্ডল, যেন অনেকক্ষণ ধরে দম আটকে ছিল তার। ভাঁজ-করা হাঁটু দুটোকে সে মুঠো করে চেপে ধরলে অসহ্য ক্রোধে, হাতের কাছে মাধবের গলাটা থাকলে পিষে যেত ওই মুঠোর মধ্যে।

—সব বেইমানের বিচার হবে একদিন, তার দেরি নেই। কিন্তু—কাচের মতো চোখ দুটোকে বরিন্দের মাঠে জনশ্রুতির স্কন্ধকাটার সন্ধানী চোখের মতো তীক্ষ্ণতর করে সে সভাটার ওপর আর একবার বুলিয়ে নিল: তোমাদের কারো যদি অমনি করে পালাবার মতলব থাকে, তাহলে এইবেলা সরে পড়ো। কোনো বেইমানের জায়গা নেই এখানে।

একসঙ্গে মাথা নিচু করে রইল সকলে। মাধবের অপরাধ যেন তাদের সকলকে স্পর্শ করেছে, নিজেদের মনের মধ্যে তাকিয়ে তারা যেন আত্মবিশ্লেষণ শুরু করল। যেন খুঁজে দেখতে চাইল কোথায় লুকিয়ে আছে ভীরুতা, তলিয়ে আছে মিথ্যে, সঞ্চিত হয়ে আছে বিশ্বাসঘাতকতার কালো কলঙ্ক।

একটা টর্চের আলো সভার ওপর দিয়ে পিছলে গেল।

—কে—কে—কে?

সকলের হয়ে যেন সহস্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোনাই মণ্ডল। যাদের কাছে লাঠি ছিল, নিতান্ত অবচেতন একটা প্রেরণাতেই তারা লাঠিগুলো ধরল মুঠো করে।

—আমি রঞ্জন।

—ঠাকুরবাবু!

—ঠাকুরবাবু এসেছে!

—শালা মাধব থাকলে বুঝতে পারত—

—ব্যাটা বেইমান—

কিন্তু অতগুলো গলার কল-কাকলি কোনো স্পষ্ট অর্থ পৌঁছে দিল না রঞ্জনের মনের কাছে। মৃদু হেসে সে তাকাল হাতের ঘড়িটার দিকে: রাত একটু বেশি হয়ে গেল। তা আমার দোষ নেই। খেয়ার মাঝি ঘুমুচ্ছিল, এক ঘণ্টা লাগল তাকে ডেকে তুলতে। সে যাই হোক, এখন তাহলে আমাদের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

সোনাই মণ্ডলের পাশেই ঝুপ করে বসে পড়ল রঞ্জন।

—একটু দাঁড়ান ঠাকুরবাবু, আর একটা মশাল জেলে আনি—তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল একজন।

কিন্তু কালোশশী?

জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে চলেছিল রঞ্জনের পাশাপাশি। যতক্ষণ না বিপজ্জনক অঞ্চলটা পার হয়েছে, ততক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেনি। শুধু অন্ধকায়ের

আড়ালে আড়ালে ছুটো ছায়ার মতো থানিকক্ষণ নিঃশব্দে পাশাপাশি পথ হেঁটেছে।

তারপর দূরে যখন জমিদারবাড়ির আলোটা ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল, দুপাশে রইল শুধু মাথা-সমান-উঁচু বেনা ঘাসের বন, প্রকৃতি ছাড়া দুজনের মাঝখানে কিছুই আর জেগে রইল না, তখন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল রঞ্জনের। অন্ধকারে আরো অদ্ভুত মনে হতে লাগল রহস্যময়ী কালোশশীকে, চারদিকে ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে ঝিঁ ঝিঁ করতে লাগল রক্তের মধ্যে।

—কালোশশী?—রঞ্জন ডাকল।

জবাব দিল না কালোশশী। যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে।

—কালোশশী?—রঞ্জন আবার ডাকল।

—কি বলছ?—যেন ঘুমের ঘোর ভেঙে তাকালো মেয়েটা। রঞ্জনের মনে হল, হাল্কা মেঘের আবরণে ঢাকা দুটো ম্লান নক্ষত্রের মতো চকচক করে উঠল কালোশশীর চোখ।

—ঘরে ফিরবি না তুই? সারারাত ঘুরবি পথে পথে?

—ঘর?—অন্ধকারে কালোশশীর মুখ দেখা গেল না, শুধু কানে এল চাপা একটা হাসির শব্দ।

—তোর মরদ রাগ করবে না? লক্ষ্মণ?

কালোশশী আবার হাসল কিনা কে জানে, কিন্তু হাসির শব্দটা এবারে আর শুনতে পাওয়া গেল না। মৃদুকণ্ঠে বললে, না, রাগ করবে না। রাগ করার মতো হালই নেই তার।

—সে কি! কেন?

—সে এতক্ষণ মদ খেয়ে গোপালপুরের ভুঁইমালী পাড়ায় গিয়ে পড়ে আছে।

—ওঃ!—রঞ্জন চুপ করে গেল। একটা প্রশ্ন নিয়ে-নাড়াচাড়া করতে লাগল নিজের মধ্যে। কালোশশীর জন্য কি তার সহানুভূতি বোধ করা উচিত? উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা কি কালোশশীর মনে সঞ্চার করে কোনো গৃহবধূর আর্তি, কোনো পুরলক্ষ্মীর আকুলতা? অথবা ওদের দাম্পত্য জীবন কি শুধু কিছুক্ষণের জন্য একটা জৈব-বন্ধন, তার পরেই দুটো সমান্তরাল রেখা? কোনো দিন কেউ কারোর সঙ্গে মিলবে না, এগিয়ে যাবে নিজেদের নির্বিঘ্ন গতিপ্রবাহে?

তাই তো স্বাভাবিক। দয়াল দাস, পরশুরাম, লক্ষ্মণ সর্দার। লক্ষণ সর্দারের সঙ্গেও আজ আর সুর মিলছে না। এমন কত আসবে, কত যাবে। তাজা সাপ নিয়ে খেলা ভালোবাসে কালোশশী। আজ হয়ত লক্ষ্মণকে নিয়েও তার খেলা শেষ হয়ে গেছে, তাই কি নিজেই তাকে সে ছুঁড়ে দিয়েছে গোপালপুরের মদের দোকানে, ভুঁইমালীদের পাড়ায়?

হঠাৎ মনে পড়ল। দিনকয়েক আগে সাইকেলে করে আসবার সময় পথের মধ্যে যখন দেখা হয়েছিল কালোশশীর সঙ্গে, তখন বলেছিল, ভারি বিপদে পড়ছে পরশুরামের জন্য ; সে-সম্পর্কে একবার আলাপ করতে আসবে রঞ্জনের কাছে।

—হ্যাঁ রে, পরশুরামের খবর কি ?

—পরশুরাম ?—কালোশশী চমকে উঠল একবার।

—তোকে এখনো শাসাচ্ছে নাকি ?

—নাঃ !—কালোশশী একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল।

—তোর আশা ছেড়ে দিয়েছে তাহলে ?

কালোশশী আবার চোখ তুলল। আবার হাল্কা মেঘের আড়াল থেকে চকচক করে উঠল দুটি বিষণ্ন নক্ষত্র।

—তা তো জানি না। তবে তীরে বিষ মাখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার খোঁজে। কুঁচিলার বিষ, গোখরো সাপের বিষ।

—কী সর্বনাশ !—রঞ্জন ভয়ানক চমকে উঠল : আর তুই রাতবিরেতে এমন করে এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াস ? ভয় করে না তোর ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না কালোশশী। তারপর মাঠ থেকে উঠে-আসা একটা আচমকা হু-হু করা হাওয়ায় আলগাভাবে একটা কথা ছেড়ে দিলে : না, ভয় করে না। কি হবে ভয় করে ?

—তার মানে ? মরতে ভয় নেই তোর ?

—নাঃ !—আবার আর একটা হু-হু হাওয়ায় কালোশশীর কথাটা উড়ে চলে গেল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসও কি মিশে গেল তার সঙ্গে ?

—এসব আবার কি কথা রে ? তোর হল কি ?—রঞ্জনের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কালোশশী। তারপর—

অন্ধকারে রঞ্জন এইবার আর তার চোখ দুটোকে দেখতে পেল না। নক্ষত্রের আলোটা মেঘের আড়ালে বুঝি একেবারেই ঢাকা পড়ে গেছে। কেউ জানল না, কখন কোথা থেকে কয়েক বিন্দু জল এসে জমেছে কালোশশীর চোখের কোণায় কোণায়।

আচ্ছা বাবু, আমাকে একবার শহরে নিয়ে যাবে ?

একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন।

—হঠাৎ আবার শহরে যাবার শখ হল কেন তোর ?

—কি জানি, বলতে পারি না—ধরা গলায় কালোশশী বললে, আর ভালো লাগে না এমন করে। সারাজীবন খালি সাপ ধরেই বেড়াব ? শহরে হয়ত সাপ নেই—সাপ ধরবার জন্য হাত নিশপিশ করবে না সেখানে। এই সাপের ঝাঁপি ফেলে দিয়ে দিনকয়েক নিজের

খুশি-মতো ঘর বাঁধব সেখানে।

—কি বলছিস তুই?

কালোশশী তেমনি ধরা গলায় বললে, আর ভালো লাগে না এমন করে। তুমি আমায় নিয়ে চল বাবু।—জল-ভরা যে চোখ দুটোকে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে যেন বিদ্যুতের মতো কি ঝিকিয়ে উঠল: আমি তোমার কাছে থাকব, তোমার সব কাজ করে দেব। সত্যি বলছি বাবু, আমি আর সাপ ধরব না, সাপ ধরতে আর আমার ভালো লাগে না।

এতক্ষণ ধরে জমাট মেঘে বর্ষণ নামল এইবারে। হু হু করে বন্যার মতো অজস্র ধারায় কেঁদে ফেলল নাগমতী বেদের মেয়ে।

রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মাথার মধ্যে একটার পর একটা রক্তের ঢেউ এসে সমুদ্র-গর্জনের মতো ভেঙে পড়তে লাগল। কি বলতে চায়, কি বলতে চায় কালোশশী? এই অন্ধকার-ভরা মাঠের মধ্যে, হু-হু-করা বাতাসের এই আকুলতায়—কোন বনস্পতির ছায়াস্বপ্নে নীড়ের কামনা উতরোল করে দিয়েছে বনহংসীর বুকের রক্তকে?

—কালোশশী!—রঞ্জন ডাকল। নিজের গলার স্বরেই চমকে উঠল সে।

কিন্তু কোথায় কালোশশী! চক্ষের পলকে একটা ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে রাত্রির অতলান্ত গভীরতায়।

—কালোশশী!

না, কালোশশী কোথাও নেই। বিহ্বলের মতো সামনে তাকাল রঞ্জন। খানিক দূরে একটা আলেয়া এগিয়ে আসছিল তার দিকে, ডাক শুনে যেন থমকে দাঁড়াল, তারপর দপ করে নিবে গিয়ে মিলিয়ে গেল নিশীথ-সমুদ্রের একটা বুদ্বুদের মতো।

দশ

দিন সাতেক পার হয়ে গেছে।

এক পশলা জোরালো বৃষ্টি ঝরে গেছে বরিন্দের লাল মাটির ওপর। কাঁচা সড়কের ওপর এঁটেল কাদায় গরুর গাড়ির 'ডহ' সৃষ্টি হয়েছে এক-আধটা। কাঁদড়ের স্থির ঘোলাটে জলে অল্প অল্প তিরতিরে স্রোত এসেছে। দু-চার আঙুল জল জমেছে ফেটে চৌচির শুকনো নয়ানজুলির ভেতরে, কোথা থেকে প্রাণ পেয়েছে শুকনো কয়েকটি কলমীলতা—তিন-চারটি পাতা নিয়ে ভীরু মাথা মেলে দিয়েছে ওই জলটুকুর ওপরেই। মাটির বুকের ভেতর থেকে শীর্ণ কয়েকটি সবুজ আগুনের শিখার মতো ঘাসের অঙ্কুর উঠেছে এদিকে ওদিকে।

আর মুশকিল হয়েছে আউশ ধান নিয়ে। প্রায় এক মাস ধরে টানা খরা চলছিল,

এইবার আসছে জোরালো বর্ষার পালা। প্রথম প্রথম কাজল মেঘ থম্‌ থম্‌ করে ওঠে, ঘনিয়ে আসতে চায়—কিন্তু বরিন্দের প্রচণ্ড পাগলা হাওয়ায় ঠিক জমাট হয়ে বসতে পারে না ; একটা কালো রাজহাঁসের পাখা যেমন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে শেয়ালে, তেমনি ভাবে বাতাসের ঝাপটায় শতছিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দিকে দিকে।

কিন্তু কদিন আর ? এক সময়ে ঠিক জড় হয়ে আসবে, একজোড়া শক্ত লোহার কবাটের মতো আড়াল করে ফেলবে আকাশকে। পূর্বে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে জলতে থাকবে লাল বিদ্যুৎ, বাজ পড়বে গুম্‌ গুম্‌ করে—এক একটা আকাশ-ছোঁয়া তালগাছের বুককে দু ফাঁক করে দিয়ে মাটির তলায় পালিয়ে যাবে সর্বনাশা আগুন। তারপর বৃষ্টি—বৃষ্টি। এক নাগাড়ে চলতে থাকবে—দুদিন, তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন। তারও পরে। কোথায় কতদূরে গঙ্গা, কোথায় বা মহানন্দা ! পাগলের মতো জলের তোড় ছুটবে মালিনী নদী দিয়ে—মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় একাকার করে দিয়ে জন্ম হবে 'চাফালে'র। সে তো সায়র !

এদিকে ধান পেকে উঠেছে। ওই সর্বনাশা জলের ঢল নামবার আগে কাটতে না পারলে কমসে কম সাত-আট হাজার বিঘের ধানই বরবাদ। একেই তো পোকাধরা এবারে, তারপরে ঢল নেমে এলে—

তিন-চারজন মাতব্বর গোছের কৃষক জড়ো হয়েছিলো আলিমুদ্দিনের দাওয়ায়। আলোচনা তারাই করছিল।

আলিমুদ্দিন বললেন, তোমাদেরই দোষ। এত দেরি করে রোও কেন ?

—করব কি জনাব ! আগে পানি না পড়লে ক্ষেতে লাঙল দিয়ে কি করব ! তা ছাড়া মাটিও তো দেখছেন। ভিজলে মাখন, নইলে পাথর।

সলিম মুনশী সাদা দাড়িটার মধ্যে হাত বুলিয়ে নিলে কয়েকবার।

—সত্যি দিনকাল যেন বদলে যাচ্ছে। আগে ফাল্গুনের আগেই জল নামত—এখন ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। সেই নামতে নামতে চোতের শেষ। এমনি চলতে থাকলে পহেলা ফসল আর চাষার ঘরে উঠবে না।

জোনাবালি আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। আজও আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একখানা ঘন কালো জলভরা মেঘ উঠে এসেছে। একটা চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে গুরগুর করে। নাঃ—এল বলে। বেশি দেরি নেই আর।

জোনাবালি বললে, আব্বাজানের মুখে শুনেছি, আগের আমলে ক্ষেতে ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন নবাব আর জমিদাররা। বৃষ্টি না হলে পাছে চাষার কষ্ট হয়, এজন্যে পুকুর কাটিয়েছিলেন বরিন্দের চারদিকে। আর এখন ? নেবার কুটুম সব—একটা আধলা দেবার বেলা কেউ নেই।

হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ল আলিমুদ্দিনের।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দেখেছি বটে। মাঠে-ঘাটে চারধারেই তো ছোট-বড় অনেক পুকুর আছে। ওইগুলোর কথাই বলছ বুঝি?

—জী।

—তা তোমরা কেন ওসব পুকুর থেকে সেচের ব্যবস্থা করে নাও না?

—পানি কই জী, শুধু তো পানা আর কাদা।

—নিজেরা কাটিয়ে নিলেই তো পার।

—বাপস!—সভয়ে সলিম বললে, অত পয়সা কোত্থেকে আসবে চাষার ঘরে? আর সবাই মিলে-জুলে যদি কাটিয়েও নিই—শাহ্ কি আর রক্ষা রাখবে তাহলে! দেওয়ানী নয় হুজুর, ঠেলে দেবে ফৌজদারীতে। নইলে একশ টাকা আক্কেলসেলামী দিয়ে তিন হাত নাকে খত টানতে হবে শাহের সদর-কাছারির সামনে।

—বটে—বটে!

—জী। তবে আর বলছি কি?

—হুঁ! আলিমুদ্দিন ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। দিনের পর দিন একটার পর একটা অবাঞ্ছিত আঘাত আসছে, আর সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে—এ তিনি চাননি—এ তিনি চান না। দুই আর দুইয়ে চারের মতো যাকে অত্যন্ত সরল আর তরল বলে ধারণা জন্মেছিল, দেখা যাচ্ছে তা অত সহজ নয়। অনেকদিন ধরে কঠিন হাতে লাঙলের আঁচড় কাটতে হবে, বেছে বেছে ভেঙে ফেলতে হবে অনেক সর্বনাশা মাটি-পোকার বাসা, গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে হবে পাথরের মতো শক্ত অনেক মাটির চাঙাড়। তারপর—

তারপর এই মাটিতে পাকিস্তানের ফসল। গরীবের দুনিয়া।

বাজার করে ফিরল জিব্রাইল। কাঁধে ধামা।

—মুরগী পাওয়া গেল না জনাব। বললে মড়ক লেগেছে। মাছও নেই। যা সামান্য মাছ ধরেছিল ধাওয়ারা, তা শাহের তোলায়—

—থাক। তরকারী এনেছ তো?

—তা এনেছি। আলু, পেঁয়াজ, কলাইশাক।

—বাস বাস, ওতেই চলবে।

জিব্রাইল ভেতরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, কি ভেবে থেমে দাঁড়াল।

—জী, একটা কথা। শাহ্ ডেকে পাঠিয়েছে। নিজের অজ্ঞাতেই ভ্রূকুঞ্চিত করলেন আলিমুদ্দিন। লোকটাকে যেন সহ্য করতে পারছেন না আর। নিতান্তই কাজের খাতিরে যেতে হয়, তাই যাওয়া। নইলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, বৈঠকের

ভেতরে সকলের সামনেই একটা নির্মম থাবা দিয়ে লোকটার মুখোশ ছিন্নভিন্ন করে দেন তিনি।

—ডাক কেন ?

—বিকেলে ভারি জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। আপনার সঙ্গে তাই নিয়ে আলাপ করবেন।

—এখুনি যেতে হবে ?—গলার স্বরে তাঁর একটা চাপা বিদ্রোহ প্রকাশ পেল।

—জী হাঁ। এখুনি।

হুকুম! সারা শরীরের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। পালনগরে শাহের ইস্কুলে না হয় মাস্টারীই নিয়েছেন, তাই বলে কোনো দাসখত তো লিখে দেননি তিনি। হুকুম করে করে ওদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা হাতছানি দিয়ে ডাকলেই যে দৌড়ে গিয়ে শাহের নাগরা জুতোর নিচে পোষা কুকুরের মতো লুটিয়ে পড়তে হবে—স্বীকার করে তো নেননি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি। তিনি মাস্টার; স্বাধীন বিবেক নিয়ে পথ চলাই তাঁর কাজ—যা সত্য তাকে ঘোষণা করাই তাঁর দায়িত্ব। তাঁর নৈতিক কর্তব্য ছাত্রদের কাছে—দেশের কাছে; শিক্ষক শুধু খোদার বান্দা—দুনিয়ার মালিক ছাড়া কারো কাছেই সে মাথা নত করতে জানে না।

গড়গড়া টানছিলেন আলিমুদ্দিন, একটা টান দিয়ে সরিয়ে দিলেন নলটা। তিক্ত স্বরে বললেন, কিসের ওয়াজ ?

—লীগের একটা মজলিস হবে বলছিলেন—জিব্রাইল ভেতরে চলে গেল।

সলিম মুনশীর মনে পড়ল : হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই বটে। আমাদের গাঁয়েও ঢোল পড়েছে।

জোনাবালি বললে, আচ্ছা মাস্টার সাহেব, কি হবে লীগ দিয়ে ?

অন্য সময় হলে পরমোৎসাহে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে বসতেন আলিমুদ্দিন। উদ্দীপনা জেগে উঠত মনের ভেতর, দপ দপ করে জ্বলে উঠত চোখ। বলতেন ইসলামের কথা, তার আদর্শের কথা, দুনিয়ার তামাম গরীবের বেহেস্ত গুলিস্তাঁ পাকিস্তানের কথা। কিন্তু সাতদিন ধরে কেন যেন তেমন করে আর জোর পাচ্ছেন না মনে।

হ্যাঁ—পাকিস্তান চান বই কি। কিন্তু এই বনিয়াদের ওপর ? ফতে শা পাঠানদের ওপর ভর দিয়ে ? না।

তবু—লীগ, লীগ। কায়েদে আজমের নির্দেশ। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা।

আলিমুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা ভাইসাহেব সব, আমি তাহলে চলি। বিকেলে সভায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে লীগের কথা। তোমরা এস।

—জী, আসব।

দু পা বাড়িয়েছেন আলিমুদ্দিন, এমন সময় পেছন থেকে ভীরু কণ্ঠের ডাক এল : জনাব!

তাকিয়ে দেখলেন, সলিম।

—কিছু বলবে মিঞা সাহেব?

—এই বলছিলাম—সলিম একটা ঢোঁক গিললে, আমরা পুকুর-টুকুর সম্বন্ধে যে সব কথা বলছিলাম, সেগুলো যেন আর শাহ্‌কে—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই সে থেমে গেল।

—কেন?—আলিমুদ্দিন ভ্রুকুঞ্চিত করলেন : আমি তো ও কথাটা গিয়েই বলব ভাবছিলাম। এ কাজ তো শাহেরই করা উচিত। প্রজাকেই যদি না বাঁচালো, তাহলে কিসের জমিদার! আর তা ছাড়া ফসল ভালো হলে জমিদারেরই তো লাভ—বাকি-বকেয়া কিছু পড়ে থাকবে না প্রজার কাছে।

—ফসল ভালো না হলেও বাকি-বকেয়া কোনোদিন থাকে না শাহের কাছে। বাদিয়া-পাড়ার পাইকেরা আছে।—জোনাবালি বললে, তাই ফসল ভালো না করলেও শাহের চলবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি দেখব—আলিমুদ্দিন দ্রুত পা চালালেন।

না, আর কথা বলবার সাহস নেই—আলোচনা জাগিয়ে তোলবার আগ্রহ নেই এক-বিন্দু। হঠাৎ তাঁর মনে হল এই দিগদিগন্তব্যাপী রাঙা মাটির ঢেউ খেলানো বরেন্দ্রভূমির প্রান্তরে তিনি দাঁড়াবেন কোথায়, কোন্‌খানে পা রাখবেন? সমস্ত মাঠটাই যেন আলাদা, খিরিশ আর চিতি বোড়ার গর্তে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে—কতকাল আর নাগরা জুতোর নিচে চেপে রাখা যাবে এই বিবরগুলো?

ধুলো-ভরা পথটায় এখন এলোমেলো কাদার ছোপ। কোথাও কোথাও মাটি পিছল, চলতে হয় পা টিপে টিপে। সন্ত্রস্ত সতর্ক পায়ে চললেন আলিমুদ্দিন। দূরে দূরে ধান-সিঁড়ি। সবুজ জমির ওপর গাঢ় সবুজ রঙের ধান; তার ভেতর দিয়ে একটা বাঁক নিয়ে বয়ে গেছে মালিনী নদী। যেন সবুজ ইসলামী পতাকায় ঝকঝক করে উঠছে রজতশুভ্র চন্দ্ররেখার দীপ্তি।

মাটিতে ছড়ানো ওই যে সবুজ পতাকা, ওই পতাকা তুলে ধরবে মাটির মানুষেরাই। ওই চাঁদের আলো-গলানো নদীর রেখা, ও তো মাটির মানুষেরই চোখের জল। শাহের নাগরা জুতোর তলায় আর এ পতাকাকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেওয়া যাবে না। একে বাঁচাতে হবে—বাঁচাতে হবে।

কিন্তু কি করে?

অসহায় ভাবে মনের মধ্যে যেন একটা উত্তর খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পারবেন? সাহস হবে তাঁর শাহের বিরুদ্ধে মাথা তুলে মানুষগুলোকে এককাট্টা করতে? সব মানুষকে

খোদার আইনে ভাগ করে দিতে পারবেন তার পাওনা মাটি, তার মেহনতী ফসল, তার সাচ্চা ইমান ?

—আদাব মাস্টার সাহেব। আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—কে ?—চমকে উঠে তাকালেন আলিমুদ্দিন। এলাহী বক্স, বাদিয়াপাড়ার মাতব্বর।

—কি হয়েছে এলাহী ?

—আমার বেটিটা বুঝি আর বাঁচল না মাস্টার সাহেব !—এলাহীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

পা দুটো শক্ত হয়ে গেল, যেখানে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন আলিমুদ্দিন মাস্টার : কি হয়েছে ?

—কাল রাত থেকে খুব চেঁচামিচি করছে, আর বেজায় জ্বর। সরকারী দাওয়াখানা থেকে ওষুধ তো নিয়ে আসছি, কিন্তু—এলাহী কথা বলতে পারল না।

দেশসেবার প্রথম হিড়িকে অনেক কিছুই করেছিলেন আলিমুদ্দিন—এমন কি বছর-খানেক কম্পাউণ্ডারীও। এলাহীর হাত থেকে ওষুধের শিশি আর প্রেসক্রিপশনটা তুলে নিলেন কৌতূহলবশে।

—কি ওষুধ দিলেন ডাক্তার, দেখি ?

এক মুহূর্তের জন্য চোখ পড়ল প্রেসক্রিপশনের দিকে। তারপরই চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

—এই ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার ?

এলাহী সভয়ে বললে—জী।

ভয়ঙ্কর গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, তোমাদের ডাক্তার না এল. এম. এফ. ?

—কি জানি হুজুর, অতশত বলতে পারব না।

—এস আমার সঙ্গে।

ডান দিকে বাঁক নিলেন আলিমুদ্দিন। ভুলে গেলেন শাহের আহ্বানে তিনি চলেছিলেন বিকেলের জরুরী ওয়াজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে, ভুলে গেলেন তাঁরই হাতে-গড়া মুসলীম লীগের আজকে একটা স্মরণীয় অনুষ্ঠান।

দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন আলিমুদ্দিন। রক্তের মধ্যে অসংযত চাঞ্চল্য, কোথায় যেন নিঃশব্দ বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে একটা। পায়ের একটা কড়ে আঙুলে যেন ছোবল লেগেছে বিবর-ছিদ্রিত বরিন্দের মাঠে লুকোনো কোনো একটি নাগশিশুর। এলাহী বক্স সভয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

কিন্তু ডিসপেনসারী পর্যন্ত আর যেতে হল না। পথেই দেখা হল সরকারী ডাক্তার খোদাবক্স খন্দকারের সঙ্গে। সাইকেলে করে বেরিয়েছেন রুগী দেখতে।

—ডাক্তার সাহেব !—আলিমুদ্দিন ডাকলেন।

—এই যে, কি খবর মাস্টার সাহেব ?—সাইকেলে চলতে চলতেই জবাব দিলেন ডাক্তার।

—একটা দরকারী কথা আছে, নামুন।

ডাক্তার নামলেন। হাসলেন একগাল।

—বিকেলের মিটিংয়ের কথা বলছেন তো ? হ্যাঁ, সে আমার মনে আছে।

—না, মিটিং নয়।—আলিমুদ্দিন হাতের প্রেসক্রিপশনটা মেলে ধরলেন : এইটে।

—কিসের প্রেসক্রিপশন ?—বিস্ময় ফুটল ডাক্তারের স্বরে।

—আপনারই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো।—মনোযোগ দিয়ে একবার চোখ বুলোলেন ডাক্তার : রাজিয়া খাতুন—চব্বিশ বছর, ম্যালেরিয়া। সিনকোনা মিকশ্চার। কি হয়েছে তাতে ?

—না, কিছু হয়নি।—থমথমে গাঢ় গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, কিন্তু রাজিয়া খাতুনের কেসটা কি সম্পূর্ণ শুনেছেন আপনি ?

—কি আবার শুনব ? জ্বর হয়েছে—ম্যালেরিয়া !—তাচ্ছিল্যভরে ডাক্তার বললেন, ওতেই সেরে যাবে।

—যদি না সারে ?

আলিমুদ্দিনের জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন খোদাবক্স খন্দকার। লোকটার হাল-চাল এমন যে—যেন জেরা করতে এসেছে ! যেন সাক্ষাৎ সিভিল-সার্জন এসে উপস্থিত হয়েছেন ডিসপেনসারী ইন্সপেকশনে।

—না সারে, মরবে। সবাইকে বাঁচাবার গ্যারান্টি দিয়ে কেউ ডাক্তারী করতে আসে না মিঞা সাহেব।

—তা আসে না। কিন্তু রোগটা জেনে ওষুধ দেয়।

ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠল। অপমান করছে তাঁকে—মূর্খ বলছে প্রকারান্তরে। অহেতুক অনধিকার চর্চা।

খোদাবক্স বললেন, নিজের কাজ নিজে করুন মিঞা সাহেব, আমার কাজটা আমাকেই ছেড়ে দিন।

—না।—আলিমুদ্দিন হঠাৎ পথ আটকে দাঁড়ালেন। আগুন-ঝরা গলায় বললেন : না। মানুষের জীবন নিয়ে কেন আপনারা এই ছিনিমিনি খেলেন, তার কৈফিয়ত দিয়ে যেতে হবে।

—কৈফিয়ৎ !—বাঁকা ঠোঁটে জ্বালা-ভরা হাসি হাসলেন ডাক্তার : আপনি আমার মনিব নন। কৈফিয়ত দিতে হয় দেব সিভিল-সার্জনকে, নইলে শাহুকে। আপনাকে নয়।

শাহু! আলিমুদ্দিনের মাথার মধ্যে যেন একটা আগুনের চাকা পাক খেতে লাগল। শাহুই বটে! মনে পড়ল, খোদাবক্স খন্দকার সম্পর্কে শাহের চাচাতো ভাই।

—পথ ছাড়ুন—খোদাবক্স বললেন।

—না, জবাব দিয়ে যেতে হবে।

—জবাব?—ডাক্তারের খুন চেপে গেল। অপমান! আরো বিশেষ করে এলাহী বক্সের সামনে! বাঁ হাত দিয়ে আলিমুদ্দিনকে একটা ধাক্কা দিয়ে ডাক্তার বললেন, সরে যান।

ধাক্কাটা একটু জোরেই লেগেছিল। অথবা ধাক্কা নয়—বিস্ফোরকের মুখে আগুন দেবার জন্যে ওইটুকুমাত্রই বাকি ছিল হয়ত। মাথার মধ্যে আগুনের চাকাটার আবর্তন আরো দ্রুত, আরো ক্ষিপ্র হয়ে উঠল। সাতদিনের সঞ্চিত জ্বালা বিদীর্ণ হয়ে পড়ল এক মুহূর্তে।

প্রকাণ্ড একটা ঘুষির ঘায়ে ধুলোর ওপর গড়িয়ে পড়লেন খোদাবক্স খন্দকার। আর্তনাদ করে উঠল এলাহী:

—এ কী করলেন মাস্টার সাহেব।

একটা ক্লান্ত বন্য জন্তুর মতো নিশ্বাস ফেলেছিলেন আলিমুদ্দিন। দুটো চোখে যেন সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হয়েছে তাঁর। জবাব দিলেন না—দাঁড়িয়ে রইলেন স্থাণুর মতো।

ডাক্তার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ঝাড়লেন গায়ের ধুলো। হায়নার মতো এক সার দাঁত বের করে যেন হাসলেন মনে হল। সে দাঁতের ওপর রক্তের একটা আবরণ নেমে এসেছে।

—আদাব, পরে বোঝাপড়া হবে—সাইকেলটা তুলে নিয়ে উঠে পড়লেন ডাক্তার—মিলিয়ে গেলেন ঝড়ের বেগে। চাকার তলা থেকে একরাশ লাল কাদা ছর্ ছর্ করে ছুটে বেরিয়ে গেল দুপাশে।

আরো অনেক, অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙল এলাহী।

—মাস্টার সাহেব?

—অ্যাঁ?—যেন ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন।

—এ যে ভারি বিশ্রী হয়ে গেল।—ভয়ে ভয়ে জড়ানো গলায় এলাহী বললে।

—হ্যাঁ, তা হল।—আলিমুদ্দিন মাস্টার ফিরে এলেন নিজের মধ্যে।—ছিঃ ছিঃ—করলেন কী! এতদিনের এত শিক্ষা, এত আত্মসংযমের শেষ পর্যন্ত এই পরিণাম! একটা সামান্য তুচ্ছতার আঘাত সইতে পারলেন না, ভেঙে পড়লেন টুকরো টুকরো হয়ে! একটা সামান্য পোকার ওপরে করলেন শক্তির এমন জঘন্য অপব্যবহার!

এক মুহূর্ত অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, এস এলাহী।

—কোথায় ?

—তোমার বাড়িতে। তোমার মেয়েকে একবার আমি দেখব। যদি দরকার হয়, আমার বাড়িতে এনে চিকিৎসা করব ওর। তোমার আপত্তি নেই তো ?

—আপনার বাড়িতে !

—হ্যাঁ, আমার বাড়িতে। আমি একবার শেষ চেষ্টা করব এলাহী।

এলাহী এবার ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল : মাস্টার সাহেব !

বিরক্ত গলায় আলিমুদ্দিন বললেন, চল, চল। বেশি দেরি করো না। আমার আবার সময় নেই, এখুনি সোজা শাহের বাড়িতে দৌড়তে হবে।

ফতে শা পাঠান গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। ঘন ঘন পাক দিচ্ছিলেন কাঁকড়াবিছের লেজের মতো গোঁফজোড়ায়। মামলাটা অত্যন্ত জটিল—কোনোদিকেই রায় দেওয়া সহজ নয় তাঁর পক্ষে। খোদাবক্স খন্দকার তাঁর নিজের আত্মীয়, তার অপমানের আঁচটা তাঁরও গায়ে লাগে। অন্য সময় হলে এতক্ষণ দুটো পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে বেঁধে আনতেন মাস্টারকে, জুতোর ব্যবস্থা করতেন তাঁর কাছারি-বাড়ির সামনে। কিন্তু মাস্টারের গায়ে হাত দেওয়া সহজ নয়। গ্রামের লোকের মনে জনপ্রিয়তার এমন একটা জায়গা করে নিয়েছেন মাস্টার, যে বেশি কিছু করতে গেলে ঘটনাটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে।

তা ছাড়া আপাতত যেমন করে হোক ওই লোকটাকে তাঁর মুঠোর মধ্যে রাখা চাই। অনেক উপকার হবে—অনেক কাজ হবে। অফুরন্ত সুযোগ আসছে। প্রজাদের ভেতর ঘনিয়ে-আসা অসন্তোষের স্রোতকে উল্‌টো পথে চালিয়ে দেবার প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়াবে ওই মাস্টার। তারপর ওই বশ-না-মানা সাঁওতালেরা। কিছুতেই জব্দ করতে পারেননি—ওই খাজনা-না-দেওয়া তীর-শানানো মানুষগুলো তাঁর বুকের মধ্যে বিঁধে আছে কাঁটার মতো। সবশেষে কুমার ভৈরবনারায়ণ—পাশাপাশি বাস করা কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এক ঢিলে শুধু দুটো নয়—এক ঝাঁক পাখি বধ করবার প্রতিশ্রুতি। একটা কাঁচা কাজের ভেতর দিয়ে এতখানি ভবিষ্যৎকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গোঁ গোঁ করতে করতে খোদাবক্স বললেন, এর যদি ব্যবস্থা না করেন, তা হলে আমি আদালতে যাব।

—আহা-হা দাঁড়াও, ছেলেমানুষি করছ কেন ?—বিপন্ন স্বরে বললেন ফতে শা।

—ছেলেমানুষি !—খাঁচার ভেতরে খোঁচা-খাওয়া একটা বানরের মতো মুখ খিঁচোলেন ডাক্তার : রাস্তার মাঝখানে আমায় ঘুষি মারল, দাঁত দিয়ে এখনো রক্ত পড়ছে। তার ওপর মানহানি ! আপনি একে ছেলেমানুষি বলবেন ভাইজান !

—দাঁড়াও, দাঁড়াও—দেখছি ! আঃ—কী মুশকিল !—আবার গোঁফের প্রান্ত দুটো

পাকালেন শাহ্।

—আমি আপনাকে বলে রাখছি—ডাক্তার চৌকির ওপরে একটা হিংস্র কিল মারলেন —বলে রাখছি—

কিন্তু বলাটা শেষ হল না। তার আগে বারান্দায় চটির শব্দ উঠল। ঘরে ঢুকলেন আলিমুদ্দিন।

—আদাব মাস্টার সাহেব, আসুন, আসুন—কেমন যেন থতমত খেয়ে স্বাগত জানালেন শাহ্। ডাক্তার আগ্নেয় চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে দিলেন দেওয়ালের আরেক দিকে।

আলিমুদ্দিন শাহের অভিবাদনের কোনো জবাব দিলেন না। সোজা এগিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে।

—মাফ করুন ডাক্তার সাহেব।

অকৃত্রিম বিস্ময়ে খোদাবক্স ঘাড় ফেরালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে না পেরে হতভম্বভাবে মুখটাকে আধখানা ফাঁক করে রইলেন ফতে শা।

আলিমুদ্দিন বললেন, ভারি অন্যায় করে ফেলেছি—ঝোঁকের ওপর মাথার ঠিক ছিল না। মাফ করুন।

ফতে শাহ্ স্বাভাবিক হয়ে এলেন আগে।

—বাঃ, তবে তো চুকে-বুকেই গেল। কি বল খোদাবক্স?

খোদাবক্স হাঁড়ির মতো মুখে বসে রইলেন!

দু হাত জুড়ে নাছোড়বান্দা আলিমুদ্দিন বললেন, বলুন, মাফ করলেন? আর তা ছাড়া আমার এই অন্যায়ের জন্যে শাহ্ যদি কিছু জরিমানা করেন, তাও দিতে রাজী আছি আমি।

এবার খোদাবক্সের হয়ে শাহ্ই তাড়াতাড়ি কথা কয়ে উঠলেন: আরে না—না, সে কি কথা! এ তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার। কখনো কখনো মানুষমাত্রেরই মাথা গরম হতে পারে ওরকম। এর জন্যে এত ঝামেলা করবার কি আছে। খোদাবক্স তো আমার ভাই হয়, ওর তরফ থেকেই আমি বলছি—আপনি নিজে যখন মাফ চাইলেন, সেই সঙ্গেই সব চুকে-বুকে গেল।

—হ্যাঁ, তাহলে চুকে-বুকেই গেল। আর এ নিয়ে ঝামেলা করবার কি আছে?—শাহের কথাগুলোরই কেমন একটা পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার, তার ভেতরে একটা ব্যঙ্গের খাদও মেশানো রইল কিনা, বোঝা গেল না। কিন্তু তার পরেই ছটফট করে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার: আমি যাই ফতে ভাই। তালুকগাঁয়ে আমার তিন-চারটে রুগী আছে।

ডাক্তারের সাইকেলের শব্দ অনেকদূর মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো কথা কইলেন না কেউ। তারও পরে শট্‌কায় নল তুলে একটা টান দিলেন ফতে শা, একবার নড়ে-চড়ে

বললেন আলিমুদ্দিন। কি যে ঠিক বলা উচিত, খুঁজে পেলেন না শাহ্‌ ; আর আলিমুদ্দিন যেন তলিয়ে রইলেন নিজের মধ্যেই।

তার পর :

হঠাৎ কি একটা মনে পড়ল শাহুর। মনে পড়ল, খোদাবক্স আসবার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি।

—হ্যাঁ, সকালে আপনার চাকর জিব্রাইলকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়েছিলাম। পাননি ?

—পেয়েছিলাম।—অন্যমনস্কভাবে মাস্টার জবাব দিলেন।

—এলেন না তো।

—আসব মনে করেছিলাম, সময় পাইনি।

—ওঃ।—শাহ্‌ একটু চুপ করে রইলেন : লীগের নামে খুব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ টাকা চাঁদা উঠেছে, আরো উঠবে মনে হয়।

—খুব ভালো কথা !—নিজের অজ্ঞাতেই একটা উৎসাহের উত্তাপ অনুভব করলেন আলিমুদ্দিন।

—আজ বিকেলে তাদের জমায়েত হবার ঢোল দিয়েছি। আপনি তাদের লীগের উদ্দেশ্য, তার কাজ—সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন। তা ছাড়া কাল সন্ধ্যেয় আমার এক ভাই ইসমাইলও এসেছে সিরাজগঞ্জ থেকে। সে তো সব কথা শুনে লাফিয়ে উঠল। ওদিকে তারা খুব কাজ করেছে, এখানে যে এতদিন কিছু হয়নি, শুনে একেবারে তাজ্জব বনে গেল। সেও কিছু বলবে।

—বেশ তো।—এতক্ষণে আলিমুদ্দিন হাসলেন।

—সকালে আপনাকে ডেকেছিলাম—একটু অনুযোগভরা স্বরেই শাহ্‌ বললেন, ইসমাইলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। আপনি এলেন না—সে শিকারে বেরিয়ে গেল। ফিরতে অনেক দেরি হবে।

—আচ্ছা, বিকেলেই আলাপ হবে না হয়।—আলিমুদ্দিন ক্লান্তভাবে একটা হাই তুললেন : আর কোনো কথা আছে ?

—না, এই জন্যেই ডাকছিলাম।

—তাহলে আমি এখন উঠি শাহ্‌। আমার এখনো খানাপিনা হয়নি।

—বলেন কি—এত বেলায় !—শাহ্‌ চমকে উঠলেন : তাহলে এখানেই—

—নাঃ, থাক থাক। জিব্রাইল বসে থাকবে। আদাব তাহলে—আলিমুদ্দিন উঠে পড়লেন : বিকেলে তাহলে জমায়েতের সময়েই দেখা হবে।

কিন্তু বিকেলের জমায়েতে যা ঘটল, তার জন্যে আগে থেকে কারু মনে এতটুকুও

আশঙ্কা ছিল না। শুধু ঝড়ই এল না—বজ্রও ভেঙে পড়ল আকাশ থেকে।

এগারো

রেশমের কুঠির শ্রীহীন কম্পাউণ্ডটার মাঝখানে দার্শনিকের মতো নিরাসক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ক্রু সাহেব।

দৃষ্টিটা আকাশের দিকে। একটা বিশাল কালো কম্বলের কয়েকটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে কালো মেঘের টুকরো। চারদিকের পোড়া মাটি থেকে একটা ভাপ উঠছে খানিক তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো। শুকনো কলাপাতার মতো মরা ঘাসের রঙ। জলহীন খানা-ডোবার ফাটলে ফাটলে একরাশ শুঁটকি মাছের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে জীওল মাছের ঝাঁক; তিনহাত মাটির নিচে শক্ত খোলার ভেতরে পা মুখ গুটিয়ে নিয়ে যোগমগ্ন আছে 'দুরা'র দল—সাঁওতালেরা এখনো ওদের সন্ধান পাবে না।

কিন্তু কবে?

একটা অদ্ভুত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ক্রু সাহেব। দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ জুড়ে ছুটে আসবে মহানন্দা-পুনর্ভবা-আত্রাইয়ের জল, দাম ঘাসের শীষকে বারো হাত লম্বা করে দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ খেলবে সীমাহীন চাফালে চাফালে? আর চাফাল থেকে সেই জল বয়ে আসবে এই শুকনো কাঁদড়ের সংকীর্ণ খাত দিয়ে—বয়ে নিয়ে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে মাটির তলায় সন্তর্পণে পুঁতে রাখা বাদামী রঙের সেই হাড়গুলিকে?

খুন। সে খুন করেছে।

নিজের হাত দুটো চোখের সামনে বাড়িয়ে ধরল ক্রু সাহেব। যেন মণিবন্ধের হাড় দুটো তার ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, তাই আঙুলগুলো অসহায়ভাবে কাঁপছে থর থর করে—তাদের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই তার। দিনের পর দিন, বছরের পর বছরগুলি মনের যে অন্ধকার সংকীর্ণতার স্তরে স্তরে মাকড়শার জাল বুনেছিল—জটাধর সিংয়ের খুন সেই জালটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

তখনো মার্থা আসেনি জীবনে, তখনো আরম্ভ হয়নি এমন একটা শান্ত-নিরীহ অহিংস অধ্যায়। পার্সিভ্যাল ক্যাক্রুর উদ্দাম রক্ত ধমনীতে ধমনীতে সেদিন মাতলামি করে ফিরেছে। কালো মায়ের তপ্ত কামনার সঙ্গে বাপের মত্ত লালসার প্রেরণায় সেদিন—

একটার পর একটা উল্কা ঝড়ে-পড়া সেপ্টেম্বরের রাত্রে—চামড়ার মতো পুরু নিরেট অন্ধকারে—হাওয়ায় শিরশিরানি-লাগা ঘন বেনাবনের মধ্যে। বার কয়েক দপ দপ করে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বেজে উঠেই—হঠাৎ একটা ফাটা ফুটবল-ব্লাডারের মতো চুপসে থেমে গিয়েছিল হৃৎপিণ্ডটা। হাতের তলায় সেটা স্পষ্ট টের পেয়েছিল স্কাইদ ক্যাক্রু; টের

পেয়েছিল কেমন করে শরীরের উত্তাপ নিবে গিয়ে তা ক্রমশ শীতল আর আড়ষ্ট হয়ে আসতে থাকে।

—হ্যালো স্মাইদ !

কোথায় যেন বিস্ফোরণ ঘটল ডিনামাইটে। উৎক্ষেপে যেন দোলা খেয়ে উঠল পায়ের তলার মাটিটা।

—হ্যালো স্মাইদ !

ভগবানের ভুল হতে পারে, শয়তানের ভুল হওয়াও সম্ভব, কিন্তু অ্যালবার্টের নয়। তিব্বতের কোনো পাহাড়ী গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাকলেও সে ঠিক আবিষ্কার করে ফেলত। প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব দিয়ে থাকলেও ডুবুরী হয়ে ঠিক গিয়ে চেপে ধরত অ্যালবার্ট।

ফোড়ার মধ্যে ছুরি বসিয়ে ডাক্তার রুগীকে হাসতে বললে কেমন দেখায়, সেটা অভিব্যক্ত হল ক্রু সাহেবের মুখে। একটা প্রাণান্তিক মোহিনী হাসি হেসে বললে, হ্যালো অ্যালবার্ট !

—অনেক খুঁজে আসতে হল—পিঠের ওপর একজোড়া বন্দুকের ভারে কুঁজো হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অ্যালবার্ট বললে, সে রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার—একেবারে মঙ্গোপার্কের মতো।

মঙ্গোপার্কের পরিণামটা তোমারও ঘটলে আমি বেঁচে যেতাম—মনে মনে দাঁত খিঁচিয়ে বললেও বাইরে দেঁতো হাসিটা বজায় রাখতেই হল ক্যারুকে : কিন্তু আজকে তো তোমার—

—না, আমার আসবার প্ল্যান ছিল আগামী কাল সকালে। কিন্তু শিকারের লোভে মনটা এমন ছট্‌ফট করছিল যে একটা দিনও আর দেরি করতে ইচ্ছে করল না। তা ছাড়া ভাবলাম, তোমাকে একটা সারপ্রাইজও দেব, তাই—

—কিন্তু তোমার তো খুব কষ্ট হল। যদি কাল সকালের ট্রেনে আসতে তা হলে এসব ট্রাবল হত না—এতক্ষণে একটা আশ্বস্ত আত্মপ্রত্যয়ের স্বর ফুটল ক্যারুর গলায়। সত্যিই তো, কালকের ট্রেনে যদি অ্যালবার্ট আসত, তাহলে কি হত কে বলতে পারে ? কে বলতে পারে একখানা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যেত না, একটা রাজকীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করে আনত না অ্যালবার্টকে ? একটা রাত্রি—একটা সম্পূর্ণ রাত্রি ছিল তার হাতে। সে রাত্রিটিতে কি হতে পারত, আর কি যে হতে পারত না—তা তো অ্যালবার্টের জানার কথা নয় !

—একটা মন্দ অ্যাডভেঞ্চার তো হল না !—কাঁধের ওপর দুটো বন্দুকের ভার বয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অ্যালবার্ট তাকাল নিজের ট্রাউজারের দিকে। পা থেকে শুরু করে কোমর

পর্যন্ত লাল-কালো কাদায় একাকার ; চকচকে জুতোজোড়ার আভিজাত্য একরাশ কাদার প্রলেপে চাপা পড়ে গেছে। নিয়াঙ্গটা করুণ চোখে লক্ষ্য করে অ্যালবার্ট বললে, ট্রাবলও অবশ্য দিয়েছে কিছু কিছু।

—তাই তো, ছিঃ ছিঃ—সখেদে জানাল ক্রু সাহেব ; কিন্তু মনের মধ্যে যেন একটা হিংস্র উল্লাস সাড়া দিয়ে বললে, বেশ হয়েছে। যেমন অকারণে ভূতের মতো পরের ঘাড়ে এসে চেপে বসতে চাও, উপযুক্ত একটা শিক্ষা হয়েছে তার। শুধু কাদা কেন, কাঁদড়ের ভেতর তুমি ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকলেই আমি সত্যিকারের খুশী হতাম।

পাক্কা বারো মাইল পথ ঠেঙিয়ে এখন অ্যালবার্টের প্রায় নাভিশ্বাস। শুধু কাঁধের ওপর জুটো বন্দুক ঝুলছে তাই নয়—হাতে একটা আধ-মণি সুটকেস। ক্যারুর প্ল্যান্টেশনের স্বপ্ন-স্বর্গে আসবার খেশারত ইতিমধ্যেই অনেকখানি দিতে হয়েছে অ্যালবার্টকে। মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে ঘুমবার আশায় গল্পের যে লোকটি খাটিয়া সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারপর সারা দুপুর যাকে সেই খাটিয়া পিঠে বেঁধে মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় ছুটতে হয়েছিল পলাতক গরুর পিছে পিছে—অ্যালবার্টের সেই দশা এখন।

নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল :

—কি হে স্মাইদ, এখন কি এখানে ঠায় দাঁড় করিয়ে রসালাপ করবে, না তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটু বসতে দেবে ?

—ওহো—সো সরি !—চোখ কান বুজে হেডিস কিংবা লিম্বোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার মতো ক্রু সাহেব বললে, এস, এস। ওই আমার কুঠি।

কুঠি নয়—ভয়াবহ জঙ্গল। কালো জাগুয়ারের মতো থাবা পেতে বসে আছে মার্থা ক্যারু ! ও ক্রাইস্ট—ও হোলি শেফার্ড, এই মহা-সংকটে নিরীহ মেষশাবক ক্রু সাহেবকে রক্ষা কর প্রভু ! ইহুদীদের অমন ক্রুশের ঘা সইতে পেরেছ, আর মার্থার দাঁতের ধার একটু সহ্য করতে পারবে না ? হে মানবপুত্র, ইচ্ছে করলে তুমি সব পার !

ধরা ইঁদুরকে নিয়ে বেড়াল যেমন কিছুক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে খেলা করতে থাকে তেমনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে, সহজ আন্তরিকতায় অ্যালবার্টকে আহ্বান এবং স্বাগত জানাল মার্থা।

পাছে অ্যালবার্ট আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্থা তার স্বাভাবিক গলাবাজানো শুরু করে, এই ভয়ে আগে থেকেই হুঁশিয়ার হতে চাইল ক্রু সাহেব। বেশ শক্ত করে, আটঘাট বেঁধে।

—খুব বড় ঘরের ছেলে অ্যালবার্ট।

মার্থা সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

—ওর এক কাকা লর্ড। আর্ল অফ—আর্ল অফ—সাহায্যের আশায় স্মাইদ এবার কাতর দৃষ্টিতে তাকাল অ্যালবার্টের দিকে।

অ্যালবার্ট তখন ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কর্দমাক্ত জুতোটার ফিতে খুল-

ছিল। মাথা না তুলেই ক্রু সাহেবের অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে দিলে : আর্ল অফ ব্রেটন-ব্রুকশায়ার, নর্থ এক্সিটার।

ব্রেটনব্রুকশায়ার—নর্থ এক্সিটার! গালভারি শব্দ দুটো বোমার আওয়াজের মতো ক্রু সাহেবের নিজের কানেই ভয়াবহ শোনাল। এই দুটো প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর নামের কি প্রতিক্রিয়া মার্থার ওপরে ঘটে, সেটা লক্ষ্য করবার জন্য ক্রু সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর দিকে।

না, লক্ষ্য একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চমক লেগে রইল মার্থার মুখে চোখে। গোল্ডার্স গ্রীনে কোনো এক ক্যারুজ-এর অবাস্তব একটা কল্পমূর্তি নয়; অ্যালবার্টের মধ্যে সার আছে, ভার আছে। গলার টাই-পিন, জামা আর হাতের বোতাম খাঁটি সোনার; বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের আংটিটায় সবুজাভ এক টুকরো পাথর ঝলমল করছে—হীরে হওয়াই সম্ভব; ধুলো-কাদায় মাথা বেশ-বাসে স্পষ্টই সচ্ছলতার ছাপ; আপাতত পুরু একটা কাদার প্রলেপের নিচে ঢাকা পড়লেও জুতো-জোড়া যে খাঁটি পেটেণ্ট লেদারের, তাতেও সন্দেহ নেই।

মেয়েদের জন্মগত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির সাহায্যে মিনিট তিনেকের মধ্যে এতগুলো জিনিস আবিষ্কার করল মার্থা। আরো আবিষ্কার করল—অ্যালবার্টের চুলের রঙ সোনালী, গায়ের বর্ণ তুষারশুভ্র, মার্থার হাতের 'ক্যাটস আই' পাথরটার মতো চোখের তারা।

আর পাশাপাশি ক্যারু? কালো মায়ের নির্ভুল কালো ছেলে; পার্সিভ্যালের এতটুকু চিহ্ন কোনোখানে খুঁজে পাওয়ার জো নেই।

এক চোখে বিরাগ আর এক চোখে বিমুগ্ধ বিস্ময় ফুটিয়ে মার্থা বললে, হাত মুখ ধুয়ে তাজা হয়ে নিন মিস্টার ফিলিপসন—আমার চা এখনি তৈরি হয়ে যাবে।

জুতোটার তত্ত্বাবধান করতে করতে মাথা না তুলেই অ্যালবার্ট বললে, অনেক ধন্যবাদ।

আর্ল অফ ব্রেটনব্রুকশায়ার, নর্থ এক্সিটার—শব্দ দুটোকে কানের মধ্যে ভরে নিয়ে চায়ের সন্ধানে চলে গেল মার্থা।

শুধু ক্রু সাহেব দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ হয়ে। এখনো সামলে নেয়নি অ্যালবার্ট, এখনো ঠিক ধাতস্থ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু একটু পরে? মিথ্যার বালির বাঁধটা ধ্বসে একাকার হয়ে গেছে; কোনো অলৌকিক উপায়ে এখন অ্যালবার্টকে দেখানো যাবে সারি সারি ফলন্ত আখরোটের বন, টলটলে নীল জলের নদীতে কার্পের ঝাঁক, ছবির মতো পামগাছের সারি? কোন ইন্দ্রজাল দিয়ে সৃষ্টি করা যাবে পার্সিভ্যালের সেই জমজমাট রেশমের কুঠি—একখানা নয়, দু-দুখানা মোটর গাড়ি?

ক্রু সাহেবের কপালে ঘামের ফোঁটা জমতে লাগল।

জুতোটাকে ছুঁড়ে ফেলে অ্যালবার্ট ক্লান্তভাবে শরীরটা মেলে দিলে।

—আঃ!

ক্রু সাহেব অপেক্ষা করতে লাগল বলির পশুর মতো।

—কি বিশ্রী কাদা এদিককার! উঠতে চায় না কিছুতেই।

—হ্যাঁ, এঁটেল মাটি।—সভয়ে জবাব দিলে ক্রু সাহেব। যেন মাটিটা তারই হাতে তৈরি—সেই অপরাধে কৈফিয়ত দিয়ে নিচ্ছে একটা।

—পথে খানা-খন্দলও খুব।

—বর্ষার জল আসে।—ফিসফিসে গলায় ক্রু সাহেব জানাল।

—বস না, দাঁড়িয়ে আছ কেন?—সহজ অন্তরঙ্গতায় অ্যালবার্ট বলল।

বসতে ভয় করে। কেমন শক্তিহীন হয়ে পড়বে, ইচ্ছে করলেই উঠে পালাতে পারবে না। তবু বসতেই হল। শরীরের কোথাও একবিন্দু জোর নেই, যেন সাতদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে।

যে ঘরটায় দুজনে বসেছে—এটাই ক্রু সাহেবের ড্রয়িংরুম। পার্সিভ্যালের আমলে ঝলমল করত শ্রী-সমৃদ্ধিতে, মেঝেতে ছিল দুই-ঞ্চি পুরু রঙ-বেরঙের ছবি আঁকা কাশ্মীরী কার্পেট; ছিল সোফা-সেটি, গদি-মোড়া চওড়া চওড়া বেতের চেয়ার। এখন সে কাশ্মীরী কার্পেট কুঠিবাড়ির কোনো ছাত-ফাটা, অন্ধকার ঘরে একরাশ ধুলোর মধ্যে লজ্জায় বিলীন হয়ে গেছে; সোফা-সেটি কোন মন্ত্রবলে ডানা মেলে উড়ে গেল ক্যাক্স সাহেবের নিজেরই তা ভালো করে জানা নেই। ভাঙা বেতের চেয়ারগুলিতে ছারপোকার বংশ খেয়ে-দেয়ে আরশোলার আকার ধারণ করছিল—মার্থা তাই সেগুলোকে বাড়ির পেছনে আস্তাকুঁড়ে বিদায় করেছে।

সিমেন্টের চটা-ওঠা মেঝেতে এখন খানকয়েক কাঁটাল কাঠের চেয়ার; শুধু সেদিনের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে ঘরে টিঁকে আছে বার্মা ও সেগুনের একখানা বার্নিশ-ওঠা ভারি টেবিল; একটা জীর্ণদশা হ্যাটর‍্যাক! দেওয়ালে ফাটা কাঁচের ফ্রেমে বিবর্ণ কয়েকখানা ছবি—ঔপনিবেশিক ইংরেজের রুচিমাফিক খানকতক শিকারের চিত্র, ক্যাভালরি চার্জের একটা রোমহর্ষক ব্যাপার, রঙ-জলে-যাওয়া সোনালী ফ্রেমে একখানা পঞ্চম জর্জের ছবি, তার তলায় ল্যাটিন হরফে 'গড সেভ দ্য কিং'। আর আছে সবুজ ফ্রেমে ওভ্যালশেপের বড় একখানা ব্রেজিলিয়ান আয়না—পারা উঠে গিয়ে তার ভেতরে ফুটেছে বসন্তের ক্ষতাঙ্কের মতো একরাশ বিন্দুচিহ্ন—কাচের ওপর কুয়াশার মতো একটা ঝাপসা আবরণ!

গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে টানা-পাখার শূন্য হুকে মাকড়শার জাল পর্যন্ত কিছুই দৃষ্টি এড়াল না অ্যালবার্টের। মৃদু হেসে পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করল। একটা সিগারেট দিলে ক্রু সাহেবকে, একটা নিজে ধরালো।

স্তব্ধতা। কি বলা যাবে কেউ খুঁজে পেল না খানিকক্ষণ।

তবু অ্যালবার্টই নীরবতা ভাঙল।

—এখানে তোমরা কতদিন আছ?

—প্রায় চল্লিশ বৎসর।—বলতে গিয়ে ক্রু সাহেব সিগারেটের গোড়াটা চিবিয়ে ফেলল।

কিন্তু আর যাই হোক, নিষ্ঠুর নয় অ্যালবার্ট। বন্দুক দেখেই যে পাখি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তার ওপর অকারণে আরো দুটো একটা টোটা খরচ করবার প্রবৃত্তি নেই তার। আর তা ছাড়া মদের নেশা। সেই নেশার ঝোঁকে নিজের অতৃপ্ত কামনাগুলোর ওপর কল্পনার রঙ ফলিয়েছিল স্মাইদ। তার দোষ নেই।

সুতরাং অ্যালবার্ট সমস্ত জিনিসটাকে পাশ কাটিয়ে গেল।

—তোমাদের বাড়িটা একটু পুরনো হলেও নেহাত খারাপ নয়।

—হুঁ।

—বেশ খোলামেলা। চারিদিকে চমৎকার মুক্ত প্রকৃতি।

ঠাট্টা করছে নাকি? ক্রু সাহেব বুঝতে পারল না। একবারের জন্যে মাথা তুলেই চোখ নামিয়ে নিলে।

—শহর থেকে এখানে এসে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছি। আঃ—কী মিষ্টি এই মাঠের হাওয়া! গাছপালাগুলোকেও কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

ঠাট্টা? ক্রু সাহেব একটা ঢোঁক গিলল। যদি ঠাট্টাও হয়—তবু কি অদ্ভুত কৃতিত্ব অ্যালবার্টের! ছুরি যদিও চালিয়ে থাকে, তার আগে ব্যবহার করেছে মর্ফিয়া—বেদনা বিন্দুমাত্র টের পাবার উপায় নেই!

—হুঁ।

—এই সব কুঠিবাড়ির ওপরে একটা আশ্চর্য মোহ আছে আমার। ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন ক্যাসলগুলোতে গেলে এইরকম একটা অপূর্ব অনুভূতি টের পাই। বাড়ি আর বিচিত্র প্রকৃতি মিলে যেন একটা ঘুমন্ত অতীতকে জাগিয়ে তোলে। বর্তমানটাকেই কেমন অবাস্তব বলে বোধ হতে থাকে তখন।

কাব্য করছে নাকি অ্যালবার্ট? না ব্যঙ্গকাব্য?

এবার সাহসে ভর করে ক্রু সাহেব সোজা তাকিয়ে দেখল। না—ব্যঙ্গের চিহ্নও কোথাও নেই। নিজের মধ্যে যেন মগ্ন হয়ে গেছে অ্যালবার্ট, হারিয়ে গেছে নিজের ভাবনার গভীরে। চোখ দুটোতে একটা মুগ্ধ তন্ময়তা। সে কি বাড়ির প্রভাবেই? না—ইংলণ্ডের সেই অতীতের ঘন ছায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন অতিকায় ক্যাসলগুলির স্বপ্ন-স্মৃতিতে?

দিগন্তের সবুজ গাছগুলি ছাড়িয়ে আরো দূরে সঞ্চার করে ফিরল অ্যালবার্টের দৃষ্টি।

—আচ্ছা, আকাশের কোলে ওই যে নীল মেঘের মতো রেখা—ওটাই কি হিমালয়ান রেঞ্জ ?

—ওর নাম—তি—তিন পাহাড় !—বাংলাদেশের ভূগোল সম্পর্কে অ্যালবার্টের জ্ঞানটা খুব মারাত্মক নয়, এমনি প্রত্যাশা করে ক্রু সাহেব বললে, তা হিমালয়ান রেঞ্জই বলতে পার বই কি।

—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তো! ঠিক যেন একটা মোষের পিঠের মতো মনে হচ্ছে।

—হুঁ!

—আচ্ছা, মাউণ্ট এভারেস্ট দেখা যায় না এখান থেকে? আর কাঞ্চনজঙ্ঘা? স্নো ভিউ?

এত বড় মিথ্যে কথা কি করে বলা যায় আর? জবাব দিতে হল, না।

—তবুও এও মন্দ নয়।—হাতের সিগারেটটার কথা ভুলে গিয়ে অ্যালবার্ট পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল।

—চা এসেছে।

বীণার ঝঙ্কারের মতো শোনাল মার্থার গলা, চমকে দুজনেই ফিরে তাকাল। মার্থার এ গলা ক্যাক্ সাহেব সর্বশেষ শুনেছিল জীবনের পূর্বরাগ-পর্বে। তারপর এতকাল ধরে ফাটা-কাঁসরের পালাই চলে এসেছে।

শুধু তাই নয়। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই আশ্চর্যভাবে নিজের ভোল বদলে ফেলেছে মার্থা। কোন ফাঁকে বিগত কোন ক্রিসমাসের একটা ভালো পোশাক তুলে রেখেছিল, সেইটে পরে এসেছে, গালে মুখে পড়েছে প্রসাধনের একটা লঘু প্রলেপ। হঠাৎ যেন দশ বছর আগেকার কিশোরী মার্থা নবজন্ম লাভ করেছে।

আরো আছে। পুরনো কাঠের বাক্সটা থেকে কি করে খুঁজে এনেছে সে-আমলের একটা আর্দালীর পোশাক। চাপিয়েছে রাজবংশী চাকরটার গায়ে। দু-একটা জায়গায় পোকায় কেটেছে বটে, তবু তো মন্দ দেখাচ্ছে না একেবারে!

চাকরটা সামনে টেবিলের ওপর একটা কাঠের ট্রেতে করে চা আর খাবার রাখল। কোথা পেল মার্থা চিনির চা—কেমন করে এল সাদা রুটি, একটুখানি মাখন, দুটো ডিম? বিহ্বল হয়ে ক্যাক্ সাহেব বসে রইল।

ক্ষুধার্ত অ্যালবার্ট গোগ্রাসে রুটি-ডিম গিলতে লাগল, আর মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফেলতে লাগল মার্থার ওপরে।

কিন্তু শুধুই কি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, না আরো কিছু? আজ ক্যাক্‌র মনে হল, দশ বছর আগে কিশোরী মার্থা সত্যিই সুন্দরী ছিল তাহলে। হোক নেটিভ ক্রীশ্চানের মেয়ে, তবু ফর্সার দিকেই তার গায়ের রঙ, চোখের তারা দুটো আশ্চর্য গভীর—মুখে একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা।

আরো আশ্চর্য, মার্থার বাঁ গালে একটা ছোট তিল যে আছে—সেটাও কেন এতদিন তার চোখে পড়েনি?

—তুমি চুপ করে বসে আছ কেন? চা খাবে না?

সম্ভাষণটা ক্যারুর প্রতি। এবার আর বীণা বাজল না, ফাটা-কাঁসরের রেশটা অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পাওয়া গেল।

—হ্যাঁ, এই যে নিই—থতমত খেয়ে একটা চায়ের কাপ কোলের দিকে টেনে নিলে ক্রু সাহেব।

খাবার শেষ করে রুমালে মুখটা মুছে নিলে অ্যালবার্ট। মার্থাকে পরিতৃপ্ত স্বরে জানাল, অশেষ ধন্যবাদ।

মার্থা হাসল। ক্রু সাহেবের আবার মনে হল অদ্ভুত সাদা ওর দাঁতগুলি!

মার্থা বললে, এই পাড়াগাঁয়ে যখন এসে পড়েছেন, তখন এ কষ্টটুকু করতেই হবে। এখানে এ ছাড়া আর কিছুই তো পাওয়া যায় না।

বেশ ভালো ইংরেজি বলে তো মার্থা। সহজ, সুন্দর, চমৎকার নির্ভুল উচ্চারণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিশনারী বাপের মেয়ে—দার্জিলিংয়ের কি একটা স্কুল থেকে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাস করেছিল বটে। আর এই মার্থাকে এতকাল ভুলে ছিল স্মাইদ ক্যারু—ভুলে ছিল দীর্ঘ দশ বছর ধরে। গোল্ডার্স গ্রীনে ক্যারু কোম্পানির জাগ্রত স্বপ্নে এতদিন এই বাস্তব জগৎটা কোন্‌খানে হারিয়ে গিয়েছিল?

ক্যারুর কালো হাতের পাশে ধবধবে সাদা একখানা হাত অ্যালবার্টের। সে হাতের কড়ে আঙুলে চকচক করছে ঈষৎ হরিৎ একখণ্ড পাথর—হীরেই নিশ্চয়। সোনালী রঙের চুলে ঝকঝক করছে বিকেলের সোনালী আলো। এই-ই পার্সিভ্যালের সত্যিকারের স্বজাতি, তার সগোত্র। আপাদমস্তক এমন একটা অনন্যতা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে এর পাশাপাশি কালো মায়ের কালো ছেলে এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেছে। যেন অবচেতন মনে হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছে, অমন করে তাকে পথের ধুলোয় ফেলে দিয়ে কেন সেদিন চলে গিয়েছিল পার্সিভ্যাল ক্যারু!

—আপনি কখনো যাননি ইয়োরোপে?—মার্থার প্রতি অ্যালবার্টের একটা উজ্জ্বল প্রসন্ন প্রশ্ন।

—নাঃ—মার্থার দীর্ঘশ্বাস।

—যাবেন একবার। দেখে আসবেন।—মার্থাকে অ্যালবার্ট বলে চলল, যদি আগে থেকেই খবর দেন, আমিও না হয় সহযাত্রী হব। তারপর আমাদের ওখানে দু-চারদিন আতিথ্য নিয়ে আসবেন।

ক্যারু সাহেব চুপ করে বসে রইল। এ আলাপের মধ্যে তার আজ কোথাও স্থান নেই,

সে যেন একান্তই অনাহূত, অবাঞ্ছিত আগন্তুক। এখানে অ্যালবার্ট পার্সিভ্যালের সগোত্র —আর মার্থা? মার্থা যেন হঠাৎ দশ বছর আগেকার কুমারী জীবনে ফিরে গেছে,— পরিচ্ছন্ন, কমনীয় একটি বিদুষী মেয়ে। গোল্ডার্স গ্রীনের স্বপ্ন না দেখালে যে মার্থাকে কোনোদিন জয় করা যেত না।

ক্যাক্ল শুনে যেতে লাগল!

—যাবেন এক্সিটারে। দেখে খুশী হবেন।

—কি আছে দেখবার?—মার্থার সাগ্রহ প্রশ্ন।

—সেন্ট পিটারস ক্যাথিড্রাল। আটশো বছর আগেকার।

—আর?

—আর জয়স্তম্ভ। উইলিয়াম দি কঙ্কারার তৈরী করিয়েছিলেন।

—এক্সিটার।—চোখ বুজে মার্থা দেখতে লাগল।

—ওখান থেকে কিছু দূরেই ব্রেনব্রুকশায়ার। সেইখানে আমাদের বাড়ি ব্রুকশায়ার হল। ছবির মতো একেবারে। বড বড় পপলার গাছের ছায়া। হনিসাক্‌লে ঢাকা বাড়িগুলি। পপিতে আলো-করা বাগান, রাশি রাশি পাকা আপেল আর হট-হাউস ভরা স্ট্রবেরি।

ক্রু সাহেব যেমন করে তার প্ল্যান্টেশনের গল্প বলেছিল, এ কি তাই? ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা বুঝতে পারল এই মুহূর্তে মার্থা আর অ্যালবার্টের মধ্যে সে যেন কোথাও নেই। একটা অনধিকারীর মতো সসম্ভ্রমে অনেকখানি দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছে।

মাঠের ওপারে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে আসবার আগেই উঠল ঝিঁঝির ডাক। কুঠিবাড়ির কব্জাভাঙা জানালা বাতাসে আর্তনাদ তুলতে লাগল পেত্নীর কান্নার মতো।

মার্থা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আলো জ্বেলে আনি।

আশ্চর্য চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেল সে। আটশো বছর আগেকার সেণ্ট পিটারস্ ক্যাথিড্রাল তাকে হাতছানি দিচ্ছে, ডাক পাঠিয়েছে উইলিয়াম দি কঙ্কারারের সিটাডেল। হনিসাক্‌লের আবরণে ঢাকা বাড়িগুলির চারপাশ থেকে তার রক্তে হয়ত সাড়া দিয়েছে দীর্ঘকায় পপলার-বীথির মর্মর স্বর।

অ্যালবার্ট আবার সিগারেট ধরালো।

আর স্মাইদ ক্যাক্ল শুনতে পেল মাঠের ওপারে ডেকে উঠছে শেয়াল।

বারো

দারোগা তারণ তলাপাত্র সগৌরবে আহীরপাড়ায় গিয়ে পৌঁছুলেন।

বেশ সমারোহ করেই এসেছেন। বিশ্বাস নেই লোকগুলোকে। এক-একটার চেহারা

দেখলে হৃদ্‌কম্প হয় দস্তুরমতো।

রিভলবার নিয়েছেন, সঙ্গে ত্রিশ রাউণ্ড গুলি। এ.এস.আই. বদরুদ্দিনের সঙ্গে বন্দুক। তা ছাড়া বন্দুকধারী দুজন কনস্টেবল, জন আষ্টেক চৌকিদারও।

কনস্টেবল আর চৌকিদারদের আগেই রওনা করে দিয়েছিলেন; তারা যখন গ্রামের কাছাকাছি এসেছে, তখন সাইকেল নিয়ে তিনি আর বদরুদ্দিন এসে ধরেছেন তাদের। তারপর সন্ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে এসে ঢুকেছেন আহীরপাড়ায়।

নিমগাছের ছায়ার নিচে বড় একখানা আটচালা ঘর। আট-দশটা মহিষ চরছে আশে-পাশে। বরেন্দ্রভূমির মাঠের মহিষ। নিরীহ দুর্বল জীব নয়; বিশাল বপু—মাথার ওপর খরশৃঙ্গে আতঙ্কজনক সম্ভাবনা।

দারোগা বললেন, ওগুলো কি?

বদরুদ্দিন বললেন, মোষ স্যার।

তারণ চটে উঠলেন।

—মোষ যে তা আমিও জানি। আমি কি গরু যে আমায় মোষ চেনাতে এসেছেন? সে কথা বলছি না। মানে, ওগুলো গুঁতোয় কিনা?

বদরুদ্দিন সন্দিগ্ধ চোখে অতিকায় প্রাণীগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, কি করে বলব স্যার, আমার সঙ্গে তো ওদের আলাপ নেই।

তারণ একবার কটমট করে তাকালেন বদরুদ্দিনের দিকে।

বললেন, আলাপ থাকলে কি আর থানার এ.এস. আই. হতেন? ওইখানেই বাঁধা থাকতেন।

—কি বলছেন স্যার?—বদরুদ্দিনের চোখে বিদ্রোহ দেখা দিলে।

—না, কিছু না।—তারণ সামলে নিলেন। লীগের মন্ত্রিত্ব—কাউকে চটানো ঠিক নয়। সব ভাই-বেরাদারের দল। কখন পেছন থেকে চুকলি খেয়ে দেবে—তারপরেই ভবিষ্যতের পথটি একেবারে বন্ধ। আর কিছু না হোক, ট্রান্সফার তো নির্ঘাত। দুর্ঘটনা হিসেবে সেটাই কি কম মর্মান্তিক! এটা জেলার একটা বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল থানা—একদল অত্যাচারী জোতদারও আছে। সুতরাং প্রাপ্তিযোগের ব্যাপারে থানাটা অনেকের কাছেই লোভনীয়। পট করে যদি সদরের কাছাকাছি কোথাও বদলি করে দেয়, তাহলে বসে বসে বেলপাতাই শুঁকতে হবে খালি।

সুতরাং তারণ মৃদু হাসলেন: একটু রসিকতা করলাম আপনার সঙ্গে।

—ওসব রসিকতা আমার সঙ্গে করবেন না স্যার, আমার ভালো লাগে না।—হাঁড়ির মতো মুখ করে জবাব দিলেন বদরুদ্দিন।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছেন দুজনে। একটু পেছনে আসছে চৌকিদার আর কন-

স্টেবলরা। দিন দুই আগে কি করে একটা খাসি বাগিয়েছিলেন দারোগা, সেই সম্পর্কে সরল আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে। সুতরাং একটু দূরে থাকাই নিরাপদ।

একজন চৌকিদার বলছিল, তুমি বুঝি ভাগ পাও নাই চৌবেজী?

চৌবে ঘৃণাভরে জবাব দিলে, হামি গোস্-উস্ খাই না—ব্রাহ্মণ আছি।

—সব ব্রাহ্মণকেই চিনা আছে হে—দ্বিতীয় চৌকিদার মিটিমিটি হাসল।

চৌবে কানে আঙুল দিলে, ছিঃ ছিঃ—উ সব মত বলো।

দ্বিতীয় কনস্টেবল বামাচরণ বাঙালী। ক্লাস এইট পর্যন্ত বিদ্যা। একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে তার। থানায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে এল. সি.—লোকে তাকে সম্মান করে মুহুরীবাবু ডাকে—চৌবের মতো পাহারাওলা সাহেব বলে না। কিন্তু এই সমস্ত জরুরী ব্যাপারে তার পদমর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যায়—পট্টি-পাগড়ি এঁটে তাকেও বেরিয়ে পড়তে হয় বন্দুক কাঁধে করে। নিতান্ত অতৃপ্ত বিরক্তির সঙ্গে বেরোয় বামাচরণ—পোশাকে না হোক, অন্তত মুখের চেহারায় টেনে রাখতে চেষ্টা করে একটা গাম্ভীর্যের মুখোশ; বিছিয়ে রাখতে চায় আভিজাত্যের আবরণ।

সুতরাং বামাচরণ কিছু বললে না, শুনে যেতে লাগল।

তৃতীয় চৌকিদার বললে, মিছাই খালি দারোগার দোষ দেছেন। উ জমাদারটাই কি কম ঘুঘু হে? হামার দুই-দুইটা রাওয়া মোরগা বেমালুম প্যাটত সান্ধাই দিলে!

—এই চুপ চুপ। শুনিবা পাবে। থামি গেইছে।

সত্যিই থেমে গেছেন তারণ। মোষগুলোর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

—বদরুদ্দিন মিঞা?

—বলুন স্যার।

—সামনে মোষ।

বদরুদ্দিন বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছি স্যার। আমার চোখ আছে, একজোড়া চশমাও আছে।

—হুঁ!—দারোগা গম্ভীর হলেন: গুঁতোবে নাকি?

—কিছুই বলা যায় না স্যার!—বদরুদ্দিন পরম তৃপ্তিতে হাই তুললেন একটা।

ভ্রূকুঞ্চিত করে লক্ষ্য করতে লাগলেন তারণ। এই শৃঙ্গী প্রাণীগুলো সম্পর্কে তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত—এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত দারোগা হয়েও এদের সম্পর্কে তাঁর একটা ভয়াবহ বিভীষিকা। কারণ আছে। ছেলেবেলায় একবার একটা এঁড়ে গরু গুঁতিয়ে তাঁকে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিল—সেই থেকে জীবগুলোকে আদৌ পছন্দ করেন না তিনি।

—তাহলে দাঁড়ান, পেছনের ওদের আসতে দিন—দারোগা বললেন।

—ওরা কি ভাববে স্যার? মোষের ভয়ে এগোতে পারছেন না আপনি?—একটা

চিমটি কাটলেন বদরুদ্দিন।

—তা বটে। দারোগা উত্তেজনা বোধ করলেন। কাপুরুষতার এ রকম অপবাদ সহ্য করা অসম্ভব। কোমর থেকে খুলে নিলেন রিভলবার।

—ওকি স্যার, রিভলবার আবার কেন?

—তেড়ে এলে গুলি করব।

—আপনি যে হিন্দু স্যার—বদরুদ্দিন টিপ্পনী ছাড়লেন: আপনার আবার ধর্মে বাধবে যে।

—না, বাধবে না। গরু মারলে পাপ হয়, কিন্তু মোষ মারলে কি হয়, তা শাস্ত্রে লেখা নেই—সন্তর্পণে অগ্রসর হলেন তারণ।

কিন্তু মোষগুলো লক্ষ্যই করল না তাঁদের। যেন লক্ষ্য করবার যোগ্য বলেই মনে করল না। প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে মাটি থেকে কী একরাশ চিবিয়ে চলল তারা।

—যাক—বিপদের সীমানা পার হয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দারোগা: একটা সমস্যা মিটল। কিন্তু যা বলছিলাম। সামনের ওই আটচালাটা কার বলুন তো?

বদরুদ্দিন জবাব দিলেন, যমুনা আহীরের।

—যমুনা আহীর!—দারোগা কপাল কোঁচকালেন: যেন চেনা-চেনা ঠেকছে নামটা।

—হ্যাঁ স্যার। দাগীর খাতায় নাম আছে।

—হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু কী জাতের?

—ডেঞ্জারাস! পাঁচ-সাতটা হাঙ্গামায় জড়িয়েছে এ পর্যন্ত। একবার একটা খুনের দায়েও পড়েছিল—কিন্তু জালে পড়েনি, ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

—এবার আর বেরোবে না, গলা টিপে ধরব—ভয়াবহ একটা মুখ করলেন তারণ তলাপাত্র: জটাধর-মার্ডারের ব্যাপারে ওর হাত থাকতে পারে, কি বলেন?

—কিছুই অসম্ভব নয় স্যার। চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

তারণ আবার থামলেন। চিন্তিত মুখে বললেন, জোয়ান বুঝি খুব?

—বিরাট।—এতক্ষণে বদরুদ্দিনের মুখেও চিন্তার ছাপ পড়েছে: আকারে-প্রকারে ওই মোষগুলোর মতোই হবে। আর মেজাজও প্রায় ওই রকম।

—তাহলে দাঁড়ান। ওদের আসতে দিন। যে রকম লোক বললেন, হঠাৎ যদি ঝাঁপিয়ে-টাপিয়ে পড়ে, গোলমাল হতে পারে একটা। কি বলেন?

—নিশ্চয়—এবার বদরুদ্দিনও সমর্থন জানালেন। মোষ সম্পর্কে তারণের মতো তাঁর অহেতুক স্নায়বিক দুর্বলতা নেই বটে, কিন্তু যমুনা সম্পর্কে কোনো বিশ্বাস নেই তাঁরও। বিশেষ করে কিছুদিন থেকে ডিসপেপসিয়ায় ভুগছেন—একটু শান্তিপূর্ণ ভাবেই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলাই পছন্দ করেন তিনি। বন্দুক একটা সঙ্গে এনেছেন বটে, কিন্তু সেটা ব্যবহার

করতে না হলেই আন্তরিক সুখী হবেন।

তারণ একটা সিগারেট ধরালেন।

—বুঝলেন বদরুদ্দিন মিঞা, এরিয়াটা এমনিতে মন্দ নয়। কিন্তু এই সব লোকের জন্যই যা কিছু গোলমাল।

—সে তো ঠিক কথা স্যার। কিন্তু ব্যাপার কি, জানেন ?—বদরুদ্দিন 'সাদী'র একটা বয়েৎ আওড়ালেন : গোটাকয়েক কাঁটা না থাকলে কি আর গোলাপ ফুল ফোটে ?

গোলাপ না হোক, গোলগাল পাকা ফল তো বটেই। কিন্তু কাঁটা বড্ড বেশি। মাঝে মাঝে তারণ তলাপাত্রেরও জিতেন্দ্রিয় হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আজ পনেরো বছর দারোগা-গিরি করে অনেক পোড় খেয়েছেন—কিন্তু বুকের ধুকপুকুনি থামেনি এখনো।

চৌকিদার আর কনস্টেবলের দলটা এসে পড়ল।

তারণ এদিক-ওদিক তাকালেন।

—লোকজন কাউকে তো দেখছি না! সব গেল কোথায় ?

—কাজ-কর্মে গেছে হয়ত। মোষ চরাতেও যেতে পারে।

—হুঁ! ডাকো তো দেখি কেউ—

চৌকিদারেরা মুখিয়েই ছিল। তিন-চারজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল : যমুনা—যমুনা হে—

যমুনা এল না—দোরগোড়ায় দেখা দিলে একটি মেয়ে।

ঝুমরি। রূপের সঙ্গে কঠিন একটা নিষ্ঠুরতা মেশানো। রূপোর কাঁকন পরা শক্ত বাহু। জ্বালাধরা চোখ। নাগিনী।

দোরগোড়ায় পুলিস দেখে একটা চমক খেলে গেল তার মুখের ওপর দিয়ে।

দারোগা মেয়েটার দিকে তাকালেন—কিন্তু চোখের ওপর চোখ রেখেই নামিয়ে নিলেন মাটিতে। দৃষ্টিটা যেন সহ্য করা যাচ্ছে না। অতসী কাচ। প্রতিফলিত—কেন্দ্রিত সূর্যের আলো।

—কে মেয়েটা ?—মুখ ঘুরিয়ে বদরুদ্দিনকে প্রশ্ন করলেন তারণ।

জবাব দিলে বামাচরণ। অভিজ্ঞ গম্ভীর গলায় বললে, ওর মেয়ে—ঝুমরি। বছর খানেক আগে একটা মারামারির ব্যাপারে একেও থানায় আনতে হয়েছিল স্যার। রেকর্ড আছে।

—হুঁ। বাঘের বাচ্চা বাঘ—নিজের অজ্ঞাতেই যেন স্বীকারোক্তি করলেন দারোগা।

নির্নিমেষ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা—কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। দারোগার হয়ে বদরুদ্দিনই প্রশ্ন করলেন—তোর বাপ কোথায় রে ?

—শো গেয়া।

—শো গেয়া!—বামাচরণ ঝাঁঝিয়ে উঠল : আমরা এতগুলো লোক এই ঠাটা-পরা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ঠায় পুড়ছি আর তিনি শো গেয়া! ডাক্, ডাক্—

—ব্যাটা য্যান লাটসায়েব হচ্ছে!—একজন চৌকিদার ফোড়ন কাটল। এই মহল্লায় রাতে তার চৌকি দিতে হয় না—তা ছাড়া সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীও আছে। সেই ভরসায় আরও জোরের সঙ্গে সে তার বক্তব্য পেশ করল : ডাকি উঠাও জলদি!

মেয়েটা ঘরের ভেতরে চলে গেল।

প্রখর ধারালো চেহারা। রূপের সঙ্গে নিষ্ঠুর কঠিনতা একটা। চোখ দুটো অদ্ভুত জলন্ত। দারোগা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মুহূর্তের জন্য। ইস্পাত। নাগিনী।

শশব্যস্তে যমুনা আহীর প্রবেশ করল।

—দারোগাবাবু, জমাদারবাবু! গোড় লাগি। তো রোদে কাঁহে দাঁড়িয়ে আছেন? আইয়ে বৈঠিয়ে—

বারান্দায় রাখা খাটিয়া আর চৌপাইগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে আহ্বান জানাল দলটাকে। সাইকেল নামিয়ে রেখে দারোগা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। তাঁদের দেহের ভারে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একটা আর্তনাদ জাগল খাটিয়ায়।

কিন্তু উদ্দেশ্য আতিথ্য নেওয়া নয়, কর্তব্য। যমুনার বিশাল দেহটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে একবার রিভলবারের বাঁটটা স্পর্শ করলেন দারোগা—যেন আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করে নিলেন। তারপর বার করলেন পকেট থেকে তাঁর নোটবই আর কপিয়িং পেনসিলটা।

—তোমার নাম?

—যমুনা অহীর, হুজুর।

—পেশা?

—হামরা আহীর হুজুর। দহি, ক্ষীর, ঘী তৈয়ার করি, বেচি।

—আর কিছু কর?—দারোগা নোটবই থেকে মুখ তুললেন। সন্তর্পণে এগোতে হবে এইবার, আস্তে আস্তে ঢুকতে হবে কাজের কথায়। টোকা দিয়ে দেখা দরকার।

—আর কি করব হুজুর? মহিষ-টহিষ চরাই—সরল উত্তর দিলে যমুনা আহীর।

—কিছু কর না—না?—রিভলবারের বাঁটের ওপর আলগোছে বাঁ হাতটা ফেলে রেখে দারোগা বললেন, এই মারামারি, খুন-জখম?

আধ হাত জিভ কেটে যমুনা বললে, না।

—না? থানার খাতা কিন্তু অন্য রকম বলে।—দারোগা আর একটা সিগারেট ধরালেন : তা ছাড়া চেহারাও তো তেমন সুবিধে নয় বাবু। ভালোমানুষ বলে তো মনে হয় না।

—দেখছেন না, ব্যাটার চোখ কি রকম লাল ?—বদরুদ্দিন দারোগাকে আর একটু আলোকদানের প্রয়াস করলেন।

—চোখের আর দোষ কি আছেন হুজুর ?—যমুনা আপ্যায়নের হাসি হাসল : হামি থোড়া থোড়া গাঁজা পী।

—গাঁজা পী ?—দারোগা ভ্রূকুটি করলেন : সে-গুণটাও আছে তাহলে ! আর দারু ?

—মিলনেসে থোড়া থোড়া ওভি পী।

—কোনোটাই বাকি নেই স্যার। সব পী পী করে পিপে হয়ে আছে। একেবারে সর্ব-গুণান্বিত—বদরুদ্দিন আবার সংশোধনী জুড়ে দিলেন। দারোগা অত্যন্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। না—সন্দেহ নেই। এই লোকটা জটাধরকে খুন যদি নাও করে থাকে, খুন করার যোগ্যতা রাখে নিশ্চয়ই।

—জটাধর সিংকে চিনতে তুমি ?

একটা চকিত সতর্কতার আভা খেলে গেল যমুনার মুখের উপর। আস্তে ঢোঁক গিলল একবার।

—কে জটাধর সিং ?

বদরুদ্দিন খিঁচিয়ে উঠলেন : ন্যাকামি হচ্ছে—না ? জটাধরকে চেন না ? কুমার ভৈরবনারায়ণের বরকন্দাজ ?

—কুমার সায়েবের বরকন্দাজ তো ঢের আছে হুজুর। কে জটাধর সিং ?

—আহা ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জান না ?—তারণ ভেংচি কাটলেন : একেবারে কেষ্টর জীব ! যে লোকটা বিলের মধ্যে খুন হয়েছে, জান তাকে ?

—না।

—এখন তো জানবেই না।—দারোগা ক্রুর হাসি হাসলেন, আর একবার ছুঁয়ে নিলেন রিভলবারটা, ভালো করে দেখে নিলেন নিজের দলটাকে : আমিও তারণ তলাপাত্র, জানিয়ে ছাড়ব। যাক। তোমার ঘর খানাতল্লাস করব।

—করুন হুজুর।

—ঢুকুন বদরুদ্দিন সাহেব—ভাল করে খোঁজ-খাঁজ করুন।

বদরুদ্দিন বিব্রত বোধ করলেন। এ দারোগার অন্যায়। নিজে স্বার্থপরের মতো নিরাপদে বসে থেকে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছেন বাঘের গর্তের ভেতর ! বিশ্বাস নেই—এ লোক-গুলোকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। হাতের নাগালে পেলে যে কোনো সময় ঘাড়ের ওপর একখানা দা বসিয়ে দিতে পারে।

—আপনিও চলুন না স্যার—

—আপনি গেলেই যথেষ্ট হবে—সিগারেটটায় টান দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে বললেন

দারোগা।

বদরুদ্দিন বিপন্ন মুখে তাকালেন এদিক-ওদিক।

—বামাচরণ এস, চৌবে তুম ভি আও।

কিন্তু সার্চ করে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। মিলল শুধু লোহার তার দিয়ে গাঁটে গাঁটে জড়ানো ছুখানা অতিকায় লাঠি।

দারোগা বললেন, লাঠি ছুটো নিয়ে চলুন। রক্ত-টক্ত ধুয়ে ফেলেছে হয়ত। কিন্তু কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করলে, কিছু না কিছু ট্রেস পাওয়া যাবেই।

—আর লোকটা? ছেড়ে যাবেন?

—পাগল!—দারোগা এবার খাপ থেকে রিভলবারটা বের করলেন, যমুনা, তোমাকে গ্রেপ্তার করা গেল।

—গ্রেপ্তার!—যমুনা কিন্তু ভয় পেল না। অল্প একটু হাসল: কেন হুজুর?

—জটাধর সিংয়ের খুনের দায়ে। চৌবে, পাকড়ো ইসকো।

একটা সন্ত্রস্ত প্রস্তুতি পড়ে গেল। কিছু যেন আসন্ন হয়ে আসছে। কোনো দুর্ঘটনা, কোনো দুর্যোগ। এক্ষুণি ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই হল না। যমুনা আবার হাসল। নিরুত্তরে হাত ছুটো বাড়িয়ে দিলে চৌবের দিকে।

হাতকড়া পরালেন বদরুদ্দিন। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন দারোগা। মনে হল, যেন বুকের ওপর থেকে একতাল পাথর নেমে গেছে—কেটে গেছে একটা ভয়ানক ফাঁড়া। এত সহজে এমন প্রকাণ্ড মানুষটাকে গ্রেপ্তার করা যাবে—এ যেন কল্পনাও ছিল না।

দারোগা বললেন, চলুন বদরুদ্দিন মিঞা। এবার আর ছু-চারটেকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। এ রকম সাসপেক্টেড আর কে কে আছে বলুন তো?

প্রজ্ঞাবানের গম্ভীর গলায় বামাচরণ বললে, ছুখীরাম আহীর, ঢুণ্ডি আহীর, গণশা আহীর—

—চলুন, দেখা যাক একে একে।

দারোগা উঠে দাঁড়ালেন। যমুনাকে নিয়ে নেমে এলেন দাওয়ার বাইরে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ঝুমরি। রূপের সঙ্গে নিষ্ঠুরতা। চন্দ্রবোড়া সাপের মতো সৌন্দর্যের সঙ্গে বিষাক্ততা; শানানো ইস্পাতের মতো দীপ্তির সঙ্গে ঘাতনের ইঙ্গিত।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে যমুনা একটু হাসল।

—হাজতে চললাম বেটি। কবে আসব ঠিক নেই। ভৈঁসাগুলোকে দেখিস ভালো করে।

ঝুমরি কথা বলল না। শুধু অতসী কাচের মতো চোখের অগ্নিদৃষ্টি ছড়িয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর—

তারপর দারোগা যেই কয়েক পা এগিয়েছেন, অমনি তীব্র তীক্ষ্ণ প্রচণ্ড গলায় একটা শিসের আওয়াজ করল সে। রোদে পোড়া মাঠের ওপর দিয়ে সেটা সাইরেনের মতো দূর-দূরান্তে ভেসে গেল।

আর সভয়ে দারোগা দেখলেন এক মুহূর্তে মাথা তুলেছে সেই শান্ত নিরীহ মহিষের পাল। তাদের চোখগুলোতে আদিম অরণ্যের অমার্জিত বন্য হিংসা। লেজ আকাশে তুলে ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সাত-আটটা ছুটে আসছে তাঁদের দিকেই।

গুলি করবার সুযোগ পেলেন না কেউ—হয়ত সাহসও হল না। দুই লাফে বদরুদ্দিন নিমগাছটায় উঠে পড়লেন—তাঁর তৎপরতা দেখলে বানরও লজ্জা পেত তখন। চৌকিদারদের একজন শিংয়ের গুঁতোয় ছিটকে পড়ল—বাকি সব যে যেদিকে পারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। তারণও হাতের সাইকেলটা ছুঁড়ে ফেলে গোটাকয়েক লাফ মারলেন, তারপর আবিষ্কার করলেন, একটা পাঁকে ভরা দুর্গন্ধ ডোবার মাঝখানে গলা পর্যন্ত তলিয়ে আছেন তিনি।

আর সেই অবস্থায়, বিস্ফারিত চোখ মেলে তারণ দেখতে পেলেন—বহু দূরে বেনা ঘাসের বন ভেঙে তীব্রগামী তীরের মতো একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। দেখতে দেখতে লোকটা দৃষ্টির বাইরে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

সে যমুনা আহীর!

কিন্তু ভোঁস্ ভোঁস্ করে চলন্ত পাহাড়ের মতো ওটা কি এগিয়ে আসছে এদিকে? মোষ? চক্ষের পলকে পচা ডোবার ভেতরে ডুব মারলেন তারণ তলাপাত্র।

তেরো

—একবার জয়গড়ে আসুন, খুব জরুরী দরকার।

নগেন ডাক্তার খবর পাঠিয়েছে।

দুপুরে সাধারণত চাকরি থাকে না। এই সময়ে গীতোক্ত কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমার ভৈরবনারায়ণ বিশ্রাম-শয্যায় গা এলিয়ে দেন। এই বিশ্রাম-পর্বটা ভয়াবহ। জাহাজের মতো একখানা সুবিশাল খাটে বপুষ্মান কুমার বাহাদুর পড়ে থাকেন একটি ব্রহ্মদেশীয় শিশু-হস্তীর মতো। দুবেলা কুস্তি-করা দুজন ছাপরাই চাকর তখন সশব্দে তাঁর অঙ্গসেবা করতে থাকে। মহিষ স্নান করাবার দৃশ্য তার চোখে পড়েছে—ডলন-মলনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় আধ মাইল দূর থেকে; কিন্তু কুমার বাহাদুরের অঙ্গমর্দনের ধকল একদিন সহ্য

করতে হলে বুনো মোষও জেলী মাছ হয়ে যেত। ষণ্ডা জোয়ান দু-দুটি পালোয়ানের মুখ দিয়ে ফেনা ছুটতে থাকে ; মাথার ওপর বাহারী ইঞ্চি পাখার প্রচণ্ড ঘূর্ণন সত্ত্বেও তাদের গা দিয়ে দরদর করে নামতে থাকে কাল-ঘাম।

রাজা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি—সন্দেহ কী! সকালে-বিকেলে অন্তত কয়েক হাজার লোক হাত বুলিয়ে আসে কাশীর বিশ্বনাথের মাথায়। অবশ্য হাত বুলিয়ে কিছু তারা হাতাতে পারে কিনা কে জানে, কিন্তু বিশ্বনাথকে বসে সেই দিতে হয় ধৈর্যের পরীক্ষা। সে-হিসেবে ভৈরবনারায়ণ নিশ্চয় দেবাংশসম্ভূত। বিশ্বনাথের কাছে কিছু নগদ বিদায় মেলে না, এখানে অন্তত রাজসেবায় দুটি প্রবল-মল্ল প্রতিপালিত হচ্ছে।

বারোটা থেকে পাঁচটা—এইটুকুই সবচেয়ে মূল্যবান সময়। সাময়িকভাবে ঘটোৎকচের দানবীয় নিদ্রা। তারপর পাঁচটায় চা—তার মধ্যে ফিরে এলেই চলবে। তখন কুমার বাহাদুরের চার পাশ ঘিরে বসবে স্তাবকের দল—ডাক্তার, পোস্টমাস্টার, সদর-নায়েব, সুমারনবীশ। ঘোড়ায় চড়ার গল্প, ভৌতিক কাহিনী, কাঞ্চনগরের যুদ্ধের ইতিহাস, লাট-সাহেবের একখানা আস্ত খাসির রাং খাওয়ার জ্বালাময়ী বর্ণনা। সেই সময় তাকে হাসতে হবে, হেঁ হেঁ করতে হবে—বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হবে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। তার আগে পর্যন্ত আপাতত ছুটির পালা।

কুমার বাহাদুরের অঙ্গ মর্দন চলতে থাকুক, এই ফাঁকে তার জয়গড় ঘুরে আসা দরকার।

ঘরটায় একটা তালা দিলে, তারপর বারান্দা থেকে সাইকেলটা নামিয়ে বেরিয়ে পড়ল রঞ্জন।

আবার সেই ধান-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কুমারীর অকলঙ্ক সিঁথির মতো শুভ্র পথের রেখা ; অগণিত পদ্মকোরকের মতো তুঁষের হিরণ্ময় পাত্রে ঘন ক্ষীরের মতো জমে-আসা ধান। দূর-দূরান্তব্যাপী হরিতের ওপর হিরণ্যের দ্যুতি পড়েছে—আর কদিন পরেই পাকতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এবার পোকার উপদ্রব আছে, কিছু নষ্ট হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া আকাশে কালো মেঘেরও আনাগোনা চলছে—যদি জল আসে তাহলে এদের অর্ধেক ডুবে যাবে, এমন আশঙ্কাও জেগেছে লোকের মনে।

দু ধারে ধান-ক্ষেতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে সে চলল। হালকা ধুলোর ওপর সাপের রেখা আর মানুষের পদচিহ্নের ওপর চাকার দাগ টেনে চলল সাইকেল।

এই ক্ষেতটা পার হলে তিন-চারটে শিমুল গাছ এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ; ওইখান দিয়ে ত্রিভুজের একটা কোণের মতো ভৈরবনারায়ণের এলাকার মধ্যে খানিকদূর ঢুকে গেছে ফতে শা পাঠানের জমি। দুজনের মধ্যে ওটা নিয়েই লাঠালাঠি আর ঝামেলা। এই সীমান্তরেখার ওপারে পর পর সাঁওতালদের কয়েকখানা ছোট-

ছোট গ্রাম—ফতে শাহের অবাধ্য প্রজার দল। টুলকু আর ধীরুয়া সাঁওতালের জন্মভূমি।

মাঠ পার হয়ে শন-ঘাসের বন ঠেলে চলতে চলতে মনে পড়ছিল দিন কয়েক আগে এখানেই সাঁওতালদের বুনো-শুয়োর মারতে দেখেছিল সে। আরো মনে পড়ল সাঁওতালদের ওখানে নাচ দেখবার এবং মাংস-ভাত খাওয়ার একটা নিমন্ত্রণও ছিল তার। সেদিন সেটা রক্ষা করবার সুযোগ হয়নি—একদিন এসে চুকিয়ে যেতে হবে তাকে।

—আদাব বাবু।

তাকিয়ে দেখল, পাশের আল দিয়ে একদল মুসলমান চাষী এগিয়ে আসছে। সম্ভাষণটা তাদেরই।

—হাজী সাহেব যে! খবর কী?—প্রসন্ন মুখে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল রঞ্জন: জিয়াফৎ আছে নাকি কোথাও?

দলটি তখন রাস্তার সামনে এসে পড়েছে। সকলের আগে আগে জামান হাজী—এ তল্লাটের তিনিই সামাজিক নেতা। সম্পন্ন চাষী। প্রায় একশো বিঘে জমি রাখেন, খান চারেক গরুর গাড়িও আছে। অল্প-স্বল্প ইংরেজী জানেন—হজ ঘুরে এসেছেন দু-দুবার।

মধ্যবয়সী লোক—মুখে একটি প্রসন্ন হাসি লেগেই থাকে। হেসেই বললেন, না, জিয়াফৎ নয়।

—তবে এত সেজে-গুজে চলেছেন কোথায়? আজ তো কোনো পরব নয়!

সাজগোজের ঘটা সকলেরই একটু আছে,—সন্দেহ নেই। কারো মাথায় সাদা ধবধবে গোল টুপি, কারো বা রাঙা টকটকে ফেজ। সাদা পায়জামার ওপর হাজী সাহেব কালো রঙের একটা লম্বা কোট পরেছেন, পায়ে চকচকে জুতো। বাকি সকলের কারো ফর্সা পাঞ্জাবি, কারো জাপানী-আদ্দির জামা, পাট-ভাঙা লুঙ্গি আর পায়জামা। বেশ সমারোহ করেই বেরিয়েছে দলটা।

হাজী সাহেব বললেন, একটা মিটিং আছে আমাদের।

—মিটিং! কিসের মিটিং?

—লীগের।

—লীগের কাজকর্ম এ তল্লাটেও আছে নাকি?—রঞ্জন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—এতদিন ছিল না—এইবারে হচ্ছে।—হাজী সাহেবের হাসিটা এবারে আর একটু বিস্তৃত হয়ে পড়ল, ফুটে বেরুল একটা আন্তরিক প্রসন্নতা।

—সে তো বেশ কথা। কিন্তু মিটিংটা হচ্ছে কোথায়?

—শাহের কাছারিতে। কাল ঢোল দিয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে।

—শাহের কাছারিতে!—রঞ্জনের স্মৃতি আবার সজাগ হয়ে উঠল: আলিমুদ্দিন মাস্টারও আছেন নিশ্চয়?

—তিনিই তো গোড়া। তাঁর চেষ্টাতেই সব হচ্ছে।—কৃতজ্ঞতার রেশ লাগল হাজী সাহেবের গলায় : খুব এলেমদার লোক।

—হ্যাঁ, আমার আলাপ হয়েছে তাঁর সঙ্গে—রঞ্জন বললে, আচ্ছা আপনারা যান। ওদিকে আবার আপনাদের দেরি হয়ে যাবে।—রঞ্জন সাইকেলে উঠল।

—আপনি কোথায় চললেন ?

—আমি যাব একটু জয়গড় মহলে।

—আদাব।

—নমস্কার।

শন ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে আবার এগিয়ে চলল সে।

আলিমুদ্দিন মাস্টার! হ্যাঁ—বার তিনেক নানা উপলক্ষে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। কথাবার্তার সুযোগও ঘটেছে কিছু কিছু। তীক্ষ্ণধী, বিচক্ষণ লোক। চাপা ঠোঁট—মুখের ওপর একটা শান্ত কাঠিন্য। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, অনেক-গুলি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি তাঁর আয়ত্ত।

তিনিই লীগের সংগঠনের কাজে মন দিয়েছেন! খুব চমৎকার কথা। দেশের প্রতিটি সম্প্রদায় আত্মসচেতন হোক, নিজের মর্যাদাকে ফিরে পাক; মুক্তিলাভ করুক সব রকমের হীনমন্যতার পীড়ন থেকে। এর চেয়ে বড় জিনিস আর কী হতে পারে! জাতির এক-একটি অঙ্গ যদি শক্তিলাভ করতে পায়, তাহলে তার সমগ্র দেহের পূর্ণ জাগরণে আর কতখানি দেরি হবে?

পৃথক জাতীয়তা—পৃথক সংস্কৃতিবোধ ? হোক—কোনো ক্ষতি নেই। অন্ততঃ বাঙালী মুসলমান যে প্রধানত দীক্ষিতের সন্তান—এ ঐতিহাসিক সত্যকেও ভুলে যাওয়া চলে। আর সংস্কৃতি! অন্ধের মতো চোখ বুজে না থাকলে মানতেই হবে সত্যপীরের পাঁচালি আর মাণিকপীরের গানের মধ্য দিয়েও তার ব্যবধানের সীমাটাকে কোনোদিন একেবারে মুছে ফেলা যায়নি। এমন কি, 'দীন-ইলাহী'র ঐক্যমন্ত্র যিনি দিয়েছিলেন, সেই সম্রাট আকবরের সময়েও আগ্রা শহরে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল—এমন কথাও ইতিহাস বলে।

সুতরাং পৃথক জাতিতত্ত্বে আপত্তি নেই। ইসলাম জাগুক। শুধু আসন্ন বন্যার ওই মেঘগুলোর মতো একটি জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে ঘুরছে। এই হঠাৎ ঘুম-ভাঙা দুর্দান্ত মানবতা যখন খাদ্য-বস্ত্র-মুক্তি-সংস্কৃতির আকুলতায় ক্ষুধার্ত গরুড়ের মতো প্রশ্ন তুলবে : 'কংখাম'—তখন নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকবার জন্যে তাকে প্রতিবেশী কিরাত-পল্লী দেখিয়ে দেবে না তো এর উদ্গাতারা? তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার মতো পর্যাপ্ত সংস্থান এদের আছে তো?

সেইখানেই ভয়। তার সে ভয় যে একেবারে অমূলক নয়—তারও আভাস দেখা

গেছে নানাভাবে। অন্যকে অবিশ্বাস করা নয়—আজ নিজেকে বিশ্বাস করতে পারাই সব চেয়ে বড় কাজ।

হয়ত আলিমুদ্দিন মাস্টার তা পারবেন।

জয়কালী মন্দিরের বটগাছটা সাইকেলের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ দিগন্ত থেকে সামনে এগিয়ে এল।

এই জয়কালী মন্দির থেকেই সম্ভবত জয়গড়। গড় হয়ত কোনোদিন ছিল—হয়ত পাল-বুরুজের গড়খাই এরই সীমান্ত-রেখা! গ্রামের পূব-দক্ষিণ জুড়ে ইংরেজী 'এল' হরফের মতো অজগর জঙ্গলে ছাওয়া একটা জাঙ্গালও আছে বটে—হয়ত গড়ের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। জয়কালী পুরানো মন্দির এখন একটা মাটি ঢাকা ইটের পাঁজা—গ্রামের লোক কিছু খরচপত্র করে একটি ছোট মন্দির তুলে দিয়েছে তার পাশে।

পেছনে একটা বড় বটগাছ—তার তলায় একখানা পঞ্চমুণ্ডী আসন। বাংলা দেশে ডাকাতির যুগে যখন সারা উত্তরাঞ্চল জুড়ে ভয়াবহ অরাজকতার স্রোত বয়ে গিয়েছিল—সেই সময় কোনো দস্যুপতি ওই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তার পাশে একটা মজা-দীঘি—ওর ভেতরে সন্ধান করলে নাকি এখনো একশো আটটি নরবলির কঙ্কাল-করোটি খুঁজে পাওয়া যাবে। দুর্বল স্নায়ুর মানুষ আজও নাকি রাত-বিরেতে বিভীষিকা দেখে এই পঞ্চমুণ্ডী আসনের আশপাশে।

নির্জন মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, আজ আবার নতুন করে এক তন্ত্র-সাধনার সূত্রপাত হয়েছে এই জয়গড়ে। এও কত নরবলি দাবি করবে কে বলতে পারে সেকথা!

গ্রামে ঢুকতে গরুর গাড়ির লিক-আঁকা একটা মেটে রাস্তা পাওয়া গেল। সেই রাস্তা দিয়ে আর একটা বাঁক ঘুরতেই খানিকটা উঁচু ডাঙার ওপর ছোট একটি মহুয়া বন। আর এই মহুয়া বনটির পরেই নগেন ডাক্তারের বাড়ি।

বাড়ির বাইরের ঘরে ডিসপেনসারী। ছোট্ট ডিসপেনসারী—যৎসামান্য আয়োজন। একটা বার্নিশবিহীন চেয়ারে বসে এবং সামনে কাগজপত্র আর ডাক্তারী ব্যাগ-রাখা টেবিলটার ওপরে পা তুলে কি যেন পড়ছিল নগেন ডাক্তার।

বারান্দায় সাইকেল তোলার শব্দে বই সরাল নগেন, পা নামাল। সাদরে ডাকল, রঞ্জনদা? এস—এস—

রঞ্জন ঘরে ঢুকে নগেনের মুখোমুখি একটা চেয়ার নিয়ে সশব্দে বসে পড়ল।

সামনে ঝুঁকে পড়ে নগেন। অন্তরঙ্গ গলায় বললে, আমার চিঠিটা পেয়েছিলে তাহলে?

—পেয়েছি।—রঞ্জন হাসল: কিন্তু যত তাড়া আমায় দিয়েছিলে, তোমার মধ্যে সে

তাড়া তো দেখছি না। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা হচ্ছিল। কি পড়ছিলে?

নগেন হাসল লজ্জিতভাবে—গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠল। এত ভালো কর্মী, এমন দৃঢ়-ব্রত, তবু একটা অপূর্ব শান্ত কমনীয়তা আছে ওর ভেতরে। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ—তবু এখনো ছেলেমানুষি চেহারা। দেখলে মনে হয় আঠার-উনিশের বেশি বয়সে হবে না।

সলজ্জ গলায় নগেন বললে, একটা লিটারেচার পড়ছিলাম।

—কি লিটারেচার?

—আমাদের ডাক্তারীর। বিলিতী ওষুধের কোম্পানি পাঠিয়েছে।—নগেনের চোখ দুটো বিষণ্ণ হয়ে উঠল: কিন্তু এ দিয়ে আমরা কী করব? এ সব পেটেণ্ট ওষুধ প্রেসক্রিপশন করবে শহরের ডাক্তারেরা—মোটা দাম দিয়ে কিনে খাবে শহরের লোক। তা ছাড়া এদের অধিকাংশই ডাক্তারদের সর্বনাশ করছে।

রঞ্জন বললে, তোমার প্রথম কথাটা বুঝলাম, কিন্তু দ্বিতীয়টা ধোঁয়াটে রয়ে গেল। ডাক্তারদের সর্বনাশ করছে কেন?

নগেন বললে, মেডিসিন তৈরী করতে ভুলে যাচ্ছে ডাক্তাররা—এদের ওপরেই বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছে। তার ফল কি দাঁড়াচ্ছে জানো? কম্পাউণ্ডিং করে দিলে যার দাম পড়ত বারো আনা, পাঁচ টাকা দিয়ে তার পেটেণ্ট ওষুধ কিনে খেতে হচ্ছে লোককে।

রঞ্জন হাসল: পৃথিবীতে দেখছি সমস্যার আর অন্ত নেই। কিন্তু ও-কথা যাক—ওসব আমার পক্ষে একেবারে অনধিকার চর্চা। এখন বল দেখি, এমনভাবে হঠাৎ তাড়া কেন?

নগেন বললে, বলছি সব। কিন্তু এখানে নয়। চল ভেতরে। অনেকগুলো দরকারী পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললে, এখন দেড়টা। চারটের মধ্যে আমায় ছেড়ে দিতে হবে—মৃদু হেসে বললে, নইলে আমার চাকরি যাবে, জানো?

—যাওয়াই ভালো—নগেনও হাসল: নাও, ভেতরে চল।

বাড়িতে মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। তবু পাড়াগাঁয়ের নির্ভুল পরিচ্ছন্নতা ঝকঝক করছে সব জায়গায়। উঠানে ঢেঁকি আছে, তার পাশে লাউমাচা। পেছনের প্রাচীর ঘিরে বড় একটা বাতাবিলেবুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে—অকৃপণ ফলের সমারোহ সেখানে।

নিজের শোবার ঘরে নগেন নিয়ে এল রঞ্জনকে।

আড়ম্বরহীন ঘর। একধারে ছোট একটি শেলফে থানকতক বই; শীতলপাটি বিছানো তক্তপোশের মাথার কাছে জড়ানো শতরঞ্জির বিছানা।

নগেন বললে, বস।

রঞ্জন বিছানায় বসল। সামনে একটা টুল টেনে নিল নগেন।

—তারপর?

—দাঁড়াও। অনেক দূর থেকে এসেছ—একটু জল খাও আগে।

—পাগল নাকি! এই তো খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি।

—ছ মাইল সাইকেলের ধাক্কায় সে হজম হয়ে গেছে—নগেন চিৎকার করে ডাকল: উত্তমা, উত্তমা?

—আসছি দাদা—বাড়ির কোনো এক দূরপ্রান্ত থেকে সাড়া এল।

—উত্তমা কে? তোমার বোন বুঝি?

—হ্যাঁ।—নগেন বললে, তুমি ওকে দেখনি আগে। মামাবাড়ি গিয়েছিল মাস তিনেক আগে—মামীমার খুব অসুখ চলছিল।—একটা প্রসন্ন স্নেহ ফুটে উঠল নগেনের মুখে: ও আমার ডান হাত। সব কাজ-কর্ম করে দেয়। মোটামুটি খানিক কম্পাউণ্ডারী শিখিয়ে নিয়েছি, দরকার হলে প্রেসক্রিপশন অবধি সার্ভ করে। ও না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

—বিনা পয়সায় বেশ কম্পাউণ্ডার পেয়েছ তো!

—তা পেয়েছি।—নগেন হাসল: কিন্তু ওই কম্পাউণ্ডারটির জ্বালায় আমার ডাক্তার-খানা চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী হয়ে উঠেছে।

—কেন ডাকছিলে দাদা?

দোরগোড়ায় উত্তমাকে দেখতে পাওয়া গেল।

—কে এসেছে দেখ। চিনিস একে?

—বুঝেছি, রঞ্জনদা।—উত্তমা হাসল, এগিয়ে এসে প্রণাম করল রঞ্জনকে।

—আরে ছিঃ ছিঃ—থাক থাক—

—অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? প্রণামটা পাওয়ার জিনিস—আদায় করে নিতে লজ্জা নেই।

উত্তমা খিল খিল করে হেসে উঠল। প্রচুর স্বাস্থ্য আর অপরিমিত প্রাণ থাকলে যে হাসি আলোর মতো নিঝ´রিত হয়ে পড়ে—সেই হাসি। রঞ্জন ভালো করে তাকিয়ে দেখল উত্তমাকে।

শ্যামবর্ণের ছোটখাটো একটি মেয়ে। রূপের ব্যাকরণে সুশ্রী বলতে বাধে। পরনে আধ-ময়লা ডুরে শাড়ি। মেধাবী পুরুষের মতো চওড়া কপাল—গ্রামবৃদ্ধারা হয়ত সংজ্ঞা দেবেন 'উঁচকপালী' বলে। সেই কপালের ওপর একগুচ্ছ অলকের নিচে স্বেদবিন্দু চিকমিক করছে। অটুট স্বাস্থ্যে গড়া শরীর, আর সব চাইতে আগেই চোখে পড়বে পরিপুষ্ট নিটোল দুখানি হাত। আঙুলগুলি কঠিন—মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা; চম্পক-কলির ব্যঞ্জনা কোথাও নেই—পরিশ্রমের নির্ভুল চিহ্ন। হাতে চারগাছা করে কাচের চুড়ি—তাদের ওপর মাটির একটা হালকা আস্তরণ পড়েছে।

—কি করছিলি রে?

—বাগানে মাটি কোপাচ্ছিলাম।

—বেশ করছিলি। মাটি কোপানো এখন থাক। রঞ্জনদার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আয় আগে।

—না—না, কিছু দরকার নেই—সন্ত্রস্তভাবে রঞ্জন জবাব দিল।

—গুরুপাক কিছু নয়, সামান্য কিছু গাছের ফল।—নগেন হাসল: তা ছাড়া আমি ডাক্তার—আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পার। যা—যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

উত্তমা বেরিয়ে গেল।

কথা আরম্ভ করার আগে চিন্তাটাকে যেন গুটিয়ে নেবার জন্যে একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল নগেন। জানালার ওপারে মহুয়া বন—তার পেছনে টাঙন নদীর খাড়া পাড়ি। অন্তর্মুখী চোখটাকে সেদিকে রেখে নগেন বললে, তুরী-পাড়ায় পঞ্চায়েতে আমি থাকতে পারিনি। তুমি যখন গিয়েছিলে, তখন ওতেই কাজ হয়েছে। কেমন মনে হল?

—চমৎকার। একেবারে বারুদের মতো তৈরী। আগুন ধরিয়ে দিলেই হয়।

—হ্যাঁ—ওরা বেশ গড়ে উঠেছে! ভালো লড়াই করতে পারবে—কচি কচি মহুয়া পাতাগুলোর দিকে চোখ রেখে নগেন বললে, এত বয়েস হয়েছে, তবু সোনাই মণ্ডলের কি রকম জোর দেখেছ?

—তাই দেখলাম।—উৎসাহিত হয়ে উঠল রঞ্জনের স্বর: ওরা তো চাষী। ওদের কাছ থেকে এতখানি আশা আমাদের ছিল না।

—চাষী আর কোথায় দেখছ!—নগেন এবার চোখ ফিরিয়ে এনে সোজা রঞ্জনের দিকে তাকাল: ওদের দেনার অবস্থা জান? বেশির ভাগেরই এখন ক্ষেত-মজুরের দশা—লাভের মোটা টাকাটা সোজা চলে যায় মহাজনের হাঙর-পেটে। যা-ও সামান্য কিছু হত—ডাঁড়ার বানে একেবারে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। এবার ডাঁড়ায় বাঁধ না দিলে ওদের আর বাঁচবার জো নেই!

—কিন্তু ডাঁড়ায় বাঁধ দিলে কি হবে বাড়তি জলটার? অন্যদিকে বান ডাকবে না তো?

—না, না, সে সব ভয় কিছু নেই। ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করলে দক্ষিণের ঢালু মাঠটা দিয়ে জল চলে যাবে। আগে তাই যেত। ও তো মরা মাঠ—এমনিতেই বর্ষায় সাগর হয়ে যায়—হাত-খানেক করে জল বাড়বে এই যা। আসলে ক্ষতি শুধু ভৈরবনারায়ণের, জলকর দুটোয় একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু কয়েকশ টাকার জলকর বাড়াতে গিয়ে দু-হাজার বিঘে জমির ধান এমনভাবে বরবাদ হবে নাকি?

—না, এবার আর তা ওরা হতে দেবে না। কালাপুখরিতে আগুন জ্বলবে, আমি

স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি।

নগেন বললে, রঞ্জনদা, তোমার কাছ থেকে আসল পরামর্শ টাই বাকি। যত দূর মনে হচ্ছে—শুধু তুরীদের একার লড়াইতেই হবে না। এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষগুলোকে নিয়ে একটা কমন কজ তৈরী করতে হবে।

—আহীররা?

—নিশ্চয়। ওরা তো আগুনের মতো গরম হয়ে আছে। হাতের লাঠি ওদের তৈরী। তা ছাড়া জটাধর সিংয়ের খুনের পর পুলিস এসে ওদের ওখানে হামলা করেছিল। যমুনা অ্যাবসকনডিং। শোননি?

—না তো!—রঞ্জন চকিত হয়ে উঠল: তাই নাকি?

উদ্দীপ্ত মুখে নগেন বললে, কাল আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। এতদিন আমাদের কৃষাণ-সমিতির কথা বলেছি—কিন্তু আমল পাইনি। এবার দেখলাম আর ভাবনা নেই। একদম তৈরী। এ লড়াইয়ে ওরাই হবে ভ্যানগার্ড। তুরীদের লড়াইয়ের কথা ওদের বলেছি। যমুনা আমার সঙ্গে দেখাও করে গেছে—একেবারে আগুন।

—এতটা হয়ে গেছে—কিছু জানতাম না! তারপর?

—যা ক্ষেপে আছে, একটা সুযোগ পেলেই হল।

—এটা একটা মস্ত খবর।

নগেনের চোখ জ্বলতে লাগল: টিলার সাঁওতালদেরও পাওয়া যাবে।

—ওরা তো ফতে শা পাঠানের প্রজা!

—তাতে আটকাবে না। সব জমিদারই ওদের পক্ষে সমান। যদি আমরা ভালো করে অর্গানাইজ করতে পারি, তাহলে সমস্ত এরিয়ার মানুষগুলোকে এই লড়াইয়ে টেনে আনতে পারব—নগেনের গলার স্বর একটা আগামী প্রত্যাশায় উঁচু পর্দায় চড়তে লাগল আস্তে আস্তে: ওই সাঁওতালদের ওপর তোমার হাত আছে—ওদের টেনে নামাতে হবে তোমাকে।

—দেখি চেষ্টা করে—রঞ্জন হাসল: কিন্তু তোমাদের জ্বালায় কুমার বাহাদুরের ওখানে আমার অমন ভালো চাকরিটা চলে যাবে দেখছি। কোনো ঝামেলা ছিল না—শুধু নির্বিঘ্নে গীতাপাঠ। ভবিষ্যতেরও আশা ছিল—হয়ত একটা ব্রহ্মোত্তরও মিলে যেত এক সময়ে।

নগেনও হাসল: আখেরের ভাবনা ভাবতে হবে না। তোমার নাম আমাদের বইতে টোকা আছে। দুনিয়া যখন পালটাবে—যখন নতুন করে মাটির বিলি-ব্যবস্থা হবে, সেদিন তুমিও ফাঁক পড়বে না। তবে তার আগে এ অসুবিধেটুকু ভোগ করতেই হবে।

—তার মানে এটা ইনভেস্টমেন্ট?

—তাই—নগেন হেসে উঠল সশব্দে।

উত্তমা প্রবেশ করল। শাড়িটা বদলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে—ধুয়ে মুছে এসেছে শরীর থেকে মাটি কোপানোর চিহ্ন। গাছকোমর বাঁধা আঁচলটিকে বিন্যস্ত করে নিয়েছে শোভন কমনীয়তায়। এক হাতে ঝকঝকে পেতলের থালায় সযত্নে কাটা বাতাবি লেবু, কয়েক টুকরো পেঁপে, দুটি কলা আর কিছু নারিকেলের নাড়ু, আর এক হাতে কাচের গ্লাসে জল। সব মিলিয়ে যেন অপূর্ব একটি রূপান্তর হয়েছে উত্তমার। একটু আগেকার কঠিনবাহু সেই কর্মী মেয়েটি নয়—চির-পরিচিত একটি বাংলার নন্দিনী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নগেন উঠে আর একটা টুল টেনে দিলে। তার ওপর থালা-গ্লাস নামিয়ে রাখল। উত্তমা হাসল।

—এত কী হবে ?

—খাবেন।—উত্তমা বলল।

—সব ?

—সব।

—কিন্তু আমি তো একটু আগেই খেয়ে এসেছি।

নগেন বললে, রঞ্জনদা, বিনয় বন্ধ কর। খাওয়াটা শেষ করে নাও, অনেক দরকারী কাজ আছে।

রঞ্জন বললে, আচ্ছা লোক তো দেখছি। এমনি ভাষায় বুঝি অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ?

—অতিথি হলে তো অভ্যর্থনা করব।—নগেন বললে, নাও নাও। রাজবাড়ির রাজভোগের ব্যবস্থা অবশ্য এখানে নেই। কিন্তু টাটকা গাছের ফল, আর ঘরের নাড়ু—সম্পূর্ণ হাইজিনিক।

অগত্যা আহারে মন দিতেই হল।

—মা কই রে উত্তমা ?

—জ্যাঠামশাইয়ের ওখানে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে।

—আমি পছন্দ করি না—মেঘের মতো মুখ করে নগেন বললে।

উত্তমা বললে, মা বলেন, সামাজিকতা রাখতে হবে।

—না রাখাটাই নিরাপদ—নগেনের মুখ আরো কালো হয়ে উঠল।

উত্তমা জবাব দিল না, দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।

নীরবে খাওয়া শেষ করল রঞ্জন। ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল নগেন, আর জানালা দিয়ে বাইরের মহুয়া বন আর টাঙন নদীর উঁচু পাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল উত্তমা।

—আর দেব ?—খানিক পরে মৃদু গলায় উত্তমা জিজ্ঞাসা করল।

—সর্বনাশ—এই ম্যানেজ করতেই প্রাণান্ত! নিতান্তই নগেনের ভয়ে এতগুলো খেতে হল।

থালা আর গ্লাসটা হাতে তুলে নিলে উত্তমা।

বেরিয়ে যাওয়ার মুখে নগেন পিছু ডাকল।

—হ্যাঁ রে, পোস্টারগুলো লেখা হয়ে গেছে ?

—সামান্য কিছু বাকি।

—দুপুরেই শেষ করে দিবি—সন্ধ্যের আগে আমার চাই।

—আচ্ছা—উত্তমা বেরিয়ে গেল।

—কিসের পোস্টার ?—রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল রঞ্জন।

—আমাদের কৃষক-সমিতির ঘোষণা। আগামী লড়াইয়ের প্রস্তুতি।—নগেন একটু হাসল : আর এ গ্রামে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, কে জান ? আমারই জ্যাঠামশাই!

—ও!—রঞ্জন তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে। খানিকটা বোধগম্য হচ্ছে—উত্তমা আর নগেনের ব্যক্তিগত আলোচনার তাৎপর্যটা।

—বড় জোতদার। অনেক হাল আর বিস্তর কৃষাণ। তিনি আমাদের সমিতিকে ভাঙবার জন্যে তলে তলে মতলব আঁটছেন। এখনো সুবিধে করতে পারেননি—তবে সময় হলেই ঘা দেবেন। যাক সেকথা। এবার তোমায় একটু উঠতে হবে রঞ্জনদা।

—আবার কোথায় ?

—যেতে হবে আমাদের কিষাণ-সমিতিতে। যে প্ল্যান প্রোগ্রাম হচ্ছে, সে সম্বন্ধে ওরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবে একটু।

—আচ্ছা চল—হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললে, ঘণ্টাখানেক সময় আছে এখনো।

আগে খবর পেয়ে কুড়ি-পঁচিশজন এসে অপেক্ষা করছিল কৃষাণ-সমিতিতে।

বড় একখানা ঘর। ওপরে খড়ের চালা—নিচে চাটাই। মাটির দেওয়ালে কিছু পোস্টার—কিছু ছবি! কাস্তে-হাতুড়ির ওপর জলজ্বলে একটা লাল তারা—ওদের পথের নির্দেশ।

অফিস-সেক্রেটারী মনোহর জানাল, এদিকের ব্যবস্থা আমরা করে এনেছি। অন্তত দুশো লোক নিয়ে যেতে পারব।

—আহীররা আসবে, সাঁওতালদের ভারও নিয়েছেন রঞ্জনদা।—নগেন বললে, এই আমাদের প্রথম লড়াই! মনে রাখবেন এই আমাদের শক্তি পরীক্ষা। এখানে যদি আমরা

জিততে পারি—তাহলে আমাদের আর কেউ রুখতে পারবে না।

জয়ধ্বনিতে ঘরখানা কেঁপে উঠল।

ফেরবার পথে বিকেলের আলোয় বহুদূর থেকে ভৈরবনারায়ণের প্রাসাদটা যেন আজ আবার নতুন করে চোখে পড়ল রঞ্জনের। চোখে পড়ল, বাড়িটার মাথার ওপর একসার শকুন উড়ছে—যেন আসন্ন অপমৃত্যুর আঘ্রাণ পেয়েছে ওরা।

চোদ্দ

প্রায় দুই হাজার লোক জড়ো হয়েছে শাহের কাছারির সামনে।

একদল লোক যথাসাধ্য সেজেগুজে এসেছে—যেন ঈদের নামাজের জমায়েত। আর একদল উঠে এসেছে সোজা ক্ষেত থেকে, তাদের গায়ে লাল মাটির স্বাক্ষর; খড়ি-ওড়া রুক্ষ শরীর—তেলের অভাবে জমাট-বাঁধা লাল চুল, হাতে হাঁসুয়া আছে, লাঠিও আছে; ময়লা গামছায় বেঁধে চিঁড়ে-মুড়ির নাস্তাও নিয়ে এসেছে কেউ কেউ—সঙ্গে আছে টিনের চৌকো দেশী লণ্ঠন। অনেক দূরে যেতে হবে—কত রাত হবে ফিরতে, কে জানে। আর বলা যায় না—জমায়েতের পর হয়ত গানের ব্যবস্থাও থাকতে পারে—এমন আশাও কারো কারো মনে স্থান পেয়েছে। রাতটা মন্দ কাটবে না তাহলে।

আর আছে জনকয়েক চৌকিদার। নিজেদের তাগিদেই তারা এসে জুটেছে। রঙ-জ্বলে-যাওয়া উর্দির ওপর চকচক করছে পেতলের চাপরাশ—এই বিশেষ উপলক্ষ্যটির জন্যেই মেজে ঘষে তাদের পরিষ্কার করা হয়েছে। অনাহূতভাবেই সভার শান্তিরক্ষা করছে তারা।

: কী হচ্ছে উদিকে? গোলমাল করিবেন না।

: এই মিঞা, চুপ করি বৈসো ক্যানে। খামোকা ওইঠে ফির কিবা ঝামেলা লাগাইলে হে?

: চিল্লাবা হয় তো এইঠি থাকি উঠি যাও। ইটা তামাসা নহো, ওয়াজ হেবে।

রোদে ঝকঝকে চাপরাশ আর গম্ভীর মুখেও তারা যথোচিত পদমর্যাদা রাখতে পারছে না। নানারকম টীকা-টিপ্পনী আসছে তাদের লক্ষ্য করে।

: ইস, ত্যালখানা ছাখো হে! য্যান দারোগা হছেন!

আর একজনে চিমটি কাটল: আইতের (রাতের) ব্যালা চোর দেখিলে বাপ বাপ করি পালাবা পথ পায় না, এইঠে আসি মেজাজ ছাখাছে!

: সিটাই কহো না। কামের ব্যালায় কিছু নাই—আইতে আসি খামোকা চিল্লাই চিল্লাই ঘুমের দফা রফা করি দেয়। ফের চৌকিদারী ট্যাক্সো না দিবা পারিলে ঘটি-বাটি

ক্রোক করিবা চাহে!

: এই চুপ চুপ—আট-দশজন ধমক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দু হাজার লোকের দৃষ্টি ধাবিত হল একই দিকে।

একখানা পুরানো টেবিলের আশেপাশে খানকতক চেয়ার। তার পেছনে একটা উঁচু বাঁশের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি হরিৎ পতাকা। পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে ঐসলামিক ভ্রাতৃত্বের প্রতীক; ঈদের চাঁদের চিরপ্রত্যাশা—একটি ধ্রুব-নক্ষত্র সত্যধর্মের চির-ইঙ্গিত, গাঢ় সবুজের বর্ণলেখায় চির-তারুণ্যের প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি। মোহম্মদ রসুলের (দঃ) কদমে কদমে অনুসরণ করে দুরন্ত অভিযানের দিগ্বিজয়ী ঝাণ্ডা।

হাওয়ায় উড়ছে সবুজ পতাকা। শাহের কাছারি থেকে নেমে সেই পতাকার তলায় এসে আস্তে আস্তে দাঁড়ালেন পাঁচ-সাতজন—আজকের অনুষ্ঠানের যাঁরা কর্ণধার। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে এসেছেন ফতে শা পাঠান—পরনে কালো আলপাকার লঙকোট, আদ্দির পাজামা, মাথায় জরির কাজ-করা টুপি; বুকে সোনার চেন বাঁধা একটা ঘড়িও সেঁটে নিয়েছেন। প্রশান্ত গাম্ভীর্যে এসে তিনি মাঝখানের চেয়ারটা দখল করলেন—আজকের সভায় অনির্বাচিত হলেও অনিবার্য সভাপতি তিনিই। পেছনে পেছনে এলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, এস্তাজ আলী ব্যাপারী, জন দুই স্কুলমাস্টার, থানার জমাদার সাহেব, পালনগর মসজিদের ইমাম এবং ইসমাইল। শাহ্র আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হাততালি দিলেন—সমবেত জনতাও আনন্দে করতালি মেলাল।

বাকি সকলে কেউ কেউ চেয়ারে, কেউ কেউ সামনে পাতা দুখানি বেঞ্চিতে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় আকাশে মুঠি তুলে ইসমাইল চিৎকার করে উঠল: মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ—

সহস্র সহস্র গলায় শোনা গেল আন্তরিক প্রতিধ্বনি: মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ—

—পাকিস্তান—

—জিন্দাবাদ!

—কায়েদে আজম—

—জিন্দাবাদ!

—এইবার বসুন সব, এখনি সভার কাজ আরম্ভ হবে—ইসমাইল আদেশ করল। বছর বাইশ বয়েস হবে ইসমাইলের। একটু কুঁজো—একটু ঢ্যাঙা। অযত্নে এলোমেলো মাথার চুল; মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। শার্টের আস্তিন কনুইয়ের ওপর আরও খানিকটা গোটানো—সংকল্পে মুঠো-করা হাত। চোখের দৃষ্টিতে একটা উগ্র চাঞ্চল্য—যেন যে কোনো মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সে।

—গোড়াতেই আমাদের উদ্দেশ্যটা একটু স্পষ্ট করে আপনাদের খুলে বলা যাক।

—ইসমাইল আরম্ভ করল : অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি যে আমাদের অনেকেই পাকিস্তান কথাটার মানে পর্যন্ত জানেন না। এমন কি আমাদের মহান নেতা কায়েদে আজম জিন্নার নাম পর্যন্ত শোনেন নি এমন লোকও এ সভায় আছেন। সুতরাং—

সুতরাং জ্বলন্ত ভাষায় পাকিস্তানের কথা বলতে আরম্ভ করল ইসমাইল। আরম্ভ করল আরবের-মরুভূমি থেকে কোরান আর জুলফিকারের দুর্নিবার অগ্রগমনের ইতিহাস; আগুন-ঝরা ভাষায় বলে গেল, কেমন করে কাফেরদের রক্তে তরবারি আর বর্শা-ফলককে স্নান করিয়ে, সিন্ধু-সোমনাথ-গুর্জর জয়ের ধারা বয়ে গৌড়-বঙ্গের প্রত্যন্তে প্রত্যন্তে এল শেষ ধর্মের প্রাণবন্যা। বর্ণনা করে গেল কেমন করে বাদশাহ আলমগীর সারা হিন্দুস্থানের কোরেশদের ভাঙা বিগ্রহের শিলা দিয়ে রচনা করলেন মসজেদের সিঁড়ি; তারপর এল ইংরেজ—এল হিন্দুর চক্রান্ত। সে চক্রান্তের আজও শেষ নেই—

এই পর্যন্ত এসে ইসমাইল একবার থামল। সমস্ত সভা গাম্ভীর্যে গমগম করছে। বলবার শক্তি আছে ইসমাইলের। সভা কেমন করে জমিয়ে নিতে হয়, সে তা জানে।

ইসমাইল মাথার ওপর হরিৎ পতাকাটার দিকে তাকিয়ে নিলে একবার। উড়ছে সূর্যের আলোয়—উড়ছে একটা সগৌরব প্রসন্নতায়। আজাদী কি ঝাণ্ডা।

—বন্ধুগণ, মন দিয়ে আমার কথাগুলো একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, ১৯০৬ সালে আমাদের লীগ জন্ম নেবার পরে তাকেও অনেকখানি পথ কেটে এগোতে হয়েছে। আমরাও একদিন হিন্দু কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলাম। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে একসঙ্গে আজাদীর লড়াইয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা, লড়েছি খেলাফতের দিনে। সেদিন আমাদের জিন্না সাহেবও নিজেকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বলতেন। তারপর স্বাধীনতার লড়াইয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে যেদিন আমরা পুরো স্বাধীনতা চাইলাম—সেদিন—সেই ১৯২২ সালে হিন্দু কংগ্রেসই 'স্বরাজে'র ভাঁওতা তুলে লড়াই থামিয়ে দিলে। শুধু লড়াই থামাল না—এল হিন্দু মহাসভা। দেখা গেল কংগ্রেসের পথ হিন্দুর পথ—আর মুসলমানের যদি কোনো রাস্তা থাকে তা হলে তা এই মুসলীম লীগ—

একটা তিক্ত হাসি ইসমাইলের ঠোঁটের আগায় দেখা দিল : কিন্তু দেশের মুসলমান তখনো জাগেনি। ১৯৩৭ সালে যেদিন কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের প্রথম বোঝাপড়া, সেদিন আমাদের ভাইয়েরা কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছিল। নিজেদের দলাদলিতে আমরা হেরে গেলাম। কিন্তু হারতে পারে না আমাদের লীগ—আলী ভাইয়ের আদর্শ—মুসলমানের সত্য। এগিয়ে এলেন কায়েদে আজম জিন্না তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে। গড়ে তুললেন সারা ভারতের মুসলমানকে। আমরা বুঝলাম—হিন্দুর সঙ্গে পাশাপাশি থাকা আমাদের চলবে না। নতুন দেশ চাই, নতুন রাস্তা চাই—নতুন পথ চাই ইসলামী তমদ্দুন বিকাশের জন্যে। সেই আমাদের 'পাকিস্তান'। সেই পাকিস্তানের জন্যই আপনাদের এক

হতে বলছি! আসুন—দলে দলে লীগের মেম্বার হোন—সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন : পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

—পাকিস্তান জিন্দাবাদ!—সভার মধ্যে গর্জন করল ঝোড়ো হাওয়া।

রুমালে ঘর্মাক্ত মুখখানা মুছে নিয়ে বলতে বলতে ইসমাইল বললে, এবার মসজিদের ইমাম সাহেব আপনাদের দু-চার কথা বলবেন।

সভায় আবার প্রচণ্ড করতালি পড়ল।

ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে উঠলেন ধীর গম্ভীর ভঙ্গিতে। চুমরে নিলেন ধূসর রঙ-ধরা সাদা দাড়ির গোছা। তারপর উচ্চকণ্ঠে কোরানের একটা 'সূরা' আউড়ে বললেন, এর অর্থ হল, বিধর্মী কাফেরের সঙ্গে পাশাপাশি কখনো মুসলমানের বাস করা চলবে না, তাকে লড়াইয়ের জন্যে সব সময় তৈরী থাকতে হবে—দরকার হলে প্রাণ দিতে হবে—

উত্তেজনার যে বারুদ ইতিমধ্যেই সঞ্চিত করে রেখেছিল ইসমাইল, তাতে আগুনের উত্তাপ সঞ্চার করে আসন নিলেন ইমাম সাহেব।

সভায় তখন মধুচক্রের মতো গুঞ্জন উঠেছে। ইসমাইলের শহুরে বক্তৃতা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু ইমাম সাহেবের কথাগুলো নির্মম এবং তীক্ষ্ণ। কোথাও কোনো আড়াল নেই—নেই বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতার আভাস।

: হঁ্যা, পাকিস্তান নিবা হেবে হামাদের।

: কাফেরের সাথে হামরা আর নি থাকিমু।

: পাকিস্তান জান মান দিই কায়েম করিবা হেবে।

: মোক থালি একটা কথা কহেন। পাকিস্তান হই যায় তো খুব ভালোই। ফের প্যাট ভরি খাবা পামু তো হামরা? সার্টিফিকেট, উচ্ছেদ তো উঠি যাবে? শাহু তো ব্যাগার ধরিবে না? বকেয়া খাজনা তো মাফ করি দিবে?

কথাগুলোর কোনো স্পষ্ট জবাব কেউ দেবার আগেই আবার সাড়া উঠল : এই চুপ, চুপ! মাস্টার সাহেব কহোছেন।

এবার প্রচণ্ডতম করতালি। সব চাইতে জনপ্রিয়, সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিমুদ্দিন মাস্টার এই-বার দাঁড়িয়েছেন তাঁর বক্তব্য বলবার জন্যে। সকলের দুঃখে-কষ্টে অকৃত্রিম বন্ধু। প্রয়োজনের বান্ধব। দুর্দিনের একনিষ্ঠ আশ্বাস।

ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়েছে সবুজ পতাকায়—যেন একটা অপূর্ব দীপ্তি ছড়াচ্ছে তার থেকে। নূর-এ-পাকিস্তান। সে দীপ্তি পড়েছে আলিমুদ্দিনেরও প্রশস্ত মুখে। কঠিন ভাস্কর্যে গড়া একটা তাম্র-পিতল মূর্তির মতো তাঁর দেহের রেখাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট আর প্রকট হয়ে উঠেছে। দাক্ষিণাত্যের কোনো মন্দিরের ছায়া-ঘন গর্ভ-গৃহে দীপ-দীপিত দেবমুখের মতোই দেখাচ্ছে তাঁর মুখখানা।

তারপর কয়েকবার নিঃশব্দে নড়ে উঠল তাঁর ঠোঁট দুটি। বলবার আগে কিছু একটা যেন আউড়ে নিলেন নিজের ভেতর। একবার তাকালেন মাথার ওপরকার পতাকার দিকে, পতাকা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে। ওই সবুজ পতাকার ওপর যে কিরণ-লেখা বিম্বিত হয়ে পড়েছে তা কি পাকিস্তানের পূর্বাভাস, না কোনো আগামী শূন্যতার প্রতিভাস?

তারও পরে জনতার মধ্যে নামল তাঁর দৃষ্টি। একদল মানুষ। তাঁর কাছ থেকে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, প্রতীক্ষা করে আছে। কিন্তু একদল মানুষ? না—এক হয়ে গেছে। একটা শক্তি—একটা বিশ্বজয়ী শক্তি; যা অপ্রতিহত প্রভাবে এগিয়ে গিয়েছিল মক্কা থেকে মরোক্কো, মরোক্কো থেকে মস্কোভী। সহস্র ছাড়িয়ে লক্ষ—লক্ষ ছাড়িয়ে কোটি। শিখায়িত রক্তধারায়, বজ্রবাহী পেশীতে পেশীতে। The great human dynamo!

কিন্তু!

কোন লক্ষ্যে? সব সত্য কি বলতে পেরেছে ইসমাইল? তথ্য দিয়েছে, আবেগ দিয়েছে তার চাইতেও বেশি। কিন্তু তারপর? কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই শক্তির বন্যাকে—এই চল-বিদ্যুতের ধারাকে? কারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই বিপুল human dynamoকে?

একবার নিজেরই আশেপাশে তাকালেন আলিমুদ্দিন। একটা উগ্র চঞ্চলতা ইসমাইলের চোখে মুখে—কোনো নিশ্চিত লক্ষ্য নেই যেন। জ্বলতে চায়—জ্বালাতে চায়। ফতে শা পাঠান? চমৎকার সেজেগুজে এসেছেন, গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে—নির্বোধ আনন্দে ঘন ঘন পাক দিচ্ছেন কাঁকড়া বিছের লেজের মতো গোঁফজোড়ায়। জমাদার বদরুদ্দিন সাহেব অল্প অল্প হাসছেন, নিচু গলায় কথা কইছেন পাশের একজন স্কুল-মাস্টারের সঙ্গে: হিন্দু ইন্সপেক্টারটা থাকাতেই ডিগ্রেড হয়ে গেলাম, বুঝলেন! যদি কোনো মুসলমান থাকত—

ঘুষের দায়ে লোকটা ডিগ্রেডেড হয়েছিল—দোষ দিচ্ছে হিন্দু কর্মচারীর। এরা—এই এরাই হবে রাষ্ট্রের কর্ণধার! আলিমুদ্দিনের রক্ত তেতে উঠল, জ্বালা ধরল মাথার ভেতর। শাহ্—খোদাবক্স খন্দকার—

ইসমাইল অধৈর্যভাবে তাঁকে স্পর্শ করল।

—বলুন, বলুন মাস্টার সাহেব। প্রায় তিন মিনিট ধরে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন!

হ্যাঁ—বলতে উঠে বড় বেশিক্ষণ ধরে ভাবছেন তিনি। চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন। নড়ে উঠলেন তড়িৎ-তরঙ্গের স্পর্শে উচ্চকিত একটা শবদেহের মতো। তারপর:

—ভাই সব, আমার বন্ধু ইসমাইল সাহেব আপনাদের সব মোটামুটি খুলে বলেছেন। কাজেই আমার আর নতুন কিছু বলবার নেই। আশা করি, পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগের সার্থকতা সম্বন্ধে আপনাদের কোনো সন্দেহ নেই, সে কথাও আমাকে নতুন করে বোঝাতে হবে না। শুধু একটা প্রশ্ন আমার আছে। আমরা, যারা আজ এমন করে পাকিস্তানের কথা আপনাদের বলতে এসেছি—বুকে হাত দিয়ে আমাদের বলতে হবে—সে ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের আছে তো?

জনতা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারা ঠিক ধরতে পারছে না। আর চেয়ারে বেঞ্চিতে যাঁরা বসে ছিলেন. তাঁরা পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন—কোন দিকে এগোতে চাইছেন মাস্টার?

আলিমুদ্দিন বললেন, আমি জানতে চাই—কার জন্যে পাকিস্তান?

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল ইসমাইল: কেন, মুসলমানের?

—বেশ কথা। কিন্তু মনে রাখবেন, ১৯০৬ সালে লীগের জন্মদিনে সব চেয়ে বেশি খুশী হয়েছিল ইংরেজ। সেদিন সে আশা করেছিল, এই লীগের আশ্রয় নিয়েই দেশের আজাদীর লড়াইকে সে ডুবিয়ে দেবে। কারণ সারা দেশে সেদিন আগুন জ্বলছিল।

ইসমাইল আর বসতে পারল না, ছট্‌ফট করে উঠে দাঁড়াল।

—মাস্টার সাহেব, এতদিন পরে কেন তুলছেন ওসব পুরনো কথা? ১৯০৬ সালে যা হয়েছিল, তারপরে অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আজ তো মুসলমান সত্যিকারের লড়াইয়ে নেমেছে।

আলিমুদ্দিন বললেন, মানি, সব মানি। কিন্তু একটা কথা আমার বলবার আছে। লর্ড মিণ্টোর আমলে যে স্বার্থপরের দল নিজেদের পেট মোটা করবার জন্যে লীগের খাতায় নাম লিখিয়েছিল, তারা কি আজও আমাদের মধ্যে নেই!

ইসমাইল তিক্তস্বরে বললে, নেই।

—আমি আপনাকে জবাব দিতে বলছি না ইসমাইল সাহেব, আপনি বসুন।—তীব্র চোখে আলিমুদ্দিন ইসমাইলের দিকে তাকালেন।

মুঠো-করা হাতটাকে আরো শক্ত মুঠোয় ধরে ইসমাইল বললে, আপনি অনাবশ্যক কথা বলছেন মাস্টার সাহেব, আপনারই বসে পড়া উচিত।

সভায় একটা কলরব উঠল।

আলিমুদ্দিন সোজা শাহের দিকে তাকালেন: প্রেসিডেণ্ট সাহেব, আমি কি বসে পড়ব, না আমায় বলতে দেওয়া হবে?

সামনে যারা ছিল, তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: বলুন, বলুন, বলে যান আপনি।

ফতে শা বিব্রতভাবে তাকালেন এদিকে। গোঁফে পাক না দিয়ে টেনে টেনে লম্বা

করতে লাগলেন সেটাকে। বললেন—না, না, আপনি বলুন। বস হে ইসমাইল, এখন ওঁকে বাধা দিয়ো না।

অসন্তুষ্ট মুখে বিড়বিড় করতে করতে ইসমাইল বসে পড়ল। অধৈর্যভাবে তাকাল হাতের ঘড়িটার দিকে।

শরীরটাকে আরো ঋজু করে দাঁড়ালেন আলিমুদ্দিন। মাথার উপর রাঙা আলোয় সবুজ পতাকা ঝলমল করছে—মহিমময় হয়ে উঠছে নূর-এ-পাকিস্তান! এই পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলা যাবে না, কোনো কপটতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। সত্য চাই, আত্মদর্শন চাই। এখন থেকেই পরিষ্কার করে নিতে হবে সব হিসেব-নিকেশ। জেনে নিতে হবে কে দোস্ত, কে দুশমন। কে চলেছে সম্মুখের পথ কেটে, কারা পায়ের তলায় গড়ে তুলছে নিঃশব্দ চোরাবালি।

সেই 'নূরী ঝাণ্ডা'র নিচে তাঁকে মনে হতে লাগল তাম্র-পিত্তলের নির্ভুল স্পষ্টরেখ দীপ্তমূর্তি। তাঁকে বলতে হবে স্পষ্ট ভাষায়—সত্য ঘোষণাই তাঁকে করতে হবে।

আলিমুদ্দিন বললেন—আরো সোজা কথায় আমি আসব। ধরুন, এই সভাতেই এমন লোক উপস্থিত আছেন, যাঁদের মতো মুসলমানের শত্রু আর কেউ নেই। তাঁদের আগে আমাদের চেনা দরকার।

—কারা তাঁরা?

চেষ্টা করেও একটা কটু প্রশ্ন এড়াতে পারল না ইসমাইল।

—কারা তারা?—মূর্তির চোখ দুটো জলজল করে উঠল—দক্ষিণী মন্দিরের নটরাজের হীরক-নেত্রের মতো। যেন দেখা দিল, অগ্নিবর্ষণের পূর্ব-সংকেত।

আলিমুদ্দিন বললেন, যদি বলি, আমাদের এই ইমাম সাহেব—যিনি একজন হাজী এবং বিখ্যাত আলেম, তিনি আমাদেরই সমাজের অংশ, আমাদেরই ভাই ধাওয়াদের মসজিদে ঢুকতে দেন না? তা হলে কি বলতে হবে তিনি ইসলামের খাদেম?

—মাস্টার সাহেব!—যেন আর্তনাদ করে উঠলেন শাহু।

—হ্যাঁ, আপনার কথাও আমি বলব—আলিমুদ্দিনের চোখ দিয়ে এবার সত্যিই আগুন ঝরতে লাগল: প্রজাদের আপনি বেগার খাটান। গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে খান। অনবরত অত্যাচার করে দেশের লোককে আপনি শেষ-দশায় এনে ফেলেছেন। যে মেয়ে আপনাকে ধর্মবাপ বলে—বিহ্বল স্তব্ধ সভাটার ওপর রক্তচক্ষু মেলে আলিমুদ্দিন বললেন, আপনি তার সর্বাঙ্গে পারার ঘা ছড়িয়ে দিয়ে ইমানকে কোতল করেন। বলুন—আপনারাই কি নেতা? আপনাদের হাতেই কি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ?

—চুপ করুন—বসে পড়ুন।—পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল ইসমাইল।

—লোকটা ক্ষেপে গেছে—চিৎকার করলেন ইমাম সাহেব।

ফতে শার মুখ দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরুল। এত জোরে সরু গোঁফটাকে আকর্ষণ করলেন যে ছিঁড়ে যাবার উপক্রম করল সেটা।

—না, আমি বলব না, আমি বলবই—আলিমুদ্দিনও চিৎকার করলেন এইবারে।

সভায় বিশৃঙ্খলার ঝড় বইছে। নানা কণ্ঠে নানা রকম কোলাহল উঠছে। যেন ক্ষেপে গেল ইসমাইল, জামাটা ধরে সজোরে টান দিলে আলিমুদ্দিনের।

আলিমুদ্দিন তিন পা পেছনে হটে এলেন।

—আমি বলবই—আমি বলবই—

—না—না—

—বেশ!—স্বরগ্রামকে সমুচ্চতর পর্দায় তুলে শেষবার বললেন আলিমুদ্দিন : তাহলে আমিও জানিয়ে যাচ্ছি, পাকিস্তানের লড়াইয়ে দুশমন মুসলমানও আজ থেকে আমার শত্রু। তাদের বিরুদ্ধেও আজ থেকে আমার লড়াই—

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সভা থেকে একটা জ্বলন্ত হাউইয়ের মতো ছুটে চলে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

বাতাস নেই। একটা গমগমে গুমোট সন্ধ্যা ঘনিয়েছে ঘরের মধ্যে। দিগন্তবিস্তৃত বরেন্দ্রভূমির মাঠের ওপরে হাওয়া যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা দামাল ছেলের মতো খেলে বেড়ায়, নিয়ে যায় মাটির গন্ধ, ঘাসের গন্ধ; গোখরো সাপের নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কেয়াফুলের সৌরভ বয়ে নিয়ে যায়; বয়ে বেড়ায় তালগাছের মর্মর থেকে শুরু করে শঙ্খচিল আর গিন্নী শকুনের কান্না,—সেখানে হঠাৎ সব থমকে দাঁড়িয়েছে যেন কোন অদ্ভুত ভানুমতীর মন্ত্রোচ্চারণে। যেন আকাশ থেকে ঘনাচ্ছে কোনো দিগদিগন্তব্যাপী অশরীরী অপচ্ছায়া—আসন্ন মৃত্যু, আসন্ন দুর্বিপাক। আলেয়া-জ্বলা বরিন্দের মাঠে ঘর-পালানো রাত-চরা গরুর দল এখন আচমকা ভয় পেয়ে বসে পড়েছে কোনো ঝুরি-নামা ডাইনী বটের অন্ধকার ছায়ায়—তাদের সবুজ পিঙ্গল চোখে কিসের যেন আতঙ্কিত জিজ্ঞাসা!

শাহের বৈঠকখানা-ঘরেও সেই স্তব্ধতা, সেই গুমোট।

ফরাশের সামনে দুটো জোরাল লণ্ঠন। ঘরটা অতিরিক্ত আলো হয়ে আছে। সেই আলোর সঙ্গে কুয়াশার মতো জমছে ঘন-গন্ধী তামাকের ধোঁয়া। রাশীকৃত স্তব্ধতার মধ্যে শুধু অনুরণিত হচ্ছে মশার শ্রান্তিহীন গুঞ্জন।

মুখোমুখি দুজন। শাহু আর ইসমাইল।

ইসমাইল তিক্তভাবে হাসল। তির্যক চোখে তাকাল শাহের দিকে।

—আপনি তো লোকটার প্রশংসা করেছিলেন খুব।

হুঁ, তা করেছিলাম।—অনুতাপবিদ্ধ শোনাল শাহের গলা : তখন কি জানতাম,

লোকটা একেবারে পাগল? কোনো বুদ্ধিসুদ্ধিই ওর নেই?

—পাগল?—ইসমাইল আবার বাঁকা চোখে শাহের দিকে তাকাল: না, পাগল নয়। কিন্তু বিপজ্জনক।

—তাই দেখছি।

—যা বলবার ছিল—ইসমাইলের মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল: সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তারও তো একটা জায়গা আছে! সভাটাই পণ্ড করে দিলে!

ফতে শা উত্তর দিলেন না। সজোরে একবার গোঁফটাকে আকর্ষণ করলেন, তারপর মনের অসহ্য জ্বালাটা দূর করবার জন্যে চটাস চটাস শব্দে গোটাকয়েক মশা মারবার চেষ্টা করলেন।

ইসমাইল বললে, আমার সন্দেহ হয়—লোকটা প্রজা ক্ষ্যাপাবে।

—কি রকম?—তড়িৎগতিতে উঠে বসলেন ফতে শা।

—আজকাল ওইসব রেওয়াজ হচ্ছে। আমাদের আন্দোলনকে নষ্ট করবার জন্যে সোশ্যালিজমের একটা ধুয়ো তুলেছে হিন্দুরা। আমার মনে হয়, ওদেরই কারো সঙ্গে যোগ-সাজস আছে মাস্টারের। মুখে এরা লীগের বন্ধু, ভেতরে ভেতরে পাকা ন্যাশানালিস্ট। তা ছাড়া—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ইসমাইল বললে, উনি তো কংগ্রেসের হয়ে বারকয়েক জেল-টেলও খেটেছেন, তাই না?

—ঠিক ঠিক।—ফতে শা যেন অকূল অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন: তাই তো! সে কথা তো খেয়াল ছিল না।

ইসমাইল মৃদু হাসল: এসব লোক আমি অনেক দেখেছি, এদের আমি চিনি। যাক—সেজন্যে আটকাবে না। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

অসহ্য ক্রোধে ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন শাহ্: আমার খেয়ে আমারই বদনাম গাইবে? ইস্কুল থেকে ওই মাস্টারকে আমি তাড়াব। সাহস কত! খোদাবক্সের গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছিল!

ইসমাইল বললে, সব দুরস্ত হয়ে যাবে। ভালো কথা, বিদ্রোহী প্রজা আছে আপনার?

—অভাব কি! টিলার সাঁওতালরাই তো—

—সাঁওতাল!—ইসমাইল আঁতকে উঠল: সাংঘাতিক জীব। সাপ পুষে রেখেছেন চাচা! ওই সবই হল এসব লোকের বিষদাঁত। দাঁতটা উপড়ে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—কী করে?—শাহ্ সাগ্রহে জানতে চাইলেন।

—পলিটিকস। আগে এককাট্টা হওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে। সে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। হ্যাঁ—আপনাকে একটা কাজ করতে হবে চাচা। টিলায় একটা মসজিদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—টিলায় মসজিদ !—শাহ্‌ হাঁ করে রইলেন : কেন ?

—সব জিনিস বড় দেরিতে বোঝেন আপনি—ইসমাইল আবার মৃদুমন্দ হাসল।

স্তব্ধ গুমোট হাওয়ায়, ঘনীভূত তামাকের ধোঁয়ায় খানিকক্ষণ ইসমাইলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝতে চাইলেন শাহ্‌। তারপর কোনো কিছু বুঝতে না পেরে অসহায় ক্রোধে চটাস চটাস করে আবার মশা মারলেন গোটাকয়েক।

পনেরো

সভাটা বসল কিষাণ-সমিতির সামনে।

এত লোক হবে আশা করা যায়নি—নগেন ডাক্তারের যোগ্যতা আছে দেখা যাচ্ছে। কখনো সাইকেলে চড়ে আবার কখনো বা সাইকেলটাকে কাঁধে চাপিয়ে চষে বেড়িয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। পালগ্রামের সাঁওতালেরা এসেছে, এসেছে কালাপুখরির ওঁরাওঁয়ের দল, আর এসেছে সাধারণ কৃষক। তাদের ভেতরে বড় কৃষাণ আছে, আছে বর্গাদার। শুধু পেট-মোটা জোতদারেরা আসেনি—খবর দিলেও তারা আসত না।

নগেনই প্রস্তাব করল।

—আজকের এই সভায় সভাপতি হলেন কালাপুখরির সনাতন মণ্ডল। আপনাদের পরিচিত সোনাই সর্দার।

সনাতন হকচকিয়ে গেল। সে দু'হাত জোড় করে বললে—ডাক্তার ভাই, আমি—

রঞ্জন বললে—আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

আশ্রয়ের আশায় দু-চারবার এদিকে ওদিকে তাকাল সনাতন : কিন্তু আমি—

আর কিছু তাকে বলতে দেওয়া হল না। তাকে হাত ধরে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলে নগেন। আনন্দিত করতালির ধ্বনি উঠল চারদিকে।

: কিষাণ-সমিতিকী জয়—

: ইনকিলাব জিন্দাবাদ—

এক হাজার মানুষের গলা থেকে প্রতিশ্রুতি ছড়াল আকাশে। এক হাজার মানুষ। এক হাজার চওড়া বুক—দু হাজার লোহায় গড়া পেশী। দু হাজার চোখে উজ্জ্বলন্ত প্রাণের অগ্নি।

নগেন বললে, ভাই সব, অনেক দূর দূর থেকে আপনারা সবাই এসেছেন। তাই আপনাদের সকলকে একটু তাড়াতাড়িই ছেড়ে দিতে হবে—নইলে রাত হয়ে যাবে ফিরতে। দিন কাল খারাপ, মাঠে আজকাল খুব সাপের উৎপাত হচ্ছে। সেই জন্যে আমরা এখনি সভার কাজ আরম্ভ করব। এখন আজকের সভার উদ্দেশ্য আপনাদের ভালো করে

বুঝিয়ে বলবেন আমাদের রঞ্জনদা।

রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। কেমন বিব্রত লাগছে। বক্তৃতা দেবার অভ্যাস তার আছে, জেল থেকে বেরুবার পর কিছুদিন তাকে এখানে ওখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেও হয়েছে। কিন্তু সে বক্তৃতা পোশাকী, তার রূপ সাজানো-গোছানো, আলঙ্কারিক। সেখানে যুক্তির সঙ্গে ইমোশনের মিশ্রণ, তত্ত্বের সঙ্গে তির্যক ব্যঙ্গের বিন্যাস, ভাষার অলঙ্করণে ধ্বনির কুহক-বিস্তার। কিন্তু এ তো তা নয়। হাজার মানুষের চোখ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্পষ্ট উত্তর চায় এরা—চায় জীবন-মরণ সমস্যার অকুণ্ঠ সমালোচনা। এখানে রাজনীতির ব্যসন নয়, কথার কারু-শিল্প নয়—যুগরুদ্রের ছিন্ন জটা থেকে ক্রোধরূপী পুরুষের আগ্নেয় আবির্ভাব ঘটেছে এদের মধ্যে : হয় পথ দেখাও, নইলে পথ থেকে সরে যাও। হয় আগে কদম ফেল, নইলে চিরদিনের মতো বরবাদ হয়ে যাও ভীরুর দল!

অনধিকারী। অনধিকারী বই কি। এদের মন আমাদের নয়—সে মন আয়ত্ত করে নিতে হচ্ছে। কিন্তু সে কি সহজ কাজ? কত সংস্কার! মানসিক আভিজাত্য—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অহমিকা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বত-প্রাকারের মতো! শ্রেণীচ্যুতি! এক নিশ্বাসে বলবার মতো সহজ কথা, কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে? বংশক্রমের অলক্ষ্য শৃঙ্খল চিন্তাকে সরীসৃপ গ্রন্থিলতায় জড়িত রাখে, শূন্যনির্ভর সংস্কৃতির অহঙ্কার দ্বিধার পরে দ্বিধা আনে। তবু—

তবু চেষ্টা করতেই হবে। যতটা পারি—যতখানি সম্ভব। চেষ্টায় ফাঁক না থাকে, ফাঁক না থাকে আন্তরিকতায়। আগামী দিনের ইতিহাসের কাছে আমাদের সপক্ষে এই তো দলিল।

রঞ্জন বললে, আপনারা সবাই জানেন, নদীর বন্যায় কালাপুখরি অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘে ধানী জমি প্রতি বছর কি ভাবে বরবাদ হয়ে যায়। আর কি ভাবে জমিদারের কিছু জলকর বাঁচাবার জন্যে নষ্ট হয় হাজার লোকের মুখের গ্রাস। তাই, এবার বর্ষা নামবার আগেই বাঁধ দেওয়া হবে কালাপুখরির ডাঁড়ায়। কিন্তু তাতে জমিদারের বাধা। এই বাধা সয়ে এমন করে কিছুতেই আপনারা মরতে পারেন না। এবার রুখে দাঁড়াতে হবে আপনাদের—সকলে হাতে হাত মিলিয়ে বাঁধ বাঁধতে হবে। হয়ত জমিদারের লাঠিয়াল আসবে—পুলিসও আসতে পারে। কিন্তু সেই জন্যে আপনারা পিছিয়ে যাবেন কি না সে বিচারের ভার আপনাদেরই ওপর।

—জান কবুল—উগ্র চিৎকার উঠল একটা।

—হামার অ্যাকটা কথা বলিবার আছে—একজন দাঁড়িয়ে উঠল।

—বসি যাও হে বসি যাও। তুমি আবার খামাখা ঝামেলা লাগাইলে ক্যানে হে?—কয়েকজন তাড়া দিলে।

সভাটার ওপর একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে রঞ্জন।

—না, না, চুপ করুন আপনারা। সকলের কথাই শুনতে হবে আপনাদের। বলুন কী বলবেন আপনি।

যে দাঁড়িয়েছিল, সে একজন মাঝবয়সী কৃষাণ। এক সময়ে অতিকায় একটা কাঠামো ছিল, হয়ত অমানুষিক শক্তিও ছিল গায়ে। কিন্তু অর্ধাহারে আর ঋণের বোঝায় পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, চাপা চওড়া কপালের তলায় চোখ দুটো গভীর গর্তের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছে। একটা শঙ্কিত অনিশ্চয় দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে বললে, হামি কহিতেছিনু কালাপুখরিতে ঝামেলা হছে তো হছে। সেইটাকে লিয়া ওইখানকার মানসিলাই (মানুষগুলোই) লড়িবে। হামরা ক্যানে ঝুটমুট ওইঠে যাই ফ্যাচাঙে পড়িমু?

—ইটা একদম বাজে কথা হচ্ছে—একজন প্রতিবাদ করল তীব্র গলায়।

—না, বাজে কথা নয়—রঞ্জন আবার হাত বাড়িয়ে দিলে সভার দিকে: এরকম কথা আপনাদের সকলেরই মনে উঠতে পারে, আর তা ওঠাও উচিত। সত্যিই তো, অন্যের জন্যে কেন আপনারা লড়তে যাবেন, কেন আপনারা পড়তে যাবেন জমিদারের কোপে? বিশেষ করে যে কালাপুখরিতে আপনাদের কোনো স্বার্থই নেই? ঠিক কথা। সোজাসুজি ভাবতে গেলে এমনি মনে হওয়া উচিত। কিন্তু ভাই সব, আজ দিন বদলে গেছে। আজ দুনিয়ার সব দুঃখী মানুষকে পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার জন্যে। যতদিন আপনারা ফারাক হয়ে ছিলেন, ততদিন আপনাদের ক্ষেতের ফসল লুটে নিয়েছে জমিদার, ঘর-বাড়ি গরু-হাল নীলামে তুলেছে মহাজন। আজ যে যেখানে আছেন যদি এককাট্টা হয়ে দাঁড়ান, তাহলে দেখবেন দুদিনেই সব জুলুমবাজি বন্ধ হয়ে গেছে। রামের স্বার্থ রাখবার জন্যে যদি রহিম দাঁড়ায়, আলীকে বাঁচাবার জন্যে যদি যদু ছুটে যায়—তাহলে সবাই বুঝতে পারবে তামাম মুলুকের ভুখা মানুষেরা আজ একদল। কেউ আর তাদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না। আজ আপনারা যদি কালাপুখরিতে বাঁধ দেবার জন্যে এগিয়ে যান, তাহলে কাল জয়গড়ে আপনাদের ফসল বাঁচাবার জন্যে কালাপুখরির মানুষগুলোই ছুটে আসবে—এ কথা কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না?

: আলবত! বুঝি হামরা।

: কালাপুখরির মানসিলার সাথ হামরা একদল।

: এককাট্টা হই হামাদের বাঁধ গড়িবা হেবে।

: কিষাণ-সমিতি জিন্দাবাদ!

রঞ্জন সভার দিকে তাকাল। হাজার মানুষ নয়—ক্রোধ-সমুদ্র। তরঙ্গের পর তরঙ্গ. তুলে আসছে। ভেঙে দেবে—গুঁড়িয়ে দেবে, ধ্বসিয়ে দেবে বালির বনিয়াদে গড়া শিষ-মহলের স্বপ্নকে।' সেই তরঙ্গের মুখে সে নিজেও টিকে থাকতে পারবে তো? দাঁড়িয়ে

থাকতে পারবে তো তার মানসিক পারিপাট্যের খুঁটিতে? এই ঢেউয়ের মুখে সেও কি এগিয়ে যেতে পারবে, না নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ক্রোধ-বন্যার এই বিপুল উৎক্ষেপে?

সংশয়-শঙ্কিত মন যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, আচমকা থমকে দাঁড়াল হৃৎস্পন্দন। রক্ত-নাড়ীতে গুরগুর করে ঝোড়ো মেঘের ডাক। তারপর—তারপর?

নগেন বললে, এতেই হবে রঞ্জনদা। এবার তুমি বস, বাকিটা আমি শেষ করছি।

জয়গড়ে নগেন ডাক্তারের ঘরে বসে ছিল তিনজন।

বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে—শুক্লা রাত। মহুয়া বনের পাতায় পাতায় রূপালী জরির মতো ঝকমক করছে জ্যোৎস্না। টাঙন নদীর জলটা সাদা হয়ে আছে একরাশ দুধের মতো। একটা মোড়ার ওপর বসে সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ছিল উত্তমা। রঞ্জনের বেশ লাগছিল শ্যামাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির এই তন্ময়তাটুকু। মাটি কোপায়, পোস্টার লেখে, মেয়েদের জড়ো করে আনে, পুরুষের মতো উঁচু গলায় চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। মন্দাক্রান্তা ছন্দ নয়, ভুজঙ্গ-প্রয়াতের ললিত বিস্তার নয়—অনুষ্টুপের মতো কঠিন ঋজুতা। তবু ছন্দ ছন্দই। তারও রেশ আছে, তারও ব্যঞ্জনা আছে, তারও কথায় কথায় হরিণীপ্লুতার ঝঙ্কার বেজে ওঠে। এই মুহূর্তে আত্মমগ্ন উত্তমাকে দেখে এই সব কথাই রঞ্জনের মনে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল, ঝলকে উঠছিল বাইরের ঝলক লাগা মহুয়া পাতার মতো। কিন্তু গদ্যময় নগেন একটিপ নস্য টানল।—মিটিংটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে রঞ্জনদা।

—চমৎকার। এত ভালো হবে আশা করিনি।

—তোমার কি মনে হয়? ওই বাঁধটাকে নিয়েই একটা জোরদার লড়াই আমরা গড়ে তুলতে পারব?—উৎসুক জিজ্ঞাসুভাবে নগেন রঞ্জনের দিকে তাকাল। চোখ দুটো চকচক করে উঠল তার।

—তাই তো মনে হচ্ছে।—আবার একটিপ নস্য নিয়ে বেশ শব্দ করে টানল নগেন।

—জানো রঞ্জনদা, এই আমাদের প্রথম শক্তি-পরীক্ষা। এতদিন ধরে যে সব কথা আমরা ওদের বুঝিয়েছি, যে ভাবে ওদের চালাতে চেয়েছি, তা কতটা সফল হবে, এরই ওপরে তার যাচাই। যদি লড়াই জিততে পারি—জেনে রেখো, এ তল্লাটে কাউকে আর দাঁত ফোটাতে হবে না। আর যদি হারি, তাতেও দমবার কিছু নেই। এক পা পিছু হটে গেলে পাল্টা দশ পা এগিয়ে যাবার জোর আমরা পাবই। কি বলিস উত্তমা?

ঘোর-লাগা চোখ মেলে উত্তমা একবার ফিরে তাকাল। কথা বললে না, শুধু মাথা নেড়ে নিজের সমর্থনটা জানিয়ে দিলে। তার মন এখানে নয়—আরো কিছু সে ভাবছে, আবিষ্ট হয়ে গেছে মহুয়া বন আর টাঙন নদীর দিকে তাকিয়ে। অনুষ্টুপের দ্রুত-দীপ্তির ওপর মন্দাক্রান্তার মেঘ নেমেছে কোথাও।

রঞ্জন বললে, কিন্তু একটা খবর শুনেছ তো? পালনগরের শাহ্ কিন্তু মুসলিম লীগ গড়বার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। মুসলমানদের তিনি সরিয়ে নেবেন তোমাদের আন্দোলন থেকে।

—মুসলিম লীগ গড়তে চান গড়ুন। মুসলমানের স্বার্থের কথাও তিনি ভাবুন। কিন্তু সকলের স্বার্থ নিয়েই যেখানে লড়াই, সেখানে কতদিন তিনি মুসলমানকে আলাদা করে সরিয়ে রাখতে পারবেন? সাচ্চা ইমান যার আছে, আজ হোক, কাল হোক, ছুটে সে আসবেই। তার প্রমাণ আলিমুদ্দিন মাস্টার। সেদিন সভায় কী কাণ্ড হয়ে গেছে শোনোনি বুঝি?

—শুনেছি। আলিমুদ্দিন খাঁটি লোক—সত্যিকারের আজাদ পাকিস্তানের কথাই তিনি ভেবেছেন। তাই সেদিনের সভায় তিনি শাহের দলকে বেশ মিঠেকড়া শুনিয়েছেন। তা নিয়ে খুব গণ্ডগোলও চলছে। কিন্তু সেজন্যে তুমি এ কথা মনেও করো না যে তিনি তোমাদেরই দলে এগিয়ে আসবেন। তিনি সোস্যালিজমে বিশ্বাস করবেন—এ আমার কখনো আশা হয় না।

—কী করে জানলে?—তর্ক করার উৎসাহে নগেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: দেশের মানুষকে যিনি ভালোবাসেন, তাদের মঙ্গল যিনি করতে চান, তিনি একদিন না একদিন আমাদের সঙ্গে এক লক্ষ্যে এসে মিলবেনই। হয়ত সেদিন আমাদের সকলের আগেই তাঁকে আমরা দেখতে পাব।

—বেশ তো, আশা করতে থাক—রঞ্জন টিপ্পনী কাটল।

নগেন উত্তেজনার সঙ্গে কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে ভারি গলার ডাক এল: উত্তমা!

উত্তমা আর নগেন একই সঙ্গে চমকে উঠল। মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল উত্তমা।

—নগেন নেই বাড়িতে?—আবার ডাক শোনা গেল।

—আমার সেই জ্যাঠামশাই—সেই জোতদার।—ফিস ফিস করে বলেই নগেন সাড়া দিলে: আছি জ্যাঠামশাই, আসুন এ ঘরে।

একটা চটির শব্দ উঠে আসতে লাগল ঘরের দিকে। নগেন আবার চাপা গলায় বললে, সাংঘাতিক লোক। বুঝে-সুঝে কথা কয়ো রঞ্জনদা।

রঞ্জন হাসল—জবাব দিলে না। বুঝে-সুঝে কথা! আর যাই হোক, ও জিনিসটার জন্যে তার ভাবনা নেই। দিনের পর দিন কুমার ভৈরবনারায়ণকে তার সঙ্গদান করতে হয়। পড়ে শোনাতে হয় গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ—বিশ্বরূপকে এনে প্রতিষ্ঠা করতে হয় কুমার বাহাদুরের নেশার রঙ-লাগা চোখের সামনে; মূঢ় রসিকতায় হাসবার চেষ্টা করতে হয়—হাসতেও হয় কখনো কখনো। আর কিছু না হোক, কথা বলবার আর্টটাকে অন্তত

তার জানা হয়েছে।

চটির শব্দ চৌকাঠের গোড়ায় এসে পৌঁছুল। জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখা গেল মানুষটিকে। মাথায় চকচকে টাক, গায়ে বেনিয়ান। হাতে একখানা মোটা ছড়ি। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি—আচমকা দেখলে শ্রদ্ধা উদ্রেক করবার মতো প্রৌঢ়ত্ব।

—আসুন জ্যাঠা, আসুন—নগেন ডাকল।

ভদ্রলোক ঘরে পা দিলেন। লণ্ঠনের আলোয় অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জনের দিকে।

নগেন বললে, ইনি আমাদের রঞ্জনদা, রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আর ইনি আমাদের জ্যাঠামশাই—মৃত্যুঞ্জয় সরকার। এঁর কথা তো তোমায় আগেই বলেছি।

নমস্কার বিনিময়ের ভদ্রতাটা শেষ হল। উত্তমা দাঁড়িয়ে উঠেছিল, তার পরিত্যক্ত মোড়াটায় এসে আসন নিলেন মৃত্যুঞ্জয়। বেশ জাঁকিয়েই বসলেন।

কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে একবার মৃত্যুঞ্জয় নগেনের দিকে তাকালেন: এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোদের একবার খবর করে যাই। তোর মা কোথায়?

জবাব দিলে উত্তমা: হরিসভায় গেছেন—কীর্তন শুনতে।

—আজ হরিসভায় কীর্তন আছে বুঝি? ওহো, মনে তো ছিল না।—মৃত্যুঞ্জয় যেন অনুতপ্ত হয়ে উঠলেন: যা দিনকাল পড়েছে—কিছু কি আর খেয়াল থাকে! সংসারের চিন্তাতেই অস্থির—ধমকর্ম মাথায় উঠে গেছে। কী বলেন?—

শেষ কথাটা তিনি রঞ্জনের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

—তা বটে—রঞ্জন মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—আপনাকে কিন্তু আমি চিনি। হিজলবনের রাজবাড়িতে আপনি থাকেন, না?—মৃত্যুঞ্জয় অভিজ্ঞ দৃষ্টি ফেললেন।

মুহূর্তের জন্যে রঞ্জনের মুখে অস্বস্তির ছায়া দুলে গেল: আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিকই চিনেছেন।

—ও।—মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, মনে মনে যেন মিলিয়ে নিতে চাইলেন কিছু একটার যোগফল: ভালো কথা নগেন, আজ বুঝি তোদের কিষাণ-সমিতির একটা সভা ছিল, না?

—আপনার অজানতে এ অঞ্চলে কিছুই তো হওয়ার জো নেই জ্যাঠামশাই—নগেন স্মিত হাসি হাসল।

—ওহো, তাও তো বটে। বুড়ো বয়সে আজকাল সব কিছু ভুল হতে শুরু করেছে। তা কী হল সেই মিটিঙে?

—দেশের লোকের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা—যা আমরা করে থাকি—নগেন জবাব দিলে।

—সেই কালাপুখরির ব্যাপারটা বুঝি?—মৃত্যুজয় আড়চোখে রঞ্জনকে লক্ষ্য করতে

লাগলেন।

হঠাৎ উত্তমা হেসে উঠল। এতক্ষণ ধরে যেন বাঁধা পড়েছিল একটা ঝরণার জল—মুক্তির চপল আনন্দে ছুটে বেরিয়ে এল হঠাৎ।

—কিছু ভেবো না দাদা। সব খবরই রাখেন জ্যাঠামশাই—তোমার আমার চাইতে ভালোই রাখেন।

চাপ দাড়ির ভেতরে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখা গেল না, চোখের দৃষ্টিতে ফুটল না বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য। খোঁচাটা তাঁকে এতটুকু স্পর্শ করেনি—এ সবের অনেক উর্ধ্বে তাঁর আসন।

—খবর ঠিক রাখা নয়—এগুলো হাওয়াতেই ভেসে আসে কি না।—দাড়ির নেপথ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ একটু প্রসারিত হল, খুব সম্ভব হাসলেন : তা ভালোই। ওদের দুঃখ অনেক দিনকার—মেটাতে পার তো একটা মস্ত বড় কাজই হবে। কিন্তু নগেন, কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি।

—বলুন না।

—যা করছ ভালোই করছ। কিন্তু দেখ, হিংসার পথ কোনোদিন নিয়ো না। ওতে কখনো কল্যাণ নেই। মহাত্মার পথ নাও, অহিংসা দিয়ে সংগ্রাম কর।

নগেন একটু হাসল : আপনি কোনো চিন্তা করবেন না জ্যাঠামশাই। অহিংসা পরম ধর্ম, তা আমরা জানি। আমাদের ব্যাপারটা নিছক নিরামিষ—ওতে কোনো রক্তারক্তির গন্ধ নেই।

উত্তমা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। ঘরের শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে তার আকস্মিক হাসিটা যেন খিল খিল করে গেল একগোছা চাবুকের মতো।

—জানেন রঞ্জনদা, জ্যাঠামশাই ভারি অহিংস। উনি শুধু মাছ-মাংস খান না তাই নয়, ভুলেও কোনোদিন একটা ছারপোকা পর্যন্ত মারেন না।

আশ্চর্য সংযম মৃত্যুঞ্জয়ের। এ আঘাতও তাঁকে স্পর্শ করল না।

ধীর শান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ, আমি অহিংসার সেবক। আপনারা ইয়ংম্যান রঞ্জনবাবু, এখনো রক্তের জোর আছে। কিন্তু জানবেন, আত্মার শক্তিতে যা হয়, হাজার বাহুবলেও তা হয় না। আর তার সবচেয়ে বড় নজীর গান্ধীজী। সারা দুনিয়া সে কথা স্বীকার করে।

হাতের লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় উঠে পড়লেন।

—চললেন ?—নগেন জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, উঠি। একবার হরিসভার দিকেই যাই। সারাদিন তো বিষয়ের চিন্তাতেই মন বিক্ষিপ্ত থাকে, ওখানে গিয়ে তবু একটু শান্তি পাব। চলি তাহলে রঞ্জনবাবু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি খুশী হলাম, আবার দেখা হবে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনজনেই কান পেতে শুনতে লাগল তাঁর বিলীয়মান চটির শব্দ।

—খুব অমায়িক লোক!—রঞ্জনই স্তব্ধতা ভাঙল।

—হ্যাঁ, অত্যন্ত।—নিজের ঠোঁটটা একবার কামড়াল নগেন।

—ওঁর ওপরে তোমাদের মিথ্যে সন্দেহ। অত্যন্ত নিরীহ মানুষ—গান্ধীভক্ত, বিনয়ে একেবারে লুটিয়ে আছেন—রঞ্জন আবার বললে।

—সাপও মাটিতে লুটিয়েই থাকে রঞ্জনদা, কেবল ছোবল দেবার সুবিধের জন্যে—আর গান্ধীজী? তাঁর রাজনীতি না জানি, মানুষটাকে তো জানি। জ্যাঠামশাইয়ের মতো এমন আরো কটি ভক্ত জুটলেই তাঁর হয়েছে!—উত্তমা আবার হাসল। কিন্তু উচ্ছল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নয়। ছোরার ধারের মতো একটা প্রখর হাসি বয়ে গেল তার ঠোঁটের কোণায়।

ষোলো

মাথা নিচু করে জিব্রাইল এসে দাঁড়াল সামনে।

—কিছু বলবে? আলিমুদ্দিন চোখ তুললেন।

বেদনা-ভরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জিব্রাইল। সঙ্কোচে আর সমবেদনায় গলা তার জড়িয়ে আসছে। এতদিন ধরে সে নিজেও জানত না এই বিদেশী বিচিত্র মানুষটাকে কখন সে এমন একান্ত করে ভালোবেসে ফেলেছে। চকিতের জন্যে জিব্রাইল অনুভব করল কোথায় নেমকহারামী হচ্ছে—ঘটছে একটা গভীর বিশ্বাসঘাতকতা। চারদিকের উদ্যত শত্রুর আঘাতের ভেতর এই অসহায় লোকটাকে এমনভাবে ফেলে যাওয়া—একে বেইমানি ছাড়া আর কী বলা চলে!

কিন্তু আর নয়। একটার পর একটা যা ঘটেছে, তার পরিণাম সহজ হবে না। ওয়াজের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে অন্ধকারে লোক লাগিয়ে যে কোনো মুহূর্তে শাহ্‌ ফারশার ঘায়ে মাথা নামিয়ে দিতে পারে মাস্টারের। শয়তানের রাজত্বেই যখন বাস করতে হচ্ছে, তখন তাকে ক্ষ্যাপানো মানেই খাঁড়ার মুখে নিজের গর্দান বাড়িয়ে দেওয়া। ছা-পোষা জিব্রাইল সে ঝক্কি কাঁধে বইতে রাজী নয়। তা ছাড়া এলাহী বক্সের বিশ্রী রোগওলা মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে আসা—

মনঃস্থির করে ফেলল জিব্রাইল।

—আমাকে বিদায় দিতে হবে মাস্টার সাহেব।

মাস্টার কথা বললেন না। শুধু শান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে জিব্রাইলের দিকে চেয়ে রইলেন।

জিব্রাইল আরো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল—ওই অদ্ভুত চোখের দৃষ্টির সামনে সত্যি

কথা বলবার সৎসাহস মুহূর্তে মুছে গেল তার মন থেকে।

—কাল সকালে একবার দেশে যাব। বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে অনেকদিন দেখিনি।

—যাবে—আলিমুদ্দিন হাসলেন : যাওয়াই তো উচিত।

জিব্রাইল আবার মাথা নিচু করল। তার এই ছলনাটুকু যে মাস্টার ধরে ফেলেছেন—তা সে জানে। কিন্তু ইচ্ছে করেই তার দুর্বল জায়গাটাকে তিনি স্পর্শ করলেন না। আরও খারাপ লাগল। এর চাইতে মাস্টার যদি সোজাসুজি তাকে জেরা করতেন, যদি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, তাহলে ভার নেমে যেত তার। লঘু হয়ে যেত অপরাধের বোঝা।

জিব্রাইলের দুচোখে জল এসে গেল।

অপ্রত্যাশিতভাবে উচ্ছ্বসিত গলায় জিব্রাইল বলে ফেলল—আমাকে মাপ করুন মাস্টার সাহেব!

আলিমুদ্দিন ব্যস্ত হয়ে তার দু হাত চেপে ধরলেন।

—ছিঃ—ছিঃ—মাপ করবার কী আছে! দেশে যেতে চাইছ, যাবে বই কি জিব্রাইল। যেদিন খুশি আবার ফিরে এস।

জিব্রাইল আর দাঁড়াতে পারল না। দ্রুত চলে গেল সামনে থেকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মাস্টার, আবার ঝুপ করে বসে পড়লেন কাঠের জলচৌকিটার ওপর। যাবে বই কি—যেতেই হবে ওকে। শাহের কাছে ওর মাথা পর্যন্ত বাঁধা। কিসের জন্যে তাঁর সঙ্গে ও এমন করে ঝাঁপ দিতে যাবে তুফানের মুখে? না, জিব্রাইলের কোনো দোষ নেই।

কিন্তু: মাস্টারের ললাটে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। কেন হঠাৎ এলাহী বক্সের মেয়ে রাজিয়াকে তিনি ঘরে নিয়ে এলেন? চিকিৎসা করবার জন্যে? যে বিষ-ব্যাধি আজ সমস্ত বড় বড় ডাক্তারের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে, একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স দিয়ে তার জন্যে কতখানি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব? কতটুকুই বা তিনি জানেন চিকিৎসা-বিদ্যা সম্পর্কে?

না, এ তাঁর চ্যালেঞ্জ! শাহের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, খোদাবক্স খন্দকারের বিরুদ্ধে; ইসলামের নাম নিয়ে যারা শেষধর্মের অমর গৌরবকে কলঙ্কিত করছে, তাদের বিরুদ্ধে। বাঁচাতে তিনি পারবেন না, কিন্তু আল্লাহুতালার কাছে এই তাঁর সাফাই থাকবে যে মিথ্যাকে তিনি সহ্য করেননি, তাঁর কাজে কোথাও ফাঁকি দেননি তিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাস্টার উঠলেন। রুগীর অবস্থা একবার দেখা দরকার।

এলাহী সকালে একবার খবর নিয়ে গিয়েছিল, এ বেলা আর আসেনি। আনবার সময় মৃদু আপত্তি করেছিল, কিন্তু মাস্টার বুঝেছিলেন মনের দিক থেকে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে সে। ঘরে স্ত্রী নেই, বউ মরবার পরে বুড়ো রয়েছে আর নিকা করে

নি। সংসারে বুড়ি শাশুড়ী আর এই রুগ্ন মেয়েটাকে নিয়ে চরম অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল সে। দুজনকেই একসঙ্গে মাস্টারের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে এতদিনে যেন আশ্বস্ত হয়েছে।

মশার গুঞ্জনে ভরা অস্বচ্ছ ধোঁয়াটে সন্ধ্যা নেমেছে। একটা গুমোট গরম। ঝড়বৃষ্টি আসন্ন মনে হচ্ছে। বিলের পাশে নিস্পন্দ তালগাছগুলো থমথম করছে যেন। কবরের মতো কেমন দম-চাপা অন্ধকার—ভালো করে নিশ্বাস পর্যন্ত টানতে পারা যায় না।

আলিমুদ্দিন রাজিয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এলাহীর শাশুড়ী তক্তাপোশের কোণায় মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে। ময়লা লণ্ঠনের আলোয় নিঝুম মেরে পড়ে আছে ঘরটা, একটা উত্তপ্ত গন্ধ উঠছে চারদিকের মেটে দেওয়াল থেকে। মশার গুনগুনানির সঙ্গে কোথাও বাঁশের ভেতর থেকে উঠছে কাঁচপোকার ঘুর ঘুর শব্দ। আর অসহ্য যন্ত্রণায় অল্প অল্প গোঙাচ্ছে রাজিয়া।

এর আগে ভালো করে রাজিয়ার মুখ দেখতে পাননি মাস্টার, এটবার দেখলেন। বিমর্ষ লণ্ঠনের আলোয় মুহূর্তে সর্বাঙ্গ তাঁর শিউরে উঠল।

বিষাক্ত ক্ষতে সেই বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখ মানুষের নয়। যেন একটা গলিত মড়া দুটো অস্বাভাবিক জীবন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে!

নিজের অজ্ঞাতেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ করলেন মাস্টার।

খাটের কোণায় ঝিমুতে ঝিমুতে চমকে জেগে উঠল বুড়িটা। বুকের ওপর থেকে কাঁপা হাতে ময়লা চাদরটা টেনে নিয়ে রাজিয়া খাতুন মুখ ঢাকল।

সামলে নিয়ে বুড়ি বললে, কে, মাস্টার সাহেব?

—হ্যাঁ, আমি। ওষুধটা খাইয়েছ ওকে?

—না, খায়নি। জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে—বুড়ি হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠল: মিথ্যেই আপনি এত দয়া করছেন মাস্টার সাহেব, এত কষ্ট পাচ্ছেন! ও বাঁচবে না।

বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখখানার সেই আকস্মিক ছবিটা এখনো যেন মাস্টারের শরীরটাকে রোমাঞ্চিত করে তুলছে, যেন একটা শীতল থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। মনে হল, ও যেন রাজিয়া খাতুন নয়—যেন ওর মুখের দর্পণে সমস্ত সমাজের চেহারাটা দেখতে পেলেন তিনি। অমনি গলিত, অমনি বীভৎস, অমনি বিষাক্ত।

কোনো কথা বললেন না মাস্টার। নিঃশব্দে এসেছিলেন, নিঃশব্দেই সরে গেলেন।

পরের দিন।

রাজিয়ার ঘরে আসবেন না, এমনি একটা ঠিক করেছিলেন মাস্টার। নিশ্চিত পরিণামের হাতেই রাজিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বেদনার্ত উদাসীনতার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। করবার নেই, কিছুই করবার নেই। এ তো শুধু শাহের পাপ নয়! তাঁর পাপ,

সমাজের পাপ—সকলের পাপ। এই পাপের অপরাধে শুধু দোয়া চেয়ে তিনি বলতে পারেন, আয় খোদা, আয় রহমান, মাফ কর আমাদের—আমাদের মুক্ত কর। গ্লানি মুছে যাক—অন্যায় মুছে যাক—! তোমার নিজের রাজ্য পাকিস্তানে মানুষ মহৎ হোক, নির্মল হোক—ইনসানের গৌরবে ভরে উঠুক সারে জাহান।

রাজিয়ার ঘরে যাবেন না সংকল্প করেও রাখতে পারলেন না। দুপুরবেলা মেয়েটার আর্ত তীব্র গোঙানি তাঁর কানে এল। দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন তিনি।

বুড়ি ঘরে নেই—কোথায় বেরিয়ে গেছে। আর বিছানার ওপর উঠে বসেছে রাজিয়া খাতুন। ক্ষতাক্ত বীভৎস মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টি—গলিত শবদেহের যেন দুটো আগ্নেয় চোখ।

—আমাকে ছেড়ে দাও—যেতে দাও আমাকে। তুমি আমার আব্বা—চিৎকার করে প্রলাপ বকছে মেয়েটা।

—রাজিয়া!—আলিমুদ্দিন দু'পা এগিয়ে এলেন।

—বদমাস—গুণ্ডা—শয়তান। ছেড়ে দাও আমাকে—আলিমুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রাজিয়া আগুন বর্ষণ করতে লাগল দু চোখে: পালাও—পালাও—এখান থেকে—

—চুপচাপ শুয়ে পড় বেটি, কোনো ভয় নেই তোমার—সভয়ে মাস্টার বলতে গেলেন।

—ভয়?—রাজিয়া বিকৃত মুখে বিকটভাবে হেসে উঠল: কাকে ভয় করব আমি? ভয় করবার কী আছে আমার?—আচমকা হাসিটা তার বন্ধ হয়ে গেল। মাস্টারের মুখের ওপর খরদৃষ্টি ফেলে দিয়ে বললে: কে তুমি? আমাকে কোথায় এনেছ?

—বেটি!

—বেটি?—রাজিয়া আবার চিৎকার করে উঠল: বেটি অমন সবাই বলে। শয়তান—ইবলিশের ঝাড়!—বলতে বলতে মাথার কাছের মেটে কুলুঙ্গি থেকে একটা চীনামাটির পেয়ালা তুলে নিলে রাজিয়া। সাবধান হবার আগেই সেটা সশব্দে এসে লাগল মাস্টারের কপালে, খান খান হয়ে পেয়ালাটা ভেঙে পড়ল মাটিতে।

এমন সময় বুড়ি ঢুকল ঘরে। ঢুকেই চিৎকার করে উঠল।

—এ কী মাস্টার সাহেব, কি হল? কপাল দিয়ে খুন পড়ছে যে!

হাতের তেলোয় কপালের রক্তটা মুছে নিয়ে মাস্টার হাসলেন।

—ও কিছু না। রাজিয়া একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তুমি ওকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা কর নাদিরের মা।

কিন্তু রাজিয়াকে ঘুম পাড়াবার আগে বুড়ি নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। মাঝরাতে তার হাঁউমাউ চিৎকারে আলিমুদ্দিন ছুটে এলেন।

বিছানায় রাজিয়া নেই।

তাকে পাওয়া গেল শেষরাতে। একটু দূরের একটা পোড়ো ভিটের ভাঙা পাতকুয়োর ভেতরে। টর্চের আলোয় দেখা গেল নিচের ভাঙা পাটের গায়ে একখানা পাণ্ডুর হাত উঠে আছে, আর আবর্জনা-ভরা সবুজ জলে ভাসছে একরাশ চুল।

বুক-ফাটা চিৎকার করে উঠল এলাহী বক্স। অজ্ঞান হয়ে পড়ল নাদিরের মা। আলিমুদ্দিনের হাত থেকে টর্চটা ঝুপ করে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

তবু এই ভালো। এতদিনে সব যন্ত্রণা ওর দূর হয়ে গেছে—অন্ধকার শীতল জলে ওর সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেছে।

সতেরো

বেগুন গাছের গোড়া খুঁড়ছিল উত্তমা। পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল।

—আসুন রঞ্জনদা।—লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। খুরপিটা ফেলে দিয়ে ঝাড়তে লাগল হাতের মাটি।

—ডাক্তার কই ?

—রুগী দেখতে গেছে, কলেরা কেস। বড্ড তাড়া ছিল। বলে গেছে, আপনি যেন কিছু মনে না করেন। যত শীগগির পারে ফিরে আসবে।

—বাঃ রে, মনে করব কেন ? রুগী দেখাই তো ডাক্তারের কাজ, কিন্তু—কলেরা ? এদিকে কলেরা শুরু হয়েছে নাকি ?

—শুরু মানে ?—উত্তমা হাসল : লেগেই তো থাকে। কম বেশি হয়, এই যা। তবে কয়েকশো এক সঙ্গে না মরলে তো খবরের কাগজে বেরোয় না। জানতেও পারে না শহরের লোকে।

—ওঃ!—শঙ্কিত বেদনায় চুপ করে রইল রঞ্জন।

—এ নিয়ে আর ভেবে কী করবেন ? লোকের গা সওয়া হয়ে গেছে। তবে মুশকিল হয় কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে, যখন পাট পচতে থাকে। রাতের পর রাত ঘুমোবার সুযোগ পাই না। গত বছর তো খেটে খেটে দাদারও কলেরা ধরে গেল। সে যা হাঙ্গামা! আমাকে বাইরের কাজ নিয়ে থাকতে হয়, মা একা দাদাকে নিয়ে যমের সঙ্গে লড়াই করছেন। জ্যাঠামশাইদের খবর দেওয়া হয়েছিল—ভয়ে তাঁরা এ তল্লাট মাড়ালেন না। বিশ্বাস তো নেই—ওলাবিবির দয়া বড্ড ছোঁয়াচে কি না!—উত্তমা থামল, একসঙ্গে কতগুলো অনাবশ্যক কথা বলে ফেলে খানিকটা লজ্জাও বোধ করল যেন।—যাক সে সব। চলুন, ঘরে গিয়ে বসবেন।

—ঘরে গিয়ে কী করব ? যা গরম। দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়া এখানে।

—কিন্তু এখানে বসবেন কোথায় ?

—এই তো চমৎকার জায়গা রয়েছে—একটা আমগাছের তলায় বসে পড়ল রঞ্জন।

—মাটিতেই বসলেন ?—স্নিগ্ধ হাসি হাসল উত্তমা : তা বসুন। রাজবাড়ির লোক আপনারা, একটু ধুলো-মাটির সঙ্গে পরিচয় থাকা ভালো।

—ঠাট্টা করছ ?

—ঠাট্টা করব কেন ?—উত্তমাও একটু দূরে মাটিতে আসন নিল। একটু কাত হয়ে একখানা হাতের ওপর ভর রাখল নিজের, তারপর প্রাণোজ্জ্বল দীপ্ত দৃষ্টি মেলে বললে, রাজবাড়ির লোক না হলেও খাঁটি মাটির কাছাকাছি তো আপনাদের বেশি আসতে হয় না।

—কিন্তু আমার ওপর কি একটু অবিচার হচ্ছে না ?—রঞ্জনের স্বর ক্ষুণ্ণ।

—অবিচার ?—কথাটার প্রতিধ্বনি করল উত্তমা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না। বাগানের বাইরে যেখানে টাঙন নদীর খাড়া পাড়ির ওপরে চলেছে মহুয়া গাছের সারি, আর তার আড়ালে টাঙনের জল চিকচিক করছে, তার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে আনল উত্তমা। যেন গুছিয়ে নিলে চিন্তাটাকে।—দোষ দিচ্ছি না আপনাদের—একটা শুকনো আমের পাতা কুড়িয়ে নিলে উত্তমা। গুঁড়ো গুঁড়ো করতে লাগল আঙুলের ডগায় : একেবারে মাটি থেকে উঠে না এলে মাটিকে ভালো করে চেনা যায় না। রাগ করবেন না রঞ্জনদা, দোষ শুধু আপনাদের দিচ্ছি না। আমরাও তো গাঁয়ের লোক। তবু আমাদের জোত-জমা আছে। অর্থাৎ ধানের শীষটাই আমরা নিতে জানি—যে লাঙল দেয়, তার খবরটাই কি পুরোপুরি রাখি ? আপনাদের অসুবিধে আরো বেশি, থালার ওপর সাজানো ভাতটাই পান কি না একেবারে !

—তাই তো মাটিটাকে জানতে এসেছি।

—ওই চেষ্টারই দাম আছে। সেও কম কথা নয়। কিছু মনে করবেন না, জানতে ঢের বেশি সময় লাগবে—চোখ বদলাতে হবে।

—সেটা যে পারব না, কি করে জানলে ?—উত্তেজনার সুর এল রঞ্জনের গলায়।

—আপনারা নতুন মন নিয়ে এসেছেন—অন্যমনস্ক চোখটাকে নদীর ওপর মেলে রেখে উত্তমা বললে, আপনাদের খানিকটা ভরসা হয়। তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না এখনো।

—কেন ?

উত্তমা সোজা হয়ে বসল। সরল উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি রঞ্জনের মুখের ওপর মেলে ধরল।—একটা মজার গল্প মনে পড়ল। ঠিক গল্প নয়—শুনবেন ?

—হঠাৎ গল্প কেন আবার ?—বিস্ময়ে ভ্রূ প্রসারিত করল রঞ্জন।

—শুনলেই বুঝতে পারবেন—অর্থ-গভীর মৃদু হাসল উত্তমা: বছর দুই আগে এদিকটাতে খুব বান হয়েছিল, জানেন?

—হ্যাঁ, কাগজে পড়েছিলাম।

—খুব বান হয়েছিল। অনেকগুলো গ্রাম ভাসিয়ে নিয়েছিল। কলকাতা থেকে রিলিফের দল এসেছিল। আর সেই দলে ছিলেন অজয়দা।

—কে অজয়দা?

—আপনি চিনবেন না, না চিনলেও ক্ষতি নেই। এখন যা বলছিলাম শুনুন।—উত্তমা আর একটা শুকনো আমের পাতা কুড়িয়ে নিলে মাটি থেকে: বয়েসে আপনার মতোই হবেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা—শুনেছিলাম ওকালতি করেন। কলকাতার বাইরে কখনো পা দেননি। এখানে এসে আমাদের বাড়িতেই উঠলেন। সে কী উৎসাহ! দিন দুই চারদিক দেখে-শুনে বললেন, বাংলা দেশের জন্যই আমি কাজ করব—এ ছেড়ে আর নড়ব না।

—সাধু সংকল্প—মাঝখানে মন্তব্য জুড়ে না দিয়ে থাকতে পারল না রঞ্জন।

—তা বইকি!—উত্তমা হাসল: কিন্তু একটু পরেই টের পেতে আরম্ভ করলেন। মশার কামড়ে টুকটুকে ফরসা গায়ে লাল লাল দাগ পড়ে গেল; লণ্ঠনের আলোয় রাতে বারে বারে হোঁচট খান; আমাদের এখানে যা খাবার জোটে তা আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। তাও সইছিল, শেষ পর্যন্ত—উত্তমা হঠাৎ থেমে গেল।

—পালালেন বুঝি?

উত্তমা বললে, হ্যাঁ, পালালেন। কিন্তু খানিকটা দোষ আমারও ছিল।—উত্তমা আবার একটু চুপ করল: একদিন বিকেলে আমরা দুজনে একটা ডোঙা নিয়ে জল দেখতে বেরিয়েছিলাম। মাঝখানে একটা পাকের মধ্যে পড়ে ডোঙা ডুবে গেল, দুজনে সাঁতরে একটা টিলার ওপর উঠলাম। অজয়দার মুখ শুকিয়ে গেল।

: এখন কী হবে?

আমি বললাম, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, চারদিকে প্রায় অথৈ সমুদ্র। এখন যে কেউ উদ্ধার করবে সে ভরসা নেই। তবে জলে জোর টান পড়েছে, সকালের দিকে অনেকটাই নেমে যাবে—হয়ত কোমরভর দাঁড়াবে। তখন হেঁটে গিয়ে গাঁয়ে উঠতে পারব। নৌকোও পাব।

: তা হলে সারারাত—অজয়দা আর কথা বলতে পারলেন না।

আমি বললাম, এই টিলার ওপর স্বচ্ছন্দে ঘুম দেওয়া চলবে। সারাদিন খেটে আমারও শরীর আর বইছে না। এমনিতে তো আর ছুটি মিলত না—বেশ ফাউ পাওয়া গেল এটা। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন।

অজয়দা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, কিন্তু সাপ-টাপ—

—হয়ত দু-চারটে আছে।—আমি ভরসা দিলাম : কিন্তু ঘাবড়াবেন না, বান-ভাসি সাপ কাউকে কামড়ায় না।

অজয়দা বললেন, হুঁ।—তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

উত্তমা আবার থামল। বিকেলের আলোয় রঞ্জন স্পষ্ট দেখতে পেল আচমকা তার মুখ-খানা রাঙা হয়ে উঠেছে।

—কী আশ্চর্য জানেন—দ্বিধাভরে উত্তমা আবার শুরু করল : একটু পরেই দেখি, অজয়দার মন থেকে ভয়-ডর মুছে গেছে। রাত একটু বেশি হতেই আমার কানের কাছে এসে এলোমেলো বকতে শুরু করলেন। দেখলাম, আমাকেই উনি তখন বাংলা দেশ বলে ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

আমি বারকতক ধমক দিলম, বললাম, ঘুমুতে দিন। কিন্তু কী অদ্ভুত মানুষ দেখুন—কিছুতেই আর থামতে চান না। আমার জন্যে নাকি ওঁর প্রাণটা হাবুডুবু খাচ্ছে। শেষ-কালে বিরক্ত হয়েই আমাকে বলতে হল, আর যদি কানের কাছে এভাবে বকর বকর করেন, তো ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেব। গায়ের জোরে তো আমার সঙ্গে পারবেন না—যত খুশি চান হাবুডুবু খাইয়ে ছাড়ব।

উত্তমা হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।—পরের দিনই সরে পড়লেন। দেশের ভালো আর করে উঠতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

আর সেই হাসিতে শিউরে উঠল রঞ্জনও। মনে হল মাটি-কোপানো শক্ত হাতের একটা কঠিন চড় যেন আচমকা মুখের ওপর এসে পড়ল। যেন উত্তমা মনে করিয়ে দিলে—

পেছনে কাশির শব্দ। চমকে মুখ ফেরাল দুজনেই।

বিকেলের ধূসর ছায়ায় মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছেন। কখন নিঃশব্দে এসেছেন টেরও পায়নি তারা।

মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটো যেন একবার চকচক করে উঠল। যেন, যেমন একটা কিছু আশা করেছিলেন তাই পেয়েছেন, যেন কোথা থেকে শিকারের অভ্যস্ত ঘ্রাণ এসে তাঁর নাসারন্ধ্রকে চকিত করে তুলেছে।

—তোর মা কোথায়?

উত্তমা স্নিগ্ধ গলায় বললে—সে তো আপনি জানেন জ্যাঠা। মা রোজ বিকেলেই হরি-সভার কীর্তনে যান আজকাল।

—ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। মনেই ছিল না।—মৃত্যুঞ্জয় অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন।

—আপনি আজকাল বড্ড বেশি ভুলতে শুরু করেছেন জ্যাঠামশাই—উত্তমা হাসল :

এ দোষ কিন্তু আগে আপনার ছিল না!

বিষণ্ণ আলোয় মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখা গেল না। তবু রঞ্জনের মনে হল, হঠাৎ যেন নিবে গেলেন ভদ্রলোক।

—বয়েস বাড়ে রে—বয়েস বাড়ে। ভুলচুকও হয়।—যেন কৈফিয়ৎ দিতে চাইলেন জ্যাঠামশাই।

—কিন্তু যাই বলুন—উত্তমা আবার স্নিগ্ধস্বরে বললে, লোকে কিন্তু তবু আপনার স্মৃতিশক্তির খুব প্রশংসা করে। বলে, এত বয়েস হয়েছে, তবু সরকার কর্তার হিসেবের মাথাটি ভারি পরিষ্কার। আধিয়ারদের কর্জ দেওয়া ধানে কখনো এক ছটাক পর্যন্ত গোলমাল হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় জোর করে হাসতে চেষ্টা করলেন।

—তা বটে। আচ্ছা, আমি তবে চলি।

—যাবেন? আসুন। কিছু মনে করবেন না জ্যাঠামশাই, কতক্ষণ পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন—দেখতে পাইনি, বসতেও বলতে পারিনি। চলুন না ঘরে গিয়ে বসবেন, চাও খাবেন এক পেয়ালা—

—না মা, চা আমি খাব না। বরং হরিসভার দিকেই যাই—দ্রুতপায়ে চলে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়।

উত্তমা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল তাঁর যাওয়ার দিকে। তারপর মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেলে ব্যঙ্গভরা উচ্ছ্বসিত গলায় লহরে লহরে হেসে উঠল।

—এইবার চিনলেন তো জ্যাঠামশাইকে? উনি বিলক্ষণ জানতেন মা কোথায় আছেন, তবু চোরের মতো গোয়েন্দাগিরি করবার লোভটুকু সামলাতে পারেন না!

—তুমি কিন্তু ওঁকে চটিয়ে দিলে—এতক্ষণ পরে মৌনতা ভাঙল রঞ্জন।

—চটিয়ে দিলাম নাকি?—হাসি থামল উত্তমার, গলা শক্ত হয়ে এল: তুষ্ট করে রাখলেও যখন ছোবল মারতে ছাড়বেন না, তখন খোঁচা দেবার সুযোগটাই বা নেব না কেন? সে যাক—ওর জন্যে ভাববেন না। এখন ঘরে চলুন রঞ্জনদা, সত্যিই অন্ধকার হয়ে এসেছে।

বাগান থেকে বেরুল দুজনে। কিন্তু উত্তমার পাশে পাশে হাঁটতে আজ কেমন সঙ্কুচিত বোধ করতে লাগল রঞ্জন। নিজের মধ্যে কোথায় একটা অপরাধ সজাগ হয়ে উঠেছে—সচেতন হয়ে উঠেছে গোপন পাপ। কেন এমন করে তাকে অজয়দার গল্পটা শোনাল উত্তমা? তার মধ্যে কি অজয়ের রূপ দেখেছে কোথাও—দেখেছে ফাল্গুনী শূন্যতা? নারী হলেই যে লীলাসঙ্গিনী হয় না, অত্যন্ত রূঢ় নির্মম ভাষায় তাই কি সেই সত্যটাকে সে মেলে ধরল তার সামনে?

মিতা নয়, সীতাও নয়। আর এক জাত—আর এক গোত্র।

সামনের পথটা দিয়ে একজন চাষার মেয়ে মাথায় এক আঁটি লাকড়ি নিয়ে চলেছিল।

উত্তমাই ডাকল তাকে—কে, সরলা নাকি?

সরলা থেমে দাঁড়াল: লাকড়ি কুড়িয়ে ফিরলাম দিদি।

—তারপর তোমার ঘরের খবর কী? নন্দ কী বলে?

সরলা কৌতুকভরে হেসে উঠল: সকাল থেকে জাম গাছে চড়ে বসে আছে।

—জাম গাছ! সে কী?

সরলা বললে, নামতে সাহস পাচ্ছে না।

উত্তমা বললে, কী আশ্চর্য! না—না, এ ঠিক হচ্ছে না। এ ভারি অন্যায় সরলা।

সরলা বললে, অন্যায় আবার কী! অমন ভরপোক মরদ নিয়ে ঘর করা যায় না। থাক একটা রাত—মশার কামড় খাক, কালই ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, যাই দিদি—সরলা এগিয়ে গেল।

রঞ্জন আশ্চর্য হয়ে বললে, এর মানে? নন্দ কে? ওর স্বামী?

—হুঁ।

—তা গাছে উঠে বসে আছে কেন?

উত্তমা হাসল: ঝাঁটার ভয়ে। শুকনো লাকড়ির ভয়ও আছে।

—এ রকম বীরাঙ্গনা তো বাংলা দেশে সহজে দেখা যায় না! স্বামীকে একেবারে গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করতে হয়! ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। ওর স্বামী কিছুতেই কিষাণ-সমিতিতে যোগ দিতে চায় না, ভয় পায়। তাই একটু পারিবারিক শাসনের ব্যবস্থা।

—সর্বনাশ! এ বুঝি সব তোমার লাইন অফ অ্যাকশান?—রঞ্জন সভয়ে উত্তমার দিকে তাকাল।

উত্তমা এবারে শব্দ করে হাসল: তা বলতে পারেন। তবে বেচারাকে সারারাত গাছে বসিয়ে রাখতে হবে এমন কঠিন শাস্তির বরাদ্দ করিনি আমি। কিন্তু কি করা যাবে—উপায় নেই। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের তো ওইখানেই তফাৎ রঞ্জনদা। পুরুষেরা এক-সঙ্গে সব কিছু করে, কিন্তু কোনোটাই সম্পূর্ণ করতে পারে না। মেয়েরা যেটুকু ধরে—সে একেবারে মরণকামড় দিয়ে।

রঞ্জন বললে, যে ভাবে ভেতর থেকে তোমরা ভাঙতে শুরু করেছ, তাতে আর কাউকে পালাতে দেবে না দেখছি।

উত্তমা কঠিন গলায় বললে, না। ভীরু পুরুষকে ভয়ের পাপ থেকে মুক্তি দেব আমরা। ওরা যখন সড়কি নিয়ে এগোবে, পেছনে আমাদের হাতে থাকবে ছুরি। যদি শত্রুর ভয়ে

পিছু ফিরে পালাতে চায়, আমরা ক্ষমা করব না।

আচমকা হোঁচট লাগল রঞ্জনের পায়ে। পড়তে গিয়ে টাল সামলে নিলে।

উত্তমা হাত চেপে ধরলে: বড্ড অন্ধকার—আমার সঙ্গে চলুন।

শক্ত, কঠিন হাত। মিতা নয়, সীতাও নয়। কমরেড।

একটা সাইকেলের আলো পড়ল গায়ের ওপর। নগেন ডাক্তার ফিরে এসেছে।

আঠারো

কোথায় শিকার, কোথায় কী! অ্যালবার্টের হালচাল ক্রমেই কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল ক্যাক্লর।

একদিক থেকে ভালোই যে হয়েছে—সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে। গেমসবার্ডের সন্ধানে বেরিয়ে জমিদারের জলায় দুটো চারটে ফায়ার করলে শ্রাদ্ধ কতদূরে যে গড়াতো বলা শক্ত। পেন্টলুনপরা চেহারা আর সাদা বাপের ছেলে—এর অতিরিক্ত কতটুকু মর্যাদা তার আছে কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছে। নিতান্তই সামনা-সামনি গেলে একখানা চেয়ার বসবার জন্যে এগিয়ে দেন—এই যা। কিন্তু হাঁড়িতে যে তার কতখানি চাল এ আরো ভালো করে কে জানে কুমার বাহাদুরের চাইতে?

অ্যালবার্টের বন্দুক দুটো যেমন তেমনি ঝুলোনোই আছে। না আছে তার হিমালয়ান রেঞ্জ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল, না আছে শিকার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ! ক্যাক্ল সাহেবের সন্দেহ হয় তার চাইতে বড় কিছু শিকারের সন্ধানে আছে অ্যালবার্ট।

কী সে শিকার? মার্থা নয় তো?

একটা প্রচণ্ড উত্তাপে ক্যাক্লর সমস্ত মগজটা যেন টগবগ করে ফুটে উঠতে চায়। দেশের বুকের ওপর চাবুক চালিয়ে একদিন রেশমের ব্যবসা করেছে পার্সিভ্যাল। সাহেবের সমস্ত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে যারা তাঁতে রেশম বুনে প্রতিযোগিতা করতে চেয়েছে, রাত্রে মশালচী পাঠিয়ে আগুন লাগিয়েছে তাদের ঘরে। খুন-খারাবিও দুটো-চারটে করতে হয়নি—নিঃসন্দেহে একথা বলবার মতো জোর নেই স্মাইদ ক্যাক্লর।

সে রক্ত তার মধ্যেও আছে। সেই অত্যাচারী, সেই আঘাত। দারিদ্র্য আর বংশ-পরিচয়ের লজ্জায় আহত সাপের মতো সে ফণা লুটিয়ে আছে, কিন্তু দরকার মতো প্রাণ-ঘাতী ছোবল দেবার শক্তিও যে রাখে, তার পরিচয় অন্তত একবার সে দিয়েছেই। সেই চামড়ার মতো নীরেট অন্ধকারের কালো রাত্রে—

স্মৃতির গলাটা জোর করে চেপে ধরল স্মাইদ। কিছুদিন থেকে এই এক ব্যাধি দেখা দিয়েছে তার। যা প্রায় ভুলতে বসেছিল—থেকে থেকে হঠাৎ আলোড়ন লাগা জলের

তলা থেকে একরাশ ঘোলা কাদার মতো তা ওপরে উঠে আসতে চায়। বলা যায় না, এর শেষ কোথায়। শেষ পর্যন্ত একদিন হয়ত সে সোজা আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে—বোবাধরা গলায় চিৎকার করে বলতে চাইবে, হুজুর, বারো বছর আগেকার এক মেঘে ঢাকা সন্ধ্যায়—

ক্যাক্স অস্থির ভাবে উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল।

আশ্চর্য! সে কেউ নয়—সে কোথাও নেই। এই পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলোয় বাইরে সে অনধিকারীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ঘরের ভেতর আলো-না-জ্বালা ঘন ছায়ার সুযোগে অ্যালবার্ট অত্যন্ত কাছ ঘেঁষে বসেছে মার্থার—গান শোনাচ্ছে তাকে। তবু পিয়ানো-টিয়ানো কিছুই নেই—এই যা রক্ষা।

জনসন, বীং ক্রসবি—অদ্ভুত সব নাম! যেন মায়া-লোকের কতগুলো স্বপ্নকথা। শুনতে শুনতে সে বিরক্ত হয়ে উঠে এসেছে। গান তার খুব ভালো লাগে না, ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতাও নেই। সাঁওতালী নাচ দেখেছে, শুনেছে ঝুমুরের সঙ্গে সঙ্গে মাদলের বাজনা, খুশী হয়েছে আস্তের গম্ভীরা দেখে, 'এনকোর, এনকোর' বলে উৎসাহ দিয়েছে ধামালী গানের নগ্ন আদিরসে।

কিন্তু এ এক বিচিত্র জগতের খবর।

"Do you know the man, who came down from the moo—oo—n—"

আবেগভরা গম্ভীর গলায় গান ধরেছে অ্যালবার্ট। মার্থাও সুর মিলিয়েছে তার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে পড়ল স্নাইদ, মনে হল মার্থার গলা আশ্চর্যভাবে মিশ খেয়েছে অ্যালবার্টের গলার সঙ্গে, নিখুঁত তান বাঁধা হয়ে গেছে সরু মোটা তারে। এই দুইয়ের মাঝখানে সে প্রক্ষিপ্ত; এদের ভেতরে তার গলা কোথাও মিলবে না, মেলাতে গেলে বেসুরো করে দেবে সব কিছুকে।

"The man from the moon—"

অ্যালবার্ট? হয়ত তাই। মার্থার এই মাটির পৃথিবীতে যেন কোনো চন্দ্রলোকের সংবাদ। সেখানে অন্ধকারের ছায়ার মতো ক্যাক্স আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে না তো?

একটা অনিশ্চয় আশঙ্কায় নিজের হাত কামড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কিছুই বলা যায় না, বলবার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই কিছু। অতিথি—বন্ধু! কিন্তু এ কেমন অতিথি যে এসে এই সারাদিনের মধ্যেও নড়তে চাইছে না! দিনরাত অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে বকর বকর করে কথা কইছে। এই বা কোন্ দেশী বন্ধুত্বের নমুনা!

নাঃ, এবার অ্যালবার্টের যাওয়া উচিত। কাল একবার আভাসও দিয়েছিল।

—তোমার তো ছুটি ফুরিয়ে এল বার্টি?

মার্থা শিউরে উঠেছিল শুনে : তাই নাকি ? কী সর্বনাশ !

কিন্তু বার্টি অভয় দিয়েছিল : না—না, আরো দিন সাতেক হাতে আছে। তা ছাড়া, রিয়্যালি এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে। দরকার হলে ছুটিটা আরো এক হপ্তা না হয় বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।

আনন্দে মার্থা হাততালি দিয়ে উঠেছিল : বাঃ, কী চমৎকার হবে তাহলে ! চমৎকার ! ক্যারুর ইচ্ছে হয়েছিল একসঙ্গে দু হাতে দুটো ঘুষি ছুঁড়ে দেয় অ্যালবার্ট আর মার্থার মুখের ওপর। কিন্তু তবু সে প্রাণপণে আনন্দের একটা করুণ হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল ঠোঁটের আগায় : হ্যাঁ, খুব চমৎকার হবে।—আরো এক সপ্তাহ ! ভাবতেও আমার আনন্দ হচ্ছে।

আনন্দ হচ্ছে ! তাই বটে। আনন্দ হওয়ার কথাই। অ-দেখা গোলডার্স গ্রীনের বাতাস নিজের চারদিকে বয়ে এনেছে অ্যালবার্ট, স্বপ্নের দেশ ইংলণ্ডের স্পর্শ ঝরে পড়ছে তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে। কিন্তু—কিন্তু ! আরো এক সপ্তাহ ! আবার একটা খুন করতে হবে না কি স্মাইদ ক্যারুকে ?

তবু শেষ চেষ্টা।

—আর দু তিনদিনের মধ্যেই খুব বর্ষা নামবে এদিকে।

অ্যালবার্ট কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল : রিয়্যালি ?

—হ্যাঁ, চারদিকে সমুদ্রের মতো জল দাঁড়াবে। এদিক ওদিক দেখতে পাওয়া যাবে না।

—বাঃ—একসেলেণ্ট ! সে তো দেখবার মতো জিনিস।

ক্যারু নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল।

—তখন নৌকোয় করে পাড়ি দিতে হবে। তাতে প্রায়ই অ্যাকসিডেণ্ট হয়, মানে নৌকো ডুবে যায়।

—ফাইন !—আনন্দে অ্যালবার্টের চোখ চকচক করে উঠেছিল : আমার সাঁতরাতে খুব ভালো লাগে। একবার আমি আধা-আধি চ্যানেল সাঁতরে গিয়েছিলাম।

—চ্যানেল ? ইংলিশ চ্যানেল ? তার অর্ধেক সাঁতরে গিয়েছিলে ?—শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে মার্থা চোখ বিস্ফারিত করেছিল।

অসহায় ক্রোধে পকেটে হাত দিয়েছিল ক্রু সাহেব। তার পরেই অ্যালবার্টের সামনে বিড়ি বার করলে পদমর্যাদা থাকবে না মনে করে, পকেটের ভেতরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙেছিল সেটাকে। ওটা বিড়ি না হয়ে মার্থার মাথাটা হলেই সে খুশী হত।

শেষ চেষ্টায় স্মাইদ বলেছিল, তখন কিন্তু খুব সাপের উপদ্রব।

—সাপ ? রিয়্যালি ?—আলবার্টের কৌতূহল যেন অনন্ত : I am very much interested in Bengal snakes—

এর পর বলা যেত মাত্র একটি কথা! বেরোও—বেরোও আমার বাড়ি থেকে। কিন্তু বলা কি অতই সহজ এখন? নিজেই নিজের গর্ত খুঁড়ছে! লর্ড বংশের ছেলে। ব্রেটন ব্রুকশায়ার। নর্থএক্সিটার, অক্সফোর্ড। ক্যারুর কালো হাতের পাশে একখানা তুষার-শুভ্র হাত—সে হাতে হীরের আংটি। ক্যারু উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্তত আর একটা চেষ্টা করা যাক। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত দূরে সরিয়ে নেওয়া যাক মার্থার কাছ থেকে।

—চল বার্টি, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

—ওঃ, গ্ল্যাডলি—অ্যালবার্ট উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু মার্থাই বাধা দিয়ে বসল।

—না, বার্টি, তুমি আর একটু বস। যাও না স্মাইদ, তুমিই একটু ঘুরে এস বরং। দিনরাত ঘরে বসে থেকে তোমাকেই কেমন ক্লান্ত ক্লান্ত লাগছে। তোমারই একটু বেড়ানো দরকার।

বেড়ানো দরকার! দরদ কত! এতক্ষণ পরে আর সহ্য হয়নি ক্রু সাহেবের। বারুদ-ঠাসা হাউইয়ে যেন শেষ আগুনের ছোঁয়া লেগেছে—দুর্বিষহ ক্রোধে ছিটকে বেরিয়ে চলে এসেছে স্মাইদ।

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ক্যারু নিজের ডান হাতটা মুঠো করে ধরল।

দোষ তার নিজেরও আছে বই কি। তুলনা করে দেখলে মার্থার পাশে তাকে বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট ছাড়া কী বলা যায় আর? মিশনারী বাপের মেয়ে মার্থা, উচ্চশিক্ষিত, রেভারেণ্ড বিশ্বাস মেয়েকে পাস করিয়েছিলেন জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পর্যন্ত। আর সে?

সে তবুও তো স্বামী! তবুও তো স্ত্রীর ওপর তার আইনগত অধিকার। এতদিন সেই অধিকারের দাবিতে নিশ্চয় হয়ে ছিল বলেই মার্থার কোনো কটু মন্তব্য, তার দারিদ্র্যের ওপর কটাক্ষ—কোনোটাই তার দুঃসহ বলে মনে হয়নি। অ্যালবার্ট আসবার পরেও মার্থা যদি তার সঙ্গে ঝগড়া করত, স্বাভাবসিদ্ধ প্রখর ভাষায় গালিগালাজ করত, তাহলে মনে হত সব ঠিক আছে। সব চলছে নিয়মমতোই—কোথাও কিছু ব্যতিক্রম হয়নি, ছন্দপতন ঘটেনি কোনোখানে। কিন্তু আজ—মার্থা আর ঝগড়া করে না। অভিযোগ করতেও ভুলে গেছে।

অবচেতনভাবে কী একটা যেন বুঝতে পারে ক্যারু। মনে হয়: এর চাইতে মার্থা যদি মুখর হয়ে উঠত, ঢের বাঞ্ছনীয় হত সেটা। অন্তত ক্রু সাহেব বুঝতে পারত তার সম্পর্কে সজাগ চেতনা আছে মার্থার মনে। আজ এই অভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। ভদ্র হয়ে গেছে মার্থা—সংযত হয়ে উঠেছে—মার্থার রসনা যেন সদয় হয়ে উঠেছে তার ওপর। মন থেকে সরে যাচ্ছে বলেই কি ভূমিকা তৈরি করছে সৌজন্যের?

"On the silvery green—the man came down from the moon..."

সন্ধ্যা নামল। রাত্রির ছায়া পড়ল আচক্রবাল মাঠের ওপর—শুধু রক্তের একটুখানি

ফিকে রঙ লেগে রইল তিন-পাহাড়ের কৃষ্ণ-স্তব্ধতায়। একদল বকের পাখার ক্ষীণ ধ্বনি মিলিয়ে এল তাল-দিগন্তের ওপারে।

ঘরে আলো জ্বলছে। গানটা থামল এতক্ষণে। হাসির কলধ্বনি উঠল একটা। জুতোর শব্দ পাওয়া গেল—হয়ত ওরা বাইরে বেরিয়ে আসছে।

এই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে নিজেকে সংযত রাখা যাবে কি না সন্দেহ। কি বলতে কি যে বলে বসবে নিজেই জানে না। তার চাইতে নিজের আহত মনটা নিয়ে একটু সরে দাঁড়ানোই ভালো।

সামনের খোলা দরজা দিয়ে এদিকের অন্ধকার ঘরটায় এসে ঢুকল ক্যাক্স।

কতগুলো ভাঙা জিনিসপত্র, একটা ছেঁড়া ক্যাম্প-খাট। অন্ধকারের মধ্যে সেই ক্যাম্প-খাটটাতেই ঝপ করে বসে পড়ল স্মাইদ।

বাইরে অ্যালবার্টের গলার আওয়াজ।—স্মাইদ তো এতক্ষণ এইখানেই ছিল!

মার্থা জবাব দিলে, বোধ হয়।

—গেল কোথায় তাহলে?

—তাই তো?—মার্থা ডাকল—স্মাইদ—স্মাইদ!

ক্রু সাহেব সাড়া দিল না। ঠিক ইচ্ছে করেও নয়—সাড়া দেবার কোনো প্রয়োজন আছে বলেই যেন মনে হল না তার। এও সৌজন্য, অ্যালবার্টের সামনে স্বামীর সম্পর্কে একটুখানি ভদ্রতা বাঁচিয়ে রাখা মাত্র। কিন্তু সাড়া দিয়ে সে যদি সামনে গিয়েই দাঁড়াত, তাহলেই কি সত্যি সত্যি খুশী হত ওরা? না—হত না। স্মাইদ ক্যাক্স স্পষ্ট বুঝেছে—the man from the moon আজ ঘুম ভাঙিয়েছে রাজকন্যার; কোনো দ্বীপ-দুর্গের মিনারে বন্দিনীর জানালা দিয়ে এনেছে মুক্তির সংবাদ। সেখানে একটা দৈত্যের মতোই সে অনভিপ্রেত, অনধিকারী।

মনে হল, মার্থা যেন এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে খুঁজে নিলে খানিকটা। তার পরে মন্তব্য করলে: কোথাও বেরিয়ে গেছে হয়ত। ও ওই রকম।

অ্যালবার্ট বললে—পুয়োর চ্যাপ।

—পুয়োর নয়, ইডিয়ট।—মার্থার মন্তব্য শোনা গেল আবার।

—ইডিয়ট? তা সত্যি।—বোঝা গেল, মার্থার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার সম্মতি আছে। তবু বন্ধুত্বের ঋণটা একেবারে অস্বীকার করতে পারল না অ্যালবার্ট: বাট হি ইজ এ গুড সোল।

অন্ধকারের মধ্যে দু'হাতে হাঁটু দুটো চেপে ধরল ক্রু সাহেব। কোথা থেকে দু-তিনটে আরশোলা পড়ল গায়ের ওপর, পায়ের গোড়ায় সুড়সুড়ি দিয়ে গেল খুব সম্ভব একটা নেংটি ইঁদুর। কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইল সে। নিজেকে সম্পূর্ণ সজাগ করে—পরিপূর্ণভাবে

উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি কথা সে শুনে যেতে লাগল।

মার্থা বললে—এস, বসা যাক।

চেয়ার সরাবার শব্দ হল। ওরা বসেছে তাহলে।

—তুমি কবে হোমে যাচ্ছ?—মার্থার প্রশ্ন।

—খুব সম্ভব আসছে মাসেই। ব্রুকশায়ার হল থেকে কাকার চিঠি পেয়েছি, কি একটা দরকারী কাজে ডেকে পাঠিয়েছেন।

—কাকা বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসেন?

—ওঃ, হি ইজ এ গ্র্যাণ্ড ওল্ড চ্যাপ। ভেরি জলী ম্যান। একবার চল না আমাদের ওখানে।

—আমি?—মার্থার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া গেল।

—কেন, আপত্তি কী?

—মিথ্যে ওসব বলে কেন কষ্ট দিচ্ছ বার্টি? জানোই তো আমার অবস্থা।

—এ ভারি অন্যায়!—অ্যালবার্টের গলায় অনুযোগের সুর: এখানে তোমার এভাবে নিজেকে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

—কী করব তবে?

—You should see the other side of life also!

অ্যালবার্টের গলায় শয়তানের প্রলুব্ধিমন্ত্র বেজে উঠল। নির্জন বারান্দার নিভৃতিতে মার্থার সান্নিধ্য তাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

পায়ের কাছে একটা নয়—গোটা তিনেক নেংটি ইঁদুর ঘুর ঘুর করছে। সুযোগ পেয়ে একদল মশা চক্রাকারে ঘিরে ধরেছে তাকে। পাথর হয়ে বসে রইল ক্রু সাহেব।

—কিন্তু কী আমার আছে?—একটা কান্নাভরা আকুলতা বেজে উঠল মার্থার গলায়: এই জীবনই আমার ভালো। এইখানেই তিলে তিলে আমায় মরতে হবে!

—ইমপসিবল! কিছুতেই তা হতে পারে না।—অ্যালবার্টের কণ্ঠে পুরুষের প্রতিশ্রুতি।

—কী করে আমি যাব? কী আমার যোগ্যতা?

মার্থা কি কাঁদছে? স্নাইদ ক্যারু ভাবতে চেষ্টা করল। মার্থা কখনো কি কাঁদতে পারে? কেঁদেছে কি কোনোদিন? ক্যারু মনেই করতে পারল না।

—আমার দিকে তাকাও মার্থা!—স্নিগ্ধ বিষণ্ণ স্বর অ্যালবার্টের: চোখ তোলো।

—না—না।

—তাকাও, ভালো করে তাকাও। তোমাকে দেখি।

—কী দেখবার আছে আমার?

—তোমার চোখ। ব্ল্যাক আইজ। কালো চোখ দেখলে I feel so dreamy! মনে হয় ওই চোখের মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছি।

—বার্টি, প্লীজ—বোলো না অমন করে। আমি সইতে পারছি না।

—তুমি নিজেকে জানো না মার্থা। নিজের দিকে কখনো তাকিয়ে দেখনি। জানো না, তুমি কত সুন্দর!

—মিথ্যে। আমি কালো—আমি আগলি।

—কালো হলেই কি আগলি হয়? তুমি বাংলা দেশের সবুজ মাটির সৌন্দর্য। আই লাভ বেঙ্গল। বাংলা দেশের মেয়েদের আমার ভালো লাগে। একটা আশ্চর্য ছন্দ আছে তাদের। মনে হয়, লিরিক কবিতা। সেই কবিতা আমি তোমার মধ্যেও দেখেছি।

—বার্টি, তুমি লর্ড বংশের ছেলে। কত তোমার সম্মান, কত তোমার মর্যাদা। সেখানে কে আমি? বার্টি, ভগবানের দোহাই—তুমি আমায় ওসব বোলো না।

—মার্থা!

—না।

—মার্থা, শোনো।

—না—না—মার্থা এবার সত্যই কাঁদছে।

সিমেন্ট জমানো কংক্রীটের মতোই জমে গেছে ক্যারুর সমস্ত পেশীগুলো। স্তব্ধ হয়ে গেছে বোধেন্দ্রিয়। এও ছিল মার্থার মধ্যে! ছিল চোখের জল—ছিল স্বপ্ন—ছিল এমন দুর্বলতা! কোনোদিন সে জগতের সন্ধান পায়নি ক্রু সাহেব, কোনোদিন পা বাড়াবার সুযোগ পায়নি মার্থার অন্তর-রাজ্যের এই বিচিত্রলোকে। যদি বিশ বছর আগেকার গোল্ডার্স গ্রীনের স্বপ্ন-মরীচিকা এমন করে তার ভেঙে না যেত, তাহলে—তাহলে কী যে ঘটতে পারত, কে বলতে পারে সে কথা!

—মার্থা, মাই লাভ—

—ও বার্টি—

—মাই ডার্লিং—

প্রেতের মতো যেন কবর ফুঁড়ে অভিশপ্ত ক্যারু ওদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। অ্যালবার্টের বাহুবন্ধনে তখনো মার্থা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তখনো ওদের ওষ্ঠাধর আকুল চুম্বনে একসঙ্গে মিলিত।

নিঃশব্দে তিনজন দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—কিন্তু কি করতে পারত, কি করতে পারত ক্রু সাহেব? আক্রমণ নয়, গালাগালি নয়, বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আর অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর প্রতি একটা কটু মন্তব্যও নয়। এ হবেই—এই অবধারিত—এ কথা তার চেয়ে কে আর বেশি ভালো করে জানে!

The man from the moon! ছায়ার লজ্জায় আপনিই ছিটকে পড়ল স্মাইদ ক্যারু—যেমন করে একবার পড়ে গিয়েছিল একটা অবাধ্য ঘোড়ার পিঠ থেকে।

কিছুই বলল না, একটা অব্যক্ত ধ্বনি পর্যন্ত উচ্চারণ করল না। তারপর যেন কি একটা অত্যন্ত দরকারী কাজের কথা মনে পড়েছে, এমনি ভাবে অতিশয় ক্ষিপ্রগতিতে নেমে গেল বাইরের অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরল পরদিন বেলা নটায়।

উদ্দাম রাত কাটিয়ে ফিরেছে ভিন গাঁয়ের একটা নষ্ট মেয়ের ঘরে। তাড়ি গিলেছে কয়েক ভাঁড়। তারপর নেশায় জড়ানো চোখে টলতে টলতে ঘরে এসেছে। পাঁচ-সাত বছর আগে মার্থার শাসনে এই অনুগৃহীতা মেয়েটার সংস্রব সে কাটিয়েছিল, আজ আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হল।

জানত—এ হবেই সে জানত। বিস্মিত হল না, ব্যথাও পেল না। কালো মায়ের কালো ছেলে। পার্সিভ্যাল তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছে—সম্মান থেকে, মর্যাদা থেকে; তারই সগোত্র আর একজন সাদা-মানুষ মার্থাকেও কেড়ে নিয়ে গেল।

অভিযোগ কাউকে করতে হলে—নিজেকেই করতে হয়; কারো গলা যদি টিপে ধরতেই হয়, তবে তা নিজেরই মায়ের—যার কালো রক্তের অভিশাপ নিজের সর্বাঙ্গে সে বয়ে এনেছে!

বেতের চেয়ারটার ওপর ঝুপ করে শুয়ে পড়ল ক্যারু। টেবিলের ওপর নীল কাগজে লেখা একটা চিঠি চাপা দেওয়া—মার্থা তাকেই লিখে রেখে গেছে। অভ্যাসবশে তুলে নিলে ক্যারু, তারপরেই মনে হল—কি হবে পড়ে? টুকরো টুকরো করে কাগজটাকে ছিঁড়ে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে দিলে বাইরে।

উনিশ

ঝিমধরা তালগাছগুলোর মাথার ওপরে কালো হয়ে এল ছাই রঙের আকাশ। কবরের ঝুরো মাটির ওপর শেষবার কোদালের উল্টো পিঠে ঘা দিয়ে মানুষগুলো সরে এল পেছনে। ওপারে সন্ধ্যা নামবার আগেই ওখানে ঘনিয়ে রইল বুক-চাপা অন্ধকার। এখানে রাত আসবে, রাত শেষ হয়ে যাবে; সূর্যমুখী আর চন্দ্রমল্লিকারা মালা গাঁথবে দিনরাত্রি। অন্ধকার কবরের নীরন্ধ্র রাত জমাট হয়ে থাকবে; নড়বে না, সরবে না, একটি জোনাকি চমকে উঠবে না—শুধু মৃত্যুর গন্ধ দিনের পর দিন কটুস্বাদ হয়ে অপেক্ষা করবে—যতদিন না কোন উল্কা-ঝরা নিশি-পাওয়া প্রহরে শেয়ালের লুব্ধতা মাটি খুঁড়তে থাকবে পচা

মাংসের আকর্ষণে।

—মাস্টার সাহেব, যাবেন না?—এলাহী বক্স কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল।

—কোথায়?—অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন। তাঁর দৃষ্টি তালবনের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে গেছে বিলের জলে। আশ্চর্য রং জলটার! কালোর সঙ্গে লালের শেষ প্রতিবিম্ব দুলছে—যেন চাপ বেঁধে আসছে একরাশ রক্ত; একজোড়া উড়ন্ত চখাচখীর পাখার শব্দ ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল—মনে হল কোথাও একটা বিরাট হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে আসছে আস্তে আস্তে।

—কেন, ঘরে?—এলাহী আশ্চর্য হল।

—থাক, আর একটু বসি।

—এই গোরস্থানে?—এবার যেন বিব্রত বোধ করল এলাহী: রাত নামছে যে!

—নামুক। তোমরা যাও।

—একা বসে থাকবেন এখানে?

—ভয় করবে ভাবছ?—আবছা তিক্ত হাসি ফুটল মাস্টারের মুখে: মড়াকে আমার ভয় নেই।

সদল-বলে তবু দাঁড়িয়ে রইল এলাহী। কি করবে মনঃস্থির করে উঠতে পারছে না যেন।

মাস্টার এবার স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

—বলছি তোমরা চলে যাও, তবু দাঁড়িয়ে আছ কেন সব? আমি একটু একাই থাকব।

ওরা চলে গেল। ভালোই হয়েছে—বেঁচেছে রাজিয়া। নিস্তার পেল আজীবন বিষের জ্বালায় পুড়ে মরার হাত থেকে—বীভৎস বিকৃতাঙ্গ হয়ে টিঁকে রইল না লোকের ঘৃণা আর অনুকম্পা কুড়িয়ে। প্রথমে আঘাতটা বড্ড লেগেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মরাটাই ওর দরকার ছিল—নিজের দিক থেকে, এলাহীর দিক থেকেও।

তবু তুষের তাওয়ার মতো জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতর। এই মেয়েটার মৃত্যুর জন্যেই নয়। চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন: শাহ্ বসে আছেন সারা সমাজটার একেবারে মাথার ওপরে, ইচ্ছে হলে যে কোনো লোককে ধরে তিনি বাইশ বাজারে পয়জারের ব্যবস্থা করতে পারেন; কথায় কথায় মাপা সাত হাত নাকখত-দেওয়াতে পারেন তাঁর কাছারীর সামনে; নালিশ দিয়ে প্রজা তুলতে পারেন, বে-দখল করতে পারেন লাঠির ঘায়ে। আর নিজের বিষাক্ত কামনার জালে—

তবু ফতে শা পাঠান আজ দেশের নেতা। আজাদীর যে নতুন স্বপ্ন নিয়ে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে লীগের ঝাণ্ডার তলায়, সেই ভাবী পাকিস্তানের ওপরেও তিনি নিজের আসন

কায়েম করতে চান। গড়তে চান এমনি লাখো লাখো রাজিয়ার গোরস্থান। অসম্ভব—এ হতে দেওয়া যাবে না। সারা জীবন যুদ্ধ করেই এসেছেন মাস্টার—আজ আর আপোস করতে রাজী নন মিথ্যার সঙ্গে।

এর মধ্যেই অনেক খবর কানে এসেছে। সেদিনের সেই জমায়েতের পর কাণ্ড গড়িয়েছে অনেক দূর অবধি। তাই ভয়ে সরে পড়ল জিব্রাইল। ইমাম সাহেব চটে আগুন হয়ে গেছেন. উসকানি দিচ্ছেন জমাদার, শাহ্ তাঁকে এখান থেকে তাড়াবার জন্তে আঁটছেন ফন্দিফিকির। ইসমাইল বলে বেড়াচ্ছে. লোকটা কাফের; মুখে লীগের বুলি আওড়ালে কি হয়, তলে তলে মাস্টারের সাঁট আছে হিন্দুদের সঙ্গে।

এ হবেই—জানতেন আলিমুদ্দিন। সত্যের জন্ম অনেকখানিই দাম দিতে হয়। দিয়েছেন হজরত স্বয়ং—দিয়েছেন আবু বকর, দিয়েছেন আরো অনেকেই। তা নয়। তাঁর দুঃখ হয় ইসমাইলের জন্ম। ধারাল তলোয়ারের মতো ছেলে; অফুরন্ত উৎসাহ—অক্লান্ত উদ্যম—পাকিস্তানের জঙ্গী নওজোয়ান। আজ এই সব ছেলেরাও এদের ফাঁদে পা দিচ্ছে—বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে দিচ্ছে শয়তানের মসনদ!

সন্ধ্যা ঘনাতে লাগল। গোরস্থানকে ঘিরে ঘিরে বাতাসের থর থর শব্দ উঠছে তালগাছের পাতায়। ভাঙা ভাঙা কবরগুলোর ওপর থেকে বাঁশের খুঁটি উঁকি দিচ্ছে ঝাপসা বিষণ্ণতায়; পচা কাফনের টুকরোর মতো অস্বচ্ছ অন্ধকারে অস্বাভাবিক সাদা হয়ে আছে ইতস্তত কয়েকটি করোটি এবং কয়েকখানা হাড়; হাওয়ার মুখে থেকে থেকে কেমন একটা চিমসে গন্ধের চমক।

একটু দূরে মাটি থেকে খানিক ওপরে একঝলক আগুন যেন ঝলমল করে উঠল। মুহূর্তের জন্মে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন আলিমুদ্দিন, পরক্ষণেই দেখতে পেলেন ধূসর ছায়া দিয়ে গড়া একটা দেহরেখা। শেয়াল—হাই তুলল। আলিমুদ্দিন আরো দেখলেন চকচকে নতুন টাকার মতো তার দুই চোখে লোলুপ সবুজ আলো, একদৃষ্টিতে তাঁকেই পর্যবেক্ষণ করছে।

নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে—লক্ষ্য করেছিল নিশ্চয়ই। তাই সন্ধ্যার ছায়া নামতেই এসে হাজির হয়েছে খাদ্যের সন্ধানে। কিন্তু তাঁকে দেখে থমকে গেছে। তিনি সত্যিই লোকালয়ের শরীরী জীব, না এই কবরখানায় সারারাত যে অশরীরীরা ছায়া হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—তাদেরই কেউ, এইটেই যেন বুঝে নিতে চাইছে ভালো করে।

—শালা বদমাস—একটা অর্থহীন ক্রোধে মন ভরে উঠল আলিমুদ্দিনের। মাটি থেকে একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন শেয়ালটাকে লক্ষ্য করে। দ্রুতগতিতে সেটা একটা ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলিমুদ্দিন বিড়ি ধরালেন।

না—এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না। করতেই হবে একটা কিছু। ফাঁকি বনিয়াদের ওপর কোনো সত্যই গড়ে উঠবে না। চোরাবালির ওপর দাঁড় করাতে গেলে সব কিছু ধ্বসে পড়বেই একদিন—কেউ রক্ষা করতে পারবে না তাকে।

কাজ—অনেক কাজ। আগে যাচাই করে নিতে হবে আজাদীর অর্থ—জেনে নিতে হবে কাদের জন্যে সে আজাদী। ঘন-শ্যামল দিগদিগন্তের ওপর ওই যে নদীর রূপোলি রেখায় আঁকা চন্দ্রচিহ্ন—জেনে নিতে হবে এই মাটিতে সত্যিকারের স্বাধীন মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াবে কারা।

আর তা যতক্ষণ না যয়, ততক্ষণ ধাওয়াদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবে শাহের পাইকের দল; ভিটের মাটি কামড়ে পড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনবে মানুষ; পারার ঘায়ের বিষাক্ত যন্ত্রণায় জ্বলে যাবে এলাহী বক্সের বেটিরা। আর তাদের কবরের ওপর ঘিরে ঘিরে নামবে এমনি কটুগন্ধী রাত্রি—পচা মাংসের সন্ধানে ঘুরতে থাকবে শেয়ালের জ্বলন্ত চোখ!

ভূতুড়ে তালগাছগুলোর শুকনো পাতায় পাতায় অপমৃত্যুর খড়্গধ্বনি বেজে উঠল। হঠাৎ-খসা একটা উল্কার অগ্নিরেখা শিউরে গেল বিলের কালো জলের ওপর দিয়ে।

—আদাব মাস্টার সাহেব!

হোসেন। কালু বাদিয়ার সেই দুর্বিনীত ছেলেটা।

—এ সময়ে কি মনে করে রে?—এই সাত-সকালেই হোসেনকে দেখে কিছু বিস্ময়-বোধ করলেন মাস্টার।

—সেদিনকার জমায়েতে আপনার কথাগুলো শুনেছি মাস্টার সাহেব। খুব দামী কথা। কিন্তু ওগুলো না বললেই ভালো করতেন।

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ল হোসেন।

আলিমুদ্দিনের ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠল।—যা হক, তাই বলেছি।

—কিন্তু হক কথা শাহ্‌ তো শুনতে চায় না। ইমাম সাহেব না, থানার জমাদার বদরুদ্দিন মিঞাও না, এস্তাজ আলী ব্যাপারীও না।

—তা জানি।—আলিমুদ্দিন স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন হোসেনের দিকে: কিন্তু তোমরা?

—আমরা?—হোসেনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: সেইজন্যেই তো আপনাকে সালাম করতে এলাম মাস্টার সাহেব।

হঠাৎ পিঠ সোজা করে উঠে বসলেন মাস্টার। অস্বস্তির শূন্যতায় বিশ্বাসের ডাঙা মিলেছে একটা। পায়ের নিচে খুঁজে পাচ্ছেন দাঁড়ানোর মতো একটা শক্ত ভিত্তি। আছে—আছে। নতুন দুনিয়া, নতুন আজাদীর রাস্তায় এগিয়ে চলবার সঙ্গী তাহলে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে।

—তোমরা আমার সঙ্গে আছ হোসেন ?

—আছি মাস্টার সাহেব।—হোসেন হাসল। চকচকে সাদা দাঁত।

আলিমুদ্দিন দেখলেন, কবাটের মতো চওড়া বুক—কাঁধের ওপর থেকে দু বাহু বেয়ে নেমেছে পেশীর কঠিন তরঙ্গ। হ্যাঁ—ঠিক আছে। লোহার মতো শক্ত সোজা মেরুদণ্ড। নুয়ে পড়বে না—ভেঙে যাবে না।

হোসেন বললে, লীগ আমরা চাই, তার আগে বোঝাপড়াও চাই। দুশমনকে চিনে নিয়ে তবে আমাদের কাজ। মাস্টার সাহেব যখনই ডাকবেন, আমরা হাজির থাকব।

কি বলবেন ভেবে পেলেন না মাস্টার। বুকের মধ্যে ঢেউ উঠছে যেন। পাকিস্তান। আজাদী। ফতে শা পাঠানের নয়—সারা দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের। যাদের জিনিস, তারাই আজ হাত তুলে দাবি জানাতে এসেছে, আর তাঁর ভাবনা নেই।

হোসেন আস্তে আস্তে বললে—কিন্তু একটা কথা বলব সাহেব!

—কি কথা ?

—শাহু আপনাকে সহজে ছাড়বে না।

আলিমুদ্দিন হাসলেন : কী করবে ?

—কিছুই বলা যায় না—সাক্ষাৎ ইবলিস লোকটা।

আলিমুদ্দিন আবার হাসলেন : ইংরেজ সরকারকে ভয় করিনি—আজ শাহুকেও করব না। সে যাক, একটা কাজ করবে হোসেন ?

—বলুন।

—যাওয়ার পথে পার তো একবার জলিল আর বসির ধাওয়াকে খবর দিয়ো। বলবে, বিকেলে যেন একবার আমার কাছে আসে।

—কিন্তু আমাদের কি কাজ, সে তো বললেন না মাস্টার সাহেব ?

—সময় হলে ডেকে পাঠাব।

হোসেন দাঁড়িয়ে উঠল : তাই হবে। কিন্তু একটা কথা বলি মাস্টার সাহেব। আপনি যদি আমাদের হয়ে দাঁড়ান, তবে আপনার গায়েও কাউকে হাত ছোঁয়াতে দেব না।—খুব আস্তে আস্তে বললে কথাটা। কিন্তু এর চাইতে বেশী জোরে বলবার দরকার নেই। জাত বাদিয়ার ছেলে—গায়ে পাঠানের রক্ত। ওরা যখন টালের মধ্যে ডাকাতি করতে যায়, আর গরুর গাড়ির সোয়ারীকে টুকরো করে কাটে হাঁসুয়া দিয়ে—তখনো নিঃশব্দে কাজ করাই ওদের অভ্যাস।

হোসেন চলে গেল। আলবোলাটা সরিয়ে দিয়ে আলিমুদ্দিন চেয়ে রইলেন জালালী পায়রার চক্র-দিয়ে-ওড়া পাল বুরুজের দিকে। সোনার রঙ ধরেছে ধানের মাঠে। কিন্তু ওই ধানের ওপর নামছে শাহের একটা শক্ত ক্ষুধার্ত মুঠি—কেড়ে নেবে, ছিনিয়ে খাবে মুখের

গ্রাস। ওই ধান যারা রয়েছে, ও ধান তাদের নয়। তাদের জন্যে গোরস্থান—শেয়ালে খোঁড়া গর্তের ভিতর থেকে পচা গন্ধ ছাড়ছে বাঁশের খুঁটি বেরিয়ে আছে যেখানে, যেখানে তালগাছের শুকনো পাতায় পাতায় খড়্গাধ্বনি।

তবু হোসেন—হোসেন আছে। আরো আছে—আরো আসবে। ধানের মাঠ ছাড়িয়ে আরো দূরে তাকাতে চাইলেন আলিমুদ্দিন—দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে মেলে দিতে চাইলেন আরো দূরের কোনো দিগন্তের দিকে। যেন দেখতে চাইলেন বহুদূর থেকে কারা এগিয়ে আসছে—তাদের মুখ সূর্যের দিকে, তাদের দীর্ঘ ছায়াগুলো পেছনে লুটিয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল দুপুরের পর।

শাহের ডাক পেয়ে আলিমুদ্দিন যখন মজলিসে গিয়ে পৌঁছুলেন, তখন থম থম করছে ঘরটা। সমস্ত আবহাওয়া যেন বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি, ফেটে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তেই। শাহু তাঁর বিছের লেজের মতো গোঁফটাকে টেনে ধরলেন দু হাতে। তারপর বললেন, বসুন মাস্টার সাহেব।

আলিমুদ্দিন চৌকিতে বসলেন। ইমাম সাহেব মুখ ফিরিয়ে নিলেন, জমাদার বদরুদ্দিন হঠাৎ অত্যন্ত মগ্ন হয়ে গেলেন একখণ্ড 'মাসিক মোহম্মদী'র পাতায়। আর ইসমাইলের ঠোঁট দুটো বার কয়েক নড়ে উঠল, যেন কি একটা বলতে গিয়ে অতি কষ্টে সামলে নিলে নিজেকে।

একবার গলাখাঁকারি দিলেন শাহু।—বল ইসমাইল—

ইসমাইল মাথা তুলতেই আলিমুদ্দিনের সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলল। মাস্টারের নীরব চোখে ইসমাইল কি আবিষ্কার করল সে-ই জানে, মিনিট খানেক পরেই সে শাহের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলে।—না চাচা, আপনি বলুন। আপনি বললেই ভালো হয়।

শাহু আবার কিছুক্ষণ পাকিয়ে নিলেন গোঁফটা—যেন প্রস্তুত হয়ে নিলেন অবস্থাটার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। তারপর বললেন—আপনাকে মাপ চাইতে হবে মাস্টার সাহেব।

—কার কাছে?—শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করেন মাস্টার, শান্তভাবে হাসলেন।

কেমন থতমত খেয়ে গেলেন ফতে শা।—মানে, কথাটা হচ্ছে এই—নিরুপায়ভাবে ইসমাইলকে একটা খোঁচা দিলেন শাহু : আরে, বলেই দাও না।

এতক্ষণে ইসমাইল যেন জোর পেয়েছে। ফিকে হয়ে এসেছে অস্বস্তিটা। ইসমাইল বললে—শাহের কাছে, ইমাম সাহেবের কাছে।

—কেন?—তেমনি শান্ত জিজ্ঞাসা মাস্টারের।

—কথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে তো চলবে না—নির্ভীক হয়ে ওঠা ইসমাইলের গলায় এবার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল : তিনদিন আগেই যা করেছেন, সে কি

এত শীগগির ভুলে যাওয়ার জিনিস ?

—তিনদিন আগে এমন কিছু করেছি বলে তো মনে হচ্ছে না, যে জন্যে আমায় ক্ষমা চাইতে হবে।

বদরুদ্দিন অনুভব করলেন, এইবারে তাঁর কিছু বলা উচিত। আসামীর সামনে উকিল দুর্বল হয়ে পড়েছে, সুতরাং পুলিসের হস্তক্ষেপ দরকার।

বদরুদ্দিন বললেন, আপনি সেদিন জমায়েতের মধ্যে এঁদের অপমান করেছেন।

কপালের দু'পাশ দিয়ে শুধু দুটো শিরা ফুলে-ওঠা ছাড়া আর কোনো ভাবান্তর ঘটল না মাস্টারের। নিরুত্তাপ স্বরে বললেন—না, মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা!—শাহু প্রায় ফরাস ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ইমাম সাহেব ঘুরে বসলেন বিদ্যুৎবেগে।

—হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। আমি কাউকেই অপমান করিনি।

ইসমাইলের চোখ ঝকঝক করে উঠল ছুরির ডগার মতো।—ভালোমানুষি করারও একটা সীমা আছে মাস্টার সাহেব। সেদিন দু হাজার লোকের সামনে আপনি কেমন করে এঁদের অপদস্থ করেছেন, তার সাক্ষীর অভাব হবে না।

—অপদস্থ করেছি মানতে পারি, কিন্তু অপমান করিনি। যা সত্যি, তাই বলেছি। —নিজেকে চারদিকে একটা পাথরের দেওয়াল তুলে দেওয়ার মতো কঠিন স্পষ্ট ভাষায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মাস্টার।

—মুখ সামলে কথা কইবে তুমি—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রাচীন ইমাম সাহেব। অসহ্য ক্রোধে সমস্ত মুখ তাঁর কালো হয়ে গেছে—যেন এখনি ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন মাস্টারের ঘাড়ের ওপর।

বাদরুদ্দিন থানার লোক—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। চট করে মাথা গরম করা তাঁর অভ্যাস নয়। ইমাম সাহেবের একখানা হাত তিনি চেপে ধরলেন।

—মিথ্যে রাগ করবেন না মৌলবী সাহেব। সবাই যখন আছি, ব্যবস্থা একটা হবেই।

—হ্যাঁ, ব্যবস্থা একটা হবেই—ক্রোধে ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল শাহের : মাস্টারকে মাপ চাইতেই হবে।

ইসমাইল দুটো হাত মুঠো করে ধরল : শুধু মাপ চাইলেই চলবে না। জমায়েৎ ডেকে সকলের সামনে কসুর স্বীকার করতে হবে তাঁকে। যে অন্যায় তিনি করেছেন, তাতে শুধু আমাদের ইজ্জতই নষ্ট হয়নি, লীগের কাজেরও ক্ষতি হয়েছে।

আলিমুদ্দিন আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।—এসব বাজে কথার কোনো মানে হয় না। যে অন্যায় আমি করিনি, তার জন্যে মাপ চাওয়ার শিক্ষাও আমি পাইনি। আচ্ছা, আমি তাহলে চলি শাহু—আদাব।

এতক্ষণ পরে বাজের মতো ফেটে পড়লেন শাহ্‌। এতক্ষণের সঞ্চিত বিস্ফোরক বিদীর্ণ হয়ে পড়ল এইবার।—মাস্টার, তুমি—

—আমাকে 'আপনি' বলবেন—দোরগোড়া থেকে মাথা ঘুরিয়ে আলিমুদ্দিন জবাব দিলেন।

কথাটা শাহ্‌ শুনতে পেলেন না। গর্জন করে বললেন—কাল থেকে আমার স্কুলে আর তুমি ঢুকবে না।

—বেশ।

—আজই আমার ঘর তুমি ছেড়ে দেবে—

—তাই দেব।—আলিমুদ্দিন বললেন, কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আপনার জুতোর চাকর নই। আমিও মুসলমান—খোদার বান্দা। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে চেষ্টা করবেন।

আলিমুদ্দিন বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় তিন মিনিট পরে স্তব্ধ ঘরটার আচ্ছন্নতা ভাঙলেন ইমাম সাহেব। অসহ্য নিরুপায় ক্রোধে তিক্ততম গলায় উচ্চারণ করলেন—ইঃ—খোদার বান্দা! শালা কাফের, শালা হারামীর বাচ্চা!

মালিনী নদীর জলটাকে টগবগ করে ফুটিয়ে দিয়ে ছুটন্ত ঘোড়সোয়ারের মতো বৃষ্টি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঞ্জনের জানালায়। কয়েকটা কাগজ উড়ে গেল ঘরময়, বিছানায় খানিকটা ভিজে গেল বৃষ্টির ছাটে। রঞ্জন জানালাটাকে বন্ধ করে দিলে।

ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে—সুইচ টিপে সে আলো জ্বালাল। কুমার বাহাদুরের ডায়নামোর এই এক সুবিধে—এই পাড়াগাঁয়েও পা ফেলতে পারে না কালো রাত্রি।

একা ঘরে এমনি সন্ধ্যায় মিতার কথা মনে পড়ে। আরো বিশেষ করে যখন বৃষ্টি নামে : 'মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গ-প্রয়াতে'। রবীন্দ্রনাথের গান : 'বাহির হয়ে এস আমার স্বপ্ন-স্বরূপ'। স্মৃতির ভেতরে কতগুলো ঝরে-যাওয়া ফুলের রঙ ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। সেও একদিন কবিতা লিখত না কি? সে কতদিন আগে? অনেক রোদের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে কোথায় হারিয়ে গেছে তাদের মুকুন্দপুরের বাড়িটা—বাতাবী-ফুলের গন্ধে-ভরা ছায়াঘন বাগান—ঝুপসী আমগাছে রাঙা টুকটুকে কাঁকরোলের দোলা!

বাইরে মালিনী নদীর জল বর্ষায় উতরোল। নাগিনী পদ্মা কোথায় কত দূরে এখন? তার জীবনের স্রোত কোন্ সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে স্বপ্নে-দেখা সেই মেয়েটিকে—সীতা যার নাম?

থাক—থাক ওসব। উত্তমার তীক্ষ্ণ হাসি। পুরুষের মতো পেশীপুষ্ট কঠিন হাত।

অজয়দার গল্পটা একটা উদ্যত চাবুকের মতো দুলছে মনের সামনে। কমরেড। লীলাসঙ্গিনী হারিয়ে গেছে মুকুন্দপুরের ছায়ার সঙ্গেই। এখন সময় কই—সময় নষ্ট করবার? অনেক কাজ। প্রচুর খাটনি যাচ্ছে কদিন ধরে, নগেন ডাক্তারের সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। তুরীরা প্রায় তৈরি—সাঁওতালদের মধ্য থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। যমুনা আহীর এখন নগেনের আশ্রিত—কিছুতেই সে ধরা দেবে না পুলিসের হাতে। তা ছাড়া সে থাকলে আহীরদের সকলকে পাওয়া যাবে—আর সে সংগ্রামে হয়ত সেনাপতি হওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে যমুনাকেই!

মোটামুটি সব অবস্থাই অনুকূল। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের মধ্য থেকেই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কিছু। শাহের লোকলস্কর নিয়ে ইসমাইল পূর্ণ-উদ্যমে নেমে পড়েছে আসরে। গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের ভূমিকা তৈরি চলছে এখন।

তা করুক। আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নীতিটাই কেমন বিসদৃশ ঠেকে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করুক—কিন্তু সর্বজনীন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কেন এসে দাঁড়াবে না পাশাপাশি পা ফেলে? সে তো হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়। সকলের দাবি—সকলের পাওনা।

রঞ্জনের পেছনে ঘরের দরজাটা প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল। দেওয়ালের ওপর পড়ল ছায়া! আর সেই ছায়ায় যার দেহের ইঙ্গিত ফুটে উঠল—সে এমনি অস্বাভাবিক আর অপ্রত্যাশিত যে তীরবেগে ফিরল রঞ্জন—উঠে দাঁড়াল সীমাহীন বিস্ময়ের চমকে। কুমার ভৈরবনারায়ণ স্বয়ং!

—এ কি—আপনি!

কথাটা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল, না, তার মনের ভেতর থেকে উঠল একটা নিঃশব্দ চিৎকারের মতো, তা-ই সে ভালো করে বুঝতে পারল না।

কুমার তাঁর প্রকাণ্ড মুখে একটা বিস্তীর্ণ হাসি ফুটিয়ে তুললেন। আফিঙের জড়তাভরা জ্যোতিঃহীন চোখে তাকালেন অর্থহীন দৃষ্টিতে। হঠাৎ একটা বিলাতী কার্টুন মনে এল: একটা প্রাইজ বুল লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোনো গাজরক্ষেতের দিকে।

—খুব অবাক হয়ে গেছেন ঠাকুরবাবু?—কুমার বাহাদুর যেন নিজের লীলায় নিজেই কৌতুক বোধ করছেন: দেখতে এলাম কেমন আছেন।

রঞ্জন শুধু বলতে পারল—বসুন।

কুমার সশব্দে একটা চেয়ারে আসন নিলেন।

—কোনো দরকার আছে? তাহলে ডেকে পাঠালেই পারতেন। এত কষ্ট করলেন কেন?—আনুগত্যের বিনয়ে কথাটা বলতে হল রঞ্জনকে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে। একটা কিছু ঘটবে। এই বর্ষার রাত্রে তার মতো

অধমের ঘরে কুমার সাহেবের পদার্পণটা নিছক একটা কুশল-কৌতূহলই নয়! তাই দেওয়ালের গায়ে যেন একটা অবলম্বন খুঁজে নিচ্ছে। কিছুতেই নিজেকে নুয়ে পড়তে দেবে না—দুর্বল হতে দেবে না!

—কখনো কখনো মহম্মদকেও পর্বতের কাছে আসতে হয়—কুমার বললেন: এক তরফা কি চলা উচিত?

বাইরে আমবাগানে সমানে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ। তবু কুমার বাহাদুরের কথাগুলো নির্ভুল স্পষ্টতায় শুনতে পেল রঞ্জন। কৌন্তেয় অর্জুন মোহপাশ থেকে মুক্ত হচ্ছেন আস্তে আস্তে। কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শনটা করালো কে? পোস্ট-মাস্টার বিভুপদ হাজরা? ডাক্তার পান্নালাল এল-এম-এফ (পি)? না, দারোগা তারণ তলাপাত্র?

—আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না।

—বলছিলাম কি ঠাকুরমশাই, হিজলবনীতে স্বাস্থ্যটা বোধ হয় আপনার ভালো থাকছে না।

—কেন, কোনো অসুখ-বিসুখ নেই তো আমার!—রঞ্জন কেমন হতভম্ব হয়ে গেল।

কিন্তু জালটা কেটে দিলেন ভৈরবনারায়ণ নিজেই। গরুর মতো সুবিশাল মুখে আরো প্রসারিত হচ্ছে হাসিটা। গাজরক্ষেতের আরো কাছাকাছি এসেছে বোধ হয়।

—লজ্জা করছেন কেন?—কুমার ক্রমশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন, রঞ্জনের পিঠের পাশ দিয়ে তাকালেন শ্যাওলার চিহ্ন-ধরা দেওয়ালের দিকে: শরীর ভালো থাকলে কি আর এমন করে হাওয়া বদলাবার জন্যে আপনাকে ছুটতে হয় জয়গড় মহলে আর কালাপুখরিতে?

মুহূর্তে শ্রদ্ধায় রঞ্জনের মন ভরে উঠল কুমার বাহাদুরের ওপর। সত্যি অবিচার হয়েছে। আফিং খেয়ে ভৈরবনারায়ণ ঝিমোতে থাকেন বটে, কিন্তু কখনোই ঘুমিয়ে পড়েন না। তা ছাড়া আত্মপ্রকাশের মধ্যে একটা আশ্চর্য শিল্পীর সূক্ষ্মতা আছে তাঁর—মুদ্গরের মতো নেমে পড়েন না ঘাড়ের ওপর!

কুমার বললেন—ও সব নগেন ডাক্তারের চিকিৎসার কাজ নয় মশাই। কলকাতায় যান। কালই চলে যান।

—কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার কোনো দরকার দেখছি না তো আমি।

—আমি দেখছি!—কুমার আপ্যায়িত বিনীত গলায় বললেন, আমার এখানে আছেন, আমাকে গীতা পড়ে শোনাচ্ছেন, পরলোকের কাজ করে দিচ্ছেন। কিন্তু আপনার কথাটা আমি ভাবব না, বলেন কি!—কুমারের স্বরে আত্মধিক্কার: আমাকে কি এমনি স্বার্থপর আর অকৃতজ্ঞ পেলেন? না না, সে হবে না।

—আমাকে যেতেই হবে?—দেওয়ালের ভর ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইল রঞ্জন।

—আপনি চলে গেলে আমার অবশ্য খুব কষ্টই হবে। এমন যোগ্য লোক আর কোথায় পাব বলুন? কিন্তু আপনার শরীরের কথা ভেবে চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হয় না। তার চাইতে দিনকয়েক কলকাতায় গিয়ে স্বাস্থ্যটাকে ফিরিয়ে আসুন—কেমন?—কুমার উঠে দাঁড়ালেন: অবশ্য দু মাসের মাইনে আগাম দেব আপনাকে। আর কাল বেলা দশটার ট্রেনে আমারই গাড়িতে করে আপনাকে পৌঁছে দেব হজরতপুর স্টেশনে। কোনো অসুবিধে হবে না।

—কিন্তু—

—আমার জন্যে ভাবছেন?—কুমার থামিয়ে দিলেন: হ্যাঁ, মনটা আমার দিনকতক খুবই খারাপ থাকবে। কিন্তু কি করা যায় বলুন? আপনার দিকটাও তো ভাবতে হয়। তা ছাড়া কতদিন আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখেননি—সে জন্যেও তো একবার যাওয়া দরকার। তাহলে ওই কথা রইল—কাল সকালেই। সাড়ে আটটার মধ্যেই গাড়ি রেডি থাকবে।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে কুমার বাহাদুর থামলেন: আর সময়টাও খারাপ। এদিকে প্রায়ই খুন-খারাবী হচ্ছে। আপনি ভালো মানুষ—কিছু একটা হলে আমার আফসোসের সীমা থাকবে না। বুঝছেন তো?—কুমার দরজাটা টেনে দিয়ে বিদায় নিলেন। বৃষ্টির শব্দে তাঁর জুতোর আওয়াজটা মিলিয়ে গেল।

বুঝেছে বই কি—সবই বুঝেছে। কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে—এ কুমার সাহেবের আদেশ। অনেকদিন ধরে বুকের মধ্যে কালসাপ লালন করেছেন তিনি—আর নয়। যদি না যায়? এ বাড়ির তোষাখানায় সে আমলের ভারি তলোয়ার আছে—রাম-দা আছে। একটা বস্তা মালিনী নদীর বালির মধ্যে কোথায় তলিয়ে যাবে কে তার হিসেব রাখে? কিন্তু—

কাল সকালের আগে পালাতে হবে এখান থেকে। পালাতে হবে এই রাত্রে—এই বৃষ্টির মধ্যেই। আর দেরি করলে হয়ত সময়ও পাওয়া যাবে না।

জানালাটা খুলে দিলে। অন্ধকার। আমবাগানে ঝড়-বৃষ্টির মাতামাতি। বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জন্যে দেখা গেল মালিনী নদীর জলটা। একটা সোনালি অজগর যেন মোচড় খাচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণায়।

কুড়ি

সাপের ছোবলের মতো বৃষ্টি আর চাবুকের মতো হাওয়া। দানো-পাওয়া রাত্রিটা গোঙাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল মালিনী নদীর জল ফুলে ফুলে উঠছে অজগর-

গর্জনে। বরিন্দের রাঙা মাটি ধুয়ে ধুয়ে কাঁকর-পাড়ি কেটে কেটে ঝর্ণার মতো নামছে ঘোলা জল—এক এক অঞ্জলি চাঁপা ফুলের মতো ফেনা বয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ বেগে। বান আসছে নদীতে।

পাড়ির ধার দিয়ে দিয়ে, পিছল মাটির ওপর সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলল রঞ্জন। সঙ্গে ছাতা আছে বটে, কিন্তু সেটা একটা নিছক বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। এলোমেলো হাওয়ায় ছাট আটকাচ্ছে না—বরং দমকার ঝাপটায় তাকে সুদ্ধ ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে নদীর ভেতরে। বিরক্ত হয়ে ছাতাটা সে বন্ধ করে ফেলল।

এই বৃষ্টি ছাড়া কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে পালাবার আর কোনো উপায় ছিল না তার। নইলে অনিবার্যভাবেই কাল সকালে এসে দাঁড়াত কুমার বাহাদুরের মোটর—কিছুই বলা যায় না, হয়ত স্বয়ং কুমারই তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। মিথ্যে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই তাঁকে। নিজের পথ নিজে দেখাই ভালো।

এরই মধ্যে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। ওপরের সবটাই একখণ্ড মসৃণ কষ্টিপাথরের মতো। শুধু উত্তরের কোণায় একটা পিঙ্গল আভা ছড়িয়ে আছে—তার ওপর এই বৃষ্টিটার মধ্যে কোথাও যেন আভাস আছে সাইক্লোনের।

সারা গায়ে কোথাও এতটুকু শুকনো নেই আর। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা লেগে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। টর্চটাও আর জ্বলছে না—বাল্‌বটা খারাপ হয়ে গেছে খুব সম্ভব। ক্রমাগত পা পিছলে যাচ্ছে—ভয় হতে লাগল একসময় নদীর মধ্যে গিয়ে না পড়ে।

কিন্তু আশেপাশে দাঁড়াবার জায়গা নেই কোথাও। ইতস্তত বাবলাগাছগুলি ধারাস্নান করছে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর—তলায় আশ্রয় নিলে ঝাঁঝরির মতো বর্ষণ করবে সর্বাঙ্গে। মাথার ওপর অনবরত মেঘ শাসিয়ে চলেছে—বিদ্যুতের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে নিঃসঙ্গ তালগাছদের। এমনি রাত্রে তালগাছ দেখলে ওর কেমন ভয় করতে থাকে, মনে হয় অপমৃত্যুর একটা থমথমে আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা—যে কোনো মুহূর্তে ওদের ব্রহ্মরন্ধ্র চিরে বজ্র নেমে আসবে।

রঞ্জন দ্রুত পা চালাতে চেষ্টা করল।

হাঁটতে হবে—বেশ খানিকটা না হাঁটলে ঠাঁই মিলবে না রাত্রের মতো। এই বৃষ্টি বাতাস ঠেলে সামনে এখনো পুরো তিন মাইল পথ। কালাপুখরিতে সোনাই মণ্ডলের বাড়ি। তারপর সকাল হলে সেখান থেকে জয়গড়।

সকালে তাকে না পেয়ে কুমার বাহাদুরের কি প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু ও নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই কিছু। এতদিন দুজনের মধ্যে একটা মসলিনের পর্দা টাঙিয়ে যে অভিনয় চলছিল, সেটা যে এমন আচমকা শেষ হয়ে গেছে, এর জন্যে

মনের দিক থেকে বেশ খানিকটা স্বস্তিই বোধ করেছে রঞ্জন। ভালোই হল—একেবারে মুখোমুখি এর পর থেকে। স্পষ্ট, নগ্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দিনের পর দিন শত্রুতার কটুগ্রাসায় গলাধঃকরণ করার হাত থেকে বহু-বাঞ্ছিত মুক্তি।

কিন্তু এই তিন মাইল পথ যে তিনশো মাইলের চাইতেও দুর্গম এখন।

ক্রমাগত চশমার কাচ মুছতে মুছতে এখন একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে। শুধু অকূল সমুদ্র পাড়ি দেবার মতো দু'হাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে সে। অন্ধ—নিঃসন্দেহে অন্ধ। বৃষ্টি আরো ঘন হয়ে জমছে তার পাশে—কোন্ সময় সোজা নদীর জলে গিয়ে পড়ে ঠিক-ঠিকানা নেই। কি করা যায়? রঞ্জন দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু দূরে একটা বটগাছের আদল আসছে যেন। যাবে নাকি ওদিকে? নদীর ধার ছেড়ে মাঠের রাস্তা নেবে? আপাতত সেটাই তার যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে।

দু পা এগোতেই সে থমকে দাঁড়াল। চশমা খুলে নেওয়াতে কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উপকারও হয়েছে খানিকটা। এখন চশমা থাকলে দুর্গতি ছিল কপালে।

এধারে প্রায় দশ-বারো ফুট গভীর একটা কাঁদড় আছে এবং তার মধ্য দিয়ে খরধারে ছুটছে জল। হাতের ছাতাটা সজোরে এঁটেল মাটিতে চেপে ধরে সে হুড়মুড় করে একটা বিরাট পতনকে সামলে নিলে।

—কে? কে?

বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যে—ফাঁকা মাঠের দুর্যোগভরা অন্ধকারে কোথা থেকে স্বর বেজে উঠল। চকিতের জন্য রঞ্জনের শিরাগুলো চমকে থেমে গেল—তীব্র অস্বাভাবিক ভয়ে শির শির করে উঠল লোমকূপগুলো। আর একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ার ঝোঁকটা সামলে নিতে হল তাকে।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে? কথা বলছ না কেন?

মেয়ের গলা। সীমাহীন বিস্ময়ে রঞ্জন দৃষ্টিটাকে বিস্ফারিত করতে চেষ্টা করল। এতক্ষণ পরে যেন একটু একটু করে ঘোর কাটছে। কাঁদড়ের ঠিক ওপারে যেটাকে সে বটগাছ বলে মনে করেছিল—সেখানে দু-তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে। আর তাদের অন্ধকার কোলের ভেতর ঘর আছে একখানা। সেখান থেকেই আসছে আওয়াজটা।

জবাব দেবে কি না ঠিক করে নেবার আগেই বিদ্যুৎ ঝলকালো। তালগাছের উদ্ধত মাথাগুলোর ওপর উদ্যত খড়্গের আভাস দিয়ে খানিকটা তীক্ষ্ণ সাদা আলো ছুঁয়ে গেল পৃথিবীকে। আর রঞ্জন সেই আলোয় মেটে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কালোশশীকে। কালোশশী! এত কাছে—এই অন্ধকারে এমন করে লুকিয়ে ছিল!

—ঠাকুরবাবু! তুই ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিস?

চকিত আলোতেও তাহলে চিনতে পেরেছে! পা চালিয়ে চলে যাবে কি না ভাবতে

ভাবতেই রঞ্জন দেখলে কোন্ ফাঁকে সাড়া দিয়ে ফেলেছে সে।

—হ্যাঁ, আমি।

বৃষ্টির ঝরঝরানি ছাপিয়ে উদ্বিগ্ন কালোশশীর আকুল স্বর কানে এল : এত রেতে অমন করে ভিজছিস কেন! কোথায় যাবি?

—একটু কাজে। কালাপুখরি।

—কালাপুখরি!—কালোশশীর স্বরে অপরিসীম বিস্ময় : নদী ফুলে উঠেছে, হড়পা বান নামছে। এখন তোকে কে খেয়া পার করে দেবে? ঘরে ফিরে যা ঠাকুরবাবু।

—ঘরে ফিরবার জো নেই কালোশশী। আমায় যেতে হবে—

—তবে এইখানে একটু দাঁড়িয়ে যা ঠাকুরবাবু—

—না, আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।—রঞ্জন টলতে টলতে আবার রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

—ঠাকুরবাবু—

কাঁদড়ের ওপার থেকে শোনা গেল কালোশশীর মিনতিভরা আহ্বান। কিন্তু আর দাঁড়াবে না। নিশ্চিন্ত প্রতিজ্ঞায় কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ সচল হয়ে উঠল নিচের পৃথিবীটা। মাটিতে ছাতার বাঁট পুঁতে একবার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু আর সম্ভব হল না। দ্রুতবেগে হাত তিনেক পিছনে গিয়ে অসহায়ভাবে একবার সে ঘুরপাক খেল, তারপর সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে সোজা কাঁদড়ের জলে।

ইতিমধ্যে বিদ্যুতের একটা উজ্জ্বল শুভ্রতায় সমস্ত ব্যাপারটাই পুরোপুরি চোখে পড়েছে কালোশশীর। দুর্যোগের রাত্রিটা ছন্দোস্তরভিত হয়ে উঠল হাসির উচ্ছল ঝঙ্কারে। অবগাহন স্নান শেষ করে, একঢোঁক কাদাজল গিলে রঞ্জন যখন দাঁড়াতে পারল তখন এপার-ওপারের ব্যবধানটা লোপ পেয়ে গেছে। হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে কালোশশী নেমে এসেছে একেবারে জলের কাছে—হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছে : হল তো এবার? আমার ঘরে উঠে আয় ঠাকুরবাবু—

এককোমর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রঞ্জন বললে, কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে।

কালোশশী শুধু বললে, আমার হাত ধর—

শেষ পর্যন্ত রাতটা কাটাতে হবে কালোশশীর ঘরে!

কিন্তু আর উপায় নেই। বাইরে সমানে বৃষ্টি আর হাওয়ার দাপট।

সাইক্লোনই বটে। অন্ধকার রাত্রিটায় গোঙানি চলেছে একটানা। এই প্রাকৃতিক শত্রুতা ঠেলে—অন্ধ দু'চোখে পিছল পথের পতন-সম্ভাবনাকে সামলাতে সামলাতে

কালাপুখরি গিয়ে পৌছনো শারীরিকভাবেই অসম্ভব এখন। তা ছাড়া খেয়াও একটা সমস্যা বটে। এমনিতেই রাত একটু বেশি হলে খেয়াঘাটের মাঝি ওপারে নৌকা নিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম লাগায়—তাকে জাগিয়ে তোলা সমস্যা বিশেষ। তারপর এই রাতে সে এপারের ডাক আদৌ শুনতে পাবে কিনা সন্দেহ। আর শুনতে পেলেও এমনি বর্ষায় একটি কোমল মসৃণ ঘুম এবং কম্বলের সুখশয্যা ছেড়ে সে যে কিছুতেই উঠবে না এ প্রায় নিশ্চিত। তা ছাড়াও এই ভয়ঙ্কর নদী!

সুতরাং—

সুতরাং মেটে প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় কালোশশীর ঘরটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল রঞ্জন।

আশা করা যায় না, তবু একটা ভাঙা তক্তপোশ আছে ঘরে। ওই তক্তপোশের নিচেই বোধ হয় আছে কালোশশীর যা কিছু তৈজসপত্র। ঘরময় অনেকগুলি শিকে ঝুলছে, তাতে কিছু রঙবেরঙের হাঁড়ি। এক কোণে মেলায় কেনা একখানা মনসার সরা—তার ওপর বিষহরির মূর্তিটা প্রদীপের ম্লান আলোয় একটা স্থির জীবন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

—এই তোর ঘর?

—হুঁ।

—লক্ষ্মণ কোথায়?

—সে তো এখানে থাকে না।

—তবে কোথায় থাকে সে?

—আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—চলে গেছে?—রঞ্জন চকিত চোখে তাকালো ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা কালো-শশীর মুখে। কোনো চিহ্নই নেই সে মুখে—কোনো ছাপই পড়েনি বিরহ-জর্জরতার। স্রোতের জলে আরো অনেকের মতো যেমন ভেসে এসেছিল লক্ষ্মণ—তেমনি করেই আর একদিন ভেসে গেছে কালোশশীর জীবন থেকে। বাঁধা ঘাটে একটি রেখাও কোথাও এ কে রেখে যায়নি, হয়ত একটুখানি শৈবালের কলঙ্করেখাও নয়!

কালোশশী নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললে—হাঁ, ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে সাঙা করেছে আবার।

—তা হলে তুই একা?

—কে আর থাকবে?

তীক্ষ্ণ অর্থভরা ভঙ্গিতে কালোশশী হাসল। অস্বস্তিতে রঞ্জন চমকে উঠল হঠাৎ। মনে হল, এই হাসিটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সাইক্লোনের এই রাতটার মতো এ হাসিটাও যে কোনো সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতে পারে।

প্রসঙ্গ বদলানো উচিত। আরো মনে পড়ল: সেদিন অন্ধকার পথে আচমকা তাকে

পথে ছেড়ে দিয়ে কালো রাত্রির আড়ালে ছায়াময়ীর মতো মিলিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। সেদিন পাশাপাশি খোলা আকাশের তলায় পথ চলতে চলতে যে কথাটা শুধু ইঙ্গিতের মধ্যেই ঝলক দিয়েছিল—এই বিচিত্র রাত্রির নিঃসঙ্গ ঘরটির অন্তরঙ্গ নিবিড় অবকাশে তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে কতক্ষণ? বনের সাপ নিয়ে যার কারবার, তার মনের সাপটাও কি ঘুমিয়ে আছে?

অস্বস্তিতে রঞ্জন নড়ে উঠল।

—এত রাত অবধি জেগেছিলি কেন কালোশশী?

—সাপ ধরছিলাম।

—সাপ!

—শুয়েছিলাম—গায়ের ওপর দিয়ে হলহল করে চলে গেল। বর্ষার জল পেয়ে কোন ফোকর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চেপে ধরতে গেলাম—ফোঁস করে উঠল, পালালো বারান্দায়। তা আমার কাছ থেকে পালাবে? থপ করে ধরে হাঁড়িতে পুরেছি।

—কী সাপ?

—শামুক ভাঙা আলাদ। খুব তেজী। একটু হলেই কেটে দিত। দেখবি?

রঞ্জন শিউরে উঠল: না না, থাক।

—ভয় পাচ্ছিস? আমার ঘরটাই তো সাপে ভরা। যত হাঁড়ি দেখছিস, সব তো ওরাই আছে। একবার খুলে দিলেই কিলবিল করে ঘুরে বেড়াবে গোটা ঘরময়।

—থাক, থাক!

কালোশশী আবার খিল খিল করে হেসে উঠল: আমার আর কেউ নেই,—ওরাই থাকে সঙ্গে। মানুষের মতো নিমকহারাম নয়—পোষ মানে।

—পোষ মানে! সাপ আবার পোষ মানে! যেদিন ছোবল মারবে ফস করে, বুঝবি সেদিন।

—একবারই মারবে—ব্যাস ফুরিয়ে যাবে তারপরে। মানুষের মতো বারে বারে ছোবল দিয়ে জ্বালিয়ে মারবে না।

গলার স্বর কি গভীর হয়ে উঠল কালোশশীর? কখনো কি গভীর হয়? কেমন যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভয় করে। কালোশশীর রুপোর কাঁকনপরা হাত দুটোয় কালনাগের ছন্দ—তার বাহুর ভঙ্গিতে ওই কাঁকনের দীপ্তিটাও ঝলক দিয়ে ওঠে সাপের মাথার চক্রের মতোই।

বাইরে বৃষ্টি চলছে, সেই সঙ্গে বাতাসের পাগলামি। জলের কল-গর্জন আসছে। নদীর না কাঁদড়ের? সর্বাঙ্গ ভিজে একাকার হয়ে গেছে—কাপড় বদলাবার মতো শুকনো কিছু কালোশশীর ঘরে প্রত্যাশা করাও বিড়ম্বনা। সাইক্লোন বাড়ছে। এই রাত্রিকে বিশ্বাস নেই

—বিশ্বাস করতে সাহস হয় না কালোশশীকেও।

এর চাইতে তো পথই ছিলো ভালো। আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তেও কোথাও না কোথাও, একটা না একটা গাছের তলায় আশ্রয় মিলতই। তারপর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়া পার হয়ে—

নাঃ, আর এখানে থাকার মানে হয় না। যেতেই হবে।

—আমি যাই কালোশশী—

—ঠাকুরবাবু—হঠাৎ বিচিত্র গলার ডাক এল একটা।

প্রদীপের আলোয় ভুল দেখল নাকি আজও? আজও কি সেদিনের সন্ধ্যার মতো একটা কিছুর অস্ফুট আভাস পেল সে? কালোশশীর চোখে কি জলের রেখা?

—আমায় নিয়ে চলো ঠাকুরবাবু—

—কোথায়?

—তোমার ঘরে।

পরক্ষণেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল মেয়েটা। প্রস্তুত হওয়ার এক বিন্দু সময় না দিয়ে হাওয়ার একটা দমকার মতোই এগিয়ে এল রঞ্জনের দিকে। তারপর দু হাতে তার পা জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে বসে পড়ল সেখানে: আমায় নিয়ে চলো ঠাকুরবাবু।

—পা ছাড়, পা ছাড়। কী পাগলামি হচ্ছে এসব?—রঞ্জন প্রাণপণে পা ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ মুহূর্তে জমাট হয়ে গেছে।

—আর আমি সাপ নিয়ে ঘর করতে পারি না। আমি জ্বলে মরছি ঠাকুরবাবু—জ্বলে মরছি সাপের বিষে। আমাকে তুমি নিয়ে যাও—তোমার যেখানে খুশি নিয়ে যাও। আর আমি সইতে পারছি না।

নির্জীব পুতুলের মতো স্থির হয়ে বসে রইল রঞ্জন। তার পা দুখানা বুকের মধ্যে সজোরে আঁকড়ে ধরে অর্থহীন আকুলতায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল কালোশশী—যেন বাইরের এই অশান্ত বিক্ষুব্ধ রাতটার মতো তার কান্নাও আর কোনোদিন থামবে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়।

যেমন আচমকা পা জড়িয়ে ধরে কান্না আরম্ভ করেছিল, তেমনি আকস্মিক ভাবেই পা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ উঠে চলে গেল বাইরে।

রঞ্জন একান্ত নির্বোধের মতো খাটের ওপরেই বসে রইল কিছুক্ষণ।

আরো খানিক পরে খোলা ঝাঁপের ভেতর দিয়ে এল সাইক্লোনের একঝলক উদ্দাম বাতাস। যে কেরোসিনের ডিবাটা একটা রক্তশিখা তুলে জ্বলছিল এতক্ষণ, দপ করে নিবে গিয়ে সেটা অন্ধকারের ঘূর্ণিতে ভেসে চলে গেল।

আর সেই অন্ধকারে আত্মস্থ হয়ে উঠল রঞ্জন—যেন এতক্ষণের ঘোরটা কেটে গেল

তার। মনে হল এই ঘরের সর্বত্র অসংখ্য মাটির পাত্রে সংখ্যাতীত সাপ আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে—বিষাক্ত জ্বালা নিয়ে, একটা দুঃসহ বন্দিত্বে। আছে গোখরো, আছে দুধরাজ, আছে চিতি, আছে চন্দ্রবোড়া, আছে সিঁদুরিয়া, আছে নাম-না-জানা অগণিত মৃত্যুর অনুচর। এই অন্ধকারে হঠাৎ যদি তারা মুক্তি পায়? রঞ্জনের চতুর্দিক চকিতে যেন রাশি রাশি সরীসৃপে আবিল হয়ে উঠল—বাইরের গর্জিত রাত্রি লক্ষ লক্ষ সাপের মতো ক্রুদ্ধ গর্জনে যেন ছোবল মারতে লাগল, চারদিকের ঘনীভূত কালোর ভেতর থেকে বিষ-জর্জর মৃত্যু বুঝি তাকে লক্ষ্য করে আবর্তিত হয়ে উঠল।

আর নয়! আর এখানে থাকলে বিষের জ্বালায় সে ঢলে পড়বে। সে বিষক্রিয়ার প্রথম পর্বটুকু নাগিনী কালোশশীই শুরু করে দিয়েছে। পালাও—এখনো পালাও! এখনো সময় আছে।

কিন্তু কোথায় গেল কালোশশী?

যে চুলোয় খুশি যাক। সেজন্যে ভাবনা করার সময় নেই এখন। রঞ্জন অন্ধকারেই দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্যের মতো ঝাঁপের দিকে লাফিয়ে পড়ল। কালোশশীর জন্যে মনোবিলাস করবার মতো অপর্যাপ্ত সময় তার হাতে নেই। আকাশ গর্জাচ্ছে, বাতাস গর্জাচ্ছে—নদী গর্জাচ্ছে। বহুদিনের অবরোধ ভেঙে ফেলে ক্ষুব্ধ আক্রোশে পৃথিবী গর্জন তুলছে আজ। এইবারে জল নামবে কালাপুখরির ডাঁড়া দিয়ে। তারপর—

এই মুহূর্তে তাকে যেতে হবে জয়গড়ে। খেয়া না থাক, সাঁতার দিয়েই পার হবে নদী।

বৃষ্টির জোরটা মন্দা হয়ে এসেছে। কোমরভাঙা গোখরোর অন্তিম ছোবলের মতো ঝোড়ো হাওয়া। আর একবার বিদ্যুতের আলোয় রঞ্জন দেখল—কাঁদড়ের ধারে কে যেন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। বাতাসে তার রুক্ষ চুলগুলো উড়ে যাচ্ছে।

থাকুক দাঁড়িয়ে। ওর কান্না আজ রাত্রির এই কান্নার সঙ্গে একাকার হয়ে যাক।

জয়গড়ে এসে পৌঁছুল একটা কিম্ভূত চেহারা নিয়ে।

—কী হয়েছিল?—হতবাক হয়ে জানতে চাইল নগেন।

—সে অনেক কথা, পরে হবে। আপাতত কুমার বাহাদুরের ওখান থেকে চম্পট দিয়েছি। কিন্তু উত্তমা কোথায়—উত্তমা? সকলের আগে এক পেয়ালা গরম চা চাই আমার।

একুশ

খবরটা নিয়ে এল দূত হোসেন।

শাহের ঘর ছেড়ে পরদিন সকালেই এসে ধাওয়া-পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছেন মাস্টার। শাহ্ তাঁকে বরখাস্ত করেছেন, তাঁকে ঘোষণা করেছেন প্রত্যক্ষ শত্রু বলে। এ অবস্থায় কাউকে বিব্রত করা উচিত হবে কিনা সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না আলিমুদ্দিন। তবে কি গ্রাম ছেড়েই তাঁকে চলে যেতে হবে? যে পাকিস্তান তাঁর জীবনের ব্রত, যে পাকিস্তান তামাম দুনিয়ার গরীবের দেশ, যেখানে বখিলের হাতে মানুষের রক্ত মুঠো মুঠো সোনা হয়ে সঞ্চিত হয় না, তাঁর সেই আজাদী-প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই এমন করে পিছিয়ে পড়বেন তিনি? গ্রাম থেকে পালাবেন একটা খুনী শয়তান জমিদারের ভয়ে? সভার সামনে হাজার মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, শুধু এইটুকু বিরোধিতার চাপেই সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে তাঁকে?

'সারে জাঁহাসে আচ্ছা পাকিস্তান হামারা—'

একটা অনিশ্চয়ের মধ্যবিন্দুতে মন যখন টলমল করছিল তখন তাঁকে ঘরে টেনে নিয়ে গেল জলিল ধাওয়া।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভয় করবে না?

আজ আর সেদিনের মতো মদ খায়নি, তবু মাতালের হাসি হেসেছিল জলিল। জীবনটাকে ভুলতে গিয়ে যে নেশার মধ্যে ওরা ডুব দিয়েছে, সে নেশার ঘোর ওদের আর ভাঙে না। মদ না খেলেও না।—স্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়!—সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল।

যথেষ্ট। এর পরে বলবার আর কিছুই নেই। ভাঙনধরা খাড়া পাড়ির গায়ে যে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একটু পরে আপনিই যে ঝরে পড়বে স্রোতের মধ্যে, ভেসে যাবে কুটোর মতো। পেছন থেকে কেউ ধাক্কা দেবে কি দেবে না, দুর্ভাবনার সেই স্তরটা সে পেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই।

সুতরাং হোগলার বেড়া আর খড়ের চালে ছাওয়া, মাছ আর জালের পচা আঁশটে গন্ধে আকীর্ণ এই ঘরে আলিমুদ্দিন আশ্রয় নিয়েছেন। তেতো পাটশাক, মাছের ঝোল, আর রাঙা চালের ভাত দিয়ে যথাসাধ্য অতিথি-সৎকার করেছে জলিল।

বলেছে—খোদার কাছে দোয়া করুন মাস্টার সাহেব, জাল ভরে যেন মাছ পাই। তাহলেই হবে।

সকালে মাস্টার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নমাজ পড়ছিলেন, আর একটু দূরে একটা চালতা গাছের তলায় বসে পাঁচ বছরের ন্যাংটো ছেলেটাকে নিয়ে জালে গাব দিচ্ছিল জলিল। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল মাস্টারের নমাজের দিকে। ধর্মকর্মের বালাই খুব বেশি নেই সম্প্রদায়টার—দু-চারজন ছাড়া রোজাও বড় কেউ রাখে না। অবশ্য প্রকাশ্যে সেটা স্বীকার করে না, কিন্তু আড়ালে হাসাহাসি করে বলে: 'যে হয়, সে করে রোজা।'

সুতরাং মাস্টারের নমাজ দেখতে দেখতে জলিল যেন আকস্মিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে উঠছিল এবং জালে রঙ লাগানোর কাজেও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেন।

—কী খবর ভাই সাহেব? এত ব্যস্ত যে?

হোসেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাস্টারকে একনিষ্ঠভাবে নমাজ পড়তে দেখে থমকে গেল।

জলিলের দিকে তাকিয়ে বললে—একটু পানি খাওয়াতে পার মিঞা, এক ঘটি ঠাণ্ডা পানি?

—এই সকালেই এমন করে পানি? হয়েছে কী?

—বলছি পরে। বড় পিয়াস লেগেছে ভাই—ঢের দূর থেকে ছুটে আসছি।

জলিল ব্যস্ত হয়ে জালের কাঠি ছেড়ে দিলে। তার পর তাড়া দিলে ছেলেটাকে।

—যা তো দেলোয়ার। তোর আম্মার কাছ থেকে লোটা ভরে পানি আর গুড় নিয়ে আয় একটু।

—গুড় লাগবে না, পানি হলেই চলবে।

দেলোয়ার দৌড়ে চলে গেল।

জলিল বললে—ব্যাপার কী মিঞা?

—সাংঘাতিক।

—কি রকম সাংঘাতিক?

—খুব দাঙ্গা লাগবে আজ।

—দাঙ্গা? কোথায় দাঙ্গা?

—পালনগরের টিলায়।

—সে তো সাঁওতালদের আড্ডা। আবার শাহের লোক-লস্কর যাচ্ছে নাকি তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে? আবার বুঝি খুনোখুনি হবে কয়েকটা?

হোসেন মাস্টারের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিলে। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেজদা করছেন মাস্টার—সমস্ত মন তাঁর তন্ময় হয়ে আছে। জবাব দেবার আগে ইতস্তত

করতে লাগল সে।

এক থাবা ভেলি গুড়, আর এক ঘটি জল নিয়ে ফিরল দেলোয়ার। এক চুমুকে জলটা নিঃশেষ করলে হোসেন—যেন বুকের ভেতর একটা মরুভূমি বয়ে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ।

জলিল অধৈর্য হয়ে উঠল।

—কিসের দাঙ্গা?

হোসেন বললে—যা এ তল্লাটে কোনোদিন হয়নি, তাই।

—খোলসা করে বলো—জলিল আরো উত্যক্ত হয়ে উঠল।

—হিঁদু মোছলমানে।

—হিঁদু-মোছলমানে?—জলিল হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাটি ছেড়ে তীরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন আলিমুদ্দিন।

—কী নিয়ে দাঙ্গা হবে হিন্দু-মুসলমানে?—মেঘের মতো গম্ভীর গলায় মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন।

হোসেন বললে—ব্যাপার এর মধ্যেই ঢের দূর গড়িয়েছে মাস্টার সাহেব। সাঁওতালদের কিছুতেই জব্দ না করতে পেরে এবার নতুন রাস্তা নিয়েছেন শাহু। লীগের ঢোল পিটিয়ে লোক জুটিয়েছেন সব, তারপর তাদের নিয়ে মসজিদ বসাতে যাচ্ছেন পালনগরের টিলার ওপর। সাঁওতালদের কালীর থান যেখানে আছে, ঠিক তার গায়ে। বলছেন, অনেককাল আগে ওখানে নাকি মসজিদ ছিল।

—ছিল নাকি?

—কই, আমরা তো কখনো শুনিনি। এসব ইসমাইল সাহেবের কারসাজি বলে মনে হচ্ছে। ইসমাইল সাহেবই সকলকে ডেকে বলেছে, আমাদের মসজিদ গড়ার কাজে কেউ বাধা দিলে তার মাথা আগে ভেঙে দিতে হবে। পাকিস্তান গড়তে গেলে এইটেই পয়লা কানুন—আগে আমাদের ধর্ম রাখতে হবে।

—কত লোক নিয়ে যাচ্ছে?—ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন মাস্টার।

—তা প্রায় শ'খানিক হবে। লাঠি-শড়কিও যাচ্ছে।

মাস্টার নিজের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরলেন একবার।

—সত্যই তা হলে ওখানে মসজিদ কখনও ছিল না?

—বোধ হয় না।—হোসেন বললে, মতলব বুঝতে পারছেন না? যে রায়তের সঙ্গে এমনিতে এঁটে ওঠা যাবে না, তাকে জব্দ করতে গেলে এই রকমই কিছু একটা তো চাই!

মাস্টারের সমস্ত মুখটা ক্রোধে হিংস্র হয়ে উঠল।

—মতলব বুঝতে পারছি বই কি। আরো বুঝতে পারছি, এইখানেই এর শেষ নয়। রক্তে শা পাঠানের মতো লোকের হাতে যদি কোনদিন পাকিস্তান পড়ে, তাহলে এই

নিয়মেই তা চলতে থাকবে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দেবে ধর্মের দোহাই ; কোরান আর খোদাতালার পবিত্র নামের অমর্যাদা করে নিজেদের কাজ হাসিল করবে ইসলামী জিগির তুলে। দেশ জুড়ে আনবে হাঙ্গামা—ঝরবে নিরীহ সরল মানুষের কলিজার খুন।

হোসেন বললে—খবর পেয়েই তো ছুটে এলাম মাস্টার সাহেব। কী করা যায় ? চোখের সামনে মিছিমিছি খুন-খারাপি হবে—দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলবে !

—শুধু চোখের সামনে নয়, সারা দেশেও ছড়িয়ে পড়বে। তারপরে—ঝড়ের আকাশের মতো কী একটা ঘন হয়ে এল আলিমুদ্দিনের মুখে : ধর্মের জন্যে জান কোরবান করলে মুসলমানের বেহেস্ত। মসজিদের একখানা ইট তাকে রাখতে হবে পাঁজরার একখানা হাড় দিয়ে। কিন্তু ধর্মের নাম নিয়ে এই শয়তানি বরদাস্ত করা যাবে না। হোসেন, জলিল— যেমন করে হোক এ দাঙ্গা রুখতে হবে।

জলিল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে আধখানা বাঁশ কুড়িয়ে নিল সে।

—হ্যাঁ মাস্টার সাহেব, দাঙ্গা রুখে দেব আমরা।

—তোমার দলবল তৈরি আছে হোসেন ?

—ডাকলেই এসে পড়বে।

—চলো তাহলে, একটুও দেরি নয় আর—মাস্টার পা বাড়ালেন।

—আমিও যাব বা-জান ?—কী বুঝেছে কে জানে, উৎসুক মিনতিভরা গলায় হঠাৎ অনুমতি চাইল দেলোয়ার।

মাস্টার ফিরে তাকালেন দেলোয়ারের দিকে। অযত্নমলিন ক্ষুধাশীর্ণ শিশুমুখখানা এই মুহূর্তে যেন আশ্চর্য সুন্দর মনে হল তাঁর। আজাদ পাকিস্তানের অঙ্কুর।

গভীর স্নেহে দেলোয়ারের মাথার ওপর হাত রাখলেন আলিমুদ্দিন।

—আগে আমরাই চেষ্টা করে দেখি বাপ। যদি না পারি, আমাদের কাজের ভার তোমাদের ওপরেই রইল। আমাদের যা বাকি থাকবে, তা তোমাদেরই শেষ করতে হবে যে !

উত্তমা হাসছিল।

শিরশিরে হাওয়ায় চোখ মেলল রঞ্জন। সারা গায়ে এখনো জ্বালা—জ্বর-জ্বর ভাব লাগছে মাথায়।

—উঠে বসুন। চা এনেছি আপনার জন্যে।

রঞ্জন উঠে বসল।

—কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলো তো ?

—তা মন্দ হবে না। রাত আড়াইটে থেকে সাড়ে দশটা—পুরো আট ঘণ্টা।

—বলো কি! সাড়ে দশটা এখন!

—কী করা যাবে, বেলাটাকে ঠেকানো গেল না!—কৌতুকভরে উত্তমা বললে, আমাদের হাত নেই তো ওর ওপরে। চা খেয়ে চান করতে যান, রান্না তৈরি। মা তাড়া দিচ্ছেন।

—আজ আর চান করব না। কাল সারারাত যা ভিজেছি—রঞ্জন উত্তমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলে: সারা গায়ে অসম্ভব ব্যথা।

—সে আর বলতে হবে না। রাতভর ছট্ফট করেছেন, আমাকেও ঘুমুতে দেননি।

—সে কি কথা! তুমিও জেগে বসেছিলে নাকি?

একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল উত্তমা: কী করব বলুন। কিন্তু এতে করে একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেল রঞ্জনদা। আপনার পুঁথির সঙ্গে এখনো মাটির মিল হয়নি।

—হেতু?

—একটা রাত বৃষ্টিতে ভিজেই এমন করে শুয়ে পড়লে তো চলবে না। যাদের ভালো আপনি করতে এসেছেন, তাদের কিন্তু সাতদিন ঝড়-বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও একফোঁটা সর্দি হয় না। যাই বলুন, শরীরে-মনে এখনো ঠাকুরবাবু হয়েই আছেন। ঠাকুর তো রয়েইছেন, বাবুগিরিটাও ছাড়তে পারেননি।

—হুঁ!—রঞ্জন বিষণ্ণ হয়ে গেল: আরো কিছু সময় লাগবে। পুরো পেরে উঠব কি না বুঝতে পারছি না।

—না পারলে মাপ নেই। তাহলে দুটো পথ খোলা আছে। হয় অজয়দার মতো দেশের ভালো করবার আশা ছেড়ে সরে পড়তে হবে, আর নইলে—উত্তমা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: নন্দর মতো গাছে গিয়ে উঠতে হবে।

হাসিতে যোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু রঞ্জন পারল না। একটা কঠিন ধিক্কারের ঘূর্ণির মতো হাসিটা আবর্তিত হয়ে গেল তার চারদিকে। শ্রেণীচ্যুতি শুধু মনেই নয়—দেহেও। রোদে-জলে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে—বরিন্দের মাঠে তালগাছের মতো মাথা উঁচু করে নিতে হবে বজ্রের আঘাত। লাল মাটির দেশের এই নিয়ম।

কিন্তু উত্তমা! মিতাকে জানে, বিপ্লবযুগে মৃতপাদিকে দেখেছে, মনে আছে সীতাকে, কাল রাতে ঝরেছে কালোশশীর অর্থহীন চোখের জল। কিন্তু এ একেবারে আলাদা। ইমোশন নেই, আদর্শ আছে; স্বপ্ন নেই—প্রত্যয় আছে। এর কাছে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে খতিয়ে দেখতে হয়, ভয় করে কখন কোন্ দুর্বলতার ওপর একটা খড়গের মতো আঘাত হেনে বসবে।

—যান, স্নান করুন—

—কিন্তু যদি জ্বর-টর—

—কিচ্ছু হবে না। আপনারও দেখছি অজয়দার বাতাস লেগেছে। আপনারা, শহরের লোকেরা সবাই বুঝি একরকম!

—না, অতটা অপবাদ দিয়ো না। অমন কাপুরুষ আমি নই।

—কাপুরুষ!—খানিকটা স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল উত্তমা, চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ম্লানভাবে অল্প একটু হাসল: কাপুরুষ না হলে গিয়ে একটা চিঠিও লিখতে পারল না!

সুরটা কেমন নতুন ঠেকল উত্তমার গলায়। যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, তার মুখের ওপর কোথা থেকে একটা রাঙা আলো পড়েছে এসে।

—দেখেছেন মজা! শহরের লোকই এইরকম! এত কথা সাজিয়ে সাজিয়ে বলেছিলেন—এত আবৃত্তি আর গান! কোনোদিন ভুলব না, এই গ্রাম, এই দিনগুলোকে চিরদিন মনে রাখব!—উত্তমা যেন নিজের সঙ্গে কথা কইতে লাগল: কিন্তু ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবারও মনে পড়ল না! সাধে কি শহরের লোকের ওপর অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা আসে?

একটা সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল রঞ্জনের মনে। অজয় পালিয়ে গিয়ে উত্তমাকে চিঠি লেখেনি। কিন্তু কী এমন অন্যায় হয়েছে—কোই-বা অস্বাভাবিক হয়েছে তাতে? তার জন্যে এত ক্ষোভ কেন উত্তমার? রঞ্জন একটা স্থিরদৃষ্টি মেলে ধরল উত্তমার দিকে। বার্নার্ড শ'র ক্যাণ্ডিডা? দুর্বলের ওপর শক্তিময়ীর আকর্ষণ? শেষ পর্যন্ত অজয়ই জিতে গেল না তো?

—উঠুন, আর বেলা করবেন না—

স্বর বদলে গেছে উত্তমার। হ্যাঁ, বোধ হয় ভালোই করেছে অজয়। এ আগুনকে বুকে বয়ে কতখানি পথ চলতে পারত? কতক্ষণই বা সহ্য করতে পারত সে?

—তাহলে নিতান্তই স্নান করব আজ?

—করবেন বই কি। আজ আপনার ছুটি নেই। দুপুরে অনেক লোক আসবে—তাদের অনেক কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। কুড়েমি করবার একদম সময় নেই—বুঝেছেন?

—বুঝেছি—হতাশ হয়ে বললে রঞ্জন। আর ঠিক সেই সময় ঝড়ের বেগে বাইরে থেকে নগেন এসে ঢুকল ঘরে। রঞ্জন চমকে উঠল।

—একেবারে ভগ্নদূতের অবস্থা দেখছি ডাক্তারের!

—ব্যাপার সাংঘাতিক! সাঁওতালদের সঙ্গে শাহু দাঙ্গা বাধিয়েছে পালনগরে।

—আবার সেই টুলকু মাঝিদের সঙ্গে?

—না, শ্রাদ্ধ গড়িয়েছে অনেকদূর। দাঙ্গা লেগেছে হিন্দু-মুসলমানে।

—হিন্দু-মুসলমানে !—রঞ্জন লাফিয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে। উত্তমা চমকে উঠে পাংশু মুখে চেয়ে রইল।

—একটা বাড়তি সাইকেল জোটাতে পার ডাক্তার ?

—এক্ষুনি।

রাতারাতি কালীর থানের পাশে কে কখন টিনের চালা তুলে ফেলল—টেরও পায়নি সাঁওতালরা। এমনিতেই কালীর থান গাঁ থেকে একটু দূরে—একটা অন্ধকার অশথগাছের তলায়। তার ওপর সারাদিনের খাটনির পরে যখন ওরা গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে—তখন রাতে ওদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা সাধারণ শব্দ-সাড়ার কাজ নয়।

ওদের খেয়াল হল সকালে। আজানের শব্দে।

কালীর থানের কাছে টিনের চালাঘরের সামনে আজান দিচ্ছেন হাজী সাহেব। চারপাশে দলে দলে জড়ো হয়েছে ভক্ত মুসলমানের দল—সেই আজানের আকর্ষণে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইল সাঁওতালরা। তরপর দু-চারজন করে এগোল সেদিকে।—কী এসব ?

জনতার একজন গম্ভীর গলায় জবাব দিলে—কী এসব, জানো না ? মসজিদে আজান দেওয়া হচ্ছে।

—মসজিদ ?

—হ্যাঁ, মসজিদ।

—কবে হল মসজিদ ?

—বরাবরের।

বরাবরের ! সাঁওতালেরা একবার এ ওর দিকে তাকালো।

—কই, আমরা তো কিছু জানতাম না।

—তোমাদের না জানলেও চলবে।

—আমাদের কালীর থানের গায়ে মসজিদ ! কোনোদিন তো কেউ নামাজ পড়েনি এখানে।

—আজ থেকে পড়বে। যাও, সরে পড় এখান থেকে—জবাব দিল ইসমাইল।

—তাহলে আমাদের কালীপূজার কী হবে ?—সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ সাঁওতাল জানতে চাইল : আমরা এখানে পূজা করতে পারব না, ঢোল বাজাতে পারব না—

—তোমাদের ওই ভুতুড়ে কালীকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিলের জলে ফেলে দাও। খোদাতালার মসজিদের কাছে ও সব বুত্-পরস্ত চলবে না আর !

বুড়োর চোখ দুটো ধিকিধিকি জ্বলে উঠল, কিন্তু সে আর কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

আস্তে আস্তে সরে এল গাঁয়ের দিকে। একশো লোক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে নামাজ পড়তে লাগল।

গাঁয়ে ফিরেই নাকাড়া বাজিয়ে দিল সর্দার মাঝি। পঞ্চায়েৎ। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে নাকাড়ার শব্দ দিকে দিকে রণ-আহ্বান ঘোষণা করে দিলে।

যারা নামাজ পড়ছিল, তারা নামাজ শেষ করেই উঠে গেল না। তারা জানে, এ শুধু আরম্ভ—শেষ নয়; এর পরেই আসবে সত্যিকারের কাজ। গোল হয়ে মসজিদের চারপাশে বসে রইল তারা।

ঘণ্টা দুই পরে ফিরল মোড়ল। একা নয়—সঙ্গে আরো জন-তিনেক অনুচর।

—এখানে কোনোদিন মসজিদ ছিল না—সর্দার মাঝি জানালো।

—বরাবর ছিল—তেজালো গলায় জবাব দিলে ইসমাইল।

—এইখানে মসজিদ থাকবে না—মোড়ল আবার বললে।

—আলবৎ থাকবে।

—তা হলে আমাদের পুজো হবে না!—মোড়ল ধীর কঠিন স্বরে বললে, আমরা এখানে থাকতে দেব না মসজিদ।

—কি করবে তবে?—বুক চিতিয়ে জানতে চাইল ইসমাইল। মাথার বিশৃঙ্খল চুল-গুলো দু পাশ দিয়ে বন্য আকারে নেমে এসেছে, হাতের মুঠি দুটো বদ্ধ হয়ে এসেছে আপনা থেকেই।

—ভেঙে দেব।—মোড়লের স্বর তেমনি শান্ত আর কঠিন।

—ভেঙে দেবে—মসজিদ ভেঙে দেবে!—আকাশ-ফাটানো চিৎকার করে উঠল ইসমাইল: ভাই সব, মোছলমানের বাচ্চা হয়েও এর পর চুপ করে আছ তোমরা?

—আল্লা-হো-আকবর—

একটা পৈশাচিক ধ্বনি উঠল করুণাময় ঈশ্বরের নাম নিয়ে। কোথা থেকে কে একখানা তরোয়াল ইসমাইলের হাতে বাগিয়ে দিলে—হিংস্র উল্লাসে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে উন্মত্তের মতো ইসমাইল বললে, চলে আয়—কে মসজিদ ভাঙবি চলে আয়—

এমন সময় পেছনের টিলার ওপর ড়ুম ড়ুম শব্দে নাকাড়া বেজে উঠল।

মন্ত্রবলে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে ষাট-সত্তরজন সাঁওতাল। কারো হাতে তীর-ধনুক, কারো বল্লম, কারো লাঠি। বুড়ো থেকে দশ বছরের বাচ্চা—বাদ নেই কেউ। এমন কি টুলকু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়াও আছে তাদের মধ্যে। পেছনে মেয়েরা—তাদের হাতেও তীর-ধনুক।

তার পর মুহূর্ত মাত্র।

একটা লাঠি উঠে এল মোড়লের মাথা লক্ষ্য করে—আর একটা টাঙ্গি চট করে রুখে

দিলে তাকে। মোড়ল তার সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে চলে এল নিজের দলের মধ্যে। আকাশে বাহু তুলে রক্তচোখে গর্জন করে বললে, মার—

ত্রিশজন সাঁওতাল হাঁটু গেড়ে বসে ধনুকে তীর জুড়ল। ধারালো ইস্পাতের ফলাগুলো রোদে ঝক ঝক করে উঠল।

কিন্তু তার আগেই বহু কণ্ঠের একটা চিৎকার উঠেছে দূরান্তে। মুহূর্তের জন্যে যুযুৎসু ছুটো দলই তাকাল সেই শব্দের দিকে। চিৎকার করতে করতে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে মাঠের ভেতর দিয়ে: থামাও—দাঙ্গা থামাও—

হাওয়ায় ঘাস দোলার আওয়াজ অবধি পাওয়া যায়, এমনি স্তব্ধতা। সন্দেহে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল ইসমাইল—মোড়ল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল। গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল ছুটো দলের মধ্যে।

যুযুৎসু ছুটি বাহিনীর মাঝখানটিতে—সংগ্রামক্ষেত্রে ছু হাত তুলে দাঁড়ালেন আলিমুদ্দিন মাস্টার। পেছনে পেছনে আরও জনত্রিশেক লোক। কিছু ধাওয়া—কিছু বাদিয়া হোসেনের দল।

আলিমুদ্দিন রুদ্ধশ্বাসে বললেন, মিথ্যে খুন-খারাপীর মধ্যে কেন যাচ্ছ ভাই সব? মাতব্বরদের নিয়ে বৈঠক হোক—মসজিদ এখানে আদৌ ছিল কিনা সেটা ঠিক হোক—তার পরেই যা হয় হবে।

ইসমাইলের চোখ ছুটো ক্রোধের জ্বালায় ঠিকরে পড়তে লাগল।

—আলবৎ ছিল মসজিদ, হাজার বার ছিল। তুমি কাফের—এ সব ব্যাপারে কেন মাথা গলাতে এসেছ মাস্টার?

কিন্তু ইসমাইলের কথার শেষটা কেউ শুনতে পেল না। তার আগেই ধাওয়া আর হোসেনের দল সমস্বরে গর্জন তুলল: কাফের! মুখ সামাল! ইসমাইল সাহেব!

ইসমাইল থর থর করে কাঁপতে লাগল: নিশ্চয় কাফের!

হোসেন বললে, ইসমাইল সাহেব, এ শাহের বৈঠকখানা নয়। ইজ্জৎ বাঁচাতে হলে জবান সামলাও। নইলে এখান থেকে মাথা নিয়ে ফিরতে পারবে না।

ইসমাইল একবার তাকাল চারদিকে। তার অপমানে তার দলবলের মধ্যে তো চাঞ্চল্য জেগে ওঠেনি, এতগুলো মুখ তো প্রতিহিংসায় কালো হয়ে যায়নি। হঠাৎ মনে হল কোনো শক্ত মাটির ওপরে পা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে নেই—সেখানেও টলমল করছে ভাঙন-ভাঙা। আরো অনুভব করল—সকলের দৃষ্টি একান্তভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে আলিমুদ্দিনের প্রতিই—তার দিকে নয়।

অবস্থাটা অনুমান করে হাজী সাহেবই এগিয়ে এলেন সম্মুখে।

—কী হচ্ছে এসব? মোছলমানে মোছলমানে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবার কি মানে হয়?

মাস্টার সাহেব কি বলছেন—শোনা যাক।

—মাস্টার—আবার ইসমাইল বলতে গেল।

—আপনি চুপ করুন—চিৎকার উঠল জনতার মধ্য থেকে : আমরা মাস্টার সাহেবের কথাই শুনতে চাই।

পায়ের তলায় যে ভাঙা তটের শিথিল ভিত্তি অনুভব করছিল, এবার যেন সেটা সুদ্ধ নদীর জলে ধ্বসে পড়ল ইসমাইল। শাহের বৈঠকখানা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া যায় মাস্টারকে, বরখাস্ত করা যায় চাকরি থেকে, কিন্তু—

ওই কিন্তুই সর্বনেশে! মাটির গভীরে যেখানে আলিমুদ্দিনের অলক্ষ্য শিকড় গিয়ে পৌঁছেছে, সেখান থেকে কে তাকে উৎপাটন করবে?

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ইসমাইল দাঁড়িয়ে রইল।

আলিমুদ্দিন ফিরে তাকালেন সাঁওতালদের দিকে।

—এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো তোমরা। মিছিমিছি তোমাদের ধর্মে-কর্মে কেউ ব্যাঘাত করবে না।

তীরগতিতে এই সময় আরো দুটো সাইকেল এসে পৌঁছুল। নগেন আর রঞ্জন। কলস্বরে সম্বর্ধনা করে উঠল সাঁওতালরা। এতক্ষণে যেন নিজেদের লোক পেয়েছে নির্ভর করবার মতো।

আলিমুদ্দিন হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

—আসুন আসুন। বড় ভালো হয়েছে। সকলে মিলেই একটা ফয়সালা করে ফেলা যাক।

কালো মুখে, ক্ষিপ্ত চোখের অগ্নিবর্ষণ করতে করতে ইসমাইল ক্রমশ ভিড়ের পেছন দিকে হটে যেতে লাগল। অবিলম্বে খবর দিতে হবে শাহুকে—অন্য উপায় দেখতে হবে এইবার।

আলিমুদ্দিন ততক্ষণে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন।

—ভাই সব, আশেপাশের গাঁয়ে অনেক প্রবীণ মাতব্বর আছেন। তাঁরাই ভালো জানেন—এখানে কোনোদিন মসজিদ ছিল কিনা, অথবা কবে ছিল। যদি থাকে—

হাজী সাহেবের একটা টাট্টু ঘোড়া বাঁধা ছিল হিজল গাছের সঙ্গে। ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়াটা খুলে নিল ইসমাইল—তারপর দ্রুতবেগে সেটাকে হাঁকিয়ে দিলে পাল নগরের উদ্দেশে।

বাইশ

ঝড়ের মেঘটা থমথমে হয়ে উঠেও দমকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

বেশি কিছু বক্তৃতা হল না—দরকারও ছিল না তার। সাদা-সিধে সহজ আলোচনা শান্তভাবেই শুনে গেল দু পক্ষ। সত্যিই তো, নিছক একটা ঝোঁকের মাথায় এমন ভাবে কি খুনখারাপী করবার মানে হয় কিছু? জান জিনিসটা নিতে এক লহমাও সময় লাগে না, কিন্তু হাজার বছর চেষ্টা করলেও যে আর তা ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, যেন খেয়াল থাকে কথাটা।

তাহলে রফা?

দশখানা গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বরদের ডাকা হোক, তাঁদের সাবুদ করা হোক, প্রাচীন যাঁরা আছেন আশেপাশে। পরচা দেখা হোক, দেখা হোক নকশা। মসজিদ যদি থাকে এখানে, আবার গড়ে উঠবে। পীরের দরগা নাকি ছিল, আবার নতুন করে তাহলে চেরাগ জ্বলবে তাঁর। তখন যদি কেউ বাধা দেয়, তাহলে অনেক সুযোগ মিলবে লাঠির জোর পরখ করবার। আর যদি না থাকে—বেশ তো, চুকে-বুকেই গেল সব।

সম্মতির মাথা নাড়ল দু পক্ষই।

কৃতজ্ঞচিত্তে রঞ্জন বলেছিল—মাস্টার সাহেব, সময়মতো আপনি এসে পড়েছিলেন বলেই রুখে গেল দাঙ্গাটা।

আলিমুদ্দিন হেসেছিলেন—অত্যন্ত ক্লান্ত, বিমর্ষ হাসি।

—কিন্তু সত্যিই যদি এখানে মসজিদ থেকে থাকে, তাহলে এর পরে হয়ত আমাকেই দ'ঙ্গায় নামতে হবে। পীরের জায়গা, খোদার জমিন আমরা এমনি ছাড়ব না।

—তখনকার ভার আমরা নিচ্ছি—নগেন জবাব দিয়েছিল: কিন্তু আজ আপনি যা করলেন এটাকে এমনি অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে—

—অবিশ্বাস্য! কেন?—মুহূর্তে ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল মাস্টারের চোখ: আপনাদের কি ধারণা যে দাঙ্গা বাধানোটাই মুসলমানের কাজ?

—না, তা বলছি না—নগেন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল: মানে, আমার বলবার কথা ছিল—

আলিমুদ্দিন তিক্ত স্বরে বলেছিলেন, জানি। আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের কি অভিযোগ সব আমার জানা আছে। আপনারা বলেন, আমরা অসহিষ্ণু, অন্য ধর্মকে আমরা সহ্য করতে পারি না। তা নয়। আমাদের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই আমরা তার মর্যাদা রাখবার জন্যে সহজে প্রাণ দিতে পারি। ইসলামের সত্য-ই তো তাই। যেচে আমরা

কাউকে ঘা দিতে চাই না, কিন্তু কেউ আমাদের উপর চড়াও হলে তাকেও আমরা ক্ষমা করব না।—আলিমুদ্দিনের চোখ দুটো আচমকা এক ঝলক আগুন বৃষ্টি করেছিল : দিনের পর দিন আমাদের তুচ্ছ করেননি আপনারা? দূরে সরিয়ে দেননি যবন বলে?—এক বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যার অপমানের ক্ষত আকস্মিকভাবে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল আলিমুদ্দিনের বুকের ভেতর : আপন বলে যতবার আপনাদের দিকে আমরা হাত বাড়াতে গেছি, ততবার ঘৃণা করে সে হাত ঠেলে দেয়নি আপনাদের সমাজ?

কি থেকে কথাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছুল! কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আলিমুদ্দিন তিক্ততম স্বরে বলেছিলেন, তাই তো পাকিস্তান চাই! সমান শক্তি না নিয়ে দাঁড়ালে আমাদের কোনোদিন শ্রদ্ধা করতে শিখবেন না আপনারা। সে শিক্ষা আপনাদের দরকার।

রঞ্জন বলেছিল, ঠিক। আপনাদের দাবিকে আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ভুল বোঝাটা দুপক্ষেই হয়েছে—এক হাতে তালি বাজেনি। ওর মূলটা ইতিহাসের আড়ালে। সে কথা যাক মাস্টার সাহেব। আপনি একদিন সময় করে আসুন না জয়গড়ে। অনেক কিছু আলোচনা আছে আপনার সঙ্গে।

—কি আলোচনা?

—আপনি একটা কিছু গড়তে চাইছেন—আমরাও চাইছি। শেষ পর্যন্ত যাই হোক, হয়ত অনেক দূর পর্যন্ত একসঙ্গে এগোতে পারি আমরা। সেই সুযোগটাই বা ছাড়ব কেন?

—অনেক দূর পর্যন্ত একসঙ্গে এগোব!—চোখ বুজে কিছুক্ষণ যেন কি চিন্তা করে নিয়েছিলেন আলিমুদ্দিন : সে কথা মন্দ বলেননি। কিছুদিন না হয় এক টার্গেটেই প্র্যাকটিস করা যাক। তারপর মুখোমুখি দাঁড়ানো যাবে রাইফেল নিয়ে।

রঞ্জন বলেছিল, মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই না আমরা—পাশাপাশি পা ফেলে এগোতে চাই সম্মুখের দিকে। আজ আপনাদের না পাই, দুদিন পরে পাবই।

—দুরাশা করছেন। তেলে-জলে মিশ খায় না। খাবেও না কোনোদিন।

রঞ্জন হেসে বলেছিল, শুধু একটি কথায় আমার প্রতিবাদ আছে মাস্টার সাহেব। তেল-জল কথাটা আমি মানি না। দুটোই জল—একটা জমজমের, আর একটা গঙ্গার। শুধু মাঝখানে আরব সাগরের ফারাক। ওটুকু পার হতে পারলেই দুটো জল এসে একসঙ্গে মিশবে।

আলিমুদ্দিন ব্যঙ্গভরে বলেছিলেন, কিন্তু এই আটশো বছরেও কেউ তা পারেনি।

—আটশো বছর ধরে যা পারা যায়নি, তা আজও পারা যাবে না এটা কোনো যুক্তিই নয় মাস্টার সাহেব। মানুষ পৃথিবীতে পা দিয়েই আকাশে উড়তে চেয়েছে কিন্তু এরোপ্লেন গড়তে তার সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর। সেই জন্যেই আমরা আশাবাদী। বলুন, কবে আসছেন জয়গড়ে?

নগেনের ঘরে বসে আরো জোরালো, আরো তীব্র কণ্ঠে আলিমুদ্দিন বললেন, পাকিস্তান আমাদের চাই। কিন্তু ওই শাহের মতো লোকের জন্যে নয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, পণ্ডিত হোক আর মৌলবীই হোক—শয়তান আর অত্যাচারীর জায়গা নয় পাকিস্তান। আল্লার রসুলের নাম নিয়ে আমরা গড়ব আজাদী দুনিয়া—সমস্ত শঠ-বঞ্চকদের নিকাশ করব সেখান থেকে। গরীবের রক্ত যারা শুষে খায়, তাদের টুঁটি টিপে ধরব!—বলতে বলতে মাস্টারের হাতের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে এল—মনে হল যেন ফতে শা পাঠানের গলাটাকেই পিষে ধরছেন তিনি।

নগেন বললে, সে পাকিস্তানে আমরা সবাই পাকিস্তানী হতে রাজী আছি মাস্টার সাহেব। অত্যাচারী হিন্দুস্থান আমাদেরও দুশমন। তাই সকলের আগে গরীবকে আমরা একসঙ্গে মেলাতে চাই, কোমর বেঁধে দাঁড়াতে চাই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আমাদের কৃষাণ সমিতির কথা নিশ্চয় শুনেছেন আপনি।

আলিমুদ্দিন বললেন, শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি না।

—কেন করেন না?

—ও-ও আপনাদের একটা চক্রান্ত। মুসলমানের দল ভাঙানোর ফন্দি।

রঞ্জনের মুখ লাল হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে: একটু অবিচার হচ্ছে না মাস্টার সাহেব?

—অবিচার?—ঘৃণাভরে আলিমুদ্দিন বললেন, কংগ্রেসে একদিন আমিও ছিলাম—স্বাধীনতার জন্যে জেল আমিও খেটেছি, আমার মাথাতেও পুলিসের লাঠি পড়েছে অনেক-বার। আমি জানি, কিসে কি হয়। ভালো ভালো কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু মুসলমানের দাবির প্রশ্ন যখন উঠেছে, তখনি কেমন করে তা দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে কথাও আমি ভুলিনি।

নিজেকে সামলে নিয়ে রঞ্জন বললে, মতভেদ রইল। তবুও একটা জিনিস বিশ্বাস করুন মাস্টার সাহেব, দিন বদলায়।

—হয়ত বদলায়। কিন্তু এখনো তার প্রমাণ পাইনি।

—প্রমাণ তো চাননি!—রঞ্জন হাসল: শুধু অভিমান করে দূরে সরেই দাঁড়িয়ে আছেন। এসে একবার দেখুন না আমাদের ভেতর।

—এসে কি দেখব?—উদ্ধত স্বরে আলিমুদ্দিন বললেন, চাপা পড়ে যাব আপনাদের তলায়।

নগেন বললে, চাপা পড়বেন কেন? আমাদের এখানকার কৃষাণ সমিতিতে হিন্দুর চাইতে মুসলমানই বেশি। তারা নিশ্চয় আপনার পেছনেই থাকবে।

আলিমুদ্দিন চুপ করলেন। কিছু একটা ভেবে স্থির করে নিতে চাইলেন নিজের মধ্যে। তারপর মৃদু হাসলেন: যদি সেই সুযোগে আপনাদের কৃষাণ সমিতিকে আমাদের লীগের

প্ল্যাটফর্ম করে নিই ?

—নিন না করে!—রঞ্জনও হাসল : গরীবের জন্তে যে লড়বে সে-ই আমাদের দল। সে নামে মুসলিম লীগ হোক, কৃষাণ সমিতি হোক, হিন্দু মহাসভা হোক—কিছু আসে যায় না।

আবার চুপ করে রইলেন আলিমুদ্দিন। চিন্তার ভ্রূকুটি ফুটছে কপালে, অর্ধমনস্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরের ছায়া-রৌদ্র-চঞ্চল মহুয়া বনের দিকে—ঝলক-লাগা টাঙন নদীর নীল ধারায়। তারপর ধীরে ধীরে মুক্তি দিলেন বুক-চাপা একটা দীর্ঘশ্বাসকে।

—নাঃ, লোভ দেখাচ্ছেন আপনারা। ও সবের মধ্যে আর আমি নেই। এর ফলে শুধু আমার পাকিস্তানের লক্ষ্য থেকেই আমি ভ্রষ্ট হব। সোস্যালিজমের বুলি কপচে মুসলিম লীগকে স্যাবোটেজ করতে চান আপনারা।

রঞ্জন হাসল : কিন্তু আপনি যা চাইছেন, তাও তো সোস্যালিজম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

—ইসলামী সোস্যালিজম। শরীয়তী আইনে সে চলবে। ধর্মকে সামনে রেখে সে এগিয়ে যাবে। আপনাদের মত ধর্ম মানে না, মুসলমানের সঙ্গে রফা হতে পারে না আপনাদের।

—ধর্ম না মানলেও আমাদের মত কারোর ধর্মে কখনো হাত দেবে না মাস্টার সাহেব। ধর্মটা ব্যক্তিগত—

বিরক্ত হয়ে আলিমুদ্দিন বললেন, আর আমাদের ধর্ম সমাজগত। এ সব বলে ভোলাতে পারবেন না। আমাদের লক্ষ্য সোজা—যা চাই, তাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি। যদি মেনে নিতে পারেন, আসুন। নইলে এ নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। আজ বরং আমি উঠি—আলিমুদ্দিন চৌকি ছেড়ে দাঁড়ালেন।

—সে কি! এখনি উঠবেন কেন?—নগেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

—বাঃ, ফিরতে হবে না? ঢের বেলা হয়ে গেছে।

—তা হোক না। খেয়ে যাবেন এখান থেকে।

—খেয়ে যাব!—আলিমুদ্দিন যেন আঁতকে উঠলেন।

—সেই ব্যবস্থাই তো করা হয়েছে। এতদূর থেকে এসে না খেয়ে ফিরে যাবেন, তা কি হয়?

মুখের চেহারাটা শক্ত আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের : নাঃ, থাক।

—কেন? আপনি কি হিন্দুর বাড়িতে খান না?—রঞ্জন জানতে চাইল।

আলিমুদ্দিন খরদৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জনের দিকে। ক্ষতটায় আবার নিষ্ঠুর আঁচড় পড়ছে একটা। বিতৃষ্ণাভরা অদ্ভুত গলায় বললেন, খেতাম এককালে। কিন্তু এখন আর খাই

না। দেখলাম যাদের সঙ্গে জাত মেলে না, তাদের সঙ্গে পাতও মিলবে না কোনোদিন।

নগেন শশব্যস্তে বললে, এখানে ও ভয় রাখবেন না। আমাদের কোনো জাতই নেই।

—আপনারা মুসলমানের রান্না খান?

নগেন উত্তেজিত হয়ে বললে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। অমন মোগলাই রান্না থেকেই যদি বঞ্চিত হলাম, তাহলে আর বেঁচে থেকে সুখ কি?

নিঃশব্দে আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন। আস্তে আস্তে বললেন—তবে খাব। কিন্তু আজ নয়। অনেক কাজ আছে—এক্ষুণি আমাকে বেরুতে হবে।

—তবে এক মিনিট দাঁড়ান। আপনার চার্জ এখন আর আমাদের ওপর নেই—ও ভারটা আমার বোন নিয়েছে। তাকেই ডাকি।—নগেন স্বর চড়িয়ে ডাকল, উত্তমা—

—আসছি—উত্তমার সাড়া এল।

—আবার কেন—দ্বিধাভরে বলতে গিয়েও থেমে গেলেন আলিমুদ্দিন। দোরগোড়ায় উত্তমা এসে দাঁড়িয়েছে। তেমনি চিরাচরিত অভ্যস্ত তার চেহারা। গাছকোমর বাঁধা, গালে-কপালে স্বেদবিন্দু।

নগেন বললে, এই স্থাখ, মাস্টার সাহেব না খেয়ে পালাচ্ছেন।

—সে কি কথা? এত কষ্ট করে রাঁধছি, পালালেই হল!

সংস্কারবশেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন আলিমুদ্দিন। এই মেয়েটির কাছে রূঢ় হয়ে উঠতে তাঁর বাধল। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন—অনেক কাজ আছে, আজ থাক।

—আমার হয়ে গেছে, বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না দাদা।

দাদা! শিউরে উঠলেন আলিমুদ্দিন—বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকালেন উত্তমার দিকে। কল্যাণী! উত্তরবঙ্গের এক মফস্বল শহরে বর্ষার রাত্রে যে চিরদিনের মতো কালো অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল, আজ কোথা থেকে সে এমন করে প্রাণ পেয়ে উঠল। কোন্ মৃত্যুর আড়াল থেকে আলিমুদ্দিন শুনলেন এই প্রেতকণ্ঠ! একটা তিক্ত-যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে উঠল বুকের ভেতর।

—দাদা! মৃত্যুর ওপার থেকে আবার ভেসে এল কল্যাণীর প্রেতস্বর।—আধঘণ্টার মধ্যেই খেতে দেব।

আলিমুদ্দিন তেমনি তাকিয়ে রইলেন। উত্তমার মুখটা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আর ধীরে ধীরে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। আর সেই শূন্যতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে কতগুলো দিন—কতগুলো বৎসর—হাওয়ায় জ্যোতির্ময় পতঙ্গের মতো উড়ে চলেছে ঝাঁক বেঁধে। তারপর সেগুলো যখন মিলিয়ে গেল, তখন দেখা গেল—যেন পাথরের বেদীর ওপর হিন্দুর একটা মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সে মূর্তি কল্যাণীর!

কিন্তু আলিমুদ্দিন তো পৌত্তলিক নন। নিষ্প্রাণ প্রতিমা শুধু নিতেই জানে, দেবার

শক্তি কোথায় তার! একবার অজ্ঞানের অর্ঘ্য সাজিয়েছিলেন, তার দাম তো শোধ করে দিতে হয়েছে কড়ায় গণ্ডায়! আবার—আবার কি সে ভুল তিনি করবেন? সেদিনের সেই অসহ্য যন্ত্রণার পরেও কি যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি তাঁর? না, নিজেকে সংযত করতে হবে এবার।

কিন্তু পারলেন না।

উত্তমা বললে, আর একটু বসুন দাদা, খুব শীগগিরই আপনাকে ছেড়ে দেব।

যা বলা উচিত ছিল, তার উল্টোটাই বললেন আলিমুদ্দিন। বহুদিন আগে যে কংগ্রেস-কর্মীর কবরের ওপর তিনি শেষ মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজ তাঁর গলার ভেতর থেকে তার আত্মাটাই কথা কয়ে উঠল।

—আচ্ছা, বেশ!—যেন ঘোরের মধ্যে থেকে জবাব দিলেন।

যেমন সহজে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল উত্তমা, তেমনি সহজেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু কি যেন এক সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় ভেসে চললেন আলিমুদ্দিন। এ হওয়া উচিত ছিল না, কোনো প্রয়োজন ছিল না এর। যে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা নিয়ে একদিন তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন, কখনো কি জানতেন যে একটা সামান্য আকর্ষণেই আবার যেখানকার সেইখানেই ফিরে আসবেন তিনি?

কখনো কি কল্পনা করেছিলেন তাঁর মন এত দুর্বল, এমন হীনশক্তি? একটা অন্ধ ব্যর্থ আক্রোশে নিজেকেই তাঁর আঘাত করতে ইচ্ছে হল। কবে কোন্ কালো সমুদ্রের ক্ষুব্ধ আক্রোশ পার হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটা শিলাখণ্ডের ওপর—চক্ষের পলকে সেখান থেকে অন্তহীন তরঙ্গের মধ্যে আছড়ে পড়লেন তিনি! এতক্ষণ পরে কানে এল, নগেন হাসছে।

—দেখলেন তো! ইচ্ছে করলেই এত সহজে পালানো যায় না!

—তাই দেখছি!—ক্লান্ত পীড়িত স্বরে যেন স্বগতোক্তি করলেন মাস্টার।

বাইরের মহুয়া বনে ঝলক-লাগা রোদ। টাঙন নদীর নীল জল শিথিল বেদনার মতো বয়ে চলেছে। তার-বাঁধা দুপুরের ভেতর থেকে ঝঙ্কার তুলছে হট্টিটির ডাক! ঠাণ্ডা ছায়া দিয়ে ছাওয়া এই ঘরখানা, খাটের ওপর শীতলপাটি পাতা। একটু আগেই দোর-গোড়া থেকে যে সরে গেল—সে তো সেই স্বপ্নে দেখা কল্যাণী! আজ মনে হল—অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মনে হল: পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত দীর্ঘ, কত অর্থহীন পথ যেন তিনি পেরিয়ে এসেছেন! যেন মরীচিকার হাতছানিতে ছুটে চলেছেন মরু-বালুকার এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে। কি চেয়েছেন নিজেও স্পষ্ট করে জানেন না, কি পাবেন কোনো সুস্পষ্ট রূপ নেই তারও! তার চেয়ে এখানকার এই ছায়ায়—কল্যাণীর এই ছায়ায়—তিনি কি কোনো স্বপ্নহীন নীরন্ধ্র তন্দ্রার মধ্যে তলিয়ে যেতে পারেন না? হারিয়ে যেতে পারেন

না কোনো নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে ?

—কি ভাবছেন মাস্টার সাহেব ?—রঞ্জনের প্রশ্ন।

আবিষ্ট চোখ তুলে ধরলেন মাস্টার।

নগেন বিমর্ষ গলায় বললে, অবশ্য আপনার যদি খুব বেশি অসুবিধে থাকে, তবে পীড়াপীড়ি করব না। যদি অস্বস্তি বোধ করেন—

—অস্বস্তি ? নাঃ—একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিলেন আলিমুদ্দিন : অন্য কথা ভাবছিলাম। সে যাক। হ্যাঁ, এখন আমাদের পুরনো আলোচনাটাই চলুক—জোর করে সব কিছু ভুলে যাওয়ার একটা প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করে মাস্টার বললেন, খানিক দূর পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে যেতে পারি—এই কথাই হচ্ছিল। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত ? আর আপনাদের প্রোগ্রামটাই বা কি ?

রঞ্জন কি বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা লোক। তারপর আলিমুদ্দিনকে দেখেই চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ছাঁটা ছাঁটা চুল, ষণ্ডা চেহারা—একটা বন্য মহিষের মতো দেখতে। দুটো রক্তমাখা চোখে আগুন বর্ষণ করতে করতে সে হিংস্র জন্তুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

নগেন চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—কী—কী হয়েছে যমুনা ?

যমুনা আহীর তবু জবাব দিল না। প্রকাণ্ড চওড়া বুকটা প্রচণ্ড নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শুধু তালে তালে ওঠা-পড়া করতে লাগল।

—কোনো ভয় নেই, বলো। ইনি আমাদের বন্ধুলোক।

যমুনা কেঁপে উঠল একবার। তারপর একটা অদ্ভুত বিকৃত স্বর বেরুল তার গলা দিয়ে —হামি ফেরারী—থানায় যেতে পারেনি। কিন্তু ইস্ দফা হাম খুন করেঙ্গা, জান লে লেঙ্গা।

—কার জান নেবে ? কী হয়েছে ?—নগেন আকুল হয়ে উঠল : খুলে বলো সব কথা।

সেই অদ্ভুত বিকৃত স্বরে যমুনা বললে, শাহের লোক লাঠিয়াল পাঠিয়ে মাঠ থেকে ঝুমরিকে ধরে নিয়ে গেছে।

তেইশ

—লীগ-ফীগের কথা ছাড়ুন—পরম পরিতৃপ্তিতে গড়গড়ায় টান দিলেন ফতে শা পাঠান। তারপর ধীরে ধীরে নাসারন্ধ্রে ধোঁয়াটাকে মুক্তি দিয়ে আধবোজা চোখ দুটোকে সম্পূর্ণ করে মেলে ধরলেন : কি করা যায় তাই বলুন এখন।

আজ বিকেলে আফিঙের মৌতাত করেছেন কি না ভৈরবনারায়ণ, বলা শক্ত। আশ্চর্য জাগ্রত আর সজীব তাঁর চোখ। এই সময়ে ভৈরবনারায়ণকে দেখলে মত বদলাত রঞ্জন। যে মুখখানাকে সে প্রাইজ বুলের সঙ্গে তুলনা করেছিল, সে মুখ দেখলে এখন তার অন্য কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত গ্রীক পুরাণের গল্প—ভেসে উঠত লুব্ধ বীভৎস কামনায় ইয়োরোপের দিকে ছুটে আসা জুপিটারের বৃষভমূর্তি!

ভৈরবনারায়ণ বললেন, গণ্ডগোল আপনারাই তো বাধিয়েছেন। কি কতগুলো লীগ আর ন্যাশানাল গার্ড গড়েছেন, লোক ক্ষ্যাপাচ্ছেন—

ইসমাইল ফোঁস করে উঠল: লোক আমরা ক্ষ্যাপাচ্ছি না। এতকাল ধরে আপনারা সব ভোগ-দখল করে এসেছেন, এবার আমরা আমাদের হিসেব মিটিয়ে নিতে চাইছি।

ভৈরবনারায়ণ হাসলেন: আলাদাই যদি হয়ে যেতে চান, তাহলে আর একসঙ্গে কি করে কাজ করা যায় বলুন। আমরা উত্তরে গেলে আপনারা যাবেন দক্ষিণে; আমরা পুবে যেতে চাইলে, আপনারা পশ্চিমে—

ইসমাইল কি বলতে চাইছিল, ফতে শা থামিয়ে দিলেন।

—ওসব পরের কথা পরে। সে ফয়সালা দুদিন দেরিতে হলেও চলবে। কিন্তু অবস্থা বুঝতে পারছেন এখন? আমার প্রজারা বাগ মানছে না। ওই চাষী প্রজা—ওই সাঁওতালের দল, সব জোট বাঁধছে। ওদের পেছনে আছে কতগুলো হারামী মুসলমান, আলিমুদ্দিন মাস্টারটা হয়েছে তাদের পাণ্ডা। আপনিই বা কোন্ সুখে চোখ বুজে বসে আছেন কুমার বাহাদুর? আপনার জয়গড় মহল বশ মানছে না, কালাপুখরির তুরীরা ভাঁড়ার মুখ বাঁধবার জন্যে কোমর বাঁধছে। দেখছেন না, আপনিও ডুবছেন, আমিও ডুবছি!

ভৈরবনারায়ণের ভ্রূ দুটো একসঙ্গে জুড়ে এল।

—কিন্তু এর শেষ কোথায় সেটাই বুঝতে পারছি না!—চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কুমার বাহাদুর: সে যাক, পরের ব্যাপার পরেই হবে। আপাতত আপনার কথাটা আমার মনে ধরেছে। আপনার যেমন মাস্টার জুটেছে, আমিও তেমনি এক ঠাকুর-বাবু পুষেছিলাম। চোখে চোখেই রেখেছিলাম, কিন্তু সরে পড়েছে আমার ওখান থেকে। খবর পেয়েছি গিয়ে উঠেছে হতভাগা নগেন ডাক্তারের ওখানে। তুরীদের নাচাচ্ছে ওরাই। আপনি নতুন কিছু জানেন নাকি সরকার মশাই?

নগেনের জ্যাঠা মৃত্যুঞ্জয় সরকার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। কুমার বাহাদুরের প্রশ্নে উৎসাহে নড়ে উঠলেন তিনি।

—হ্যাঁ, কৃষাণ সমিতি হচ্ছে, গরম গরম বক্তৃতাও চলেছে সেখানে।

—আপনি তো জয়গড়ের মাথা—ফতে শা প্রশ্ন করলেন, ইউনিয়ন বোর্ডের

প্রেসিডেন্টও বটেন। ঠেকাতে পারেন না লোকগুলোকে ?

মৃত্যুঞ্জয় মাথা নাড়লেন।—আমি অহিংসার সেবক—গান্ধীজীর শিষ্য। বলেছিলাম, এসব করে কি হবে ? লোকের মনে হিংসা আর লোভ বাড়িয়ে কি লাভ ? এর ফল হবে সর্বনেশে। কিন্তু মাথায় দুর্বুদ্ধি ঢুকেছে, সবসুদ্ধ মরবে শেষ পর্যন্ত। শুনল না। তা অহিংসার সেবক হিসেবে আমার কর্তব্য আমি করেছি—সবই জানাচ্ছি কুমার বাহাদুরকে।

—হ্যাঁ, ওঁর কাছ থেকেই সব খবর আমি পাচ্ছি। ভেবেছিলাম, এক ফাঁকে সব কটাকে মাটিতে দলে দেব !—ভৈরবনারায়ণ হিংস্র হাসি হাসলেন : ততদিন প্রশ্রয় নিক খানিকটা। এখন দেখছি শ্রাদ্ধ অনেক দূর পর্যন্ত গড়াচ্ছে। আর কি আস্পর্ধা বেড়েছে ওই আহীরগুলোর ! জটাধর সিংকে খুন করেছে। দারোগা ধরতে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাস্তানাবুদ করে হাওয়া হয়ে গেছে পালের গোদা যমুনা আহীর।

—সেটাও বোধ হয় নগেনের ওখানে গিয়ে জুটেছে—জুড়ে দিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

—তাই নাকি ?—ভৈরবনারায়ণের বৃষভমুখে বুল ফাইটিঙের জিঘাংসা ফুটে বেরুল : ওটাই তাহলে ঘাঁটি। একটা কাজ করতে পারেন সরকার মশাই ? লাল ঘোড়া ছোটাতে পারেন নগেন ডাক্তারের আস্তানায় ?

—অনুমতি হলেই পারি—মৃত্যুঞ্জয় হাসলেন : আমি অহিংসার সেবক, তবু দরকার হলে অহিংসার জন্যে হিংসাকেও বাদ দেওয়া চলে না।

—আপনাদের গান্ধী সে কথা বলেছেন নাকি ? তাঁর ভালো-মন্দ যাই থাক, তাঁকে অন্তত মহাত্মা বলেই তো জানতাম আমরা !—টিপ্পনী কাটল ইসমাইল।

—বাজে কথা থাক।—শাহু ধমক দিলেন : এখন শুনুন। পাল নগরের ব্যাপারটা পণ্ড হল আপনার ঠাকুরবাবু আর আমার মাস্টারের দৌলতে। কিন্তু হাল আমি ছাড়িনি। আর একটা চেষ্টা করেছি যমুনা আহীরের মেয়েটাকে চুরি করিয়ে—

—তাই নাকি ?—ভৈরবনারায়ণ চমকে উঠলেন : আমার এলাকা থেকে—

—মিথ্যে ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবেন না কুমার বাহাদুর। দুজনের এলাকাই এখন যায় যায়—এ সমস্ত ছোট-বড় মান-অভিমানের কথা থাক। সাঁওতালদের দিয়ে হল না, এবার যদি আহীরদের সঙ্গে—

—কাঁচা কাজ হয়েছে চাচা, একদম কাঁচা কাজ ! উল্টো ফল হয়েছে। এতকাল আহীররা কারো সাতে-পাঁচে ছিল না, এবার ওরাও তেতে উঠেছে। সাঁওতালদের নিয়ে এর মধ্যেই বৈঠক করেছে নিজেদের ভেতর।—ইসমাইল অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো : চারদিকে এমন একটা বেড়াজাল তৈরি হয়েছে যে এখন কেটে বেরুনোই মুশকিল। মাঝখান থেকে লীগের কাজকর্মই পণ্ড !

—রাখো তোমার লীগ !—শাহু সজোরে কয়াশে একটা থাবড়া মারলেন : যত জঞ্জাল

সব ! ভালো করতে গিয়ে একরাশ বিপত্তি বাধল। জুটল ওই আলিমুদ্দিন মাস্টার—এখন গোড়াসুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে।

—সব ঠাণ্ডা হবে, কিছু ভাববেন না—ভৈরবনারায়ণ চিন্তিত মুখে বললেন, এখন একটা পথ বাতলান। দারোগাকে বলে কয়েকটা পাণ্ডাকে ধরপাকড় করিয়ে—

ইসমাইল বললে, উহুঁ, খুব সুবিধে হবে না। এক যমুনা আহীরকে নাড়তে গিয়ে বেজায় ঘাবড়ে গেছে দারোগা। বলছে, এসব ক্রিমিন্যাল এলাকায় কাজ করা—সাতজন ভুঁড়িওলা কনস্টেবল, আর পাঁচজন হাবা চৌকিদার নিয়ে সম্ভব নয়। মাঝ থেকে বেঘোরে প্রাণ যাবে। শহরে নাকি চিঠি দিয়েছে স্পেশাল পুলিস ফোর্সের জন্যে। যদি না আসে, এরিয়া থেকে ট্রান্সফার নেবে সে।

—যা করবার নিজেদেরই করতে হবে—শাহু বললেন, ওসব হাতটান-মার্কা ছারপোকা-মারা দারোগার কর্ম নয়। আসুন একজোট হই আমরা। নিজেদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা, লাঠালাঠি, হিন্দু-মুসলমান—এগুলো এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় যে আপনার আমার কারুরই তা গায়ে লাগবে। কিন্তু প্রজা ক্ষেপবার ফল বুঝতে পারছেন ? দুদিনে ওলট-পালট করে দেবে। তখন হিন্দুও থাকবে না, মুসলমানও থাকবে না—সব শালা এক হয়ে জমিদারের ঘাড়ে লাঠি ঝাড়তে চাইবে। ওদিকে আপনার ঠাকুরবাবু, এদিকে আমার মাস্টার, মানিকজোড় মিললে আর—

—মিলেছে।—কথার মাঝখানে থাবা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বললেন, মিলেছে। আলিমুদ্দিন সাহেব কাল নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছেন নগেনের ওখানে—

কথাটা সভার ওপর বজ্রপাতের মতো এসে পড়ল।

ঘরসুদ্ধ সকলে একসঙ্গে চমকে উঠলেন। খোঁচা-খাওয়া বিষধর সাপের মতো একটা অস্ফুট গর্জন করলেন ফতে শা পাঠান। মনে হল মাস্টারকে সামনে পেলে আর কিছুই করতেন না তিনি, শুধু হিংস্র ক্রোধে ছোবল মারতেন একটা।

অসহ্য জ্বালায় ইসমাইল বলে ফেলল, শালা হারামী !

চাপা তীক্ষ্ণস্বরে শাহু বললেন, ব্যাস, খতম !

—না, খতম নয়—ভৈরবনারায়ণ বললেন, এই শুরু।—উত্তেজনায় তাঁর গলা কাঁপতে লাগল : আমার পূর্বপুরুষ কান্ত নগরের যুদ্ধে লড়েছিল ইংরেজের সঙ্গে। আর কটা অবাধ্য লোককে ঠাণ্ডা করা যাবে না ? আপনি তৈরি হোন শাহু, আমিও তৈরি। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেব—ছুটোয় না হলে ছুশোর মাথা নামিয়ে দেব মাটিতে। তারপর ফাঁসি যেতে হয়—সে ভি আচ্ছা।

—তাহলে তাই কথা রইল, শাহু উঠে পড়লেন : আমি তাহলে আজ আসি কুমার-বাহাদুর। রাত হয়ে গেছে। ইদ্রিস !

একজন বাদিয়া বরকন্দাজ ঘরের বাইরে থেকে দোরগোড়ায় এগিয়ে এল।

—গাড়ি জোতা আছে?

—জী।

—তা হলে—শাহু দু পা এগোলেন।

ভৈরবনারায়ণ বললেন, একটু বসে যান। বৃষ্টি পড়ছে।

—বৃষ্টি? তাই তো বটে!—শাহু বললেন।

হ্যাঁ, বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। এতক্ষণের তদ্গত আলোচনায় সেটা কারো খেয়াল ছিল না। বাইরে লালমাটির সহস্রদীর্ণ বুকের উপর নেমেছে বহুপ্রতীক্ষিত বর্ষণ, রৌদ্রদগ্ধ দিক্-প্রান্তের ওপর স্নেহের মতো ঝরে পড়ছে অকৃপণ ধারায়। এলোমেলো হাওয়ায় শোনা যাচ্ছে তালবনের মর্মর, আমবাগানের আর্তধ্বনি, মালিনী নদীর কল্লোল!

—তাই তো বৃষ্টি নামলো যে!—শাহু বিব্রত হয়ে বললেন।

—ভয় নেই, এখুনি থামবে—আশ্বাস দিলেন ভৈরবনারায়ণ।

—থামবে?—কাচের জানালার ভিতর দিয়ে বৃষ্টিঝরা অন্ধকারের দিকে তাকালেন বিচক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়: ঠিক সে কথা কিন্তু মনে হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে বান ডাকানো বৃষ্টি—সহজে থামবে না, মাঠে জল আসবে—

—মাঠে জল!—চকিত হয়ে মন্তব্য করলেন কুমার বাহাদুর। একসঙ্গে অনেকগুলো কথা মনে পড়ল তাঁর—একটা সুতোয় টান পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে ভেসে এল পাশাপাশি কতগুলো ছবি। কালাপুখরি—ডাঁড়া—মালিনী নদীর বান—মাঠভরা জল—নগেন ডাক্তার—ঠাকুরবাবু—

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল মাধব। কালাপুখরির মাধব। বৃষ্টিতে ভিজে একাকার, সর্বাঙ্গে কাদা—চোখে মুখে উৎকণ্ঠার আকুলতা।

—খবর কী মাধব?

হাঁপাতে হাঁপাতে মাধব বললে, নদীতে বান এসেছে।

—তারপর!

—ওঁরাও, তুরী, সাঁওতাল, জয়গড়ের সব হিন্দু-মুসলমান প্রজা, মাস্টার সাহেবের বাদিয়ার দল, সব একজোট হয়ে কালাপুখরির ডাঁড়ায় বাঁধ বাঁধছে!

কিছুক্ষণ শুধু বাইরের বৃষ্টির শব্দটাই জেগে রইল।

তারপর ভৈরবনারায়ণ ডাকলেন, ফতে সাহেব!

শাহু বললেন, আপনি লোক ঠিক করুন, আমিও আসছি। গাড়ি জুততে বল ইদ্রিস—

—জোর বৃষ্টি হচ্ছে যে শাহু—ইদ্রিস বলতে গেল।

—চুপ কর্ হতভাগা উল্লুক—যা বলছি তাই করবি!—বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়িয়ে বজ্রধ্বনির মতো শাহের কণ্ঠ ঘরময় ভেঙে পড়ল।

রাজবংশী চাকরটাও বাড়িতে নেই—ক্যারু একা। সেই ফাঁকে বসল বোতল নিয়ে।

অনেক দিন পর্যন্ত এমনভাবে মদ খায়নি ক্রু সাহেব।

মার্থার ভয়ে জীবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলো একদিন শান্ত সংযত করে নিয়েছিল,—মার্থার রুচি আর শিক্ষার সাহচর্যে নিজেকে মার্জিত করে নিতে চেয়েছিল সে। সেদিন জানত, গোল্ডার্স গ্রীনের সোনার হরিণ মার্থাকে আর ভোলাতে পারবে না; তার নিজের যা কিছু রঙ, সব জলে গিয়ে সে মার্থার কাছে একটা মূল্যহীন ফাঁকি হয়েই ধরা দেবে। সেই হীনমন্যতার অপরাধে সে দিনের পর দিন স্তুতি করেছে মার্থাকে, তার গঞ্জনা সহ্য করেছে। উচ্ছৃঙ্খল কুঠিয়াল পার্সিভ্যাল আর কালো মায়ের যে নগ্ন কামনার মিলনে তার জন্ম, নিজের ভিতর তার বন্য আবেগকে প্রাণপণে রোধ করেছে বার বার। মার্থা আসবার আগের অধ্যায়ে সেই একদিনের ভুল—একটা মেয়েকে জোর করে ধরে এনে তারপর পুলিস কেস বাঁচাবার জন্য গলা টিপে তাকে খুন করা! সেই পাপ—সেই অপরাধে সে শঙ্কিত থেকেছে দিনের পর দিন। অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছে সে।

কিন্তু আজ? আজ আর কোনো ভয় নেই।

কি আছে—কেই বা আছে? কাকে ভয়—কার কাছেই বা কৈফিয়ত? আজ কুড়ি বছর ধরে যে চিঠি আসেনি—সে চিঠি আর কোনোদিন আসবে না। এতদিন পরে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে। আশা করবার যা কিছু সাহস ছিল, একটি আঘাতে তার সব কিছু চুরমার করে দিয়ে গেছে মার্থা। মনে হয়েছে, আজ এতদিন পরে ফুরিয়ে গেছে স্নাইদ ক্যারু—এতদিন পরে আর তার কিছু করবার নেই।

সবাই বঞ্চনা করেছে তাকে—সবাই। বাপ, মা, মার্থা, অ্যালবার্ট—আর, আর পৃথিবী! খুন করেছিল সে? সেই খুনের পাপে এতদিন ধরে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল? পালিয়ে থাকতে চেয়েছিল এই অন্ধকার ভাঙা কুঠি-বাড়ির একটা গর্তের ভেতর? ক্যারুর মুখে একটা স্বাদহীন হাসি ফুটে উঠল, আর তার ভয় নেই। শুধু একটি মেয়েকে মাত্র নয়—পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকেই সে খুন করতে পারে আজ।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। লাল মাটির আদিগন্ত পৃথিবীতে জল আর বাতাসের মাতামাতি শুরু হয়েছে ক্ষ্যাপা আনন্দে। তালগাছের বুক ফুঁড়ে নামছে বজ্রের অসহ ক্রোধ—দিকে দিকে অবিন্যস্ত বনজঙ্গলে উড়ছে রাত্রির জটা। খর-খড়্গের দীপ্তি জ্বলছে ভাঁড়ার তীক্ষ্ণপ্রবাহে!

বাইরের ক্ষেপে-ওঠা পৃথিবীর সঙ্গে ক্যারুর সমস্ত মনও উদ্দাম হয়ে উঠল। কিছু একটা করা চাই—এই মুহূর্তেই করা চাই তার। ক্যারু কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কান পেতে রইল। হাওয়ায় ভাঙা কুঠি-বাড়ির কব্জা-ভাঙা জানালার কবাটে পেত্নীর কান্না বাজছে; কোথায় যেন খোলা দরজা দিয়ে বাতাস ঢুকে কি একরাশ খসখস করে ওড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। আর—আর—সেই মেয়েটা কি চুপ করে আছে এখনো? দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না—কাঁদছে না—চেঁচিয়ে উঠছে না?

তার নির্জন কুঠি-বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে মেয়েটাকে জিম্মা করে রেখে গেছে শাহু। তখন প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি—শাহু বলে গেছে, সকালেই মেয়েটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এখন এত তাড়াতাড়িতে বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। অত্যন্ত বিব্রত আর বিপন্ন বোধ করেছিল ক্রু সাহেব। কিন্তু এখন? এখন আর কোনো ভয় নেই। পৃথিবী তাকে ঠকিয়েছে—সবাই বঞ্চনা করেছে তাকে। কাউকে আর সে ক্ষমা করবে না। শিকার যখন মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তখন সে নেবে না কেন তার পূর্ণ সুযোগ? দরকার যদি হয়, না হয় আর একবার আর একজনের গলা সে পিষে দেবে দু হাতে।

মদের নেশায় আচ্ছন্ন চেতনাটার ওপর ক্রমশ বাইরের অন্ধকার এসে ঘন হতে লাগল—ক্রমশ একটা বন্য জন্তু যেন সেখানে স্থায়ী হয়ে এসে বসল থাবা পেতে। মনের দিকে তাকিয়ে ক্যারু শুধু সেই জন্তুটার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে লাগল। সে চোখ তিলে তিলে তার সমগ্র সত্তাকে হরণ করতে লাগল, মন্ত্রমুগ্ধ করতে লাগল, তারও পরে—আস্তে আস্তে নিজের ওপর তার আর বিন্দুমাত্র কর্তৃত্বও জেগে রইল না।

বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার তাকে লোভানি দিতে লাগল—হাওয়ার সঙ্গে মিশতে লাগল তার উদ্বেজিত উত্তপ্ত ঘনশ্বাস। দেওয়ালের গায়ের 'গড সেভ দ্য কিং' যেন রূপ বদলে ফেলল আকস্মিকভাবে—তার মনের চোখ দুটো তার মধ্যেও আবির্ভূত হল টেবিলল্যাম্পের ম্লান আলোয়। যেন কুটিল কটাক্ষে ডেকে বলতে লাগল: ওঠো—ওঠো! সময় চলে যাচ্ছে—দামী, দুর্লভ, দুর্মূল্য সময়!

অসহ্য জ্বালায় এবং অসংযত মত্ততায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যারু। অন্ধকারে দূরে ছুঁড়ে ফেলল মদের বোতল, তারপর—টলতে টলতে এসে দাঁড়াল অন্ধকার ছোট কুঠরিটার সামনে।

ঘরটা পেছন দিকের একটা কোণায়। সংসারের প্রয়োজনে কোনোদিন লাগেনি—কোনোদিন ঘরটাকে ব্যবহার করেনি মার্থা। এই ঘরখানাকে সে ভয় করত—সন্ধ্যার পরে আসতে চাইত না এদিকে। তার কারণও ছিল। পার্সিভ্যাল যখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল এ অঞ্চলে, তখন এদিককার স্বাধীন রেশম চাষীদের এই অন্ধকার কুঠরিতে এনে বন্ধ করা হত। স্বেচ্ছায় যারা রেশম কুঠিকে পলু বেচতে চাইত না, তাদের—

সেই পুরনো ইতিহাস ঘরের নোনা-ধরা দেওয়ালে দেওয়ালে এখনো হয়ত আঁকা আছে রক্তের চিহ্নে। এখনো এর স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় অনেক চোখের জলের স্মৃতি চিহ্নিত। দেওয়ালের গায়ে মরচে-পড়া দুটো লোহার আংটায় এখনো বুঝি ছড়ে-যাওয়া হাতের ছেঁড়া চামড়া শুকিয়ে আছে!

সেই আংটায় ঝুমরি বাঁধা।

দোরগোড়ায় এসে আবার ফিরে গেল ক্যারু—নিয়ে এল একটুকরো আধপোড়া মোমবাতি। শিথিল হাতে সেটাকে জ্বালালো, তারপর একটানে খুলে ফেলল দরজাটা।

কাঁপা মোমবাতির আলো পড়ল বন্দিনীর মুখে, পড়ল তার যন্ত্রণা-বিকৃত দেহের ওপর।

ক্যারু থমকে দাঁড়াল। মনের ভেতর থেকে যে কুটিল ক্রূর রাক্ষসটা বেরিয়ে আসছিল, সে যেন কোথা থেকে সাপের ছোবল খেল একটা।

দৃষ্টির সামনে কতকগুলো বুদ্বুদ উঠল—ভেঙে গেল টুকরো টুকরো হয়ে। দেখা দিল একটি দিন। তার সাত বৎসর বয়েসের একটা দিন।

কালো ছেলের মনে পড়ে গেল প্রায়-ভুলে-যাওয়া কালো মাকে। একটা অসহ্য অন্ধ ক্রোধে একটু আগেই যে মাকে সে খুন করতে চাইছিল—সাত বছর বয়েসের একটি দিন সেই মাকে নতুন করে ফিরিয়ে আনল। এই ঘরে, ওই আংটা দুটোর সঙ্গে বেঁধে চাবুক মেরেছিল তাকে সাদা বাপ পাসিভ্যাল। কি অপরাধ সে জানে না, কিন্তু পাসিভ্যালের চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলন্ত ক্ষুধায় জ্বলেছিল। চাবুকের ঘায়ে ঘায়ে ছিঁড়ে আসছিল গায়ের চামড়া, লাল ফিতের মতো সর্বাঙ্গে ফুটে ফুটে উঠেছিল ক্ষতরেখা।

ইচ্ছে হয়েছিল একখানা থান ইট কুড়িয়ে এনে পেছন থেকে ছুঁড়ে মারে বাপের মাথায়। কিন্তু সাহস ছিল না। ওই বয়েসেই বাপের হাতে নির্মম নির্যাতনের স্মৃতি তারও নিতান্ত কম ছিল না।

দোরগোড়া থেকে সভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়ে গিয়েছিল আহত জানোয়ারের মতো ক্ষতচিহ্ন লেহন করতে করতে। নিরুপায় ক্রোধ—অথচ প্রতিকারের পথ নেই!

আজ ক্যারুর মনে হল: নেশায় জর্জরিত চেতনা নিয়ে মনে হল: ওই তার মা কালো দুটো নিষ্ঠুর আংটায় বাঁধা কালো মায়েরা এমনি করেই সাদা হাতের চাবুকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে চিরকাল। মনে হল: তার দুর্ভাগ্যের পেছনে কালো মায়ের অপরাধ ছিল না—ছিল বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস।

ক্যারু এগোল ঝুমরির দিকে।

—হট যাও—হট যাও—দু চোখে বিষবর্ষণ করল নাগকন্যা।

—ভয় নেই, আমি তোমায় ছেড়ে দেব।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ঝুমরি দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

নিজের ঘরে এসে আবার বোতল নিয়ে বসল ক্যাক্ল। জীর্ণ কুঠি-বাড়ির চারদিকে বাতাস গোঙিয়ে চলেছে—কান্না উঠছে দরজা-জানালার ভাঙা কব্জায় কব্জায়। এতদিন পরে নেশার ঘোর-লাগা চোখে ক্যাক্ল যেন কুঠি-বাড়ির স্বরূপটা দেখতে পেল। শূন্য, নগ্ন, নিরর্থক। এ কোন্ আবর্জনার মধ্যে তাকে ফেলে গেছে পার্সিভ্যাল? লাল মাটির রক্ত শুষে খেয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে কোন্ অস্থিশয্যার ওপর?

ঘৃণা—অসহ্য ঘৃণা। নিজেকে, পার্সিভ্যালকে, গোল্ডার্স গ্রীনের মরীচিকাকে। নিজের ভয়কে, শাহের ভয়কে, ভৈরবনারায়ণের ভয়কে। এই কুঠি-বাড়ি। এর প্রেত তার কাঁধে চেপে বসে আছে, পার্সিভ্যালের চাবুকের চাইতেও আরো নিষ্ঠুর, আরো নির্মম চাবুকের ঘায়ে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে তাকে। কেন সে নিজের চারদিকে এমন একটা মুক্তিহীন জাল জড়িয়ে নিয়ে বসে আছে? কেন সে এখান থেকে পালাতে পারে না? অ্যালবার্ট কি এই সত্যটাই তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি, যে তার স্থান কোথায়, কারা তার সগোত্র?

একটা কিছু করা চাই। ভয়ঙ্কর একটা কিছু। বিদ্রোহ—নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। কালো মায়ের কালো ছেলে। সাদা বাপের পায়ে পায়ে চলতে গিয়ে সে শুধু আঘাতই পেয়েছে, ঠাট বাঁচাতে গিয়ে শুধু নিজেকে নির্বাসিত করে রেখেছে পৃথিবী থেকে। এর চাইতে যদি সে খাঁটি কালো ছেলে হয়ে মাটি কোপাত, যদি লাঙল ঠেলত, যদি বলতে পারত—সে এই মাটির—সে লাল মাটির মানুষ—

তার জন্ম—তার রক্ত—তার দুরাশা, কী দিয়েছে? অভাব, বঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা। সে কেউ নয়। লাল মাটিরও নয়—গোল্ডার্স গ্রীনেরও নয়। একটা শূন্যতার যোগফল।

হ্যাঁ—কিছু একটা করা চাই। ভয়ঙ্কর—ভয়াবহ। নিজের বিরুদ্ধে—এই শূন্যময় অস্তিত্বের বিরুদ্ধে।

বোতলটা উবুড় করে সে দেখল তাতে আর একটি ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

কোথা থেকে রাজবংশী চাকরটা এসে দাঁড়াল।

—ডাঁড়ার দিকে ভারি গোলমাল হুজুর।

—গোলমাল!—ক্যাক্ল সজাগ হয়ে উঠল: কি হয়েছে?

—প্রজারা ডাঁড়ায় বাঁধ দিচ্ছে। শাহ্ আর কুমার বাহাদুরের লোক আসছে বাঁধ কেটে দেবার জন্যে। খুব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে।

কানাঘুষোর ব্যাপারটা শুনেছিল ক্যাক্ল। আজ হঠাৎ যেন সব জিনিসের একটা নতুন অর্থ দেখা দিল তার কাছে। শাহ্ নয়, ভৈরবনারায়ণ নয়—পার্সিভ্যাল! বন্দিনী মেয়েটা!

আর ভাঁড়ার জলে যে ফসল ভেসে যায়, তার ভেতর মিশে যায় তার কালো মায়ের চোখের জল। ক্যারু উঠে দাঁড়াল।

—আমার বন্দুক—

চাকরটা চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল: কি হবে বন্দুক সাহেব?

—বাঁধে যাব—

হ্যাঁ—সে যাবে। নিজের বিরুদ্ধে, পার্সিভ্যালের বিরুদ্ধে, এই রেশমকুঠির বিরুদ্ধে। কোথায় জায়গা পাবে তা সে জানে না, কিন্তু যেখানে সে আছে, সে যে তার জায়গা নয়, এ সত্যই আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঝড়ের মধ্যে, বন্দুক কাঁধে, ক্যারু ঘোড়া ছোটালো।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না।

বেশিদূর যেতে পারল না ক্যারু। চোখের সামনে দিয়ে প্রলয়-শব্দে চোখ-জ্বালানো তীব্রতম আলো ঝলসে গেল, একটা মাটির ঢিবিতে টক্কর খেল ঘোড়াটা, আর উঁচু ডাঙার ওপর থেকে ঝপাং করে প্রায় দশ হাত নিচে কাঁদড়ের জলের মধ্যে পড়ে গেল ক্যারু। শুধু পা দুটো জেগে রইল জলের ওপর, বুক পর্যন্ত পুঁতে গেল কাদার তলায়। মেঘের গর্জনে থরথরিয়ে উঠল দিগ্বিদিক।

না, বেশিদূর যেতে পারল না ক্যারু। হয়ত জলের তলায় সেই বাদামী রঙের কঙ্কালটাই নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে তাকে আঁকড়ে রইল।

শুধু একটা খবর জানল না ক্যারু। ওই বাজটা পড়েছিল তারই কুঠির ওপর—যেটুকু বাকি ছিল, তাও শেষ করে দিয়েছিল। অগ্নিশোধন করে দিয়েছিল পার্সিভ্যালের সঞ্চিত সমস্ত অপরাধের।

জলের ওপর জেগে থাকা ছ'পাট ছিন্ন জুতোর ওপর লাল মাটির বৃষ্টি পড়তে লাগল। আর কিছুক্ষণ ধরে লাল জলটা আরো খানিক রাঙা হয়ে রইল—পড়বার সময় সেফটি খুলে কখন তার গলার মধ্যেই ফায়ার হয়ে গিয়েছিল বন্দুকটা।

চব্বিশ

বৃষ্টি থেমেছে, তবু মেঘে ঢাকা কালো আকাশ। যেন কোনো জীর্ণ মন্দিরের পাথুরে ছাদ ঝুলে আছে মাথার ওপর—তার ফাটলে ফাটলে বিদ্যুৎ-বিলাস। এক সময়ে যেন সবটা হুড়মুড় করে সশব্দে ভেঙে পড়বে, তার সঙ্গে সঙ্গে নিচের পৃথিবীটাকেও নিয়ে যাবে রসাতলের দিকে।

লাল মাটির তমসা-দিগন্ত মুখর করে তীব্র স্বর উঠেছে মালিনী নদীর জলে সেই বান

এসেছে নদীতে—সেই ঢল নেমেছে লাল মাটিতে : যার প্রতীক্ষায় বরিন্দের পৃথিবী এতকাল সহস্রদীর্ণ হয়ে ছিল—তুলছিল ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসের গৈরিক ঝড় ; এতদিন ধরে দেখা দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে যাওয়া মেঘে মেঘে পড়ছিল যার পদাঙ্করেখা, টিলার ওপর নিঃসঙ্গ তাল-গাছের মাথার ওপর যার তর্জনী সঙ্কেত দেবার জন্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল !

সেই বৃষ্টি এসেছে—এসেছে সেই সমুদ্র-প্রতিভাস বন্যার আবেগ। এইবার বন্যার সঙ্গে লড়াই। অন্ধ মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের বোঝাপড়া। কালাপুখরির তিন হাজার বিঘে ধানী জমির ফসল আর ভেসে যেতে দেবে না আহীররা।

শেষ পর্যন্ত যমুনা আহীরও এসেছে দলবল নিয়ে। বুক পুড়ে যাচ্ছে ঝুমরির জন্যে—বরিন্দের বন্য হিংসা জ্বলছে মাথার মধ্যে ধু ধু করে। তার শোধ নেবে সে কড়ায় গণ্ডায়, একটা আধলাও বাকি রাখবে না। কিন্তু তার আগে বাঁধ বাঁধা চাই।

সাঁওতালরা এসেছে—এনেছে তীর-ধনুক। সোনাই মণ্ডলের নেতৃত্বে চাপ চাপ মাটি কোদালের মুখে তুলে ডাঁড়ার মুখে ফেলছে তুরীরা। বৃষ্টি নেই এখন—এলোমেলো হাওয়ায় কাঁপছে পঞ্চাশটা মশালের শিখা—প্রেতদীপ্তি জ্বলছে ফেনিল ঘোলা জলের ধারায়, মানুষগুলোর মুখে বুকে, মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা হোসেনের দল আর কৃষাণ সমিতির লোকগুলির লাঠিতে লাঠিতে। আকাশের জমাট মেঘ যেন সেইদিকে তাকিয়ে আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে আছে।

একটু দূরে অপেক্ষা করে আছেন আলিমুদ্দিন মাস্টার, রঞ্জন, নগেন আর হোসেন বাদিয়া। কারো মুখে কথা নেই। শুধু মশালে মশালে দোল-খাওয়া রক্তাভ আলো-ছায়ায়, মালিনী নদীর গর্জনে, ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসা ডাঁড়ার মুখে চাপ চাপ মাটি পড়ার শব্দে অভিভূত হেয় আছে চারদিক। আকাশের ফাটলে ফাটলে লুকিয়ে যাচ্ছে সাপের জিভের মতো ক্ষীণ বিদ্যুৎ।

—ঠাকুরবাবু !

একটা চাপা স্বর শোনা গেল বাঁধের তলা থেকে। এক চাপ অন্ধকারের আড়াল থেকে আবার ডাক শোনা গেল : ঠাকুরবাবু !

—কে ?

সীমাহীন বিস্ময়ে ঝুঁকে পড়ল রঞ্জন। ছায়ার মধ্যে কায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে ! একটুখানি সাদা কাপড়ের আভাস ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ছে না। যেন কোথাও থেকে সে আসেনি, মাথার ওপরের অন্ধকার আকাশ থেকেই নিঃশব্দে ঝরে পড়েছে এখানে।

—একটু এদিকে আসবি ঠাকুরবাবু ?

নগেন জিজ্ঞাসা করলে, কে ডাকছে ?

রঞ্জন বললে, কালোশশী।

—সেই বেদের মেয়েটা? কি চায় এখানে?

—দেখছি।

বাঁধের গা বেয়ে রঞ্জন নিচে নেমে এল।

এইবার আরো স্পষ্ট করে দেখা গেল কালোশশীকে। মাত্র দু হাত দূরে সে দাঁড়িয়ে। দেহের ধারালো রেখাগুলো মূর্তির মতো কঠিন রেখায় জেগে উঠেছে। চিকচিক করছে গলার রুপোর হাঁসুলী, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দু'হাতের দুটো সাপের ঝাঁপি।

সেই বৃষ্টির রাত—মেটে প্রদীপের ছায়া-কাঁপা ঘর—সেই অর্থহীন কান্না; কালো পাথরের মতো বেদের মেয়ের হৃৎপিণ্ড-ফাটা অশ্রুর উচ্ছ্বাস। কয়েক মুহূর্ত একটা কথাও বলতে পারল না রঞ্জন। এমন সময়ে—এই বাঁধের ধারে কোথা থেকে এল কালোশশী! কী চায়?

কিন্তু সে তো ঘর; সে তো আকুল বৃষ্টির সঙ্গে একটা অপ্রত্যাশিত নিঃসঙ্গতা। কিন্তু এ তা নয়। এখানে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ জাগছে ভয়ঙ্করের ভ্রূকুটির মতো, দিগন্তে এখানে স্তম্ভিত ঝড়, এখানে প্রায় দুশো মানুষের আমৃত্যু সংকল্পে চারদিক আকীর্ণ হয়ে আছে। কোদালের মুখে রাশ রাশ মাটি পড়ে এখানে যখন মালিনী নদীর ফেনিল জল অসহায় আক্রোশে রুদ্ধস্রোত হয়ে আসছে, তখন কয়েক বিন্দু চোখের জল কখন কোন্ মাটিতে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে—কে তার খবর রাখে?

তবু কালোশশীর সামনে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রঞ্জন।

কিন্তু যা আশঙ্কা করছিল, তার কিছুই ঘটল না।

কালোশশী বললে, তোরা তৈরি আছিস ঠাকুরবাবু?

রঞ্জন হাসল: তৈরি বইকি। আর দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তুই এখানে কেন?

—খবর দিতে এলাম—শুকনো স্বর শোনা গেল কালোশশীর। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই সে রইল। এক পাও সে নড়ল না। গলার আওয়াজ ছাড়া মূর্তির মতো কঠিন রেখা-দিয়ে-গড়া দেহে এতটুকু স্পন্দন লক্ষ্য করা গেল না।

—কিসের খবর?—রঞ্জন ভ্রূকুটি করল।

—ওরা আসছে।

—কারা?

—শাহু আর জমিদারের লোকজন।

—শাহু!—রঞ্জন চমক খেল: কেন, শাহু কেন?

—তা তো জানি না।—কালোশশী একটু থেমে বলল: শাহুর সব বরকন্দাজ আসছে,

সেই সঙ্গে জমিদারের লাঠিয়াল। তরোয়াল, বন্দুক, বল্লম—সব আসছে ঠাকুরবাবু!—এতক্ষণে কালোশশীর গলায় প্রাণের লক্ষণ পাওয়া গেল, কাঁপতে লাগল উৎকণ্ঠার রেশ : তোদের মারতে আসছে।

কিন্তু কালোশশীর সে উৎকণ্ঠা রঞ্জনের মনকে স্পর্শ করল না। শাহ্—শাহ্ও আসছেন! কালাপুখরির বাঁধে তাঁর কোনো স্বার্থ নেই, তবুও আসছেন লোকজন, লাঠিয়াল আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে! যে ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর মামলা-মোকদ্দমা আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা—আজ অহেতুকভাবে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতেও একবিন্দু দ্বিধা হল না ফতে শা পাঠানের।

—তুই জানলি কি করে?

—ওরা একসঙ্গে বেরিয়েছে। তাই দেখেই তো তোকে খবর দিতে এলাম। তোরা সাবধান হয়ে থাকিস।

—সাবধান!—রঞ্জন হাসল : হ্যাঁ, সাবধান হয়েই আমরা আছি।

ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে শাহ্ আসছেন। কিন্তু বিস্ময় বোধ করবার কি আছে এতে? যে কারণে আজ আলিমুদ্দিন মাস্টার তাঁর মত আর পথের সম্পূর্ণ পার্থক্য সত্ত্বেও এসে দাঁড়িয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ঠিক সেই কারণেই শাহের সঙ্গে মৈত্রী রচনা হয়েছে ভৈরবনারায়ণের। আজ দু দিকে দু দলকে জোড় বাঁধতেই হবে—শোষক আর শোষিতের সমস্ত স্বার্থ দুটি দলেই ভাগ হয়ে গেছে আজকে। এই নিয়ম—এই ইতিহাস।

চিন্তার ঘোর কাটল কালোশশীর একটা নিশ্বাসে।

ভালো করে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই রঞ্জন দেখল, হাতের ঝাঁপি নামিয়ে কখন কালোশশী এসেছে তার কাছে, নুয়ে পড়ে নিয়েছে তার পায়ের ধুলো। তার আঙুলের মৃদু ছোঁয়ায় সে চমকে উঠল।

—কি হল রে?

—চলে যাচ্ছি ঠাকুরবাবু। শুনলাম আইহোর বাজারে এসেছে বেদের দল। ওরাই আমার আপনার লোক—চলে যাব ওদের সঙ্গেই। পথে বেরিয়ে ভাবলাম, তোকে একবার খবরটা দিয়ে যাই!

মুহূর্তের জন্যে একান্ত কাছের মানুষটির কাছে ফিরে এল রঞ্জন। একটি দীর্ঘশ্বাস তাকে সজ্ঞান করে তুলল, মাত্র চকিতের জন্যেই!

—তুই চলে যাচ্ছিস কালোশশী?

—হ্যাঁ ঠাকুরবাবু!—এতক্ষণে যেন একটু হাসল কালোশশী : ঘর আর আমার বাঁধা হল না।

পরক্ষণেই ঝাঁপি দুটো তুলে নিয়ে সে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে শুরু করল। মনের ভুল

কিনা বোঝা গেল না—বাঁধে মাটি পড়বার আওয়াজে সে ভুল শুনল কিনা তাও বোঝা গেল না—শুধু যেন দীর্ঘশ্বাসের মতো কানে এল : ওরা আসছে। কিন্তু তুই মরিস নে ঠাকুরবাবু, তুই মরিস নে—

চোখ দুটো কচলালো রঞ্জন। স্বপ্ন দেখছিল নাকি এতক্ষণ ? কোথাও কেউ নেই। আরো অনেকবার যেমন করে নিঃশব্দে অন্ধকারে মুছে গেছে কালোশশী, আজো তেমনি করে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আর সে ফিরবে না। ঘর বাঁধতে চেয়েছিল, পারল না। বন্যার মুখে একদিন একটা ঘাটে এসে বাঁধা পড়েছিল, আবার বন্যার মুখেই শূন্যতায় ভেসে গেল সে।

দূর হোক ছাই। স্রোতের কুটোর জন্যে কি হবে সময় নষ্ট করে! আকাশে বিদ্যুতের আর একটা ভ্রূকুটি জ্বলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সে সজাগ হয়ে উঠল। একটা বেদের মেয়ে নয়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ ; বেনো জল নয়, দিকে দিকে প্রাণবন্যার উচ্ছলিত উদ্দাম প্রবাহ।

রঞ্জন বাঁধের ওপরে উঠে এল।

নগেন বললে, এত দেরি হল যে ? কি হয়েছে ?

—জরুরী খবর আছে ভাই ! ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে ফতে শা পাঠান আসছেন বাঁধ-বাঁধা রুখতে।

—কী বললেন !—আলিমুদ্দিন অস্ফুট চিৎকার করলেন একটা।

—হ্যাঁ, খবরটা পাকা বলেই মনে হচ্ছে।

তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। শুধু অন্ধকার মুখর হয়ে চলল ঝপাঝপ কোদালের আওয়াজে—ঝপাস ঝপাস করে মাটি পড়ার আর ক্রমাগত বাধা পাওয়া জলের ক্রুদ্ধ বিষাক্ত গর্জনে।

নগেন বললে, মাস্টার সাহেব, বড়লোকেরা একজাত। হিন্দুস্থানীও নয়—পাকিস্তানীও নয়।

আলিমুদ্দিন কি ভাবছিলেন। আস্তে আস্তে মাথা তুললেন। সংক্ষেপে বললেন, জানি।

—কি করবেন এবার ?—মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে নগেন।

—যা করতে এসেছিলাম—আলিমুদ্দিন তেমনি সংক্ষেপেই জবাব দিলেন। তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে ওঠা মাটি-কাটা কালো মানুষগুলির পিঠের দিকে তাকিয়ে থেকে, নিঃশব্দে কান পেতে জলের মুখে মাটি পড়বার আওয়াজ শুনে বললেন, এই তো আমার আজাদ পাকিস্তান। বড়লোকের নয়। গরীব মুসলমানের—গরীব হিন্দুর।

আচমকা চারদিকের মানুষগুলো কলরব করে উঠল। আকাশ-ফাটানো একটা গর্জন

করল যমুনা আহীর—যেন বরিন্দের লাল মাটির অন্ধকার বুকের ভেতর থেকে জেগে উঠল ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দীর সীমা পার হল—পার হল মহাকালের সিংহদ্বারের পরে সিংহদ্বার; জলস্তম্ভ উঠল দীবোর দীঘির শ্যাওলাধরা নির্জীব স্তব্ধতায়, থরথর করে কেঁপে উঠল দিব্যোকের জয়স্তম্ভ, একটা বিরাট বিস্ফোরণে ভীমের জাঙাল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল।

সেই সঙ্গে লাল মাটির টিলাগুলোও গর্জন তুলল—যেন একদল ক্রুদ্ধ সিংহ যুগ-যুগান্তের ঘুম ভেঙে লেজ আছড়ে উঠে দাঁড়ালো। কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল—তালগাছের মাথাগুলো দুলে উঠল ঝড় খাওয়া ঝাণ্ডার মতো। অন্ধকার আকাশ থেকে বিদ্যুতের তরোয়াল হাতে নিচে নামলেন গণ-বিপ্লবের নেতা দিব্যোক: মাথার ওপর বজ্রগর্জিত কৃষ্ণতা, পায়ের তলায় থরথর করে কেঁপে ওঠা পৃথিবী।

মাঠের ওপারে একরাশ মশাল। রক্তের ছোপ-লাগা দিগন্ত।

যমুনা আহীর আবার পৈশাচিক স্বরে চিৎকার করে উঠল।

—ঠিক হো যাও ভাই সব।

বুড়ো সোনাই মণ্ডল থেকে টুলকু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়া পর্যন্ত; জরাতুর শার্দূল থেকে নাগশিশু অবধি। হোসেনের দল আর তুরীরা। কৈবর্ত-বিদ্রোহের নবজন্ম।

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—গম্ভীর স্বর উঠল নগেনের। তার প্রতিধ্বনিতে মালিনী নদীর জল পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। আর দূরে মাঠের পারে রক্তের রঙ ধরানো মশাল-গুলো থমকে দাঁড়ালো একবার—কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই।

—ঠিক হো যাও—যমুনার বজ্রধ্বনি বাজতে লাগল বার বার। যে তেল-পাকানো পিতলের গাঁটবাঁধা লাঠির ঘায়ে জটাধর সিংহের মাথা গুঁড়ো হয়ে গেছে, সেই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে সে ওই মশালগুলোর দিকে ছুটে চলল: আর বাড়ো ভাই, আগ বাড়ো—

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুটো ঝড় মুখোমুখি দাঁড়াল।

সকলের আগে কুমার ভৈরবনারায়ণ। আফিমের নেশায় নিদ্রিত স্থূলোদর মাংসপিণ্ড নন। আরক্তিম ভয়ঙ্কর চোখ। ঘোড়ার পিঠে তাঁর চেহারাটাকে অতিকায় বলে মনে হতে লাগল: কাঞ্চনগরের যুদ্ধে তাঁর পিতৃপুরুষের গৌরবকীর্তি নিতান্তই তবে ইতিহাস নয়।

ভৈরবনারায়ণ বললেন, সরে যাও সব। খুন-খারাপী হবে নইলে।

জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন: কেউ সরবে না।

মশালের আলোর পেছনে ফতে শা পাঠানকে দেখা গেল। চিৎকার করে শাহু বললেন, শালা কাফের!

—কাফের!—আলিমুদ্দিন পাল্টা চিৎকার করে বললেন, কে কাফের? ইবলিশের সঙ্গে

হাত মিলিয়ে গরীবের রক্ত শুষে খেতে এসেছে—কে কাকের ?

—খবরদার !—শাহু আকাশে হাত তুললেন : মারো শালাদের !

—চলা আও—যমুনা আহীরের হাতের লাঠিটা ঘুরতে লাগল বনবন করে। ওদিক থেকে একটা বল্লম ছুটে এসে রঞ্জনের পায়ের কাছে মাটিতে গেঁথে গেল—শনশন করে ছুটল টুলকু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়ার হাতের তীর !

চিৎকার, গর্জন, গোঙানির ভেতরে বাজতে লাগল লাঠির আওয়াজ। নেচে নেচে ফিরতে লাগল মশালের প্রেতচ্ছায়া। ফট ফট করে উঠতে লাগল মানুষের মাথা ফাটবার শব্দ !

দুম করে বন্দুকের আওয়াজ এল একটা।

পেছন থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে বন্দুক ছুঁড়েছে ডাক্তার খোদাবক্স খন্দকার। এতদিন পরে সেই ঘুষিটার বদলা নিয়েছে সে।

সভয়ে রঞ্জন দেখল, নিঃশব্দে বুকে হাত দিয়ে বাঁধের ওপর শুয়ে পড়েছেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

তবুও তৈরি হয়ে গেছে রক্তমাখা বাঁধ। মালিনী নদীর জল ভাঁড়ার মুখে ঢুকতে না পেরে ক্রুদ্ধ আক্রোশে পাশের ঢাল জমি বেয়ে নেমে গেছে মাঠের ভেতর। আর পালিয়েছে শাহু আর ভৈরবনারায়ণের দল, আট-দশজন আহত লোককে কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো।

এর পরে হয়ত পুলিস ফৌজ নিয়ে পৌঁছুবেন বদরুদ্দিন জমাদার আর দারোগা তারণ তলাপাত্র। কিন্তু বাঁধ বাঁধা হয়ে গেছে, বাঁধ রুখতেও হবে। সে হয়ত আরো বড় লড়াই।

কিন্তু এই দুঃখরাতের পার থেকে যে সূর্য উঠেছে, সে সূর্য সেদিনও জেগে থাকবে ; যে রাত্রি প্রভাত হল—সে রাত্রি আর ফিরে আসবে না।

রঞ্জনের ঘুম ভাঙল জয়গড়ে নগেনের বাড়িতে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পাশ ফিরতে গিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সে।

কপালে হাত দিয়ে কে বললে, আর একটু শুয়ে থাক চুপ করে।

রঞ্জন চমকে চোখ মেললে : কে ?

—চিনতে পারছিস না রঞ্জু ? আমি পরিমল।

পরিমল লাহিড়ী অল্প অল্প হাসছিল।

—কখন এলি তুই ?

—তোদের যুদ্ধ শেষ হবার পর। এসে দেখি, সৈনিক হবার আর দরকার নেই, তাই

নার্স হতে হল।

রঞ্জন উত্তেজিতভাবে বললে, আর মাস্টার সাহেব? আলিমুদ্দিন মাস্টার?

—পাশের ঘরে আছেন। ডাক্তারের বোন নার্স করছে।

—বাঁচবেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল পরিমল: বোঝা যাচ্ছে না।

যন্ত্রণায় রঞ্জনের হৃৎপিণ্ড যেন শুদ্ধ হয়ে এল। নিঃশব্দ গলায় বললে, বড্ড খাঁটি মানুষ।

পরিমল অন্যমনস্কভাবে বললে, হ্যাঁ, সবই শুনলাম ডাক্তারের কাছ থেকে। ওই মানুষগুলোর হাতেই খাঁটি পাকিস্তান জন্ম নেবে একদিন। এখন শোন্। এখানে আপাতত তোকে নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল হবে। তুই আজই চলে যাবি কলকাতায়। থাকলে না-হক ঝামেলা বাড়বে কতগুলো।

—তারপর এখানকার ভার?

—সেইটে নেবার জন্যেই তো আমি এলাম।

এই আহত অসুস্থ মুহূর্তে একটা কথা বার বার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় একটা আর্ত প্রশ্ন জেগে উঠতে চাইল ক্রমাগতই—কিন্তু কিছুই উচ্চারণ করতে পারল না রঞ্জন।

পরিমল নিজেই বললে সে কথা।—একটা খবর তোকে এখনও দেওয়া হয়নি। মাসখানেক আগে মিতাকে অ্যারেস্ট করেছে।

—ওঃ!

আর কিছু জানবার নেই, আর কিছু জিজ্ঞাসা করবারও নেই। এইবার যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে রঞ্জন। এখনও অনেক দেরি—নীড়ের স্বপ্ন এখনও অনেক দূরান্তরের অরণ্যছায়ায়; তার আগে শুধু বেদের মেয়ে কালোশশী কেন—কেউই ঘর বাঁধতে পারবে না। না—কেউ নয়।

দরজার গোড়ায় ছায়ার মতো এসে দাঁড়াল নগেন। পাণ্ডুর মুখে বললে, একবার উঠতে পার রঞ্জনদা—আসতে পার এ ঘরে?

রঞ্জন সোজা বিছানার ওপর উঠে বসল: মাস্টার সাহেব?

নগেন বললে, দেখে যাও।

উত্তমার কোলে মাথা রেখে ঘুমভরা চোখ মেলে একবার তাকালেন আলিমুদ্দিন। কাউকে চিনলেন না। রঞ্জনকে নয়, নগেনকেও নয়।

ফিসফিস করে ডাকলেন, কল্যাণী?

উত্তমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

কল্যাণী নয় বাবা, আমি উত্তমা।

—না, কল্যাণী!—আলিমুদ্দিন হাসলেন: আর তো তুমি দূরে নেই বোন, এবার কাছে চলে এসেছ। কি এ যাত্রা তো আর হল না দিদি, আবার তোমার ভাইফোঁটা নেব আজাদ পাকিস্তানে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

নিবিড় তৃপ্তিতে আস্তে আস্তে তাঁর চোখ দুটি বুজে এল।

লাল মাটি।

আমার মা। অনেক ইতিহাসের রক্ত-স্বাক্ষরের সীমন্তিনী তুমি—অনেক প্রাণ-সাধনার তুমি মহাভৈরবী। আজও তোমার সাধনা শেষ হয়নি, আজও গৈরিক মাটিতে তোমার ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, আজও কালবৈশাখীর ঝড়ে দিকে দিকে উড়ে চলেছে তোমার ছিন্ন-ভিন্ন ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি।

কিন্তু আমরা আজ এসেছি! আমাদের হাতে নতুন ইতিহাসের লেখনী তলোয়ার হয়ে জ্বলছে; আমাদের বুকে আমরা বয়ে এনেছি রুকনপুরের নির্বাপিত দীপস্তম্ভের শেষ শিখা।

আমার জন্মভূমি—আমার লাল মাটি। আমাদের রক্ত দামামার তালে তালে, তোমার রাঙা টিলার চূড়োয় চূড়োয় আজ নবযুগের স্পর্ধিত পদধ্বনি।

কলিকাতা

আষাঢ়, ১৩৫৮

শ্বেতকমল

বাইশে শ্রাবণ

কলরব করতে করতে একসঙ্গে চারটি মেয়ে ফুটপাথে নামল।

লম্বা বিনুনীটায় ঝাঁকুনি দিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় ইরা বললে, সাধলেই ওঁদের মান বাড়ে। চাই না আমরা প্রেসিডেন্ট। নিজেরাই সব করব আমরা। কবিকে শ্রদ্ধা জানানোই আসল, নৈবেদ্যের ওপর সন্দেশের মতো নাই বা থাকল সভাপতি।

দলের নেত্রী শকুন্তলা বললে, এই চুপ চুপ—আস্তে। বাড়ি থেকে একটু দূরে সরেই বল্ কথাগুলো। শুনতে পাবেন যে ভদ্রলোক!

—পান না শুনতে—ইরার স্বর আরো তীব্র হয়ে উঠল: না হয় নামই হয়েছে একটু, কিন্তু লেখেন তো ভারী! আবার দেমাক কত। চেত্‌লায় মিটিং, বেহালায় সভা, হাওড়ায় বক্তৃতা—সারা দেশ যেন ওঁরই আশায় মুখিয়ে বসে আসে!

দ্রুত জুতোর শব্দ তুলে চারজনে হাঁটতে লাগল পথ দিয়ে। চড়া রোদে সারা সকাল এমনিভাবে নানা জায়গায় ধর্ণা দিয়ে প্রত্যেকেই যেমন ক্লান্ত, তেমনি বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ক্ষিদের সঙ্গে ক্ষোভের যে উত্তাপটা এতক্ষণ ধরে সকলের মনে সঞ্চিত হচ্ছিল, ইরার মধ্যে দিয়ে সেটা বিদীর্ণ হয়ে পড়ল।

মাধবী বললে, তা ঠিক। কিন্তু একা এ ভদ্রলোককে দোষ দিয়ে লাভ কী? সবাই তো এক কথা বলছেন। প্রত্যেকেই দারুণ রকমের এন্‌গেজ্‌ড্‌।

ইরা একটা ঝামটা মারল: এন্‌গেজ্‌ড্‌ না ছাই। এই সব বলেই নিজেদের দর চড়িয়ে রাখেন ওঁরা। লোকে দোরগোড়ায় এসে সাধবে আর ওঁরা ওই সব ধুয়ো তুলে বোঝাতে চাইবেন যে, কী বিরাট ওঁদের চাহিদা! উচিত কী জানিস? কোনো সভায় কোনো সাহিত্যিককে না ডাকা। তা হলে নিজেরাই যেচে ছুটে আসতে পথ পাবেন না।

কিন্তু এ তো শুধু অক্ষম ক্রোধে গায়ের জ্বালাই মেটানো। সমস্যার সমাধান যে এতে ঘটবে না সেকথা বাকি তিনজন ভালোই জানে—ইরাও যে জানে না এমন নয়। সাত দিন পরে বাইশে শ্রাবণ—রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ-তিথি। একজন বেশ জাঁদরেল গোছের সভাপতি না থাকলে মুখ থাকবে না কলেজের মেয়েদের কাছে।

এমনিতেই এ নিয়ে তর্ক তুলেছিল অনেকে।

—শান্তিনিকেতন থেকে ওঁরা তো বলেছেন যে কবির মৃত্যুদিনটায় এসব অনুষ্ঠান না করাই ভালো। ওটা নিছক পারিবারিক ব্যাপার—কিছু করতে হলে ওঁর আত্মীয়-স্বজনদেরই—

—বারে, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন বুঝি শুধু ওঁরাই?—আর একজন কলকণ্ঠে

প্রতিবাদ করল : তিনি সারা দেশের আপনার জন। তাঁর ওপর ওঁদের যে অধিকার, সে অধিকার আমাদেরও।

—বেশ, মেনে নিচ্ছি সে কথা। কিন্তু মৃত্যু-তিথি হল দুঃখের দিন—

সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষ থেকে তৈরি জবাব এল : কবির মৃত্যু নেই—তাঁকে নিয়ে কেউ কাঁদতে বসছে না। আসল কথা একটা উপলক্ষকে নিয়ে আমরা তাঁকে স্মরণ করব। সেইটেই লাভ।

—কিন্তু তার জন্যে সভা করবার কী দরকার? শ্রদ্ধা নিয়ে মনে মনে স্মরণ করলেই তো হয়। কবি নিজেই বলে গেছেন :

যখন রবো না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়—

—থামো, থামো—কমনরুমের সমস্ত কল-কোলাহল ছাপিয়ে ইরার তীক্ষ্ণ গলা মুখর হয়ে উঠল : শান্তিনিকেতনই তারী মানছে কিনা সে কথা? আর কবি শালবনে পালাতে চাইলেই বা আমরা ছাড়ব কেন! তিনি যখন 'আমাদেরই লোক', তখন আমাদের এটুকু উৎপাতও তাঁকে সইতেই হবে। বাজে কথা বন্ধ করো। চাঁদা দিতে চাও না, সেইটেই খুলে বলো।

—কক্ষণো না। এসব বলা তোমার ভারী অন্যায়—এ পক্ষের মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে

তারপরে যা শুরু হল, তাকে আর তর্ক বলা যায় না। ঝগড়ার উৎসাহে কোমর বেঁধে একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে গেল ইরা—তিরিশটি গলায় ঐকতান বাজতে লাগল সপ্তমে। রণে ভঙ্গ দিয়ে দুটি মেয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে কান্না জুড়ল।

ঠিক এই সময় সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আরাধনাদি দেখা দিলেন দোরগোড়ায়।

—এই মেয়েরা, কী হচ্ছে এসব? স্কুলের ছাত্রীদের মতো চ্যাঁচাচ্ছ সব—ওদিকে অন্য ক্লাস যে ডিস্‌টার্বড্ হচ্ছে তা জানো? আর ইরা, ফোর্থ ইয়ারে পড়ছ তুমি—কোন্ আক্কেলে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছ শুনি? তোমাদেরও যদি এটুকু ডিসেন্সি না থাকে, ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েরা কী শিখবে তোমাদের কাছ থেকে?

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল সাময়িকভাবে, ভোটের জোরে জিতেও গেল ইরারা। কিন্তু একটা প্রতিদ্বন্দ্বী দলও তৈরি হয়ে গেল কলেজের ভেতরে। অনুষ্ঠানে কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকলে ঠাট্টার কিছু আর বাকি রাখবে না তারা।

আর প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে সকলের আগে দরকার বেশ একটা ভারী রাজাপতি।

এদিকে আয়োজনটা নেহাত মন্দ হয়নি। প্রথমে বেদমন্ত্র পড়বে থার্ড ইয়ার সংস্কৃত অনার্সের সুনেত্রা গোস্বামী—ভাটপাড়ার মেয়ে—আই. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে সংস্কৃতে; গান গাইবে বেণু বোস আর শিখা চক্রবর্তী—দুজনেই রেডিও-আর্টিস্ট। সেতার বাজাবে ইরা সেন—গীটার মুক্তি বিশ্বাস। 'নটীর পূজা'র "ক্ষমো হে ক্ষমো" গানটার সঙ্গে শ্রীমতীর নাচ খুব সময়োপযোগী হবে—নাচবে হিমানী গুপ্ত—অল্ বেঙ্গল চাম্পিয়ান। 'রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু-কল্পনা' বলে প্রবন্ধ পড়বে ফোর্থ ইয়ারের শকুন্তলা নিয়োগী। কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটর, চমৎকার বাংলা লেখে। তা ছাড়া প্রিন্সিপ্যাল্ও কিছু বলতে রাজী হয়েছেন। বাংলার অধ্যাপক অসামান্য জনপ্রিয় সি. সি. বি.ও নিশ্চয়ই খুব ভালো একটা বক্তৃতা দেবেন।

সুতরাং বেশ ভালোই হয়েছে এদিকের ব্যবস্থাটা। এখন মানানসই গোছের একজন সভাপতি হলেই কোথাও কিছু আর বাকি থাকত না। কিন্তু সেইখানেই বেধেছে গণ্ডগোল। পুরুত না থাকলে যেমন পুজোর সমস্ত সমারোহ ব্যর্থ, তেমনি দুর্দান্ত একজন সভাপতি না পেলে সবটারই অঙ্গহানি ঘটে যাবে।

নিরুপায় ভাবে পথ চলতে লাগল চারজনে।

অনেক ভেবে-চিন্তে সন্ধ্যা-ই শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙল।

—তা হলে প্রিন্সিপ্যাল্কেই সভাপতি করে—

—থাম্ তুই—বকিসনি বোকার মতো। প্রিন্সিপ্যাল্ তো বারো মাসই সভাপতি রয়েছেন। কিন্তু এমনি একটা 'অকেশনে'ও যদি বাইরের কাউকে না আনতে পারা যায়, তাহলে কী করে মুখ দেখাবি সবিতা ওদের কাছে? ইউনিয়ানের আসছে ইলেক্শনে কাউকে আর দাঁড়াতে হবে না আমাদের ভেতর থেকে—সেটা যেন খেয়াল থাকে।

—একটা ব্যবস্থা হবেই—শ্রান্তভাবে শকুন্তলা বললে, কাল একবার যেতে হবে সোমেন মিত্তিরের কাছে, নইলে চেপে ধরতে হবে ডক্টর তুষার দত্তকে।

—কাল আবার কেন? বেরিয়েছি যখন—সেরে যাই আজকেই। সাউথেই তো থাকেন ওঁরা।—মাধবী বললে।

—না, এত বেলায় গিয়ে কাউকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আমারও তাড়া আছে ভাই, বাড়ি ফিরতে হবে।

ইরা মুখ ভারী করে বললে, এই আজ-কাল করতে করতে ওঁরাও কোথাও এন্গেজ্ড্ হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

—সে ভার আমি নিচ্ছি। কালকের মধ্যে ব্যবস্থা আমি করে দেবই। কিন্তু এখন আর নয় ভাই—আমার বড্ড তাড়া আছে। ওই যে—বাসও আসছে।

আলোচনাটা মাঝপথে বন্ধ করে দিয়ে বাস-স্টপের দিকে এগোল শকুন্তলা। অসন্তুষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে ইরা বিড়বিড় করে বকে চলল।

ছুটির দিনের বাস, তাতে বেলা বারোটার কাছাকাছি। ভিড় নেই বললেই চলে। অভ্যস্ত গলায় যাত্রীদের প্রলুব্ধ করবার জন্যে কণ্ডাক্টার সমানে হেঁকে চলেছে : বাগবাজার —কাশীপুর—বরানগর—খালি গাড়ি! খালি গাড়ি—বরানগর—

—বরানগর।—একটা সিকি এগিয়ে দিলে শকুন্তলা।

শ্রাবণের দুপুর, কিন্তু বর্ষণের বিষণ্ণ ছায়া আকাশের কোথাও নেই। শুধু অলস আশ্বিনের আভাস নিয়ে 'সিরাস' মেঘের কয়েকটা শুভ্রোজ্জ্বল খণ্ড ভেসে চলেছে দল-ছাড়া পাখির মতো। সূর্যের নিষ্ঠুর আলো থেকে থেকে শকুন্তলার মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল। ওপাশের সিটে গিয়ে বসলেই হয়, কিন্তু সীমানাহীন ক্লান্তিতে নিজের জায়গাটা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না আর। মাথার ওপর সারা সকালের রোদ জ্বলে গেছে—না হয় পড়ুক আরো দু-এক ঝলক।

বাইশে শ্রাবণ। কবিগুরুর প্রয়াণ-তিথি। গান, নাচ, আবৃত্তি, প্রবন্ধ, বক্তৃতা—অনুষ্ঠানের কোথাও কোনো ত্রুটি থাকবে না নিশ্চয়। তা ছাড়া অক্লান্ত পরিশ্রম করছে ইরা—খেটে চলেছে জেদের মাথায়। যেন চ্যালেঞ্জ নিয়েছে সবিতার দলের। সেই ঝোঁকের মুখে এতক্ষণ শকুন্তলাও বিভ্রান্ত হয়েছিল—সারা সকালটা কেটে গেছে নেশার ঘোরে। কিন্তু এই রৌদ্রজ্জ্বল বেলা বারোটার সময় বাসের ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে বরানগর ফিরবার মুখে নিজেকে এইবার ফিরে পেল শকুন্তলা।

বাইশে শ্রাবণ নয়—বরানগরের গলির ভেতরে ইট বের করা একতলা বাড়ি। পায়রার খোপের মতো দুখানা ছাদফাটা ঘর—বর্ষায় বাক্স-বিছানা টানাটানি করতে হয় এ-কোণে ও-কোণে। ফুট কয়েক উঠোনের আধখানা জুড়ে আছে পাট-ভাঙা পুরনো ইঁদারা আর বাসনমাজার ছাই। ইলেক্‌ট্রিক নেই—সন্ধ্যার পরে হ্যারিকেন লণ্ঠনের পোড়া কেরোসিনের গ্যাসের সঙ্গে মেশে পচা চুন-বালির একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ—যেন দম আটকে আসে। আর সময় বুঝে ওদিকের পানাপুকুর আর সামনের বদ্ধজলের কাঁচা ড্রেন থেকে উঠে আসে লক্ষ লক্ষ মশা। পঁচিশ টাকায় কলকাতার কাছেপিঠে এর চাইতে ভালো আস্তানা মেলা দুর্লভ আজকাল।

আর সেখানে—

নাঃ, জোর করে চিন্তার মোড়টাকে ঘুরিয়ে আনল শকুন্তলা। বাইশে শ্রাবণ আসছে —রবীন্দ্রনাথ এই দিনে অস্তে নেমেছেন সন্ধ্যা-মেঘের তরণীতে সোনার মুকুট ভাসিয়ে দিয়ে —মরণমহেশ্বরের দেউলে বয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর প্রণাম। কিন্তু তাই বলে একেবারে বিদায় নিয়ে যাননি : 'আবার যদি ইচ্ছা করো, আবার আসি ফিরে—'। এই কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায় তাঁর ঘট ভরা তো শেষ হয়নি—'নব নব জীবনের গন্ধ যাবো রেখে, নব নব বিকাশের বর্ণ যাবে এঁকে'।

রবীন্দ্রনাথ। শকুন্তলা নিজের মনের মধ্যে খুঁজতে লাগল। ভালো করে সেখানে তাঁকে তো ধরা যাচ্ছে না। বারে বারে হারিয়ে যাচ্ছেন—লুকিয়ে যাচ্ছেন কেমন একটা ম্লান কুয়াশার অন্তরালে।

মনে হল একটা অস্বচ্ছ কাচের আবরণের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বকবি: আবছা ভাবে দেখা যায় তাঁকে—দেখতে পাওয়া যায় তাঁর পেছনে একটা আনীল আকাশ—শ্যামলী অরণ্যের ললাটে কৃষ্ণচূড়ার কুঙ্কুম-চিহ্ন, অঞ্জনা নদীর কালো জলে ছায়া ফেলে যাওয়া বাণীবনের মরাল-মিথুন। বিদ্যুতের ভুজঙ্গপ্রয়াতে মেঘ-মঙ্গলের শ্লোকধ্বনি ওঠে—বৈশাখের সূর্যমুখী দুপুরে কিরণের উজ্জ্বল তারগুলো অদৃশ্য মিড়ে ঝিন্‌ঝিন্‌ করতে থাকে—হিমের অবগুণ্ঠন টেনে হেমন্তলক্ষ্মী কাঁপন-লাগা-সন্ধ্যাতারার প্রদীপ হাতে পায়ে পায়ে ঝিঁঝির নূপুর বাজিয়ে চলে যান হিরণ্যশীর্ষ ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে।

কিন্তু!

আচ্ছা, সত্যিই কি কিনু গোয়ালার গলির কোনো একতলা ঘরে কখনো বাস করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে? তাঁর হরিপদ কেরানীর ভাগ্য ভালো বলতে হবে—অন্তত কখনো কখনো কান্তিবাবুর বাঁশির সুরে সে তমালের ছায়াঘেরা ধলেশ্বরী নদীর ধারে ঢাকাই শাড়ি পরা মেয়েটির কাছে ফিরে যেতে পেরেছে। কিন্তু মশার গুঞ্জন থেমে গেলে শকুন্তলা বাঁশির সুর শুনতে পায় না—কানে আসে কাছের কোনো একটা মদের দোকান থেকে মাতালের চিৎকার; শুনতে পায় বাবার গোঙানি—ছোট বোনটার ঘুংরি কাশির বুকফাটা যন্ত্রণা।

ধলেশ্বরী নয়—একটা নদী তাদেরও ছিল—সুনন্দা। কবিতার মতো নাম—কবিতার মতো নদী। সুনন্দার দুধের মতো সাদা জলে জোয়ার-ভাঁটার ঢেউ খেলত, ঢেউ উঠত। হাওয়া-লাগা সুপুরি আর নারকেলের বনে, ঢেউ দুলত পলিমাটিতে বুকসমান রূপশালি ধানে। কিন্তু স্বপ্নের পথ বেয়েও সে সুনন্দার ধারে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। একটা লোহার প্রাচীর যেন চিরদিনের মতো তাকে আড়াল করে দিয়েছে—পাকিস্তান।

তা না হলে কলকাতার এই পঁচিশ টাকার ঘরে এসে এমনভাবে মুখ থুবড়ে পড়বার তো কোনো দরকার ছিল না। বেতো শরীর নিয়ে হুঁকো হাতে বাবার দিন কাটতো চণ্ডীমণ্ডপে; ভাইবোনদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল গ্রামের ইস্কুল—তালের ডিঙি আর 'চক' ভরা রাঙা শালুক; রাঙা কাঁকরের ফাঁকা পথের পাশে ফুল আর ঘাসের জমিতে আঁটা ব্রজমোহন কলেজেই যথেষ্ট বিদ্যালাভ হতে পারত শকুন্তলার। কলকাতার মেসে থেকে সোয়াশো টাকা মাইনের চাকুরে দাদার ঘাড়ের ওপর এমন করে এসে পড়ার কোনো প্রশ্নই কখনো ওঠেনি।

সেদিন অনেক কাছে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। থেকে থেকে কখন প্রসন্ন মুখে পাশে এসে দাঁড়াতেন—তাঁরই দৃষ্টিদীপের আলোয় ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি

আগত : 'আমি অন্ধকারের হৃদয়ফাটা আলোক জ্বল জ্বল'। সন্ধ্যায় সুপুরিবনে যখন জোনাকির ঝাঁক জ্বলত, তখন কানে আসত তারই সুরেলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠধ্বনি : 'সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখী, একটি কেতকী'। নারকেলের পাতায় পাতায় ঝিলমিলে আলো পড়লে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যেত : 'অর্থহারা সুরের দেশে ফিরালে দিনে দিনে—'

সে সুনন্দা নেই—সেই অর্থহারা সুরের দেশও নেই। এখন কিন্তু গোয়ালার গলি। কিন্তু কর্ণেটের সুর আসে না—হরিধ্বনি তুলে মড়া যায় বরানগরের শ্মশানঘাটে।

বরানগর বাজার—বরানগর বাজার—

কণ্ডাক্টারের গলার স্বর সব ছিন্নভিন্ন করে দিলে। চমকে তাকালো শকুন্তলা। ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে কখন পার হয়ে গেছে নোংরা বাগবাজার, পাথর-ওঠা কাশীপুরের পথ। বরানগর বাজারের অপরিচ্ছন্ন তেমাথার সামনে এসে কখন ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলছে বাস।

মিনিট কয়েক দাঁড়াবে এখানে—টাইম নেবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ধীরে ধীরে নিজেকে গুছিয়ে নিলে শকুন্তলা, নেমে এলো বাস থেকে।

বাঁ দিকের ঘিঞ্জি রাস্তাটা দিয়ে সে এগিয়ে চলল।

এতদূর থেকে ওই কলেজে পড়তে যাওয়া—যেমন কষ্ট হয় তেমনি সময়ও লাগে। কিন্তু একসঙ্গে এমন কনসেসন আর স্টাইপেণ্ড কলকাতার আর কোনো কলেজেই পাওয়া গেল না। তাই যাতায়াতে প্রায় দু ঘণ্টা সময় নষ্ট হলেও উপায়ান্তর নেই কিছু। তবে একটা সুবিধে এই যে কলেজ সকালে। সে যখন বেরিয়ে পড়ে তখনো অধিকাংশ অফিস-যাত্রীর চায়ের পেয়ালায় চুমুক পড়ে না ; যখন ফেরে তখন উল্টো স্রোতে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের বড়বাবু-মেজবাবু-জুনিয়ার গ্রেডের দল।

এইটুকুই যা বাঁচোয়া। কখনো কখনো ভয় করে। বিশেষ করে শীতের মেঘলা সকালে। যখন ঠাণ্ডায় চোখ মুখ যেন ছিঁড়ে যেতে থাকে, হাতে বোনা পশমী ব্লাউজটার ভেতরে শীতের কাঁপন ওঠে আর রাত্রি জমে থাকা একেবারে ফাঁকা বাসটার একা যাত্রী শকুন্তলা জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে—তখন। কিন্তু চারদিকের এত ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে মনকে ঘিরে ধরে যে একটু পরে নিজের জন্যে ভয় করতেও প্রায় ভুলে যায় শকুন্তলা। বাবা, ছোট বোনেরা, ছোট ভাই, বড়দা। অভাব, দুশ্চিন্তা—লেগে-থাকা অসুখ। দাদার মাইনের টাকায় আর শকুন্তলার স্টাইপেণ্ডের উদ্বৃত্ত থেকে মাসের কুড়িটা দিন কোনক্রমে টেনে-বুনে চলে, কিন্তু বাকি দশটা দিন যে কী ভাবে নাভিশ্বাস টেনে চালিয়ে যেতে হয়, সেটা ভাবতে গেলেও মাথা ঘুরতে থাকে। চারদিক থেকেই কালো রাত যেখানে ঘনিয়ে আছে, সেখানে একটা শীতের সকাল তার কতখানিই বা ক্ষতি করতে পারে ?

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে থেমে পড়ল একসময়। অজিত নয় ?

সন্দেহ কী—অজিতই বটে। আরো তিন-চারটি ছেলের সঙ্গে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে—কী একটা কথার ওপর অশ্লীলভাবে হাসছে হি হি করে।

ঠিক সেই সময়ে চোখ তুলতেই অজিতও দেখতে পেল দিদিকে। চট করে হাতের জলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিল মাটিতে, নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হল পাশের একটা ছোট গলির ভেতরে।

অজিতের সঙ্গীরা শকুন্তলাকে চেনে না, বুঝতেও পারল না কিছু। তারা সমস্বরে কোলাহল তুলে ডাকতে লাগল : পালালি কেন এই শালা—এই অজিত—আরে শোন্ না শালা—

'শালা'কে উচ্চারণ করল 'শ্লা'।

রাস্তার মধ্যে কিছুক্ষণ শকুন্তলা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বারো বছরের ছেলে অজিত এর মধ্যেই এই স্তরে নেমেছে। যে অজিত সেদিন পর্যন্ত তার কোলের কাছে শুয়ে চোখ বড় বড করে রূপকথা শুনত, গ্রামের স্কুলে শুধু পড়াশুনোয় নয়—স্বভাব-চরিত্রেও ছিল ফার্স্ট বয়, শহরের কলেজ থেকে ছুটিতে বাড়ি ফিরলে দিদি কই মাছ ভালোবাসে বলে ছিপ নিয়ে ধ্যানে বসত পুকুরে—এ সেই অজিত। শুধু সিগারেট ধরেছে তাই নয়—যাদের সঙ্গে মিশেছে তারা সময়ে অসময়ে শকুন্তলার দিকেও লক্ষ্য করে শিস্ টানে।

শুধু মাথার ওপরে সূর্যের জ্বালাই নয়, পায়ের তলাতেও যেন একটা আগুনের নদী পার হয়ে শকুন্তলা বাড়ি ফিরল। নাড়া দিলে কিনু গোয়ালার গলির ফাট-ধরা দরজার ক্ষয়ে-যাওয়া কড়াতে।

দশ বছরের বোন শান্তি দরজা খুলল। ছেঁড়া ফ্রক, ময়লা হাফপ্যাণ্ট্। ছোট ছোট দুটি হাতে মশলা বাটার পাকা জাফ্রাণি রঙ। এই শান্তিকে দেখলে এখন কার মনে হবে দু বছর আগেও তাকে একটা টাট্‌কা ফোটা গোলাপ ফুল বলে সম্ভাষণ করত লোকে ?

শান্তি ফিস্‌ফিস্ করে বললে, আজ ছুটির দিনেও এত দেরি করে ফিরলি দিদি ?

—কাজ ছিল। হয়েছে কী ?

—বাবা ভয়ানক ক্ষেপে গেছেন। যাচ্ছেতাই বলে গালাগাল দিচ্ছেন তোকে।

—দিন—

—নিজেদের ঘরটার দিকে এগোল শকুন্তলা। নিজেদের ঘর। তারা চারজন থাকে এ ঘরে—সে, অজিত, শান্তি আর পাঁচ বছরের ছোট বোন টুনু। আর একখানায় বাবা আর দাদা।

তক্তপোশের কারবার নেই—বিকেলে ঢালা বিছানা পড়ে মেঝের ওপর। এক কোণে

গোটা তিন-চার ট্রাঙ্ক আর টিনের সুটকেস। দেওয়ালে কী একটা তেলকলের খেলো ক্যালেণ্ডার। দরজাটাকে বাঁচিয়ে এদিকে একটা নারকেলের দড়ি টানা—শাড়ি, জামা আর একরাশ ছেঁড়াখোঁড়া টুকিটাকির ভারে মেঝের প্রায় হাতখানেকের মধ্যে নেমে এসেছে। আর এক কোণে তিন টাকা দামের একটা প্যাকিং কাঠের শেল্‌ফে শকুন্তলার বই খাতা—ফাঁকে ফাঁকে প্রায় লুকিয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বার্নার্ড শ' এবং দেশী-বিদেশী আরো দু-চারজন। এই শকুন্তলার বিদ্যাবেদী—এইখানে বসেই সে বি.এ. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাওয়ার স্বপ্ন দেখে, উৎকর্ণ হয়ে থাকে সেই বাঁশি শোনবার জন্যে—যা তাকে সুরের ইন্দ্রধনুরথে রসের বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাবে।

অজিতের তিক্ত বিষাক্ত ব্যাপারটা নিয়ে মনের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে একটা ময়লা আধ-ছেঁড়া শাড়ি জড়িয়ে নিলে শকুন্তলা, এ সপ্তাহে কলেজে যাওয়ার মতো একমাত্র কাপড়-খানাকে সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখতে রাখতে বাবার গালাগালির জন্যে তৈরি হতে লাগল। এসব এখন আর গায়ে লাগে না, অভ্যেস হয়ে গেছে।

বাতের যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে কদর্য কটুভাষায় বাবা সুর ধরেন।

—ধিঙ্গি ধেড়ে মেয়ে আমার কলেজে পড়েন! এদিকে সংসার ভেসে যায়—বুড়ো বাপটা মরে, মেয়ে আমার বিদ্যের জাহাজ হচ্ছেন! বুঝি—বুঝি সব! পড়া তো নয়—নাচতে যাওয়া হয় কলেজে।

আশ্চর্য—সেই বাবা! গ্রামের লোকে বলত দেবতার মতো মানুষ। মা ছাড়া কোন-দিন ডাকেননি শকুন্তলাকে, বলতেন, ও আমার সাক্ষাৎ সরস্বতী। মা-মরা ছেলেমেয়েদের একেবারে আগলে রাখতেন বুক দিয়ে। এই দু'বছরের মধ্যে কী অদ্ভুতভাবে বদলে গেছেন।

একটা ভয়ঙ্কর ইংরেজী গল্প কিছুদিন আগে পড়েছিল—মনে আছে। একজন লোক একটু একটু করে তার আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল একটা ঘোড়ার মধ্যে, নিজে মরে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বাবার সম্বন্ধেও তেমনি একটা সন্দেহ হয় তার। কোন্‌দিন মরে ফুরিয়ে গেছেন, কার একটা হিংস্র প্রেতাত্মা এসে সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর ভেতরে।

কিন্তু গালাগালটা এখনো শোনা যাচ্ছে না কেন? সে ফিরেছে এটা বুঝতে তো বাকি থাকার কথা নয়। দরজার কড়া নড়েছে—শান্তি দোর খুলে দিয়েছে—জুতোর শব্দ উঠেছে, তবু বাবা এখনো নীরব কেন? ঘুমিয়ে পড়েছেন খুব সম্ভব। সারারাত বাতের জ্বালায় ছট্‌ফট করে হয়তো চোখ বুজেছেন একটুক্ষণের জন্যে। ছোট বোন টুনুরও দেখা নেই—ল্যাভেণ্ডার হুপিং কাশি টেনে সেও বোধ হয় বাবার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তবু বাঁচোয়া।

একদিন সহ্য করতে না পেরে বলে ফেলেছিল, বেশ তো বাবা, তোমার যদি পছন্দ না

হয়, পড়াশুনো ছেড়েই দিচ্ছি আমি।

শুনে বাবা বিশ্রীভাবে মুখ ভেংচে উঠেছিলেন।

—আহা, তা আর ছাড়বে না! তা নইলে আর এমন করে খাইয়েদাইয়ে তালগাছ করে তুললাম কেন! পাস করে বেরুলে একটা চাকরিবাকরি হবে—দুটো পয়সা এনে দিতে পারবে। আপন সন্তান হয়ে বাপের এটুকু উপকার কোন্ দুঃখে করতে যাবে শুনি?

না, বাবার ওপর আর রাগ হয় না। বুঝতে পারে বাবাকে, বুঝতে পারে কোথায় তাঁর ব্যথা। এই পচা চুন-বালি আর আরশোলার গন্ধভরা দম-আটকানো ঘরের মধ্যেই বাঁধা পড়ে গেছে বাবার জীবন; সুনন্দার দুধের মতো জলে ঢেউ ওঠে না এখানে, সুপুরি নারকেলের বন দুলিয়ে ছুটে আসে না বুক-জুড়োনো হাওয়া। একটা করুণাহীন অন্ধকূপের মধ্যে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন বাবা। আর তারই মধ্যে একটুখানি অন্তত বাইরে বেরুতে পায় শকুন্তলা—পথে, কলেজে একটা বিস্তৃততর জীবনের ভেতরে ফেলতে পায় মুক্তির নিশ্বাস। বাবার যা কিছু হিংসা আর হিংস্রতার উৎস ওইখানে।

—দিদি, খাবি আয়—শান্তি ডাকল।

না, আর বসিয়ে রাখা উচিত নয় বাচ্চাটাকে। বেলা একটা পার হয়ে গেছে। শান্তির শীর্ণ ক্ষুধিত মুখখানা দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল।

সকালে শকুন্তলার কলেজ পড়াতে এই বাচ্চা মেয়েটার ওপরেই রান্নাবান্নার ভার। নটায় বড়দার অফিসের ভাত দিয়ে, দশটার মধ্যে বাবাকে খেতে দিতে হয়—বুড়ো মানুষ বাবা আজকাল একেবারে খিদে সইতে পারেন না। তারপর অজিত আর সে খেয়ে নিয়ে ছোটে ইস্কুলে। শকুন্তলার খাবার ঢাকা দেওয়াই থাকে। টুনু কোনো কোনো দিন বাবার সঙ্গে খেয়ে নেয়—কোনো দিন বা দিদির জন্যে অপেক্ষা করে।

অতটুকু মেয়ের ওপর বড্ড বেশি চাপ পড়ে সকালে। অবশ্য দুপুর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত জোয়ালটা শকুন্তলাই কাঁধে তুলে নেয়—তবুও! কিন্তু উপায় নেই—কী করা যায়!

রান্নাঘরে এল শকুন্তলা। দুজনের ভাত বেড়ে নিয়ে ক্ষুধিত কাতর মুখে অপেক্ষা করছে শান্তি।

খেতে বসে শকুন্তলা জিজ্ঞেস করলে, টুনি খায়নি?

—অনেকক্ষণ।

—ছোটদা সেই এগারোটার সময় কোথায় চলে গেল। বাবা বারণ করলেন, শুনল না। বললে, কোন্ এক বন্ধুর বাড়িতে পড়তে যাচ্ছে।

—হুঁ!—শকুন্তলা চুপ করে রইল। সকালের কড়কড়ে শুকনো ভাতগুলো যেন আটকে যাচ্ছে তালুতে।

হাতের ভেতর কতগুলো ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল শাস্তি, তারপর চুপি চুপি বললে, ছোটদা বোধ হয় আজকাল পয়সা চুরি করে দিদি !

গেলাসের গায়ে হাতটা শক্ত হয়ে আটকে গেল শকুন্তলার : তাই নাকি ?

—সকালে বড়দা খুব হৈ-চৈ করছিল। পকেটে নাকি ছ-আনা খুচরো ছিল, পাওয়া যাচ্ছে না।

স্বাভাবিক—খুব স্বাভাবিক। এই অন্ধকূপে, এই হীনতার ভেতরে এ ছাড়া কী আর করতে পারত অজিত ? নিজের চোখেই তাকে দেখেছে কতগুলো বখাটে রকবাজ ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে।

—হুঁ !—এবারও সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে শকুন্তলা।

আর একটা কী বলি বলি করে কিছুক্ষণ দ্বিধা করলে শাস্তি। তারপর : ছোটদা খুব খারাপ হয়ে গেছে দিদি !

শকুন্তলা চোখ তুলে তাকাল।

—ক্লাস এইটের লীলা বলছিল, ছোটদা নাকি কাল ওদের দেওয়ালে একটা চক দিয়ে কী সব যাচ্ছেতাই কথা—

—চুপ কর্—আচমকা সমস্ত জ্বালা নিয়ে শকুন্তলা নির্দোষ শাস্তির ওপরেই অসহ্য ক্রোধে বিদীর্ণ হয়ে পড়ল : অত কথায় তোর কাজ কী ? কাল যে তোদের পরীক্ষার প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেবার কথা ছিল—দেয়নি ?

শাস্তি পাথর হয়ে গেল। যে গ্রাসটা মুখে তুলতে যাচ্ছিল, নামিয়ে ফেলল থালার ওপর।

—জবাব দিচ্ছিস না যে ? দেয়নি প্রোগ্রেস রিপোর্ট ?

—দিয়েছে—ফিসফিসে গলায় শাস্তি জবাব দিলে।

—কোথায় সেটা ?

—অঙ্কে আর ইংরেজীতে ফেল করেছি দিদি—ঝরঝর কেঁদে ফেলল শাস্তি। সারা-দিনের ক্লান্ত, অভুক্ত মেয়েটার বেড়ে নেওয়া ভাতের ওপর টপ্ টপ্ ঝরে পড়তে লাগল চোখের জল।

নিজের এই নিষ্ঠুরতায় বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে ছিঁড়ে গেল শকুন্তলার। চারদিকের আঘাত খেয়ে খেয়ে প্রতিঘাত তো দিতেই হবে একজনকে। এমন একজন—যে তার চাইতেও দুর্বল—তার চাইতেও অসহায়। শাস্তি !

থালা ছেড়ে উঠে গেল শকুন্তলা।

কিন্তু সাতদিন পরে বাইশে শ্রাবণ। বাবা আর টুনু ঘুম থেকে ওঠবার আগে, দাদা অফিস থেকে ফেরবার আগে, অজিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত তার হাতে কিছু-

ক্ষণ সময় আছে। 'রবীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যুকল্পনা' প্রবন্ধটা তাকে আরম্ভ করে দিতেই হবে— লিটারারি সোসাইটির সেক্রেটারির মান থাকবে না তা নইলে।

ততক্ষণ চোখের জল শাস্তিরই পড়তে থাকুক।

শেষ পর্যন্ত ডক্টর তুষার দত্তকেই রাজী করানো গেল।

সবিতার দল ইতিমধ্যেই কী করে খবর পেয়েছে সভাপতি জোটেনি। চারদিকে দস্তুরমতো প্রোপাগ্যাণ্ডা জুড়ে দিয়েছিল তাই নিয়ে। হঠাৎ খবরটা পেয়ে দমে গেল তারা।

আশেপাশে আরাধনাদি কোথাও আছেন কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে আর একবার কোমর বেঁধে কমন রুমের টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে গেল ইরা।

—দেখো আসছে পঁচিশে বৈশাখে কী করি! একজন দুজন নয়—তিন তিনজন সভাপতি নিয়ে আসব, প্রেসিডিয়াম করে তুলব একেবারে। সেই সঙ্গে দুজন প্রধান অতিথি।

—তখন তো কলেজ বন্ধ থাকবে—একজন ভুল শুধরে দিলে।

একবার থতমত খেয়েই ইরা নিজেকে সামলে নিলে: থাকলেই বা কলেজ বন্ধ। তোমরা তো আর ঘরে বন্ধ থাকবে না। এদিকে দিনরাত রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ করো— অথচ ছুটির দিনে একটা ফাংশন করতে গেলে সব ভক্তি উবে যাবে বুঝি?

সবিতার দল থেকে একজন টিপ্পনী কাটল: আচ্ছা, দেখা যাবে। সামারের ছুটিতে তোমার চুলের ডগাটুকুও দেখতে পাওয়া যায় কিনা? নিজেও তো ঊর্ধ্বশ্বাসে সিমলা পাহাড়ে মামারবাড়িতে ছোট!

ইরা আবার ঝগড়া বাধাতে যাচ্ছিল, শকুন্তলা এসে পড়ল মাঝখানে।

—চুপ কর ইরা। ওসব বাজে তর্ক করে লাভ নেই। চল, প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে একবার কথা বলে আসি। আর তিন দিন বাদে তো ফাংশন। অন্তত দুটো দিন লাস্ট পিরিয়ডটা আমাদের 'অফ' করে না দিলে ভারী অসুবিধা হচ্ছে নাচ আর গানের রিহার্সালে।

সত্যি, কাজের আর অন্ত নেই। যেটুকু সময় কলেজে থাকে যেন নিশ্বাস ফেলবারও সময় পায় না শকুন্তলা। মেয়েরা সব যেন কী! পান থেকে চুনটি খসলে অভিমান করে বসে। হিমানী বশ মানে তো শিখার রাগ পড়ে না, বেণুকে যদি বা বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা গেল তো মুক্তিকে ডেকে পাওয়া যায় না। মুখরা আর প্রখরা ইরা সঙ্গে না থাকলে শকুন্তলার সাধ্যও ছিল না এদের সামলে রাখা। জোর করে তাকে লিটারারি সেক্রেটারি আর কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটার করে দেওয়া ইরারই কীর্তি—এই দুঃসময়ে সে-ই সঙ্গে সঙ্গে আছে বিশ্বস্ত সেনাপতির মতো। বলতে গেলে ডক্টর দত্তকে ধমকে রাজী করিয়েছে একরকম।

ডক্টর দত্ত জানিয়েছিলেন, ওইদিন তাঁর একটা আর্ট কন্‌ফারেন্স আছে।

শুনেই হাত পা নেড়ে বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছিল ইরা।

—রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ওয়ার্ক করেছেন আপনি—একজন এডুকেশনিস্টও বটেন। স্টুডেন্টদের এটুকু দাবিও যদি আপনারা মেনে নিতে না পারেন তা হলে কোথায় আমরা যাব বলুন তো ?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চাইতে সভাপতি হওয়াটাই সহজ বলে মনে হয়েছে ডক্টর দত্তের। হেসে বলছেন, আচ্ছা, এক ঘণ্টা স্পেয়ার করতে পারি আমি।

—ওতেই যথেষ্ট হবে—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে এসেছে ওরা। পথে বেরিয়ে ইরা বলেছে, এক ঘণ্টা ! ফাংশন হতেই দেড় ঘণ্টা, তার পরে তো প্রেসিডেন্টের অ্যাড্রেস ! দু ঘণ্টার আগে পালান কী করে দেখব।

কিন্তু থেকে থেকে ক্লান্ত লাগে শকুন্তলার। এখানে উৎসাহ, আয়োজন, চঞ্চলতা। আর একটা পৃথিবী। এখানে গন্ধধূপ জ্বলবে, রবীন্দ্রনাথের আলোকমূর্তির গলায় দুলবে ফুলের মালা, একটা স্বপ্নিল নীলিম আলোয় ভরে যাবে ঘর, তানপুরার ব্যথিত মূর্ছনার সঙ্গে বেণু বোসের ভাবগম্ভীর মধুমতী গলায় গান উঠবে : 'সমুখে শান্তি পারাবার'। চারদিকে অনুভব করা যাবে কবিগুরুর শুচিস্মিত আবির্ভাব—সমস্ত মন এক মুহূর্তে দেওয়ালের আড়াল ভেঙে বেরিয়ে যাবে, পৌঁছুবে সেখানে—শান্তি-সাগরের তরঙ্গ দোলায় দোলায় যেখানে একটি শ্বেতপদ্ম বিকশিত হয়ে উঠছে আর তার ওপরে ধ্যানাসীন হয়ে আছে সুন্দরের জ্যোতিঃস্বরূপ।

বাইশে শ্রাবণ !

আর সেদিন বরানগরের একতলা ইট-বের-করা বাড়িতে নতুন একটা কুকীর্তির কাহিনী শোনা যাবে অজিতের। আরো কুশ্রী গলায় অবিশ্রাম গালাগালি দিয়ে যাবেন বাতে পঙ্গু অক্ষম বাবা। কাশির ধমকে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে যেতে চাইবে টুনুর, গোগ্রাসে গিলে একশো পঁচিশ টাকার চাকরিতে ছুটবে বড়দা—মুখের ভাত চোখের জলে ভেসে যাবে শান্তির।

পিছন থেকে ইরা বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? চল্ দেখে আসি কেমন তৈরি হয়েছে হিমানীর নাচটা।

'ক্ষমো হে ক্ষমো—নমো হে নমো'—রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটা আকুল আর্তি যেন বুকের ভেতর থেকে বিদীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতে চায় শকুন্তলার। ক্ষমা করো কবিগুরু—ক্ষমা করো আমাকে। তোমার কিছু গোয়ালার গলিতেই বাসা বেঁধেছি—কিন্তু এখনো তো বাঁশির ডাক শুনতে পেলাম না !

ঘুমের মধ্যে টুনি থেকে থেকে কেশে উঠছে। রাত্রেই বাড়ে উপদ্রবটা। সারারাত কী অসহ্য কষ্টেই যে কাটে মেয়েটার। তবু আজ দশদিনের মধ্যে কোথা থেকে দাদার বিনা পয়সায় চেয়ে আনা কয়েক পুরিয়া হোমিওপ্যাথি ছাড়া আর কোনো ওষুধই পড়ল না। কালকের হাঙ্গামাটা চুকিয়ে ফেলতে পারলে যেমন করে হোক নিজেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে শকুন্তলা।

সন্ধ্যেবেলা বাবার কাছে ঘা-কয়েক খড়মপেটা খেয়েছে অজিত। ঘণ্টাখানেক হাউমাউ করে ভাতের প্রতি অসহযোগ জানিয়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওর জন্যে ভাবনা নেই—বড়দা এসে কান ধরে টান দিলেই সুড়সুড় করে খেতে বসবে। বাবা ওঘরে এখনো ঘুমোননি—গজগজ করে অশ্রান্ত কণ্ঠে গালাগাল দিয়ে চলেছেন: পৃথিবীর কাউকে—কোনো কিছুকে একবিন্দু ক্ষমা নেই তাঁর। বাবার গালাগালিগুলো আজকাল আর কান পেতে শোনারও দরকার হয় না—একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে সমস্ত।

কিন্তু এখনো কেন ফিরছে না দাদা? রাত তো দশটার কাছাকাছি!

প্রবন্ধটা শেষ করে ক্লান্তির একটা হাই তুলল শকুন্তলা। মন্দ দাঁড়ায়নি—লিখে নিজেরই তৃপ্তিবোধ হচ্ছে। অনেক খুঁজে খুঁজে উদ্ধৃতি দিয়েছে ইংরেজ কবিদের—রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় মৃত্যুর স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নিজেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে বার বার। কলমের মুখে সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে লিখেছে—মনের অন্ধকার খনির ভেতর থেকে এক একটা জলজ্বলে হীরার খণ্ডের মতো চুনে চুনে এনেছে শব্দ। লিটারারি সোসাইটির সেক্রেটারির অযোগ্য হয়নি লেখাটা।

স্লিপগুলো পর পর সাজাতে সাজাতে শকুন্তলা শান্তির দিকে তাকালো। লণ্ঠনের এ পাশে উবু হয়ে বসে ঘুমে জর-জর চোখে শ্লেটের ওপর প্রশ্নের অঙ্ক কষছে শান্তি।

শকুন্তলা বললে, শুয়ে পড়্ শান্তি। আর অঙ্ক কষতে হবে না এখন।

—থাক্, বড়দা আসুক।

—কখন আসবে তার তো ঠিক নেই। তুই শো গে যা।

ঘুম-ভরা চোখ দুটোকে দু'হাতের পিঠে ডলে নিয়ে শান্তি সোজা হয়ে বসল।

—বড়দা আজকাল বড্ড রাত করে ফেরে—না দিদি?

—হুঁ। অফিসের পরে কী একটা ব্যবসার কাজে ছুটোছুটি করে—তাইতেই রাত হয়।

—ও।—শান্তি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ: কিন্তু ছোড়দা বলছিল—কথাটা শেষ করার আগেই সে থেমে গেল।

—কী বলছিল অজিত?—একটা আকস্মিক সন্দেহে মুহূর্তের মধ্যে শকুন্তলা সংকীর্ণ হয়ে উঠল।

ভীত ম্লান মুখে শান্তি বললে, শুনলে রাগ করবে তুমি।

—রাগ করব না, বল্।

ছোটদা বলছিল—একটা ঢোঁক গিলল শান্তি : বড়দার ব্যবসা না হাতী। ছোটদা নাকি নিজের চোখে দেখেছে আলমবাজারে কী একটা আড্ডায় বড়দা সন্ধ্যের পর জুয়ো খেলে—মদও—

—অজিত!—প্রেতিনীর মতো তীক্ষ্ণ গলায় প্রায় ককিয়ে উঠল শকুন্তলা। অজিত সাড়া দিলে না, নড়ল না পর্যন্ত। যেন মড়ার মতো অঘোর ঘুমে মগ্ন।

—অজিত!—আর একবার তেমনি অস্বাভাবিক তীব্র স্বরে শকুন্তলা বিস্ফোরিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু অজিত সাড়া দেওয়ার আগেই নাড়া খেল দরজার কড়া। ঝন-ঝন করে একেবারে ভেঙে ফেলতে চাইল ক্ষয়ে যাওয়া দরজাটাকে।—এত রাতে বাড়িতে ডাকাত পড়ল নাকি? বাবা খন্-খন্ করে উঠলেন।

—বড়দা এসেছে—ছুটে দরজা খুলতে গেল শান্তি। হুড়কোর আওয়াজ এল—আওয়াজ এল পাল্লা দুটোকে সজোরে আছড়ে ফেলার, এল ধপ্ ধপ্ করে কয়েকটা জুতোর অসংলগ্ন ভারী ভারী শব্দ, তারপরেই কুয়োতলার বালতিটাকে নিয়ে সবেগে কেউ উঠোনের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

—ও মাগো!—শান্তির আর্তনাদ বাজল পাড়া কাঁপিয়ে। ছুটে বেরুল শকুন্তলা, খোঁড়া পা নিয়ে টলতে টলতে বেরুলেন বাবা।

দুটো লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল উঠোনের ওপরে লম্বা হয়ে পড়েছে রণজিৎ। বমি করে ভাসিয়ে দিচ্ছে সব। মদ আর একরাশ অজীর্ণ খাদ্যের টুকরোর অম্ল গন্ধে আবিল হয়ে গেছে চারদিক।

—রণজিৎ! রণজিৎ! কী হল?—কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসতে লাগলেন বাবা।

—কিচ্ছু হয়নি দাদার—নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে রক্তাক্ত করে দিতে চাইল শকুন্তলা : দাদা মদ খেয়েছে!

—মদ! —বাবা দু'পা পিছিয়ে গেলেন, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন : হারামজাদা, শুয়োর—

রণজিৎ আস্তে আস্তে মাথা তুলল খানিকটা, জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, খামোকা চ্যাচাচ্ছ কেন? মদ খাই, জুয়া খেলি—যা খুশি করি, তোমাদের টাকা তো এনে দিয়েছি!—অনিশ্চিত হাতে বুকপকেটের ভেতর থেকে কী কতকগুলো টেনে বার করে সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে, তারপর আবার নিজের বমির ওপরই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

—টাকা!—ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো উচ্চারণ করলেন বাবা।

টাকাই বটে। একরাশ দশ টাকার নোট কাগজের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে উঠোনময়।

বাবার কোটরে-বসা অদৃশ্য চোখ দুটো জ্বলে উঠল দুখানা নতুন সিকির মতো, আর একবার বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন : হারামজাদা—শুয়োরের বাচ্চা!—তারপর, না, তারপর স্বপ্ন দেখল না শকুন্তলা : বেতো শরীরে প্রাণপণে নত হয়ে উঠোন থেকে নোটগুলো থাবা দিয়ে দিয়ে তুলে নিচ্ছেন বাবা, লণ্ঠনের আলোয় তাঁর পাকা চুলগুলো রুপোর তারের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে।

খিক্ খিক্ করে অশ্লীল হাসির আওয়াজ এল একটা। পাথরের মূর্তি শকুন্তলা যেন হাতুড়ির ঘা খেয়ে নিজের চেতনাটা কুড়িয়ে পেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে অজিত হাসছে।

—আমি তখনি বলেছিলাম—

কুয়োতলা থেকে আধখানা ইট কুড়িয়ে অজিতের দিকে ছুঁড়ে মারল শকুন্তলা। লাগল না—পুরনো দেওয়াল থেকে একরাশ চুনবালিই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল শুধু। এক লাফে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হল অজিত।

—"সনাতনম্ এনম্ আহুর—"

বেদমন্ত্র পড়ছে সুনেত্রা গোস্বামী—গম্ভীর মন্ত্রধ্বনিতে সমস্ত সভাটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চন্দন, ফুল আর ধূপের গন্ধে পূজামণ্ডপের পবিত্রতা আকীর্ণ হয়ে গেছে। বড় ফটোখানার ভেতরে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের—যেন বেদমন্ত্রের প্রতিটি উদাত্ত অনুদাত্তের আহ্বান একটু একটু করে জ্যোতির্বলয় বিকীর্ণ করে দিচ্ছে তাঁর চারদিকে।

চোখ বুজে বসে আছেন সভাপতি—চোখ বুজে বসে আছেন সভার সকলে। এমন কি সবিতার দলও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল শকুন্তলা। বরানগরের বাসা মুছে গেছে—মুছে গেছে কাল রাত্রির সমস্ত দুঃস্বপ্ন—ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে বিনিদ্র প্রহরগুলির সেই পঙ্কস্নান! রবীন্দ্রনাথের দুটি উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চোখ থেকে যেন করুণার অমৃতধারা এসে ধন্য করে দিচ্ছে তাকে। শকুন্তলার মনে হতে লাগল—ওই গন্ধধূপের ধোঁয়ার মতো তার সমস্ত অস্তিত্বও অমনি বায়বীয় হয়ে যাক, মিলিয়ে যাক জীবনের যা কিছু ভার আর যত কিছু তুচ্ছতা—অমনি শূন্যময় হয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তির পায়ে সে নিঃশেষিত করে দিক তার নিবেদিত প্রণাম।

—শকুন্তলাদি—মাধবী এসে স্পর্শ করল তাকে।

বিরক্ত হয়ে শকুন্তলা ফিরে তাকালো।

—কী হল আবার?

—একবার মেক-আপ রুমে এসো। ওরা ডাকছে।

—আঃ, একটা মুহূর্ত এরা শান্তি দেবে না! শকুন্তলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: চল্—

কমন ক্রমেই মেক-আপ চলছে। ফুলের গয়না সর্বাঙ্গে পরে শ্রীমতীর ভূমিকায় তৈরি হয়েছে হিমানী গুপ্ত—সুন্দরী মেয়েটিকে অপরূপ লাগছে দেখতে। মুগ্ধ হয়ে গেল শকুন্তলা।

—বাঃ, বেশ হয়েছে।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে'র কর্ণ ইরা। নাকের নিচে ক্রেপের গোঁফটা চেপে ধরে হেসে অস্থির হয়ে উঠল।

—এই, আমাকে দেখছিস না? কেমন গোঁফটা লাগিয়েছি বল্ তো? একেবারে মহাবীর কর্ণ বলে মনে হচ্ছে না?

—চুপ চুপ, শুনতে পাবে ওখানে।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আরাধনাদি মেক-আপের চার্জে। অমন ভারিক্কি মানুষ প্রসন্ন হাসিতে মুখ আলো করে বললেন, কেমন শকুন্তলা, ঠিক হয়েছে সব?

—চমৎকার হয়েছে!

ইরা আবার ফিরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো—তারপর মুখভঙ্গি করে দেখতে লাগল—ক্রেপের গোঁফটায় তাকে কেমন মানিয়েছে।

একটু হেসে শকুন্তলা হলঘরে ফিরে এল।

একটার পর একটা প্রোগ্রাম হয়ে চলল স্টেজের ওপর। চমৎকার উৎরে যাচ্ছে সব-গুলো। সবিতার দলের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না একটুও। অসীম আত্মপ্রসাদে আর গভীর তৃপ্তিতে দেওয়ালের কোণে নিজের জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে রইল শকুন্তলা। তার প্রবন্ধটা পড়া হয়ে গেছে সকলের আগেই: সভাপতি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন: 'সাধু সাধু'। প্রিন্সিপ্যাল্ তার দিকে সস্নেহ-চোখে তাকিয়েছিলেন, এমন কি সি. সি. বি. পর্যন্ত বলেছেন 'চমৎকার!' কোথাও আর ক্ষোভ নেই শকুন্তলার—এতটুকু গ্লানি অবশিষ্ট নেই কোনোখানে। বরানগরের বাসা অনেক দূরে পড়ে থাকুক, আপাতত নিজের মধ্যে সে চরিতার্থ হয়ে গেছে। হলের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে, লাল-নীল-হলুদ-সবুজ ফোকাসের সঙ্গে স্টেজের ওপর নাচ শুরু হয়েছে হিমানীর। নেপথ্য থেকে মৃদু অর্কেস্ট্রার সঙ্গে বেণু বোসের মধুক্ষরা গলা মাইকের মধ্য দিয়ে নির্ঝরিত হয়ে পড়ছে:

'আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে-বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে—
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে—'

চমৎকার নাচছে হিমানী—নাচের প্রতিটি ছন্দে, প্রতিটি মুদ্রায় তার সর্বাঙ্গ যেন দীপ্ত হয়ে উঠছে 'ঘনসাংসক্তদিগন্তেন দীপেন তমধৎসিনা'।

ওই নাচের তালে তালে—ওই প্রতিটি আভরণ ছুঁড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার যেন নিজেকেও ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল: 'তোমার পায়ে মোর সাধনা মরে না যেন লাজে'!

—শকুন্তলাদি!

এই সময় আবার ডাকতে এল সন্ধ্যা।

—সব সময়ে কেন বিরক্ত করিস বল্ তো? নাচটা দেখতে দে না একটু—ক্রুদ্ধ শকুন্তলা তর্জন তুলল ফিস্ ফিস্ করে।

—বা রে!—কানে কানে সন্ধ্যা বললে, খাবার আনা হয়নি যে এখনো। দশটা টাকা দাও শীগগির—একটু পরেই তো চলে যাবেন প্রেসিডেণ্ট।

—উঃ, জ্বালিয়ে মারলি—

হল থেকে বেরিয়ে আলোকিত করিডোরে এসে দাঁড়াল শকুন্তলা। ব্যাগ খুলল।

কিন্তু এ কি!

চাঁদার অবশিষ্ট অন্তত কুড়ি টাকা ছিল ব্যাগে—অন্তত আজ দুপুর পর্যন্তও ছিল। একটা টাকাও নেই সেখানে। শুধু মাঝখানে আনা আটেক খুচরো পয়সা পড়ে আছে। বাসে আসবার সময় ব্যাগের এ পকেটটা সে দেখেনি—শুধু খুচরো থেকে বাসভাড়াটা বের করে দিয়েছিল খালি।

কোথায় গেল টাকা?

বেণু বোসের গান যেন একরাশ ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে মিলিয়ে গেল। হলঘর, রবীন্দ্রনাথ, হিমানীর নাচের ছন্দ—এক মুহূর্তে তলিয়ে গেল। মনে হল কালো অন্ধকার থেকে বরানগরের বাসার পচা দুর্গন্ধটা তার চারপাশে পাক খেয়ে যাচ্ছে—কানে আসছে মাতালের কতগুলো অবোধ্য কুৎসিত চিৎকার।

খাবার—প্রেসিডেণ্টের ট্যাক্সি ভাড়া—খুচরো খরচ—

অজিত। দুপুরবেলা একবার চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। শকুন্তলা তখন খেতে বসেছে। হাঁ, অজিত—সন্দেহমাত্র নেই। দাদা যদি জুয়ো খেলে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে পারে, বাবা যদি সেই ক্লেদাক্ত নোটগুলোকে অমন লোলুপ হয়ে কুড়িয়ে নিতে পারেন—তা হলে—তা হলে অজিতের কী দোষ?

কিন্তু কী বলবে শকুন্তলা? কী কৈফিয়ৎ দেবে? কোন্ লজ্জায় বলবে চাঁদার টাকা তার নিজেরই ভাই—

বাবা-দাদা-অজিত! কেউ বাদ নেই—কেউ না। সবাই যখন পঙ্কের মধ্যে ডুবে গেছে,

তখন সে কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে একটা শুকনো ডাঙার ওপরে ? সে-ও চোর—ও টাকা সেই-ই চুরি করেছে।

মাথার মধ্যে রক্ত ঘুরতে লাগল—আগুন জ্বলতে লাগল সারা শরীরে। যেন দুটো চোখ অন্ধ হয়ে গেল শকুন্তলার। যেন মৃত্যুর একটা পিছল সিঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে অন্ধের মতো সে নেমে চলল পাতালের দিকে।

কমনরুমে একা এসে দাঁড়াল শকুন্তলা। কেউ কোথাও নেই। শূন্য ঘরে একটা আলো জ্বলছে, আর গোল বড় টেবিলটার ওপর পড়ে আছে একখানি সঞ্চয়িতা, কয়েকটা শাড়ি-জামা, জোড়া-তিনেক চশমা, গোটা-দুই রিস্টওয়াচ আর লাল-সাদা-সবুজ-খয়েরী একরাশ মেয়েদের ব্যাগ।

না, কোথাও কেউ নেই। হিমানীর নাচ দেখতে সবাই উইংসের ধারে ভিড় জমিয়েছে —এমন কি, আরাধনাদিও। এক মুহূর্ত আর অপেক্ষা করল না শকুন্তলা। চকিতের মধ্যে তুলে নিলে পাইথন-লেদারের একটা সৌখীন ব্যাগ। জিনিসটা চেনা—বেণু বোসের। লাখোপতির মেয়ে বেণু বোস—তিন রকমের মোটরে চড়ে কলেজে আসে। তার ব্যাগে কুড়িটা টাকা হাত দিলেই তুলে নেওয়া যাবে—বেণু হয়তো কোনোদিন টেরও পাবে না!

অনুমান ভুল হল না। মেয়েলী প্রসাধনের সুগন্ধিভরা ব্যাগটার ভেতর থেকে দুখানা সুরভিত নোট বের করে নিয়ে সেটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখল শকুন্তলা। হাত কাঁপল না, পা কাঁপল না একবার। তারপর তেমনি ভাবেই বেরিয়ে এল কমনরুম থেকে।

ছায়াবাজির মতো কখন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। ডক্টর দত্ত অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলে গেলেন। তার একটা শব্দও ভালো করে বুঝতে পারল না শকুন্তলা—একটা কথার অর্থবোধ করতে পারল না। শুধু নোট দুটোর উগ্র সুগন্ধ তার মস্তিষ্কের ভেতর বিঁধতে লাগল একরাশ কাঁটার মতো।

দুধের মতো শুভ্র সন্দেশ—পরিপাটি খাবার। চুরির একবিন্দু ময়লা তাতে লাগেনি। তবু এক টুকরো সন্দেশ ভেঙে মুখে দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন সভাপতি।

বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে ভেঙে পড়ল শকুন্তলার। গন্ধ পেয়েছেন নাকি—চুরি-করা নোটের গন্ধ ?

সভাপতি বললেন, চমৎকার অনুষ্ঠান হয়েছে—ভারী আনন্দ পেলাম। আসি তা হলে—নমস্কার।

আর একবার—আর একবার চোরের মতো ফিরে এল শকুন্তলা। ফিরে এল হলঘরে। কেউ নেই। বেণু বোসের মোটর কখন চলে গেছে—মেয়েরা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে যে-যার বাড়িতে। শুধু তারই যাওয়া হয়নি এখনো—অর্ধেক পথ থেকে ফিরে এসেছে।

শূন্য হলঘরে এখনো আলো জ্বলছে—বেয়ারারা চাবি বন্ধ করে যায়নি। বেদীর ওপর

রবীন্দ্রনাথের মালা-চন্দন-ভূষিত চিত্রমূর্তি। একটা ধূপকাঠির শেষ প্রান্তটুকু তখনো জ্বলছে, একটা প্রদীপের বুক জ্বলেছ তখনো।

কান্নার বেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে শকুন্তলা ছবির সামনে লুটিয়ে পড়ল।

—তুমি দেবতা, তুমি মহাকবি। মানুষের প্রেমে তোমার চোখের জল ঢেলে পৃথিবীকে তুমি ধন্য করে গেছ। তুমিই বলো আমার কতখানি অপরাধ? বাবা-দাদা-অজিত-আমি—আজ তোমার মৃত্যুতিথিতেও কেন এমন করে পাপের অন্ধকারে তলিয়ে চলেছি—তুমিই তার জবাব দাও।

মর্গ

ছোট মফস্বলের শহরের চোখে ব্যাপারটা বাড়াবাড়িই ঠেকল।

নিতান্ত অনুল্লেখ্য একটি সাব্‌ডিভিসন্যাল হেড কোয়ার্টার। ছোটখাটো আদালতে জনসাতেক উকিল আর সতেরোজন মোক্তার। একজন এম. বি. ডাক্তারকে ঘিরে আছে জনসাতেক এল. এম. এফ. আর হাতুড়ে, তিনজন এম. বি. হোমিও আর জন-দুই কণ্ঠী-গলায় হুঁকো-হাতে কবিরাজ। ছেলেদের হাই স্কুলে ব্ল্যাক্‌বোর্ডগুলো প্রায় সাদা আর মেয়েদের এম. ই. স্কুলে টিনের চাল।

তবু এই শহরের গা ঘেঁষেই চালের কল বসল। একটা নয়—পাশাপাশি দুটো।

শহরের প্রান্ত-বাহিনী একটি নদী। একরাশ চিকচিকে বালি আর একহাঁটু জল নিয়ে সাপের খোলসের মতো নিষ্প্রাণ। ওই নদীর ওপারে চক্ররেখা পর্যন্ত ধু ধু মাঠ—ধানের মাঠ। মেটে রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, ভারমন্থর বলদের ক্লান্ত পদক্ষেপে, তেলহীন চাকার আর্তনাদ তুলে শহরে আসে ধানের গাড়ি। ধান আছে, জোতদার আছে, ধান বিক্রির গন্ধ আছে। সুতরাং যোগ অঙ্কের ঠিকের মতো এল চালের কল। উঠলো সরু সরু কালো চিমনি, বাতাসে ছড়ালো সেদ্ধকরা ধানের একটা তপ্ত লঘুস্বাদ গন্ধ, বাঁধানো কম্পাউণ্ডে শুকোতে লাগল স্তূপীকৃত ধান আর আকাশে শুকতারাটা নিবে যাবার আগেই রাত্রির শেষ হৃদস্পন্দনের মতো মুখরিত হল ছাঁটাই কলের আওয়াজ।

ঢেঁকি-ছাঁটা রাঙা চালের বদলে এল শুভ্র মল্লিকা ফুলের মতো ভাত। নীরক্ত শুভ্রতার মতো অন্তঃসারশূন্যতা।

ছোট শহরটি বরং গর্ববোধ করল। যেন সমৃদ্ধ হয়ে উঠল কোনো একটা নতুন আভিজাত্যে। কাচভাঙা কেরোসিন-ল্যাম্পের বিষণ্ণ লজ্জাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল চালের কলের একসার বিজলী আলো। ট্রেনে আসতে আসতে দূর থেকে আঙুল বাড়িয়ে লোকে বলে, ওই যে ইলেকট্রিক লাইট দেখা যাচ্ছে, আমাদের শহরে এসে পড়লুম।

হ্যাঁ—গর্বের কারণ বৈকি! কিন্তু তবু—

তবু মন্মথ ডাক্তারের বউ। ছোট শহরের এই নিস্তরঙ্গ লেগুনে যেন টাইফুন জাগিয়ে তুলল।

দুবার আই. এ. ফেল করে শহরে এসে হোমিওপ্যাথ হয়ে বসেছিল মন্মথ। এক টুকরো টিনের পিঠে আলকাৎরা মাখিয়ে নিজেই তাতে লিখল: এম. বি. (হোমিও), ডি. পি. এম.। হোমিওপ্যাথের ক্ষেত্রে যা হয়—কেউ কখনো জানতে চাইল না সে ডিগ্রী পেল কবে, ডি. পি. এম. অক্ষরগুলোর মানে জানবার জন্যেও প্রকাশ করল না বিন্দুমাত্র কৌতূহল। দুটো কাঠের বাক্স আর চারখানা বই সাজিয়ে মন্মথ ডাক্তার হয়ে বসল।

চার আনা ছ আনা করে যৎসামান্য রোজগার। ভিজিট পায় আট আনা, কখনো-সখনো শহরের বাইরে গেলে বড়জোর এক টাকা। এহেন মন্মথ সখের একেবারে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিলে বিয়ের ব্যাপারে। কোথা থেকে নিয়ে এল এক ম্যাট্রিক পাস বউ—মমতা তার নাম। শহরের এস. ডি. ও.র গৃহিণী পর্যন্ত ম্যাট্রিক ফেল, সুতরাং মন্মথের এই ধৃষ্টতাটা অনেকেরই ভালো লাগল না। তবু ভদ্রতা করে বউ দেখতে গেলেন বন্ধু-বান্ধবেরা।

—কি হে, খুব যে বিদুষী মেয়ে বিয়ে করে এনেছ শুনলাম। দেখি—দেখি, বউ দেখি।

স্বচ্ছন্দ অনায়াস ভঙ্গিতে মমতা বেরিয়ে এল, প্রসন্নমুখে নমস্কার জানাল অভ্যাগতদের। কিন্তু সেই মুহূর্তে একসঙ্গে চমকে উঠলেন তাঁরা। কালো ক্যাবলা মন্মথের কী আকাশ-স্পর্শী স্পর্ধা! মেয়েটি শুধু সুন্দরী তাই নয়—এমন কি সার্কেল অফিসারের স্ত্রী পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় তার কাছে।

মেঘের মতো মুখ করে বসে রইলেন তাঁরা। মমতার মিষ্টি হাতে পরিবেশন করা মিষ্টি খাবারগুলোকে পর্যন্ত মনে হল বিষের মতো তেতো।

পথে বেরিয়ে একজন শুধু বললেন, ইস্!

আর একজন বললেন, এমন মুক্তোর হার গিয়ে পড়ল ওই বানরের গলায়! একেই বলে ভবিতব্য।

তৃতীয়জন হিংসায় জ্বালা-ধরা গলায় যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চাইলেন: বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে মন্মথর। অতটা সইবে না।

কে বলে ইচ্ছাশক্তির দাম নেই একালে? অন্তত সমবেত ইচ্ছার যে প্রকাণ্ড একটা জোর আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল বছর দুইয়ের মধ্যেই। ঢাকা মেলের একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মড়ার স্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল প্রায় পিণ্ডাকার মন্মথ। আশ্চর্য—সে মরেনি।

এখনো বেঁচে আছে। বেঁচে আছে অদ্ভুত বীভৎস ভাবে। শুধু বাঁ পা নেই তাই নয়,

গোটা বাঁ দিকই অসাড় হয়ে গেছে তার। বিছানায় শুয়ে বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কখনো গভীর রাতে কী একটা অব্যক্ত ব্যথায় সে গোঙাতে থাকে। বিচিত্র তার গোঙানির আওয়াজ, মনে হয় যেন সাপে ব্যাং ধরেছে কোথাও।

তাতেও মফঃস্বল শহরটির কিছু বক্তব্য ছিল না। কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি অফিসার আর উকিলদের ময়লা তাস ভেঁজে ব্রীজ খেলার আড্ডায়। কিন্তু—

বোমা ফেটেছে একটা। মমতা শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে ওই চাদের কলে এবং আরো কিছু।

অনিরুদ্ধ হাতের পাইপটা ঠুকল ছাইদানের ওপর। পোড়া তামাকের কিছু ছাই হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ল তার সামনে রাখা ফাইলগুলোর গায়ে। ফুঁ দিয়ে সেগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে অনিরুদ্ধ ডাকল, মিসেস ঘটক?

—আসছি—

ক্লান্ত গলায় পাশের ঘর থেকে সাড়া দিলে মমতা।

—ব্যস্ত আছেন বুঝি এখন?—ফাইলের ওপর এতটুকু ছাই আর অবশিষ্ট নেই, তবু আর একটা ফুঁ দিলে অনিরুদ্ধ।

—হাঁ, একটু কাজ বাকি—মমতার জবাব এল।

—থাক এখন। একটু এ ঘরে আসুন—অধৈর্য ভাবে অকারণে অনিরুদ্ধ আবার পাইপটাকে ছাইদানির ওপরে ঠুকল।

চটির শব্দ করে ঘরে এসে দাঁড়াল মমতা। আধখানা চোখে তার দিকে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ বললে, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

অস্বস্তিভরে মমতা মাটির দিকে চোখ নামালো: না, সে কিছু না। কী বলবেন বলুন।

কিন্তু সব কথাই কি মুখ ফুটে বলা যায়? জীবনের সবচেয়ে বড় কথাগুলো তো না-বলাতেই বেশি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। মমতার মুখের ওপর বিমুগ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে অনিরুদ্ধ। সুকুমার ললাটে কদম্বরেণুর মতো স্বেদচিহ্ন, কয়েকটি চুল সুললিত রেখাচক্রে লগ্ন হয়ে আছে সেখানে। আধময়লা শাড়িতে, দেহের ক্লান্ত ভঙ্গিমায়, পাণ্ডুর মুখশ্রীতেও কখনো কখনো মেয়েদের যে এত ভালো দেখায় আগে একথা কখনো মনে হয়নি অনিরুদ্ধের।

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না ওই চেয়ারটায়।

আদেশ পালন করল মমতা। তারপর তেমনি শ্রান্ত স্বরে জানতে চাইল: কোনো কাজ আছে?

—কাজ?—ভাবতে চাইল অনিরুদ্ধ। অদ্ভুত ভাবনার ভঙ্গিতে কপালে ফুটিয়ে তুলল

গোটা কয়েক রেখার সংকেত। তারপর কথাটা ছেড়ে দিলে একটা উদাসীন অনুকম্পায় : আচ্ছা, থাক এখন।

—আমি তা হলে উঠি।—ভাবহীন মুখে উঠে দাঁড়াতে গেল মমতা।

—বসুন না, অত তাড়া কেন? একটু গল্পই করা যাক?—টেবিলের সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল অনিরুদ্ধ, আনতে চাইল একটা অন্তরঙ্গতার আভাস।

—না, থাক—অস্বস্তিতে মমতা নড়েচড়ে উঠল চেয়ারের ওপর।

—কেন, ভয় করে আমাকে?—অনিরুদ্ধ গলাটাকে আরো একটু ঝুঁকিয়ে দিলে। বাঁ দিকের ঠোঁটটা একটু বেঁকে নামল নিচের দিকে : আমি কি এতই ভীতিকর?

ক্ষীণভাবে হাসল মমতা।

—না, ভয় আপনাকে নেই। কাউকেই নেই।

—তবে?

প্রায় অর্থহীন চোখ দুটো স্থিরভাবে অনিরুদ্ধের মুখের ওপর মেলে রাখল মমতা : আপনি কি জানেন, আপনার সঙ্গে মেলা-মেশা করবার জন্যে শহরে এর মধ্যেই আমাকে নিয়ে নানারকম কথা উঠেছে?

মুহূর্তের জন্যে চোখের পাতা দুটো নামিয়ে আনল অনিরুদ্ধ, একটা অপ্রতিভ লালিমার আভাস লাগল গালে। তারপর :

—আপনি কি এসব ডার্টি স্ক্যাণ্ডাল-মঙ্গারদের কথায় কান দেন?

—কানে যারা ঢোকাতে চায়, আমার সম্মতির তারা অপেক্ষা রাখে না।—নিরুত্তাপ স্তিমিত গলায় জবাব দিলে মমতা।

অনিরুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—আপনি আমার এখানে চাকরি করেন। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সঙ্গত।

—লোকে বলে, সম্পর্কটা চাকরির সীমা ছাড়িয়ে আরো একটু এগিয়ে গেছে।—মমতা হাসল। কিন্তু সে হাসিতে অনিরুদ্ধের রক্ত দোলা খেয়ে উঠল না—একটা হিমেল ছোঁয়া লাগল তার হৃৎপিণ্ডের ওপর।

অনিরুদ্ধ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। আবার পাইপটা ঠুকতে লাগল অ্যাশট্রের ওপর। চোখ না তুলেই বললে, কুকুর ডাকলেও ক্যারাভানের নিশ্চিন্তে পথ চলা উচিত।

—হয়তো।—মমতা বললে, কিন্তু সকলের সহ্য করবার ক্ষমতা সমান নয়।

—ওঃ।

এবার পাইপ ঠোকবার মতো জোরও যেন পেল না অনিরুদ্ধ। স্তিমিত চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, আপনিও কি আমায় ভয় করেন?

—বলছি তো, ভয় আমার কাউকেই নেই!—মমতার হাসিটা এবার একটু যেন বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। দেখা দিলে একরাশ কুন্দশুভ্র দাঁতের ঝলক। মিনিট তিনেক স্তব্ধতায় ভরে রইল ঘরটা। পাশের জানালা দিয়ে মমতা দেখতে লাগল সামনের বাঁধানো কম্পাউণ্ডটায় স্তূপীকৃত ধান বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিলমিল করছে তার সোনার মতো রঙ। কয়েকটা অনধিকারী শালিক আর চড়াইয়ের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে, খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করে নিচ্ছে দিনান্তিক সঞ্চয়।

না—অনিরুদ্ধকে সে ভয় করে না। কিন্তু চিনতে পেরেছে। অনুভূতির আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে তার মনের চেহারাটা। দুটো চালের কলের ম্যানেজার অনিরুদ্ধ—মালিকের ছেলে। চাইতেই পেয়ে এসেছে বরাবর—কোনদিন লড়তে হয়নি কোন শক্ত বাধার সঙ্গে। পেছনে ফেলে আসা ললিতা, রিনি, রত্নার ছায়ামূর্তি আভাস দিয়ে উঠেছে তার অসতর্ক কথাবার্তার অবসরে। পাওয়াকে এত সহজ বলে জেনে এসেছে যে আজ চাওয়ার জন্যেও সে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করতে রাজী নয়। আরো বিশেষ করে মমতা। তার কর্মচারী। আর জীবনের ক্ষেত্রে আজ মন্মথ বাতিল, দেউলিয়া। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় ভয়ঙ্কর স্মৃতির মতো পঙ্গু বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে আছে অন্ধকার কোণায়।

মমতা জানে। জানে, যেদিন সুযোগ আসবে, সেদিন মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধা করবে না অনিরুদ্ধ। ভয় করবে না একবিন্দু প্রতিবাদের, কণামাত্র প্রতিরোধের। হাত বাড়িয়ে ধরবে, মুঠো করে আঁকড়ে ধরবে, শক্ত আঙুলের ফাঁসে ফাঁসে একটা পায়রার নরম গলাকে নিষ্পেষিত করে ফেলবার মতো পিষ্ট করে ফেলে দেবে তাকে।

মমতা চোখ তুলল।

—চারটে বাজে। আমি তা হলে আজ উঠি।

অনিরুদ্ধেরও যেন চটকা ভাঙল।

—চলুন, আমিও যাব সঙ্গে।

—এগিয়ে দেবেন?—এক ঝলক শীতল হাসি হাসল মমতা।

—ক্ষতি কী!—অনিরুদ্ধও হাসল। একটু তপ্ত, একটু উত্তেজিত।

—চলুন—

মমতা উঠে পড়ল। শরীরে কোথাও যেন জোর নেই, যেন নিজের ভার সে আর বইতে পারছে না। ক্লান্ত, অসম্ভব ক্লান্ত। নিষ্ঠুর নিয়তির মতো একটা অনিবার্যতার সঙ্গে যেন তার লড়াই। কিন্তু আত্মরক্ষার পথ যেন নেই কোথাও। সবল পেশল হাত অনিরুদ্ধের, কঠিন তার মুষ্টি। অত্যন্ত সহজে আঁকড়ে ধরতে পারে—পিষ্ট করে ফেলতে পারে একটা কপোতের কণ্ঠের মতো, ফাটিয়ে দলে নিতে পারে একরাশ পাকা আঙুরের মতো।

ভয় করে লাভ নেই। তাই ভয়ও নেই। নির্বোধ গলায় মমতা আবার বললে, চলুন।

ছোট শহরটা থেকে কল ছুটো সামান্য একটু দূরে। একখানা ছোট মাঠের ভেতর দিয়ে, ঘনবদ্ধ নিম আর বিলাতী পাকুড়ের ছায়ার তলা দিয়ে এসে পৌঁছুতে হয় শহরে। কদাচিৎ দু-একজন পথিক আর ঘুঘুর অশ্রান্ত কূজন ছাড়া পথটা প্রায় নির্জন।

কিছুই অস্বাভাবিক মনে হল না, যখন সেই পথ দিয়ে পাশাপাশি আসতে আসতে এক ফাঁকে মমতার একখানা হাত আঁকড়ে ধরল অনিরুদ্ধ।

হাত ছাড়িয়ে নিল না মমতা, জোরও করল না। শুধু শ্রান্ত স্বরে বললে, কিছু বলবেন?

চমকে নিজেই অনিরুদ্ধ হাতখানা ছেড়ে দিল। অদ্ভুত মৃত মমতার গলার আওয়াজ—আঙুলগুলো অস্বাভাবিক শীতল। কেমন একটা শীতল স্পর্শে কুঁকড়ে যেতে চাইল তার পেশীগুলো।

ললিতা—রিনি—রত্না। ঠাণ্ডাও কেউ কেউ ছিল বইকি। কিন্তু অনিরুদ্ধ জানে, কেমন করে শবাধারের মধ্য থেকে মৃতকে জাগিয়ে তোলা যায়—উত্তাপ সঞ্চার করা যায় রক্তের ভেতর।

মরীয়া হয়ে অনিরুদ্ধ বললে, এখনি ফিরবেন?

—কী করব তবে?—শিথিল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মমতা পাল্টা প্রশ্ন করল।

—চলুন না, একটু মাঠের দিক থেকে বেড়িয়ে আসা যাক।

—কিন্তু আকাশে মেঘ করেছে যে।

—ও কিছু না: আকাশের দিকে একবার অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে আনল অনিরুদ্ধ: ও মেঘ এখুনি হাওয়ায় উড়ে যাবে। একটু মাঠ থেকে ঘুরে আসা যাক চলুন। সারাদিন তো সমানে খেটেছেন, খানিক ফ্রেশ এয়ার নেহাৎ মন্দ লাগবে না।

—আপনি যখন বলছেন, বেশ।

ঘুঘু-ডাকা নিমের ছায়ার তলা থেকে মাঠে নামল দুজন। কিছু কিছু চোর-কাঁটা, কিছু এলোমেলো ঘাস। দু-চারটে ঢিবি এখানে-ওখানে। খানকয়েক গরুর হাড়, রোদে-বৃষ্টিতে তামাটে রঙ-ধরা। অনিরুদ্ধের জুতোর ঠোক্করে ঘাসের ভেতর থেকে খানিকটা গড়িয়ে গেল একটা মানুষের করোটি; কাছাকাছি কোথাও হয়তো গোরস্থান আছে, সেখান থেকে শেয়ালে টেনে এনেছে।

অনিরুদ্ধ নাক কুঁচকে বললে, আন্‌ক্যানি!

মমতা জবাব দিল না।

নিঃশব্দে চলতে লাগল দুজনে। কিন্তু মাঠটা বড় বেশি ফাঁকা—বড় বেশি দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত। হঠাৎ কেমন একটা অনুতাপ বোধ হতে লাগল অনিরুদ্ধের। ছায়ার তলায় মনটা ঘন হয়ে আসছিল, প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল একটু একটু করে। কিন্তু এই ফাঁকা

মাঠ যেন তাকে তরল করে দিয়েছে ; ছড়িয়ে দিয়েছে একটা আদিগন্ত শূন্যতায় ; মনের একরাশ ঘন রঙকে অদ্ভুত ফোলো আর ফিকে করে তুলেছে। এর চাইতে ঘর ছিল ভালো —সংহত, সংযত। কিন্তু এই আকাশ আর শূন্যতা বড় বেশি প্রসারিত—গুছিয়ে রাখা যায় না—সব কিছু যেন ছত্রাকার করে দেয়।

তবু একবার চেষ্টা করল সে। এমন করে নষ্ট হতে দেওয়া চলে না বিকেলটাকে, মিথ্যে হতে দেওয়া যায় না এমন দুর্লভ অবকাশকে। এলোমেলো ভাবে অনিরুদ্ধ বললে, আচ্ছা মিসেস ঘটক, আপনার কষ্ট হয় না?

—কিসের কষ্ট?—তেমনি ভাষাহীন চোখে প্রশ্ন করল মমতা।

কেমন থমকে গেল অনিরুদ্ধ। এত সহজে যে গ্রহণ করতে পারে—তার কাছে আত্মপ্রকাশ এত কঠিন এ অভিজ্ঞতা যেন তার কখনো হয়নি। একটু লীলা থাক, একটু চটুলতা, একটু জটিলতা। কিন্তু—এর পরের কথাটা বলবার আগে নিজেকে আর একটু তৈরি করে নেওয়া দরকার। সময় নিয়ে নিয়ে সে পাইপে তামাক ভরল, সেটাকে ধরালো। অলসভাবে ধোঁয়া ছাড়ল বারকয়েক।

—আপনার এই জীবন?

—মন্দ কি!—শান্ত উত্তর এল মমতার: কিন্তু দেখেছেন, ঝড় আসছে!

ঝড়! তাই তো। খেয়াল হল অনিরুদ্ধের। কার্বন-পেপারের উল্টো পিঠের মতো আকাশটা ছেয়ে গেছে একটা নিশ্ছেদ নীলিম কৃষ্ণতায়। নিবাত-নিষ্কম্পতায় স্তব্ধ হয়ে আছে সামনের একসারি হিজল গাছ। ঘনিয়ে আসছে একটা তরল অন্ধকার, কালো হয়ে যাচ্ছে পায়ের তলাকার ঘাসগুলো।

আজকের মতো বলা হল না নিজের কথা। বৃথা হয়ে গেল একটা দুর্লভ অবসর। কিন্তু উপায় নেই। প্রচণ্ড ঝড় আসছে একটা। আত্মঘোষণা করার চাইতেও আত্মরক্ষার দরকার আগে।

—চলুন, ফেরা যাক—অনিরুদ্ধই বললে।

—ভিজিয়ে দেবে মনে হচ্ছে—মমতার ঠোঁটের কোণায় যেন দেখা দিল এক টুকরো কৌতুকের হাসি। যেন এতক্ষণে সে প্রাণ পেয়ে উঠেছে একটু একটু করে।

অনিরুদ্ধ লক্ষ্য করল না সেদিকে। শশব্যস্তে আর একবার কালো আকাশটার দিকে তাকিয়ে বললে, পা চালিয়ে চলুন, একটু তাড়াতাড়ি।

কিন্তু কতখানি আর পা চালিয়ে যাওয়া যায় এত বড় একখানা মাঠের মধ্যে? দু মিনিটের মধ্যেই ঝড় এল। দিগন্তরেখায় একটা ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো শব্দ করে ফেটে পড়ল আকাশটা, কঙ্কালের রক্ত-মাখা হাতের ছোপের মতো বিদ্যুৎ জ্বলল মেঘের গায়ে, হিজল বনটা প্রায় মাটি পর্যন্ত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেই খাড়া হয়ে উঠল ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো।

একরাশ ধুলো আর খড়কুটোর আবর্তের ভেতরে মুহূর্তের জন্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দুজনে। একটা টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলে অনিরুদ্ধ, মমতার মাথার এলো খোঁপা খুলে গিয়ে চুলের রাশ ঝড়ের মেঘের মতো তরঙ্গিত হয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে অনিরুদ্ধ বললে, ছুটুন—ছুটুন—

ঝড়ের মধ্য দিয়ে দুটো ঝরা-পালকের মতো প্রায় উড়ে চলল দুজন।

শুকনো তপ্ত ধুলোর আবর্ত উঠেছে। কার্বনের মতো আকাশ পিচের মতো কালো। ঘন হয়ে নামছে অন্ধকার। রূপোর তারের মতো খরধার বৃষ্টি এসে বিঁধতে লাগল চোখেমুখে।

সামনের একটা শিশুগাছ থেকে প্রচণ্ড শব্দে একটা ডাল ভেঙে পড়ল। একদল কাক আর্ত চিৎকার ছেড়ে উড়ল আকাশে, তারপর হাওয়ার ঘূর্ণিতে দিকে দিকে ছিটকে গেল কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো।

তিক্ত শঙ্কিত গলায় অনিরুদ্ধ বললে, ছুটুন—ছুটুন। অমন গজেন্দ্র-গমনে চলেছেন কেন?

আবার হাওয়ার একটা প্রবল ঝাপটায় পড়তে পড়তে সামলে নিলে অনিরুদ্ধ। কাছাকাছি কোথাও একটা গাছ পড়ল—ঝড়ের ভেতর দিয়েও স্পষ্ট শোনা গেল নাভিশ্বাসের মতো তার একটা বিকট শব্দ।

—উঃ, সাধে কি মেয়েদের নিয়ে পথ চলতে নেই?—কটুস্বরে একটা অরুপণ স্বীকারোক্তি বেরুলো অনিরুদ্ধের। ঝড়ের মধ্যে মমতা হাসল কিনা বুঝতে পারা গেল না।

রাত্রির মতো হয়ে অন্ধকার নামছে। চারদিকে দৃষ্টি চলে না ভালো করে। ক্রুদ্ধ একপাল বন্য-মহিষের মতো পেছন থেকে বৃষ্টি বাতাস সমানে তাড়া করে আসছে। এরই মধ্যে দৃষ্টির সামনে হঠাৎ মাথা তুলে উঠল একটি নিঃসঙ্গ লাল বাড়ি। মাঠের মাঝখানে একা।

—চলুন—ওদিকেই যাওয়া যাক—

—কিন্তু ওটা যে—মমতা কিছু একটা বলতে চাইল।

—আবার কথা বাড়াচ্ছেন কেন? ভয়ঙ্কর সাইক্লোন শুরু হয়েছে। মরতে চান নাকি এই মাঠের ভেতরে?

মাঠের মাঝখানে ছোট বাড়িটি। বাড়ি নয়—একখানা ঘর। কাচের জানালা, ওপরে টালির ছাদ। বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জন্য আভাসিত হয়ে উঠল।

পৈশাচিক শব্দে বজ্র ডেকে গেল আকাশে। সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে গেল অনিরুদ্ধের। মমতার হাত ধরে একটা টান দিয়ে সোজা গিয়ে উঠল বাড়িটার দোর-গোড়ায়।

দরজা বন্ধ। তালা দেওয়া।

একটু বারান্দা পর্যন্ত নেই যে দাঁড়ানো যায়। শুধু ঘরটুকু তৈরি করা ছাড়া আর বিন্দুমাত্র উদ্যমও যেন ব্যয় করা হয়নি এর পেছনে। এলোমেলো খোড়ো হাওয়া আক্রমণ করছে চারদিক থেকে। গায়ে বিঁধছে শাণিত বৃষ্টির ফোঁটা।

জিম্‌ন্যাস্টিক করা শক্ত মুঠোয়—অনেক কপোত-কণ্ঠ নিষ্পিষ্ট করা নির্মম হাতে তালাটায় মোচড় দিল অনিরুদ্ধ। হাতের রগগুলো ফুলে উঠল, মণিবন্ধের কাছটা ফেটে যেতে চাইল রক্তের চাপে। আর একটা, আর একটা মোচড়। দাঁতে দাঁতে কঠিন চাপ পড়ে চোয়াল দুটো টন টন করে উঠল—মটাং করে খুলে পড়ল তালাটা।

একটা আশ্রয় শেষ পর্যন্ত।

বাইরে ঘন হয়ে আসা অন্ধকারে সাইক্লোনের মাতামাতি। ঘরের মধ্যে ঢুকে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। ফেলতে লাগল শ্রান্তির ঘন নিশ্বাস।

অন্ধকারে ঘরটায় নজর চলে না ভালো করে। দুটো ছোট ছোট টেবিলের ওপর ওষুধ-পত্রের মতো কী একরাশ সরঞ্জাম। একপাশে লম্বা একটা টেবিল—মনে হয় তার ওপর সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কেউ। এতক্ষণে হঠাৎ একটা তীব্র দুর্গন্ধে দুজনের নাড়িভুঁড়ি মোচড় খেয়ে উঠল একসঙ্গে। পচা মাংসের গন্ধ—ওষুধের গন্ধ!

—উঃ, এ কোথায় এলাম!—অনিরুদ্ধ বলতে গেল।

আর সেই মুহূর্তে বাইরে চমকালো বিদ্যুৎ। বিরাট একখানা তলোয়ারের আচমকা আঘাতের মতো একটা খর দীপ্তি লক্‌লকিয়ে গেল জানালার কাচে। হিংস্র আলোয় কয়েক মুহূর্তে সব স্পষ্ট করে দিয়ে গেল। মফঃস্বল শহরের মর্গ।

অন্ধকারে হাসির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল মমতার: এটা লাশকাটা ঘর।

—লাশকাটা ঘর!—অনিরুদ্ধের গলার মধ্য থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরুল একটা।

—হ্যাঁ, তাই।—তেমনি হাসির সঙ্গে মমতা বললে, দেখছেন না, টেবিলের ওপর লাশ রয়েছে?

পচা মাংস আর ওষুধের তীব্র গন্ধে, অস্বস্তিভরা ভয়ের চমকে অনিরুদ্ধ বললে, ছিঃ ছিঃ! চলুন বেরিয়ে যাই এখান থেকে।

দেওয়ালের একটা কোণা ঘেঁষে ততক্ষণে বসে পড়েছে মমতা। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে তার মিষ্টি গলার স্বর সূচিতীক্ষ্ণ হয়ে এসে কানে বিঁধল: ভয় পাচ্ছেন?

—ভয়?—ভয়টাকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে অনিরুদ্ধ বললে, তা নয়, তবে—

—গন্ধ? ও কিছু না। মানুষ পচলে ওরকম গন্ধই বেরোয়। ও সয়ে যাবে। তা ছাড়া বাইরে এখন বেরুবেন কী করে? সাইক্লোনের আরো জোর বেড়েছে। শুনছে

পাচ্ছেন না?

শোনা যাচ্ছে বইকি। বাইরের অন্ধকার পৃথিবীতে হাজার মেল ট্রেন একসঙ্গে চলবার মতো রুদ্রগর্জন উঠছে থেকে থেকে। দূর থেকে আবার একটা গাছ পড়বার আওয়াজ এল। মাথার ওপর মড়মড় করে উঠল টালির চালটা—কয়েকখানা টালিও বোধ হয় ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক।

—বাইরে বেরুতে গেলে গাছ চাপা পড়তে হবে এখন—আবার মমতার মিষ্টি তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল।

দুর্গন্ধ। অসহ্য দুর্গন্ধ। সে গন্ধে নিজের পাকস্থলীটা পর্যন্ত যেন ছিঁড়েছুঁড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে তীব্র ক্লোরোফর্মের বিষক্রিয়ার মতো ঝিমঝিম করছে। ভেজানো দরজাটাকে এক আঘাতে খুলে দিয়ে দমকা বাতাস সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। মড়ার গায়ের ওপর থেকে উড়ে পড়ল কাপড়টা, আর একটা বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল পচ ধরে-আসা একটা বীভৎস দেহ—পেটটা দু'ফাঁক করে চেরা।

আরো তীব্র একরাশ দুর্গন্ধ যেন প্রবল আঘাতের মতো মুখের ওপর এসে পড়ল অনিরুদ্ধের। ঘুরে গেল মাথাটা—সমস্ত অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে গেল। পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাইল—মনে হল এই বীভৎস ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে বাঁচার চাইতে গাছচাপা পড়ে মরাও ভালো। কিন্তু পালাতে চাইলেই কি পালানো যায়? ক্লোরোফর্মের বিষের মতো সেই বিকট দুর্গন্ধ একটা অক্টোপাশের বাহুর মতো যেন তার পায়ে পাক দিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল। মেঝের ওপর বসে পড়ল, না শুয়ে পড়ল ভালো করে মনেও রইল না অনিরুদ্ধের।

শুধু আর একবার দেখতে পেল আর একটা বিদ্যুতের চমক—দেখতে পেল চেরা পেটের একটা রাক্ষুসে হাঁ—আর শুনতে পেল আরও মিষ্টি, আরো তীক্ষ্ণ গলার স্বর মমতার।

—মড়া কাটলে ওর চেয়ে ভালো দেখায় না। কী করা যাবে বলুন!

মনে হল ও যেন মমতা নয়। ওই বিকৃত বীভৎস দুর্গন্ধ শবটার প্রেত মমতার মধ্য থেকে কথা কয়ে উঠছে।

অনিরুদ্ধ চোখ বুজল।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর।

নিঃশব্দে কাদা আর ঝরা-পাতার পথ বেয়ে মন্মথর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। কেমন নিষ্প্রাণ আর যান্ত্রিক হয়ে গেছে অনিরুদ্ধ। এতখানি পথ পাশাপাশি চলে আসবার সুযোগেও একবারও তার মমতার হাত ধরবার কথা মনে পড়েনি।

মমতা বললে, বড্ড ভিজে গেছেন। চা খেয়ে যান এক পেয়ালা।

ক্লান্ত স্বরে অনিরুদ্ধ বললে, অনেক রাত হয়ে গেছে যে!

—পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।

কী মনে করে অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে গেল।

—আসুন, বসুন এই ঘরে।

বাইরের শ্রীহীন ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বেলে আনল মমতা। একটা বার্ণিশ-ওঠা নগ্ন চেয়ারে বসতে দিলে অনিরুদ্ধকে। নিঃশব্দে বসে সে শুনতে লাগল শ্রান্তিহীন মশার গুঞ্জন। একটু পরেই শাড়ি বদলে ঘরে এল মমতা। হাসল।—একবার কষ্ট করে আসুন না পাশের ঘরে। আমার স্বামী অসুস্থ, জানেনই তো। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

—চলুন—উঠে পড়ল অনিরুদ্ধ। মমতার ক্ষুধাশীর্ণ হাতের লণ্ঠনের দোলা অনুসরণ করে এল পাশের ঘরে।

মেঝেতে একটা স্যাঁতসেঁতে মলিন বিছানায় শুয়ে ছিল মন্মথ। বালিশে ভর দিয়ে অতি কষ্টে উঠে বসতে চাইল। আপ্যায়নের হাসি হেসে বলতে চাইল: কী সৌভাগ্য, আসুন —আসুন—

কিন্তু আসতে পারল না অনিরুদ্ধ, নড়তে পারল না আরো কয়েক মুহূর্ত। লণ্ঠনের পাণ্ডুর বিবর্ণ আলোয় পাথর হয়ে রইল। সেই লাশকাটা ঘরের লাশটা আরো বিকৃত, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে বসেছে। মুখের একদিক বলে কিছু নেই। চোখের মতো কী একটা জিনিস ঠিকরে বেরিয়ে আছে, একরাশ থোরানো-মাংস জমে আছে পিণ্ডাকারে। অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য। একটা অমানুষিক বিভীষিকা।

কোন্ মমতাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইছিল সে? জীবনের লাশকাটা ঘরের এই জীবন্ত প্রেতিনীকে কেমন করেই বা স্পর্শ করবে? মনে হল যে হাতে সে মমতাকে ছুঁয়েছিল, হাতের সেইখানে ক্লেদ-বসা মাথা একরাশ পচা মাংস জড়িয়ে আছে।

—ও কি হল? কোথায় যাচ্ছেন?

কোথায় যাওয়া যাবে আপাতত তাই কি জানে অনিরুদ্ধ। পালাতে হবে—পালাতে হবে এই লাশকাটা ঘর থেকে। অন্ধকারের মধ্যে ছুটে চলল পাগলের মতো। আর শুনতে পেল তার চারদিকের পৃথিবী যেন আবিল হয়ে উঠেছে মমতার তীক্ষ্ণ শাণিত হাসির শব্দে।

তিমিরাভিসার

—ব্লাডটা আমি দিতে পারি স্যার—প্রণবেশ হাত বাড়ালো। চওড়া কব্জী, সংক্ষিপ্ত সাদা বুশসার্টের সীমান্ত পর্যন্ত নিটোল শক্তিমান বাহুতে পেশীর তরঙ্গ। পৌরুষ আছে, কিন্তু কাঠিন্য নেই।

হাত থেকে জয়াবতীর দৃষ্টি প্রণবেশের মুখের ওপর উঠে এল। বয়েস সবে তিরিশ ছুঁয়েছে অথবা ছোঁয়নি। শরীর আব মনের স্বাস্থ্য অটুট থাকলে যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তেমনি। চোখের তারা দুটো এখনো চঞ্চল, কোনো অন্তর্মুখী গভীরতার আকর্ষণে স্থির আর নিশ্চল হয়ে আসেনি। ঠোঁটের রেখাগুলো কোমল, শ্লথলগ্ন। এত সহজে হাত বাড়িয়েছে যে, যেন একগুচ্ছ রজনীগন্ধা এগিয়ে দিয়েছে কাউকে।

কিন্তু যাকে দিয়েছে, নেবার ক্ষমতা তো নেই তার। ফেনশুভ্র বিছানাটির ওপর সে এলিয়ে আছে—তার শীর্ণ সুন্দর মুখে মৃত্যুর ছায়া। খাটের পাশে তার একখানা সকরুণ বিন্যস্ত হাত—রেশমের মতো ত্বকের নিচে নীল নিবিড় শিরাগুলি মানচিত্রের নদীর মতো টানা। আর মানচিত্রের প্রাণহীন নদীর মতোই তা শুকিয়ে আসছে—প্রণবেশের রক্ত-সঞ্চারে তাতে প্রাণের ধারা ফিরে আসতেও পারে। অন্তত ডাক্তার সেইরকম আশা করেন।

জয়াবতীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির মতোই ডাক্তার গম্ভীর চোখে তাকালেন প্রণবেশের দিকে। তারপর স্বচ্ছ সস্নেহ হাসি হাসলেন।

—ইউ, ডক্টর?

—হ্যাঁ স্যার। চলবে?

—চলবে বইকি। আচ্ছা—এসো।

ছ মাস পরে জয়াবতী চিঠি লিখলেন প্রণবেশকে।

—আমার মেয়েটাকে তুমি বাঁচিয়েছ, বাবা। যদি সময় থাকে আর খুব অসুবিধে না হয়, তা হলে যে কোন একদিন বিকেলে এলো আমাদের বাসায়। স্বচ্ছন্দে চলে আসবে—লজ্জার কোন কারণ নেই। একবার—দুবার—তিনবার। চিঠির প্রতিটি শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করে পড়ল প্রণবেশ, উলটে-পালটে দেখল কাগজখানাকে। বেশি গবেষণা না করেও বুঝতে পারা যায়, এ চিঠির কাগজ তাঁর নয়, এ হাতের লেখা তাঁর তো নয়ই। ফিকে নীল রঙের কাগজ, একটা লঘু সুরভি তাতে জড়ানো। লেখার ধরনটা একটু কাঁচা—একটি সুকুমার মনের ভীরুতার চিহ্ন বয়ে এনেছে। মার জবানীতে এ চিঠি লিখেছে

সুনীলাই। সুনীলার হাতের লেখা কখনো না দেখেও তা সে অনুমান করতে পারে।

অন্যমনস্কভাবে কাচের টেবিলটার ওপরে প্রণবেশ আঙুল টানতে লাগল—জলরঙের এলোমেলো রেখা পড়তে লাগল এলোমেলো ভাবনার মতো। যেদিন হাসপাতাল থেকে সুনীলা ডিস্‌চার্জড্ হল, সেদিন প্রণবেশ তাদের এগিয়ে দিতে গিয়েছিল হাসপাতালের গেট পর্যন্ত।

দুর্বল পায়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল সুনীলা—যেন যে কোনো মুহূর্তে টলে পড়ে যাবে মাটিতে। কয়েকবারই ইচ্ছে হয়েছিল তার সবল বাহুর মধ্যে সযত্নে মেয়েটাকে আশ্রয় দেয় সে। কিন্তু পাশেই জয়াবতী চলেছেন। স্বাভাবিক সঙ্কোচে বরং একটুখানি দূরত্বই রাখতে হয়েছিল তাকে।

ট্যাক্সি পর্যন্ত নিঃশব্দেই এল তিনজন। তারপর জয়াবতী প্রণবেশের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—তুমি আমাদের জন্যে অনেক করলে বাবা। নিজের আত্মীয় থাকলেও এত করত না। তোমার ঋণ কী করে শোধ হবে জানি নে।

অভ্যস্ত কৃতজ্ঞতার জবাব দিতে হল অভ্যস্ত ভাষাতেই।

—কেন তুলছেন ওসব কথা? ডাক্তারের যতটুকু দায়িত্ব, ততটুকুই করেছি। তার বেশি কিছু করিনি।

জয়াবতী হাসলেন: ডাক্তার আমি অনেক দেখেছি, কে কতটুকু করে তাও জানি। তোমার মতো ডাক্তার যে কলকাতায় খুব বেশি নেই—এ আমি জোর করেই বলতে পারি।

এই সময় প্রণবেশের চোখ গিয়ে পড়েছিল জয়াবতীর চোখে। সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা খোঁচা লাগল তার। গলার স্বরের সঙ্গে এই চোখ মিলছে না, কথার সঙ্গে যেন সাদৃশ্য নেই এ দৃষ্টির। কেমন একটা ধূসর চাউনি, একটা অর্থভরা ইঙ্গিত। জয়াবতী কি ঠাট্টা করছেন তাকে? সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

কিন্তু এর মধ্যেই কখন সামনে নুয়ে পড়েছে সুনীলা—পায়ের অনাবৃত অংশে কয়েকটি শীর্ণ শীতল আঙুলের করুণ স্পর্শ। চমকে প্রণবেশ পিছিয়ে যেতে চাইল: ছি ছি, কী এসব!

জয়াবতী বললেন, তাতে কী হয়েছে বাবা! একটা প্রণাম তো তোমায় করাই উচিত।

ধীরে ধীরে সুনীলা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মুখ তুলল।

বেলাশেষের আলো সামনের বকুলগাছের ভেতর দিয়ে সুনীলার মুখে এসে পড়ল। মনে হল, তার ক্লান্তির-পাণ্ডুর গালে-কপালে কে যেন নববধূর মতো রক্তচন্দনের গোরোচনা এঁকে দিয়েছেন। প্রণবেশ কী দেখল সে-ই জানে। বুকের ভেতরে আচমকা একটা দোলা

লাগল—আরো একবার শিউরে উঠল শরীর। কিন্তু এবার সম্পূর্ণ অন্য কারণে। জয়াবতীর চোখের সঙ্গে এর চোখের এতটুকুও তো মিল নেই কোথাও।

মগ্নতাটা কাটল মিনিট দুই পরে। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আকস্মিক ধাতব শব্দে।

জয়াবতী বললেন, সময় পেলে একবার যেয়ো আমাদের ওখানে।

সুনীলা কিছুই বললে না, বলার দরকারও ছিল না। প্রণবেশ মাথা নাড়ল: নিশ্চয় যাব।

ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি। প্রণবেশ আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। তারপর মস্ত একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়িকে ঢোকবার জন্যে যখন পথ ছেড়ে দিতে হল, তখন আস্তে আস্তে নিজের ওয়ার্ডে সে ফিরে এল।

কিছুদিন সুনীলার কথা মনে পড়ত—মনে পড়ত ওই কেবিনটার দিকে তাকালে ওর শূন্যতাকে এখন আরো বেশি বলে মনে হত, ওটা যেন করুণ বিষণ্ণতায় বিকীর্ণ হয়ে থাকত সব সময়। কিন্তু যথাসময়ে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ী ওই কেবিনে এসে আশ্রয় নিলে। যেটুকু ঘুমুত, সেই সময়টুকু ছাড়া বুড়ী চিৎকার করত অনর্গল, গালমন্দ করত, অভিশাপ দিত ডাক্তার আর নার্সদের, আর মাঝে মাঝে ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা নিবেদন করত: হেল্‌প মী—ও লর্ড, হেল্‌প মী!

সুনীলার স্মৃতিটুকু নিভে-যাওয়া ধূপের গন্ধের মতো গেল মিলিয়ে। তারপর ওখানে একের পর এক কত এল, কত গেল। ঘুরতে হল ওয়ার্ডের পরে ওয়ার্ড। অসংখ্য মানুষের অসংখ্যতর ব্যাধি আর বিকার, বহু বিচিত্র মৃত্যুর রূপ, শরীরের জটিল যন্ত্রে যন্ত্রে কতরকম অবক্ষয়ের কাহিনী। পীড়িতের মুখের ভিড়ে সুনীলার মুখ মুছে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু আজ এই চিঠি এসেছে—এসেছে বহুদিন পরে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সকলের ভেতর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসেছে সুনীলা। এই হাসপাতালের লোহার খাটে নয়, ওষুধের গন্ধে ভরা এখানকার অসুস্থ বাতাসের মধ্যেও নয়। সমস্ত পৃথিবীর পশ্চাদ্‌পট মুছে গেছে, একান্ত নিঃসঙ্গতার শূন্যতায় যেন নীহারিকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুনীলা, আর তার মুখের ওপর রক্তচন্দনের পত্রলেখার মতো ঝরে পড়ছে বেলাশেষের আলো।

এসো আমাদের বাসায়।

তলায় নামটা অবশ্য জয়াবতীর। তবু প্রণবেশ জানে, এর মধ্যে সুনীলার স্বর আছে; অথবা জয়াবতীর স্বরে সুর ঢেলে দিয়েছে সুনীলা। জয়াবতী সাজিয়েছেন কথার প্রদীপ, কাঁচা হাতের কোমল লেখায় সুনীলা তাতে শিখা জ্বেলে দিয়েছে। তাই চিঠির ভেতরে অদৃশ্য সেতারের সুর বাজছে—জ্বলছে অলক্ষ্য দীপান্বিতার আলো।

দীপ্ত মুখে প্রণবেশ উঠে দাঁড়ালো। চিঠিটাকে গুঁজে নিলে বুক পকেটে, কোটের জন্যে

হাত বাড়ালো হ্যাণ্ডারের দিকে। আজকের মতো ডিউটি শেষ।

এ ডাক উপেক্ষা করা যায় না। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো কারণ নেই আর। একটা কৌতূহল, যার রক্তে নিজের রক্ত মিশিয়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল, এই ছ'মাসে সেই কিশোরী মেয়েটির কঙ্কালে যৌবনের পূর্ণতা কতখানি এসে ঢেউ দিয়েছে, একবার সেইটুকু নিজের চোখে দেখে আসা। একটা সহজ স্বাভাবিক দাবি আছে বইকি।

যেতেই হবে একবার। কাল? কিংবা আজই? প্রণবেশ ঘড়ির দিকে তাকালো। ছটা বেজে গেছে, বিকেলের আলো নিবেছে কিছুক্ষণ আগেই। একটু বেশি দেরিই হয়তো হয়ে গেছে আজ—দিনান্তের চন্দন-বর্ণ আলোয় আজ আর হয়তো সুনীলার মুখ দেখা যাবে না। কিন্তু তবুও কিছু বাকি আছে এখনো। বিদ্যুতের আলো-জ্বলা ঘরে সুনীলার আয়ত কালো চোখে নতুন কিছু কি ধরা পড়বে না? নিবিড় সন্ধ্যাকে আরো নিবিড় করে কি দেবে না সুনীলা?

প্রণবেশ পথে নামল। ট্রামে নয়, ট্যাক্সিই ডাকল একটা।

বড় রাস্তার ওপরে চারতলার ফ্ল্যাট। পাড়াটা আন্তর্জাতিক, বাড়িটাও তাই। সিঁড়িতে পা দিতেই মাদ্রাজী সাহেব পাশ কাটিয়ে নেমে গেল, কানে এল পাঞ্জাবী মেয়ের তারস্বরে ঝগড়ার আওয়াজ, কোথা থেকে ভেসে এল পিয়ানোর সঙ্গে বিলিতী ফিল্মের চটুল গানের সুর। কেমন বিব্রত বোধ করল প্রণবেশ। পাড়াটার সুনাম নেই সে জানে।

কিন্তু জয়াবতীর দোষ দেওয়া যায় না: প্রণবেশ মনে মনে ভাবল। আজকালকার দিনে ইচ্ছেমতো বাড়ি চাইলেই কি পাওয়া যায়—আর ইচ্ছেমতো পাড়ায়? নিজেই সে এমন সব অঞ্চলে মধ্যবিত্ত বাঙালীকে বাসা নিতে দেখেছে—যেখানে পাঁচ বছর আগে বাংলা ভাষা বোঝবার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না!

ফ্ল্যাটের নম্বর মিলিয়ে কড়া সে নাড়ল।

দরজা খুলে দিলেন জয়াবতীই। কয়েকটা রেখার আভাস পড়ল তাঁর কপালে, চোখে ফুটে উঠল সন্দেহের ধূসর ছায়া। প্রথমটা যেন চিনতেই পারলেন না। পরক্ষণেই তাঁর মুখে প্রশ্রয়ের পরিচিত হাসি ছড়িয়ে গেল।

—ও:, তুমি এসেছো? এসো—এসো। ভারি খুশি হয়েছি—এসো—প্রণবেশ ড্রয়িং রুমে পা দিলে। সোফা দেখিয়ে জয়াবতী বললেন, বোসো, দাঁড়িয়ে আছো কেন?

প্রণবেশ বসল। কাশ্মীরী-কাজ-করা একটা টিপয়কে মাঝখানে রেখে বসলেন জয়াবতীও।

—সকালে চিঠি দিয়েছি, তুমি আজই আসবে বুঝতে পারিনি। তোমার আবার যে রকম কাজের তাড়া!

প্রণবেশ অপ্রতিভ হল। বড় বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। সৌজন্য-সঙ্গত দেরি

করা উচিত ছিল একটু, প্রতীক্ষা করবার সময় দেওয়া উচিত ছিল ওঁদের। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে।

কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, হাতে আজ বেশি কাজ ছিল না, তাই এলাম। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে হয়তো আর সময় পাব না, তাই দেখাটা করেই যাই।

—বেশ করেছ, বেশ করেছ।—আবার প্রশ্রয়ের হাসিতে জয়াবতীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: যখন সময় পাবে, তখনই এসো। বলতে গেলে এও তো তোমার আর একটা বাড়ি! বোসো, সুনীলাকে খবর দিই।—জয়াবতী উঠলেন। ডান দিকের দরজাটার ব্রোকেডের পর্দা সরিয়ে চলে গেলেন ভেতরে।

প্রণবেশ বিহ্বলভাবে তাকালো ঘরটার দিকে। যতটা সে ভেবেছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি সঙ্গতিপন্ন এরা। বিধবা মা আর মেয়ের পক্ষে ড্রয়িংরুমের অঙ্গসজ্জাটা একটু বাড়াবাড়িই বলতে হবে। হাসপাতালে যেভাবে ক্যাপিটাল আর স্মল লেটার অসমভাবে সাজিয়ে জয়াবতী নিজের নাম সই করেছিলেন, তা থেকে কল্পনাই করা যায় না যে তাঁর রুচি এত সজাগ এবং এমন তীব্র আধুনিক। ঘরের কোণায় কোণায় তিন-চারটি অ্যাশ্-ট্রে—একটির ওপরে সোনালি লেবেল মোড়া আধপোড়া একটা মোটা চুরুট। স্পষ্টই বোঝা যায়, এ ঘরে ওপরতলার মানুষগুলোরও আনাগোনা আছে। দেওয়ালে একদিকে একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ, অন্যদিকে একটি নারীমূর্তি; কিন্তু নারীটির দিকে তাকিয়ে মনে মনেই প্রণবেশ আরক্তিম হয়ে উঠল। জয়াবতীর রুচির মধ্যে কেবল আধুনিকতাই নেই, দুঃসাহসও আছে। সে ব্যাচেলর, কিন্তু নিজের ঘরে অমন একখানা ছবি টাঙাবার মতো মনের জোর তারও নেই।

আচমকা অনুভব করলে, কোথায় কি যেন হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। বকুল পাতার ফাঁকে ফাঁকে বেলাশেষের আলো এখানে কোনো দিন পড়বে না। কী ক্ষতি ছিল ক্যামেরার ছবির মতো ওইটুকুকেই কেবল মনের মধ্যে ধরে রাখলে? এ বাড়িতে না এলেই কি তার চলত না?

নিচের ফ্ল্যাট থেকে পিয়ানোর সুর, ফিল্মের হালকা গান; নাচের আওয়াজও যেন পাওয়া গেল। সোফাটার ভেতরে যতটা সঙ্কীর্ণ হওয়া যায়—নিজের অজ্ঞাতে প্রণবেশ তারই চেষ্টা করতে লাগল।

—নমস্কার!—ঘরে ঢুকেছে সুনীলা। সঙ্গে সঙ্গে নাচ আর গানের শব্দের ঘূর্ণি স্থির হয়ে দাঁড়ালো, সমস্ত ঘরটাই হারিয়ে গেল সুনীলার আবির্ভাবের আড়ালে। লাল শাড়ি পরা সুঠাম দেহ পূর্বরাত রক্তপদ্মের মতো ফুটে উঠল প্রণবেশের সামনে। প্রতিনমস্কার করবার হাতটাও ভালো করে উঠল না। তার আগেই সুনীলা ঝুপ করে বসে পড়েছে প্রণবেশের মুখোমুখি—ঠিক জয়াবতী যেখানে বসে ছিলেন।

—সত্যিই আপনি এলেন তা হলে? আমি কিন্তু বিশ্বাসই করতে পারিনি।

এবারেও প্রণবেশ জবাব দিলে না। মুগ্ধ বিস্ময়ভরা চোখ মেলে দেখতে লাগল, কেমন আশ্চর্য বদলে গেছে সুনীলা—যেন নতুন করে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার সময় দেখেছিল একটা কাঠামো—এখন দেখল প্রতিমা।

—কী, কথা বলছেন না যে?—সুনীলা হাসল: চিনতে পারছেন না বুঝি?

—একটু শক্ত বইকি চেনা—নীরবতা ভেঙে প্রণবেশ বলে বসল, এতখানি আশা করিনি।

সে তো আপনারই জন্যে—সুনীলার চোখে কৃতজ্ঞতা উচ্ছলিত হয়ে উঠল: আপনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন।

কথাটার পুনরাবৃত্তি ভালো লাগে না, সম্পর্কটাকে কেমন যেন সংকীর্ণ আর সীমিত করে আনে। প্রণবেশ বললে, আমি না থাকলেও কয়েক আউন্স রক্ত দেবার লোকের অভাব হত না। ব্লাড ব্যাঙ্কেও পাওয়া যেত। ও আলোচনা থাক। তার চেয়ে বলুন, এখনো টনিকগুলো নিয়মিত খাচ্ছেন তো? অনিয়ম করছেন না তো শরীরের ওপর?

সুনীলা বললে, মানুষকে দেখলে কি টনিক ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না? আপনাদের দুনিয়ায় বুঝি পেসেন্ট ছাড়া দেখতে পান না আর কাউকেই?

—আমি কিন্তু আজ পেসেন্টকেই দেখতে এসেছিলাম।—প্রণবেশ হাসল।

—সর্বনাশ! সঙ্গে করে তাহলে স্টেথিসকোপও নিয়ে এসেছেন? আর ইনজেকশনের সিরিঞ্জ?

হালকা ধরনের একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল প্রণবেশ, সেই সময় ঘরে ঢুকলেন জয়াবতী, পেছনে একটা ছোকরা চাকর, তার হাতে চা আর খাবারের ট্রে।

—এ কী! এসব ব্যাপার কেন করতে গেলেন এখন!

জয়াবতীর চোখে একটা অদ্ভুত ধূসর দৃষ্টি ফুটে উঠেই মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল আবার। অভ্যস্ত সুস্মিত হাসি হেসে বললেন, কী আশ্চর্য, সন্ধ্যেবেলায় এক পেয়ালা চাও কি তুমি খাও না?

লেখা স্লেটের ওপর আচমকা হাত বুলিয়ে যাওয়ার মতো আকাশের অর্ধেক তারা মুছে গেল। এতক্ষণ গুমোটের পরে একটা দমকা হাওয়া ফেটে পড়ল, ক্যাথিড্রাল রোডের দু'ধারে মর্মরিত হয়ে উঠল আলো-অন্ধকার গাছের সারি।

প্রণবেশ বললে, ঝড় আসছে মনে হয়।

সুনীলা বললে, ও কিছু নয়—এক-আধটা হাওয়া দেবে হয়তো। আসুন, এখানে বসা যাক ঘাসের ওপর।

—ধুলো পড়বে যে চোখেমুখে।

—এত বয়েস হল, এখনো চোখে ধুলো পড়বার ভয়?—লঘু শ্লেষের আভাস পাওয়া গেল সুনীলার স্বরে।

—কী জানি, নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।

পথ ছেড়ে ঘাসের দিকে এগোচ্ছিল সুনীলা, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। মুহূর্তের ভেতরে তার মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল, প্রণবেশ দেখতে পেল না।

সুনীলা ফিরে এল। হাসতে চেষ্টা করলে জোর করে।

—চলুন তা হলে। নিরাপদ আশ্রয়েই পৌঁছে দেওয়া যাক আপনাকে।

প্রণবেশ আশ্চর্য হল: রাগ করলেন নাকি? মেঘ কেটে যাচ্ছে, আসুন—বসাই যাক বরং।

—নাঃ, থাক আজ। রাত হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল দুজনে। অত্যন্ত অকারণে কোথায় কী যেন একটা বেতালা হয়ে গেছে, প্রণবেশ ঠিক বুঝতে পারল না। মাঝে মাঝে এমন হয় সুনীলার। কেমন খটকা লাগে মনের মধ্যে। কোথাও কি একটা অজ্ঞাত অপরাধ আছে প্রণবেশের? সুনীলার কোনো দুর্বল জায়গায় সে কি আঘাত করে বসে যখন-তখন?

অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যে একটা কথা খুঁজে বের করার আগেই সে চমকে উঠল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে সুনীলা।

—কী হল?

কিন্তু উত্তরের দরকার ছিল না। প্রণবেশও দেখতে পেল।

এতক্ষণ বোধ হয় পথের ধারে পড়েছিল লোকটা, এবারে উঠে দাঁড়িয়েছে, টলতে টলতে একেবারে ওদের মুখোমুখি এসে পড়েছে। পথের ল্যাম্পের আলোয় লোকটার শরীরের প্রতিটি রেখা দেখা গেল সুস্পষ্ট। গায়ে কালো লংকোট, পরনে চুড়িদার পায়জামা, গালে কয়েকটি ব্রণের দাগ থাকলেও পরিষ্কার সৌখীন চেহারা। কিন্তু আপাতত মাথার চুলগুলো বিশৃঙ্খলভাবে কাপালে নেমে এসেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলা, এমনভাবে টলছে যেন নিরবলম্ব হয়ে দুলছে বাতাসের সঙ্গে।

জড়ানো গলায় লোকটা বললে, পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া!

প্রণবেশ বললে, মাতাল।

—মাতাল!—সুনীলার আর্তনাদ এবার স্ফুটতর হয়ে উঠল। সভয়ে প্রণবেশের বুকের কাছে সে সরে দাঁড়ালো: কী হবে?

—কিছুই হবে না—প্রণবেশের বলিষ্ঠ পুরুষদেহ শক্তিতে বৈদ্যুতিক হয়ে উঠল: আপনিই চলে যাবে এখন।

লোকটা সেখানে দাঁড়িয়েই বিড়বিড় করে জড়ানো গলায় বলে চলেছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, ওরা তার লক্ষ্য নয়, সে এখন কাউকেই নিজের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে না। বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুড়ির মতো কাঁপতে কাঁপতে লোকটা আওড়াতে লাগল: টিপস্—ডবল টোট—গোল্ডেন অ্যারো! ছোঃ! হামারা পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া—

বলতে বলতেই হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলল সে: পঞ্চাশ হাজার রূপেয়া—। ফতুর কর্ দিয়া—একদম ফতুর কর্ দিয়া। ওঃ হোঃ হাঃ—

প্রণবেশ বললে, চলুন পাশ কাটিয়ে যাই। ও এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার শোক সামলাতে পারছে না—কোনোদিকে তাকাবার ফুরসুৎ ওর নেই এখন।

সুনীলাকে একরকম হাতে ধরেই টেনে বের করে নিয়ে গেল প্রণবেশ। দ্রুতগতিতে খানিকটা এগিয়ে সভয়ে পেছন ফিরে তাকালো সুনীলা। লোকটা এখনো সেইখানে দাঁড়িয়ে—এতদূর থেকেও তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

—এখনি সার্জেণ্ট এসে ওকে থানায় নিয়ে যাবে—বেশিক্ষণ আপসোস করতে হবে না—প্রণবেশ আশ্বাস দিলে।

ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে সুনীলা বললে, কী হয়েছে লোকটার?

—শুনলেন না? রেসের মাঠে ঘোড়ার পায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার নৈবেদ্য দিয়ে এল। এখন একেবারে ফতুর। সেই শোকটাকে ভোলবার জন্মেই প্রাণপণে মদ টেনেছে।

—ওঃ!

প্রণবেশ যেন স্বগতোক্তি করলে: কোত্থেকে যে মানুষের ধারণা জন্মায় মদ খেলে দুঃখ ভোলা যায়! উল্টোটাই হয় বরং। যে দুঃখ ছিল সেটা দশগুণ বাড়ে, যেটা কোনোদিন ছিল না, সেটাও আচমকা গজিয়ে ওঠে।

—ডাক্তারিতে বলে বুঝি এসব?

—ঠিক মনে পড়ছে না—প্রণবেশ পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট খুঁজতে লাগল: তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

—মানে, আপনি—সুনীলা শিউরে উঠল।

ঠোঁটে সিগারেট লাগাতে লাগাতে প্রণবেশ বললে, ভয় নেই। এখন আর ছুঁই নে—ছোবার প্রবৃত্তিও নেই। বছর তিনেক আর্মিতে ছিলাম আসাম মণিপুর ফ্রণ্টে। ট্রেঞ্চে রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছে, মাথার উপর বৃষ্টির ঝাঁকের মতো বয়ে গেছে মেশিন-গানের গুলি। শেল্ আর সারারাত বোমা ফেটেছে আশেপাশে। তখন সঙ্গে মদের বোতল না থাকলে তো পাগলই হয়ে যেতাম। তেষ্টার জলের কাজ তো বীয়ার দিয়েই চালাতে হয়েছে কতদিন।

সুনীলা একটু যেন সরে গেল কাছ থেকে: ভারী খারাপ।

—খারাপ বইকি।—সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে প্রণবেশ বললে, মানুষের মনুষ্যত্ব মুছে ফেলতে ওর মতো উপকরণ আর দুটি নেই। বিচার-বিবেক বিসর্জন দিয়ে নিরঙ্কুশ পশুকে জাগাতে হলে ওইটিই হল তার শ্রেষ্ঠ আহুতি। ওই লোকটাকে দেখলেন তো? এই নেশার ঝোঁকেই স্ত্রীকে লাথি মেরে তার গয়না কেড়ে নেবে কালকের রেসের জন্যে। মদ না খেলে অমন সহজে সর্বনাশের রাস্তায় নেবে যাওয়া যায় না।

—ওসব আলোচনা ছেড়ে দিন। ভালো লাগছে না।

—ঠিক কথা। জিনিসটা প্রীতিকর নয়।

চৌরঙ্গীর ফুটপাত ধরে এস্‌প্ল্যানেডের দিকে এগোচ্ছিল দুজনে। হঠাৎ সুনীলা বললে, এখন বাড়ি যাওয়া যাক।

—চলুন।

—কোথাও চা খাবেন না এক পেয়ালা?

—থাক আজ।

এর মধ্যে বন্ধু ঘটক একদিন পাকড়াও করলে প্রণবেশকে।

—ব্যাপার কী ঘোষাল? চারদিকে যে আলোড়ন জাগিয়ে বসে আছো।

অ্যাপ্রনটা খুলতে খুলতে প্রণবেশ বললে, হঠাৎ আলোড়ন জাগাবার মতো কী করলাম?

—আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় গড়ের মাঠ ইত্যাদি ভালো ভালো জায়গায় তোমাকে দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে একটি চাঞ্চল্যকর মেয়ে।

—তাতে আলোড়িত হওয়ার কী আছে?—প্রণবেশ হাসল: চাঞ্চল্যকর মেয়েদের নিয়ে বেড়াবার জন্যেই তো ভালো ভালো জায়গা সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটক হিংসার হাসি হাসল: সাধু সাধু। তবে তোমার মতো ভীষ্মের কাছ থেকে ওটা আশা করা যায় না—এই আর কি! যুদ্ধ থেকে ফিরেও যেমন কামিনীকাঞ্চন বর্জিত দিন কাটাচ্ছিলে, তাতে তুমি হঠাৎ—

—এমন প্রতিজ্ঞা কি করেছিলাম যে মেয়েদের দেখলেই গঙ্গাস্নান করব?

তর্কে আমল না পেয়ে ঘটক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলে: তা বেশ। তবে তুমি আবার ইম্মিউনড্‌ নও কিনা। অনেক ঘাটের জল খেয়েছি আমরা—আমাদের কথা আলাদা কিন্তু তোমাকে যদি একবার রোগে ধরে বাঁচানো শক্ত হবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর মেডিকেল অ্যাড্‌ভাইস—প্রণবেশ উঠে পড়ল: কিন্তু এখুনি বেরুতে হচ্ছে আমাকে।

—কোথায়?—চোখের একটা তির্যক ইঙ্গিত করলে ঘটক: সেই তার ওখানেই নাকি?

—ঠিক ধরেছ।—চমকিত ঘটককে আরো নার্ভাস করে দিয়ে প্রণবেশ বললে, কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও আছে দেখছি তোমার। আর শোনো। ইচ্ছে করলে তুমি এখন আমাকে ফলো করতে পারো। সাম মোর ডিশেজ ফর ইয়োর ফ্রেণ্ডস্।

জুতোর শব্দ তুলে প্রণবেশ বেরিয়ে গেল। ঘটক কিছুক্ষণ বসে রইল বোকার মতো, তারপর স্বগতোক্তি করলে, মরেছে!

কিন্তু সত্যি সত্যিই মরেছে প্রণবেশ। বিকেলে যেদিন ছুটি পায় সেদিন ওই চারতলার ফ্ল্যাট বাড়িটার আকর্ষণ কিছুতেই রোধ করতে পারে না সে। বেলাশেষের আলো এখন নেশার মতো নেমে আসে, সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘন হয়ে জমতে থাকে স্নায়ুর ওপরে। নিজের কাছে প্রথম প্রথম লজ্জা হত, সে স্তরটাও পেরিয়ে গেছে অনেকদিন।

বাইরের ঘরে আজ আর সুনীলা ছিল না, জয়াবতীও না। সোফার ওপরে পা তুলে শুয়েছিলেন একজন প্রৌঢ় অচেনা ভদ্রলোক। পাকা চুলে সৌখীন সিঁথি কাটা, পরনে সিল্কের পায়জামা আর পাঞ্জাবি, হাতে ধূমায়িত চুরুট। ভ্রূরেখা সংকীর্ণ করে ভদ্রলোক পরীক্ষকের ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে মনে প্রণবেশ ছট্‌ফট করে উঠল।

—আপনি বোধ হয় ডক্টর প্রণবেশ ঘোষাল? আসুন, বসুন।

প্রণবেশ বসল। তারপর কুণ্ঠিত বিস্ময়ে একটা ঢোক গিলে বললে, আপনি—

ভদ্রলোক কথাটা কেড়ে নিলেন: আমি বি. মল্লিক—এঁদের কাছে মল্লিক সাহেব। আর এতদিন কোনো পরিচয় না থাকলেও নামটা অনেকদিন থেকেই জানি আপনার। তা সুনীলাকেই তো আপনি চান?—কেমন ধূর্ত হাসি হাসলেন মল্লিক সাহেব: দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।

গলা চড়িয়ে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে মল্লিক ডাকলেন: সুনীলা, ডক্টর ঘোষাল এসেছেন।

—আসছি—সুনীলার সাড়া পাওয়া গেল।

—ওর মা এখন বাড়িতে নেই অবশ্য। তাতে আপনার অসুবিধে নেই বোধ হয়?—হাসির সঙ্গে যেন চোখ টিপলেন মল্লিক।

বিরক্ত আর বিব্রত বোধ করলে প্রণবেশ। লোকটার মধ্যে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন ইতরতা আছে, আছে অশোভনভাবে খোঁচা দেবার একটা প্রয়াস। মুহূর্তের মধ্যে মল্লিকের মুখখানা দেখে নিলে প্রণবেশ। দাঁতগুলো হলদে, গালে কপালে রেখার জটিলতা, চোখের কোলে কোলে কালো ভাঁজ। ডাক্তারের মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল: এই বাড়িতে আসবার যোগ্য কি এ লোকটা?

মল্লিক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, সঙ্গে গাড়ি এনেছেন বুঝি?

—না, গাড়ি আমার নেই।

—কবে কিনছেন?

লোকটা কি মোটর কোম্পানির এজেন্ট ? সংক্ষেপে জবাব দিলে, সে কথা এখনো ভাবিনি।

মল্লিক নাকটা কুঁচকোলেন একটু : ওঃ ! কিন্তু বাড়িটা তো নিজস্ব ? না, ভাড়া দিয়ে থাকেন ?

প্রণবেশের মুখ লাল হয়ে উঠল। ভালো করে পরিচয়টা হওয়ার আগেই এরকম সাংসারিক প্রশ্ন করবার কী অধিকার ওঁর আছে, এমনি একটা তিক্ত জিজ্ঞাসা ঠেলে এল গলার কাছে। কিন্তু তার আগেই ঘরে ঢুকল সুনীলা। পরনে নীল শাড়ি, প্রসাধনে উজ্জ্বল। বেরুবার জন্যেই তৈরী হয়ে এসেছে।

মল্লিক বললেন, একদম রেডি ? বেরুবার জন্যে মুখিয়েই ছিলে বোধ করি ? কিন্তু বাঃ—বাঃ ! সুনীলা যে একেবারে নীলে নীলে একাকার ! 'চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি'—

বিদ্যুৎবেগে মল্লিকের দিকে তাকিয়ে খরদৃষ্টিতে একঝলক ভৎর্সনা বর্ষণ করলে সুনীলা। তারপর তপ্ত মুখে প্রণবেশকে বললে, চলুন—

সঙ্গে সঙ্গেই প্রণবেশ উঠে পড়ল, বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। আর একটু দেরি হলে হয়তো মল্লিককে আক্রমণ করে বসত।

—ফেরা হবে কখন ?—পেছন থেকে নির্লজ্জের মতো মল্লিক আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল।

সুনীলা কোনো জবাব দিলে না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শোনা গেল, পেছনে তীব্রভাবে শিস বাজাচ্ছে মল্লিক।

গাড়িতে ওঠবার পরে সুনীলাই শুব্ধতা ভাঙল : কিছু মনে করেননি তো ?

—না, কেন মনে করব ?

—মল্লিক সাহেবের জন্যে ?

—মনে করার কী আছে ?—এতক্ষণের সঞ্চিত অসহ্য কৌতূহলটা প্রণবেশ মেলে ধরল : উনি বুঝি তোমাদের আত্মীয় ?

সুনীলা জানালার দিকে মুখ ফেরালো, তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না। তারপর বললে, অনেকটা তাই বটে। কিন্তু—হঠাৎ তার দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল : মল্লিক সাহেব কিছু বলছিলেন নাকি আপনাকে ?

—বিশেষ কিছু নয়। জিজ্ঞেস করছিলেন, কবে গাড়ি কিনব, পৈতৃক বাড়ি আছে কি না আমার। ভদ্রলোক বোধ হয় একটু—

সুনীলা কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে রইল, তারপর : আপনাকে একটা কথা বলব ভেবেছি—দ্বিধা করে শেষ করলে সুনীলা : যেদিন আসবেন, আগে একটা টেলিফোন করে দিলে ভালো হয়।

—টেলিফোন?—প্রণবেশ ঘা খেলো। এতদিন এই লৌকিকতাটুকুর প্রয়োজন হয়নি।

অপরাধে ম্লান হয়ে সুনীলা বললে, আর কোনো কারণ নেই, কখনো কখনো বাড়িতে হয়তো না-ও থাকতে পারি। আপনি এসে শুধু শুধু বসে থাকবেন—

কৈফিয়ৎটা মিথ্যের সঙ্কোচ দিয়ে জড়ানো, জেরা করলে ও আবরণটুকু এক মুহূর্তও টিকবে না। কিন্তু প্রণবেশের আর জের টানতে ইচ্ছা করল না। সব ঠিক আছে, অথচ কোথায় কী একটা বাধছে ক্রমাগত। তাকে ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু তার ক্ষতটা গভীর হয়ে আসছে প্রত্যেক দিন।

আজকের প্রোগ্রাম ছিল সিনেমা। কিন্তু ছবি আরম্ভ হতে তখনো দেরি আছে খানিকটা। দুজনে চা খেতে ঢুকল।

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে যাওয়ার পরেও মাঝখানের আকাশটা কেমন মেঘগম্ভীর হয়ে রইল। অথচ, আজ নিজেকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না প্রণবেশ। নিজের কাছে যেটুকু কুণ্ঠা ছিল, সেটাকে ঘটকের ব্যঙ্গ ছিঁড়ে সরিয়ে দিয়েছে দূরে। চোখ-টেপা হাসিতে ইতর ভঙ্গিতে কী একটা কথা বলতে চেয়েছে মল্লিক সাহেব। চারদিক থেকে যেন সে আজ নগ্ন হয়ে গেছে, আর দ্বিধা করলে চলবে না।

সপ্রতিভভাবে সে হাসতে চাইল: বন্ধুদের বড্ড চোখ টাটাচ্ছে।

সুনীলা যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে ছিল। মুখ তুলল, কিন্তু যেন শুনতে পেল না।

—ওরা বলছে—পেশল হাতে টেবিলের একটা পায়া মুঠো করে ধরে সহজ আর দৃঢ় হতে চাইলে প্রণবেশ: আমার মতো ভীষ্মেরও নাকি মতিভ্রম ঘটছে। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘোরাফেরা করার ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছে না ওদের।

সুনীলা মাথা নিচু করলে। পষ্টোচ্চার প্রসাধন সত্বেও গালের রঙ তার বিবর্ণ হয়ে এল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল অল্প অল্প।

মরীয়া প্রণবেশ বললে, আমি জবাব দিয়েছি, ভীষ্ম আমি নই, হতেও চাই না।

—বেয়ারা ট্রে নামিয়ে দিয়ে গেল। সুনীলা চা তৈরি করতে লাগল নিঃশব্দে।

জবাবের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, আদালতে যেন স্বীকারোক্তি দিচ্ছে এমনিভাবে প্রণবেশ বলে চলল, ওরা বলছে, আমার নাকি আর বাঁচবার পথ নেই। নাই বা থাকল—উত্তেজিত উৎকণ্ঠ আবেগে সে ঝুঁকে পড়ল সুনীলার দিকে: তুমি কি মনে করো কোনো ক্ষতি আছে তাতে?

চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট ছুঁইয়েছিল সুনীলা। চুমুক না দিয়েই নামিয়ে রাখল।

—আমার কথার জবাব দাও—প্রণবেশের উত্তেজনার মাত্রা ছাড়াতে লাগল স্তরে স্তরে: বলো।

সুনীলা মুমূর্ষুর মতো জ্যোতিহীন চোখে তাকালো : বন্ধুদের কথাই আপনার শোনা উচিত। এখনো ফেরবার উপায় আছে আপনার।

—একথা তুমিও বলবে ?—একটা আহত গোঙানি বেরুল প্রণবেশের গলা দিয়ে।

—যা সত্যি, সে কথা সবাই বলবে।

—সুনীলা!

প্রায় চাপা গর্জন করে উঠল প্রণবেশ, হয়তো আর একটু হলেই সুনীলার একখানা হাত সে চেপে ধরত। বিমর্ষ শ্রান্ত হাসি মুখে ফুটিয়ে সুনীলা বললে, চায়ের দোকানে বসে কী হচ্ছে এসব ? তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন চা-টা, এখনি ছবি আরম্ভ হবে।

কিন্তু মনটাকে প্রাণপণে দমন করতে করতে প্রণবেশ চায়ের পেয়ালা মুখে তুলল। কিন্তু বিশ্রী রকমের তেতো লাগল চা-টা।

তারপরে তেতো লাগল ছবিটাও। এমন ক্লান্তিকর দীর্ঘ ছবি জীবনে সে আর দেখেনি।

ফেরার পথে একবার যেন মনে হল, জানালার বাইরে মুখ বের করে দিয়ে কাঁদছে সুনীলা। ইচ্ছে হল ওকে স্পর্শ করে, টেনে নিয়ে আসে বুকের ভেতর, মুহূর্তে চরম নিষ্পত্তি করে ফেলে সব কিছুর।

কিন্তু সাহস হল না। নিজের মনের মধ্যেই একটা শক্ত বেড়া পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুনীলাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে প্রণবেশ যখন বিদায় নিলে, রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা। ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল সুনীলা। বিস্বাদ একটা বেদনায় দেহমন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। মুখের ভেতরেও তিক্ত একটা অনুভূতি, চাপা জ্বর হয়েছে যেন। বারে বারে একটা নিঃশব্দ নিষেধ বাজছে নিজের মধ্যে : আর কেন—এইখানেই দাঁড়ি টানো। অন্যকে নিয়ে খেলবার আর নিজেকে নির্যাতন করবারও একটা সীমা আছে —সে সীমা পেরিয়ে যাওয়ার আগেই তুমি থেমে দাঁড়াও।

এখন এই মুহূর্তে তার চারদিকের ফ্ল্যাট বাড়িটা ক্রমেই ঘন আর সংকুচিত হয়ে আসছে —তাকে ঘিরে ধরছে একটা ফাঁদের মতো। সিঁড়ির রেলিং আর পাশের দেওয়াল তার হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরতে চায়—মুক্তি নেই, অথচ মৃত্যুও নেই। বাঁচতে পারবে না—মরতেও পারবে না, শুধু মাঝখানে দাঁড়িয়ে অক্সিজেন টানতে থাকবে—যেমন টানতে হয়েছিল হাসপাতালে কয়েকদিন।

ড্রয়িংরুমের দরজা খোলাই ছিল। মল্লিক সাহেব এখনো বসে আছে, তার চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর প্রায় অন্ধকার। সোফার ওপর আধশোয়া জয়াবতীর মুখেও জ্বলন্ত সিগারেট একটা।

সুনীলা পাশ কাটিয়ে ডান দিকের দরজার দিকে এগোচ্ছিল। জয়াবতী ডাকলেন, এই সুনী, দাঁড়া।

অপ্রসন্নভাবে সুনীলা থেমে দাঁড়ালো : কী বলবে বলো।

—অত তড়বড় করছিস কেন ?—জয়াবতী ধমক দিলেন : কিছু দিলে আজ ডাক্তার ?

—কী আবার দেবেন ?—একটা আসন্ন সংঘর্ষ অনুমান করে সুনীলা সোফার পিঠ আশ্রয় করলে।

সিগারেটটা অ্যাশ্‌ট্রেতে গুঁজে দিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন জয়াবতী : তবে ওর সঙ্গে ঘোরা কেন অমন করে ? এর চাইতে শেঠজীর ছেলেটার সঙ্গে বেরুলেও এতদিনে ছু হাজার টাকা ঘরে আসত। এই তো মল্লিক সাহেব বলছিলেন—

—আমি এখন বড্ড ক্লান্ত মা, আমার ভালো লাগছে না—সুনীলা আবার যাওয়ার উপক্রম করলে।

—দাঁড়া, দাঁড়া !—জয়াবতী কুৎসিত গলায় বললেন, আমারই বড্ড ভালো লাগছে কি না ! এত খরচ-পত্তর করে এখানে সব সাজিয়ে বসলাম, সে বুঝি ছুটো মিঠে মিঠে কথা শোনবার জন্যে ? নগদ টাকা না হোক অন্তত একটা ঘড়ি দিলে দিতে পারত, দিতে পারত ছু-একখানা গয়না। ভুল আমারি হয়েছিল। সুন্দর চেহারা আর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল বেশ ভালো ঘরের ছেলে—

—থামো মা, থামো।—আর্ত হয়ে সুনীলা বললে, যত ছোট আমরা হই না কেন, আমাদেরও কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে। যখন মরতে চলেছিলাম, নিজের রক্ত দিয়ে উনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সে কথাটা অন্তত তোমার ভোলা উচিত নয়।

রেখাজটিল মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে হাসির ভঙ্গিতে হল্‌দে দাঁতগুলো উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে মল্লিক সাহেব এতক্ষণ লোলুপ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন সুনীলাকে। এবারে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে হেসে উঠলেন সশব্দে।

—তোমার জন্যে ব্লাড ? ওতে বাহাদুরি নেই। অমন চাঁদমুখের দিকে তাকালে আমার নিজেরই গলা কেটে ব্লাড দিতে ইচ্ছে করে, ছেলে-ছোকরারা তো কোন্ ছার !

দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ ঘৃণা জেলে সুনীলা মল্লিক সাহেবকে দগ্ধ করতে চাইল : সবাইকে আপনার চোখ দিয়ে নাই বা দেখলেন মল্লিক সাহেব। আপনি ছাড়াও মানুষ আছে সংসারে।

—আছে নাকি ?—অশ্লীল একটা মুখভঙ্গি করলেন মল্লিক সাহেব : যাক, শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। ওগো জয়মণি, তোমার আর ভাবনা নেই। তোমার লায়েক মেয়ে অ্যাদ্দিনে মানুষ চিনতে শিখেছে, আমরা এখন বাতিল !

খোঁচা-খাওয়া গোখরো সাপের মতো ফণা তুললেন জয়াবতী। তাঁর চোখ থেকে বিষ

ঝরে পড়ছে। মনে হল, মেয়ের গায়ে হাত তোলবার জন্যে এই মুহূর্তেই তিনি প্রস্তুত।

—চুপ কর, সুনী, খুব হয়েছে। রক্ত দিয়েছিল, বেশ তো। এক মাস ধরে লাই দিয়েছিস সেজন্যে। কিন্তু তাই বলে খালি হাতে কতদিন চলবে এসব ইয়ার্কি? তোর ভরসাতেই তো সব। এরকম ভাবে কেবল বসে বসে লোকসান করলে আর ঠাট বজায় রাখা শক্ত হবে—দামী খদ্দের কেউ ভিড়বে না। তুই ডাক্তারকে আসতে বারণ করে দে। আর কাল মল্লিক সাহেব শেঠের ছেলেকে নিয়ে আসবেন—তার সঙ্গেই তুই বেরোবি এখন থেকে।

ঠোঁট চেপে কঠিন গলায় সুনীলা বললে, ক্ষমা করো মা—আমি পারব না।

—পারবি নে?—অসহ্য ক্রোধে জয়াবতী কাঠ হয়ে গেলেন, কথা বেরুল না মুখ দিয়ে।

মল্লিক সাহেব কুটিল ব্যঙ্গে বীভৎস মুখে বললেন, কেন পারবে না? 'লভ্' বুঝি? বিয়ে করবে ওকে?

—লভ! বিয়ে!—জয়াবতী এবার ফেটে পড়লেন: ওই সব করার জন্যেই বুঝি তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছি? পাড়া ছেড়ে এখানে এসে ঘর নিয়েছি? শোন্ সুনি। এর পরে ডাক্তার এলে ঝাঁটা মেরে আমিই বিদেয় করব—তোকে কিছু করতে হবে না। লভ্—বিয়ে!—জয়াবতী বিকটভাবে আবার মুখ ভ্যাংচালেন: ওসব ভদ্দর ঘরের নবেলপড়া মেয়ের সখ দিয়ে তোমার আর কাজ নেই বাছা!

কিন্তু প্রণবেশকে কারো কিছু বলবার দরকার ছিল না—জয়াবতীরও না। কারণ সুনীলার ছোট হাতব্যাগটা ট্যাক্সিতে পড়ে থাকতে দেখে, সেইটে নিয়ে মিনিট দুয়েক পরেই ফিরে এসেছিল প্রণবেশ। ঘরে ঢোকবার তার আর দরকার হয়নি। দোরগোড়াতেই ব্যাগটা ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে কখন সে বিদায় নিয়েছে, কেউ সেটা টেরও পায়নি।

"পরশু রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, আমি তোমার কাছে আসব।

বিশ্বাস করো, কোনো অপবিত্র দেহে কিংবা মনে তোমার রক্ত মেশেনি।—এক জন্মের অপরাধ ছাড়া আর কোনো অপরাধই আমার নেই। সেই অপরাধ ক্ষমা করার মতো উদারতা তোমার আছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি।

আমাকে যদি তুমি গ্রহণ না করো, তবে কোথায় আমাকে নেমে যেতে হবে সে তুমি জানো। তাই আমার সমস্ত পরিণাম তোমার হাতেই আমি তুলে দিলাম। আমার জীবন-মৃত্যু দুই-ই তোমার কাছে ধরে দিয়েছি—এবার তুমিই বিচার করো।"

সেই পরশুর রাত আজ এসেছে।

বাইরে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। ভূতে পাওয়া অন্ধকারের কান্না বাজছে শার্সিতে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে বারোটার ঘরে।

কাঁপা হাতে গ্লাসটা নামিয়ে ত্রিশবার পড়া চিঠিখানা আরো একবার পড়ল প্রণবেশ। সেই প্রথম চিঠির মতোই কাগজ, সেই অস্পষ্ট সুরভির আমেজ—এতবার করে পড়াতেও সেটা মুছে যায়নি। সেই হাতের লেখায় একটি ভীরু সংশয়—একটি তরুণ মনের আকুতি।

প্রণবেশ হাসল, গ্লাসে নির্জলা পেগ্ ঢালল আর একটা। চার বছর পরে ট্রেঞ্চের রাত্রিটা ফিরে এসেছে আবার। জানলার শার্সিতে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা মেশিনগানের গুলির মতো এসে লাগছে। বিদ্যুৎ ঝলকে যাচ্ছে—শেল ফাটবার অগ্নিরাগে যেন চমকে উঠছে চারিদিক।

আসুক সুনীলা, আসুক। দরজা খুলেই সে রেখেছে। আসুক এই ঝড়ের রাত্রিতে—আসুক এই অন্ধকারের পথ দিয়ে। নেশায় মাথাটা টেবিলের ওপর নুয়ে আসতে চাইল প্রণবেশের—কুঁকড়ে আসতে চাইল চোখের পাতা। গড়ের মাঠের সেই মাতালটার মতোই সেও বিড়বিড় করতে লাগল: আসুক, আসুক সুনীলা।

কিন্তু সুনীলা তো এসেই ছিল। এসেছিল তিমিরাভিসারে, এই অন্ধকার—এই বৃষ্টির পথ দিয়ে। তবু তাকে ফিরে যেতে হয়েছে নিঃশব্দে দরজার গোড়া থাকে। সেদিন যেমন করে প্রণবেশ ফিরে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি করেই।

খোলা দরজা দিয়ে সে দেখেছে মদের গ্লাস—দেখেছে মদের গ্লাসের নিচে তার চিঠি। বুঝতে পেরেছে, প্রণবেশ তাকে তুলে নিতে চায় না—নেশার মধ্যে দিয়ে তার কাছেই নেমে আসতে চায়। তাকে বাঁচাবার শক্তি নেই প্রণবেশের, সে পারে তারই সঙ্গে আত্ম-হত্যা করতে।

এর পরে কি আর সেখানে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল সুনীলার পক্ষে? সম্ভব ছিল এক মুহূর্তের জন্যেও?

কালনেমি

সাহেব বললেন, বণ্ডে মাটরম্!

কী চমৎকার যে শোনালো বলবার নয়। গড্ সেভ দ্য কিং গাইবার সময়েও এমন জলন্ত আর গভীর অনুরাগ সঞ্চারিত হয় না তাঁর গলায়। আবেগের উচ্ছ্বাসে লাল মুখখানি একেবারে টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে, কপিশ চোখ দুটি ঝকঝক করছে বেড়ালের চোখের মতো। অ্যাঞ্জেল্ সাহেবকে এখন দেবদূতের মতোই মনে হচ্ছে প্রায়।

পনেরোই আগস্টের সকাল। রাষ্ট্রক্ষমতার হাত বদল হয়ে গেছে কাল রাত্রিতে। অশোক-চক্রাঙ্কিত পতাকা উড়ছে লাল কেল্লায়। আজাদ ভারত জিন্দাবাদ। একশো

একানব্বুই বছর পরে, বহু রক্তস্নানের অবসানে শুচিস্মিত ভারতবর্ষ আবার মাথা তুলেছে, স্বাধীন সূর্যের আলোয় যেন সোনার মুকুট জ্বলছে এভারেস্টের চুড়োয়।

'সাম্রাজ্য বানচাল হতে দেব না'—মেঘমন্দ্র ধ্বনি এসেছিল কিছুদিন আগে। আশ্বাস ছিল তাতে, অভয় ছিল। নিশ্চিন্তই ছিলেন অ্যাঞ্জেল্ সাহেব। শিস্ দিয়ে দিয়ে কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন, জঙ্গলে ঢুকতেন বন-মুরগী শিকারের চেষ্টায়। কিন্তু হোয়াট্ এ হরর। শেষকালে অ্যাঞ্জেল্ সাহেবকেও নিজের নামের মহিমা বিসর্জন দিয়ে একটা কর্কশ শপথের সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর বিরাট গলায় বলতে হল: লেট্ ডেভিল টেক দ্যাট্ লেবার গভর্ণমেন্ট্—

এমন সময় পাশের বাগান থেকে চা খেতে এলেন জনস্টন সাহেব। তিরিশ বছর আছেন প্ল্যান্টেশন নিয়ে, অত্যন্ত ঝানু লোক। মুখের লাল গোঁফজোড়ায় দুটি-একটি করে ধূসরতা ফুটে বেরুচ্ছে। একটা চোখে চশমা পরেন আর সেই চশমার আড়ালে শিকরে বাজের মতো ক্রূর একটা লোলুপতা যেন ঝিকিয়ে ওঠে মধ্যে মধ্যে।

বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টিতে অ্যাঞ্জেল্ সাহেব তাকালেন তাঁর দিকে। প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললেন, ইট ইজ টেরিব্‌ল্!

কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না জনস্টনের। স্যাণ্ড্‌উইচ্ চিবুতে চিবুতে এবং হাঁটু দোলাতে দোলাতে তিনি একখানা হাত বরাভয়ের মতো প্রসারিত করে দিলেন অ্যাঞ্জেলের দিকে। বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ইউ নো ক্লিমেণ্ট অ্যাট্‌লি। হি ইজ এ নাইস্ চ্যাপ—হি ইজ।

—কিন্তু এ যা হচ্ছে—

—ভালোই হচ্ছে। ওভাবে আর টেঁকা যাবে না সেটা তো বুঝতেই পারছ। এখন স্রেফ গিভ অ্যাণ্ড টেক্, বখরা কিছু বেশি দিলেই দিব্যি চলে যাবে, কিছু ভেবো না।

তবু ভরসা হয়নি অ্যাঞ্জেল্ সাহেবের। পরের দিন সকালে পোষা কুকুরটা যখন ল্যাজ নাড়তে নাড়তে পায়ের তলায় এসে শরণ নিলে তখন কী ভেবে অকারণেই একটা লাথি বসিয়ে দিলেন তাকে। মুখে বিস্বাদ লাগল মুরগীর ঠ্যাং, একশো বছরের পুরনো মদও যেন মনে হল জলের মতো পানসে। ওঃ গড্! সত্যিই কি চলে যেতে হবে? ভারতবর্ষের এই রসালো মাটিতে এই সহস্রমুখী শিকড়গুলোকে এক টান দিয়ে উপড়ে ফেলে দীনাতিদীনের মতো নত মস্তকে গিয়ে উঠতে হবে জাহাজে? এর চাইতে মৃত্যু ভালো, এ অপমান সইবার আগে আত্মহত্যা করাও বুদ্ধিমানের কাজ। ওই লেবার পিপ্‌লগুলোকে এখন একবার সামনে পেলে—

অ্যাঞ্জেল্ সাহেব ঘরের কোণের দিকে তাকালেন। সূর্যের আলো পড়ে সেখানে তাঁর রাইফেলের ব্যারেলটা ঝকঝক করে উঠছিল।

কয়েকটা দিন যেন বিকারগ্রস্তের মতো কাটালেন তিনি। দেড় হাজার একরের এই বিস্তীর্ণ প্ল্যান্টেশনের দিকে তাকিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করত তাঁর, ইচ্ছে করত আর্তনাদ করে উঠতে। শালফুলের গন্ধভরা বাতাসে মৃদু মৃদু শিহরিত হচ্ছে ঘন সবুজ চা-গাছের সমুদ্র, ঝির ঝির করে কাঁপছে হাজার পাউণ্ড টু লীভ্‌স অ্যাণ্ড এ বাড্‌। ফ্যাক্টরি থেকে অবিশ্রান্ত মেশিন আর ডায়নামোর শব্দ, ওই শব্দটার সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে বড় বড় জাহাজের প্যাড্‌লের আওয়াজ—মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে ভারতীয় চা কেনবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে—লিভারপুল, ডোভার, বোস্টন, সান্‌ফ্রান্‌সিসকো—

কিন্তু এ কী ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা এসে দেখা দিচ্ছে সম্মুখে! সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজ-ডুবির মতো একটা অশুভ অনিবার্যতার সংকেতে থমথম করছে চারদিক। রাতের পর রাত জেগে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতেন, ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে, ছ'ঘরা রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে প্রতীক্ষা করতেন যেন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে। মাঝে মাঝে এমনও মনে হতো হয়তো বা শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যাবেন তিনি।

তারপর সাহেব প্ল্যান্টারদের বড়কর্তা যেদিন লণ্ডনে রওনা হয়ে গেলেন, সেদিন প্রথম পেট ভরে খেলেন। তারপরে লণ্ডন থেকে যেদিন কেব্‌ল এল, সেদিন তিনি জনস্টনকে আবার ডিনারে ডাকলেন।

জনস্টন সোনা-বাঁধানো দাঁত বের করে হাসলেন সুললিত এবং মনোহরণ ভঙ্গিতে। এক হাতে ধূসরের ছোপ লাগা লাল গোঁফজোড়ার পরিচর্যা করতে করতে শিকারী বাজের মতো ক্রুর লোলুপ এক চোখের দৃষ্টিতে তাকালেন।

—আমি বলিনি তোমাকে? দে আর নাইস্‌ পিপ্‌ল্‌।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তারপর?

—তারপর কাঁচি।

—কাঁচি?

অতিশয় স্নেহে গোঁফজোড়াকে আঁচড়াতে লাগলেন জনস্টন: হাঁ, কাঁচি। এরপরে আমাদের হাতযশ। কেটে একবার নেপালের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারলে ইউ নো। নেপাল গভর্ণমেণ্ট ভদ্রলোকের জায়গা, এই বাঙালীদের মতো তারা ছোটলোক নয়।

পুরো এক মাস পরে আজ অ্যাঞ্জেল্‌ সাহেব হাসলেন। রাত্রে যে শুধু ঘুমুলেন তাই নয়, পরমোৎসাহে নাকও ডাকালেন দস্তুরমতো। পরদিন সকালে তাঁর ক্ষুধার বহর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল বাবুর্চি।

—বণ্ডে মাটরম্‌—বণ্ডে মাটরম্‌—

আজ পরমোৎসাহে জয়ধ্বনি করছেন সাহেব। আজ পনেরোই আগস্ট, স্বাধীন ভারত আর আজাদ পাকিস্তানের পতাকায় স্বর্ণ দিনের সমুজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। শুধু

পরাধীনতার শাপমুক্তি নয়, অভাব অভিযোগ দারিদ্র্যের পাপমুক্তিও বটে। রেডিয়োটাকে আজ বাংলোর বারান্দায় এনে বসিয়ে দিয়েছেন সাহেব, আওয়াজের চাবিটা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। কাল রাত থেকে যন্ত্রটার আর বিশ্রাম নেই।

বক্তৃতা চলছে, চলছে জাতীয় সঙ্গীত, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে সুদূর দিল্লীতে উদ্বেলিত জনসমুদ্রের জয়ধ্বনি। অশোক চক্রাঙ্কিত পতাকা উড়েছে দিল্লীর লালকেল্লায়।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাগানের বাবুরা। সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন মূঢ়ের মতো। স্বাধীন ভারতই বটে।

সেদিনকার ছাব্বিশে জানুয়ারির কথা এখনো মনে আছে ডাক্তার তারাপদবাবুর। পরিতোষ বলে একটা বেয়াড়া ছোঁড়া এসেছিল বাগানে, পতাকা তুলেছিল সাহেবের বাংলোর মাথায়। পতাকাটাকে জুতোর তলায় দলে পিষে লাঞ্ছিত করেছিলেন সাহেব, 'হটাবাহার' করে দিয়েছিলেন পরিতোষকে। সেদিনও বাগানের বাবুরা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সব। অপমানের কালো কালো রেখা দু-একজনের মুখে ফুটে না উঠেছিল তাও নয়, কিন্তু কিছুমাত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি কেউ, পরিতোষও না। সম্ভবও ছিল না সেদিন।

সেদিন আর আজ!

আজ অ্যাঙ্গেল্ সাহেব দস্তুরমতো দেশপ্রেমিক, স্বাধীন ভারতের নাগরিক। কাল সারাটা বিকেল দাঁড়িয়ে থেকে বাগানের গেটে তৈরি করিয়েছেন দেবদারু পাতার তোরণ, সাজিয়েছেন লাল নীল কাগজ দিয়ে, উড়িয়ে দিয়েছেন পতাকা। নানা রঙের ঝালর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন বৈদ্যুতিক হরফ 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া'। পতাকা-দণ্ডের নিচে দাঁড়িয়ে আজ সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছেন নবজাতক মুক্ত ভারতবর্ষের ঝাণ্ডাকে, উদাত্ত উদার কণ্ঠে ঘোষণা করছেন: বণ্ডে মাটরম্—বণ্ডে মাটরম্—

অজিতবাবু ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ব্যাটার ভক্তি দেখ একবার। বিড়ালতপস্বী আর কাকে বলে!

রামময়বাবু বললেন, ভক্তি না করে যাবে কোথায়? হুঁ হুঁ বাবা, স্বাধীন দেশ। ইচ্ছে করলে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতে পারি।

—আস্তে আস্তে!—সভয়ে চারদিকে তাকালেন হরিকিঙ্করবাবু: শুনতে পাবে। এখনো ওর চাকরি করে খাচ্ছ, সেটা ভুলো না।

—হুঁ:, রেখে দাও—ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়ায় ভুগে বাদুড়-চোষা চেহারার রামময়বাবু সতেজে বললেন, এখন বাবা নেহেরু-গভর্ণমেণ্ট। এখন আমরাই মালিক।

শুধু কোনো কথা বললেন না তারাপদবাবু। চারদিকে কাঁপছে চা-গাছের সবুজ সমুদ্র।

ছায়া দিচ্ছে শিরিষের ঝিরঝির পত্র-পল্লব। বনের দিক থেকে বাতাস আসছে, বয়ে আসছে শাল ফুলের মৃদু করুণ গন্ধের ঝলক। আর সে বাতাসে প্রথম সূর্যের প্রসন্ন আলোয় ধর্মচক্রলাঞ্ছন পতাকা উড়ছে, উড়ছে আশ্চর্য সুন্দর মহিমায়। মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেছে দেড় হাজার একরের এই বাগানটা। মুছে গেছে এখানকার কালো কালো চায়ের সঙ্গে কালো মানুষ পেষণের যান্ত্রিক কলরব। সাহেবের মুখের ওপর দুলে দুলে পড়ছে পতাকার ছায়া, কিন্তু সত্যিই কি ছায়া পড়ছে? বেড়ালের মতো চোখ দুটো চকচক করছে কি দেশপ্রেমের বহ্নিতে, না কোনো চাপা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ সংকেতে? হঠাৎ কেমন আচম্বিতে আচ্ছন্ন আর তিক্ত হয়ে উঠল তারাপদ ডাক্তারের মন। হঠাৎ মনে হল বেতার যন্ত্রটার এই যে অবিচ্ছিন্ন কলকাকলি, কাল যখন ফ্যাক্টরির মেশিনগুলো চলতে শুরু করবে তখন তার সেই লোহা-লক্কড়ের কলরবের মধ্যে কোথাও কি শুনতে পাওয়া যাবে এর প্রতিধ্বনি?

আশ্চর্য হাতের কাজ ইয়োরোপীয়ান টী প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের বড় কর্তার। ধড় থেকে মাথাটিকে বেমালুম ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। জনস্টন বলেছেন এবার নিজেদের হাতযশ। যেমন করে হোক বেরিয়ে চলে যেতে হবে। ভিড়ে পড়তে হবে বাবা পশুপতি-নাথের নিরাপদ ছত্রছায়ায়। ঠিক কথা, নেপাল গবর্ণমেণ্ট ভদ্রলোকের জায়গা। বাঙালীর মতো তারা ছোটলোক নয়!

এই বাঙালীকে ঠিক চিনেছিলেন ছাট ওয়াইজম্যান মেকলে। এখানকার ভদ্রলোকদের যিনি 'বাঁদর লোক' বলে প্রাতঃস্মরণীয় উক্তি করে গেছেন ছাট কিপলিং ইজ এ ভিয়ার। এখন হালে পানি পাচ্ছে না বটে, কিন্তু এককালে এই বাঙালীরাই ক্ষেপিয়েছে ভারতবর্ষকে। এই ব্লডথার্স্টি বিস্ট্‌গুলোই ইয়োরোপের নিরীহ সিটিজেন্‌দের গুলি করে মেরেছে রিভলভারের মুখে। কেটে দুখানা হয়ে জোর কমেছে বটে কিন্তু এদের বিশ্বাস নেই। হয় নেপাল, নয় আসাম। কিন্তু এই পশ্চিম বাংলায় আর নয়।

—নেপাল!—জনস্টন সাহেব বলেছেন, ওখানকার রাণা অতি চমৎকার লোক।

—বটে?

—সন্দেহ কি?—পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে জনস্টন বলেছেন, লোকগুলো ভারি রাজভক্ত। তাছাড়া চমৎকার ম্যানেজ্‌মেণ্ট ওদের। চারজন লোক একসঙ্গে বেরিয়েছে কি হাতে হাতকড়া পড়বে। আড়ালে একটু কানাঘুষো হয়েছে কি ফাঁসির দড়ি তৈরিই আছে ওদের।

—আর আসাম?

—ভালো। ঢের ভালো এই কার্সড্‌ ওয়েস্ট বেঙ্গলের চাইতে।

'বন্দে মাটরম্'—ঠোঁটের কোণায় কোণায় অল্প একটু হাসলেন অ্যাঙ্গেল্ সাহেব। স্বাধীনতার বকশিশ দেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে একটি দিন পরিপূর্ণ ছুটিভোগের অবসর। একটা খদ্দরের স্যুটের অর্ডারও দেবেন ঠিক করেছেন। পাঞ্জাবি আর পায়জামাতে নেহাৎই মানায় না, নইলে তাও পরতে রাজী ছিলেন তিনি।

শুধু একটা জিনিস এতকাল ঠেকিয়ে এসেছেন অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে। শান্ত সমুদ্রে যারা ঝড় তোলে, পায়ের নিচেকার মানুষগুলোকে মাথায় চড়ে বসাবার প্রেরণা যারা দেয়, বহুদূর থেকে যাদের উন্মত্ত গর্জন ঘনিয়ে আনে মহাপ্রলয়ের আসন্ন সংকেত, সেই লাল ঝাণ্ডাকে কিছুতেই বাগানে ঢুকতে দেননি অ্যাঙ্গেল্ সাহেব। পাহাড়ের ব্যবধান, অরণ্যের বাধা আর তার সজাগ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই বিপজ্জনক তরঙ্গকে ঠেকিয়েছে বার বার। শিকারী মানুষ তিনি, তাঁর উৎকর্ণ অনুভূতি যেমন বনের মধ্যে অতি নিঃশব্দচর হরিণের লঘু পায়ের শব্দও শুনতে পায়, তেমনি সতর্কতা নিয়েই বাগানকে রক্ষা করেছেন এতকাল। অদূরে যখন বিশৃঙ্খলা আর ধর্মঘটের ঢেউ এসে ভেঙে পড়েছে; তখন রাত জেগে বন্দুক হাতে তিনি পাহারা দিয়েছেন বাগান, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছেন কুলি ব্যারাক। এই-টুকুই তাঁর ভরসা, এইটুকুই যা হয়েছে তা একেবারে কাজের মতো কাজ। এজন্যে আত্ম প্রসাদ বোধ হয় অ্যাঙ্গেল্ সাহেবের। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়েছে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া। আবার তাঁর ঠোঁটের কোণায় কোণায় মৃদু একটা হাসির রেখা শিউরে গেল। আর সেই দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল ধনরাজ গুরুং।

বেঁটে চেহারার মানুষ। চওড়া বুকখানার ওপর পাথর রেখে হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলা যায় সেটাকে। ছোট ছোট তীব্র চোখ দুটোতে একটা উগ্র আরণ্যক দৃষ্টি। চাপা ঠোঁটে কঠিন সংকল্পের ব্যঞ্জনা। একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেই বাঘের থাবার মতো চওড়া মুঠো দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায় ভোজালীর বাঁট।

সাহেবের সামনে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়ালো না ধনরাজ গুরুং। ভক্তি ভরে সেলাম ঠুকল না জাতভাই নেপালী প্রাইভেট্ কিংবা দরজার দারোয়ানের মতো। ঋজু মেরুদণ্ডে মাথাটা সোজা করে দাঁড়ালো, শুষ্ক স্বরে বললে, গুড্ ইভ্নিং, তারপর বিনা আমন্ত্রণেই একটা চেয়ার ঘর্ঘর্ করে ঠেনে নিয়ে বসে পড়ল তার ওপরে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন অ্যাঙ্গেল্ সাহেব। লোকটার অপরিচ্ছন্ন পোশাক থেকে ময়লা আর ঘামের গন্ধ এসে মুহূর্তে তাঁর নাসারন্ধ্রকে বিস্বাদ করে দিল। একটা অসাধারণ প্রয়াস করে আত্মসংযম করলেন অ্যাঙ্গেল্, এমন কি মুখের ওপর একটুখানি হাসিও ফুটিয়ে তুলতে হল তাঁকে।

—গুড্ ইভ্নিং, গুড্ ইভ্নিং মিস্টার গুরুং।

কিন্তু আপ্যায়িত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা দিলে না ধনরাজের মুখে। পাথর দিয়ে

গড়া চাপা ঠোঁট দুটো থেকে এতটুকু ভাব-বৈচিত্র্যের নিরিখও পাওয়া গেল না খুঁজে। তেমনি শুকনো গলায় বললে, জনস্টন সাহেবের চিঠি এসেছে ?

—হাঁ, এসেছে।

ধনরাজ এবার দুটো উগ্র চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল অ্যাঞ্জেলের মুখের ওপর : কাল সকালে মিটিং করতে চাই।

—কাল সকালেই ?

—হাঁ, কাল সকালে—ধনরাজ নিচের ঠোঁটে অকারণেই সামনের দাঁতগুলো দিয়ে চাপ দিলে একটা : আমার সময় নেই, কাল বিকেলেই আমাকে চলে যেতে হবে।

লোকটার কথার উদ্ধত ভঙ্গিতে সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল অ্যাঞ্জেল সাহেবের। ইচ্ছে করতে লাগল সশব্দে গালে একটা প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিয়ে লোকটার ঔদ্ধত্যের জবাব দেন তিনি, নয়তো ঘর থেকে বার করে দেন ঘাড় ধরে। কিন্তু মেজাজ গরম করবার সময় নয়। বদলাতে হবে একশো একানব্বুই বছরের বনিয়াদী মেজাজ, ভুলে যেতে হবে ত্রিশ বছর ধরে এখানে সগৌরবে রাজ্যপাট ভোগ করবার উজ্জ্বল ঐতিহ্যকেও। দুঃসময় এসেছে, দুর্দিন এসেছে ঘনিয়ে। চালে একটু ভুল হলেই ভরাডুবি ঘটে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে, প্লাইউডের বাক্সে হাজার হাজার পাউণ্ড টু লীভ্‌স অ্যাণ্ড এ বাড তলিয়ে যেতে পারে ভারত-সমুদ্রের লবণাক্ত নীল জলে। সুতরাং ধৈর্যচ্যুত হলে চলবে না। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে এখন, বেঁচে থাকতে হলে কিল খেয়েও চুরি করে যেতে হবে তাদের অনেক-গুলোকেই। সুতরাং গায়ের গন্ধে বত্রিশটা নাড়ী একসঙ্গে পাক দিয়ে উঠুক, এই অর্ধবর্বর নেপালীটার ধৃষ্টতায় জ্বলে উঠুক পায়ের থেকে মাথার টাক পর্যন্ত, তবু সহ্য করে যেতে হবে, চরিতার্থতার হাসি টেনে রাখতে হবে মুখের ওপরে।

—আচ্ছা বেশ, সকালেই ব্যবস্থা করব তবে—টেবিলের ওপর পাইপটাকে ঠুকতে লাগলেন অ্যাঞ্জেল।

আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহেবকে লক্ষ্য করতে লাগল ধনরাজ : আমাদের প্রোগ্রাম জানা আছে তোমার ?

—জানি—সতর্কভাবে উত্তর দিলেন সাহেব।

বিস্বাদ নীরস গলায় ধনরাজ বলে গেল : গুর্খা ল্যাণ্ড্ ফর গুর্খা পিপ্‌ল্। ধুতি-পরা ভাটিয়াদের মুরুব্বিয়ানা আমরা সহ্য করব না, আমরা থাকব না তাদের তাঁবেদার হয়ে। অটোনমি চাই আমাদের—আমাদের হোমল্যাণ্ড্ চাই।

—ওঃ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।—অ্যাঞ্জেল উৎসাহিত হয়ে উঠলেন : অত্যন্ত ন্যায্য দাবি। প্রত্যেকেরই সেটা পাওয়ার অধিকার আছে। আমরা, ইংল্যাণ্ডের দীন সন্তানেরা—উই স্ট্যাণ্ড্ ফর ডিমোক্র্যাসি।

উগ্র আরণ্য চোখ দুটো অ্যাঞ্জেলের মুখের উপর রেখে ধনরাজ বললে, কিন্তু আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি না। যদি ভদ্রলোকের মতো আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাও, করো। ভাটিয়া আমরা তাড়াবোই, দরকার হলে তোমাদেরও।

অ্যাঞ্জেলের সমস্ত মুখ অপমানের রক্ত-কণিকায় রাঙা হয়ে উঠল, আগুন জ্বলে গেল মাথার মধ্যে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। জনস্টনের সাবধান-বাণী মনে পড়ল। খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে, পা ফেলতে হবে হিসেব করে, কথা বলতে হবে ওজন করে করে। একটু ভুলের জন্যে সব কিছু বানচাল হয়ে যেতে পারে।

শান্ত স্বরে অ্যাঞ্জেল বললেন, উই স্ট্যাণ্ড্ ফর্ ডিমোক্র্যাসি।

—থ্যাঙ্ক ইউ—উঠে দাঁড়াল ধনরাজ।

ডিস্‌পেনসারিতে বসে তারাপদ ডাক্তার ওষুধের স্টক মেলাচ্ছিলেন। ওষুধ বলতে তো ছাই, খানিকটা সিন্‌কোনা ওয়াটার, এক আউন্স আয়োডিন, গজখানেক তুলো আর গোটাকয়েক মরচে-পড়া যন্ত্রপাতি ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই। তবু আইনের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এটুকু সাজিয়ে রাখতে হয়েছে আর লম্বা-চওড়া হিসেব দাখিল করে সেই সঙ্গে নির্বিঘ্নে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে ইন্‌কাম-ট্যাক্সকেও। আগে মধ্যে মধ্যে বিবেকের আর্তনাদ উঠত, কিন্তু এখন সহজ হয়ে গেছে সমস্ত। এখন পরিপূর্ণভাবে নিরঙ্কুশ হয়ে গেছেন ডাক্তার, তিনি যে বাগানের অবাস্তব একটা অলঙ্করণ মাত্র, এ সত্যটাও জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে।

টেবিলের পাশে অজিতবাবু এসে দাঁড়ালেন।—শুনেছেন ?

—কী হয়েছে ?

—ওই ধনরাজ শুকুং কাল বক্তৃতা দিয়ে গেছে কুলি-ব্যারাকে।

—বেশ তো, ক্ষতি কী ?—শান্তস্বরে উত্তর দিলেন ডাক্তার।

—ক্ষতি কী ?—ভীত কণ্ঠে অজিতবাবু বললেন, জানেন কী হয়েছে ? আজ একটুর জন্যে হরকিঙ্করবাবু মার খাননি কুলিদের কাছে। অশ্রাব্য গালাগালি করেছে, বলেছে ওদের দেশ থেকে ভাটিয়াদের মেরে তাড়াবে ওরা।

—অপরাধ ?—নিরুৎসুক দৃষ্টি তুলে ডাক্তার তাকালেন।

—রেশন কম দেওয়া হয়েছে কাল। সব ওই সাহেবের কারসাজি, জানেন ? রাতা-রাতি ব্যাটা সব চাল বাগানের বাইরে নিয়ে ফেলেছে আর কুলিদের বলে বেড়াচ্ছে বাঙালী বাবুরা আর তাদের কংগ্রেস ওদের চাল আনতে দিচ্ছে না।

—হুঁ।

অজিতবাবু প্রায় কেঁদে ফেললেন : কী করি মশাই বলুন তো ? কুলিরা তো ভয়ঙ্কর

রাফ হয়ে আছে। আমার কাণ্ডাটা এসে খবর দিলে জনকয়েক নাকি আবার শান দিচ্ছে কুকরিতে। বলেছে ভাটিয়াদের টুকরো টুকরো করে কেটে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবে। কী উপায় হবে বলুন দেখি? ছেলেপুলে নিয়ে এই বেঘোরে মারা যাব নাকি?

ডাক্তার চুপ করে রইলেন। এমন একটা যে ঘটবে এ আশঙ্কা কিছুদিন থেকেই সঞ্চারিত হয়ে ফিরছিল আকাশে-বাতাসে। চারদিকে জোর আন্দোলন চলছে: ভাটিয়া খেদাও। র‍্যাড্‌ক্লিফ অ্যাওয়ার্ড বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ডিমোক্র্যাসির জন্যে বাগানের সমস্ত সাহেবদের ধন-প্রাণ একেবারে উতরোল হয়ে উঠেছে। বাঙালী কংগ্রেস আর বাঙালী ভদ্রলোকেরা একযোগে ষড়যন্ত্র করেছে সমস্ত গুর্খা জাতির বিরুদ্ধে। তাদের মুখের অন্ন কেড়ে খাবে, রাজত্ব করবে স্বাধীন নেপালীদের বুকে বসে। তাদের চক্রান্তে পড়ে মহারাজ গান্ধী পর্যন্ত বাঙালী হয়ে যাচ্ছেন। চিরকাল পরের হিতের জন্যে যে ইংরেজ জাতি এশিয়ায় আফ্রিকায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মদান করে আসছে, আজ বাঙালীদের করাল গ্রাস থেকে সমগ্র গুর্খা জাতিকে বাঁচাবার জন্যে তেমনি নিঃস্বার্থ-চিত্তেই বদ্ধপরিকর হয়েছে তারা।

—ওই শুনছেন?—অজিতবাবু আঁতকে উঠলেন।

শোনা যাচ্ছে বইকি। চা-গাছের নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। থরথর কাঁপছে শালবন, দূরের পাহাড়গুলো শিউরে শিউরে উঠেছে আতঙ্কে। চিৎকার আসছে কুলি-ব্যারাকের দিক থেকে: কংগ্রেস—মুর্দাবাদ! ভাটিয়া—ভাগ যাও!

—কী হবে মশাই?—আকুল হয়ে অজিতবাবু বললেন, বাড়িতে মেয়েরা তো কান্না-কাটি শুরু করেছে।

—সান্ত্বনা দিন গে তাদের—

চেয়ার ছেড়ে তারাপদ ডাক্তার উঠে পড়লেন। বললেন, আপনি বাড়ি যান অজিতবাবু, আমি দেখছি।

বাংলোর বারান্দায় তখন একটা ডেকচেয়ার পেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন সাহেব। ডাক্তারকে দেখে হাসিমুখে খবরের কাগজটা সরালেন তিনি, তাকালেন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ল ঠিক এই রকম একটা হাসিই যেন তিনি দেখেছিলেন স্বাধীনতা-দিবসের সকালে, ঠিক এমনি করেই একটা রহস্যঘন হাসির সংকেতে চোখ দুটো চকচক করে উঠেছিল তাঁর।

—কী খবর ডাক্তার?

—বাগানের কুলিরা এ কী করছে স্যার?

ভালোমানুষের মতো সাহেব প্রশ্ন করলেন, কী করছে?

—ওদের জন্যে আমরা তো টিকতে পারব না মনে হচ্ছে।

—হোয়াট ক্যান আই ডু ?—নিরীহ পাদ্রীর মতো আবার প্রশ্ন করলেন সাহেব।

—এই প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা—এই বাঙালী-বিদ্বেষ বন্ধ করুন।

—তোমাদের তো বিস্তর দল রয়েছে বাবু: সাহেব মিটিমিটি হাসলেন: কংগ্রেস আছে, লাল ঝাণ্ডা আছে। ওরাও যদি নিজেদের একটা দল করতে চায়, আমরা বাধা দেব কেন ? দে হ্যাভ দেয়ার ডিমোক্র্যাটিক রাইটস্।

—কিন্তু আমাদের যদি আক্রমণ করে ?

—তোমরা আত্মরক্ষা করবে—দেবদূতের মতো শান্ত মনোরম গলায় জবাব দিলেন অ্যাঞ্জেল।

দাঁতে দাঁত চাপলেন তারাপদ ডাক্তার। বুঝতে বাকি নেই কিছু, সূর্যের আলোর মতোই প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে সাহেবের উদ্দেশ্য। মাকড়সার জালের মতো একটা গভীর শঠতার নিঃশব্দ আয়োজন করে চলেছে চা-বাগানের এই শাদা মালিকের দল। বাঙালী-বিদ্বেষের নাম করে সব রকম আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করে ধরবে, বিষাক্ত করে দেবে এতদিনের সহজ প্রীতির সম্পর্ক, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে ঐক্যের সূত্রগুলোকে। ইচ্ছে করেই আগুন যারা জ্বালিয়েছে, তাদের কাছে আগুন নেবানোর প্রার্থনা জানানো অর্থহীন আর অপমানকর।

—নো বাবু, মাইণ্ড ইয়োর বিজ্‌নেস—খবরের কাগজটা আবার মুখের কাছে তুলে নিয়ে কথাটা যেন অবহেলাভরে হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলেন সাহেব।

নিরুত্তরে ফিরে এলেন ডাক্তার। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণভাবে নিরর্থক। শোষণের বনিয়াদ কায়েম করবার জন্যে বিভেদের পুরনো চক্রান্ত। একটা অসহায় হতাশায় বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে যেতে লাগল ডাক্তারের। উপায় নেই—কিছু করবার জো নেই। একমাত্র আজ এর প্রতীকার যে করতে পারত সে পরিতোষ। সে শক্তি ছিল তার, ধনরাজের চেয়ে ঢের বেশি শক্তি নিয়েই সে এসেছিল বাগানে। কিন্তু গত জানুয়ারি মাসে 'হটাবাহার' করে দেওয়া হয়েছে তাকে।

আর সেদিন তাকে তাড়াবার জন্য সব চাইতে বেশি উৎসাহ ছিল এই রামময়বাবু, অজিতবাবু, হরকিঙ্করবাবুর।

রামময়বাবু বিকৃত মুখে বলেছিলেন, ও সব ডেঞ্জারাস লোক মশায়।

টেবিল চাপড়ে অজিতবাবু বলেছিলেন, লাল ঝাণ্ডাফাণ্ডা এখানে চলবে না। শুধু কুলি ক্ষ্যাপানোর ফন্দি।

—সর্বনাশ হয়ে যাবে মশাই বাগানের—সভায় হরকিঙ্করবাবু বলেছিলেন, এসব জিনিসের প্রশ্রয় দিতে নেই। গোখরো সাপের ছানাকে গোড়াতেই নিকেশ করা ভালো।

নিজের টেবিলটায় বসে দু'হাতে কপালটা টিপে ধরলেন ডাক্তার। কাণ্ডারীহীন নৌকো

তুফানের মুখে টলমল করছে আজ। বিছুটির চাবুকের মতো মনে পড়ছে অ্যাঙ্গেল সাহেবের হাসিটা। কিছু ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্বেষের বিষ আর বিরোধের বীজ ছড়িয়ে দেবার জন্যে আয়োজনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই কোনো দিকে। ধনরাজের মতো লোককে সমাদর করে ডেকে আনা হচ্ছে বাগানে। ভাটিয়াদের ওপর আক্রমণ চলেছে দার্জিলিংয়ে। খাসিয়া পাহাড় থেকে বে-আইনী ট্রান্সমিটারে অবিশ্রান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে সমতল-বিদ্বেষ। ডিমোক্র্যাসি! ডিমোক্র্যাসির আড়াল থেকে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে চা-বাগানের শাদা মালিকদের কালো হাত।

পরিতোষের একটা কথা মনে পড়ল : বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত না করা পর্যন্ত—

বিদেশী মূলধন! প্রথম কথাটা মনে হয়েছিল পুঁথির বুলি কপচানোর মতো, তাই সেটা আকৃষ্ট করেনি ডাক্তারকে, বরং ভেবেছিলেন, বড় বেশি বইয়ের পাতা আওড়ায় পরিতোষ। কিন্তু এই মুহূর্তে কথাটার মূল্য তিনি বুঝতে পেয়েছেন, বুঝতে পেরেছেন এর সত্যিকারের তাৎপর্য।

জানালা দিয়ে ডাক্তার তাকালেন বাইরে। স্বাধীন আকাশের ঘন নীল নিবিড় শালবন। অরণ্য-রোমাঞ্চিত পাহাড়ের রেখা উজ্জ্বল আকাশের নিচে প্রসারিত হয়ে আছে একটা আশ্চর্য গভীর শান্তিতে। দূর থেকে কানে আসছে পাহাড়ী নদীর কলধ্বনি। এই শান্ত সুন্দর ভারতবর্ষের বুকের ভেতর কালো কালো কল, লাল লাল বাংলো আর গভীর সবুজ চা-বাগান। কিন্তু এরা চা-বাগান নয়, সুস্থ দেহের নেপথ্যে যক্ষ্মার ক্ষতের মতো, নিঃশব্দে দৃষ্টির আড়ালে মৃত্যুর বীজাণু বিকীর্ণ করাই একমাত্র কাজ এদের।

হঠাৎ চোখে পড়ল ডাক্তারের। চোখে পড়ল উঁচু বাঁশের মাথায় উঠেছে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতাকা। সূর্যের আলো পড়েছে তার ত্রিবর্ণে, সূর্যের আলো জলছে তার শীল-সমাধি-নিরোধ মন্ত্র-ছন্দিত অশোক-চক্রে। একটা অপূর্ব গৌরবে যেন মণ্ডিত হয়ে আছে।

গৌরব? সাহেবের হাসিটা মনে পড়ছে। পতাকা নয়, বিদ্রূপ। কিন্তু এই পতাকাকে যে রক্ষা করত, দিতে পারত এই বিদ্রূপের উত্তর, সে পতাকা নেই এখানে। সে পতাকায় দেশলাইয়ের কাঠি জেলে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন অজিতবাবু।

চিন্তাটা বিপর্যস্ত হয়ে গেল একটা ভয়ঙ্কর কোলাহলে। ডাক্তার চমকে উঠলেন। কুলি-ব্যারাক ছাড়িয়ে শব্দটা ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে না?

—ভাটিয়া লোক ভাগো—

উচ্ছৃঙ্খলতার কলরব উঠেছে জনতার জয়ধ্বনিতে। স্পন্দিত বুকে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাক্তার। আজ সকালেও কি কুলি-ব্যারাকে সভা করছিল ধনরাজের লোক?

—ধুতিবালা মুর্দাবাদ—

—হটো, ভাটিয়া হটো—

বিক্ষুব্ধ জনতার একটা তরঙ্গ ইতিমধ্যে এসে পড়েছে ডিস্‌পেনসারির সামনে। প্রায় আড়াইশো কুলি বিশৃঙ্খল পায়ে মার্চ করে আসছে একসঙ্গে। চিৎকার করছে অসংলগ্ন ভাবে: ভাটিয়া লোগ মুর্দাবাদ। প্রত্যেকেই মদ খেয়ে এসেছে প্রচুর পরিমাণে। আর তাদের আগে টলতে টলতে স্বয়ং ধনরাজ চলেছে এগিয়ে।

জানালার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তার। কী করতে চায় এরা?

পতাকা-দণ্ডের নীচে এসে থমকে দাঁড়াল ধনরাজ। মাথার ওপর অশোক-চক্রাঙ্কিত ত্রিবর্ণ পতাকা মহিমান্বিত হয়ে উড়ছে সূর্যের আলোকে। সীমাহীন একটা হিংস্রতায় চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধনরাজের, গোখরো সাপের গর্জনের মতো একটা তীব্র শব্দ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—ধুতিবালা মুর্দাবাদ—

—ভাটিয়া মুর্দাবাদ—

ডাক্তারের শরীরে সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্তে খানিকটা বিস্ফোরকে পরিণত হয়ে গেছে। দাঁতের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসল দাঁত, থরথর করে হাত পা কাঁপতে লাগল তাঁর।

—শোনো—শোনো—

একটা লাফ দিয়ে বাইরে পড়লেন ডাক্তার। দু হাত তুলে দাঁড়ালেন জনতার মধ্যে। মাথার ওপর পতাকার ছায়া দুলছে। জবাব দিতে হবে ওই বিদ্রূপের ক্রূর হাসির, ব্যর্থ করে দিতে হবে ঊর্ণনাভ-চক্রান্তের এই কুটিল জাল-বিস্তারকে। এই মৈত্রীর পতাকার সম্মান যে রাখতে পারত, নিজেদের মূঢ়তা দিয়ে আজ তাকে হারিয়েছে বাগানের বাবুরা। তাদের সকলকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—এ অসম্মান সহ্য করা যাবে না।

ডাক্তার বলতে চেষ্টা করলেন—ভাই সব শোনো। এ কি সর্বনাশ করতে চলেছ তোমরা? বাঙালী তোমাদের শত্রু নয়—

ভিড়টা যখন সরে গেছে তখন আস্তে আস্তে চোখ খুললেন ডাক্তার। বুকে ভর দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। নাক মুখ কপাল দিয়ে তাঁর রক্ত ঝরছে, সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। একটুখানি উঠতেই মাথা ঘুরে গেল, চোখ বন্ধ হয়ে এল তাঁর। শুধু ওই এক লহমার মধ্যেই তিনি দেখতে পেলেন—বাগানের চওড়া অ্যাস্‌ফল্টের রাস্তা দিয়ে নিরাসক্ত নির্বিকার মুখে কুকুর আর বন্দুক নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন সাহেব। বোধ হয় শিকারেই চলেছেন তিনি।

ডাক্তারের রক্তমাখা চোখের সামনে ত্রিবর্ণ পতাকার ছায়া দুলতে লাগল লাল পতাকার মতো।

কিন্তু সাহেবের কিছু জানবার বাকি ছিল তখনো।

ট্রা-লা-লা—শিকার করে খুশি মনে ফিরলেন সাহেব। ভাগ্যিস জনস্টন এসে আলোক-দান করে গিয়েছিল তাঁকে। বাগানের শিকারটা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে, জঙ্গলেও নেহাত মন্দ হয়নি। দু'জোড়া বন-মুরগী পেয়েছেন, রাত্রের খাওয়াটা জমবে ভালো।

কিন্তু বাংলার সিঁড়িতে পা দিতেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। পা আর উঠতে চায় না, যেন সিঁড়ির ভেতর থেকে কার একজোড়া কঠিন হাত বেরিয়ে এসে তাঁর পা দুখানা আঁকড়ে ধরেছে!

ঘরের সর্বত্র। সোফা-সেটিতে, টেবিলে, চেয়ারে, পালঙ্কে। যে ভাটি কুলিগুলোকে ভাটিয়াদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে অধিকারের ব্যবস্থা কায়েম করে রাখবেন ভেবেছিলেন, তারাই পরম নিশ্চিন্তে তাঁরই ঘরে কায়েমী হয়ে বসেছে। কেউ হাঁ করে ঘুমুচ্ছে, কেউ টেবিলে বসে আছে ধুলো-ভরা ফাটা ফাটা পা তুলে, শুভ্র পালঙ্কের আভিজাত্যকে কলঙ্কিত করে তার ওপর দাঁড়িয়ে উঠেছে কেউ, চীৎকার করে জুড়ে দিয়েছে গান। দামী মদের খালি বোতলগুলো গড়াচ্ছে চারদিকে, স্তূপাকার হয়ে আছে খাবারের টিন আর কৌটোগুলো, প্রলয় হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে।

সাহেবের পায়ের শব্দে ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে তাকাল ধনরাজ গুরুং। তার চাপা নিষ্ঠুর ঠোঁটে এতদিন পরে, এই প্রথম বিচিত্র হাসি ফুটে বেরুল একটা।

—কাম ইন স্যার, গুড্ মর্নিং। ডোন্‌ট মাইণ্ড্ স্যার—ইউ ব্রিটিশ পিপ্‌ল আর ফাইটিং ফর্ ডিমোক্র্যাসি—

ডিমোক্র্যাসি! হাতের রাইফেলটা তুলে ধরতে চাইলেন সাহেব। গুলি করবেন—গুলি করে উড়িয়ে দেবেন এই ন্যাস্টি ব্রুটগুলোকে। কিন্তু হাত উঠল না—যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে।

ধনরাজের উচ্ছ্বসিত বিকট হাসির শব্দ ভেঙে পড়ল ঘরের মধ্যে।

অধিকার

বানের জল ঢুকে পুকুর থেকে যেমন করে পানার দল বেরিয়ে আসে, তারপর ছড়িয়ে যায় দিশেহারা আর লক্ষ্যহীন হয়ে, তেমনি করে একদিন এরাও ভেসে গেল। চৌদ্দপুরুষের ভিটেকে মনে হল ফাঁপা কোনো চোরাবালির গহ্বর। নিরাপদ শক্ত ডাঙার প্রত্যাশায় তাড়া খাওয়া হরিণের মতো দিকে দিকে ছুটতে লাগল দিগ্‌বিদিক্ হারিয়ে। তারপর এসে মুখ থুবড়ে পড়ল কলকাতায়—প্ল্যাটফর্মে, পাথুরে পথে, গাছতলায়, নয়তো, শুয়োর খোঁয়াড়-বারও অযোগ্য রিলিফ ক্যাম্পে। রুটি চাইতে গিয়ে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল আর টিয়ার-গ্যাসে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বুঝল একটি মর্মান্তিক সত্য: নিজের দেশকে পর করে

দেওয়া যত সহজ, পরের দেশকে আপন করে নেওয়া সেই পরিমাণেই শক্ত। পূর্ব বাংলার সজল মাটির মতো দাক্ষিণ্যের ফসল ফলে না এখানে। রাঢ়ের রাঙা মাটির ধারালো কাঁকরে পা কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। ক্ষীণধারা নদীর অফুরন্ত জলসঞ্চয় ছড়িয়ে দেয় না পলিমাটির রত্নকণা—খোয়াইয়ের ক্ষীণপ্রবাহ নুড়ি-পাথরের কঠিন শয্যায় মৃত্যু খোঁজে।

রাষ্ট্রপালের বাড়িতে লাঞ্চ খেয়ে তৃপ্তির উদ্গার তুলতে তুলতে বেতারে নেতারা অশ্রুকরুণ বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। বিনিদ্র টেলিপ্রিণ্টারে সারারাত ধরে বিবৃতির পর বিবৃতির বন্যা আসে। তার ভেতরে চাপা পড়ে যায় শিয়ালদার প্ল্যাটফর্ম থেকে সোমত্ত মেয়ে পঞ্চুবালার হারিয়ে যাওয়ার খবর, ডুবে যায় বাস্তুত্যাগী বুড়ো নিবারণ দাসের না-খেয়ে মরার অকিঞ্চিৎকর সংবাদ। আর জনকয়েক ভদ্রসন্তানের ভদ্র বেতনের চাকরি জোটে পুনর্বাসন দপ্তরে, 'আরো খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের লাল মূলো আর কাঁচকলা আঁকা পোস্টারে পোস্টারে শহর সচিত্র হয়ে ওঠে। লোকে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে : কোনো নতুন ছবি মুক্তি পেলো নাকি কানন দেবীর!

নতুন ছবি বৈকি। এও এক আচ্ছা তামাশা। দুদিন আগেও যারা পুরোপুরি মানুষ ছিল, আজ তারা একরাশ ছেঁড়া খবরের কাগজের টুকরোর মতো মূল্যহীন। তবু জলে কাদায় গলে যাওয়া সেই সব কাগজের টুকরোর এক-আধটা হরফ চোখে পড়ে: উনিশ শো পাঁচ সাল, অসহযোগ আন্দোলন, চট্টগ্রামের রক্তলেখা, বিয়াল্লিশের অগ্নিযন্ত্রণা আর নোয়াখালির প্রেতকাহিনী। বিলিতী চামড়ার দামী জুতোর নীচে তার দু-একটা খণ্ড জড়িয়ে গেলে পাপোষে মুছে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়! মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে কখনো কখনো মনে হয়: রিয়্যালি, ইট ইজ সো স্যাড্। তারপর ভারী হয়ে আসা মনটাকে একটু লঘু করবার জন্যে অগত্যা নতুন মডেলের গাড়িটায় করে রেসকোর্সের দিকেই পা বাড়ানো: কী আর করা যাবে ব্রাদার!

শুধু অগ্নিকোণে থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকায় ধারালো বেয়নেটের ফলার মতো।

এদেরই এক ঝাঁক একটা দমকা হাওয়ায় উড়ে পড়েছে উত্তর বাংলার এই মরুপ্রান্তরে। আগে বুনো শুয়োর দাঁতের আগায় খুঁজে ফিরত বুনো ওলের গোড়া। কাঁটায় ঝমর ঝমর করে নূপুর বাজিয়ে সজারু চলে ফিরত শনঘাসের বনে। বাবলা ঝোপের আড়ালে আড়ালে মেটে খরগোসের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করত চিতিহরিণ। বাজ-পোড়া তালগাছের কোটরে রোদ পড়ে চিকচিকিয়ে উঠত চন্দ্রবোড়ার হিলহিলে শরীর; আর জেলাবোর্ডের কালভার্টের তলা দিয়ে যেখানে বর্ষায় বিলের জল বেরিয়ে যায়, সেখানে ফণা তুলে বকের মতো বসে থাকত অতি বিষাক্ত জলগোখরো—গুগ্‌লি-শামুকের প্রত্যাশায়। গভীর রাতে চলতি মোটরের হ্রাড লাইটে কখনো কখনো বাঘের আরক্ত চোখ ফুটে উঠত ক্ষুধার্ত অরণ্যের দৃষ্টির মতো।

মাইলের পর মাইল জুড়ে ছিল মরা মাটির রাজত্ব। এরই ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো গ্রাম ছিল ছড়িয়ে। কিছু দেশী মানুষ, কিছু ভুটিয়া আর মরা মাটির আনাচে-কানাচে যেখানে সবুজ শস্যের অঞ্জলি মেলা—সেখানে লুব্ধ থাবা বাড়িয়ে থাকত জোতদারের ধানের গোলা, খামারবাড়ি।

সরকারী পুনর্বাসন-পরিকল্পনায় হাজার দেড়েক মানুষকে ঠেলে দেওয়া হল এখানে। অপরিমিত অপব্যয়ে অকিঞ্চিৎকর কতগুলো চালাঘর তুলে দেওয়া হল—এক বর্ষার পরে যা আর টিকবে না। গোটা দুই ট্রাক্টর আর একখানা ট্রাকও দিতে হল চক্ষুলজ্জার খাতিরে। কর্তব্য পালনের পালা সেইখানেই শেষ। কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে খবর এল, যথেষ্ট হয়েছে, এর বেশি সাহায্য দেবার মতো টাকা নেই সরকারের।

বে-সরকারী যে দু-চারজন মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজের ভার মাথায় তুলে নিয়েছিল, তারা পথে বসে পড়ল। একজন কাগজ খুলে দূতাবাসগুলির খরচের হিসেব দেখিয়ে বললে, ভুলে যাচ্ছ কেন বাইরে ভারতের প্রেস্টিজ বাঁচিয়ে রাখাই আজকের সব-চেয়ে বড় সমস্যা? দেশের লোকের না খেয়ে মরার খবর বিদেশে যাবে না কিন্তু বিদেশের ডিনারে এতটুকু ত্রুটি হলে রাষ্ট্রের মান বাঁচবে কী করে?

আর একজন তেতে উঠল: তা হলে এসব ফার্স করবার কী দরকার ছিল?

তৃতীয়জন রসিকতা করল: বঙ্গভঙ্গের অত বড় ট্রাজেডির পরে একটা ফার্সের ব্যবস্থা না করলে খুশি হবে কেন অডিটোরিয়াম?

দ্বিতীয় লোকটির নাম হিমাংশু সোম। ব্রহ্মচারী ধার্মিক গোছের মানুষ—কঠোপনিষদ্ থেকে কংগ্রেস পর্যন্ত সব কিছুতেই অচলা ভক্তি। কিন্তু ধর্মটা ভালো করে চর্চা করেনি—রাজনীতিও না। বন্যা, মহামারী আর দুর্ভিক্ষে রিলিফ ওয়ার্ক করেই জীবনের পঞ্চাশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। এখানকার দায়িত্বটা প্রধানত সে-ই যেচে নিয়েছিল। নিদারুণ আশাভঙ্গে এমন রসিকতাটাও বরদাস্ত করতে পারল না সে।

হিমাংশু সোম ক্ষেপে উঠে বলল, জীবনে অনেক রিলিফ ওয়ার্ক করেছি, কিন্তু এমন একটা—

গালাগালিটা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়বার আগেই তর্জনী তুলে শাসিয়ে দিলে একজন।

—খবরদার, রাজদ্রোহ!

তৃতীয়জন বললে, সিকিয়োরিটি অ্যাক্ট।

চতুর্থ ব্যক্তি কোনো কথা বলেনি এতক্ষণ। নীরবে শুনে যাচ্ছিল সব। এবারে স্নিগ্ধ হাসিতে মন্তব্য করল: কমিউনিস্ট!

আরো গরম হয়ে উঠল ভালো মানুষ হিমাংশু সোম।

—আমাকে চটিয়ো না ডাক্তার। কমিউনিজম ফমিউনিজম জানি না। আমি সোজা

মানুষ, সোজা কথা বুঝি। এসব ইয়ার্কির কোনো মানে হয়? শ্মশানের মতো জমিতে 'বাম্পার ক্রপ' ফলিয়েছিলাম, অথচ রাখবার জন্য একটা শেড পর্যন্ত পেলাম না! হাজার মণ ধান আমার চোখের সামনে পচে নষ্ট হয়ে গেল!—কান্নায় বুজে আসতে চাইল হিমাংশু সোমের গলা।

বাম্পার ক্রপ! মুহূর্তে মুখ-চোখের চেহারা বদলে গেল মানুষগুলির। তিনশো ক্যাম্পের দেড় হাজার উদ্বাস্তু মিলে এই মরা জমিতে ফলিয়েছিল সোনার ফসল। চন্দ্রবোড়া আর বুনো শুয়োরের রাজ্যপাট তছনছ করে দিয়ে—বাবলা ঝোপ আর শনঘাসের জঙ্গল নির্মূল করে গড়ে তুলেছিল মাইলের পর মাইল জোড়া সবুজ শীষ-দোলানো ধানের ক্ষেত। আলের সীমারেখা দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার কলঙ্ক-চিহ্ন কোথাও টানা হয়নি; যতদূর চোখ যায় শুধু দেখা গেছে সমবায়-শ্রমের সম্মিলিত ফসল। চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে বাস্তুহারা ঘরছাড়ার দল এসে মিলেছিল সাম্যবাদের মিলনক্ষেত্রে।

তারপর যেদিন সেই ফসল হাজার মানুষের কাস্তের মুখে কাটা পড়ল—সেদিন উৎসব নেমেছিল ক্যাম্পের ঘরে ঘরে। ঢাকা ক্যাম্পে একজন একটা ভাঙা হার্মোনিয়ম বাজিয়ে কীর্তন ধরল। নেত্রকোণা ক্যাম্প এক বিরাট ভোজের আয়োজন করল। আর গাইবান্ধা ক্যাম্পে শুরু হয়ে গেল কবিগানের মহড়া:

গোমস্তা নাই, তশীলদার নাই,
মহাজনও নাই রে—
হামাঘরের ক্ষ্যাতের ফসন
হামরা সুখে খাই রে।

কিন্তু সেই ক্ষেতের ফসন বাঁচাবার জন্যে একটা টিনের শেডও করে দিতে পারল না হিমাংশু সোম। এখানে ওখানে কিছু কিছু রক্ষা করা গেল, বাকিটা পচল বৃষ্টিতে, জ্বলে গেল রোদের খরতাপে। মানুষগুলোর চোখের সামনে সোনার বরণ ধানের রাশ গলে কালো হয়ে গেল একরাশ পচা গোবরের মতো; নবান্নের প্রাণকাড়া গন্ধ উঠল না—বিষাক্ত দুর্গন্ধ আবিল করে দিল বাতাসকে।

ডাক্তার মৃদুস্বরে বলল, তবু বলছে গ্রো মোর ফুড্!

হাঁটুর ওপরে একটা চাপড় মারল হিমাংশু সোম।

—আরে সে কথা তো লিখেছিলাম কর্তাদের। বলেছিলাম, 'বাবা, খাদ্য বাড়াও খাদ্য বাড়াও' বলে তো খুব চেঁচিয়ে মরছ, এদিকে এত খাদ্য যে পচে গেল, তার বেলায় করছ কী? তোমাদের ওই তহবিল থেকে কিছু দাও না আমাদের। কী উত্তর দিলে জানো? লিখল: ওটা এখনো পাবলিসিটি ক্যাম্পেন—তোমাদের ধান চুলোয় যাক, পোস্টারের খরচা থেকে আমরা একটা আধলাও দিতে পারব না।

প্রথম ব্যক্তি আওড়ালো :

স্বপ্ন মঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে শুনে পুণ্যবান।

তৃতীয়জন বলল, থামো হে, আর সিডিশন কোরো না। নাও, চলো এখন। শহরে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে আবার।

প্রথমজন উঠে পড়ল। বলল, তোমার জন্যে আমার সহানুভূতি হচ্ছে হে হিমাংশু। হবুচন্দ্র গবুচন্দ্রের পাল্লায় পড়ে কোন্‌দিন তুমি বা ফাঁসি যাও!

ওরা বেরিয়ে গেল। খানিক পরেই শোনা গেল মোটরের শব্দ।

এদিকে চাঁচের বেড়া-দেওয়া অফিসঘরে, কেরোসিন কাঠের টেবিলটার দু'পাশে চুপ করে বসে রইল হিমাংশু সোম আর ডাক্তার। বাইরে বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর নামতে লাগল রাত্রি। দূরে কাছে ক্যাম্পের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ডাক্তার তাকিয়ে দেখতে লাগল সীমান্তে তমসা-ঘেরা কালো পাহাড়ের ওপর কিলবিল করে নড়ছে একটা আলোর সরীসৃপ; তিনধারিয়া লুপ ঘুরে ঘুরে দার্জিলিংয়ের ট্রেন নামছে ওখানে। ঝিঁঝির ঐকতান আসছে। ঢাকা ক্যাম্পের দিক থেকে হঠাৎ শোনা গেল টিন পেটানোর শব্দ। ওরই কাছাকাছি আখের ক্ষেত হয়েছে; বোধ হয় বুনো শুয়োর পড়েছে সেখানে, তাই টিন বাজিয়ে তাড়ানো হচ্ছে তাকে। হিমাংশু সোমের টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল একজন। এতক্ষণ পরে একটা বিড়ি ধরালো হিমাংশু সোম।

—আমি তো কোনো কূলকিনারা দেখছি না।

ডাক্তার চোখ তুলে ধরল নীরব জিজ্ঞাসায়।

—আমার যা জমি ছিল, তা তো আমি বিলি করে দিয়েছি। এর মধ্যে আবার পঞ্চাশ ঘর রিফিউজি আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে—আমি কী করে ব্যবস্থা করি বলো তো? সমবায়-গোলা থেকে তাদের খাওয়াচ্ছি। তাও যা হোক চালিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু এই দেখো লেটেস্ট খবর।—পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিলে হিমাংশু সোম।

—কী এ?

বিড়িতে লম্বা একটা টান দিয়ে হিমাংশু সোম বললে, সরকারী বিল। ছত্রিশ হাজার টাকা ট্রাক্‌টর ভাড়া!

—ট্রাক্‌টর ভাড়া! সে কী!

—নইলে বিদেশী ডিনারের খরচা উঠবে কোথা থেকে! হিমাংশুর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল : অথচ ও টাকায় দুটো ট্রাক্‌টর আমিই কিনে নিতে পারতাম। এই মানুষগুলোর পেটের খোরাক বেচে আমায় দেনা শোধ করতে হবে? স্ট্যাবিং ক্রম বিহাইণ্ড আর

কাকে বলে!

চিঠিটার ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকালো ডাক্তার। কালো পাহাড়ের বুকে আলোর সরীসৃপটা চলেছে কিল্‌বিলিয়ে। তিনধারিয়া লুপ ঘোরা বোধ হয় শেষ হল এতক্ষণে!

ঢাকা ক্যাম্পের দিক থেকে ক্যানেস্তারার আওয়াজ আসছে। অন্যমনস্কভাবে সেটা শুনতে শুনতে হিমাংশু সোম বললে, শোনোনি বুঝি, কাল রাতে জোতদারের লোকেরা গাইবান্ধা ক্যাম্পে আগুন দিতে চেয়েছিল!

—তাই নাকি!

—ওরা টের পেয়ে তাড়া দিতে পাটকাঠির জলন্ত মশাল ফেলে পালিয়ে গেল। কী শয়তান লোক সব! আরে বাপু, তোমাদের জংলা জমি তো চিরকাল পতিত হয়েই ছিল। রিকুইজিশন করে নিয়ে এরা ফসল ফলিয়েছে, তাতে এত হিংসে কেন! তোমরা তো কোনোদিন ওই বাবলা আর শনবনকে ভেঙেচুরে একমুঠো কলাইও বুনতে না! যত সব— ক্রুদ্ধ হিমাংশু সোম বিড়িটাকে হিংস্রভাবে ছুঁড়ে দিলে অন্ধকারের মধ্যে।

ডাক্তার একটু হাসল।

—যতীনবাবু আর অনুকূলবাবুই তো এদিকের জোতদার না? শুনেছি তাঁরা সব কংগ্রেসের পাণ্ডা—

—কংগ্রেসের পাণ্ডা না আরো কিছু! কংগ্রেসের পাণ্ডা তো আমিও। ধড়িবাজের দল সব। এখান থেকে ক্যাম্প ওঠাবার জন্যে পাহাড়ীদের মধ্যে ছড়াচ্ছে 'ভাটিয়া'*বিদ্বেষ। লোক্যাল পিপ্‌লদের বলছে বিদেশী বাঙালেরা এসে তোমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে মুখের গ্রাস। অতএব তাড়াও ওদের। অথচ এই সব কংগ্রেসী পাণ্ডাদের বুলিতে ভুলেই এরা বাংলা বিভাগ মেনে নিয়েছিল!—সীমাহীন তিক্ততায় হিমাংশু সোমের কথাগুলি বিষবিন্দুর মতো ঝরে পড়তে লাগল।

—আসল ভয় তা নয়—ডাক্তার হাসল: হাজার হাজার বিঘে জমিতে এই যে আল নেই, এতগুলো মানুষ এই যে এক গায়ে খেটে এক খামারে ধান তুলছে, ভয়টা সেইখানে কিনা! দেশের সব লোক যদি কুশিক্ষাটা নিয়ে বসে, তাহলে ওঁদের ভবিষ্যৎ কী তা যতীন-বাবু আর অনুকূলবাবু ভালোই জানেন।

—সোশ্যালিজম নাকি?—হিমাংশু সোম সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল।

—তাই দাঁড়ায় বটে।—ডাক্তার শান্ত গলায় বলল, প্রপার্টি ইন্‌স্টিংক্টটাই যদি গেল,

* দার্জিলিং ভুটান ইত্যাদি অঞ্চলে সমতলবাসী মাত্রকেই 'ভাটিয়া' বলা হয়ে থাকে।
—লেখক

তা হলে প্রাটিওয়ালাদের আর ভরসা কোথায়! তারা কি বেশিক্ষণ টিঁকতে পারবে!' শুনলেন না, সেদিন এক অফিসার বক্তৃতা দিয়ে গেলেন—এভাবে টানা জমি ফেলে রাখবেন না! পাঁচ একর করে আলাদা আলাদা ভাগ করে দিন!

—তা হলে তো ট্রাক্টর চলবে না। হাল-বলদের খরচা দেবে কে?

—কেন, যতীনবাবুরা?—ডাক্তার তেমনি হাসল: তারপর যতীনবাবুদের সঙ্গে আধি-চাষের ব্যবস্থা। তারও পরে দেনা শোধ করতে না পেরে আস্তে আস্তে যতীনবাবু অনুকূল-বাবুর ক্ষেতমজুর হয়ে যাবে। মরা মাঠ ফসলের ক্ষেত হয়ে চারগুণ লাভে মালিকের কাছে ফিরে যাবে আর সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে বিনা পয়সায় একদল মজুর। চমৎকার ব্যবস্থা নয়?

—বটে!—টেবিলের ওপর প্রচণ্ড একটা কিল বসালো হিমাংশু সোম: বুকের রক্ত দিয়ে এরা শ্মশানকে করলে সোনার খনি আর সে জমি যাবে ওই হাঙরদের পেটে!

—তাই তো নিয়ম!—নিজের বিশৃঙ্খল চুলগুলোর ওপর একবার আঙুল বুলিয়ে নিয়ে ডাক্তার বলল, আর যতীনবাবুদের স্বার্থ না দেখলেই বা চলবে কেন! ওঁরাই তো পরের ইলেকশানে ভোট দিয়ে ফের গদিতে পাঠাবেন!

—হুঁ!—হিমাংশু সোম চুপ করে রইল। নিরীহ ব্রহ্মচারী মানুষটির চিন্তাজগতে যেন বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে একটার পর একটা। সারাজীবন কাটিয়েছে রিলিফ ওয়ার্কে—নির্বিচারে শ্রদ্ধা করেছে কংগ্রেস থেকে কঠোপনিষদ্ পর্যন্ত পৃথিবীর যা কিছু গুরুভার বস্তুকে। কিন্তু আজ যেন মন কোথাও আর থই পাচ্ছে না। এত দিনের পরিচ্ছন্ন মনের আয়নাটা হঠাৎ যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। একখানা কালো শ্লেটের ওপর কে যেন এঁকে যাচ্ছে কতগুলি হিজিবিজি রেখা। একরাশ থমথমে মেঘে অন্ধকার হয়ে উঠেছে চিন্তার আকাশটা।

—কী ভাবছেন?—ডাক্তার জানতে চাইল।

—কী আর ভাবব?—একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করল হিমাংশু সোম: এখন ভাবছি পঞ্চাশ ঘর মানুষকে নিয়ে আমি কী করি। সমবায়ের ধান দিয়ে ওদের তো খাওয়ানো যাবে না

—আপনার এরিয়ার বাইরেই তো সাতশো একর পতিত জমি ছড়িয়ে আছে। নিন না ওগুলো রিকুইজিশন করিয়ে।

—চেয়েছিলাম, দেবে না।

—দেবে না? কেন?

হিমাংশু সোম বিষণ্ণ হাসি হাসল: ওর মাঝখানে যে দশ বিঘা ধানী জমি পড়েছে যতীনবাবুর। তাই ওটা নিতে দেবে না।

—তা বটে। তিনশো মানুষের পেটের খিদের চাইতে যতীনবাবুর দশ বিঘের দাম অনেক বেশি—শান্ত ব্যঙ্গের স্বরে বললে ডাক্তার।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হিমাংশু সোম।

—আচ্ছা ডাক্তার?

—বলুন দাদা।

—তুমি কি কম্যিউনিস্ট নাকি?

ডাক্তার শিউরে উঠল: দোহাই দাদা, ওসব মারাত্মক বদনাম দেবেন না। বাতাসেরও কান আছে—শেষে কি বেঘোরে মারা পড়ব? আমিও নিতান্তই বাস্তুহারা—আর কোন ডেফিনিশন আমার নেই।

—হুঁ!—হিমাংশু সোম আর একটা বিড়ি ধরালো: যাই বলো, ওসব রাজনীতির মধ্যে আমি থাকব না। আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার—কাজ বুঝি।

—কিন্তু সোশ্যালিজ্‌ম না থাকলে কি সোশ্যাল ওয়ার্ক সম্ভব দাদা?—বিনীত প্রশ্ন করল ডাক্তার।

—তর্ক কোরো না ডাক্তার—তর্ক আমার ভালো লাগে না—হিমাংশু সোম আবার নীরবতার মধ্যে তলিয়ে গেল। ডাক্তার দৃষ্টি মেলে দিলে দিগন্তের দিকে—তমসামগ্ন পাহাড়টার অভিমুখে। আলোর সরীসৃপটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কালো সীমান্তটা যেন কোনো উদ্যত প্রহরীর মতো উদ্ধত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নক্ষত্রপুঞ্জের তলায়।

—কী করবেন এর পর?—নীরবতা ডাক্তারই ভাঙল।

—দেখি আরো দু-চারদিন। না পারি হাল ছেড়ে দেবো। এর চেয়ে আমার রামকৃষ্ণ মিশনই ঢের ভালো।

টেবিলের ওপর আঁচড় কাটতে কাটতে ডাক্তার বলল, পালিয়ে যাবেন?

—অগত্যা।

—রিহ্যাবিলিটেশন?

—চুলোয় যাবে।

—এই জমিগুলো?

জিঘাংসাভরা গলায় হিমাংশু সোম জবাব দিল: আবার বাবলা ঝোপ আর শন ঘাসের জঙ্গল গজাবে এখানে। বুনো শুয়োর দাঁতের আগায় খুঁড়বে বাঘা ওলের গোড়া। বাজে পোড়া বট গাছটার কোটরে কোটরে বাসা বাঁধবে চন্দ্রবোড়া সাপ। শহরের বাবুরা জীপে করে মারতে আসবে হরিণ, সজারু, খরগোস আর বন-মুরগী।

—আর মানুষগুলো?

—বানের জলে শ্যাওলার মতো ভেসে এসেছিল, তেমনি করেই ভেসে চলে যাবে।

হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলল, রাত হল দাদা, উঠি। আমায় আবার একবার নেত্রকোণা ক্যাম্পে যেতে হবে—একটা কেস টি-বি বলে সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা। নতুন মাটিতে নতুন ধানের স্বাদ যারা পেয়েছে, এত সহজেই তাদের হটানো যাবে তো ?

—জানি না—হতাশ আর্তস্বরে উত্তর দিলে হিমাংশু সোম।

টর্চের আলো ফেলে ডাক্তার বেরিয়ে গেলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। শ্লেটের ওপরে একরাশ হিজিবিজি লেখা। মনের আকাশে থমথমে মেঘের রাশি রাশি সমারোহ—তার কোনো রন্ধ্রপথে এতটুকু আলোও যেন গলে পড়ছে না। চিরজীবন শৃঙ্খলা মেনে এসেছে হিমাংশু সোম। স্বীকার করে এসেছে সংযমকে, নিয়মকে, বিধিবদ্ধ পথকে। কিন্তু আজ যেন কোথায় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। দুই আর দুইয়ে চারের অঙ্কে মিলতে পারছে না অবশ্যম্ভাবী যোগফল। পরিণাম চোখের সামনেই আসছে আসন্ন হয়ে। দু'দিন পরে জমি ভাগ হয়ে যাবে—শুরু হবে বিরোধ, আল ভাঙা, মারামারি, ফৌজদারী। হালবলদ ভাড়া দিতে অসীম করুণায় এগিয়ে আসবেন যতীনবাবুর দল। যারা তখনো শেষ চেষ্টা করবে, তাদের ঘরের চালে জ্বলবে পাটকাঠির মশাল। তারও পর—

তারও পর আর ভাবা যায় না। আর ভাববার শক্তি নেই হিমাংশু সোমের। বাঁধা সড়ক দিয়ে চলতে চলতে শোচনীয় মোহভঙ্গ হয়েছে আজ। সে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে যেন কোনো দুর্গম খাড়া পাহাড়ের চূড়োয়—যার নীচে অতলস্পর্শ অন্ধকার ছাড়া আর কোনো কিছুর চিহ্নই নেই।

একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে আলস্যমন্থর শিথিল দেহটাকে টেনে উঠে দাঁড়ালো হিমাংশু সোম। আর সে পারে না। তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। মালটানা গাড়ির গোরুর মতো অনর্থক বোঝা বয়ে বয়ে সে ক্লান্ত—চরম পরিশ্রান্ত।

সোস্থালিজম ছাড়া কি সোস্থাল ওয়ার্ক হয় দাদা ?—ডাক্তারের প্রশ্ন।

অন্ধকারে যেন খর আলোকের তলোয়ার ঝলকায় একখানা। কিন্তু না—না। এত-দিনের সংস্কার—এতকাল ধরে অর্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ বিশ্বাসের সঞ্চয়। না—না।

ঘরের বাইরে এসে অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল হিমাংশু সোম। সমস্ত ভাবনা মিশে গেছে ঝিঁঝির ঐকতানের সঙ্গে। আর ঢাকা ক্যাম্প থেকে সামনে ক্যানেস্তারার আওয়াজ—আখের ক্ষেত থেকে বুনো শুয়োর তাড়াচ্ছে ওরা।

আকাশ-ফাটানো কোলাহল। মাঠময় লণ্ঠনের আলো নাচছে। ট্রাক্টরের আওয়াজ উঠছে ঘরঘর করে। স্বপ্ন দেখছে নাকি হিমাংশু সোম! এই গভীর রাত্রে কী কাণ্ড এসব!

বিছানা থেকে একলাফে বাইরে নেমে পড়ল সে।

ঘরঘর করে ট্রাক্টর চলেছে। ঢাকা, নেত্রকোণা, রংপুর, পাবনা ক্যাম্প থেকে দলে দলে মানুষ চলছে উত্তরের দিকে। সারা মাঠ জুড়ে লণ্ঠনের আলো নাচছে—জ্বলছে মশালের আলো। পাগল হয়ে গেল নাকি লোকগুলো!

নিজেও প্রায় পাগলের মতোই শূন্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলে হিমাংশু সোম: কী এসব? একটা টর্চের আলো মুখে পড়ল। ডাক্তার।

অন্ধকারে ডাক্তারের হাসির হালকা শব্দ: আপনি ভাববেন না দাদা, শুয়ে পড়ুন।

—তার মানে?—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে হিমাংশু সোম।

—ওরা সেই সাতশো একর পতিত জমির দখল নিতে চলেছে দাদা। ট্রাক্টর নিয়ে রাতারাতি চাষ শুরু করবে—নিজেদের ঘরের বেড়া ভেঙে ভোরের আগে পঞ্চাশ ঘর চালা তুলে দেবে।

—আর যতীনবাবুর জমি?—অবরুদ্ধ আওয়াজ বেরুল হিমাংশু সোমের।

—ট্রাক্টরের মুখে কি আর ও দু-দশ বিঘের চিহ্ন থাকবে?

—যদি জোতদারের লোকের সঙ্গে গোলমাল লাগে?

—ওদের হাতে লাঠি আছে, কাস্তে আছে। হাসুয়াও নিয়েছে কেউ কেউ। ভয় নেই দাদা, আর এক দফা সোনার ফসলের সূচনা হতে চলল।

—কিন্তু এর পর পুলিস আসতে পারে, গুলি চলতে পারে—

—অনেক কিছুই পারে। কিন্তু ওরাও কম পারে না। নবান্নের গন্ধে মাতাল হয়ে ওরা নেমে পড়েছে—পৃথিবীর কেউ ওদের ঠেকাতে পারবে না।

—আর আমি?—ডুবে যাওয়া মানুষের মতো শেষবার বলল হিমাংশু সোম।

—আপনার কাজ আপনি শেষ করেছেন, এবার ওদের কাজ শুরু। আপনি যেখানে থেমেছেন, ওরা সেখান থেকেই সামনে পা বাড়িয়েছে। আপনি গিয়ে স্বচ্ছন্দে শুয়ে পড়তে পারেন—অন্ধকারে আবার ডাক্তারের মিষ্টি হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

লণ্ঠনের আলো আর ট্রাক্টরের গর্জন সমানে এগিয়ে চলল উত্তরের তমসা-দিগন্তের দিকে।

জন্মভূমিশ্চ

—হামাদের ঘাশ্ আছিল্ মহানন্দার উই ওপারত্। ক্যাত আছিল্, হাল-হালট্ আছিল্। ছোট কাম করি নাই হামরা কুনোদিন—হুঁকোয় অল্প অল্প টান দিতে দিতে বললে রমন্দ হাড়ী। বেশ সগর্বেই উচ্চারণ করলে কথাটা।

রমন্দ কথাটা যে কিসের অপভ্রংশ বোঝা যায় না। রমেন্দ্র হতে পারে, রামানন্দ হওয়াও অসম্ভব নয়। খুব বড় কথা নয় সেটা। কিন্তু সে বলে, দাখিলায় চেক লিখবার সময় কিছুতেই হাড়ি নামে পরিচয় দিতে রাজী নয় সে। লিখতে হবে ভুঁইমালি।

না, ক্ষেতে-খামারে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া মালী নয়। ভুঁইমালি—ভুঁইয়ের মালিক। হুঁকোয় আর একটা টান দিয়ে ব্যাখ্যা করলে রমন্দ।

আমি বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ছিলাম। শুধু ওর সঙ্গে গল্প করবার জন্যেই নয়, আরো একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। খড়ির জন্যে মস্ত একটা গাছের গুঁড়ি ফাড়তে দেওয়া হয়েছে ওকে। কিন্তু রমন্দকে ভালো করেই চেনা আছে। কাজে ফাঁকি দেবার যম। দু'ঘা কুড়ুল বসাতে না বসাতেই খিদে পায় ওর, জলপান চাই। আধঘণ্টা ধরে একধামা মুড়ি আর পাটালিগুড়ই চিবোলো বসে বসে। সে সব মিটতে না মিটতে তামাক। তারপর কায়ক্লেশে উঠে কুড়ুলের আর একটা চোট দিতে-না-দিতেই বললে, বাপ!

—কী হল আবার?—বিরক্তভাবে আমি জানতে চাইলাম।

—বড় ধুপ্ নাগোছে। 'অইদ' (রোদ) ক্যাতে চড়ি গেইছে—বাপ!

—একটা হাত কপালের ওপর আড়াল করে আকাশের দিকে তাকালো সে: ঢের ব্যালা হইছে।

এবার সত্যি সত্যিই আমার রাগ ধরে গেল।

—বেলা তো হবেই, তোর জন্যে কি আর বসে থাকবে? নে নে, হাত চালা।

—চালাছি তো। বসি তো আর রহো নাই। মোর দুইটা হাত তো আর কল নহো—ব্যাজার মুখে রমন্দ জবাব দিলে।

আমি ক্ষেপে উঠে বললাম, এই ক'খানা খড়ি নামাতে দু'ঘণ্টা কাটলো তোর? হাত আর চালাচ্ছিস কোথায়, খালি তো গল্প আর হুঁকোই চলছে দেখতে পাচ্ছি। বেশ, মাস-মাইনের সময় দেখা যাবে।

—তুমি খালি হামার দোষই ধরোছেন—রমন্দের স্বরে মর্মবেদনা প্রকাশ পেল। তার-পরেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ঝপ্ ঝপ্ করে ঘা-কতক কুড়ুল চালিয়ে গেল প্রাণপণ শক্তিতে। খড়ির কুচিগুলো একরাশ পাখির সাদা পালকের মতো ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল চিকচিকে রোদে।

আমি আর কথা বললাম না, রমন্দও জবাব দিলে না কিছু। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ওর কাঠচ্যালা। সত্যিই কড়া রোদ উঠেছে। 'বরিন্দে'র এই টিলামাটির দেশে এমনিই বর্ষা নামে দেরিতে—এ বছর আরো দেরি হচ্ছে। সূর্যটা যেন একটা অতিকায় অতসী-কাচ হয়ে দশগুণ তীব্র করে রোদ ছুঁড়ে দিচ্ছে মাটিতে,

সর্বংসহ কাঁটাগাছের গোড়াগুলো পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে সে তাপে। পাশের ধানী মাঠটায় কবে একটা লাঙল পড়েছিল, কিন্তু বর্ষার অভাবে বীজধান রোয়া হয়নি আর। নীরস মাটির চাঙাড়গুলো মাঠভরা নুড়ির রাশির মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে। দূরের লোকাল বোর্ডের রাস্তার ওপর ঘুরে যাচ্ছে ঘূর্ণি—যেন কোনো একটা বিশাল চিতা থেকে উঠে-আসা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে ক্ষ্যাপা বাতাসের তাড়া খেয়ে।

কড়া রোদ—ক্ষুরের ধারের মতো রোদ। এরই ভেতরে ঠায় দাঁড়িয়ে কাঠচ্যালা করছে রমন্দ। সারা গা দিয়ে ঘাম পড়ছে দরদর করে। ঘাড়ে-গলায়-পিঠে চিকচিক করছে কী কতগুলো সাদা গুঁড়ো—যেন পাউডারের ছোপ লাগিয়েছে। কিন্তু পাউডার নয়। এ দেশের খাটিয়ে-মানুষগুলোর গায়ে অমনিই জড়ো হয়ে ওঠে ওগুলি—রক্ত-জল-করা ঘাম শুকিয়ে গিয়ে ফুটে ওঠে লবণের কণা।

বারান্দার ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে সিগারেট খেতে খেতে আমার কেমন করুণা হল।

—আয় রমন্দ, একটু জিরিয়ে নে—

রমন্দ কুড়ুল থামিয়ে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে কপালটা মুছে নিলে একবার। তারপর আমার দিকে না তাকিয়েই ভারী মুখে বলল, থাউক। হামরা ছোটলোক—হামাদের জিরাবার দরকার হয় না।

বুঝলাম অভিমান হয়েছে ভুঁইমালি রমন্দের। হেসে বললাম, কুড়ুল তো ফসকাচ্ছে বার বার, একচিলতে কাঠ নামছে না। তার চাইতে আয়, মাথা ঠাণ্ডা করে নে।—একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম সামনের দিকে।

সিগারেট দেখে রমন্দের চোখ চকচক করে উঠল।

—হামরা খাটিই মরি—বাবুঘরের মন পাই না—কুড়ুল নামাল রমন্দ। কোমরের গামছাটা খুলে মুছে নিলে সারা শরীরের ঘাম। এসে বসল আমার চেয়ারটার পাশে উবু হয়ে, হাত বাড়িয়ে নিলে সিগারেটটা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তখনো ওর বুকের ভেতর হাপর ওঠা-নামার মতো ক্লান্ত নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি আমি। অবসন্ন দৃষ্টিতে সামনের জ্বলন্ত মাঠটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—'অইদ' কী, বাপ! য্যান্ শুষি খাচ্ছে মাটিটাক্।

আমি সংক্ষেপে বললাম, হুঁ।

সিগারেটে চোঁ করে একটা হুঁকোর টান দিয়ে রমন্দ বললে, চাষার বরাতে দুঃখ আছে ইবার।

—কেন?

—ক্যানে?—রমন্দ আমার দিকে তাকালো; দেরিতে পানি হইলে ধান উঠিবে

দেরিতে। ইদিকে বিলত্‌ থাকি পানি আসি ধানত্‌ হাজা নাগাই দিবে!

কথাটা ঠিক। আকাশে মেঘ না থাকলেও বিলে কোথা থেকে সাদা জলের জোয়ার এসে পড়ে কে জানে। ধান বড় হয়ে ওঠার আগেই যদি বিলে জল বেড়ে যায় তা হলে ফসলের অবধারিত সর্বনাশ।

আমি চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লাম।

রমন্দ আস্তে আস্তে বললে, হামার দ্যাশ অ্যামন নহো।

বুঝলাম, আগেকার কথাটার জের টানছে। মনে পড়ে গেছে মহানন্দার ওপারে ওর সেই আদি-জন্মভূমির কথা—যেখানে ক্ষেত ছিল ওর, ছিল হাল-হালট্। যেখানকার লোকে ওকে জন-মজুর রমন্দ হাড়ি বলত না, গলার স্বরে সম্ভ্রম মিশিয়ে বলত, কিবৃষক্ রমন্দ ভুঁইমালি।

আমি কৌতুহলী হয়ে উঠলাম।

—কি রকম দেশ তোমার?

—সে সোনার দ্যাশ। এমন 'অইদে'-পোড়া মরা মাটি নাই সেইঠে। অঢেল্ বর্ষা, অঢেল্ পানি, অঢেল্ ধান। ক্যাতে আমগাছ, আর—রোদের দিকে তাকিয়ে বললে, ক্যাতে যে ছায়া সিটা আর তোমাক্ কী কহিব বাবু!

—খুব চমৎকার দেশ তো।—বাইরের উগ্র-প্রখর রোদের জ্বালাটা চোখে লাগছে, এই ছায়ার নিচে বসেও পাচ্ছি পোড়ামাটির তপ্তশ্বাস। রমন্দের কথার সুরে সেই অদেখা ছায়া-ঘন দেশটা যেন আমারও মনে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলল।

—হাঁ, খুব চমৎকার।

—লোকের অবস্থা কেমন?

—কহিলে কি বিশ্বাস করিবেন?—আমার দিকে আগ্রহ-উজ্জ্বল চোখে তাকালো রমন্দ: সিটা শুনিলে আপনার মনত্‌ জাগিবে কি ঝুটা গল্প কহোছি। কাহারো সেইঠে কুনো অভাব নাই। খাছে, দাছে, ঘুমাছে।

—জমিদার খাজনা নেয় না?—মহানন্দার ওপারে সে অপরূপ দেশটা আমার ঔৎসুক্য তীব্রতর করে তুলল। যেন আশ্চর্য সুন্দর একটা সমৃদ্ধ গ্রামের ছবি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। তার ছায়া ঘেরা পথ, তার অকৃপণ বর্ষণের প্রত্যাশাবাহী মেঘমেদুর আকাশ, তার গায়ে সবুজ ঘন ঘাস, লক্ষ্মীর ঝাঁপি উজাড় করা ধানের সম্ভার আর সুখী-স্বচ্ছন্দ প্রজাদের জীবনের কল্পনা আমার মনে রূপকথার মতো সঞ্চারিত হতে লাগল।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, খাজনা নেয় না জমিদার?

—সি আর লিবে না কেন! খাজনা না লিলে ক্যামন করি বা চলিবে জমিদারের? তবে জোর জুলুম কিছু নাই। ইখানকার সাহুদের মতন কথায় কথায় সার্টিফিকেট করি

প্রজাক্ উৎখাত্ করি দেয় না—গর্বিত স্বরে বললে রমন্দ।

—তবে কেন এলি সে দেশ ছেড়ে?—আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম।

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে গেল। বিষণ্ণ চোখ দুটো মেলে ধরল পোড়া মুড়ির মতো মাটির চাঙাড় ছড়ানো মরা মাঠের শূন্যতায়।

—সি দুঃখের কথা আর কহেন না।

—কী হয়েছিল?

রমন্দ যেন বিব্রত বোধ করল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না বাবু, গপ্প করিলে হামার চলিবে না। হাতের কামটা ঝট্‌পট্ শ্যাষ করি ফেলিবা নাগে।

কুড়ুল নিয়ে নেমে পড়ল। প্রচণ্ড বেগে কোপ ঝেড়ে চলল কাঠটার গায়ে—রোদে কুচি কুচি পাখির পালকের মতো উড়ে উড়ে ছিটকে যেতে লাগল কাঠের টুকরোগুলো।

আর রৌদ্র-ঝলসিত 'বরিন্দে'র মাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম মহানন্দার ওপারে সেই গ্রামটার কথা। ছায়া আর সবুজ—আর আকাশে বর্ষার মেদুর মেঘোৎসব। চিতার ধোঁয়ার মতো ঘূর্ণি হাওয়ায় সে দেশটা যেন মরীচিকা এঁকে দিতে লাগল দৃষ্টির সম্মুখে।

রমন্দ নতুন এসেছে এই গ্রামে। মাত্র দিন দশেক আগে।

যেদিন এল, সেদিন ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাত। বাড়ির বাইরে পুকুরঘাটের ধারে বসে গল্প করছি আমরা। হঠাৎ সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে অপরিচিত একটা ছায়া এসে ছড়িয়ে পড়ল।

তাকিয়ে দেখি, বেঁটে খাটো একটি লোক। খালি গায়ের কুচকুচে কালো রঙে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হচ্ছে। ভীরুর মতো এসে দাঁড়িয়েছে—কোনো কথা বলতে পারছে না। রাত আরেকটু বেশি হলে চোর বলে সন্দেহ করা যেত স্বচ্ছন্দে।

—কী চাই?—চমকে উঠে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ভীরু গলাতেই লোকটা বললে, নোকর রাখিবেন?

—নোকর? কোত্থেকে আসছিস তুই—কোন্ গ্রামের?

—হামাদের দেশ—একটা ঢোঁক গিলল লোকটা: উই উ পার—মহানন্দার ধারত্।

—কী জাত?

—হাড়ি আইজ্ঞা। রমন্দ ভুঁইমালি হামার নাম।

পিসিমা বললেন, হাড়ি? তবে তো চলবে না বাপু। জলটল ছুঁতে পারবি না, কী হবে অমন চাকর দিয়ে?

প্রায় কেঁদে ফেলল লোকটা: আইজ্ঞা, না খাই মরি যাইলছি।

আমার করুণা হল।

বললাম, থাক না পিসিমা। বাইরের জন-মজুরের কাজ করতেও তো লোক লাগে একটা। আজকাল তো রাজবংশী আর সাঁওতালগুলোর ল্যাজ মোটা হয়ে গেছে, পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না দরকারের সময়। থাকলে বরং কিছু সাশ্রয় হবে কাজের।

পিসিমা ঠোঁট উলটে বললেন, যা ভালো বোঝো বাপু, করো তোমরা। শুধু দেখো, চোর-ছ্যাচোড় না হয়।

—কিরে, চুরি-টুরি করবি নাকি ?

লোকটা এবারে সাষ্টাঙ্গে পড়ে গেল আমার পায়ের কাছে। আমি হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই একটা পা চেপে ধরলে আমার। দেখলাম চোখ দিয়ে তার জল পড়ছে।

—হামরা গরীব হবা পারি, কিন্তু অধম্ম করিবার মানুষ নহো বাবু—

অতএব রমন্দ বাহাল হয়ে গেল। নিজের দায়িত্বেই আমি রেখে দিলাম ওকে। শুধু পিসিমা মুখ বিকৃত করে বললেন, আমার কেমন ভালো ঠেকছে না বাপু।

কিন্তু পিসিমার সন্দেহ যে অমূলক, এ কয়দিনে নিঃসন্দেহ প্রমাণ মিলে গেছে তার। কাজে-কর্মে একটু ঢিলে, সময়-সুযোগ পেলে ফাঁকি দিতে চেষ্টাও করে, কিন্তু এমনিতে লোকটা অত্যন্ত খাঁটি। ইচ্ছে করেই হাতে পয়সা-কড়ি দিয়েছি, অসতর্ক হয়েছি চেষ্টা করে, কিন্তু পাই-পয়সার হিসেব অবধি মিলিয়ে দিয়েছে রমন্দ। একটা টাকা বাইরে ফেলে রেখে-ছিলাম, মনে করেছিলাম ঠিক ট্যাকে গুঁজে নেবে। কিন্তু যথাসময়ে এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, বলেছে, ইটা ওইঠে কুড়াই পাইনু বাবু—

এখন বাড়িতে তার আসন পাকা হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, খানিকটা আত্মপ্রসাদ বোধ করি আমি। বাড়ির লোকের কাছে সগর্বে ঘোষণা করি : মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না।

প্রথম দিন কয়েক চুপচাপ থাকত রমন্দ। কেমন ভীরু-ভীরু শঙ্কিত চোখ মেলে তাকাতো এদিক ওদিকে। কথাবার্তায় উত্তর দিত না, মাঝে মাঝে ঝিম মেরে বসে থাকত। ডাক দিলে হঠাৎ কেমন যেন চমক খেয়ে উঠত : আইজ্ঞা ?

চাষার ছেলে, ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ করতে এসেছে এই প্রথম। তাই এরকম নার্ভাসনেস।

তারপরে আত্মস্থ হয়ে উঠল ক্রমশ—আস্তে আস্তে মুখ খুলল তার।

বাড়ির আর কারু কাছে আমল পায় না। বাবার তো প্রশ্নই ওঠে না—ক্ষেত-খামার জোত-জমার হিসেব নিয়ে তাঁর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই—তাঁকে দেখলে আতঙ্কে তটস্থ হয়ে যায় রমন্দ। মা তো দেখলেই ফরমাস করবেন, যা গোরুগুলো দেখ, পালংয়ের ক্ষেতে একটু জল দে। আর পিসিমা নাক উচিয়ে বলবেন, এই ছুঁসনে ছুঁসনে, ওটা আমার

রান্নার জল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও সম্প্রীতিটা ঘটে ওঠেনি বিশেষ, তারা ওকে ঠাট্টা করে 'কেলে হাঁড়ি' বলে।

শুধু বাড়তি লোক আছি আমি। এখানে থাকি না, থাকি কলকাতায়। কলেজের দু'মাস লম্বা ছুটিতে কাটাতে এসেছি বিশ্রামের দিনগুলো। দু-একটা পরিচিত আড্ডা ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ।

কাজেই আমার সঙ্গেই গল্পটা জমে ওঠে তার। সময় পেলেই আমার কাছে এসে বসে অন্তরঙ্গ সুহৃদের মতো।

সেই গল্প। মহানন্দার ওই ওপারে সেই রূপকথার মতো দেশটার কাহিনী। বলতে বলতে ঘোর ঘোর হয়ে আসে ওর চোখের দৃষ্টি।

সন্ধ্যার পরে পুকুরঘাটটার ধারে বসি দু'জনে।

—হামাদের দ্যাশে অ্যাকবার আপনাকে লি যামু বাবু।

—বেশ।

—অঢেল্ ধান সেইঠে বাবু—অঢেল্ চাইল। আমাদের দ্যাশে ক্ষীরশালি চাইল হয়। যেমন তার মিঠা গন্ধ, তেমন ফুরফুরিয়া ভাত। ভাত চাপাইলেন কি আধা কোশ 'ঘাটা' (পথ) থাকি তার সুবাস পায় মানসিলা (মানুষগুলো)।—বলতে বলতে অন্ধকারে নক্ষত্রের মতো চোখ দুটো জলে ওঠে রমন্দের: সে চাইলের ভাত একবার খাইলে আর কোনো ভাতে তুমার মন নি উঠবে বাবু।

গাছপালার ওপার থেকে ভাঙা চাঁদ ওঠে, বিবর্ণ হাসির মতো পাণ্ডু জ্যোৎস্না পুকুরের জলে দোল খায়। পুকুর থেকে পানা আর কলমীশাকের ভিজে ভিজে গন্ধ উঠে আসে। ক্ষীরশালি ভাতের গন্ধ পাই আমি সেই সঙ্গে—দেখি চওড়া চওড়া কলার পাতার ওপর ঝুরঝুর করে মল্লিকা ফুলের মতো ভাত ঝরে পড়ছে। মনে মনে সেই পাতাটির সামনে বসিয়ে নিই নিজেকে।

আবিষ্ট স্বরে রমন্দ বলে, আর আমাদের মহানন্দার চিথল (চিতল)।

—খুব বড় বুঝি?

—না দেখিলে কি বিশ্বাস হেবে! দশ স্যার, পন্দরো স্যার তো হামেশাই জালে পড়োছে। ফের দামে ক্যাতে সুবিস্তা (সুবিধে)! মাইন্‌সেও খায় খুব। ক্ষীরশালি চাইলের ভাত আর চিথলের পেটি। সে হামাদের সোনার দ্যাশ বাবু।

সোনার দেশই বটে। আমাদের গ্রামের সঙ্গে অদৃশ্য তুলনাবোধ জাগে আমার মনে, ঈর্ষা বোধ করতে থাকি। সত্যিই ভালো চাল হয় না এদেশে, যেমন লাল, তেমনি মোটা-সোটা। আর মাছও তেমন পাওয়া যায় না। ছেলেবেলায় তবু কিছু কিছু দেখেছি, ছোট-খাটো সরপুঁটিগুলো পর্যন্ত অগ্নিমূল্য আজকাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, তোদের দেশে একবার যেতে হবে রমন্দ। দিনকতক খেয়েদেয়ে শরীরটাকে ভালো করে আসতে হবে।

—যিবেন বাবু।

হাসি। ভালো করে তাকাই ওর দিকে।

—কোথায় থাকতে দিবি?

—ক্যানে, হামার বাড়িত্।

—জায়গা হবে?

—হেবে না?—পাণ্ডু জ্যোৎস্নায় তেমনি নক্ষত্রের মতো জ্বলে ওঠে রমন্দের চোখ: চাইরখানা ঘর হামার বাড়িত্। নতুন ঘরের ছাউনি। গত সন শালের খুঁটি দিনু—একদম পাকা ঘরের মতন হ'ইছে।

—তবে তোরা দস্তুরমতো বড়লোক রে?

—উটা কহি আর ক্যানে লাজ দেছেন?—তো হ্যাঁ—গাঁয়ের মাইন্‌সেরা সবজনা মানী মাতব্বর কহি মানে হামাদের। হামাদের দশ বিঘা জমিত্ ক্ষীরশালি ধান উঠে বাবু।

—এতই যদি সুখের অবস্থা, তা হলে সব ফেলে এখানে মজুরি খেটে মরতে এলি কেন রে? কী দরকার ছিল?—পুরনো প্রশ্নটাই আবার জিজ্ঞাসা করি আমি।

আর পুরনো নিয়মেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে রমন্দ। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, তবু সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সহসা।

—পিসিমা ডাকোছে বা হামাক—হামি যাই—

একা পুকুরঘাটে বসে, তার কালো জলে মরা জ্যোৎস্নার দোলা দেখতে দেখতে ভাবি ক্ষীরশালি ধানের ভাতের কথা—তার ক্ষীরের মতো মিষ্টি স্বাদ। কৃষ্ণাচতুর্থী রাত্রির মৃত ম্লান আলোয় সেই ভাতের গন্ধভরা দেশ আমাকে ডাক দেয়, হাতছানি দেয় তার ছায়া-কুঞ্জ। পরিষ্কার দেখি শালের খুঁটি দেওয়া চার-চারখানি মাটির ঘর, নতুন খড়ের ছাউনি দেওয়া তাতে। তার মেটে দাওয়ায় গ্রামের মেয়ের পরিচ্ছন্ন হাতে আঁকা পদ্মলতা, আঁকা লক্ষ্মীর পদলেখা। বাংলার চাষীর স্বপ্ন-সাগর মন্থন-করা তার স্নেহনীড়। একটা দূর আকাশের নক্ষত্রলোকের মতোই মনে হয়।

তবু সন্দেহ যায় না। এত থাকতেও এমন করে সে-দেশ ছেড়ে কেন চলে এল রমন্দ? কী সে কারণ? অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার থেকে কেন বেরিয়ে এল এই স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের বোঝা নিয়ে!

ভেবে ভেবে যেন একটা সমাধান পেয়ে গেলাম আমি।

বাইরে রোদের তেজ মরে এসেছে। ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা-বিকেল। সারাদিনের অজস্র

আগুনের জ্বালা নিবে যাওয়ার পর একরাশ রক্তাক্ত অঙ্গারের মতো 'বরিন্দে'র টিলা-মাটির রঙ। পাতা-ঝরা বাবলা গাছটার নিচে একটুকরো ছায়া আলগাভাবে জমে উঠেছে এতক্ষণে, জানলা দিয়ে ঝলকখানিক মিষ্টি বাতাস এসে আমাকে অভিনন্দন জানালো।

দিবানিদ্রা আর বৈকালী চা-পান সেরে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখনো সেই কাঠের গুঁড়িটার ওপর অশ্রান্ত কুড়ুল চলছে রমন্দের। গাছটাকে মোটের ওপর কায়দা করে ফেলেছে এতক্ষণে। পড়ন্ত রাঙা রোদে রমন্দকে এখন যেন উত্তপ্ত ব্রোঞ্জমূর্তির মতো মনে হচ্ছে একটা।

আমি মন্থর গতিতে চেয়ারটায় এসে বসতে হাসল রমন্দ।

—ত্যাখেন বাবু, শ্যাষ করি ফেলিছু কামটা।

—খুব ভালো করেছিস—আমি উৎসাহ দিলাম ওকে: নইলে পিসিমার বকুনিতে এতক্ষণ আস্ত থাকতিস না। থাক এখন, তামাক-টামাক খা।

পিসিমা ক্যানে যে হামাক দেখিবা পারে না—রমন্দের স্বরে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। তারপর এগিয়ে এল আমার সামনে, হাত পেতে দিলে। লজ্জিত গলায় বললে, একটা সিরুকেট দেবেন হামাক?

দিলাম সিগারেট। সযত্নে ধরিয়ে নিয়ে আমার পাশে তেমনি উবু হয়ে বসল।

—বাপ, কী কাঠ,—য্যান্ লোহা! হাঁফ নাগাই দিলে হামার—রমন্দ কিছুক্ষণ বিষাক্ত দৃষ্টিতে চ্যালাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল: হামার ত্যাশের কাঠ অ্যামন হয় না।

—তোর দেশের তো সবই আশ্চর্য—আমি সকৌতুকে বললাম, এমন হয় না তো কী রকম কাঠ হয়?

—কহিলে নি বিশ্বাস করেন বাবু। নরম মাটির ত্যাশের নরম কাঠ—ই বরিন্দার পাথরিয়া কাঠের মতন্ ন হয়। কোপ বসাইল্‌ছেন তো কাটি যায় ভস্ ভস্ করি।

—যে দেশটা ভালো, তার সবই অপূর্ব—আমি মন্তব্য করলাম।

আমার ব্যঙ্গটা রমন্দ বুঝতে পারলে না, কিন্তু চোখ দুটো তার জ্বলতেই লাগল।

—ঠিকই কহোছেন উঠা। অমন ত্যাশ আর হয় না। হামার নিজের ত্যাশ বলি কহোছি না। ছায়ায় ছায়া, পানিকে পানি, ধানকে ধান। ক্যাতে আরাম করি থাকে মাইন্‌সিলা। খাছে, দাছে, গম্ভীরার গান গাছে। কুনো জুলুম নাই জমিদারের—সোনার জমিদার।

ওর কথাগুলো এমন জগতের খবর বয়ে আনে যে চট করে যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। একটা আশ্চর্য পরিপূর্ণতার দেশ, মনের ভেতর যেন কল্পনাকে রোমাঞ্চ-চঞ্চল করে তোলে। এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমিও আজকাল মাঝে মাঝে চোখ বুজে ওর ক্ষীর-শালি ধানের স্বপ্ন দেখি।

কিন্তু যে কথাটা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম, চট করে সেটা মনে পড়ে গেল।

—হ্যাঁরে, তোর বউ নেই রমন্দ ?

রমন্দ চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত, রইল মাথা নিচু করে। ওর কালো মুখে লজ্জার কোনো আভাস ছড়িয়ে পড়ল কিনা আমি দেখতে পেলাম না। জড়িত স্বরে রমন্দ বললো, হাঁ।

—কেমন বউ ?

রমন্দ চুপ করে রইল আবার। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আপনি মুনিব, কহিতে সরম লাগে।

—আরে তাতে কী ? পুরুষের লজ্জা করতে নেই—উৎসাহ দিলাম ওকে।

রমন্দ দ্বিধাভরে বললে, কহিলে হয়তো ভাবিবেন বেশি কহোছি। অমন মেইয়া তিন-খানা গাঁয়ে মিলে না। যেমন গড়ন-পিটন, তেমন কাজ-কাম্। বাবুঘরের বৌ হইলে অক মানাইত।

রমন্দ চুপ করে রইল, আমিও আর জিজ্ঞাসা করলাম না। মেয়েটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কল্পনায়। গোলগাল কালো একটি মেয়ে, লাবণ্যে ঢলঢল মুখ—কাজলে আঁকার মতো দুটি টানাটানা চোখ। পরিষ্কার নিকোনো দাওয়ায় বসে নতুন কুলোয় ক্ষীরশালি ধানের চাল ঝাড়ছে।

অমন বৌ ঘরে রেখে কেন পালিয়ে এল রমন্দ—প্রশ্নটা আটকে গেল জিভের গোড়ায় এসেও। দেখলাম ডুবন্ত রোদ ওর মুখে এসে পড়ছে—যেন আগে থেকেই আমার প্রশ্নটা অনুমান করেই লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে ও।

কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর মিলল পরদিন।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই বাড়ির বাইরে হাঁক দিলে পুলিস। তটস্থ হয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখি আবছায়া আলোর ভেতর একটা রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে সাত মাইল দূরের থানার দারোগা বিনয়বাবু।

—কী ব্যাপার মশাই—এমন হাঁকাহাঁকি কেন ?

—একটু বিরক্ত করলাম মশাই। কিছু মনে করবেন না। আপনাদের নতুন চাকরটিকে আমার দরকার।

—নতুন চাকর ?—রমন্দ ?—আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

—রমন্দ নয়, বক্কা ভুঁইমালি। ফেরারী আসামী।

—ফেরারী !—প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম আমি।

—হ্যাঁ—মার্ডারার—শান্ত সুরে বললেন বিনয়বাবু, মৃদু হাসলেন।

সব মিথ্যে কথা। রমন্দ নয়, বক্কা ভুঁইমালি।—চারজন কনস্টেবল আর এ. এস.

আই,-এর সঙ্গে দড়ি বেঁধে বঙ্কাকে চালান করে দিয়ে বললেন ও বসলেন বিনয়বাবু। বাবা চায়ের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর জন্যে। জোতদার মানুষ, পুলিসকে হাতে রাখেন সব সময়। মস্ত একটা আসামী ধরে ভারী পরিতুষ্ট হয়েছে দারোগার মন।

বিনয়বাবু বললেন, খুব বেঁচে গেছেন আপনারা। খুনে লোক—একদিন কী কেলেঙ্কারি করে বসত যে কে জানে।

তারপর কাহিনীটা বলে গেলেন।

ক্ষীরশালি ধান নয়, মহানন্দা চোখেও দেখেনি। এই 'বরিন্দের'ই এক গ্রামে ওর আস্তানা। সাতপুরুষ ধরে জোতদার মাখন সাহার জুতোর চাকর। সম্পত্তির মধ্যে ভাঙা ঘর একখানা, দুবেলা মাখনবাবুর ঘরে মোটা চালের ভাত, আর মাস-মাইনে গোনাগুন্তি তিন টাকা। একটা কানা আর হাবা মেয়েকে বিয়ে করবে বলে আগাম চেয়েছিল কিছু। মাখনবাবুর মেজাজ তখন ভালো ছিল না, দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিলেন, হারামজাদা, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে! নিজের চাল-চুলোর বালাই নেই, আবার বিয়ে করবার সখ! রাখবি কোথায়, খাওয়াবি কী!

—সাংঘাতিক লোক মশাই, জাতে ভুঁইমালি তো। সেই রাত্রেই হেঁসোর এক কোপে মাখনবাবুর মাথা নামিয়ে বেটাচ্ছেলে হাওয়া। নির্ঘাৎ ফাঁসি হয়ে যাবে, বুঝলেন?

চা এসে গেছে। বিনয়বাবু চায়ে চুমুক দিলেন।

কিন্তু মহানন্দার ওই ওপারে ছায়াঘেরা গ্রাম, ক্ষীরশালি ধান আর টুকটুকে বউয়ের সোনার দেশটা, সে কি নিতান্তই মিথ্যে কথা? অথবা নিঃসম্বল ক্ষেতমজুরের চিরকালের স্বপ্নে-গড়া সেই সোনার দেশ একদিন পরম সত্য হয়ে দেখা দেবার প্রতীক্ষা করে আছে, ক্ষুধিত অভাগা মানুষের চিরন্তন 'সব পেয়েছির দেশ'?

শ্বেতকমল

স্টেশন থেকে ট্রেন অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। তবুও ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল সিদ্ধার্থ। রেল লাইনের পাশের কলমী-দামে ভরা জলা ছাড়িয়ে, সিজ-কাঁটায় ভরা চকচকে গোরুর হাড় ছড়ানো মরা মাঠখানা পেরিয়ে এখনো দূরের কলোনিটা দেখা যাচ্ছে। আর কলোনির একটুকরো মেটে ঘরের দাওয়ায় একটি শুভ্র বিন্দু স্থির হয়ে আছে—মা দাঁড়িয়ে।

কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা গেল না। ধস্ ধস্ করে খানিকটা কালো ধোঁয়া ছাড়ল এঞ্জিনটা, তিন-চারটে কয়লার গুঁড়ো চোখে এসে পড়ল আগুনের ফুলকির মতো। কোঁচায় চোখ রগড়ে আবার যখন ভালো করে তাকাতে পারল সিদ্ধার্থ, তখন লাইনের ধার দিয়ে

বিশৃঙ্খল বিবর্ণ জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। মাকে আর দেখা গেল না।

আটটা পঁয়ত্রিশে গাড়ি 'ইন্' করবে কলকাতায়, কলেজে পৌঁছতে প্রায় নটা বাজবে। সীট খুঁজে নিতে প্রায় আধঘণ্টা। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে সর্বসাকুল্যে সময় পাওয়া যাবে মিনিট চল্লিশেক।

আরো একটু আগে সেণ্টারে পৌঁছুতে পারলে ভালো হত। এই সময়টা নানা রকম 'সাজেশন' আসে—কথনো কখনো নাকি মোক্ষম লেগেও যায় সেগুলো। তা ছাড়া সেণ্টজেভিয়ার্সের কে যেন পেপার-সেটার বলে শোনা যাচ্ছে, ওখানকার ছেলেদের কাছ থেকে দুটো-একটা জিনিস হাওয়ায় উড়ে আসাও অসম্ভব নয়। একটু আগেভাগে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে এইসব নানারকম খবর মেলে—পড়ে তৈরীও করে নিতে পারা যায়।

কিন্তু এর আগে আর ভাতের জন্যে চাপ দেওয়া যায় না মাকে। তিন-চারদিন থেকে মার অল্প অল্প জ্বর—মাস কয়েক আগে থেকে যে ক্রমাগত কাশছিলেন, সেটা যেন এই ক'দিনে আরো বিশ্রীভাবে বেড়েছে। কলোনির দু-একজন বলছিলেন এক্স-রে করানোর কথা। মা হেসে বলেছিলেন, আচ্ছা, খোকা আগে পাস তো করুক, তারপরে ভাবা যাবে ওসব কথা।

খোকা আগে পাস করুক। তাই অপটু শরীর নিয়ে সেই কোন্ ভোররাত্রে উঠে মা রান্না করে দিয়েছেন। খেতে বসে সিদ্ধার্থ দেখল, বাটিতে একটা মাছের মুড়ো, ভাতের ভেতরে লালচে রঙের একটুখানি ঘি।

—এই মাছ, এই ঘি—কোত্থেকে এল মা?

অস্থিসার মুখে মা নীরক্ত স্নেহের হাসি হাসলেন: কেন, বাজার থেকে।

—বাজার থেকে তো বুঝলাম। কিন্তু পয়সা পেলে কোথায়?

মা সংক্ষেপে বললেন, অত কথায় তোর দরকার কী? তুই খা এখন। গাড়ির তো বেশি দেরি নেই আর।

সিদ্ধার্থ হাত গুটিয়ে বসল: তার মানে তোমার সেই কাঁসার চুমকিটাও বন্ধক দিয়েছ?

মা বিব্রত হয়ে উঠলেন: আজ পরীক্ষার দিন—শুভকাজে যাচ্ছিস। কেন এসময়ে মিথ্যে হাঙ্গামা করছিস খোকা? তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।

রুদ্ধস্বরে সিদ্ধার্থ বললে, এ ভারি অন্যায় মা! আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

মা ক্লান্তভাবে ভ্রূ-ভঙ্গি করলেন: অন্যায় আবার কী! পরীক্ষার দিন, একটু মাছ-ঘি না খেলে মাথাটা পরিষ্কার থাকবে কী করে? বন্ধক দিয়েছি—বেশ করেছি। তুই পাস করে চাকরিটা পেয়ে গেলে বন্ধক ছাড়িয়ে আনতে কতক্ষণ?

একটা নিশ্বাস ফেলে সিদ্ধার্থ চুপ করে গেল। তা বটে। পাস করে চাকরি পেলে আর কিছু ভাববার থাকবে না। আর বন্ধকের ব্যাপার নিয়ে কীই বা বলবার আছে তার।

পরীক্ষার ফী-এর টাকাটাও তো মার শেষ হারছড়া বাঁধা দিয়েই যোগাড় করতে হয়েছে। ঘি-মাছের জন্যে আর একটা কাঁসার চুমকি নয় গেলই বা। খড়্গপুরে দাদার কাছে টাকার জন্যে চিঠি লেখা হয়েছিল। কিন্তু ফায়ারম্যান দাদা কাঁচা কাঁচা অক্ষরে একখানা সংক্ষিপ্ত পোস্টকার্ডে জানিয়ে দিয়েছে, মাস-বরাদ্দ পঁচিশ টাকার ওপরে একটা পাইও দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। দোষ নেই দাদার। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বিদ্যে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই ফায়ারম্যানের চাকরিও যে সে পেয়েছে, এইটেই পরম ভাগ্য। আর কী-ই বা সে মাইনে পায়? তা ছাড়া রাত-দিন এঞ্জিনে কয়লা ঠেলার হাড়ভাঙা খাটুনির জন্যেই হয়তো দাদা আজকাল মদ ধরেছে। মাস ছয়েক আগে একদিন এঞ্জিন নিয়ে কলকাতায় এসেছিল—ঘণ্টা দুইয়েকের জন্যে দেখা করে গিয়েছিল মার সঙ্গে। কিন্তু সিদ্ধার্থ তখনি দেখেছিল দাদার চোখ লাল্চে, কথা জড়ানো, মুখে মদের গন্ধ।

তবু দাদা মাসে পঁচিশটা করে টাকা পাঠায় মাকে। যথেষ্টই পাঠায়। সংসার যদি না চলে, যদি পাঁচ-দশ টাকার ট্যুশন করে মুখে রক্ত তুলে সিদ্ধার্থকে কলেজে পড়তে হয়, যদি একটি একটি করে সব বন্ধক দিতে হয়—অসহায় ফায়ারম্যান দাদা কী করতে পারে সে জন্যে?

না—দাদার ওপর সিদ্ধার্থের কোনো অভিযোগ নেই। মার প্রশ্ন ওঠেই না—তার মুখে কোনোদিনই কারুর সম্বন্ধে এতটুকুও অভিযোগ শোনা যায়নি।

ঘিটা কেমন তেতো লাগল মুখে—মাছের মুড়োটার কোনো স্বাদ পাওয়া গেল না। শুধু মার ক্লান্ত হলদে রঙের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার শুধু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল: তোমার জন্যে কী আছে মা? তুমি কী খাবে?

কিন্তু জিজ্ঞেস করেই বা কী লাভ? কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। এত দুর্দিন—এত অভাব গেল, চালের এত টানাটানি, অথচ একটি দিনও কি সে কথা বুঝতে দিয়েছেন মা? কলেজে যাওয়ার আগে নিয়মিত গরম ভাত সে পেয়েছে—রাতে ফিরে এসে দেখেছে, তার জন্যে ঠিক ছ'খানা রুটি ঢাকা আছে ঘরের কোণায়। এ ক'দিন ধরে মা কী খেয়েছেন—কেন দিনের পর দিন এমন করে শুকিয়ে গেছেন, এ প্রশ্ন কোনোদিন তোলেনি সিদ্ধার্থ। সাহস হয়নি। পাস তাকে করতেই হবে। শুধু চাকরির জন্যে নয়—সিদ্ধার্থ জানে তার সঙ্গে মার অনেকখানি স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। ইস্কুলে মাস্টারী করতেন বাবা—পরের ছেলের পেছনে দিনরাত এত বিদ্যা খরচ করতেন যে ঘরের ছেলের জন্যে শেষ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত থাকত না এতটুকুও। দাদা বয়ে গেল। তারপর বাবা মারা গেলেন কার্বাংকলে—হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল—উদ্বাস্তু হয়ে ওরা এসে ঘর বাঁধল এই কলোনিতে।

বাবা বলতেন, শিক্ষাটা অর্থকরী হলেই সর্বনাশ। চাকরি পাওয়ার জন্যে যারা পড়ে, তারা কি মানুষ হতে পারে কোনোদিন? জ্ঞানের শেষ কথা হল জ্ঞান। তা থেকে কতটা

লাভ, কতখানি ক্ষতি হবে—সে বিচার যারা করে, তারা ছাত্র নামের অযোগ্য।

অবশ্য, নিজের বাণীর মর্যাদা বাবা রেখেছেন, মরবার সময় একটা পয়সাও ছুঁইয়ে যাননি। তারপরে পার্টিশন। বাবার কথাগুলো মনে পড়লে সিদ্ধার্থের হেসে উঠতে ইচ্ছে করে, কেমন একটা অন্যায় আগ্রহ জাগে বাবাকে প্যারডি করতে।

কিন্তু মা'র তা নয়। বাবাকে তিনি চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছেন, স্কুল-মাস্টার পণ্ডিত স্বামীর প্রতিটি কথাকে মেনে নিয়েছেন অভ্রান্ত বেদবাক্যের মতো। এখনো যখন কোনো কোনো দিন দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে মা বাবার গল্প করেন, মরা মাঠটার ওপারে চাঁদ ওঠে, ঝিরি ঝিরি নিমপাতার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে মার মুখে পড়ে সেই তখন—তখন মা'র এই নিভন্ত নিষ্প্রভ চোখ দুটোকে অদ্ভুত গভীর আর কালো বলে মনে হয়; মনে হয় মা'র কপালে শুচিতার অম্লান শুভ্র চন্দনলেখা, তাঁর চারদিকে পূজার্থিনীর পবিত্রতার একটা জ্যোতির্বলয়, তাঁর দৃষ্টি ধ্যানের মধ্যে সমাহিত।

—বিদ্যার মতো কি আর জিনিস আছে বাবা? বিদ্যাই হল বেদ—বিদ্বানই হল ব্রাহ্মণ।

বাবার কথার পুনরাবৃত্তি। তবু হঠাৎ সিদ্ধার্থের মনে হয়, কত নতুন—কত স্বতন্ত্র। বাবা শুধু আউড়ে গেছেন, বাঁধা অভ্যাসে কতগুলো মুখস্থ করা কথা বলে গেছেন; কিন্তু মা তো শুধু কতগুলো শব্দই উচ্চারণ করে চলেননি। বুকের একান্ত গভীরতা থেকে এরা উৎসারিত হচ্ছে, নিবিড় প্রত্যয়ে, অতলান্ত আবেগে।

কী যে হয়—মাকে যেন আর চিনতে পারা যায় না। অনেক দূরে—কত দূরে যে তিনি সরে গেছেন! তিনি মিলিয়ে যাচ্ছেন এই জ্যোৎস্নায়, হারিয়ে যাচ্ছেন একটা দীপ্তিময় শূন্যতায়। অকারণে কান্না পায় সিদ্ধার্থের। মা'র এই আলোকময় মূর্তির কাছে নিজেকে কত দীন—কত ইতর বলে মনে হয়।

—ইউ দেয়ার! ইয়েস—ইয়েস—আই মিন ইউ। আর ইউ ফিলিং ভেরি স্লিপি মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান?

সিদ্ধার্থ চমকে দাঁড়িয়ে ওঠে। অধ্যাপকের ব্যঙ্গভরা দৃষ্টি তারই ওপর—যাতে ক্লাসের দেড়শো ছাত্রের চিনতে এতটুকু ভুল না হয়, সেজন্যে তর্জনীও বাড়িয়ে দিয়েছেন তার দিকে।

একদল ছেলের নিষ্ঠুর তীব্র হাসির মধ্যে মাথা নিচু করে বসে পড়ে সিদ্ধার্থ। অধ্যাপক আরো দু-একটা কী সরস টিপ্পনী কাটেন, সামনের ছেলেদের উচ্ছ্বসিত হাসির ঢেউয়ে সেগুলো আর পেছনের বেঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছয় না। ছেলেদের কৌতুকক্ষিপ্ত দৃষ্টি যখন ঘুরে ঘুরে তার ওপর এসে পড়ে, তখন অনুমান করা যায়, সে রসিকতাগুলো নিশ্চয় আরো বেশি মর্মঘাতী। আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত মুখে অধ্যাপক আবার তাঁর একটানা বক্তৃতা শুরু করেন।

কিন্তু সব ছেলে হাসে না। সহানুভূতিভরা বিষণ্ণ চোখে সিদ্ধার্থের দিকে তাকায় তারাই—যাদের কলেজের পর ট্যুশন করে রাত ন'টার ট্রেনে বাড়ি ফিরতে হয়, সাড়ে দশটায় পড়তে বসতে হয় ঘরে তেল থাকলে, রাত দুটোর সময় যাদের চোখের পাতা কে যেন আসুরিক শক্তিতে টেনে ধরে এবং পরদিন সকালে ছটায় উঠে একটা ট্যুশন সেরে আটটার ট্রেনের কথা ভাবতে হয়!

কখনো কখনো একটা ক্ষিপ্ততা বোধ করেছে সিদ্ধার্থ। কী অর্থ হয় এর—কী এর পরিণাম? সমস্ত দিন যেন শরীরের ওপর কেউ রোলার চালিয়ে যায়—মনে হয় বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙে গিয়ে হৃৎপিণ্ড-ফুসফুসের মধ্যে বিঁধে আছে কতগুলো তলোয়ারের ডগার মতো। সারা পৃথিবীর জ্ঞানের দরজা চোখের সামনে খুলে দিচ্ছেন অক্লান্ত বক্তা অধ্যাপকের দল: সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস। দুর্বল মস্তিষ্ক নিয়ে সেগুলো বুঝতে চেষ্টা করে সিদ্ধার্থ, তবু কিছুই বুঝতে পারা যায় না। এক-একটা শব্দ যেন গুল্‌তির গুলির মতো মাথার ভিতরে বিঁধতে থাকে—ঝকঝকে কোটেশনগুলো চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। সমস্ত স্নায়ুগুলো বোধশক্তি হারাতে থাকে: কই, পথ তো খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও!

এক-একবার ইচ্ছে করে পালিয়ে যায় এখান থেকে—পালিয়ে যায় অনেক দূরে—যেখান থেকে কলেজের সাদা এই চারতলা বাড়িটার একটু আভাস মাত্র পাওয়া যায় না। দাদাই ঠিক করেছে। কালিমাখা ময়লা পোশাকে এঞ্জিনের গন্‌গনে আগুনে সে কয়লা ঠেলছে, ওই এঞ্জিনটার একরাশ লোহা-লক্কড়ের সঙ্গে তার সমস্ত অনুভূতিগুলো গেছে একাকার হয়ে। কোনো সাহিত্য, কোনো দর্শনের মরীচিকা তাকে মুহূর্তের জন্যেও উন্মনা করে দেয় না!

অসহ্য—এ অসহ্য! নাড়ী-ছেঁড়া ক্ষুধার সামনে সাজানো খাবার, অথচ তুলে নিয়ে মুখে দেবার শক্তি নেই! সাহিত্যের স্রোত সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে অমৃতধারায়, অথচ কাঁপা হাতের অঞ্জলিতে একটি বিন্দুও তুলে নিতে পারবে না সে!

কিন্তু—কিন্তু পরীক্ষা তাকে পাস করতেই হবে।

...চোখে এখনো কয়লার গুঁড়ো জ্বালা করছে—সিদ্ধার্থের মনে পড়ে গেল। একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। চকচকে স্যুট পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে। সঙ্গে জড়িপাড় সাদা সিল্কের শাড়ি পরা যে মোটাসোটা গৌরাঙ্গী ভদ্রমহিলা চলেছেন, তিনি নিশ্চয় ওঁর স্ত্রী। চোখে সোনার নিউ-মাউন্ট চশমা—সুখে পরিতৃপ্ত গোলাপী মুখ। মার রঙও তো ওইরকম ছিল—মার বয়েসও ওঁর চাইতে বেশি নয়। কিন্তু—

গাড়ি ছাড়ল। সিদ্ধার্থ চোখ ফিরিয়ে নিলে। ওঁদেরও নিশ্চয় ছেলে আছে, তার বয়েসী ছেলে। কলকাতার কোনো বড় কলেজেই পড়ে, ঝকঝকে নতুন টেক্সট্ বই, রেফারেন্স বই

—কোনো কিছুর অভাব নেই তার। সিদ্ধার্থ কল্পনার চোখে তার পড়ার ঘরটা দেখতে লাগল। তিনদিকে কাচের আলমারি আর শেল্‌ফে বই ঠাসা—চকচকে টেবিলে লেখার সরঞ্জাম, গদি-আঁটা চেয়ার, শ্বেতপাথরের একটি ছোট মূর্তি, নীল পর্দাটা উড়িয়ে খোলা জানালা দিয়ে আসছে দক্ষিণের হাওয়া। কলকাতার সেরা অধ্যাপকেরা তাকে পড়ান—স্কলারশিপ লিস্টে নিশ্চয় ওপরের দিকেই থাকবে তার নাম।

—চাই ভাল লজেন্স! বিলিতী লজেন্স! চুষতে চুষতে যান—তেষ্টার জলের কাজ দেবে। দরকার থাকলে চেয়ে নেবেন, দু'পয়সায় একটা, আনায় তিনটে—

পা-দানীতে হাঁটছে ছেলেটা। বছর সতেরো-আঠারো বয়েস, চোখ দুটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। গায়ে ছেঁড়া খাকী শার্ট, কাঁধে একটা রেশনের থলে।

—চাই ভালো লজেন্স—বিলিতী লজেন্স! আনায় তিনটে, দু-আনায় ছ'টা—

কথাবার্তায় পরিষ্কার বাঙালে টান, তারই মতো বাস্তুহারা। হঠাৎ শিউরে উঠল সিদ্ধার্থ। এ দশা তারও তো হতে পারত, তাকেও তো এমনি করে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ফিরি করতে হতে পারত ডেলি-প্যাসেঞ্জারের গাড়িতে। কে জানে—একদিন ইস্কুলে ওই ছেলেই ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিল কিনা! আজ হয়তো নিছক বাঁচবার দায়ে বইগুলোকে পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিয়ে এই পথই ওকে বেছে নিতে হয়েছে!

সে তুলনায় কত ভালো আছে সিদ্ধার্থ—যত কষ্ট করেই হোক তবু তো কলেজের ক্লাসগুলো শেষ করে আনল। পরের বই ধার করে এনে—যে করে হোক একটা প্রিপারেশনও দাঁড় করিয়েছে। একবার পাস করে যেতে পারলে—অফুরন্ত আশা, অনন্ত সম্ভাবনা।

—তাই বটে! এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে কিউটা দেখেছিস একবার?—অদ্ভুত তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল সলিল: অতগুলো মানুষের পেছনে কোথায় তোর জায়গা হবে সে কথা ভেবেছিস কখনো?

সলিলের কথা ভাবতেই শরীর কুঁকড়ে এল সিদ্ধার্থের। নিকেলের ফ্রেমের একজোড়া পুরু চশমার নিচে একান্ত ম্লান অথচ অমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে আর কারো কখনো দেখেনি।

অনার্স পাওয়ার মতো ছেলে সলিল—অনার্স নিয়েও ছিল। কিন্তু রাখতে পারেনি। মানিকতলার কী বস্তিতে একখানা ঘরে থাকে ওরা বারোজন লোক। তার মধ্যে আবার ওর ছোট বোনটা রক্ত-আমাশয়ে ভুগছে চার মাস ধরে। শুধু বই নেই বলে নয়, তার ভেতর বসে অনার্স পড়ার ভাবনাটা দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরে অধ্যাপকের মুখ থেকে শেলীর প্রেমের কবিতার ব্যাখ্যা শুনে দু'জনে যখন বেরুল, তখন সন্ধ্যার ছায়া-নামা আমহার্স্ট স্ট্রীটকে আরো ধূসর—আরো

বিমর্ষ বলে মনে হচ্ছে। দু'জনে একসঙ্গে হাঁটছিল, হঠাৎ একটা চাপা যন্ত্রণার আকৃতিতে চমকে উঠল সিদ্ধার্থ।

সলিলের পা টলছে। কোনোমতে একটুখানি সরে এসে পথের ধারের একটা ল্যাম্প-পোস্টকে সে আঁকড়ে ধরল। বেলাশেষের বিষণ্ণ আলোতেও সিদ্ধার্থ দেখতে পেল, যন্ত্রণায় সলিলের সমস্ত মুখ নীল হয়ে গেছে।

—কী হল? কী হল সলিল?

সলিল জবাব দিলে না, ব্যথায় বিবর্ণ মুখে ল্যাম্পপোস্টটাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরল। ততক্ষণে তার চোখ দুটো বুজে এসেছে—হাত থেকে বইখাতাগুলো ঝর ঝর করে পড়ে গেল ফুটপাথের ওপরে।

—সলিল, কী হল তোর?—বইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সভয়ে জানতে চাইল সিদ্ধার্থ।

সলিল এবারে জোর করে একফালি বিকৃত হাসি ফোটালো মুখের ওপর: ও কিছু না। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ একটা তীব্র সন্দেহ মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠল।

—তুই আজ বোধ হয় কিছু খাসনি, তাই নয়?—জ্বালাভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিদ্ধার্থ সলিলকে লক্ষ্য করতে লাগল। সলিল চুপ করে রইল।

—কী খেয়েছিস সারাদিন?—বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলে আবার।

—চা এক কাপ·—প্রায় অস্ফুট গলায় সলিলের জবাব এল।

—রাস্কেল! এমনি করে বুঝি সুইসাইড করতে হয়? চলে আয় আমার সঙ্গে—

কঠিন মুঠিতে সলিলের হাত চেপে ধরল সিদ্ধার্থ। তারপর রাস্তা পার করে টেনে নিয়ে এল সামনের একটা রেস্তোরাঁয়।

রেস্তোরাঁটা কলেজের ছাত্রদেরই অনুগ্রহপুষ্ট। সব সময়েই এখানে কিছু-না-কিছু ছাত্র জমে থাকে, এখনো ছিল। একটি টেবিলে চার-পাঁচজন ঘিরে বসেছে, সামনে চায়ের পেয়ালা, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

একজন বলছিল, এখন এখানে বসে আর কী হবে মাইরি? চল্,—বেরুনো যাক।

—সিনেমায় যাবি?—আর একজনের প্রস্তাব।

—না, না ভাই, আমি এখন বাড়ি ফিরব। দেরি করে গেলে বাবা আজকাল বড্ড রাগারাগি করেন। সামনে আবার টেস্ট আসছে তো।

—তুমি কেটে পড়ো না গুড বয়, তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে? এই—রিয়্যালি কোথায় যাবি বল্ তো? মধুবালা, না এস্থার উইলিয়ামস্?

একটু সরে এদিকে দুটো চেয়ার টেনে নিলে সিদ্ধার্থ, প্রায় জোর করে একটাতে বসালো সলিলকে। তারপর ঈর্ষাভরা চোখে ওই ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ আছে ওরা।

—কত সহজ, কত নিরঙ্কুশ। ওদের বাড়িতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় আছে, চায়ের দোকানে বসে সিগারেট খাওয়ার মতো অর্থসঙ্গতি আছে, যখন খুশি সিনেমায় যাওয়ার মতো উদ্বৃত্তও আছে পকেটে।

—কী খাবি সলিলকে জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধার্থ।

—কেন অনর্থক বাজে খরচ করবি?—সলিল শীর্ণ গলায় বললে, তোর অবস্থাও তো জানি। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে বল্, তা হলেই হবে।

—থাম্ তুই—সিদ্ধার্থ বয়কে ডাকল: ছুটো অমলেট করে নিয়ে এসো আগে।

সলিল মাথা তুলল—পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সিদ্ধার্থের দিকে। পুরু চশমার আড়ালে প্রায় মুছে গেছে তার চোখ ছুটো: তুই মিথ্যেই এসব ভাবছিস। আমার অভ্যেস আছে—এ রকম আমার প্রায়ই হয়।

—প্রায়ই হয় বটে, কিন্তু বেশি দিন আর হবে না। একদিন রাস্তার ভেতরেই এমনি করে টেঁসে যাবি, সেটা বুঝতে পারছিস?

—গেলেই বা ক্ষতি কী?—সলিল টেবিলটার ওপর আঁচড় কাটতে লাগল।

—অত ফিলসফি কপচাসনি—সিদ্ধার্থ বিরক্ত হয়ে উঠল: তোর মুখে ওসব 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' মানায় না। কিন্তু এমনিভাবে পরীক্ষায় পাস করে জগতে কোন্ অক্ষয় কীর্তিটা তুই রাখবি—শুনতে পাই কি?

সলিল চুপ করে রইল। বাইরে আমহার্স্ট স্ট্রীটে সন্ধ্যা আরো ম্লান হয়ে আসছে। শেষ শরতের ভারী হাওয়ায় কয়লার ধোঁয়া জমাট বাঁধছে মাথার ওপর—রাস্তার ওপারের উপ্‌চে পড়া ডাস্টবিনটা থেকে ছুর্গন্ধের ঝলক উঠে এল একটা।

আরো ছু'টি ছেলে এসে ঢুকল—গম্ভীর চেহারা। মুখ চেনা—কলেজে ওরা রাজনীতি করে। ছেলে ছু'টি কোনো দিকে লক্ষ্য করলে না, এক কোণায় বসে একখানা খবরের কাগজ খুলে নিয়ে কী আলোচনা করে চলল বিশস্ত চাপা গলায়।

বড় দলটা তখন আরো সরব হয়ে উঠেছে। শোঁ করে হাতের সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে একজন মুখটাকে অদ্ভুত বিকৃত করে রিং করছে ধোঁয়া। আর একজন বলছে, ফোর্থ ইয়ারের ও মেয়েটা আমাদের পাড়াতেই থাকে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলি স্পীকিং—একেবারে আনঅ্যাপ্রোচেবল।

—আনঅ্যাপ্রোচেবল!—যে রিং করছিল, সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সশব্দে টেবিল চাপড়ালো: তুই একটা ইডিয়ট—মানে, দেয়ার আর ম্যাগটস ইন ইয়োর ব্রেন! আমি যদি হতাম—

একজন একটা শিস দিলে। রাজনীতি-করা ছেলে ছু'টি একসঙ্গে মাথা তুলে ঘৃণাভরে তাকালো ওদের দিকে, চাপা মন্তব্য শোনা গেল: ব্রুটস্!

বেয়ারা ধূমায়িত অমলেট এনে সামনে রাখল। সলিল বিব্রত হয়ে বললে, কেন এ সব আনাচ্ছিস? পয়সাই বা এত পেলি কোথায়?

—ট্যুশনির একটা টাকা পেয়েছি আজ। যাক—খা তুই।

কিন্তু সলিল খেতে পারল না। চামচে করে একটুখানি ডিম মুখে তুলেই সে সশব্দে সেটা নামিয়ে রাখল। দু'চোখে তার ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে এসেছে।

—সলিল!

সলিল ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠল: মাপ কর্ ভাই—মাপ কর্ আমাকে। আমি খেতে পারব না। ক্ষিদে ভোলবার জন্যে কলেজে এসেছিলাম, কিন্তু বাড়িতেও আজ কেউ খায়নি।

রাজনীতি-করা ছাত্র দু'টি একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো: কী হল দাদা—কী হয়েছে?

ওদিকে তখন গান উঠছে: ও-লা-লা!—সঙ্গে সঙ্গে টকাটক তাল পড়ছে টেবিলে।···

···একটা তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজ। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো সিদ্ধার্থ। ট্রেন ইন্ করছে শিয়ালদা নর্থ স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িতে আটটা ছত্রিশ।

পকেটে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর অ্যাডমিট কার্ড ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে সিদ্ধার্থ নেমে গেল বহির্মুখী জনতার স্রোতে।

ট্রাম থেকে নেমে আরো খানিকটা এগোলে কলেজ মেলে। সিদ্ধার্থ হাঁটতে লাগল।

আগে পিছে ছাত্রের দল চলছে, তারই মতো পরীক্ষার্থী। ওরই মধ্যে হাঁটতে হাঁটতেও বিড় বিড় করে পড়ছে কেউ কেউ।

একজন চিৎকার করে ঘোষণা করছে: আমি তোকে বলছি, ওথেলো থেকে এ কোশ্চেনটা একেবারে সিয়োর—

কিন্তু সিয়োর কোশ্চেনের কথা ভেবেও উৎসাহ পাচ্ছে না সিদ্ধার্থ। সমস্ত মনটা কেমন ভারী হয়ে আছে—কাল সারারাত পড়ার প্রতিক্রিয়াটা এতক্ষণে টের পাওয়া যাচ্ছে মাথার মধ্যে। সামনের রাস্তাটা যেন দুলছে একটু একটু করে—অবশ পা দুটো আর তার চলতে চায় না।

মা'র মুখখানা মনে পড়ছে। প্রত্যাশা করে বসে আছেন—অপেক্ষা করে বসে আছেন কবে সিদ্ধার্থ সংসারে সুদিন ফিরিয়ে আনবে। শুধু অভাব ঘুচবে তাই-ই নয়, জীবনের যে স্বপ্ন স্বামী তাঁর সন্তানদের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই স্বপ্নকে সফল করে তুলবে। বড় ছেলে রোজগার করে, নিজের পায়ে দাঁড়াতেও শিখেছে, কিন্তু তবু সে মানুষ হয়নি। সিদ্ধার্থের মধ্যে সেই মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হোক, তার ভেতর জাগুক বিদ্যার ব্রাহ্মণত্ব।

চিন্তার মধ্যেও মা'র স্বপ্নকে আঘাত করতে ইচ্ছে হয় না সিদ্ধার্থের। কিন্তু তবুও মনে হয়: সে ব্রাহ্মণত্ব তাদের জন্যে—যার ঘরে দক্ষিণের হাওয়া লেগে দুলছে নীল পর্দাটা, যার

তকতকে আলমারিতে চকচকে টেক্সট্ আর রেফারেন্স বই, কলকাতার বাছাই অধ্যাপকেরা দিনের পর দিন যাকে বিদ্যাদান করেন।

সিদ্ধার্থ চাকরি চায়—একটা চাকরি শুধু। সরস্বতীর শ্বেত-কমলের পাপড়ি নয়, লক্ষ্মীর আঁচলঝাড়া এককণা ক্ষুধার অন্ন। শেলীর স্বপ্ন-রাঙানো আকাশে কল্পনার হংস-মিথুন উড়িয়ে নয়—বর্ষার জল পড়া পচা খড়ের চালের ওপর একটুখানি শক্ত ছাউনি।

—ডিগ্রি একটা ফাঁপা বেলুন, প্রজ্ঞাই হল ঐশ্বর্য—

বাবা বলতেন। সিদ্ধার্থের মুখে এক টুকরো বাঁকা হাসি ঝলকে উঠেই মিলিয়ে গেল। তাই বুড়ো বয়সেও বাবার মাইনে ষাট টাকার ওপরে আর উঠল না! অভাবের সঙ্গে সারা-জীবন লড়ে ডায়বেটিস্ আর কার্বাঙ্কলের আক্রমণে পরম পরিতৃপ্ত মুখে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

চাকরি চাই—চাকরি চাই সিদ্ধার্থের। বাঁচবার জন্যে—মাকে একটা এক্স-রে করাবার জন্যে, একটা নির্ভরযোগ্য আচ্ছাদনের তলায় মাথা গোঁজবার জন্যে। সেইজন্যেই তাকে পাস করতে হবে।

ভরসা অবশ্য একটা পাওয়া গেছে। দূর সম্পর্কের এক কাকা থাকেন টালিগঞ্জে। তিনবার আই. এ. ফেল করেছিলেন, কিন্তু তাই বলে আর কোথাও ফেল করেননি। তিনিই আশা দিয়েছেন: বি. এ.টা আগে পাস করে এসো, তারপর ঢুকিয়ে দেব একটা ফার্মে-টার্মে।

একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, বি. এ. পাস করবার দরকার তো আপনারও হয়নি। কিন্তু চাকরি পেতে গেলে ও কথাটা বলা চলে না। সিদ্ধার্থ শুধু ঘাড় নেড়েছিল একবার।

কাকা সদয় হাসিতে বলেছিলেন, মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন তো একটা চাই! কত এম. এ., এম. এস-সি., কত ফার্স্ট ক্লাস ঘোরাঘুরি করছে আমার কাছে। মিনিস্টারের চিঠিও নিয়ে আসে কেউ কেউ: আত্মতৃপ্তির আলোয় কাকার গোলালো মুখ আরো গোলাকার হয়ে উঠেছিলো: কাজেই নেহাৎ আত্মীয় বলে তাদের ক্লেম রিফিউজ করে তোমাকে চাকরি দেব—এতটা নেপোটিজম আমার নেই।

বেশ অপক্ষপাত একটা উদার মনোভাব দেখিয়েছিলেন কাকা। স্পষ্ট কথা বলবার একটা কঠিন গাম্ভীর্যে নিজের চারদিকে একটা দূরত্বের আবরণ রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ জানে, আসল দুর্বলতাটা তাঁর কোথায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সুবিচার তিনি পাননি, তাই ওখানকার ডিগ্রিধারীদের উমেদারিতে এক ধরনের হিংস্র উল্লাসবোধ করেন তিনি—অনুভব করেন প্রতিহিংসার আনন্দ।

—বি. এ. পাস করে এসো, তারপরে ব্যবস্থা করে দেব—কাকা আলোচনাটার ওপর ওইখানেই ছেদ টেনে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই থেকেই বুকের মধ্যে আশার একটা গোপন

অঙ্কুরকে এতদিন লালন-পালন করে এসেছে সিদ্ধার্থ। ইচ্ছে করলেই কাকা পারেন, তাঁর পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়। বেশি নয়—অন্তত একশো টাকার একটা চাকরি। তার বেশি চায় না সিদ্ধার্থ—আশাও নেই তার বেশি। সে আর মা। দাদা যদি এই পঁচিশটা টাকাই মাসে মাসে পাঠায়, তা হলে অভাবটা অন্তত থাকবে না। মাকে বিশ্রাম দেওয়া যাবে—পেট ভরে খেতে দেওয়া যাবে তাঁকে—দরকার হলে চিকিৎসাও করানো যাবে। তা ছাড়া মা'র চোখ খারাপ—একজোড়া চশমাও করে দেওয়া যাবে তাঁর। সিদ্ধার্থের মনটা হঠাৎ আনন্দে চকিত হয়ে উঠল : ট্রেনে দেখা সেই ভদ্রমহিলার মতো সোনালি ফ্রেমের রিমলেস নিওমাউন্ট চশমা। চমৎকার মানাবে মা'র চোখে—ওই ভদ্রমহিলার চাইতেও সুন্দর দেখাবে।

সিদ্ধার্থ থামল। সামনেই কলেজের বাড়ি।

কোলাহল চলেছে—এখানে ওখানে বই নিয়ে পড়া শুরু করেছে ছেলেরা—উদ্বিগ্ন মুখে ঘুরছেন অভিভাবকের দল। তাঁদের মধ্যে কতজন স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়ে, ধার করে পরীক্ষার ফী যুগিয়েছেন কে জানে! তাঁদের মনে ভবিষ্যতের আশা—আগামী দিনের স্বপ্ন। কত কাকা তাঁদেরও আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন তাই বা কে বলবে!

সীট্ খুঁজতে ছুটল সিদ্ধার্থ।

দেখা গেল, দু'খানা বেঞ্চ আগে—একই ঘরে তার আর সলিলের সীট্ পড়েছে। রুক্ষ চুলে, শীর্ণ মুখে সলিল বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। সিদ্ধার্থকে দেখে হাসিতে সলিলের মুখ ভরে উঠল।

—তুইও এ ঘরে? আয়—আয়—

সিদ্ধার্থ সলিলের পাশে এসে বসল : কী পড়ছিস ওটা? মার্চেন্ট অব ভেনিস?

—কোর্ট সীনটা একবার দেখে নিচ্ছিলাম, কিন্তু কী হবে আর?—সলিল বই বন্ধ করলে : দু'বছরে যা হয়নি, এই আধ ঘণ্টার মধ্যে আর কী হবে তার?

—ঠিক কথা।—সিদ্ধার্থ জবাব দিলে। আধ ঘণ্টা কেন, এখন তিন ঘণ্টা সময় পেলেও কিছু হবে না। কাল ত্রিযামা রাত্রির জাগরণ এখন মাথার মধ্যে হাতুড়ি ঠুকছে, সমস্ত স্মৃতি-শক্তি যেন ঝাপসা হয়ে এসেছে এই মুহূর্তে। বই খুললেও তার হরফগুলো এখন একরাশ কালো পিঁপড়ের মতো এদিক-ওদিক চলতে শুরু করে দেবে।

সলিলের মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল একবার। দাঁতে দাঁত চাপল সে।

—কী হল রে? অমন করছিস কেন?

—ভয় নেই তোর—সলিল এবার ক্লিষ্ট হাসি হাসল : আজ খেয়ে এসেছি। মা সামনে বসে পেট ভরে দই-ভাত খাইয়েছেন। সেজন্যে নয়, কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে যেন।

—তোর শরীর ভালো নেই সলিল। চোখমুখ যেন কেমন কেমন লাগছে।

সলিল আবার হাসল : ক'দিন পড়াশুনোর খুব স্ট্রেন গেছে কিনা! একবার চুকে যাক না পরীক্ষাটা—তারপর দু'মাস লম্বা হয়ে ঘুমুব, কেউ তখন বিরক্ত করবে না।

একখানা ঘরে যেখানে বারোজন লোক শোয় এবং তাদের একজন ব্লাড-ডিসেন্‌ট্রিতে ভোগে, সেখানে লম্বা হয়ে শোওয়ার জায়গা কোথায়—এমনি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে গেল সিদ্ধার্থ। বড় বেশি নগ্ন—বড় বেশি নিষ্ঠুর প্রশ্ন!

প্রতীক্ষার আধঘণ্টা হাওয়ায় উড়ে গেল। বাজল ঘণ্টা—রুম-ইনচার্জ এলেন, ইন-ভিজিলেটারের দল দেখা দিলেন, বেয়ারারা খাতা নিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর যথাসময়ে এল প্রশ্নপত্র।

অসাড় মস্তিষ্কের ভেতরে অনুভূতি ফিরে এল, স্মৃতির রেখাগুলো স্পষ্ট হতে লাগল ক্রমে ক্রমে। তারপর আস্তে আস্তে লেখার মধ্যে ডুবে গেল সিদ্ধার্থ।

—একটু চেপে বসুন দাদা—হাঁ, আমাকে একটু কভার করুন—

পেছন থেকে অনুরোধ শোনা গেল। একবার ফিরে তাকিয়েই ভয়ে শীর্ণ হয়ে উঠল সিদ্ধার্থ। পেছনের মোটা ছেলেটির চোখে কালো গগ্‌ল্‌স, কোলে খোলা বই।

—হাঁ, এদিকে একটু সরে আসুন, তা হলেই হবে। ইয়েস—থ্যাঙ্ক ইউ।

আতঙ্কভরে সিদ্ধার্থ নিজের খাতায় মাথা নামাল। ইনভিজিলেটারের দিকে তাকাতে তার সাহস হচ্ছে না। যেন ওই ছেলেটার অপরাধের পাপ তাকেও স্পর্শ করেছে। প্রাণপণে দ্রুতবেগে সে লিখে যেতে লাগল।

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার ঘরের স্তব্ধতা খান খান করে দিলে। হাঁ—সলিলই বটে। এক হাতে পেট চেপে ধরে সে ডেস্কের ওপর মাথা কুটছে পাগলের মতো : পেট গেল স্যার—পেট গেল!

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়ালো। রুম-ইনচার্জ ধমক দিলেন : দিস্ ইজ নো কনসার্ন অব ইয়োরস্। গো অন রাইটিং।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার নিজের জায়গায় বসে পড়ল সে। ফাঁকা চোখ মেলে দেখতে লাগল : সবাই যখন সলিলকে তুলে নিয়ে গেল, তখনো সে দু'হাতে পেট চেপে ধরে কুঁজো হয়ে চলেছে, মুখ দিয়ে ফেনা নামছে তার—গোঁঙাতে গোঁঙাতে বলছে—পেট গেল স্যার, পেট গেল!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ছেলেরা আবার লিখতে লাগল। পেছনের গগ্‌ল্‌স্‌পরা ছেলেটি নির্ভয়ে উল্টে চলল কোলের বইখানার পাতার পরে পাতা। আর সিদ্ধার্থের চোখের সামনে সারা ঘরখানা নিরবয়ব হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল খানিকটা কুয়াশার মতো।

কিন্তু 'দিস্ ইজ নো কন্‌সার্ন অব ইয়োরস্!' হাঁ, পাস তাকে করতেই হবে। সলিলের জন্যে ভাবতে গিয়ে একটি মুহূর্ত অপচয় করাও নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা! কাঁপা হাতে

কলম তুলে নিয়ে সে লিখতে লাগল : ইন এ শেক্সপীরিয়ান ট্র্যাজেডি, উই অলওয়েজ ফাইণ্ড—

পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, সেদিন সে জানতে পারল সলিল মারা গেছে।

মারা গেছে ইনটেস্টাইন্যাল অবস্ট্রাকশনে। অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, শরীরের ওপর অত্যাচার—

একবার শ্মশানে যাওয়ার মতো উৎসাহও খুঁজে পেল না সিদ্ধার্থ। শুধু বিকেলের মৃত ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখতে লাগল সেটা সে-ই জানে।

* * * *

পরীক্ষার আড়াই মাস পরে যেদিন মা'র মুখ দিয়ে প্রথম এক ঝলক রক্ত উছলে উঠল, সেদিনই দুটো খবর পাওয়া গেল একসঙ্গে। পেছনের সেই গগ্‌ল্‌স্‌পরা ছেলেটি বেরিয়ে গেছে ডিস্টিংশনে আর মাত্র দু'নম্বরের জন্যে ইংরেজিতে ফেল করেছে সিদ্ধার্থ।

হাত

—খুব বেঁচে গেছেন—আমরা অভিনন্দন জানালাম ওঁকে।

—বেঁচে গেছি, তাই নয়?—কেমন অশোভন ভাবে হাসলেন ভদ্রলোক। ঘরের আলোটা ওর কপালের ওপর এমন ভাবে চকচক করে উঠল যেন মাথাটাকে মনে হল মড়ার খুলি। বসে যাওয়া চোখ দুটোকে ভালো করে দেখতে পাওয়া গেল না—যেন দুটো কালো কোটর শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। কেন বলতে পারব না, আমার গা-ছমছম করে উঠল।

—বেঁচে গেছি—তাই বটে।—নিজেই পুনরুক্তি করলেন ভদ্রলোক : কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার কোনো দরকার ছিল না।

—সে কি!—একজনের সবিস্ময় উক্তি।

—আমার এই যে ডান পা-টা দেখছেন—ভদ্রলোক শুরু করলেন : উরুর তলা থেকেই এটা কাটা। ফ্লেক্সিব্‌ল লেগ্‌ ব্যবহার করছি। বাঁ হাতের তিনটে আঙুল নেই। ঘাড়ের একটু ওপরে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি চওড়া কাটা দাগটা কখনো মিলাবে না। কিন্তু এগুলো খুব বড় ক্ষতি নয়। এর চাইতেও অনেক বেশি বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে মানুষ বাঁচে—ভালো করেই বাঁচে। কিন্তু,—ভদ্রলোক একটু থামলেন : তা হলে ব্যাপারটা আপনাদের খুলে বলতে হয়। ধৈর্য থাকবে? আমাদের ঘরোয়া একটা সাহিত্যিক বৈঠকে কোথা থেকে রবাহূত হয়ে জুটেছিলেন ভদ্রলোক। প্রথম প্রথম আমাদের- অস্বস্তি লাগছিল—কারণ সাহিত্য-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যে সব বাড়তি টিপ্পনীগুলো থাকে সেগুলো বাইরের কারু

পক্ষে শ্রাব্য নয়। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল রবাহূতটি আমাদের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। বিদেশী সাহিত্যে ওঁর বেশ অধিকার আছে, বাংলা সাহিত্যেরও একজন রসিক পাঠক। আলোচনার ভেতরে নিজেকে কখন উনি জুড়ে দিয়েছেন টেরও পাইনি আমরা।

যেমন হয়, সাহিত্য-আলোচনা ক্লান্তিকর হয়ে উঠল একটু পরেই। প্রায় একসঙ্গেই আমরা ওঠবার কথা ভাবছিলাম। এমন সময় কথায় কথায় ভদ্রলোক বললেন, কিছুদিন আগেকার মর্মান্তিক পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনার সময় উনিও ছিলেন সেই ট্রেনের যাত্রী। তারপর থেকেই উনি সভার নায়ক হয়ে উঠেছিলেন।

ওঁর শেষ কথাটায় আমরা ওঁর দিকে তাকালাম। গল্প শোনবার লোভ আছে অথচ রাতও প্রায় নটার কাছাকাছি। সভাপতি নারায়ণ চৌধুরী নিরীহ ভদ্র মানুষ, একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, নরেনবাবুর আবার দেরি হয়ে যাবে না?

সমস্যাটা এড়াবার জন্যে তাকেই সামনে টেনে আনাতে শান্ত স্তিমিত নরেন মিত্তির মনে মনে চটল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু লেখক হিসাবে খ্যাতি যতই থাক এবং বাড়ি ফেরার তাগিদটা যতই প্রবল হোক, নার্ভাস হয়ে নরেন বলে ফেলল, তা আধ ঘণ্টা পরে গেলেও চলবে।

নীরেন চক্রবর্তী আর শান্তিরঞ্জন বাঁড়ুয্যে একটা সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল। অনিল চক্রবর্তী সম্পাদকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে ঢাকাই ভাষায় একটা ধমক দিলে, লোকের সামনে বাইচলামি করস ক্যান? ভদ্রলোক ভাব্‌বো কী!

মাঝখান থেকে ছোঁ মেরে সিগারেটের প্যাকেটটা দখল করল সন্তোষ ঘোষ। কৌতুক-ভরা অভ্যস্ত হাসিতে বললে, এটা এখন আমার জিম্মায় রইল। সবচেয়ে বেশি ধৈর্য ধরে গল্পটা যে শুনবে এ তার পুরস্কার।

ভদ্রলোক বললেন, তা হলে বরং—

নরেন বললে, না না, তা কেন? কৌতূহল যখন সৃষ্টি করেছেন তখন সেটাকে মিটিয়েই যান।

ইতিমধ্যে শান্তি বাঁড়ুজ্যে একটা চিমটি কাটছিল নীরেন চক্রবর্তীকে।

নারায়ণ চৌধুরী বললেন, অর্ডার অর্ডার।

কিন্তু হালকা আবহাওয়াটা এক মুহূর্তে বদলে গেল যখন ভদ্রলোক আবার চোখ তুলে তাকালেন। আবার ঘরের আলোটা ওঁর কপালের ওপর পড়ল, চোখ দুটোকে আবার দুটো অন্ধকার গভীর গর্তের মতো দেখালো। হঠাৎ ইচ্ছে হল উঠে আলোটাকে নিবিয়ে দিই আমি। লোকটা মুখ তুলে তাকালেই একটা কঙ্কালের মাথা বলে মনে হয় কেন কে বলবে!

আমি জোর করেই দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলাম ওঁর ওপর থেকে। দেওয়ালের গায়ে একটা মোটা টিকটিকি যেখানে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে একরাশ দেওয়ালী পোকার দিকে, মনোনিবেশ করলাম তার ওপর।

ভদ্রলোক তখন গল্প শুরু করলেন।

অনেক রকম গলা শুনেছি মানুষের—কিন্তু এ একেবারে আলাদা। ভরাট, গম্ভীর, শেষের দিকে একটু কাঁপা—যেন ওঁর স্বরযন্ত্রের ট্রেমোলার চাবিটা খোলা আছে। কথার মাঝখানে গলাটাকে হঠাৎ নামিয়ে আনেন—গোপন কথার মতো ফিসফিস করে বলে যান খানিকক্ষণ, যেন দমে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। ইলেক্‌ট্রিকের সেই বিচিত্র আলোয়, সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে ভদ্রলোক যেন ঘরের ভেতর একটা ভূতুড়ে আবহাওয়া ঘনিয়ে আনলেন।

দেওয়ালের টিকটিকিটার জ্বলন্ত চোখের দিকে চোখ রেখে গল্প শুনে যেতে লাগলাম।

পাঁচ বার্থের কামরা। আমি ডান দিকের 'আপার' বার্থে জায়গা পেয়েছিলাম। সাধারণত ওপরে শুয়ে আমার ঘুম আসে না। ছাদটা বড় বেশি বুকের কাছে এসে লাগে, আলোটা অতিরিক্ত পরিমাণে জেগে থাকে চোখের কাছাকাছি। মনে হয় বাইরের এত ফাঁকা, এত বাতাসের মধ্যে দিয়ে যখন ট্রেনটা ছুটে চলেছে সেই মুহূর্তে আমি একটা কফিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে আছি।

ওপাশের দু'খানি বার্থে দু'জন পাঞ্জাবী—দুই সর্দা। ভাই অথবা বন্ধু বুঝতে পারলাম না। আমার নীচের বার্থে আছেন একজন প্রৌঢ় বাঙালী, দামী স্যুট পরা, খুব সম্ভব বড় চাকরি করেন; মাঝের বার্থে তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলাকে সুন্দরী বললে কম বলা হয়; অমন নিখুঁত গড়ন, অত উজ্জ্বল চোখ, অমন সুন্দর হাসি খুব বেশি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বাঁ হাতের অনামিকায় একটি আংটি, খুব বড় আংটি। মিনে করা লম্বা পাতটা রঙিন্ নথ পর্যন্ত এসে ছুঁয়েছে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে বয়সের ব্যবধানটা যেন একটু বেশি। খুব সম্ভব দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। কিন্তু নাও হতে পারে। স্বাস্থ্য এবং রূপ থাকলে একটা বিশেষ বয়সের পর মেয়েরা অনন্ত যৌবনের মুখোশ টেনে বহুদিন আত্মগোপন করে থাকে। আরো উচ্চবিত্ত ঘরে যাঁদের রূপচর্চার সুযোগ কিংবা অবকাশ আছে, তাঁরা পাউডারের প্রলেপে আর রঙের কারিকুরিতে অনেকদিন পর্যন্ত বলিরেখাকে বশীভূত করে রাখতে পারেন।

অতএব বার্থের ওপর থেকে আমার আধবোজা চোখ থেকে-থেকেই ভদ্রমহিলার দিকে গিয়ে পড়ছিল। আর প্রতিবারেই ওই অস্বাভাবিক দীর্ঘ আংটিটা থেকে এক একটা ঝলক

এসে আমার চোখে কেমন একটা খোঁচা মারছিল। মনে হচ্ছিল ওই আংটিটায় একটা ছোরার ফলা যেন ওঁর রূপের প্রহরী হয়ে আছে।

আপার ক্লাস গাড়িতে সহযাত্রীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আত্মকেন্দ্রিক হয়। 'কতদূর যাবেন' কিংবা 'দিল্লীতে আজকাল কি রকম শীত'—এর বেশি এগোতে চায় না আলাপটা। প্রত্যেকেই কিছুক্ষণ পরেই নিজের সীমার মধ্যে এসে সংকুচিত হয়ে যায়। অভিজাত ট্রেন-গুলোতে ইণ্টার ক্লাসের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের পার্থক্যটা শুধু ভাড়ার নয়—মনেরও।

সুতরাং পাঞ্জাবী দুজন কিছুক্ষণ পরেই দুখানা র‍্যাগ টেনে নিয়ে নিদ্রামগ্ন হলেন। নিচের দম্পতি চা আনালেন, টিফিন বাস্কেট থেকে বের করলেন কমলালেবু আর স্যাণ্ডউইচ। সংক্ষেপেই আহার-পর্ব শেষ হল, তারপর ভদ্রলোক ট্রাউজারের পকেট থেকে টেনে আনলেন একখানা হোয়াইট সার্কল ক্রাইম ক্লাবের বই আর ভদ্রমহিলা মনঃসংযোগ করলেন সচিত্র আমেরিকান সাপ্তাহিকে। আমার নিচের বার্থে দৃষ্টির আড়ালে তলিয়ে গেলেন ভদ্রলোক—শুধু মেজেতে একজোড়া ভারী ব্রাউন রঙের জুতো তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা করতে লাগল।

পৃথিবীতে এখন আমরা রইলাম শুধু দুজন। ওপরের বার্থে আমি—মাঝের বার্থে ভদ্রমহিলা।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হু হু করে ছুটল পাঞ্জাব মেল। অস্বস্তিভরা দুলুনি আর চোখে আলোর তীক্ষ্ণ খোঁচায় হালকা কুয়াশার মতো জমে ওঠা লঘু তন্দ্রাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল বার বার। আর তারি ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে দেখতে লাগলাম প্রতি বারে পাতা ওলটানোর সঙ্গে ললিত আঙুলের মিনে করা আংটিটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মতোই ঝিকমিক করে উঠছে।

ঘুম যখন বারে বারে এমনি ভাবে এসে এসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় আর চোখ মেললেই যখন দৃষ্টি অমন একটি সহযাত্রিণীর ওপর গিয়ে পড়ে, তখন উত্তেজিত স্নায়ুগুলো আপনা-আপনিই একটা স্বপ্নের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায়। আমারও তাই হল। আমি ইন্সিয়োরেন্সের চাকুরে, টি. এ.-তে সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ি, সাধারণভাবে নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক লোক। কিন্তু আপাতত কোম্পানির প্রস্‌পেক্‌টাস, গত কয়েক বৎসরে তার নিদারুণ উন্নতির ইতিহাস এবং পার্টি বাগাবার জন্যে অভ্যস্ত বাঁধা বক্তৃতা আমার মন থেকে একেবারে মুছে গেল। আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। ওই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকদের দাড়ির প্রভাবেই কিনা বলতে পারি না, আমার চারিদিকে বেশ একটা মোগলাই স্বপ্ন ঘনিয়ে এল।

আচ্ছন্ন চোখের সামনে সহযাত্রিণী মোগল অন্তঃপুরের রূপসী হয়ে দেখা দিলেন; মিলিয়ে গেল পরনের লাল শাড়ি—দেখা দিল ওড়না আর ঘাঘরা। মনে হল চারদিকের

চক্রান্ত আর ঈর্ষার বেড়াজালের ভেতর দিয়ে কোনো ইরানী বেগম এগিয়ে চলেছেন আগ্রা ফোর্টের ভূগর্ভপথ বেয়ে যমুনার দিকে। চোখে আগুন, ছোরায় রক্তমাখা; এইমাত্র খুশ-বাগের কোনো গোলাপগুচ্ছের তলে বাদশাজাদার বুকের রক্ত অঝোরে ঝরে পড়ছে; হত্যার সাক্ষী এই ছোরাকে যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে বেগম ফিরে আসবেন—

স্বপ্নটা আরো কতদূর এগিয়েছিল মনে নেই। তারপরেই যেন একটা বিরাট বিস্ফোরণে রেণু রেণু হয়ে মিলিয়ে গেল আগ্রা ফোর্ট। এক ধাক্কায় কে আমাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে—মাথার ওপর পড়ল অতিকায় একটা হাতুড়ির আঘাত—মনে হল বিশাল দুর্গের একটা বিরাট গম্বুজ চুরমার হয়ে আমার ওপরে নেমে এল। অবিশ্রান্ত শব্দ আর আর্ত চিৎকারে একটা ঘূর্ণি মুহূর্তের জন্য জেগে উঠেই অসীম স্তব্ধতায় ডুব মারল।

কখন ঘোর ভাঙল জানি না। জাগলাম অসহ্য যন্ত্রণার চমকে। মনে হল ডান পা-টাকে কে একখানা ভারী করাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে চলেছে। বাঁ হাতের তালুতে একটা পেরেক ঠুকে কেউ কোনো দেওয়ালের সঙ্গে শক্ত করে এঁটে দিয়েছে আর ভারী একখানা পাথর দিয়ে চেপে ধরে পিষে দিচ্ছে আঙুলগুলোকে। ঘাড়ের নিচে একরাশ জমাট আঠা, তার ভেতরে কতকগুলো আলপিন—একসঙ্গে খচ্ খচ্ করে বিঁধছে।

চেতনাটা কিছুক্ষণ ধরে বোবা হয়ে রইল। মনে করতে পারলাম না—আমি কে, আমি কোথায়। তারপরেই পায়ের আর হাতের যন্ত্রণার আঘাতে স্মৃতিটা একটু একটু করে কাছে ফিরে এল—পাঞ্জাব মেলের এক সেকেণ্ড ক্লাসের আপার বার্থে চড়ে আমি জলন্ধরে রওনা হয়েছিলাম।

তারপরে?

চোখের সামনে অন্তহীন অন্ধকার। যন্ত্রণায় সারা শরীরের মাংস কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসছে। পিঠের তলায় একটা তীক্ষ্ণ কঠিন শয্যা, বুকের ওপর একরাশ গুরুভার—জোরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত টানতে পারছি না যেন।

তা হলে?

এক মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে গেল। স্পষ্ট হয়ে গেল মাথার ওপর আগ্রা ফোর্টের অতিকায় গম্বুজ সশব্দে ভেঙে পড়বার রহস্য। পাঞ্জাব মেলে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। আর আমি তার অন্যতম ভিক্‌টিম্।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছে প্রথম প্রশ্ন জাগল: আমি কি বেঁচে আছি তা হলে? পরলোক বিশ্বাস করিনি, আজ মনে হল ট্রেন-দুর্ঘটনায় আমি মরে গেছি—আমার চেতনাটা প্রেতাত্মা হয়ে যন্ত্রণাভরা মৃত্যুর মধ্যে জেগে আছে। এক মুহূর্তে পাঞ্জাব মেলের একটা সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ থেকে নিজের সমস্ত পরিচয়—সমস্ত অস্তিত্বের সীমা পার হয়ে অনুভূতিময় শূন্যতায় মাথা এসে পৌঁছেছি আমি।

কিন্তু মৃত্যু ? সে তো শুনেছি সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার শেষ। তারপরে তো শরীরটার এমন ভয়ঙ্কর উপস্থিতি থাকবার কথা নয়। শরীর আছে—অসহ্য ভাবেই আছে। বাঁ হাতের আঙুল থেকে যন্ত্রণাটা কাঁধ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে—মনে হচ্ছে একটু পরে তা হৃৎপিণ্ডে এসে সেটাকেও অসাড় করে দেবে। ঘাড়ের তলায় কে যেন ফোঁটায় ফোঁটায় ঢেলে দিচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড। ডান পায়ের ওপর দিয়ে সমানে চলেছে একটা অন্ধকার করাতের রাশি রাশি ধারালো দাঁত।

দমচাপা বুকের ভেতর থেকে কী একটা বেরিয়ে এল গলা ঠেলে। আর্তনাদ ? তাই হবে। কিন্তু নিজের গোঙানিতে নিজেই আমি চমকে উঠলাম। মনে হল আমার বুকের ভেতরে যেন দ্বিতীয় একজন কাউকে গলা টিপে মেরে ফেলা হচ্ছে—এ যেন তারই অস্তিত্ব কাকুতি !

আমি তাহলে বেঁচে আছি ? অনুভূতির প্রান্তে প্রান্তে এক একটা ইলেক্‌ট্রিক বাল্বের মতো সত্যটা জ্বলে উঠতে লাগল। কিন্তু আমার হাতে-পায়ে মাথায়-বুকে পাঞ্জাব মেলের ধ্বংসস্তূপ—তার ভেতরে আমি সমাধিস্থ।

বাঁচবার জৈব-তাগিদে আবার আমি চেঁচিয়ে উঠতে চাইলাম—আবার সেই অস্বাভাবিক শব্দটা আমার সর্বাঙ্গে ভয়ের চমক বইয়ে দিলে।

এতক্ষণে চারদিকের পৃথিবীটা রূপ নিচ্ছে আমার কাছে। তার আকার নেই—পাথরের স্তূপের মতো শুধু পিণ্ডাকার অন্ধকার। কিন্তু ভাষা আছে ; সে ভাষা কান্না, গোঙানি আর চিৎকার। সমস্ত অন্ধকারটা শুধু মানুষের মর্মান্তিক যন্ত্রণার শৃঙ্খলাহীন সামঞ্জস্যহীন আর্তনাদ দিয়ে গড়া—দান্তের ইনফার্নোর একটা অন্ধকার দরজার সামনে যেন আমি দাঁড়িয়ে। সেই দরজাটা যে মুহূর্তে আমি পার হয়ে যাবো সেই মুহূর্তে একটা পৈশাচিক নাটকের যবনিকা সরে যাবে যেন।

শুধু আমি নই—আমার মতো আরো অনেকেই বেঁচে আছে। কিন্তু এই বিভীষিকা-ভরা শব্দের ঘূর্ণিজালের ভেতর—বুকের ওপর চেপে-আসা ভয়ঙ্কর মৃত্যুর এই সঞ্চারের মধ্যে অপেক্ষা করতে করতে কী ভয়ঙ্কর এই বাঁচা ! আমার নিজের কাছে যে মৃত্যু নিঃসঙ্গ একক রূপ নিয়ে আসতে পারত, তার চেহারাটা কল্পনা করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এখানে মৃত্যু এসেছে একটা সামগ্রিক রূপ নিয়ে—অসংখ্য মানুষের কান্না আর গোঙানি মিশে সে যেন সারা পৃথিবী অধিকার করে বসেছে ! ওই সমস্ত মানুষের সঙ্গে একটা যন্ত্রণার সমুদ্রে আমি ভেসে চলেছি !

অসহ্য—এ অসহ্য ! সকলের কাছ থেকে নিজের মৃত্যুকে আমি কি বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারি না ? আনতে পারি না ব্যক্তিগত করে ? যেখানে ধীরে ধীরে তার ছোঁয়ায় আমার দেহ-মন অসাড় হয়ে যাবে—একটা নিবিড় শান্তির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারব আমি ?

ওই কান্না—ওই আর্তনাদ—আমাকে পাগল করে দেবে। মৃত্যুকে আমার মধ্যে এসে ঘুমিয়ে পড়তে দেবে না—সারারাত, সারারাত তাকে জাগিয়ে রাখবে। আমার হাত, আমার পা, আমার ঘাড়, আমার দমচাপা বুক দুঃসহ থেকে দুসহতর মুহূর্তগুলোকে নিষ্ঠুর আনন্দে আস্বাদন করতে থাকবে।

আর একবার চিৎকার করে উঠেই আমি থেমে গেলাম। কোনো লাভ নেই—কেউ শুনবে না। কেউ বাঁচাতে পারবে না কাউকে। প্রত্যেকে শুধু পরস্পরের যন্ত্রণাকে বাড়িয়েই চলবে, একে আর একজনের বিভীষিকাকে আরো—আরো বীভৎস করে তুলবে!

আমি মরে যেতে চাইলাম। একা—নিঃসঙ্গ—একান্ত করে মরে যেতে চাইলাম। এমনভাবে সারা প্রাণ দিয়ে কখনো মৃত্যু কামনা করিনি আমি। কিন্তু মরবার উপায় নেই। হাত দুটোকে নাড়তে পারছি না যে নিজের গলা নিজেই টিপে ধরব। পকেটে একটা পেন-নাইফ্ ছিল মনে পড়ছে—সেটাকে টেনে আনতে পারলেও সোজা হৃৎপিণ্ডের ওপর বসিয়ে দেওয়া চলত!

শুধু হাত-পা নয়, প্রতিটি প্রাণকোষ পর্যন্ত এতক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে আমার। মাথার প্রত্যেকটা চুল পর্যন্ত যেন মৃত্যুকে অনুভব করছে।

একটা বিদ্যুতের স্পর্শ চকিতে বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে। এতক্ষণ টের পাইনি, এবার আচমকা খেয়াল হল আমার গায়ে কার একখানা হাত এসে পড়েছে আলতো ভাবে—এলিয়ে আছে গলার ওপর।

ভয়ের কাঁপুনিটাকে সামলে নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে তুমি? কে আছো আমার পাশে?

উত্তর এল না।

—তুমি কি বেঁচে আছো?

আবার জানতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কান্না আর গোঙানিকে চাপা দিয়ে কোথায় একটা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেল। যেন শুনতে পেলাম, ফিস্‌ফিসে গলায় কে বললে, আছি—আছি!—কে তুমি? কে—?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার দরকার ছিল না। শরীরের প্রত্যেকটি রোমকূপ অবধি অনুভূতিতে একাগ্র হয়ে উত্তর খুঁজছিল। সে উত্তর এল এইবারে। সে হাতে একটা আংটি আছে—লম্বা পাতের মতো আংটি!

স্বাভাবিক সংস্কারবশে আমি তৎক্ষণাৎ সরে যেতে চাইলাম—কিন্তু এক তিল নড়তে পারলাম না। সেই সহযাত্রিণী। কিছুক্ষণ—ঠিক কতক্ষণ আগে জানি না—ওপরের বার্থে শুয়ে শুয়ে যে অপরিচিতা যাত্রাসঙ্গিনীর দিকে ঘুমভরা আবিষ্ট দৃষ্টি ফেলে ফেলে মোগলাই স্বপ্ন আমি রচনা করছিলাম!

কেমন করে হল জানি না—শরীরের যা কিছু যন্ত্রণা, যা কিছু বোধ—মুহূর্তের মধ্যে ওই হাত আর আংটিতে গিয়ে কেন্দ্রিত হল। একান্ত অপরাধী আর অনধিকারীর মতো মোগল অন্তঃপুরের ইরানী বেগমের বড় বেশি কাছাকাছি গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি—! হাতের আংটিটা ছোরার ফলার মতো মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার অধিকারের সীমা, একটু অসতর্ক হলেই গলার মাংসের ভেতর বাঁটসুদ্ধ বিঁধে যাবে! প্রহরী!

সভয়ে বলতে চাইলাম, ক্ষমা করবেন, আমি সরতে পারছি না।

বাইরে কোথাও হাওয়া উঠেছে এখন। দমকার পর দমকা উঠে এক একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মতো সমস্ত কান্না-কাকুতিকে তলিয়ে দিচ্ছে। যেন হাওয়ার মধ্যে আবার সেই স্পষ্ট ফিস্‌ফিসে স্বর শোনা গেল : কী হয়েছে তাতে?

আর একবার নিজের যন্ত্রণা-অসাড় শরীরটাকে সরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম আমি। দাঁতে দাঁত চেপে বলতে চাইলাম : কিন্তু আপনার স্বামী—

হাওয়ার বেগটা অশান্ত হয়ে উঠছে এখন। চারদিকে গোঙানির ওপরে একটা হিংস্র তর্জনের মতো বয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কি জল আছে? তারি কলধ্বনি কি জেগে উঠছে বাতাসে? না, মেয়েটিই চাপা মৃদু গলায় খিলখিল করে হাসছে? ভাবছে এই বীভৎস পরিবেশে এ এক বিচিত্র কৌতুক? আংটিটা আমার গলার ওপর যেন কেটে বসছে—যেন বিঁধে যাচ্ছে মাংসের মধ্যে। ছোরা! সভয়ে বললাম, সরিয়ে নিন্ না হাতটা!

আবার হাওয়ায় হাওয়ায় ফিস্‌ফিসে স্বর—আবার খিলখিল হাসির মতো কোথাও জলের শব্দ। এবার যন্ত্রণা নয়—ব্যথা নয়, একটা সম্পূর্ণ নতুন শিহরণ বয়ে গেল আমার গায়ের ভেতর দিয়ে।

—থাক্ না।

—কিন্তু—

আমার সমস্ত বোধ কি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে? আমার কি নেশা ধরছে? থাকুক ছোরা—থাকুক নিষেধ—তবু, তবু! কিছু স্পর্শ, কিছু স্মৃতি! যন্ত্রণার এই ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মধ্যেও একটা আশ্চর্য আনন্দ—একটা নিষিদ্ধ উন্মাদনা!

বাইরে এখন শুধু হাওয়া—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে ঝড় উঠেছে এখন। এতক্ষণ ধরে একরাশ শিকার নিয়ে খেলা করবার পর যেন মৃত্যু এখন একটা সিংহের মতো তাদের ওপর থাবা পেতে বসেছে, ফেলছে ক্লান্তির বড় বড় দীর্ঘশ্বাস! ডান পায়ে সমানে করাত চলছে—যন্ত্রণার অবিশ্রাম প্রবাহে বাঁ হাতটা যেন বৈদ্যুতিত। ঘাড়ের তলায় নাইট্রিক অ্যাসিড্ ঢালবার পৈশাচিক আনন্দসম্ভোগের পর্বটা এখনো শেষ হয়নি!

তবু—তবু!

আমি বিকারের ঘোরে যেন জানতে চাইলাম : আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ?

হাওয়ার মধ্যে যেন তেমনি ফিস্‌ফিসে স্বর শুনতে পেলাম : না। বেশ লাগছে। আপনার ?

হাতের স্পর্শ আর ছোরার ধারের বেদনাভরা রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে আমি বললাম, এতক্ষণ কষ্ট হচ্ছিল—এইবার ভালো লাগছে।

—ওঃ!—ঝড়ের মতো হাওয়ায় কার একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস যেন মিলিয়ে গেল। যেন কোনো বুকফাটা বঞ্চনার প্রকাশ—কোনো রিক্ততার স্বীকৃতি।

মৃত্যুর রাত—দুঃস্বপ্নের রাত। প্রতি রোমকূপে যন্ত্রণার চমক। পাঞ্জাব মেলের ধ্বংস-স্তূপের ভেতর পড়ে আত্মহত্যার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলাম। তার ভেতর এ কোন্ বিস্ময় এসে দেখা দিল! ওই হাত—ওই ছুরি! হাতের ওই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা যদি গলার মধ্যে বিঁধে গিয়ে আমার শ্বাসনলীটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলে—তার চাইতে বড় কিছু আর আমার চাইবার নেই এখন!

বিকারের ঘোরে, যন্ত্রণার নেশায়, আফিমের বিষাক্ত তন্দ্রায় ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মনে থাকবে এই রাতের কথা? আপনি এই রাতকে কোনো দিন ভুলবেন না?

বাইরের হাওয়া এবার প্রবল শব্দে গর্জন করে উঠল। কোথাও কি জলে তরঙ্গ উঠল সমুদ্রের দোলার মতো? আর, আর আকস্মিক ভাবে সেই চাপা হাসিটা এবার উচ্ছ্বলিত তীক্ষ্ণতায় দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল! সে হাসির নিষ্ঠুর বীভৎসতা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই!

মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে আমি সবল হয়ে উঠলাম—আমার গলার মধ্যে বেঁধা ছোরাটাকে বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গেলাম প্রাণপণে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মুঠোর মধ্যে আংটিপরা হাতখানা উঠে এল। বুঝলাম—সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম—মণিবন্ধের পরে সে হাতে আর কিছুই নেই, শুধু একতাল ছিন্ন মাংস!

যন্ত্রণা—মৃত্যু—মেল দুর্ঘটনা—ঝড়—কালো রাত! সব কিছু একসঙ্গে একটা টাই-ফুনের তরঙ্গের মতো আমার মস্তিষ্কে আছড়ে পড়ে প্রলয় গতিতে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল! শুধু শেষবারের মতো টের পেলাম, কাটা হাতটা আমার বুকের ওপর খসে পড়ল—কোনো পিশাচের হিমশীতল থাবার মতো!

ভদ্রলোক গল্পটা শেষ করলেন। শুক্তকের মতো শব্দ করে শ্বাস টানলেন একটা : সেই থেকে রাত্রে ঘুমুতে পারি না। সেই হাতটা যেন গলার ওপর এসে পড়ে। আচমকা কেউ কাঁধে হাত রাখলে ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায়। কাছে স্ত্রীকে পর্যন্ত শুতে দিই না, পাছে

কোনো ফাঁকে তাঁর হাতের ছোঁয়া লেগে আমি সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার নরকে ফিরে যাই!

আমরা যে যেখানে ছিলাম—ঠিক তেমনি করেই বসে রইলাম। স্তব্ধতা ভাঙল প্রায় দশ মিনিট পরে—নরেন মিস্তিরের অসন্তুষ্ট গুঞ্জনে।

—এখন আর বাস পাওয়া যাবে না—এত রাত্তিরে হেঁটে যেতে হবে সেই বেনিয়া-পুকুর!

ঘাসবন

হাতের লম্বা লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে দিলে সামনের দিকে; তারপর সেই অবস্থাতেই একটা লাফ দিলে শ্যামলাল। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির মাথা আর শরীরটার একটা নির্ভুল সমকোণ রচনা করে শূন্যে উড়ন্ত একটা পাখীর মতো ছোট নালাটা সে পার হয়ে গেল। লাঠির নিচেটা গিয়ে পড়েছিল জলের-মধ্যে, সেটাকে তুলে নিতে বেশি সময় লাগল না।

কোমর সমান নরম ঘাসের ভেতর দাঁড়িয়ে সে উৎকর্ণ ভাবে তাকাতে লাগল চার-দিকে। হাতের একটা মুঠোকে চোঙার মতো গোল করে ধরলে চোখের সামনে, যেন ওতে আরো বেশি করে দেখতে পাবে। কিন্তু দিগ্‌দিগন্তজোড়া ঘন শ্যামল ঘাসবনের মধ্যে কোথাও দেখা গেল না আকাশের কোণে আঁকা গাঢ় নীলরঙা তিন পাহাড়ের রেখার মতো একটা পিঠের আভাস কিংবা শিংওয়ালা অতিকায় মাথাটা।

একটু দূরেই সবুজ তৃণপ্রান্তরের মাঝখানে আকস্মিক ব্যতিক্রমের মতো খানিকটা রাঙা মাটির জাঙাল বিকীর্ণ হয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কেউ যেন মস্ত উঁচু করে একটা রাস্তা তৈরি করতে চেয়েছিল এখানে, কিন্তু যে কারণেই হোক তার ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ হয়নি। প্রাকৃতিক হোক আর ভুলে যাওয়া কোনো মানুষের হাতের কাজেই হোক, এখন ওর নাম ভূতের জাঙাল। কঠিন লাল মাটি—ছোট বড় অসংখ্য কাঁকরে একেবারে বোঝাই। কেউ যেন আগুনে পুড়িয়ে মাটিটাকে লোহার মতো শক্ত আর নীরস করে দিয়েছে; তাই গোটা দুই শিমুল ছাড়া আর কিছু গাছ-গাছালি গজাতে পারেনি, হা হা করছে স্তাড়া জাঙাল। শুধু সর্বাঙ্গে জ্বালার হিংস্রতম সাপ আলাদ গোখুরের ফোকর নিয়ে পড়ে আছে অতিকায় একটা কঙ্কালের মতো—আর তারই চারপাশে সবুজের ঐশ্বর্য ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলা খাচ্ছে।

কপাল কুঁচকে একবার জাঙালটার দিকে তাকাল শ্যামলাল। উঠবে নাকি ওর ওপরে? সুবিধে হয় তাহলে, চারদিকের অনেকটা ভালো করে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু উঠতেও ভরসা হয় না। সবাই জানে। জাঙালটা গোখরো সাপের আস্তানা, তাদের ভয়ে একটা শেয়াল পর্যন্ত এগোয় না জাঙালের দিকে।

শেয়াল না হয় এগোয় না, কিন্তু আপাতত যা দেখা যাচ্ছে, না এগিয়ে উপায় নেই শ্যামলালের। চোখ গিয়ে পড়ল মাঠের ওপারে প্রান্তরেখায়। সেখানে ম্লান হয়ে আসছে সূর্য। ছাড়া ছাড়া মেঘে রক্তাভ দীপ্তি। আর বেশি দেরি নেই। দেখতে দেখতে ধাঁ করে নেমে যাবে বেলাটা। তারপর মাঠের ওপরে ঘনাবে আলেয়া-জ্বলা কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। সে অন্ধকারে এই মাঠকে ভয় করতে থাকবে শ্যামলালের, নিজের লাঠির ওপরেও তার বিশ্বাস থাকবে না।

তবে আপাতত আকাশে সূর্য জেগে আছে এবং আস্থা আছে লাঠিখানার ওপরে। একবার চোখাচোখি হয়ে গেলে যত জাঁদরেল আলাদ গোখুরই হোক, তাকে আর ট্যাঁ ফোঁ করতে হবে না। অলক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্ভাবনা কল্পনা করতেই কাঁধের পেশীগুলো ফুলে উঠল শ্যামলালের, নিচের ঠোঁটটাকে একবার সে শক্ত করে চেপে ধরলে দাঁত দিয়ে। তারপর নির্ভীক পায়ে এগিয়ে চলল জাঙ্গালের উদ্দেশে। ওর ওপর থেকে ভাল করে চারদিকটা একবার দেখে নেওয়া দরকার।

সন্তর্পণে মাটির দিকে চোখ রেখে শ্যামলাল উঠল জাঙ্গালে। কাঁকর গাঁথা শক্ত মাটির গা দিয়ে বর্ষার জল গড়িয়ে গড়িয়ে নামে, তাই তার সর্বাঙ্গে কতকগুলো খাঁজের মতো সৃষ্টি হয়েছে। সেই খাঁজের ভেতরে লাঠি ফেলে ফেলে শ্যামলাল উঠতে লাগল।

একটা শিমুল গাছের নিচে এসে সে দাঁড়ালো। তলায় মসৃণ তকতকে মাটি। যেন যত্ন করে নিকিয়ে রাখা, দুটি-চারটি শিমুলের ঝরা পাতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে আর যাই থাক, ফস করে সাপে এসে ছোবল মারতে পারবে না।

চারদিকে তাকাতে একটা আশ্চর্য আর অপরূপ পৃথিবী ধরা দিল শ্যামলালের চোখে। সবুজ আর সবুজ। ধান নয়, ঘাস। বর্ষার জল নেমে গেছে জলা থেকে, নরম মাটির ওপরে স্তবকে স্তবকে গুচ্ছে গুচ্ছে ঘন সবুজ ঘাস উঠেছে, মাটিকে ঢেকে দিয়েছে। যতদূর চোখ যায়, এর আর শেষ নেই, ছেদ নেই। কোথাও ঢেউখেলানো জমি নেমে গেছে, কোথাও আস্তে আস্তে উঠে গেছে পাহাড়ের মতো অনেকখানি, মাথার ওপর হাতছানি দিচ্ছে তালের গাছ। সবুজ আর শান্ত, বিকেলের পড়ন্ত বেলা নিবিড় হয়ে আসছে, পাখ-পাখালির শব্দ নেই, শুধু বাতাসে একটা শির্ শির্ আর সোঁ সোঁ স্বনন বাজছে।

ওরই মাঝখানে সাদা সাপের মতো আঁকা-বাঁকা একটা রেখা, ডুবে আসা রোদে এখন সোনার মতো ঝলমলে। ওই নদীটা কাঞ্চন। ওর গায়ে খানকয়েক চালাঘরের আভাস, একটা লম্বা বাঁশের ওপর মহাবীরজীর লাল পতাকা। অস্ফুটস্বরে শ্যামলাল বললে, শালা!

কিন্তু মহিষটার কোনো চিহ্নই তো দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ গলা ফুলিয়ে একটা বিশ্রী আওয়াজ তুলল শ্যামলাল। তার কর্কশ আওয়াজটা চারপাশের শান্ত স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে দিলে। বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল লহরে লহরে। শিমুল গাছের মাথার ওপর থেকে ভয়ার্ত দুটো বক ডানা মেলে দিলে আকাশে।

শ্যামলাল ডাকলে : আঃ আঃ আঃ—আঃ ইঃ—।

একবার, দু'বার, তিনবার। কিন্তু দিগন্ত-বিস্তার ঘাসের বনে কোনোখানে এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। শুনতে পাওয়া গেল না পরিচিত গম্ভীর গলার মৃদু প্রত্যুত্তর। এমন তো হয় না। শ্যামলালের মন আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। বাথানের সব চাইতে দুধালো মহিষ—খোয়া গেলে সর্বনাশ। কিন্তু গেল কোথায়?

—শালা—মহিষটার বাপ-মা তুলে একটা অশ্লীল গাল দিলে শ্যামলাল। তারপরে আবার তারস্বরে ডাকলে—আঃ আঃ আঃ—

এবার ডাকটা শেষ করবার আগেই শ্যামলাল চমকে থেমে গেল। সাড়া পেয়ে গেছে; কিন্তু মহিষটার নয়। একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ—কাছাকাছি কোথায় কে যেন খিল্ খিল্ হাসিতে ভেঙে পড়ল।

পাথরের মতো শক্ত জোয়ান, বাইশ বছরের নির্ভীক গোঁয়ার মানুষটার বুকের ভেতর ধক্ করে চমক লাগল। এই নির্জন মাঠের ভেতরে এমন করে কে হাসল? সন্ধ্যা হয়ে আসছে, শ্যামলাল দাঁড়িয়ে আছে ভূতের জাঙালের ওপরে; চারদিকে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, এমন সময় কে হাসতে পারে?

সারা শরীরটা নিজের অজ্ঞাতেই শিউরে উঠল একবার। শক্ত মুঠোয় শ্যামলাল আঁকড়ে ধরলে লাঠিগাছকে। ভূত হোক, অপদেবতা হোক, বিনা যুদ্ধে কাউকে আমল দেওয়া হবে না। দু-চার ঘা লাঠি আগে হাঁকড়াতে হবে। তারপরে যা হওয়ার হোক।

আবার হাসির শব্দ শোনা গেল, খিল্ খিল্ করে মিষ্টি হাসি। একটু আগেই যে কর্কশ শব্দ তুলে সমস্ত মাঠখানাকে ভরিয়ে তুলেছিল শ্যামলাল, এর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। এ যেন শান্ত স্তব্ধ পৃথিবীকে গানে আর সুরে উল্লসিত করে দিলে। শ্যামলালের মন বললে, ভয় পাওয়ানোর হাসি এ নয়, খুশী করে তোলার, এমন হাসি আর যেই হাসুক, ভূতে হাসতে পারে না।

অনুমান নির্ভুল। এতক্ষণ দূরে দূরে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে রেখেছিল বলেই কি এত কাছের জিনিসটা দেখতে পায়নি শ্যামলাল? জাঙাল থেকে কয়েক পা এগিয়েই ঘাসবনের ভেতর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। হিন্দুস্থানী মেয়ে, কানের বড় বড় রুপোর গয়না দুটো দেখেই তা বুঝতে পারা গেল। মাথায় লাল শাড়ির ঘোমটা তোলা, কালো ছাঁচের মুখখানা সকৌতুক

মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল। তার পাশেই লট্‌পটে-কান একটা রামছাগলের মুখ চোখে পড়ছে। সেটাও যেন শ্যামলালের দিকে তাকিয়ে আছে কৌতুকভরা ভঙ্গিতে।

গোঁয়ার শ্যামলালের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত রাগে জ্বলে উঠল। মহিষটা পাওয়া যাচ্ছে না, তার জন্যে একেই মেজাজ বিগড়ে আছে, তার ওপরে এই রকম মর্মান্তিক ঠাট্টা! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়বার মতো অনুভূতি হল শ্যামলালের। তা ছাড়া আচমকা ভয় পাইয়ে মেয়েটা যে ভাবে তাকে অপদস্থ করে দিয়েছে, সেটাও ক্ষমাযোগ্য অপরাধ নয়।

হাতের লম্বা লাঠিতে ভর দিলে শ্যামলাল—শরীরটাকে আকাশে ভাসিয়ে দিলে সরল-রেখায়, তারপর মস্ত বড় একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে সোজা লাফিয়ে পড়ল ঘাসবনের ভেতরে। এসে দাঁড়ালো একেবারে মেয়েটার মুখোমুখি। ভয় পেয়ে দু পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা।

রূঢ়স্বরে শ্যামলাল হিন্দীতে বললে, এই, তুম্ কোন্ হ্যায়?

শ্যামলালের হিন্দী শুনে মেয়েটা ফিক্ করে হেসে ফেলল। গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ, পাথরে গড়া শরীর, মেজাজ সম্প্রতি বিলক্ষণ চড়া! হাতে প্রকাণ্ড একটা পাকা বাঁশের লাঠি, ইচ্ছে করলে এই নির্জন ঘাসবনের ভেতরে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে তাকে। আশ্চর্য, তবু ভয় পেল না মেয়েটা। স্বাভাবিক সংস্কারেই বোধ হয় কেমন করে জানতে পেরেছে লোকটা যত চোয়াড়ই হোক, সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ তার পক্ষে।

জবাব দিলে, আদ্‌মি হ্যায়।

আরো চটে গেল শ্যামলাল: আদ্‌মি হ্যায় সে তো হাম জানতাই হ্যায়। তুম্ যে ভূত নেহি হ্যায়, সে হাম বুঝতে পারা থা। লেকিন্ হাস্‌তা কেঁও!

আশ্চর্য বুকের পাটা মেয়েটার। বললে, হামারা খুশি।

তাজ্জব লাগল শ্যামলালের। এই এক ফোঁটা মেয়ের দুঃসাহসের পরিমাণ দেখে রাগ করতেও ভুলে গেল শ্যামলাল: জান্‌তা হ্যায়, হাম্ কৌন্?

কথাটার উপর জোর দিলে শ্যামলাল, 'কৌন্' শব্দটা উচ্চারণ করলে বেশ দরাজ কণ্ঠে। কিন্তু এবারেও মেয়েটা তাক লাগিয়ে দিলে: তুম্ ঘোষ হো।

আর রাগ করা চলে না, এবার অবাক হওয়ার পালা। হিন্দী ভুলে গিয়ে শ্যামলাল বললে, কী করে জানলে! মেয়েটা হাসতে লাগল, জবাব দিলে না।

—আর তুম্?

—ঘাটোয়ালকা লেড়কী। রুক্‌নি।

মুহূর্তে ভাবান্তর ঘটে গেল শ্যামলালের। বিস্ময়, কৌতূহল, সব কিছু মিলিয়ে গিয়ে ক্রোধে দপ্ করে জ্বলে উঠল রক্ত। তাই বলো। শত্রুর মেয়ে না হলে এমন বুকের পাটা হয়! এতক্ষণে সে কৌতুকভরা হাসিটা একটা নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিলে তার কাছে।

রাগে বেশি কথা আর বেরুতে চাইল না মুখ দিয়ে। হাতের লম্বা লাঠিটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শ্যামলাল বললে, ভাগো।

তারপর নিজেই আর অপেক্ষা করল না। লাঠির ওপর ভর দিয়ে এক লাফে উঠে পড়ল জাঙ্গালের ওপরে, আর একটা লাফে চলে গেল ওপারে। দুজনের মাঝখানে ব্যবধানের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল ভূতের জাঙ্গালটা—বাতাসে শোনা যেতে লাগল ঘাসবনের শির শির আর শোঁ শোঁ শব্দ।

পশ্চিম আকাশে তালবনের মাথার ওপর দিয়ে ডুবছে সূর্য। আর দেরি করা চলে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘাসবন ঠেলে ঠেলে এগোতে লাগল শ্যামলাল। সমস্ত ক্রোধ, বিদ্বেষ, ক্লান্তি আর হতাশ ছাপিয়েও, কী আশ্চর্য, সেই খিল্ খিল্ মিষ্টি হাসিটা অপূর্ব মাদকতার মতো ছড়িয়ে রইল তার চেতনার মধ্যে।

খেয়াঘাটের ঘাটোয়ালের ওপর জাতক্রোধ শ্যামলালের। ঘাটোয়ালকে একবার কায়দা-মতো হাতের কাছে পেলে লাঠির মুখে তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবে, পুঁতে দেবে জলার পানা আর গুঁড়ি কচুরির ভেতর, এইরকম একটা সাধু সংকল্প মনে মনে পুষে আসছে অনেকদিন থেকে। কিন্তু ঘাটোয়াল শ্যামলালের চাইতেও চালাক, সুতরাং এ পর্যন্ত সুযোগটা আর ঘটে ওঠেনি।

এই নীরব নির্জন মাঠের মাঝখানে উল্লেখযোগ্য মানুষ বলতে এরা দুজন। সুতরাং শত্রুতার চেয়ে মিত্রতা হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল বেশি। কিন্তু হয়নি।

ডুবা জলা জমি—বর্ষায় সমুদ্র। বর্ষার পরে ঘাসের জমি। সেও সমুদ্র, কিন্তু নীলচে ঘোলাজলের নয়, সবুজ ঘাসের। আদিঅন্তহীন এমন একটা গোচারণ ভূমি সারা উত্তর বাংলার কোথাও নেই। এর একপ্রান্তে ছ মাইল দূরে গ্রাম, আর একপ্রান্তে চার মাইল। মাঝখানে এই দশ মাইল জায়গা জুড়ে বিস্তীর্ণ প্রকৃতি—প্রাথমিক পৃথিবী। আর এরই ভেতরে প্রক্ষেপের মতো ঘাটোয়ালের ঘাট আর শ্যামলালের মহিষের বাথান।

চার-পাঁচ পুরুষ আগে হিন্দুস্থানী ছিল শ্যামলালেরা। কিন্তু সে কৌলীন্য আর নেই এখন। মাতৃভাষার জায়গা দখল করেছে প্রাদেশিক বাংলা, কখনো কখনো তার ভেতরে বালিয়া জেলার এক-একটা বেখাপ্পা শব্দ—উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত। পিতৃপুরুষের ভাষা আর নেই, রুচিরীতিও বদলেছে, কিন্তু বদলায়নি পেশাটা।

এই দিগ্‌বিস্তার মাঠের ভেতরে মহিষের বাথান। মহিষের সংখ্যা কম নয়, ছোট বড় বাছুরগুলো সুদ্ধ প্রায় আঠারোটি। আগে আরো ছিল, তবে দু বছর আগে মড়ক লাগাতে অনেকগুলো শেষ হয়ে গেছে। সেজন্যে শোকবোধটাও পুরনো হয়ে গেছে। আপাতত এই আঠারোটিকে নিয়েই খুশি আর পরিতৃপ্ত আছে শ্যামলাল।

প্রায় তিন মাইল এগিয়ে একটা উঁচু টিলার ওপরে শ্যামলালের ঘর, চাকরদের আস্তানা, মহিষের গোয়াল। আপনার বলতে কেউ নেই, একান্তভাবে একা। কিন্তু ক্ষোভ নেই এই একাকিত্ববোধের জন্যে, বেদনাও নেই। এই মহিষগুলোকে নিয়েই তার দিন কাটে। বড় ভালো লাগে অতিকায় চেহারার অবোলা প্রাণীগুলিকে। জলার ঘাস খেয়ে নধর মসৃণ দেহ তাদের তৈলাক্ত স্বাস্থ্যে চকচক করে, তাদের স্নেহস্নিগ্ধ পরিতৃপ্ত চোখগুলির দিকে তাকিয়ে ভারী তৃপ্তি বোধ হয় শ্যামলালের। মায়ের মতো আদর করে সে, মহিষগুলোর গলার নিচে হাত বুলিয়ে দেয়, আরামে চোখ বুজে আসে তাদের। এত বড় বড় বিশালকায় পশুগুলোকে শিশুর মতো অসহায় বলে বোধ হতে থাকে।

আবার বর্ষায় আর একরকম। মাঠে তখন থই থই করে জল, মহিষগুলোর স্বেচ্ছা-ভোজনের পথ বন্ধ। বছরের সঞ্চিত পোয়ালগুলো দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। কিন্তু অত বড় বড় পেট তাতে ভরে না, খড়ি-ওড়া চামড়ার নিচে দেখা যায় পাঁজরের হাড়, সারা গায়ে ডাঁশ আর এঁটুলি, পিঠের হাড়টা উঁচু হয়ে ওঠে তলোয়ারের ফলার মতো। ভারী কষ্ট হয় শ্যামলালের।

সুখে দুঃখে এমনি করে দিন কাটে। মাঝে মাঝে আসে নবীপুরের বাজার থেকে হিন্দুস্থানী ভগৎজী আর পাঁড়েজী, পাইকারী দরে ঘি কিনে নিয়ে যায়, 'ভেজিটেবল্' মিশিয়ে এক নম্বর ঘি বানিয়ে ছেড়ে দেয় বাজারে।

খোলা মাঠে, সবুজ ঘাসের জগতে দিন কাটে শ্যামলালের। ভালোই কাটছিল। কিন্তু একদিন গণ্ডগোল বাধল ঘাটোয়ালের সঙ্গে।

কাঞ্চন নদীর ওপারে ছোট খেয়াঘাটের সে ইজারাদার। নবীপুরের যাত্রী পার করে, আদায় করে দু'পয়সা; ধানের গাড়ি এলে ছ'আনা, খালি গাড়ি তিন আনা, কানে মাংড়ি, ন্যাড়া মাথা, আধবুড়ো লোক। সারাদিন গাঁজা খেয়ে চোখ লাল করে বসে থাকে; রোজগারপাতি মন্দ হলে খিট্ খিট্ করে বিশ্রী রকমে।

তা করুক, শ্যামলালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বিশেষ। কিন্তু মহিষের পিঠে একদিন সবে নদী পার হয়ে ডাঙায় উঠেছে শ্যামলাল, এমন সময় এসে পথ আগলালে ঘাটোয়াল।

শ্যামলাল বললে, কেয়া হুয়া?

ঘাটোয়াল জবাব দিলে, পয়সা?

—কিসের পয়সা?

—পারানির।

—পারানি!—শ্যামলাল আশ্চর্য হয়ে গেল: নৌকোয় পার না হলেও পয়সা?

—জরুর!—গাঁজার ঝোঁকে ঘাটোয়াল ব্যাখ্যা করে দিলে: এ ঘাট তার ইজারা। এ ঘাট যে পেরুবে, তাকেই পয়সা দিতে হবে। জমিদারের কাছ থেকে বহু টাকার ডাক দিয়ে

ঘাট নেওয়া হয়েছে—ইয়ার্কি নয়। পয়সা জরুর দিতে হবে। তা নৌকোতেই পার হও আর ভৈঁসায় চেপেই চলে যাও।

বলা বাহুল্য যুক্তিটা শ্যামলালের ভালো লাগবার কথা নয়। মহিষের পিঠ থেকে তখনি সে লাফ দিয়ে পড়ল—মারামারি করবে। ঘাটোয়ালও তৈরিই ছিল, উরু চাপড়ে বললে, ত আও ববুয়া!

ঘাটোয়ালের লোকজন মাঝে পড়ে ছাড়িয়ে দিলে। বিদায়লগ্নে দু'জন পরস্পরের দিকে যে দৃষ্টিক্ষেপণ করলে তার অর্থ জলের মতো প্রাঞ্জল।

একজন মনে মনে বললে, ফিন্ ইধার আয়েঙ্গে তো—

আর একজন স্বগতোক্তি করলে: একবার ওদিকে যায়েগা তো—

আসতে আসতে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে শ্যামলালের মনে হয়েছিল কেন আজ সে লাঠিটা সঙ্গে আনেনি!

এই হল শত্রুতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সন্ধ্যার মলিন ছায়ায় যখন ঘাসের বন ধরেছে কালো সমুদ্রের রূপ, তখন ঘরে ফিরল শ্যামলাল। আর ফিরে এসে দেখল, কখন কোন্ ফাঁকে দু'দিনের হারানো মহিষটা আপনা থেকেই বাথানে ফিরে এসেছে!

কষে মহিষটাকে একটা চাঁটি বসালো শ্যামলাল। গাল দিয়ে বললে, কাল থেকে বেঁধে রাখব। রাত্রে নিজের খাটিয়াতে শুয়ে শুয়ে একটা আশ্চর্য নূতন ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। ঘাটোয়ালের মেয়ের উপরে একটা অপরিসীম ক্রোধ আর বিরক্তি নিয়ে যে চিন্তাটা শুরু হয়েছিল, কখন তার ধারাটা ঘুরে গেছে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে সেটা টেরই পায়নি শ্যামলাল। মন বলতে লাগল, ভারী সুন্দর তার মুখখানা, নদীর স্রোতের মতো তার হাসির শব্দ। ঘাসবনের নিরবচ্ছিন্ন শির শির আর শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে, পড়ন্ত রোদের শান্ত কোমল নির্জনতায় একটা অপরূপ আবির্ভাবের মতো এসে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা।

সমস্ত রাত্রি ধরে ওই ছবিটা স্বপ্ন সঞ্চার করতে লাগল তার ঘুমের মধ্যে। শ্যামলাল স্বপ্ন দেখতে লাগল শত্রুর মেয়ের সঙ্গে ক্রমাগত সে ঝগড়া করে চলেছে।

পরের দিনটা আবার শুরু হল বাঁধা কাজের তাগিদে। চাকরগুলোকে দিয়ে দুধ দোয়ানো, সেই দুধ জ্বাল দিয়ে ঘি তৈরির বন্দোবস্ত। কাল সকালেই আসবে রামরতন ভগৎ, এক মণ ঘি চাই তার।

কিন্তু বেলা যেই পড়ে এল, যেই আকাশের ছাড়া ছাড়া মেঘে ধরল লালের রঙ, সঙ্গে সঙ্গে অকারণে চন্‌মন্ করে উঠল বুকের ভেতরে। আগুনে পোড়া তামাটে রঙের বিশাল কঙ্কালের মতো ভূতের আদালটা তার শিমুলের শাখা দুলিয়ে দূর থেকে হাতছানি দিলে তাকে। আজ মহিষ হারায়নি, সবগুলোই আছে চোখের সম্মুখে, তবু লম্বা লাঠিটা হাতে

নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্যামলাল। আর রওনা হল সেদিকেই—যেদিকে হিংস্র আলাদ গোখুরের ভয়ে মানুষ এগোতে চায় না।

লাঠিতে ভর দিয়ে, মাটির সঙ্গে শরীরটাকে সমান্তরাল করে, একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে শূন্যের ওপর দিয়ে খালটা পার হয়ে গেল শ্যামলাল। দাঁড়ালো এসে জাঙ্গালের নিচে। আর তখনি যেন ফিরে এল চৈতন্য, খেয়াল হল এ সে করেছে কী!

একে তো এই সাপের জাঙ্গালে আসা এমনিতেই বিপজ্জনক। তার ওপরে কাল যে মেয়েটি দৈবাৎ এখানে ছাগল চরাতে এসে পড়েছিল আজও যে এখানে সে আসতে পারবে তার সম্ভাবনা কোথায়! তা ছাড়া শত্রুর মেয়ে—

ফিরে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতেই শ্যামলাল দেখলে কখন সেই বর্ষার জল-নামা টিলার খাঁজে খাঁজে লাঠি আটকিয়ে উঠে বসেছে জাঙ্গালের মাথায়। এসে দাঁড়িয়েছে সেই শিমুল গাছটার নিচে, ঝরাপাতাগুলোর ওপরে। কিন্তু—

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল মুখ, বিষণ্ণ হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল নিরাশায়। তবু চেষ্টা করতে দোষ নেই। মুখে হাতটা চাপা দিয়ে অকারণেই বিশ্রী বাজখাঁই আওয়াজ তুললে শ্যামলাল: আঃ—আঃ—আঃ—

কিন্তু ডাকটা শেষ হওয়ার আগেই জলতরঙ্গের মতো উচ্ছল হাসির কলরোল ভেসে উঠল। এবারে আর ঘাসবনের ভেতরে নয়, ঠিক তার পেছনে, শিমুল গাছটার আড়াল থেকে।

চমকে পেছন ফিরল শ্যামলাল। বিশ্বস্ত পরিচিত গলায় বললে, এখানে উঠলে কেন? বড্ড সাপের ভয়।

রুক্নি হাসল: এখানে না উঠলে তো দেখা যেত না তুমি আসছ কিনা।

তা হলে ব্যাপারটা একতরফা নয়! শত্রুর মেয়েও তারই মতো ঝগড়া করবার প্রতীক্ষা করছিল, জাঙ্গালে উঠে দেখছিল শ্যামলাল আসছে কিনা। চোয়াড় কাঠ-খোট্টা মুখে হাসি দেখা দিলে। বললে, চলো, এখানে নয়, ঘাসবনের ভেতরে গিয়ে বসি।

উজ্জ্বল চোখে রুক্নি বললে, চলো।

পাখীর মতো হালকা মেয়েটা। এক হাতে তাকে তুলে নেওয়া চলে।

অনাবৃত আদিম পৃথিবীতে আদিঅন্তহীন ঘাসের বন। অনাবৃত, অনায়োজন সহজ ভালোবাসা। আজ ঘরে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল শ্যামলালের। কিন্তু আজ আর ভয় করল না, ভয় করল না জলার ওপরে তমিস্রাঘন রাত্রিকে। ঘন অন্ধকারেও তারার আলোয় এমন করে পথ দেখতে পাওয়া যায় একথা কি আগে কোনদিন জানতে পেরেছিল শ্যামলাল?

খেয়া পারাপার করে ঘাটোয়াল। পারানির পয়সা আদায় করে, ঝগড়া করে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের সঙ্গে। গাড়ি বেশি বোঝাই থাকলে ছ'আনার জায়গায় আট আনা আদায় করতে চায়, মুখচেনা থাকলে কখনো কখনো এগারো আনায় রফা করে দু'খানা গাড়িকে। কাঞ্চনের শান্ত নীল জলের ওপর দিয়ে অনবরত পারাপার করে ঘাটোয়ালের জোড়া নৌকো। আর আনে নবীপুরের বাজার থেকে তোলায় তোলায় গাঁজা, কখনো কখনো দু-চার বোতল 'তিরিশ নম্বর কা দারু'। মদের মধ্যে এইটেই সবচেয়ে কড়া আর এটা নইলে গাঁজাখোরের কড়া মগজে নেশা চড়তে চায় না।

ওদিকে পার হয়ে গেছে কৃষ্ণপক্ষ। ফালি ফালি করে আকাশে বড় হচ্ছে চাঁদ, ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ঘাসের বন, জ্যোৎস্নায় আশ্চর্য সুন্দর আলোছায়া নেচে যায় তার ওপর দিয়ে। বহুদূরের সাঁওতালপাড়া থেকে নিষুতি রাত্রে বাঁশির সুর আসে, আসে মাদলের শব্দ। জল-মেশানো পাতলা মহিষের দুধের মতো রঙধরা আকাশের তলা দিয়ে উড়ে যায় রাজহাঁসের ঝাঁক, খাটিয়ার ওপরে বসে বসে জাগ্রত স্বপ্ন দেখে শ্যামলাল।

মহিষগুলোকে এখনো আদর করে, যত্ন করতে চেষ্টা করে এখনো। কিন্তু সে আন্তরিকতা আর নেই, এখন পরিষ্কার বিমুখী হয়ে গেছে মনের গতিটা। যা নিয়ে এতদিন সে সম্পূর্ণ হয়েছিল, আজ মনে হয় তার ভেতরে কত বড় একটা ফাঁকি লুকিয়ে ছিল। এভাবে একা একা আর বাস করা চলে না, একা একা থাকা এখন অসম্ভব তার পক্ষে।

আজকাল আর অপেক্ষা করতে হয় না বিকেলের ছায়া ঘনানো পর্যন্ত। দুপুরের পরেই আসে রুক্‌নি। নিরিবিলি ভূতের জাঙালের পাশে ঘন সবুজ ঘাস স্নিগ্ধ নিবিড় আবরণ দিয়ে ওদের ঢেকে রাখে। এমনিতেই বুক পর্যন্ত ঘাস, মাথা উঁচু করে না দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় না। তার আড়ালে নিভৃত নিঃসঙ্গ অপরূপ অবকাশ।

সবুজ ঘন ঘাস। বিচিত্র একটা মিষ্টি গন্ধে ভরা। প্রজাপতি উড়ে আসে, উড়ে আসে ফড়িং—মাথার ওপর সকৌতুকে চক্র দিয়ে উড়ে যায়—ওদের নিভৃত প্রেমের নিঃশব্দ সাক্ষী। রাজারাজড়াদের বিছানা কি এই সবুজ ঘাসের চাইতেও নরম?

শ্যামলালের বাহুতে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে গুন্ গুন্ করে গান গায় রুক্‌নি। শির্ শির্ শর্ শর্ শোঁ শোঁ করে তার সঙ্গে সুর মেলায় ঘাসবনের গান। ভূতের জাঙালের ওপরে শিমুলের ছায়াটা ঘন হয়ে আসতে থাকে, সূর্য পাটে নামে পশ্চিমের তালবনের ওপারে, এদিকে উঁকি মারে চাঁদের পাণ্ডুর রেখা। রুক্‌নি ছাগল নিয়ে ফিরে যায় খেয়াঘাটের দিকে, লম্বা লাঠির ওপরে লাফ দিয়ে ঘরের দিকে রওনা হয় শ্যামলাল।

তারপর জ্যোৎস্নায় মাতাল করা সন্ধ্যা। একা একা খাটিয়ায় পড়ে ঝিমুতে অসহ্য লাগে এখন। অথচ উপায় নেই। ঘাটোয়ালকে বলা যাবে না, তেড়ে মারতে আসবে। অবশ্য মারামারিতে ভয় পায় না শ্যামলাল, কিন্তু তাতে কোনো ফয়দা হবে না। লাভের ভেতরে

ঝামেলাই বাড়বে খানিকটা, ওতে করে রুক্‌নিকে পাওয়া যাবে না।

একদিন রুক্‌নির দু'খানা সুডৌল হাত প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলে শ্যামলাল।

—চল্‌ পালিয়ে যাই।

রুক্‌নি হাসল : কোথায় ?

—যেখানে খুশি—যতদূরে হোক। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করব তোকে।

রুক্‌নি তেমনি হাসতে লাগল : পারবে ?

মাথার ভেতরে টগবগ করে রক্ত ফুটছিল শ্যামলালের : পারব না কেন ? নিশ্চয় পারব।

—এই বাথান, এই ভৈঁসার পাল ? এগুলোকে তো সবসুদ্ধ তাড়িয়ে দিতে পারবে না। ফেলে যেতে পারবে ?

হাত দুটো আপনা থেকে ছেড়ে দিলে শ্যামলাল। এই মহিষের পাল। কত যত্ন, কত আশঙ্কা, কত সজাগ পরিচর্যা! মুখে যত সহজেই বলা যাক, মনের দিক থেকে অত জোর নেই তার।

তা ছাড়া যাবেই বা কোথায় ? এত বিরাট, এত বিপুল পৃথিবীর কতটুকু জানে শ্যামলাল, কতটুকুই বা তার চেনা ? এই ঘাসের বন—সমুদ্রের মতো যার বিস্তার, ওই রাঙা মাটির টিলাগুলো, দূরে দূরে তালগাছ, আকাশে ছাড়া ছাড়া মেঘে সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের রঙ, তালগাছের মাথার ওপরে রুক্‌নির হাসিভরা মুখের মতো উঁকি দেওয়া চাঁদ, কাঞ্চন নদী, খেয়াঘাট, আর দূরের নবীপুরের বন্দর—কী আছে এর বাইরে ? সেখানে অপরিচয়—সেখানে এমন কি কিছু আছে যার ওপরে ভর দিয়ে সে দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ে! গভীর রাত্রিতে এই দিগন্ত-সমাকীর্ণ মাঠের ভেতরে কেউ যদি পথ হারায় তা হলে যেমন আলেয়ার আগ্নেয়শিখা বিভ্রান্ত করে ঘুরিয়ে মারে তাকে, তেমনি করে সেই অচেনা জগৎ ঘুরিয়ে ভুলিয়ে মারবে তাকে ? এবং সেই অন্ধকারে তাকে কি পথ দেখাতে পারবে রুক্‌নি ?

সংশয় কাটে না মনের ওপর থেকে।

তবু জোর করে জবাব দিলে শ্যামলাল : তোর জন্যে সব পারব।

—আচ্ছা, ভেবে দেখো।

রুক্‌নির চোখ তেমনি লীলা-মধুর কৌতুকে জলজল করছে। প্রতিবাদ করা উচিত—রুক্‌নি বিশ্বাস করেনি বুঝতে পারছে শ্যামলাল। কিন্তু তবুও প্রতিবাদ করা চলে না। মুখে বলা সোজা, কিন্তু কাজটা নয়। ভয় আছে—অপরিচিত অনাত্মীয় পৃথিবীর—সমস্ত নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িয়ে আছে বাথানের প্রতি অন্ধ দুর্বলতা—সারাটা জীবন ধরে সব চাইতে একান্ত করে জেনেছে যাকে ; আর আশঙ্কা আছে সেই সব আলেয়ার—রাত্রির

অন্ধকারে নিথর কালো ঘন ঘাসবনে যারা অসতর্ক পথিককে বিভ্রান্ত করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, কখনো কখনো বা ডুবিয়ে মারে জলার হাতী তলিয়ে যাওয়া অথৈ কাদাজলের মধ্যে!

মনের ভেতরে অসহ্য অস্বস্তি। নিজের হাত কামড়ে খেতে ইচ্ছে করে শ্যামলালের। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে ওই শালা গাঁজাখোর ঘাটোয়ালের কাছে। তার পা ধরে সে বলতে পারে—

কিন্তু বাধা দিয়েছে রুক্‌নি। কেমন চমকে উঠেছে, আশঙ্কায় ছল্ ছল্ জলজল করে উঠেছে কালো চোখ, বলেছে, না না।

—না না কেন? টাকা যদি চায়, আমি দেব। শ রুপেয়া, দেড়শো রুপেয়া, আমার টাকার অভাব নেই।

রুক্‌নি তবুও বলেছে, না, সে হবে না!

—কেন?

হঠাৎ একটা ঢোঁক গিলেছে রুক্‌নি, কি একটা কথা সামলে নিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। তারপর দ্বিধা করে বলেছে, আমার বাপের ভারী রাগ তোমার ওপরে। হাজার টাকা দিলেও রাজী হবে না। বরং ঝামেলা হবে খানিকটা। তার চাইতে এই ভালো!

এই ভালো? মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারে না শ্যামলাল। এ ভালো নয়— এ লুকোচুরি এখন রীতিমত পীড়া দিচ্ছে তাকে। অপরাধবোধ, লজ্জা। কারো কাছে কখনো ছোট হয়নি শ্যামলাল, চলেছে মাথা উঁচু করে, সোজা মনের মতো হাতের সোজা লম্বা লাঠিটার ওপরে নিঃসঙ্কোচ জোর রেখে। আজ হীন মনে হয় নিজেকে, মনে হয় ঘাটোয়ালের কাছে সে হেরে যাচ্ছে। এমন একটা জায়গাতে এখন দাঁড়িয়ে আছে ঘাটোয়াল—যেখানে, তার দিকে মুখ উঁচু করে তাকানোর সাহস নেই শ্যামলালের।

আরো অসহ্য লাগে রাত্রি। দুর্বিষহ বোধ হয় একেবারে। খোলা বারান্দায় খাটিয়ায় ঘুমোয় শ্যামলাল। গভীর রাত্রে শুনতে পায় বহু দূরের সাঁওতাল-পাড়া থেকে বাঁশির সুর— ওই সুরটা রক্তের ভেতরে যেন ঝিনঝিন করে বাজে; দক্ষিণের হাওয়াটায় যেমন বিশ্রী একটা অস্বস্তি, শরীরকে আচ্ছন্ন করে তুলতে চায়। বড় একা—বড় বেশি নিঃসঙ্গ।

নাঃ—আর পারা যায় না। এবার বলতেই হবে ঘাটোয়ালকে। কপালে যা থাকে তাই হোক।

সারারাত ছটফট করে বলেই ঘুমটা ভাঙতে দেরি হচ্ছে আজকাল। মুখের ওপরে রোদ এসে পড়েছে শ্যামলালের, ঘুমের ভেতরে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। হঠাৎ—

চমকে ধড়মড় করে উঠে বসল শ্যামলাল।

এ কি সত্যি? এ কি বিশ্বাস করবার মতো? তার দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে ঘাটোয়াল!

ন্যাড়া মাথা, কানে আংটি। এই সকালেই নেশা করে এসেছে—টকটকে লাল চোখের দৃষ্টি। হাতে একখানা তেল-পাকানো মস্ত লাঠি। ডাক দিচ্ছে: হোই হো ঘোষ, শুনত্ হো?

আতঙ্কে মড়ার মতো পাণ্ডুর হয়ে গেল শ্যামলাল। রুকৃনির ব্যাপারটা টের পেয়েছে নাকি ঘাটোয়াল? বিহ্বল চোখ বুলিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে লাঠিটা তার তৈরি আছে কি না।

কিন্তু তাজ্জব লাগিয়ে দিয়ে ঘাটোয়াল হাসল। বললে, এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকো কেন? কাজের কথা আছে তোমার সঙ্গে।

কাজের কথা! এবং ঘাটোয়াল হাসছে। তা হলে—

এবারেও চমক লাগল শ্যামলালের, কিন্তু আনন্দের চমক। রুকৃনিই তবে ব্যবস্থা করে ফেলেছে সব! কিন্তু ঘাটোয়াল পাকা লোক, অনেক টাকা চাইবে নিশ্চয়। তা হোক, তা হোক। রুকৃনির জন্যে দুশো টাকা খরচ করতে তার আপত্তি নেই।

—আও, বৈঠো খাটিয়ামে—

আমন্ত্রণ গ্রহণ করে খাটিয়ায় এসে বসল ঘাটোয়াল। রোমাঞ্চিত আনন্দে সর্বাঙ্গ কাঁপছে শ্যামলালের। তার উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে এই সবুজ ঘাসবনের ওপর দিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে রুকৃনির বুকে। কিন্তু আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে, করতে হবে আরো একটু প্রতীক্ষা।

কথা আরম্ভ করবার আগে হাতের চেটোতে বেশ খানিকটা খৈনি পাকিয়ে নিলে ঘাটোয়াল। ভাগ দিলে শ্যামলালকে, নিজে মুখে পুরলে খানিকটা। তারপর ধাতস্থ হলে বললে, ভেবে দেখলাম তোমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে কোনো লাভ নেই।

শ্যামলাল বললে, জরুর।

—যা হয়ে গেছে ভুলে যাওয়াই ভালো—পিচ করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে খানিকটা থুথু ফেললে ঘাটোয়াল: এখন একটু কাজে এসেছি।

নিজের বুকের স্পন্দন যেন শুনতে পাচ্ছে শ্যামলাল: কী কাজ?

—দু'সের ভালো ঘি চাই। কত দাম?

এও কি ভূমিকা, না শুধু এইটুকুই মাত্র বলতে এসেছে ঘাটোয়াল? আশায় আশঙ্কায় দুলতে লাগলো শ্যামলালের মন: দু'সের ভালো ঘি? ওর আর দাম নিব না তোমার কাছ থেকে, হাজার হোক আজ থেকে যখন দোস্তী হয়ে গেল।

খুশিতে ঘাটোয়ালের মুখ ভরে গেল: আচ্ছা, আচ্ছা, তব্ তো ঠিক হ্যায়। আজ থেকে তোমার আর পারানির পয়সা লাগবে না দোস্ত্। আসল কথাটা কী জানো? ঘি আমার জন্তে নয়—আমার বেটীর বর আসবে, তাকেই—

—তোমার বেটীর বর ?—শ্যামলালের মাথার ওপর মস্ত একটা লাঠির ঘা এসে পড়ল —মাথাটা যেন চুরমার হয়ে গেল মুহূর্তে : কোন্ বেটী ?

—একটাই তো বেটী আমার। ওই রুকনি।

—রুকনি !—প্রতিধ্বনি করলে শ্যামলাল। কিন্তু এত ক্ষীণকণ্ঠে যে ঘাটোয়াল তা শুনতে পেল না। ঘাটোয়াল বলে চলল, শাদী তো হয়েছে দু'বছর বয়েসে, কিন্তু এতদিন গাওনা হয়নি কিনা। তা এইবারে নিতে আসবে। জামাই আমার খুব মানী লোক, হবিবপুর থানার সিপাহী। শনিবারে সে আসবে মেয়েকে নিতে। বলেছে একটু ভালো ঘিয়ের যোগাড় রাখতে।

নিস্পন্দ হয়ে রইল শ্যামলাল। হাতের চেটোয় আবার নতুন করে খানিকটা তামাক-পাতা নিয়ে ঘাটোয়াল ডলতে লাগল : জামাই বড় ভালো লোক। খত্ পাঠিয়েছে চৌকিদারের সঙ্গে, মেয়েকে পাঠিয়েছে লাল শাড়ি। লিখেছে গয়নাও নিয়ে আসবে। বরাত ভালো রুকনির, কী বলো দোস্ত্ ?

হঠাৎ শ্যামলাল হেসে উঠল : জরুর।

কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে তাকালো ঘাটোয়াল, হাসিটার অর্থ যেন ঠিক বুঝতে পারল না। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, ঘিটা কখন পাওয়া যাবে ?

—কাল। কাল সন্ধ্যের পরে নিজেই দিয়ে আসব আমি।

রুকনি অস্বীকার করেনি কিছুই। তেমনি ঘাসবনের শান্ত কোমল ছায়ায় নিজেকে লীলাভরে এলিয়ে দিয়েছে শ্যামলালের বুকের ভেতরে, বলেছে, তোমাকে বলিনি, বললে তোমার কষ্ট হত। তা ছাড়া তোমার মতো জোয়ান মানুষটাকে পাওয়ার জন্যে ভারী লোভও হয়েছিল।

ঠিক কথা, কোনো অন্যায় হয়নি। ঘৃণাভরে রুকনিকে বুকের ভেতর থেকে ছিটকে ফেলে দেয়নি শ্যামলাল। এই ঘাসের বনে, এই দিগন্তজোড়া মুক্ত মাঠের ভেতরে এমনি নির্ভাবনায় ভালোবাসাই তো ভালো। এখানে যেমন ঘরের বেড়া নেই—তেমনি কোনো নিয়মের বেড়া নাই বা থাকল এই গোপন ভালোবাসায়। পৃথিবীর ধর্মকেই মেনে নিয়েছে রুকনি। ক্ষতি কী ? নির্জন প্রেম নির্জন মাঠের খোলা বাতাসেই উড়ে চলে যাক।

আস্তে আস্তে শ্যামলাল বললে, তুই চলে যাবি ?

কথাটার সোজা জবাব দিলে না রুকনি। হয়তো বেদনাবোধ হয়েছে, হয়তো জেগে উঠেছে মৃদু করুণ একটুখানি সহানুভূতি। ঘুরিয়ে বললে, তোমাকে ভুলব না।

আশ্বাসের কোনো প্রতিক্রিয়া হল না শ্যামলালের মুখে। বললে, কাল একবার আসবি শেষবারের মতো ? এর পরে তো তোকে আর দেখতে পাবো না।

রুকুনি ম্লানমুখে বললে, আসব।

—আর একটা অনুরোধ। তোর নতুন রাঙা শাড়িটা পরে আসবি রুকুনি, যেটা টকটকে লাল। আমার দেখতে ভারী ইচ্ছে করছে।

রুকুনি এবার টিপে টিপে হাসল একটু: আচ্ছা।

পরদিন দুপুরে বাথানের সব চাইতে বড় মহিষটাকে বেছে নিলে শ্যামলাল। হিংস্র চেহারা, খাঁড়ার মতো প্রকাণ্ড দুটো শিং। মাঠের প্রচুর ঘাস খেয়ে ইদানীং এটাই একটু বেয়াড়া হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে চলতি দেহাতী লোককে তেড়ে যেতে চায়। চোখের দৃষ্টিতে লালের আভাস লেগেছে, আজকাল কেমন আশঙ্কা হয় সেদিকে তাকালে।

সেই মহিষটার পিঠে চড়ে বসল শ্যামলাল। এগিয়ে চলল জাঙ্গালের দিকে। খানিকটা আসতেই পেছনের জগৎটা হারিয়ে গেল ঘন ঘাসবনের নেপথ্যে। শুধু জেগে রইল নিস্তব্ধ নির্জনতা। বতাসে রাশি রাশি ঘাসের আনন্দিত আন্দোলনে শব্দ উঠছে শির শির শোঁ শোঁ—। এ সেই স্তব্ধতা যেখানে নির্জনে ভালোবাসা চলে, আর—আর—হত্যা করা চলে নিঃশব্দে।

নালা পার হয়ে মহিষটা শ্যামলালের তাড়া খেতে খেতে অনেকটা মাটি আর পাথর ভেঙে বহু কষ্টে উঠে পড়ল জাঙ্গালে। ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে মহিষটা, মাঝে মাঝে অসন্তুষ্টভাবে নাড়ছে শিং দুটো, মুখের কষ দিয়ে গড়াচ্ছে ফেনা। তা ছাড়া আকাশে প্রখর রোদ—মাথাটা যে দস্তুরমতো তেতে তার উঠেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, রুকুনি এসেছে, লাল শাড়ি পরেই এসেছে। শ্যামলালের শেষ অনুরোধটা ভোলেনি। হাসিমুখে এগিয়ে এল সামনের দিকে। আজ শেষ বাসর—

আর সেই মুহূর্তেই একটা ভৈরব গর্জন করলে মহিষটা। সজোরে সামনের পা দুটো ঠুকলে জাঙ্গালের ওপরে, ঠিকরে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ মাটি আর পাথর, লাফিয়ে নেমে পড়ল শ্যামলাল। টকটকে লাল রঙ দেখে খুন চেপেছে উত্তেজিত মহিষের। চোখ দুটোতে ঠিকরে বেরুল আদিম পৃথিবীর আরণ্য হিংসা। শিং দুটো নিচু করে সোজা ছুটল রুকুনির দিকে।

আর্তনাদ করে পালাতে গেল রুকুনি, পারল না। টিলা থেকে দৌড়ে নামতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ঘাসবনের মধ্যে। চেঁচিয়ে উঠল: বাঁচাও—বাঁচাও—

কিন্তু বুনো ক্ষ্যাপা মহিষের হাত থেকে কাউকে বাঁচানো কি সম্ভব? অনর্থক চেষ্টা করে লাভ নেই। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরালো শ্যামলাল।

নির্জন দিগন্তপ্রসার ঘাসের বন। বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ। খানিকটা এগিয়ে গেলেই বাতাসের শব্দে সব কোলাহল উড়িয়ে নিয়ে যায়—কয়েকটা চাপা আর্তনাদের তো কথাই নেই। কিছুক্ষণ পরে যখন পেছনের গোঙানিটা একটু কমে এসেছে, তখন একবারের, শুধু

একবারের জন্মে ফিরে তাকিয়ে দেখল শ্যামলাল। ঘাসবনের মধ্যে কিছু দেখা যায় না, তবে ল্যাজটা ওপরের দিকে তুলে মহিষটা ক্রমাগত কী যেন গুঁতিয়ে চলেছে আর গর্জন করছে হিংস্র ভয়ঙ্করভাবে। পায়ের দাপটে ঘাসের বন ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে ঘূর্ণির মতো। পলকের জন্মে শিং দুটো চোখে পড়ল—লাল শাড়ির চাইতে আরো গাঢ়, আরো গভীর রঙে সে দুটো টক্‌টক্‌ করছে—সে রক্ত! ঘাসবনের হিংসা ঘাসবনের ভালোবাসার মতোই নগ্ন আর নিরাবরণ।

শ্যামলাল নিশ্চিন্তে বিড়িটায় একটা টান দিলে, তারপর হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে জাঙালের ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে চলল। তার কাজ এখনো আর একটু বাকি। একটা আলাদ গোখুর দরকার, দরকার খানিকটা তাজা বিষ। ঘাটোয়ালের জামাইয়ের জন্মে খাঁটি ঘিটা সন্ধ্যের মধ্যেই পৌঁছে দিতে হবে যে!

বন-জ্যোৎস্না

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

শ্রীচরণেষু

'বন-জ্যোৎস্না' নামে যে বইটি আমার একদা ছিল, এখন সেটি লুপ্ত। শুধু 'বন-জ্যোৎস্না' সেই বই থেকে পুনর্মুদ্রিত। 'বন-তুলসী'ও অন্য বই থেকে পুনর্মুদ্রণ।

বাকি গল্প ক'টি নতুন—গত দু-তিন বছরের মধ্যে লেখা। এদিক থেকে 'বন-জ্যোৎস্না'কে নতুন বই-ই বলা যেতে পারে। আর প্রথম দুটি গল্প থেকে পরের গল্পগুলোর মধ্যে প্রায় পনেরো-ষোলো বছরের ব্যবধান।

এই ব্যবধান থেকে হয়তো একটা জিনিস দেখা যাবে। চিন্তায়, রীতিতে, আত্মপ্রকাশে একজন সাধারণ লেখকের বিবর্তন কিভাবে ঘটে যায়, তার কিছুটা আভাস এ থেকে পাওয়া যাবে, খুব সম্ভব। পাঠক-পাঠিকারা তা লক্ষ্য করবেন কিনা জানি না, কিন্তু পুরোনো লেখা সম্পর্কে লেখকের সংকোচ কেন থাকে, এই বইটির মধ্য দিয়ে আমি তা অনুভব করছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বন-জ্যোৎস্না

জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্না পড়েছে।

দুপাশে নিবিড় শালের বন। কিন্তু নিবিড় হলেও পত্রাচ্ছাদন লতাগুল্মে জটিল নয়—পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ। আলো-আঁধারির মায়ায় অপরূপ হয়ে আছে অরণ্য।

সরু পায়ে চলার পথ দিয়ে শিউকুমারী এগিয়ে চলেছিল। কাঁখের কলসী দেহের ললিত ছন্দে দোল খাচ্ছে—শুকনো শালের পাতা পায়ের নিচে যেন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে। এই সন্ধ্যায় একা জঙ্গলের পথ নিরাপদ নয়। বাঘ আছে, ভালুক আছে, হাতি আছে, নীলগাই আছে, বরা আছে—কী নেই এই বিশাল অরণ্যে? তবু শিউকুমারীর ভয় করে না। তা ছাড়া ডুয়ার্সের বাঘ নিতান্তই বৈষ্ণব, পারতপক্ষে তারা মানুষের গায়ে থাবা তোলে না, এমনি একটা জনশ্রুতিতেও এদেশের লোক প্রগাঢ়ভাবে আস্থাবান।

বনের মধ্য দিয়ে একা চলেছে শিউকুমারী। গায়ের রূপোর গয়নায় জ্যোৎস্নার ঝিলিক। জঙ্গলের বুকে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্নের-মতো বিসর্পিত রেখায় ঝোরার জল যেখানে বয়ে গেছে, সেখানকার ঘন-বিন্যস্ত ঝোপের ভেতর উঠেছে বুনো ফুলের গন্ধ। জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে ডেকে চলেছে হরিয়াল—পূর্ণিমা-রাত্রির মায়ায় তারও চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেছে। শুধু থেকে থেকে কোথায় তীব্রস্বরে চিৎকার করছে একটা ময়ূর—পাখা ঝটপট করছে, হয়তো বেকায়দায় পেয়ে কোথাও আক্রমণ করেছে শিশু একটা পাইথনকে। অরূপণ পূর্ণিমা আর অনাবরণ সৌন্দর্যের মধ্যেও আরণ্যক আদিম হিংসা নিজেকে ভুলতে পারেনি—হরিয়ালের সুরে আর ময়ূরের ডাকে রুদ্র-মধুরের ঐকতান বেজে চলেছে।

জঙ্গল শেষ হতেই থরথরে বালি। পলিমাটির নরম কোমলতা নয়, মুক্তা-চূর্ণের মতো মিহি মখমল-মসৃণ বালিও নয়। চূর্ণ পাথরের টুকরো এখানে কাঁকরের মতো ধারালো। ভরা বর্ষায় জলঢাকা যে সমস্ত পাথরের চাঙাড় হিমালয়ের বুক থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল, অতিকায় কতগুলো কচ্ছপের মতো সেগুলো বিশাল বালি-বিস্তারের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ওপারে ভুটানের কালো পাহাড়। আর তলা দিয়ে ছেদহীন অরণ্য—ডুয়ার্স থেকে টেরাই। দুর্গমতার ওপারে প্রতিরোধের তর্জনী। দেবতাত্মা নগাধিরাজের অলঙ্ঘ্য প্রাকার। আলোয় ধোয়া আকাশের নিচে পৃথিবীর বুক ঠেলে ওঠা কালো বিদ্রোহ। আর সামনে পাহাড়ী নদী জলঢাকা।

কতটুকু নদী, কতটুকুই বা জল। বুক পর্যন্তও ডুববে কিনা সন্দেহ। দেখে মনে হয় পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। কিন্তু মনে হওয়া পর্যন্তই—শুধু হেঁটে কেন, নৌকোতেও পার হওয়া চলে না। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে দুর্দান্ত স্রোতে জল নেমে চলেছে, পাহাড় থেকে সমতলে, সমতল থেকে সমুদ্রে। স্বপ্ন থেকে হঠাৎ-জাগা নির্ঝরের বজ্র-গর্জন। জলের তলায় তলায় ঠেলে নিয়ে চলেছে ধেলে পাথর আর গ্র্যানাইটের জগদ্দল স্তূপ। নিচে পাথরে পাথরে সংঘর্ষ—ওপারে খরখরে বালি ভেঙে জলের হুঙ্কার। এতটুকু নদীর কলরোল এক মাইল দূর থেকেও কানে আসে।

জ্যোৎস্নায় ঝলসে যাচ্ছে জলঢাকা। শান্ত ধুমন্ত আলোর বাঁকা তলোয়ার নয়। পাহাড়ীরা যাকে সোনালী অজগর বলে এ যেন ঠিক তাই। ক্ষুধার্ত সোনালী অজগরের মতো গর্জন করে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে—যেন মুখ থেকে ছিটকে পালিয়ে যাওয়া শিকারের সন্ধানে তার অভিযান।

কাঁধে কলসী নিয়ে শিউকুমারী স্থির হয়ে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ। পেছনে অরণ্য, ওপারে অরণ্য আর পাহাড়, মাঝখানে নদী। আকাশে চাঁদ।

ভারী খুশি লাগছে মনটা। আনন্দে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। এমনি জ্যোৎস্না-রাতেই তো 'পিতমে'র আসবার কথা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে উৎরাইয়ের পথ। দুধারে শালের বন হাওয়ায় কাঁপছে। পাহাড়ী ঝাউয়ের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। জংলী কলার পাতাগুলো কাঁপছে, কাঁপছে জ্যোৎস্নার রঙ মেখে। আর সেই পথ বেয়ে নামছে ঘোড়া, নেমে আসছে ঘোড়সওয়ার। খট্ খট্ খটাখট্। বুকের রক্তে মাতলামির দোলা লেগেছে, সমস্ত শিরাস্নায়ু চকিতে হয়ে উঠেছে অধীর এবং উদগ্রীব প্রতীক্ষায়। 'পিতম' আসছে অভিসারে।

একটা গানের কলি গুন গুন করে দু'পা এগিয়ে আসতে-না-আসতেই আবার শিউ-কুমারীকে থেমে পড়তে হল। আকাশের চাঁদে আর মায়াময় পৃথিবীতে মিলে বন-জ্যোৎস্নার যে অপূর্ব সুর বাজছিল—হঠাৎ সে সুর কেটে গেছে। ভয়ে আর আশঙ্কায় সমস্ত শরীর ছম ছম করে উঠল।

জলের ধারে সাদামতো পড়ে আছে, ওটা কী? পাথর? না—পাথর নয়। বিকেলেও শিউকুমারী ওখানে গা ধুয়ে গেছে, তখন তো ওটা ছিল না। আর এতটুকু সময়ের মধ্যে এত বড় একখানা পাথর তো আর হাওয়ার মুখে উড়ে আসেনি। তা হলে?

নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু মানুষ এল কী করে? কেউ খুন করেছে নাকি? জানোয়ারে মেরে দিয়েছে? দুটোই সম্ভব। নন্‌রেগুলেটেড্ এরিয়া—আইনের বন্ধন এখানে শিথিল। অরণ্য-রাজ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে আরণ্যক মানুষেরাই, সে-জন্যে তাদের সদরে আদালতে ছুটে যেতে হয় না। আর সন্ধ্যেবেলায় দু-চারটে জানোয়ারের জলের কাছে

আনাগোনাও খুবই সম্ভব। বিশেষ করে ভালুকের আমদানিটা তল্লাটে এমনিতেই একটু বেশি।

কয়েক মুহূর্ত শিউকুমারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে? এগিয়ে যাবে ওখানে? কে জানে কোনো অনিশ্চিত বিপদ ওখানে প্রতীক্ষা করে আছে কি না। এই জঙ্গল আর জনহীন নদীর ধারে। এখানে বিপদ-আপদ এলে সে কী করতে পারে!

কিন্তু ইতস্তত করে লাভ নেই। দেখাই যাক না। ভুটানী মেয়ের নির্ভীক নিঃসংশয় মন আত্মস্থ হয়ে উঠল ক্রমশ। ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল সে।

মানুষই বটে। কিন্তু বিদেশী—বাঙালী। জলের ধারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে। ভালুকে খায়নি, তা হলে চোখ-নাক নিশ্চয় আস্ত থাকতো না। গায়ে কোথাও রক্তের দাগ নেই—ক্ষতচিহ্ন নেই কোনোখানে। কাপড়টা গোছানোই আছে, সাদা জামাটার সোনার বোতামগুলি আলোতে ঝিকিয়ে উঠছে। আর, আর—কী আশ্চর্য, মানুষটা মরেনি। সমস্ত শরীরে ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস উঠছে তার, নিঃশ্বাস পড়ছে। কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়।

তারপর আর ভাবতে হল না শিউকুমারীকে। কলসী ভরে সে জলঢাকার জ্যোৎস্নায় গলা তুহিন শীতের জল নিয়ে এল, সস্নেহে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটার পাশে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে একটুখানি উড়ানির হাওয়া দিতেই অজ্ঞান মানুষের দীর্ঘায়ত ক্লান্ত নিঃশ্বাস ক্রমশ সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। আরো খানিক পরে চোখ মেলল মহীতোষ। বিহ্বল অর্থহীন দৃষ্টি। সমস্ত চিন্তা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে অস্পষ্ট নীহারিকার মতো দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। খণ্ড খণ্ড, ছিন্ন ছিন্ন। রূপ নেই, আকার নেই, অর্থ-সঙ্গতি নেই!

আরো জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগল শিউকুমারী। আরো বেশি করে ছিটিয়ে দিলে জল। জলঢাকার বরফগলা স্পর্শে মরা মানুষ চমকে উঠতে পারে, আর মহীতোষ তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে মাত্র। আস্তে আস্তে মহীতোষ উঠে বসল।

সামনে তরুণী নারী। উদ্বিগ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কালো চোখে জ্যোৎস্না, সুন্দর মুখখানিতে জ্যোৎস্না, কর্ণাভরণে জ্যোৎস্না। পাশ দিয়ে তীব্র কলরোলে বয়ে যাচ্ছে জলঢাকা। পুলিস নয়, পেছনে ছুটে-আসা শত্রুও নয়। গতিশীল, ভয়ত্রস্ত জীবনের সমস্ত চঞ্চলতা যেন এখানে এসে স্থির আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে কি পরী এসে নেমেছে তার পাশে? অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদে কি শেষ পর্যন্ত মরে গেছে মহীতোষ, আর মৃত্যুর পর পৌঁছে গেছে একটা আশ্চর্য ।?

রহস্যময়ী বিদেশিনী তরুণী। মূর্তির মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে—

বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা একসঙ্গেই সে দৃষ্টির মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। কিন্তু মর্মরমূর্তি নয়, মানুষই বটে।

মহীতোষ বললে, আমি কোথায় ?

হিন্দী-মেশানো বাঙলায় জবাব দিলে মেয়েটি : নদীর ধারে।

নদীর ধারে ! মহীতোষের মনে পড়ে গেল। পালিয়ে আসছিল—সে আর অরবিন্দ ! শালবনের মধ্যে অরবিন্দ কোথায় হারিয়ে গেল—তার আর সন্ধান মিলল না। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই, প্রতীক্ষা করবার উপায় নেই। পালাও, পালাও, আরো জোরে পালিয়ে চলো। আগের দিন কিছু খাওয়া হয়নি, সারারাতের মধ্যে চোখ বুজবার উপায় ছিল না একটিবারও। ক্ষিদে-তেষ্টায় সমস্ত শরীরটা অসাড় আর শিথিল হয়ে গেছে। তারপর ছুটতে ছুটতে সামনে পড়ল জল। পিপাসার্ত পশুর মতো সেদিকে ছুটে এল মহীতোষ। তারও পরে ? আর কিছু মনে পড়ে না।

মেয়েটি আবার বললে, কী করে এলে এখানে ?

জবাব দিলে না মহীতোষ। কী জবাব দেবে, কেমন করে জবাব দেবে ! অবসাদে ভারী, আচ্ছন্ন চোখ দুটো উদাসভাবে মেলে দিয়ে সে তাকিয়ে রইল ওপারের ঘনান্ধকার অরণ্য কালো পাহাড়ের অতিকায় দিগ্-বিস্তারের দিকে।

শিউকুমারী বললে, উঠতে পারবে ? তা হলে চলো আমাদের ঘরে।

মহীতোষ তবুও ভাবছে। কোথায় যাবে সে ? কোন্‌খানে তাকে নিয়ে যাবে এই অপরিচিতা রহস্যময়ী মেয়েটি ? কোন্ অজ্ঞাত পৃথিবীর আমন্ত্রণ তার দৃষ্টিতে ?

মহীতোষ শেষ পর্যন্ত উঠেই দাঁড়ালো। ক্লান্তিতে সর্ব শরীর কাঁপছে, মাথাটা ঘুরে পড়তে চাইছে মাটিতে। এক কাঁখে কলসী ধরে আর একখানা হাত অসংকোচে শিউকুমারী এগিয়ে দিলে মহীতোষের দিকে : নাও, আমার হাত ধরে চলো।

অন্য সময় হলে দ্বিধা করত মহীতোষ। সহজাত শিক্ষা আর সংস্কারে একটি অজানা অচেনা তরুণী মেয়ের শুভ্র হাতখানিকে আশ্রয় করবার কল্পনাতেও রক্তে দোলা লেগে যেত। কিন্তু চেতনা তখনো সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি। যেন অর্ধতন্দ্রায়, অথবা পরিপূর্ণ স্বপ্নের মধ্যেই সে খেয়াল দেখছে। চাঁদের আলোয়, বালিতে, জল-কল্লোলে আর বনের মর্মরে সমস্ত পৃথিবীটাই তো অবাস্তব হয়ে গেছে। মন এখানে প্রশ্ন করে না, দ্বিধা করে না। এমন একটা আশ্চর্য পটভূমিতে সবই সম্ভব, সবই স্বাভাবিক।

শিউকুমারীর ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা আঁকড়ে ধরলে মহীতোষ। সুগঠিত সুঠাম দেহের ওপর সমস্ত শরীরের ভারটাই এলিয়ে দিয়ে বালির ওপরে পা টেনে এগিয়ে চলল সে। একটা সুগন্ধ নাসারন্ধ্র বয়ে যেন তার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু সে গন্ধ মেয়েটির দেহ থেকে, অরণ্য থেকে, না আকাশের চাঁদ থেকে—মহীতো

ঠিক বুঝতে পারল না।

বালির রেখা ছাড়িয়ে জঙ্গল। শালবনের ভেতর দিয়ে মানুষ, হরিণ আর ভালুকের চলার পথ। ঝরা শালপাতায় পদধ্বনির মর্মরিত প্রতিধ্বনি। ময়ূর ডাকছে না, কিন্তু হরিয়ালের মাদক স্বর ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। হিংস্র জানোয়ারের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে না কোথাও। চকিতের জন্য কানে এল হরিণের মিষ্টি আহ্বান। এমন অপূর্ব বন-জ্যোৎস্নায় সে হয়তো হরিণীকেই সন্ধান করে ফিরছে। কঁক-কঁক-কোঁ! ঝোপের মধ্য থেকে অস্পষ্ট গদ্‌গদ-ধ্বনি। বন-মোরগ দম্পতি হয়তো মিলনমায়ায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে কোথাও।

বন-জ্যোৎস্না। শিউকুমারীর মনে পড়ে এমনি রাত্রে আসবে পিতম। জংলী কলার পাতায় পাতায় ছায়া কাঁপছে পাহাড়ী পথে। ঝাউয়ের বনে উদাস বিরহাতুর দীর্ঘশ্বাস। আর পাথরবাঁধা পথ দিয়ে সাদা ঘোড়ায় খট্‌ খট্‌ সোয়ারী হয়ে আসছে দূরবাসী প্রিয়তম—শালের কুঞ্জে বাসর-যাপন।

শিউকুমারী কি গুনগুন করে গান গাইছে? মহীতোষ কিছু বুঝতে পারছে না। চেতনা ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। এই জ্যোৎস্নায়, বনের এই সংগীতে, এই রহস্যমধুর পথ চলার ছন্দে। শিউকুমারীর গায়ের ওপর ভারটা ক্রমশ বেশি হয়ে চেপে পড়েছে। মহীতোষ আবার কি ঘুমিয়ে পড়ল, না অজ্ঞান হয়ে গেল একেবারে?

জঙ্গলের এদিকটা অনেকখানি ফাঁকা। ডি-ফরেস্টেশনের প্রভাবে জঙ্গল হাল্‌কা হয়ে গেছে—ওদিকে তো একেবারেই নেই। মানুষের কুঠারের ঘা পড়েছে অরণ্যের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যে। কাঠ চাই। ইন্ধনের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, সভ্যতার সংখ্যাতীত প্রয়োজনের জন্য, এমন কি জঙ্গল সংহার করবার কুঠারের বাঁটের জন্য। ক্ষত-বিক্ষত অরণ্য দিনের পর দিন হ্রস্ব হয়ে আসছে, অন্তিম প্রতিবাদে ছোট বড় গাছ আর একরাশ লতাগুল্ম দলিত করে লুটিয়ে পড়ছে বৃদ্ধ বনস্পতি, মানুষের অবিশ্রান্ত দাবীর মুখে পৃথিবীর প্রথম অধিবাসীরা নিঃশব্দে আত্মদান করে চলেছে। শুধু ব্যথাতুর বুকের মধ্যে সঞ্চিত জ্বালা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে দাবানল হয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। শুকনো পাতায় ধূ ধূ শিখা জ্বালিয়ে আর লতাগুল্মকে পুড়িয়ে দিয়ে শাঁ শাঁ করে এদিকে ওদিকে সরীসৃপ-গতিতে আগুনের প্রবাহ চলে জলস্রোতের মতো। এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায়—সোজা চলতে চলতে হঠাৎ ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘোরে। বনানীর বুকের জ্বালা আগুনের সাপ হয়ে ছুটোছুটি করে। একদিন, দুদিন, তিনদিন—যে পর্যন্ত না শাল-বনের ডালে ময়ূরের পেখম ছড়িয়ে দিয়ে হিমালয়ের চুড়ো থেকে আসা নীল মেঘে ধারাবর্ষণ নামে।

জঙ্গল যেখানে হাল্‌কা হয়ে এসেছে সেখানে ভুটানীদের একটা ছোট বস্তি। দেশটা কিন্তু ভুটান নয়—বাঙলা দেশের একেবারে উত্তরাঞ্চল। পাহাড়, ঝর্ণা, জঙ্গল আর চা-

বাগান। চা আর কাঠের প্রয়োজনে একটু দূরেই ঘন বনের মধ্য দিয়ে ছোট একটি রেল লাইন—তার ওপর দিয়ে যে রেল গাড়ি চলে তা আরো ছোট। বুনো হাতি দেখলে ইঞ্জিন ব্যাক করে—শালগাছ পড়লে গাড়ির চলাচলতি বন্ধ হয়ে থাকে। ননরেগুলেটেড অঞ্চল, থানা পুলিসের উপদ্রবটা গৌণ বস্তু। একজন সার্কল অফিসার আছেন, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন অথবা কী করেন সেটা নিরাকার ব্রহ্মের মতোই গুরুতর তত্ত্ব-চিন্তা সাপেক্ষ।

এইখানে—চা-বাগান, কাঠের কারবার আর রেল-লাইনের সীমানা থেকে কিছুটা দূরে সরে এসে, কুলবীরের পচাইয়ের দোকান। চা-বাগান আর কাঠ-কাটা কুলিদের প্রাণরস-সঞ্চয়ের কেন্দ্র। সন্ধ্যায় জঙ্গলের পথ-ঘাট ভালো নয়, আপদ-বিপদের সম্ভাবনাও আছে। তবু কুলিরা এখানে আসে—দিনান্তে উগ্র মাদকতায় একবারটি গলা ভিজিয়ে না নিলে তাদের চলে না। কুলবীরের রোজগার যে প্রচুর তা নয়, তবু দিন কাটে, চলে যায় এক-রকম করে।

রাত বাড়ছে। জঙ্গলের আড়ালে চাঁদ উঠে আসছে মাথার ওপর। কোথা থেকে চিৎকার করছে হায়না। কুলিরা একে একে উঠে পড়ল সবাই, সাঁওতাল কুলিদের মাদলের শব্দ আর জড়িত গানের সুর ক্রমে মিলিয়ে এল দূরে। হঠাৎ কুলবীরের খেয়াল হল, মেয়ে শিউকুমারী এখনো ফেরেনি। নদীতে জল আনতে গিয়েছিল, তারপর—

কুলবীরের মনটা ছলকে উঠল। জানোয়ারের পাল্লায় পড়েনি তো? ঝকঝকে ভোজালিখানা খাপে পুরে নিয়ে সবে বেরিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় এল শিউকুমারী। একা নয়, কাঁধে ভর দিয়ে আসছে মহীতোষ। আর আসছে বললেই কথাটা ঠিক হয় না, শিউকুমারী বয়ে আনছে তাকে।

কুলবীর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ছোট ছোট মঙ্গোলীয়ান চোখ দুটো বিস্ফারিত করে অস্ফুট গলায় বললে, এ কি?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শিউকুমারী বললে, চুপ। একে কিছু খেতে দিয়ে এখন শোবার ব্যবস্থা করে দাও বাবা। যা শোনবার শুনো সকালে।

কুলবীরের একটা পা কাঠে তৈরি। ১৯১৪ সালের লড়াই-ফেরত লোক সে। ফ্ল্যাণ্ডার্স, কামানের গর্জন—ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। শেলের টুকরোতে বাঁ পাখানা হয়তো উড়ে গিয়ে ইংলিশ চ্যানেলেই আশ্রয় নিয়েছে।

যুদ্ধ থামল, কুলবীর ফিরে এল দেশে। ভুটান সরকার কিছু কিছু জমি-জমা দিলে, রাজভক্তির পুরস্কার। কিন্তু সেই জমি নিয়েই শেষকালে বাধল নানা গণ্ডগোল। বুড়ো কুলবীরের এসব ঝামেলা ভালো লাগল না। একদিন দুটো টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সব চাপিয়ে দিয়ে, ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে, জলঢাকার হিম-শীতল তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে সে চলে এসেছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

তারপর দিন কেটে চলেছে। ভালোয় মন্দে, ছোট বড় সুখ-দুঃখে। সাত বছরের মেয়ে শিউকুমারীর বয়স এখন উনিশ। দিনের পর দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে কুলবীর, অথর্ব হয়ে পড়ছে। একটা পায়ের অভাবে বুনো ঘোড়ার মতো তেজীয়ান শরীরেও শিথিলতার সঞ্চার হয়েছে খানিকটা। অনেকটা এই কারণেই এতদিন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি শিউকুমারীর। বুড়ো বয়সে কুলবীরের অন্ধের যষ্টি।

রাত্রির অন্ধকারে দেখা যায়নি, এখন প্রথম সূর্যের আলোয় দিগন্তে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালী চুড়ো। শালবনকে অত ঘনবিন্যস্ত বলে বোধ হচ্ছে না। পাহাড়ের রেখাটা গাঢ় নীলিমা দিয়ে আঁকা, রাশি রাশি কুঞ্চিত রোমের মতো ঘন জঙ্গল তার সর্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়ে আছে।

হুঁকো হাতে নিয়ে দড়ির খাটিয়ায় বসে মহীতোষের ইতিহাস সবটা শুনল কুলবীর। চাপা তামাটে মুখখানার ওপর দিয়ে সংশয়ের নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে পড়ল।

—এখানে কেমন করে তোমাকে থাকতে দেব বাবু? ইংরেজের মুলুক। আমার দেশ ভুটান হলে তো কথা ছিল না, কিন্তু এখানে—

পচাইয়ের একটা হাঁড়ি নিয়ে শিউকুমারী বেরিয়ে এল বাইরে। বন-জ্যোৎস্নায় যাকে অপরূপ স্বপ্নময়ী বলে মনে হয়েছিল, দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল ততটা সুন্দরী সে নয়। খর্ব নাসিকা, ছোট ছোট চোখ। পরনের উড়ানিটার রং বিবর্ণ। ফর্সা মুখখানার ওপরে স্বাভাবিক অযত্নের একটা মলিন রেখা পড়েছে, গলার খাঁজে কালো হয়ে জমে আছে ময়লা। অপগতক্লান্তি সুস্থ শিক্ষিত মহীতোষের যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। নিতান্ত সাধারণ, নিতান্তই পথেঘাটে দেখা পাহাড়ী মেয়ে। বন-জ্যোৎস্না আর সোনালী অজগরের মতো খরধার নদীর পটভূমিতে আলোর পাখায় যে ভর দিয়ে নেমে এসেছিল, সে যেন নিতান্তই অন্য লোক।

মহীতোষ কোনো জবাব দিলে না কুলবীরের কথায়, জবাবটা দিল শিউকুমারী। বললে, না বাবা, বাঙালীবাবুকে কটা দিন রাখতেই হবে। এখন এখান থেকে বেরোলেই অংরেজ ধরে নেবে ওকে। তুমি স্বাধীন ভুটিয়া, স্বাধীন বাঙালীকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করছ কেন?

এবার চমকাবার পালা মহীতোষের। আশ্চর্য, এমন একটা কথা এই নোংরা পাহাড়ী মেয়েটা বলতে পারল কী করে? এ কি স্বাধীন পাহাড়ী রক্তের থেকে স্বতোৎসারিত অথবা এই আরণ্যক উন্মুক্ত পৃথিবীর প্রভাব? মহীতোষ তাকিয়ে রইল শিউকুমারীর দিকে। সুগঠিত দেহ—লালিত্যের চাইতে দৃঢ়তা বেশি। ছোট ছোট চোখ দুটোতে শাণিত দৃষ্টি। কানে রূপোর দুটো প্রকাণ্ড আভরণ—বাঙালী মেয়ের নরম কান হলে ছিঁড়েই নেমে পড়ত। এক লহমায় মনে হল ভুটানের স্বাধীন সৈনিকের জন্ম দেবার অধিকারিণী

বীরমাতাই বটে।

কিন্তু কথাটা কুলবীরের মনে ধরেছে। স্বাধীন জাত—প্রতিদিন বিদেশী শৃঙ্খলের অপমান বয়ে বেড়াতে হয় না। তা ছাড়া নিজে লড়াই করেছে—কাদামাখা বোমাবিধ্বস্ত ট্রেঞ্চে, ফাটা শেলের ফুলঝুরিতে, রাশি রাশি বুলেটের মধ্যে, বেয়নেটের ধারালো ফলায়। সৈনিকের মর্যাদা সে বোঝে। আর তা ছাড়া মহীতোষও সৈনিক বইকি। স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে যে সে-ই তো সৈনিক।

কুলবীর চিন্তিত মুখে হুঁকোয় টান দিয়ে বললে, আচ্ছা, থাকো। এখন কোনো ভয় নেই—এবেলা লোকজনের আমদানি হয় না জঙ্গলে। কিন্তু বিকেলে চা বাগান থেকে সব আসে, তাদের সামনে পড়লে বিপদ হতে পারে।

শিউকুমারী বলল, সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি ঠিক করে নেব।

মহীতোষ কৃতজ্ঞ গাঢ় চোখে একবার তাকালো শিউকুমারীর আনন্দিত উজ্জ্বল মুখের দিকে। অস্পষ্ট গলায় বললে, তোমার দয়া থাপাজী।

—না, না, দয়া আর কিসের। এসেছো, থাকো দুদিন।—কুলবীর অল্প একটু হাসল, তারপর কাঠের পায়ে খটখট করে ঘরের ভেতরে চলে গেল। আশ্রয় দিয়েছি, কিন্তু সংশয় কাটছে না।

থাকার অনুমতি মিলল, কিন্তু মহীতোষ ভাবতে লাগল, থাকা কি সত্যিই সম্ভব। পাহাড়ীদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর—ঝোপড়ী। দড়ির খাটিয়া। পচাইয়ের উগ্র দুর্গন্ধ। চারদিকে নীল জঙ্গল, পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখে কারাগারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের প্রকাণ্ড বিক্ষুব্ধ জগৎটাতে ইতিহাসের দ্রুত আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কী যে ঘটে চলেছে তা এখান থেকে জানবার বা অনুমান করবারও উপায় নেই। এ কি আশ্রয়, না আন্দামানে নির্বাসন?

শিউকুমারী এগিয়ে এল। পাহাড়ী মেয়ের সহজ নিঃসংশয়তায় একখানা হাত রাখল মহীতোষের কাঁধের ওপর। বললে, বাঙালীবাবু, কী ভাবছ?

মহীতোষ অন্যমনস্কভাবে বললে, কিছুই তো ভাবছি না।

—না, কিছুই ভাবতে হবে না। কোনো ভয় নেই তোমার, অংরেজ এখানে তোমাকে খুঁজে পাবে না!

মহীতোষ ম্লান হাসল: ঠিক জানো তুমি?

—জানি বইকি! কিন্তু এখানে থাকতে হলে তো বসে বসে ভাবলে চলবে না। কাজ করতে হবে। চলো, জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনি।

একটা কিছু করবার সুযোগ পেয়ে যেন হাল্‌কা হয়ে গেল অনিশ্চিত অস্বস্তির বোঝাটা। মহীতোষ উঠে দাঁড়ালো, বললে, চলো।

শালবনের পথ। নিচের দিকটা দাবানলে জলে গেছে এখানে ওখানে। শাল শিশুরা আগুনে পুড়ে গিয়ে কালো কালো কতকগুলো খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। কিন্তু আগুনে পুড়েছে বলেই ওরা মরবে না। এ হচ্ছে ওদের জীবন-শক্তির প্রথম পরীক্ষা, ভাবীকালে বনস্পতি হওয়ার গৌরব লাভ করবার পরে প্রথম অগ্নি-অভিষেক। তিন-চার বছর দাবানল ওদের ডাল-পাতা পুড়িয়ে নির্জীব করে দেবে, কিন্তু তার পরেই অগ্নি-উপাসক ঋত্বিকের মতো নির্দাহন শক্তি লাভ করবে ওরা। দিনের পর দিন বড় হয়ে উঠবে—ঋজু হয়ে উঠবে—নিজেদের বিস্তীর্ণ করে দেবে, ডুয়ার্স থেকে টেরাই পর্যন্ত।

ডালে ডালে পাখি। চেনা-অচেনা, নানা জাতের, নানা রঙের। ময়ূর আর বন-মুরগীর ছুটোছুটি। চকিতের জন্যে দেখা দিয়েই বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে যায় হরিণের পাল। এখান ওখান দিয়ে ঝোরার জল। দুপাশে সবুজ ঘন-বিন্যস্ত ঝোপ, বড় বড় ঘাস, অসংখ্য বুনো ফুল। পায়ে পায়ে ভুঁইচাঁপার নীল-বেগুনী মঞ্জরী।

কাঠ আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে চলেছে দুজনে। বেশ লাগছে মহীতোষের। জীবনের রূপটা যে এত বিচিত্র, এমন মনোরম, এ কথা আগে কি কখনো কল্পনা করতে পারতো মহীতোষ? কিন্তু আর নুয়ে নুয়ে খড়ি কুড়োতে পারা যায় না। পিঠটা টনটন করছে।

শিউকুমারী ডাকল, বাঙালীবাবু?

মহীতোষ চোখ তুলে তাকালো: কী বলছ?

—হাঁপিয়ে গেছ তুমি। এসব কাজ কি তোমাদের পোষায়? এসো, জিরিয়ে নিই।

একটা শালগাছের গোড়ায় শুকনো পাতার স্তূপের উপর বসল দুজনে। নীল, ঠাণ্ডা ছায়া, খসখসে শালের পাতায় বাতাসের শিরশিরানি। ঘুঘু ডাকছে। ভুঁই চাঁপার ওপরে উড়ে বসছে নানা রঙের বুনো প্রজাপতি। গাছের ডালে ডালে বানর লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। শান্ত, সুন্দর, ঘুমন্ত অরণ্য। হিংস্র রাত্রির অবসানে জানোয়ারেরা হয়তো ঝোপ আর ঘাস-বনের ভেতরে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখন।

শিউকুমারী আস্তে আস্তে বললে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাঙালীবাবু।

মহীতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল: না, কষ্ট আর কিসের?

—কষ্ট নয়? দেশ-গাঁ ছেড়ে কোথায় এসে পড়েছ। এখানে জঙ্গল, আমরা জংলা মানুষ। এ তো তোমার ভালো লাগবার কথা নয়।

মহীতোষ মৃদু হাসল: কিন্তু ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো নিশ্চয়ই।

—তা সত্যি।

শিউকুমারীর মনটা হঠাৎ ভারাতুর হয়ে উঠল। শুধু এইটুকুই ভালো, ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো? তার চাইতে আরো কিছু ভালো নেই কি এখানে? জঙ্গলের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া—হাওয়ায় ঝরে-পড়া শালের ফুল। রাত্রিতে মাতাল-করা বন-জ্যোৎস্না।

জলঢাকার কলরোল। কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার মুকুট। দূরের পাহাড়ে পাথর-কাটা পথের ওপর যখন জংলা কলার পাতা হাওয়ায় কাঁপে, জানোয়ারের পায়ে লেগে গড়িয়ে-পড়া পাথরের শব্দে যখন মনে হয় দূরবাসী পিতম ঘোড়া ছুটিয়ে অভিসারে আসছে, তখন শিউ-কুমারীর ইচ্ছে করে—

কিন্তু শিউকুমারীর যে ইচ্ছে করে, সে ইচ্ছে মহীতোষের নয়। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ। ছাব্বিশে জানুয়ারি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাত্রির তপস্যা। আগস্ট আন্দোলন—ডু অর ডাই। সেই জগৎ থেকে, সেই আন্দোলিত আবর্তিত বিপুল জীবন থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল সে? বিক্ষুব্ধ বোম্বাই—উন্মত্ত কলকাতা। পথে পথে 'বন্দেমাতরম্'। লাঠি, বন্দুক, রক্ত, আইন। চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ঘুরে যায় সমস্ত। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—সেই গর্জিত সমুদ্রের তরঙ্গে আফ্রিকার বনভূমির শিলাসৈকতের মতো জীবনের একটা অজ্ঞাত-তটে নিক্ষিপ্ত হয়েই পড়ে থাকবে সে? আকাশে যেখানে ঘূর্ণিত নক্ষত্রমালায় আর জ্বলন্ত নীহারিকায় ভাঙা-গড়ায় প্রলয় চলেছে, সেখান থেকে কক্ষভ্রষ্ট মৃত্যু-সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে থাকবে নিবে যাওয়া উল্কা?

মহীতোষ বললে, দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ তোমরা। এ ঋণ কী করে শোধ হবে জানি না।

—দয়ার ঋণ আমরা শোধ নিই না বাঙালীবাবু—শিউকুমারীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সে আমাদের নিয়ম নয়। কিন্তু চলো, বেলা উঠে গেল।

খোঁচা খেয়ে মহীতোষ আশ্চর্য হয়ে গেল। এ আকস্মিক তীক্ষ্ণতার অর্থ কী? ডুয়ার্সের জঙ্গলের মতোই জংলী মেয়ের চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা।

ছোট কাঠের বোঝাটা মহীতোষ তুলে নিলে নিঃশব্দে।

শালবনের ছায়ামেদুর কবিতায় ছন্দপতন হয়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে বুনো হাতির ডাক। জলঢাকার কলগর্জন ছাপিয়ে মেঘমন্দ্রের মতো সে ডাক ভেসে এল।

কক্ষভ্রষ্ট উল্কা। কিন্তু নিবতে চায় না—বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে অবিরাম। তবু উপায় নেই, থাকতে হবে; অন্তত ক'টা দিনের জন্যে আশ্রয় নিতে হবে—যে পর্যন্ত অরবিন্দ ফিরে না আসে। আর মহীতোষ জানে, মনের দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই জানে, অরবিন্দ ফিরে আসবেই। যেখানে থাক, যেমন করে থাক, তাকে খুঁজে বার করবেই। মৃত্যুর হাত এড়ানো চলে, কিন্তু অরবিন্দের চোখকে এড়াবার উপায় নেই। তার দুটো চোখ যেন লক্ষ লক্ষ হয়ে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস-অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

তবু দিন কাটে। খড়ি কুড়োয়, কুলবীরের গাদা বন্দুক নিয়ে বন-মুরগী শিকার করে, হরিণের সন্ধান করে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় এখনি হয়তো কোথা থেকে একটা ছায়ামূর্তির মতো অরবিন্দ সামনে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু অরবিন্দ আসে না। যেখান সেখান থেকে বনলক্ষ্মীর মতো দেখা দেয় শিউ-কুমারী। কাঁধে কলসী, ভিজে শাড়ি সুললিত দেহের খাঁজে খাঁজে ভাজে ভাঁজে জড়িয়ে রয়েছে। মৃদু হেসে চোখের তীব্র চাহনি হেনে বলে, শিকার মিলল ?

থমকে দাঁড়িয়ে যায় মহীতোষ। দৃষ্টিটাকে বন্দী করে ফেলে শিউকুমারীর অনিন্দ্য দেহসুষমা। মনে রঙ লাগে। নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে অবচেতনার স্বীকারোক্তি : মিলল বলেই তো মনে হচ্ছে।

শিউকুমারীর দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে যায় : সত্যি ?

—সত্যি।—যেন অদৃশ্য শয়তানের শৃঙ্খলে টান লাগে, এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় মহীতোষ : অনেক খুঁজে এইবার পাওয়া গেল বলে ভরসা হচ্ছে।

শিউকুমারী আর দাঁড়ায় না। দেহভঙ্গিমার উন্মত্ত আলোড়ন রক্তের কণায় কণায় জাগিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। আর পরক্ষণেই যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যায় মহীতোষের। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়, মনে হয় একান্তভাবে ব্রতচ্যুত, যোগভ্রষ্ট। শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো ? ছাব্বিশে জানুয়ারির সঙ্কল্প ভুলে গিয়ে পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে বনে বনে প্রেম করে বেড়াচ্ছে সে ?

দু হাতে মাথাটা টিপে ধরে মহীতোষ। নাঃ, আর নয়। এ কোন্ জালে দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়ছে সে ? স্বাধীনতার সৈনিক—শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের কান্নায় কন্যাকুমারী থেকে গৌরীশেখরের তুহিন্ শৃঙ্গ অবধি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ কি মোহ তার ! এইভাবেই সে কি তার কর্তব্য পালন করছে ?

বিকেল থেকে রাত নটা পর্যন্ত পচাই-লোভী কুলি আর পাহাড়ীদের আড্ডা বসে কুলবীরের দোকানে। কাঠের পা কুলবীর একা সব দেখাশোনা করতে পারে না ; শিউ-কুমারী কাজের সহায়তা করে তার। মৃদু হাসির সঙ্গে ক্রেতার দিকে এগিয়ে দেয় পচাইয়ের ভাঁড। মনে রঙ লাগে ; নেশার রঙ—শিউকুমারীর চোখের রঙ। ভুল করে খরিদ্দারেরা বেশি পয়সা দিয়ে ফেলে।

আর সেই সময়ে কুলবীরের একটা ঢোলা হাফ-প্যাণ্ট পরে ঘরের পেছনে একটা চৌপাইয়ের ওপরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মহীতোষ। এই সময়টাই তাকে অজ্ঞাতবাস করতে হয়। কুলিরা আসে, কুলিদের সর্দার আসে। ফরেস্ট-অফিসের দু-চারজন আধা-বাবুরও পদপাত ঘটে। ওখান থেকে হৈ চৈ শোনা যায়, হল্লোড় শোনা যায়, দুর্বোধ্য গানের কলি শোনা যায়, উন্মত্ত হাসিতে কুলবীরের ছোট ঝোপড়ীটা যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। আর সব কিছুর ভিতর দিয়ে একটা তরল তীক্ষ্ণ হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে—শিউকুমারী হাসছে।

মোহ কাটাতে চায় মহীতোষ। কিন্তু মোহ কি সত্যিই কাটে ? শিউকুমারী হাসছে

—পাহাড়ী মেয়ে পচাই বিক্রির খরিদ্দারদের খুশী করবার জন্যে তার অভ্যস্ত হাসি হাসছে! তাতে মহীতোষের কোনো ক্ষতি নেই। তা হলে বুকের মধ্যে জ্বালা করে কেন, কেন মনে হয় শিউকুমারী তাকে ঠকাচ্ছে?

বন-জ্যোৎস্না শেষ হয়ে গেছে, এসেছে অমাবস্যা, আরণ্যক তমসা। অন্ধকারের মধ্যে মহীতোষ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে ছেঁকে ধরে তাকে। বুকের মধ্যে অসহায় কান্নার রোল ওঠে—অরবিন্দ, অরবিন্দ? এমন সময় তাকে ফেলে কোথায় চলে গেল অরবিন্দ?

নিজে চলে যাবে? এখুনি চলে যাবে এই কালো অন্ধকার-ঘেরা শালবনের ভেতর দিয়ে কালিমাখা জলঢাকার তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে? কিন্তু মন তাতেও উৎসাহ পায় না। কে যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে। একা চলে যেতে ভয় করে, ভয় করে আবার কোনো একটা নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ীদের এই ছোট ঘরেই কি সে চিরতরে বাঁধা পড়ে গেল, হারিয়ে ফেলল পথ-চলার ক্ষমতা? অরবিন্দ—এ সময়ে যদি অরবিন্দ থাকত!

কুলবীরের দোকানে কলরব ক্রমশ কমে আসছে। শিউকুমারীর হাসির আওয়াজ আর শোনা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে ঠুন ঠুন করে মিষ্টি শব্দ। কাঠের বাক্সের ওপর বাজিয়ে বাজিয়ে পয়সা গুনছে কুলবীর।

হঠাৎ কেরোসিনের টেমির আলো এসে মুখে পড়ে মহীতোষের। প্রদীপ হাতে বনরাজ্যের মালবিকা। চোখে সকৌতুক দৃষ্টি: চলো বাঙালীবাবু, ঘরে চলো। ওরা পালিয়েছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহীতোষ উঠে পড়ে। ঠিক প্রথম দিনটির মতোই হাত বাড়িয়ে দেয় শিউকুমারী: এসো, এসো!

আর কিছু মনেও থাকে না। একটু আগেকার তীব্র হাসির জ্বালাটাও তেমনি করে আর কানের মধ্যে বিঁধতে থাকে না। এই মেয়েটি কি ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে!

দিন কাটছিল—কিন্তু আর কাটল না। জীবনের অপরিহার্য জটিলতা এসে দেখা দিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে পচাইয়ের দোকানে কাঠের কারবারী বলদেও আবির্ভূত হল। একমুখ কুটিল হাসি বিস্তার করে বললে, ভালো আছো শিউ?

শিউকুমারীর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, কুলবীর তাকালো সন্দিগ্ধ ভীত দৃষ্টিতে। সাংঘাতিক লোক বলদেও। পচাইতে তার নেশা নেই—কোনো মতলব না থাকলে এদিকে পা দিত না সে। কিন্তু কী সে মতলব?

কুলবীর অনুমান করবার চেষ্টা করতে লাগল।

বলদেও প্রতিপত্তিশালী লোক। যেমন কূটবুদ্ধি, তেমনি নির্মম। তাকে ভয় না করে

এমন লোক নেই। তবু শিউকুমারী ভয় করেনি তাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার হাত চেপে ধরে প্রণয় নিবেদন করেছিল বলদেও। বলেছিল, যত টাকা চাস—

কিন্তু কথাটা শেষ হয়নি। প্রকাণ্ড চড়টার বিভ্রম থেকে আত্মস্থ হয়ে বলদেও যখন মাথা তুলেছিল, তখন জলঢাকার বালি-বিস্তারের ওপর একটি প্রাণীরও চিহ্ন নেই। শুধু নদীর গর্জন পরিহাসের মতো বাজছে।

টাট্টু ছুটিয়ে বলদেও চলে গিয়েছিল। কিন্তু চড়ের জ্বালাটা যে সে ভোলেনি, সহজে ভুলবেও না—এ কথা শিউকুমারীও জানত।

বিবর্ণ মুখে শিউকুমারী বললে, ভালোই আছি।

—হুঁ, খুব ভালো আছো বলেই মনে হচ্ছে?—আবার নির্মমভাবে বলদেও হাসল। ছোট ছোট চোখ দুটোয় ঝিকিয়ে উঠল পাহাড়ী প্রতিহিংসার সর্পিল চমক।

বলদেও নেশা করে না সহজে। কিন্তু আজ তার কী হয়েছে—ভাঁড়ের পর ভাঁড় নিঃশেষ করে চলল সে। একটা দশ টাকার নোট কুলবীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, চালিয়ে যাও থাপাজী।

রাত বেড়ে চলল। একে একে খরিদ্দারেরা চলে গেল সবাই। কিন্তু বলদেও ওঠে না। অধৈর্য হয়ে টাট্টু ঘোড়াটা পা ঠুকছে বারে বারে, লেজের ঘা দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। জঙ্গলের পথে বুনো জানোয়ারকে ভয় করে না বলদেও। অমিত শক্তিমান লোক—ভোজালির ঘায়ে বাঘ মারতে পারে।

কী একটা কাজে কুলবীর ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বলদেও এগিয়ে এল। শিউকুমারীর চোখের ওপর রক্তাক্ত হিংস্র চোখ দুটো স্থিরনিবদ্ধ করে বললে, ফেরারী আসামীকে ঘরে জায়গা দিয়েছ?

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর কেঁপে গেল শিউকুমারীর: কে বলেছে তোমাকে?

—আমাকে ফাঁকি দেবে তুমি?—মুষ্টিগত শিকারের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্ত জিঘাংসার আনন্দে বলদেও বললে, সাত-সাতটা চোখ আছে আমার। কালই খবর যাবে ফাঁড়িতে: শুধু ওই বাঙালীবাবু নয়, হাতে দড়ি পড়বে থাপাজীরও।

শিউকুমারী আর্তনাদ করে উঠল।

বলদেও বললে, শোনো শিউ। এ খবর আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি, রেয়াৎ করতে পারি বাঙালীবাবুকেও। কিন্তু দয়া করে নয়। আজ রাতে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। যদি আসো, কোনো ঝামেলা হবে না। যদি না আসো, কাল সকলকে ফাটকে যেতে হবে।

শিউকুমারী তাকিয়ে রইল নির্বাক চোখে।

বলদেও খাপ থেকে বার করলে ঝকঝকে ভোজালিখানা, যেন উদ্দেশ্যহীনভাবেই তার

থায় পরীক্ষা করলে একবার। বললে, টাকার জন্ম ভেবো না। আমাকে খুশি করতে পারো তো যা চাও তাই দেব। যুদ্ধের বাজারে কাঠের ব্যবসা করছি জানো হয়তো। কিন্তু আজ রাতের কথা যেন মনে থাকে। যদি না যাও কাল সকালে যা হবে, তার জন্যে আমাকে দোষ দিও না।

বলদেও টলতে টলতে উঠে পড়ল ঘোড়ায়। সাত সেলের তীব্র একটা হান্টিং-টর্চের আলোয় অরণ্য উদ্ভাসিত করে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

কিন্তু এত ব্যাপার জানল না মহীতোষ। দড়ির খাটিয়ায় সে তখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাইরে শালের পাতায় মর্মর তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস, ঝোপড়ীর ফাঁকে ফাঁকে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। স্বপ্ন দেখছে সে। কিসের স্বপ্ন? ছাব্বিশে জানুয়ারির নয়, নাইন্থ আগস্টেরও নয়। পতাকাবাহী উন্মত্ত জনতার তরঙ্গবেগ কোথায় চাপা পড়ে গেছে বিস্মৃতির অতলতায়। জলঢাকার থরথরে বালির ওপর বন-জ্যোৎস্না। চোখে-মুখে জলের ছাট দিয়ে যে উড়ানির বাতাস দিচ্ছে, সে কি কোনো মর্মর মূর্তি? অথবা আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে নেমে-আসা কোনো আলোক-পরী?

চমকে ঘুম ভেঙে গেল। বুকের ওপর কে যেন আছড়ে পড়েছে এসে। বড় বড় নিঃশ্বাস মুখের ওপর এসে পড়ছে—অনুভব করা যাচ্ছে তার উত্তেজিত প্রসরণশীল হৃৎপিণ্ডের উৎক্ষেপ। কেরোসিনের টেমির আলোয় মহীতোষ দেখলে, শিউকুমারী!

—চলো, পালাই আমরা! আমাকে নিয়ে চলো তুমি!

আকস্মিক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে মহীতোষ দু'হাতে পাহাড়ী মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে: কোথায় যাব?

শিউকুমারীর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, অসহ্য আবেগে থরথর করে গলা কাঁপছে তার: যেখানে তোমার খুশি।

মহীতোষ ক্রমশ আত্মস্থ হয়ে উঠছে: কিন্তু কী করে নিয়ে যাবো তোমাকে? এখান থেকে শুধু হাতে তো পালানো চলে না। পদে পদে বিপদ! সে-সব এড়াবার জন্যে টাকা দরকার। অনেক দূর দেশে তো যেতে হবে, টাকা নইলে চলবে কী করে?

—টাকা! শিউকুমারী বলে বসল: কত টাকা চাই তোমার?

—দুশো—তিনশো। তাহলে তোমাকে নিয়ে সিকিম চলে যেতে পারব, চলে যেতে পারব একেবারে গ্যাংটকে। সেই ভালো। সেখানে গিয়েই ঘর বাঁধব আমরা। যা পেছনে পড়ে আছে, পেছনেই পড়ে থাক—মহীতোষের যেন নেশা লেগেছে: নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা।

দুশো—তিনশো। শিউকুমারী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় পাওয়া যাবে

এত টাকা ? কুলবীরের বাক্স হাতড়ালে কুড়িটা টাকার বেশি একটি আধলাও পাওয়া যাবে না, এ কথা তার চাইতে ভালো করে আর কে জানে !

মহীতোষ লোভীর মতো হাত বাড়ালো।

কিন্তু সরে দাঁড়াল শিউকুমারী। দুশো টাকা ! বলদেও আজ সারারাত প্রতীক্ষা করে থাকবে। চিন্তাগুলো একসঙ্গে আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুপুঞ্জের মতো ফুটতে লাগল। মাত্র একবার। একটি রাত্রির অশুচিতা। তারপরে যে জীবন আসবে, তার পবিত্র নির্মল স্রোতে ধুয়ে যাবে সমস্ত, মুছে যাবে সমস্ত গ্লানি আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

মহীতোষ বললে, বুকে এসো।

—টাকার যোগাড় করে আনছি—ঘর থেকে মাতালের মতো বেরিয়ে গেল শিউকুমারী। চিন্তার মধ্যে আগুন জ্বলে যাচ্ছে—যেন এক পাত্র চড়া মদ খেয়েছে সে। দুষ্ট ক্ষুধা বলদেওয়ের। এক রাত্রের জন্য তিনশো টাকা খরচ করবে, এমন বে-হিসেবী সে নয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে, যতদিন শিউকুমারীর যৌবন থাকে, ততদিন তাকে দলিত মথিত করে লুটে নেবার জন্যেই বলদেওয়ের এই কৌশল। এই ফাঁদে আরো অনেকেই পড়েছে।

কিন্তু শিউকুমারীর পক্ষে মাত্র এক রাত্রি। সমস্ত জীবনের জন্যে একটি রাত্রির চরম গ্লানি, চূড়ান্ত অপমানকে মেনে নেবে সে। তারপর কাল, পরশু ? তখন হয়তো তারা ভুটানের পাহাড় পেরিয়ে চলেছে সিকিমের দিকে। সমস্ত শিরায় শিরায় তীব্র জ্বরের জ্বালা নিয়ে ডিলিরিয়ামের রোগী যেমন উঠে বসতে চায়, ছুটে যেতে চায়, তেমনি করেই শিউকুমারী অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বিছানার ওপরে বিহ্বল হয়ে বসে রইল মহীতোষ। তার রক্তে রক্তে এ কি আশ্চর্য দোলা ! যেন নিশি পেয়েছে তাকে। তাই নিজের অতীত—জীবনের সঙ্কল্প, সব মিথ্যা আর মায়া হয়ে গেছে। নতুনের আহ্বান—বহু বিচিত্র—বহু ব্যাপক অনাস্বাদিত জীবনের আহ্বান। এই পুলিসের তাড়া—এই বিব্রত বিড়ম্বিত মুহূর্তগুলো—এদের ছাড়িয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ক্ষতি কী, ক্ষতি কী নিজেকে ভাসিয়ে দিলে আশ্চর্য একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সমুদ্রে ?

চাপা গলায় মহীতোষ ডাকলে, শিউ শিউ !

কিন্তু শিউ এল না, এল অরবিন্দ। সত্যিই অরবিন্দ। জঙ্গলের মধ্য থেকে উঠে এল অমানুষিক মানুষ। মহীতোষের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন বরফ-গলা জলের শিহরণ নেমে গেল।

মহীতোষের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বজ্রগর্ভ কঠিন আদেশের গলায় অরবিন্দ বললে, অনেক খুঁজে তোমার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু এখানে বসে একটা পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা ছাড়াও ঢের কাজ আছে তোমার। উঠে পড়ো।

বিহ্বল ভীত গলায় প্রশ্ন এল : কোথায় ?

—পঁচিশ মাইল দূরে। ভালো শেল্‌টার আছে, দলের লোক আছে। ওখানে থেকে শহরে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক বেশ করা চলবে। উঠে পড়ো।

—এখনি ?

—হ্যাঁ, এখনি।—মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কড়কড় করে উঠল অরবিন্দের। বাঁ-হাতে দেখা দিলে ছোট একটা কালো রিভলবার : তিন রাত পাহাড়ীদের ঘরে কাটিয়েই কি আয়েসী হয়ে গেলে নাকি ?

মহীতোষ কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালো। রিভলবারের সংকেতটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

অরবিন্দ বললে, বাইরে বড় ঘোড়া তৈরি আছে। দুজনকেই এক ঘোড়ায় উঠতে হবে। হারি আপ!

টর্চের আলো নিবে গেল। ঝোপড়ীর মধ্যে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পচাইয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দূরে ঝম ঝম করে প্রচণ্ড শব্দে ভুটিয়ারা ঝাঁঝি বাজাচ্ছে—অপদেবতাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে তারা। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে কি অপদেবতার পদধ্বনিও মিলিয়ে এল ?

চরম লাঞ্ছনা আর মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করা তিনশো টাকার নোট। শিউকুমারীর হাতের মধ্যে ঘামে ভিজছে নোটের তাড়াটা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে সে। কালো অন্ধকার, এক হাত দূরের মানুষ চোখে দেখা যায় না। শালের পাতায় শিরশিরানি—এখানে ওখানে বন্যজন্তুর আগ্নেয় নয়ন।

মহীতোষ—এই কালো অন্ধকারে কোথায় মহীতোষকে খুঁজে পাবে শিউকুমারী ? অরণ্য তাকে গ্রাস করেছে, নিঃশেষে তলিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। তবু অন্ধকারে শিউকুমারী খুঁজে ফিরছে। শালের চারায় পা কেটে রক্ত পড়ছে—কাঁটায় ছড়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। এত অন্ধকার—এমন দুশ্ছেদ্য তমসায় একটুখানি আলো যদি পাওয়া যেত!

আলো পাওয়া গেল। ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর। পটপট করে পাতা পোড়ার শব্দ—বন-মুর্গীর ভীত কলরব চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বন-জ্যোৎস্না নয়—দাবাগ্নি।

বন-তুলসী

টেলিগ্রাম এল বিমলেন্দুর তৃতীয় কন্যা নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠা হয়েছে। পত্নী এবং নন্দিনী দুজনেই সম্পূর্ণ কুশলে আছে, সুতরাং বাবাজীবনের উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনো হেতু নেই।

টেলিগ্রাম করেছেন পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়—আশা করেছেন কন্যালাভের সংবাদে জামাতা বাবাজী একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে উঠবে।

কিন্তু বিমলেন্দুকে আসলে দেখাচ্ছিল একটা চতুষ্পদের মতো। অদ্ভুত রকমের বোকা হয়ে গেছে মুখের চেহারাটা, ঘোলা চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘানির জোয়াল ঘুরিয়ে সের তিনেক খাঁটি সর্ষের তেল বের করে এল। খুব সম্ভব আসন্ন কন্যাদায়ের সম্ভাবনাটাই বেচারার মানসচক্ষে এসে দেখা দিচ্ছিল।

পুরো পাঁচ মিনিট পরে এঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়বার মতো ফোঁস করে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললে বিমলেন্দু। বললে, গেল।

আমি বললাম, কী গেল?

—যৌবন। প্রেম।—কর্তিত-পকেট অসহায় পথচারীর গলায় বিমলেন্দু বলে যেতে লাগল: রোমান্স। ক্রম এ ম্যান উইথ ফিউচার টু এ ম্যান উইথ পাস্ট।

আমি বললাম, যাওয়াই ভালো। বোকামির পালাটা পটাপট মিটে গেলেই ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারবে।

হয় কথাটা বিমলেন্দুর কানে গেল না, অথবা কান দিলে না। নাটকীয় ভাবে বলে যেতে লাগল, এখন দেখতে পাচ্ছি প্রেমটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকাই ভালো। প্রিয়া গৃহিণী হলেই জীবন-স্বপ্নে বারোটা বেজে গেল। তার চাইতে কবিদের অশরীরী প্রেম, অতীন্দ্রিয় মিলন—

আমি মন্তব্য করলাম, ক্লীবের সান্ত্বনা।

বিমলেন্দু ক্ষেপে উঠল। নাটক ক্রমশ মেলোড্রামার রূপ নিতে লাগল: বৌ, ছেলে-মেয়ে, বাঁধা রুটিনের চাকরি, যক্ষ্মার মতো জীবন। তার চাইতে অনেক ভালো একটা খোলা আকাশ, একটা অবার দিগন্ত, মিষ্টি মহুয়ার ফল, কালো সাঁওতালের মেয়ে—

হাসি চাপাটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কলকাতার বাইরে জীবনে বিমলেন্দু কখনো পা বাড়িয়েছে কিনা জানি না। হয়তো বড় জোর মধুপুর, দেওঘর অথবা পুরী, কিংবা শ্রীশ্রীবারাণসীধাম। সুতরাং অবারিত দিগন্ত আর মহুয়া ফলের স্বপ্ন দেখাটা তারই স্বাভাবিক অধিকার।

বললাম, ভুল করলে। মহুয়ার ফল অত মিষ্টি নয়, একটু তেতো। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই, সে কথা থাক। আসলে প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস—ওর একমাত্র উপমা ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ। সোপেনহাওয়ের পড়লে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। কিন্তু শুধু মানুষের প্রেম নয়—প্রকৃতির প্রেমও ওই রকম সর্বগ্রাসী।

—আফ্রিকার জঙ্গলের কথা বলছ?

—না। বাংলা দেশের মাঠঘাট, তার অবারিত দিগন্ত, তার ধানের ক্ষেত, তার বন-তুলসীর ঝাড়—তার শরতের সোনা-ঝরানো আকাশ—

—কথাটা বিশদ করো।

আমি বলতে শুরু করলাম :

কৈশোরের অনেকগুলো দিন আমার কেটেছে বাংলা দেশের একটুকরো পাড়াগাঁয়ে।

মনে রেখো, কৈশোরের কথা বলছি। যে বয়সে মানুষের জীবনে প্রথম নেশার মতো প্রথম প্রেম আবির্ভূত হয়, যখন চোখের সামনে পৃথিবীটাকে আরব্য উপন্যাসের মতো বলে মনে হতে থাকে। যখন জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে জানালার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, জলের ঝাপটায় চোখমুখ ভিজে গেলেও ভালো লাগে বৃষ্টি পড়া দেখতে। ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলোর সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় থাকে, সদ্য-ফোটা আকন্দের বুনো গন্ধ পর্যন্ত রক্তে রক্তে কথা কইতে চায়।

সেই বয়সে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে অনেকগুলো দিন আমি কাটিয়েছিলাম। জায়গাটা কোনো এক অখ্যাত ব্র্যাঞ্চ লাইনের অখ্যাততর একটি স্টেশন। ঝিমিয়ে-চলা প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলো পর্যন্ত সেখানে এক মিনিটের বেশি দাঁড়াত না। তিন-চার মাইল দূরে গ্রামগুলো থেকে যে সব যাত্রী আসত বা যে দু-চারজন নামত, সারা দিনরাত্রে সবসুদ্ধ ঘণ্টা দেড়েকের বেশি তারা স্টেশনের নির্জনতায় বিঘ্ন ঘটাত না।

তা ছাড়া বিপুলব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবী। রাঙা মাটির টিলায় তাল-বীথির মর্মর। বহু দূরে ধুলোর কুয়াশা বুনে চলা গোরুর গাড়ি। মাঝে মাঝে ভুট্টার ক্ষেত, বোরো ধানের নিচু জমি। আকাশে উড়ে যাওয়া বুনো হাঁস আর একফালি নদী। দুপুরের রোদে ঝক্‌ঝকে নুড়ির ওপর বিছানো চকচকে একটা মিটার-গেজের লাইন, ভুট্টা ক্ষেতের পাশে বাঁক নিয়ে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গিয়েছে, তার একপ্রান্ত একটা জংশন স্টেশনে, আর এক প্রান্ত কোথায় গেছে জানা ছিল না : কল্পনা করা যেত দিল্লী, বোম্বাই, কাশ্মীর, কারাকোরাম ছাড়িয়ে হয়তো তুষারমেরুর পেঙ্গুইনদের দেশে গিয়ে ওর যাত্রা শেষ হয়েছে।

মেজমামা ছিলেন স্টেশন মাস্টার। অকৃতদার লোক, একটা পয়েণ্টস্‌ম্যানকে নিয়ে তাঁর সংসারযাত্রা চলত। স্টেশনের কাজ শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরে বিবেকানন্দের বই আর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ মুখে নিয়ে বসে যেতেন। রাশভারী মানুষ, নিতান্ত দরকার না হলে কথাবার্তার বড় বালাই ছিল না।

আমার দিন কাটে কী করে ? পৃথিবী ডাক দিলে। ভুট্টার ক্ষেত, রেলের লাইন আর মরা নদীর ধারে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমি। টেলিগ্রাফের তারে ফিঙে আর বুনো টিয়ার নাচ, কাশফুলের বনে নানা রঙের প্রজাপতি। খোলা আকাশের সোনালি রোদ রক্তের মধ্যে যেন মদের মতো ক্রিয়া করত, যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আর তৈরি করে নিয়েছিলাম একগাছা ছোট ছিপ, মাঝে মাঝে মৎস্য শিকারের আশায় নদীর ধারে গিয়ে বসতাম। কাদা আর নুড়ির ভেতর দিয়ে তির তির করে রুপালি জল বয়ে যেত, নেচে উঠত ছোট ছোট মাছ, তাদেরই দুটো-একটাকে ধরবার

প্রত্যাশায় অসীম ধৈর্য ধরে ছিপ ফেলে বসে থাকতাম।

সেখানকার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুর মিলিয়েছিল নদীটা! মাঝে মাঝে কাশ, মাঝে মাঝে একগুচ্ছ বন-তুলসী। কেন জানি না, এই বন-তুলসীগুলোকে ভয়ানক-ভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। লাল রঙের বড় বড় ডাঁটায় রুক্ষ চেহারার ছোট ছোট পাতা—ভঙ্গুর, নমনীয়। মেঠো বাতাসে সহজেই নেচে উঠত, দুলে উঠত, একটা মৃদু মর্মরে ডাঁটা-পাতাগুলো আকুল হয়ে উঠত একসঙ্গে। তার মঞ্জরী থেকে ছড়িয়ে পড়ত জংলা কষায় গন্ধ—ওই গন্ধটার ভেতর দিয়ে চারদিকের প্রসারিত পৃথিবীটার একটা অভিনব আস্বাদ আমাকে ব্যাকুল করে দিত।

ওই বন-তুলসীর ঝাড়ের ভেতরে মাছ ধরবার জন্যে ছোট একটু জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেখানে বসেই চলত শিকার-পর্ব। শিকার তো ছাই—ছিপ ফেলে হয় রেললাইনটার অথবা আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকা; আর নয়তো ছোট ছোট মঞ্জরী ছিঁড়ে নিয়ে ডলে ডলে দু'হাতে তার আরণ্য-গন্ধটা মাখিয়ে নেওয়া। এই গন্ধবিলাসের পেছনে হয়তো খানিকটা ফ্রয়েডিক মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে সেদিন আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম সে কথাটা অস্বীকার করবার জো নেই।

এমন সময় সেই বন-তুলসীর পটভূমিতে মানবিক প্রেমের আবির্ভাব হল।

ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর নয়। জায়গাটা ছিল নির্জন, লোকজনের যাতায়াত ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে একদিন দেখলাম, একটি ছোট মেয়ে কেমন করে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বোধ হয় তুরীদের মেয়ে। বছর বারো-তেরো বয়স হবে—হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা থান ধুতি পরনে। হাতে একটা ছোট ঝুড়ি, নদী থেকে বালি নিতে এসেছে। সারা গা অপরিচ্ছন্ন, গালে মুখে কাদার দাগ। আমাকে বোকার মতো তার দিকে তাকাতে দেখে ফিক করে হেসে ফেলল।

মনে আছে,—ভারি মিষ্টি লেগেছিল হাসিটা। হয়তো তার অন্য কারণ আছে। আকাশে তখন শরতের রোদ সোনা ঝরাচ্ছিল, তার ছোঁয়ায় ছোট নদীর জল চিকচিক করছিল, বাতাসে বন-তুলসীর ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছিল—আর আমার রক্তে ছিল বন-তুলসীর গন্ধ। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রইলাম।

মেয়েটি বললে, কী মাছ পেলি বাবু?

আমি বললাম, কিছু পাইনি।

মেয়েটি বললে, তুই মাছ পাবি না, ব্যাঙ্ পাবি।

পূর্বরাগের প্রথম পর্যায়ে নায়িকার ভাষাটা ভদ্রজাতের নয়। আমি রেগে উঠে কী

বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই মেয়েটি মিষ্টি করে মুখ ভেংচে বন-তুলসীর ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল!

ছিপ হাতে তারপর আরো অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে। শরতের রোদ আর বন-তুলসীর গন্ধ স্নায়ুর ভেতর ঝিমঝিম করছিল—বহুক্ষণ অকারণে ভেবেছিলাম মেয়েটার কথা। না, অনুরাগে বিহ্বল হয়ে পড়িনি। মুখ-ভ্যাংচানির কথা যখনি মনে পড়ছিল তখনি ইচ্ছে করছিল একবার হাতের কাছে পেলে ফাজিল মেয়েটাকে গোটা দুই চড় বসিয়ে দেব।

তারপরে আরো অনেকদিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেছি ওখানে। প্রায়ই মনে হত ওই বাচ্চা মেয়েটা ভারি জব্দ করে দিয়েছে আমাকে, বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আর এক-দিন ধরতে পারলে এর শোধ তুলব।

কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। আমার প্রথম নায়িকা দেখা দিয়ে সেই যে হারিয়ে গেল, তারপরে আর কোনদিন সে ফিরে আসেনি। ভালোই হয়েছে। আর একবার এলে নির্ঘাত ঠ্যাঙানি খেত, তার পরিণতি কী হত জানি না। প্রতিশোধের ইচ্ছাটা চরিতার্থ হয়নি বলেই তাকে ভুলতে পারিনি, অবচেতন মনের ভেতরে সে আমার প্রথম নায়িকা হয়ে বেঁচে রইল—বেঁচে রইল বন-তুলসীর পৃথিবীতে!

আমার নায়িকা হারিয়ে গেল; তারপর হারিয়ে গেল সেই ছোট স্টেশন, সেই মকাই ক্ষেত, টিলার ওপরে তালের সারি, সেই রূপালি ছোট নদী আর সেই বন-তুলসী। চলে এলাম শহরে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। ইস্কুল, কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, রাজনীতি, সাহিত্য।

হাতের থেকে সেই উদ্ভিদ্‌-রসের কষায় গন্ধটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু রক্তের থেকে নয়। বহুদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, সরু সরু লালরঙের ডাঁটাগুলো বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছে; অনেক নিঃসঙ্গ ভাবনার অবকাশে শুনতে পেয়েছি ছোট ছোট সরু পাতাগুলোর দীর্ঘশ্বাসের মতো শিরশিরানি শব্দ। রোমান্টিক মনের মুহূর্ত-বিলাস আমন্থর হয়ে উঠেছে কটু-কষায় একটা গন্ধের উল্লাসে।

এই পর্যন্ত ছিল ভালো। আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম। বন-তুলসীও যে আমাকে ভালবেসে ফেলেছে তা কি বুঝতে পেরেছিলাম কোনোদিন? তোমাকে বলেছি, প্রেমের ধর্মই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস। মানুষের পক্ষে কথাটার প্রমাণ দরকার নেই—ওটা স্বতঃ-প্রমাণিত। কিন্তু বাংলাদেশের নিরীহ পল্লী-প্রান্তরও যে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে ভালোবাসতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা, সবে এম. এ. পাস করে বসে আছি। স্টেট্‌সম্যান আর অমৃতবাজারের পাতা খুলে মাস্টারী, প্রোফেসারী, যারই বিজ্ঞাপন দেখছি দু'হাতে দরখাস্ত

করে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য, তাতে ডাক-বিভাগের পক্ষেই নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধিত হচ্ছে মাত্র। নিরাশ হয়ে গীতাপাঠে মনোনিবেশ করব কিনা চিন্তা করছি এমন সময় ডাক এল বন্ধুর কাছ থেকে।

শিকারের নিমন্ত্রণ। ওদের বাড়ি উত্তর-বাংলার জংলা বিলের দেশে, বুনো হাঁস শিকারের অপূর্ব জায়গা। বিপ্লবী যুগে আমবাগানে টার্গেট প্র্যাক্টিস করে বন্দুক-পিস্তলের হাত খানিকটা রপ্ত করেছিলাম—এবারে সেটা কাজে লাগাবার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া মনের দিক থেকেও খানিকটা আউটিংয়ের দরকার ছিল, বেরিয়ে পড়লাম।

সত্যি দেশটাকে ভালো লাগল। এত বড় একটা আকাশ যে কোথাও আছে বহুদিন সে কথাটা মনেই ছিল না। মাঠ আর বিল। বিলে অজস্র বুনো হাঁস, হাড়গিলা, দুটো একটা ফ্লোরিক্যান, কাগ, চীনে কাগ, বক, ছোট বড় স্নাইপ, এমন কি চখা চখী পর্যন্ত। ছররা-মারা শিকারীর স্বর্গ-বিশেষ।

বন্ধু সুধীররা গ্রামের অবস্থাপন্ন তালুকদার, বাড়িতে দুটো বন্দুক। পাড়াগাঁয়ের স্বভাব-সিদ্ধ আতিথেয়তার সঙ্গে শিকারপর্বও পরমোৎসাহে চলতে লাগল। শাপলা-কলমী আর পদ্মপাতার জগতে বালিহাঁসদের নিশ্চিন্ত সংসারে আমরা হাহাকার সৃষ্টি করে দিলাম। সকালের দিকে বেরিয়ে দিনান্তে যখন রক্তমাখা পাখির ঝাঁক নিয়ে আমরা ফিরে আসতাম, তখন মনে হত যেন দিগ্বিজয় করে আসছি। অদ্ভুত একটা হিংস্র আনন্দ—শিকারের নেশা—আমাদের পেয়ে বসেছিল। গুলি খেয়ে ক্ষীণপ্রাণ পাখি যখন ছট্‌ফট করত, তার রক্তে রাঙা হয়ে যেত বিলের কালো জল, তখন অমানুষিক বিকট জয়ধ্বনিতে আমরা পরস্পরকে অভিনন্দিত করতাম। আবার আমাদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে হাঁসের দল যখন বন্দুকের পাল্লার বাইরে উড়ে পালিয়ে যেত তখন একটা চাপা আক্রোশে সমস্ত মনটাই যেন কালো হয়ে যেত। এক কথায় আমাদের মনের প্রচ্ছন্ন জল্লাদ-বৃত্তিটা তখন আত্মপ্রকাশের বেশ একটা ন্যায়সঙ্গত এবং নির্দোষ উপায় খুঁজে পেয়েছিল।

এমন সময় একদিন সুধীর বললে, রঞ্জন, একটু হাঁটতে পারবি?

—কেন রে?

—ছোট হাঁস মেরে আর সুখ নেই, বড় গেমের সন্ধান পেয়েছি।

—বড় গেম? বাঘ-ভালুক নাকি?

—দুর, বাঘ-ভালুক কেন? রাজহাঁস।

—রাজহাঁস?

—হাঁ, 'ইটালীয়ান ডাক'। কাল রাত্রে একটা খুব বড় ঝাঁক উড়ে গেছে, ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। এ বছর এই প্রথম এল। কোথায় নেমেছে জানবার জন্যে সকালে লোক

পাঠিয়েছিলাম। সে খোঁজ নিয়ে এসেছে, ঝাঁকটা পড়েছে মাইল পাঁচেক দূরের কমলার বিলে। মস্ত ঝাঁক, প্রায় হাজার খানেক পাখি আছে।

—এর মধ্যে পালায়নি তো?

—না, না। কমলার বিল খুব ভালো জায়গা—মাইল তিনেকের মধ্যে লোকজন নেই, ডিস্টারবড্ হবে না। তা ছাড়া রাজহাঁসগুলো এমনিতেই একটু বেপরোয়া, সুবিধেমত জায়গা পেলে সহজে নড়তে চায় না। যাবি কাল?

—বেশ, চল—

—কিন্তু মাইল পাঁচেক রাস্তা হাঁটতে হবে। গোরুর গাড়িতেও অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু অনেকটা ঘুরতে হবে, পাক্কা দশ মাইলের ধাক্কা। দিনটা কাবার হয়ে যাবে।

—তা হলে হেঁটেই যাওয়া যাবে।

—কিন্তু তোর অভ্যেস নেই, হাঁটতে তো কষ্ট হবে—

মনের জল্লাদটা নেচে উঠেছিল। সোল্লাসে বললাম, না না, কিছু কষ্ট হবে না। আরে, রোমে এসে রোমান না হতে পারলে কি চলে?

পরদিন ভোরের আবছায়া অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়া গেল। মাথায় হ্যাট, কাঁধে ফ্লাস্ক, চাকরের হাতে টিফিন-বাস্কেট আর বন্দুক। যাত্রা করলাম আমরা পাঁচজন।

কোমর-সমান বিন্নার বন আর ধান-ক্ষেতের আল্ ভেঙে মাইল খানেক এগোতেই আকাশ রাঙা হয়ে সূর্য উঠল। গ্রীষ্মকালে পুরী গিয়েছিলাম, তাই সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিনি, তার বর্ণনাই শুনেছি; দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে দু-তিনদিন টাইগার-হিলে চেষ্টা করেছি, কিন্তু মেঘ আর কুয়াশা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। শুনেছি, পাহাড় আর সমুদ্রের সূর্যোদয়ের তুলনা নেই। কিন্তু বাংলা দেশের বিশাল মাঠের ওপরে সূর্য ওঠা দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো, জীবনে একটা অত্যন্ত দামী জিনিস হারিয়েছ।

মাঠের পারে সূর্য উঠল। আকাশে ছড়িয়ে গেল সাত রঙের কিরণলেখা, হাঁসের ডিমের মতো চ্যাপ্‌টা একটা বিরাট রক্তের ছোপ বিলের জল আর সবুজ বনান্তকে মায়াময় করে তুলল। সে সূর্যোদয় আমি কখনো ভুলতে পারব না—সেই সূর্যের আলোয় বন-তুলসীর গন্ধ ছিল।

আমি ছিলাম সকলের পেছনে। পায়ের জুতোয় কাঁকড় ঢুকেছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখি ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। তা যাক—সে জন্যে আমার চিন্তা ছিল না। মাঠের পথ, হারাবো বলে ভাবিনি। বিন্নার জঙ্গল ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে, তার আড়ালে দূরে ওদের হ্যাট আর বন্দুকের নল দেখতে পাচ্ছিলাম।

আস্তে আস্তে চলেছি। শরতের রোদ তখন সমস্ত মাঠ-ঘাটের ওপরে পাতলা একটা সিল্কের ওড়নার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট খালের সামনে চলে

এলাম। তার ওপরে একটা বাঁশের পুল, সেইটে পেরিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু পুলে পা দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

চোখে পড়ল কালো পাথরের তৈরি ভেনাস। পূর্ণযৌবনা সাঁওতালের। মেয়ে বিন্না বনের আড়ালে নির্জন খালের ধারে দাঁড়িয়ে সযত্নে গাত্রমার্জনা করছে। চারদিকের পৃথিবীর মতোই নিঃসংকোচ এবং একান্ত নিরাবরণ। কনক-চাঁপা রঙের রৌদ্রে উদ্‌ঘাটিত অপূর্ব দেহশ্রী!

কোনো বিবসনা মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানো ভদ্ররুচির পক্ষে শুধু ধিক্কারজনক নয়, কল্পনাতীত। কিন্তু সেই মাঠ আর সেই সূর্যোদয় সেদিন যে পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, আমার চির-পরিচিত শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশের সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। লোভের বিকৃত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে আমি তাকাইনি—সে প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণই অবান্তর ছিল। শুধু চেতনার মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠেছিল: এ আশ্চর্য, এ অপরূপ! মনে হয়েছিল খালের জল, সূর্যের আলো, গাছপালার গন্ধ, সবাই মিলে যেন কণা কণা সৌন্দর্য দিয়ে ওকে তিলোত্তমা করে গড়ে তুলেচে—গড়ে তুলেছে একটা স্বপ্নের মূর্তি। যে কোনো মুহূর্তে ওই মূর্তিটা মিলে গিয়ে—গলে গিয়ে জলে আলোয় আকাশে হারিয়ে যেতে পারে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিল না। তারপর দেখলাম একপাশ থেকে একখানা ময়লা কাপড় মেয়েটি কুড়িয়ে নিলে। সযত্নে আবৃত করলে দেহ, ওপাশের আলের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলে। খানিক দূর এগিয়েই—হ্যাঁ, বন-তুলসী, আমার কৈশোরের সেই বন-তুলসী, তারই নিবিড় বনের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল।

আমার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যেন রণিত হয়ে উঠল কৈশোরের সেই গান, সেই মীড়-মূর্ছনা। আমার দু'হাতের ভেতর যেন ফিরে এসেছে একটা কটু-কষায় উদ্ভিদ-গন্ধ। আমার পথ ভুল হয়ে গেল, আমার মাথার মধ্যে সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল। কেমন যেন মনে হল সেই হারিয়ে যাওয়া নায়িকা আজ পরিপূর্ণ যৌবনে ওই বন-তুলসীর কুঞ্জে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে।

দিবাস্বপ্ন? সস্তা রোমান্টিসিজ্‌ম? তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি সেই সূর্যোদয়ের কথা, বলেছি আমার মগ্ন-চৈতন্যের ভেতরে সেই বন-তুলসীর বিচিত্র আস্বাদ। হয়তো তখন আমার মনের ভেতরে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল, চেতন সত্তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়েছিল অবচেতনার আকস্মিক উৎক্ষেপে; আমি বন-তুলসীর জঙ্গলের দিকে নেমে এলাম।

বহুদিন পরে শরতের রৌদ্র আর বাতাসের ঐকতান মিলল, বহুকাল পরে আমাকে আলিঙ্গন করলে সেই লাল নরম ডাঁটাগুলি, সেই খসখসে পাতাগুলো আমার গালে মুখে

ভালোবাসার ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে। বন ভেঙে আমি এগোতে লাগলাম। কোথায় চলেছি জানি না। আমার নায়িকার সন্ধানে কি? বোধ হয় তাও নয়। ডাঁটা-পাতার সেই স্পর্শ, দলিতমথিত গাছগুলোর সেই অপরূপ আদিম গন্ধ আর বাতাসের শির শির শব্দই আমার কাছে একান্ত হয়ে উঠেছিল, সত্য হয়ে উঠেছিল।

ঘণ্টাখানেক বনের মধ্য দিয়ে চলে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। নিচে মাটি নেই, এত ঘন হয়ে উঠেছে যে ওদেরই একরাশকে চেপে বসতে হল আমাকে। চারিদিকে বন-তুলসী আমায় ঘিরে ধরেছে—আমার মাথা থেকে প্রায় দু'হাত উঁচুতে উঠে ওরা আমাকে আড়াল করে রেখেছে। কোনোদিকে কিছু দেখবার নেই—শুধু ওপরে নীল-নিবিড় আকাশ আর তার কোলে শ্বেত-পদ্মের উড়ন্ত পাপড়ির মতো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে নিয়েছিলাম, অবগাহন করে নিয়েছিলাম বন-তুলসীর নিবিড় স্পর্শ-সান্নিধ্যে। পর পর যখন গোটাপাঁচেক সিগারেট শেষ করেছি তখন খেয়াল হল। তখন আমার মগ্ন-চৈতন্যের ওপরে বাস্তব চেতনার আলো পড়ল। মনে পড়ে গেল, আমি সুধীরদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলাম। ওরা হয়তো এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছে, হয়তো ভাবছে—

হাতে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় দশটার কাছাকাছি। সর্বনাশ, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। দু পকেট ভরে বন-তুলসীর পাতা আমি ছিঁড়ে নিলাম, তারপর উঠে পড়লাম বেরিয়ে আসার জন্যে।

কিন্তু আমার মতোই বন-তুলসীও বহুদিন বাদে আমাকে ফিরে পেয়েছিল। আমি ছাড়তে চাইলেও সে আমাকে ছাড়তে রাজী হল না, ঘন-নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরল।

বেরুতে চাই, আর বেরুতে পারি না। মোহভঙ্গের পরে বুঝতে পারলাম কত বড় বোকামি করে ফেলেছি আমি। একটু আগেই তুমি বলছিলে, প্রেমের প্লেটোনিক রূপটাই নিরাপদ। হ্যাঁ, মানুষের পক্ষেও, প্রকৃতির পক্ষেও।

এ বনের যেন শেষ নেই। মনে হতে লাগল এই বন-তুলসীর ঝাড় আদি-অন্তহীন,—যেন কার একটা বিচিত্র জাদুমন্ত্রে এত বড় পৃথিবীটার পাহাড়-সমুদ্র-নগর-গ্রাম সব বন-তুলসীর জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমার অতীত জীবন, আমার সভ্যতা, আমার আত্মীয়স্বজন, সব মায়া, সব মিথ্যে। এই জঙ্গল থেকে আমি আর কোনোদিন বেরুতে পারব না।

কোনোদিন বেরুতে পারব না! ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। আমার প্রেম এখন কোটিভুজ একটা রক্তশোষী জানোয়ার হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছে, তার লাল-লাল ডাঁটাগুলিতে রক্তের তৃষ্ণা, তার শিরশিরে পাতাগুলোর স্পর্শে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

ওপরে শরতের রোদ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে আমার মাথার ভেতরে বিঁধতে লাগল, আমার চোখের দৃষ্টি আসতে লাগল ঝাপসা হয়ে। দু'হাতে জঙ্গল ঠেলে আমি এগোতে লাগলাম, কিন্তু বৃথা। এ বনের শেষ নেই—এর ভেতর থেকে কোনোদিন লোকালয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবো না আমি। মাথা উঁচু করে জগৎটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চারপাশের উঁচু-নিচু অসমতল জমির ওপরে আমার অভিশপ্ত প্রেম ছাড়া আর কিছুই নেই, কোনো কিছুর চিহ্নই নেই!

প্রাণপণে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি—কিন্তু জঙ্গল ভেঙে ভেঙে আমার সমস্ত শক্তিই যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সামনে এগোবার চেষ্টা করে বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। এক পায়ের জুতো কোথায় ছিটকে চলে গেল, টের পেলাম পকেট থেকে পড়ে গেল মনিব্যাগটা। কিন্তু সেগুলো খোঁজবার অবস্থা নয়, বেরুতে হবে, যেমন করেই হোক বেরুতে হবে। মনে হতে লাগল কোথায় কতদূরে আমার কলকাতা, তার বাড়িঘর, তার ট্রাম-বাস, তার সুন্দর স্বাভাবিক জীবন! আজ এই বন-তুলসীর জঙ্গলের ভেতরে আমি মরে যাচ্ছি—কেউ আর কোনোদিন আমায় খুঁজে পাবে না।

অসহায় গলায় বার কয়েক চেঁচিয়ে উঠলাম, কিন্তু কে সাড়া দেবে? সেই আদিগন্ত মাঠের ভেতর আমার অবরুদ্ধ আর্তনাদ শুনবে কে? কোনো আশা নেই, কোনো উপায় নেই। হয় এখানে দম আটকে মরে যাবো, নইলে সাপে কামড়াবে—আশেপাশে বাঘ থাকাও অসম্ভব নয়।

আর একবার শেষ শক্তিতে এগোবার চেষ্টা করেই একরাশ গাছের সঙ্গে পা জড়িয়ে আমি পড়ে গেলাম। বন-তুলসীরা সাপের মতো কিলবিল করে আমাকে আঁকড়ে ধরল। জ্ঞানটা সম্পূর্ণ লোপ হয়ে যাওয়ার আগে মনে হল: এইখানে মরে যাবো আমি, পচে গলে আমার দেহটা এখানকার মাটিতে মিশে যাবে। তারপর আমার শরীরের সারে এখানে মাথা তুলবে আরো সতেজ, আরো নিষ্ঠুর, আরো একরাশ বন-তুলসী, নিশ্চিহ্ন করে ওরা আমাকে গ্রাস করবে, আত্মসাৎ করে নেবে—

কিন্তু জঙ্গলের বাইরে আমার টুপিটা কুড়িয়ে পেয়েছিল বলেই অজ্ঞান অবস্থায় সে-যাত্রা আমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিল সুধীর। রক্ষা করতে পেরেছিল আমার নায়িকার সেই উর্ণনাভ-প্রেম থেকে।

তাই তোমাকে বলছিলাম, তবু আমাদের কলকাতাই ভালো। আর ভালো মানুষের প্রেম, যেখানে তুমি না থাকো, সৃষ্টির স্বাক্ষর সন্তানের মধ্যে দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে—প্রকৃতির মতো মানুষের পৃথিবী যেখানে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে নিজের ভেতর তোমাকে অবলুপ্ত করে নেবে না।

হয়তো

মঞ্জুশ্রী বললে, 'চমকালে ?'

হাতের সিগারেটটা তখনও কাঁপছিল সুদেবের। জবাব দিতে একটু সময় লাগল।

'না—চমকাব কেন ?'

শঙ্খধ্বনির মতো আওয়াজ তুলল ইলেকট্রিক এঞ্জিন। গাড়ি এগিয়ে চলল। আর প্ল্যাট-ফর্মটা পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত—ট্রেন খানিকটা স্পীড না নেওয়া পর্যন্ত সুদেব নিজেকে সহজ করে নেবার অবকাশ পেলো।

এইবার সে চোখ তুলে চাইল মঞ্জুশ্রীর দিকে।

বেশ নতুন রকমের মনে হল—ঠিক এই বেশে মঞ্জুশ্রীকে এর আগে কখনো দেখেনি। পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি। কপালে সিঁথিতে গাঢ় রঙের সিঁদুর ঝকমক করছে গাড়ির আলোয়।

সিঁদুর ? তা হোক। প্রায় ছ'বছর পরে সুদেবের তাতে কী আসে যায়।

স্থির শান্ত দৃষ্টিতে মঞ্জুশ্রী তাকে দেখছে, এই অনুভূতিটা অস্বস্তিকর। কী দেখছে ? এর মধ্যে কতখানি বদলে গেছে সে ? কিংবা বুঝতে চাইছে—রেবা দত্তকে নিয়ে সে সুখী হয়েছে কি না ? সুদেব হাসতে চেষ্টা করল। সিগারেটে টান দিলে একটা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'চমকাবার কিছু নেই মঞ্জু। পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে আজকাল। তাছাড়া তারকেশ্বর তো খুব দূর জায়গা নয়।'

মঞ্জুশ্রী বললে, 'কিন্তু তাহলেও তোমার সঙ্গে আজ দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।'

ধাঁধা লাগল। ভুরু-দুটো একটু কুঁচকে উঠল সুদেবের।

'বুঝতে পারলুম না।'

মঞ্জুশ্রী হাসল। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সামনের একটু উঁচু দাঁত দুটো ফুটে উঠল এবার : 'আমি থার্ড ক্লাসের যাত্রী। তোমাকে এই কামরায় দেখে হঠাৎ উঠে পড়তে ইচ্ছে করল। নইলে আমি থাকতুম ট্রেনের আর এক কোণায়, নেমে যেতুম ভিড়ের ভেতরে—আমাকে দেখতেও পেতে না।' আবার হাসল মঞ্জুশ্রী : 'অবশ্য তাতে তোমার কোনো ক্ষতি ছিল না।'

'আশা করি, তোমারও না।'

'না।'—সহজভাবেই জবাব দিলে মঞ্জুশ্রী : 'তবু এই ফার্স্ট ক্লাসে তোমাকে একা বসে থাকতে দেখে হঠাৎ কি রকম মনে হল, উঠে পড়লুম। সেই পুরনো অভ্যেসেই বোধ হয়।'

'ছ'বছরেও অভ্যেসটা কাটল না ?'

'অভ্যেস বদলাতে মেয়েদের সময় লাগে। আরো যদি সেটা সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।'

সুদেব আশ্চর্য হচ্ছিল। স্পষ্টতায় নয়, মঞ্জুকে সে জানে—তার চিন্তায় অস্বচ্ছতার আড়াল নেই কোথাও। এই জন্যেই তাকে একদিন ভালবেসেছিল সুদেব, এই জন্যেই আর একদিন তাকে সে ভয় করত।

সুদেব বললে, 'তোমার তিনি একথা শুনলে রাগ করবেন।'

'কার কথা বলছ?'

'যিনি তোমার কপালে নতুন করে সিঁদুর পরিয়েছেন। তিনি কি আজ সঙ্গে নেই?'

'তিনি কোথাও নেই। নতুন করে সিঁদুর কেউ তো পরায়নি।'

প্রথমবারের চাইতে দ্বিতীয় চমকটা আরো জোরালো হয়ে ধাক্কা দিলে সুদেবকে। সিগারেটটা ঠোঁটে তুলতে চাইছিল, তার বদলে জানলার বাইরে হাওয়ার ঝড়ে ছেড়ে দিলে সেটাকে।

'তা হলে সিঁদুর—'

'কেন, পরতে নেই?'

'ওটা পরার দায় থেকে তোমাকে তো নিষ্কৃতি দিয়েছিলুম।'

'তা দিয়েছিলে।'—মঞ্জুশ্রীর শান্ত চোখ দুটোয় যেন কৌতুকের আভা মিলল একটুখানি: 'সিটি সিভিল কোর্টের থার্ড বেঞ্চে।'

'তারপরে তুমি তো কুমারী।'

'ওটা বিলিতি মতে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল খাঁটি হিন্দু নিয়মে।'

'সে বিয়ে তো বাতিল হয়ে গেছে।'

'আইনত। কিন্তু হিন্দু বিয়ের শর্ত জানো তো? জন্ম-জন্মান্তর।'—স্বর আরো সহজ মঞ্জুশ্রীর, কপালে সিঁদুরের মস্ত ফোঁটাটা জ্বল-জ্বল করতে লাগল প্রকাণ্ড একটা চুনীর মতো—মনে হল, তার সিঁথির ওপর দিয়ে যেন রক্তের একটা রেখা টানা।

কোনো একটা স্টেশনে ট্রেন থামল—হয়তো সিঙ্গুর, হয়তো অন্য কিছু। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শাঁখের আওয়াজ তুলে ছুটতে আরম্ভ করল আবার।

একবারের জন্যে স্মৃতি চমকালো সুদেবের। শাঁখ বাজছিল, উলু উঠছিল, কাঁপা হাতে তার গলায় মোটা গোড়ের মালাটা পরিয়ে দিচ্ছিল মঞ্জুশ্রী। লজ্জায় চোখ দুটো প্রায় বোজা—গালের চন্দনবিন্দুগুলোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছিল ঘামের ফোঁটা। কে এক প্রৌঢ়া বলছিলেন, 'চোখ খোল্—এই মেয়ে, চোখ খোল্—'

বাইরে কতগুলো বাড়ি-ঘরের আলো একবার ঝকঝক করে উঠেই ঝাঁপ মারল ঘুনি-লাগা অন্ধকারে—ভূপেন বসু অ্যাভিনিউয়ের বিয়ে-বাড়িটাও তেমনি করে সময়ের পেছনে

নিশ্চিহ্ন হল তৎক্ষণাৎ। শরীরটাকে আর একটু জড়ো করে বসল সুদেব।

'তুমি কি সিরিয়াস্‌লি জন্ম-জন্মান্তরের কথা বলছ, মঞ্জু? আমাকে ঠাট্টা করছ না?'

'কপালের সিঁদুর নিয়ে বাঙালী মেয়েরা ঠাট্টা করে না।'

'মানো তুমি এ-সব? বিশ্বাস করো?'

মঞ্জু একটু চুপ করে রইল। সুদেব সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল পকেট থেকে।

'এত সিগ্রেট খাও এখনো? তোমার থ্রোট সেনজিটিভ্—কাশি হয় না?'

'হয়।'—প্যাকেট খুলতে গিয়েও খুলল না সুদেব: 'রাত্রে প্রায়ই ভারী ডিসটার্ব হয় ঘুমের।'

'তবু পয়সা খরচ করে ওই ধোঁয়াগুলো গিলতে হবে? রেবা আপত্তি করে না?'

'রেবা?'—সুদেব হেসে উঠল: 'তার আপত্তির তো কোনো কারণ নেই। সে থাকে এর্নাকুলামে—তার পদবী এখন কল্যাণসুন্দরম্।

'তার মানে?'—মঞ্জুশ্রীর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল একটু: 'তাকে নিয়ে খেলাটা তোমার শেষ হয়ে গেছে?'

'খেলাটা তো কোনোদিন জমেনি মঞ্জু। খেলার ভানটাই ছিল। একসঙ্গে কয়েক কাপ কফি খাওয়া আর ক'দিন সিনেমায় যাওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার ভেতরে।'

মুখের পেশীগুলো আবার আলগা হয়ে এল মঞ্জুশ্রীর।

'আমি অনুমান করেছিলুম।'

'তুমি তো জানো—নইলে সাক্ষী জুটত না, ডিভোর্স হত না।'

'হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে মুক্তি তোমার দরকার ছিল।'

'দরকার তোমারও ছিল মঞ্জু।'

'ছিল—', আলতো ভাবে কথাটা ছেড়ে দিলে মঞ্জুশ্রী: 'তোমাকে ধন্যবাদ, নইলে আমাকে চরিত্রহীন বলে প্রমাণ করতে হত তোমাকে।'

'মিথ্যেটা পুরুষের ওপর দিয়ে যাওয়াটাই ভাল, মঞ্জু। তারা টেরিলিনের জামার মতো—ওয়াশ অ্যাণ্ড উইয়ার। কিন্তু মেয়েদের নিন্দের রঙটা পাকা—সত্য-মিথ্যের যাচাই সেখানে অবান্তর।'

'তবু সেই নিন্দেটা রেবা দত্তকে তুমি দিয়েছিলে।'

'রেবার কোনো ক্ষতি হয়নি। কল্যাণসুন্দরম্ আর্মি-ম্যান। সে বাংলা জানে না, বাঙালী সমাজের নিন্দে-কুৎসায় তার কিছু যায় আসে না। তাছাড়া এনিমি ফ্ল্যাগ ক্যাপচার করবার মতো কলঙ্কবতীদের সম্পর্কে ওদের একটা সাময়িক আকর্ষণ থাকে বোধ হয়। কিন্তু সেও ঠকেনি। অন্তত আমার দিক থেকে রেবা সম্পূর্ণ নির্মল—সহৃদয়া বান্ধবীর বেশি নয়।'

মেঘলা আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল। কয়েকটা বড় বড় জলের ফোঁটা ছিটকে এল কামরার ভেতরে। জানলার কাঁচটা টেনে নামিয়ে দিলে সুদেব।

মঞ্জুশ্রী কী ভাবছিল। সুদেব আবার সিগারেট ধরাবার উদ্যোগ করল।

'এত ঘন ঘন সিগ্রেট না খেলেই নয়?'—ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি ফুটল মঞ্জুশ্রীর।

এবারেও ধরানো হল না। সুদেব হাসল।

'অভ্যেস মঞ্জু। মেয়েরা যেমন বদলাতে পারে না সহজে, পুরুষেরও ঠিক তাই।'

খোঁচা খেয়ে মঞ্জুশ্রীর চোখ দীপিত হয়ে উঠল একবার।

'পুরুষেরা বদ-অভ্যেসটাই আঁকড়ে থাকে।'

'তাই বুঝি?—সুদেবের হাসির ভঙ্গিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল: 'বিবাহ-বিচ্ছেদের পরেও সিঁদুরের ফোঁটাটাকে তুমি ভাল অভ্যেস বলবে?'

'বললুম তো—হিন্দু বিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের। বিলিতি আইনে তা ভেঙে যায় না।'

যে প্রশ্নের জবাবটা এর আগে পাওয়া যায়নি, সেইটেই আবার তুলে ধরল সুদেব। 'কিন্তু এ-সব তুমি বিশ্বাস করো?'

'করি না-করি, তাতে তো তোমার কিছু আসে-যায় না।'—মঞ্জুশ্রী বললে, 'কিন্তু কিছু ভেবো না—এই দাবীতে তোমার সম্পত্তি কোনোদিন আমি চাইতে আসব না।'

'আমি জানি মঞ্জু। আমি দিতে চাইলেও তুমি নেবে না। কিন্তু আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন? তুমি কি মানো এ সমস্ত?'

'যুক্তি দিয়ে কিছুই মানি না।'—কাঁচের জানলার ওপর জলের বিন্দুগুলো বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, সেদিকে চোখ মেলে মঞ্জু বললে, 'ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—সিঁদুর একবার পরলে আর নিজের হাতে মোছা যায় না।'

'স্বামী মরে গেলে?'

'মোছাবার লোকের অভাব হয় না তখন।'

'কিন্তু তোমার জীবনে আমি তো বেঁচে নেই।'

'সে বিচার আমার—তোমার নয়।'

কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত বোধ করল সুদেব। এখনো তাকে ভালবাসে মঞ্জুশ্রী? না—এরকম একটা অসম্ভব কথা কল্পনাই করা চলে না। কী তিক্ততা—কী দুঃসহ বিষাদের মধ্যে দিয়ে সেদিন দুজনে সেপারেশনের ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল—স্ট্র্যাণ্ড রোডের পীচের গন্ধ-মাখা দুপুরের গঙ্গার রুক্ষ হাওয়াতেও সেদিন কী মুক্তির স্পর্শ লেগেছিল দুজনের, সে কথা আজও ভোলবার নয়।

ভালবাসা?—ভালবাসা কোথাও ছিল না। বিয়ের এক বছরের মধ্যেও বোঝা গিয়েছিল—ব্যবধান রয়ে গেছে, গোত্র মেলেনি। সেটা গভীর—তার শেকড় জীবনের

অনেক তলায়। বাইরে থেকে তাকে অনুমান করা যায় না—কোনো স্পষ্ট সংঘর্ষ যে ঘটে, তা-ও নয়—তবু দিনের পর দিন দুজন মানুষ তাদের নিঃসঙ্গতার বৃত্তে কেন্দ্রিত হতে থাকে, মুখোমুখি বসলে কথা ফুরিয়ে যায়—নামে মেলাংকলিয়ার ছায়া। তারপর তিক্ততা—শুধুই তিক্ততা।

Here am I here are you :
But what does it mean ?
What are we going to do ?

অডেন না কার একটা কবিতা। লাইনগুলোর তলায় লাল পেন্‌সিলের দাগ দিয়েছিল মঞ্জু।

ট্রেন লাইন বদলালো। ঝাঁকুনির আকস্মিকতায় চিন্তাটা কেটে গেল সুদেবের।

মিষ্টি গলায় মঞ্জু বললে, 'কী ভাবছিলে ?'

'আমাদের ডিভোর্সের কথা।'

'সে তো মিটে গেছে।'

'তা গেছে। ছ'বছরে ইতিহাস হয়ে গেছে।'

'তবে ভাবছ কেন তার কথা ?'

'তোমার সিঁদুরের জন্যে।'

'মেয়েদের কথা ছেড়ে দাও।'—মঞ্জুর স্বর ক্লান্ত শোনাল : 'ধরে নাও না ওটা প্রসাধন। মনে করো না—ও সিঁদুর নয়, কুমকুম !'

'আমার মনে করতে আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার এই অকারণ বন্ধনটা আমার ভাল লাগছে না।'

মঞ্জু হাসল, জবাব দিল না।

'তুমি ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পাস করেছিলে।'

'সায়েন্সে নোবেল-প্রাইজ পেয়েও অনেক ক্রীশ্চান ভক্তিভরে চার্চে যান।'

এবার চুপ করতে হল সুদেবকে। বাইরে বৃষ্টিটা আরো জোর নেমেছে। সন্দেহ নেই, সেদিন বিচ্ছেদ ছাড়া কোন পথ ছিল না। নার্ভাস্ ব্রেক-ডাউন ঘটেছিল মঞ্জুর—সুদেব আত্মহত্যার কথা ভাবত। অথচ কী কারণ ? কী কারণ ? সেই কারণগুলো কখনো বাইরের আলোয় তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ হয়ে ফুটে ওঠেনি—জীবনের গভীরে, অনেক গভীরে একটা তীব্র অসঙ্গতি, নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য, পরস্পর সম্পর্কে মৃত্যুসঞ্চারী অথচ অনিবার্য একটা ঘৃণা—সুদেবের দেশের নদী পদ্মার মতো পরিপূর্ণ ভাঙনের নিঃশব্দ আয়োজন করছিল।

অথচ—এই সূক্ষ্ম, এই নিরুপায় তিক্ততার কথা আদালতে বোঝানো যায় না। আইন স্থূল কারণ চায়, ফ্যাক্ট্‌স্ চায়, মানুষের কতগুলো মোটা বর্বরতার ফিরিস্তি চায়। মাতাল ?

ইম্পোটেণ্ট? স্ত্রীকে মারধোর করে? অন্য মেয়ে আছে? স্ত্রী কি বন্ধ্যা? তার চরিত্র কি—

এই কালের মন, তার যন্ত্রণা, তার নিউরোসিস—এসব আইনের আওতায় আসে না। তখন রেবা দত্তদের আনতে হয়, শ্যামসদা মিহিরদা আসরে নামে, মজা দেখবার জন্যে একটা অশ্লীল জনতা আদালতে এসে ভিড় জমায়।

'ডিভোর্স না হয়ে আমাদের তো কোনো উপায় ছিল না মঞ্জু।'

মঞ্জু চোখ থেকে চশমাটা খুলে একবার শাড়ির আঁচলে কাঁচ মুছল। মাথা না তুলেই বললে, 'না।'

'আমি তোমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিলুম।'

'আমার জন্যেও তুমি একফোঁটা শান্তি পেতে না।'

'অন্য কিছুই আর হতে পারত না এ ছাড়া।'

'না।'—মঞ্জু আবার সহজভাবে হাসতে চাইল: 'কী হবে ওসব কথায়? কিন্তু একটা জিনিস খাবে একটু? বলতে ভয় করছে তোমায়।'

'আমি সর্বভুক। ও ব্যাপারে আমাকে ভয়ের কিছু নেই—তুমি জানো।'

'তারকেশ্বরের প্রসাদ। খাবে?'

'তারকেশ্বর অনাবশ্যক। মিষ্টিতে আপত্তি নেই।'

শাড়ির ভেতর থেকে বেলপাতায় ঢাকা ছোট্ট একটা বাঁশের ঝুড়ি বের করল মঞ্জু। এতক্ষণ কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল—সুদেব দেখতে পায়নি।

বেলপাতা সরিয়ে মঞ্জু বললে, 'বেশির ভাগই চিনির পিণ্ডি—তোমাকে দেবার কিছু নেই। এই সন্দেশটা নাও—এটা চলতে পারে বোধ হয়।'

হাতে হাত ঠেকল একবার। ছ'বছর? না—আরো বেশি। আইনগত বিচ্ছেদের অনেক আগেই শরীর-মনের বিচ্ছেদ পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল দুজনের।

নিঃশব্দে প্রসাদ খাওয়া শেষ করল সুদেব। তারপর: 'তারকেশ্বরে পুজো দিতে গিয়েছিলে?'

'গরদের শাড়ি দেখছ না?'—মঞ্জু আবার শ্রান্তভাবে বললে, 'দেশে বাবার অসুখ। মা তারকেশ্বরে পুজো দিতে বলেছিলেন। তাই দিয়ে এলুম।'

'বাবার নামে পুজো দিলে?'

মঞ্জু সুদেবের চোখে সোজা চোখ রাখল: 'তাই কথা ছিল। কিন্তু পাণ্ডা হঠাৎ বললে, স্বামীর জন্য একটা পুজো দেবেন না মা? তা-ও দিলুম।'

হঠাৎ বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা বোধ করল সুদেব। কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু কথা ফুটল না মুখ দিয়ে।

মঞ্জু একটা নিশ্বাস ফেলল : 'আর কী আশ্চর্য—ত্মাখো। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে চোখে পড়ল তোমাকে। লোভ সামলানো গেল না—উঠে এলুম এখানে।'

যেন দম আটকে আসতে চাইল সুদেবের।

'আমার কল্যাণে পুজো দিলে তুমি?'

মঞ্জু হাসল : 'সবই তো বাজে। নেহাতই কুসংস্কার। তবু তোমার যদি কল্যাণ হয় তো হোক না। আমার তো তাতে কোনো লাভ-ক্ষতি নেই।'

'কিছুই নেই, কিছুই নেই মঞ্জু?'—একটা রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন ফুটল সুদেবের গলায়।

ট্রেন থামল ত্মাওড়াফুলিতে। বাইরে অশ্রান্ত বৃষ্টি। সারা কামরায় জলের বন্যা বইয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে এল একদল লোক। মঞ্জু উঠে দাঁড়াল।

'আমি এখানেই নামব।'

'এখানে?' হৃৎপিণ্ডে একটা মোচড় লাগল সুদেবের : 'এখানে?'

'হ্যাঁ, এইখানেই তো আমি চাকরি করি।'

গাড়িতে ভিড় জমে উঠেছে। বাইরের পৃথিবী, বৃষ্টি, কাদা, মানুষ—সব চলে এসেছে এখন। তারই মধ্যে কোথায় নেমে চলে গেল মঞ্জু—আর দেখা গেল না তাকে।

বলা যেত? বলা যেত? তুমি বিয়ে করতে পারোনি—আমিও না—হয়তো, হয়তো ছ'বছর আগের সাপটা মরে গেছে এতদিনে, হয়তো আজ আমরা দুজনে মিলে সেই ভুলের মূলটাকে খুঁজে বের করতে পারি, হয়তো—

কিংবা—কিংবা—এই ভাল। সব তিক্ততার স্মৃতির ওপর এই সন্ধ্যাটাই সোনা ছড়িয়ে রাখুক। এইটুকুই সব গ্লানির মধ্যে পদ্ম হয়ে ফুটে থাকুক। হয়তো এই-ই ভাল।

কাঁপা হাতে আবার সিগারেট ধরাতে গেল সুদেব।

কিন্তু এবারও ধরাতে পারল না। কানের কাছে যেন ভেসে উঠল মঞ্জুশ্রীর শাসন : 'আবার সিগ্রেট?' ঠোঁটে ছুঁইয়েই ওটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বাইরের বৃষ্টির ভেতরে।

সেই মৃত্যুটা

ছোট কালভার্টটায় ক'দিন আগেই সাদা রঙের একটা পোঁচড়া লাগিয়েছে পি-ডবলু-ডি। আর সেই সাদা জামাটির ওপর কে যেন পেনসিল দিয়ে খুদে খুদে হরফে কী সব লিখে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত যোগ করে লিখেছে, বকেয়া তেইশ টাকা এগারো পয়সা।

দেখে মোনা মিঞার হঠাৎ খুব মজা লাগে। চিন্তাহরণ—ওরফে চিন্তাকে আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা মারে সে।

আঙুলের নখ বেড়ে গিয়েছিল, চিন্তাহরণের একটা আঁচড়ের মতো লাগে। ভারী বিরক্ত হয় সে।

—এঃ, আঁচড়াচ্ছিস কেন বেড়ালের মতো? চামড়া ছড়ে গেল যে।

—এতেই চামড়া ছড়ে গেল? এমন ফিনফিনে বাবুয়ানি চামড়া তোর হল কবে থেকে?—মোনা মিঞা আর একটা খোঁচা দেবার উদ্যোগ করতে দু'হাত লাফিয়ে সরে যেতে চায় চিন্তে: কী আরম্ভ করলি বল্ তো মোনা? আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

—আর আমি বুঝি সুখের দরিয়ায় নাও ভাসিয়েছি—মোনারও এবার বিরক্তি লাগে: —তাই বলে হাঁড়িপানা মুখ করে বসে থাকব নাকি রাতদিন? তাকিয়ে ছাখ না এই পুলটার গায়ে।

—কী দেখব, দেখবার কী আছে?

—হিসেব লিখেছে যে, অনেক ভেবে ভেবে মাথা খাটিয়ে হিসেব করেছে। বকেয়া তেইশ টাকা এগারো পয়সা—হি-হি-হি।

চিন্তে ভুরু কুঁচকে তাকায় মোনার দিকে।

—লিখেছে বেশ করেছে, তাতে হাসির কী আছে, শুনি?

—কি রকম ঝানু লোক দেখছিস, কাগজের খরচ বাঁচিয়েছে। হি-হি।

—খামোকা হাসতে তোর ভালোও লাগে?—চিন্তে বিরক্ত হয়ে কালভার্টটার ওপর বসে পড়ে: তোর পয়সাকড়ি থাকে, তুইও হিসেব লেখ্ না। বিস্তর জায়গা রয়েছে—বারণ করছে কে?

—আরে হিসেব লিখতে পারলে আর এ দশা হয় নাকি? মগজে আঁক-জাঁক কিছু ঢুকল না বলেই তো মৌলবী রেগেমেগে মাদ্রাসা থেকে বের করে দিলে।—ধীরে-সুস্থে চিন্তের পাশে বসতে বসতে মোনা বলে, অবিশ্যি তিন মাসের মাইনেও বাকি পড়েছিল।

—হুঁ, সেইটেই বল্।—চিন্তে গম্ভীর হয়।

—বুঝলি, কিচ্ছু ক্ষেতি হয়নি। মৌলবীসাহেবও টের পেয়েছিল—কোনোদিন আমার পয়সাও জুটবে না, হিসেবও লিখতে হবে না। খুব এলেম ছিল লোকটার।

—আমি খুব ভালো আঁক জানতুম—চিন্তে তেমনি গম্ভীর হয়ে বলে।

—বেশি গুল দিসনি আমার কাছে—মোনা ফ্যাস করে ওঠে: আমি কিছু জানি নে—না? ভালো আঁকই যদি কষবি তা হলে পাঠশালার সেই শুঁটকে পণ্ডিত তোর দু'হাতে ইট দিয়ে তোকে রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখত কেন রে? আমি দেখিনি?

—যেতে দে ওসব।—চিন্তে অস্বস্তি বোধ করে: বিড়ি-টিড়ি আছে নাকি সঙ্গে? দে তা হলে।

—দাঁড়া দেখি।—হাফ শার্টের পকেট হাতড়ায় মোনা: আছে দু-তিনটে। এই একটা

দিলুম, কিন্তু আর চাস নে তা বলে দিচ্ছি।

—না, চাইব না। কিন্তু মাইরি, ব্যাপারটা কী বল্ দিকি? বিড়ির দাম যে সিগ্রেটকে ছাড়িয়ে উঠল!

মোনা একটা মুখভঙ্গি করে: শালার মুড়ির কেজিই চার টাকা উঠল তো বিড়ি।

দুজনে বিড়ি ধরায়—পাশাপাশি চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। মাথার ওপরে একটা কাঠবাদাম গাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপে, অথচ খচখচ করে শব্দ ওঠে—একটি নতুন বৌ যেন কাপড়ের আওয়াজ তুলে চুপিসাড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এমনি মনে হয়। কালভার্টের নিচে একরাশ ঘোলা জল থমকে আছে, কয়েকটা সোনা ব্যাং ড্যাবা-ড্যাবা চোখ তুলে চার পা ফেলে ভাসছে তার ভেতরে। হাতের বিড়িটায় গোটাকয়েক টান দিয়ে মোনা একটা ব্যাঙকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় সেটা—ব্যাঙটা থলাৎ শব্দে ডুবে যায়, তারপর আবার হাত তিনেক দূরে চার পা ছড়িয়ে ভেসে ওঠে।

সেইটে লক্ষ্য করে মোনা বলে, জানিস, সায়েবেরা ব্যাঙ খায়!

—হুঁ, তোর কানে কানে বলে গেছে।

—মাইরি, বানিয়ে বলছি না। রজ্জব চাচার এক ছেলে কলকাতার হোটেলে চাকরি করে—সে—

বাধা দিয়ে চিন্তে জিজ্ঞেস করে: সেও ব্যাঙ খায় বুঝি?

—তোবা-তোবা। মোসলমানের ব্যাটা না?

—রেখে দে, বারফট্টাই করিসনি।—চিন্তে ঠোঁট বাঁকায়। আধখানা খেয়ে তার বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, সেটাকে সাবধানে কানের ওপর গুঁজতে গুঁজতে বলে: কলকাতায় গেলে হিন্দু-মোসলমান কিচ্ছু থাকে না।

—তা যা বলেছিস।—মোনা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

ঠিক তখন চিন্তের চোখ পড়ে। নিচে বাঁ-দিকে, কালভার্টের জলের কোল ঘেঁষে, জলো ঘাসে ছাওয়া এক টুকরো ছোট জমির ওপর পা ছড়িয়ে পড়ে আছে লাল-সাদা গোরুটা।

—ওটা কি রে?

মোনাও তাকিয়ে দেখে। একটু চুপ করে যায়। থেকে থেকে এক-একটা ঢেউয়ের মতো শ্বাস দুলে যাচ্ছে গোরুটার পাঁজরা-সার শরীরের ওপর দিয়ে। এখান থেকেও ছাই-ছাই রঙের একটা চোখ দেখা যায়, জলের মতো একটা রেখা নেমেছে তা থেকে, বিন-বিন করে ওনকি উড়ছে একরাশ। কালো লম্বা জিভটা বেঁকে বেরিয়ে এসেছে, মুখে ময়লা ফেনা জমেছে, ল্যাজের দিকটা গোবরে একাকার।

মোনা প্রায় চুপি-চুপি বলে, মরে যাচ্ছে গোরুটা।

—কার গোরু রে ?

—কে জানে ?

—এখানে মরতে এল কেন ?

—কোথায় মরবে, বল্ ? একটা জায়গা তো চাই।

—ইস, একেবারে চোখের সামনে।

—চোখটা কোথায় সরাবি চিন্তে ? মরণ কোথায় নেই ?

—তা বটে।

মাথার ওপর বাদামগাছটায় একটা কাক ডেকে ওঠে। অদ্ভুত শোনায় তার আওয়াজটা। মোনার শরীরটা শিউরে যায় একবার।

—কি রকম বিচ্ছিরি করে ডাকল রে কাগটা!

—ওরা নানা রকম করে ডাকতে পারে। ওদের সব ডাকের একটা মানে থাকে।

মোনা ঘাড় বাঁকিয়ে একবার চেয়ে দেখে চিন্তার দিকে।

—তুই আবার কাগ-চরিত্তির শিখলি কোত্থেকে ?

—আমি শিখব কেন ? লোকে বলে।

আবার সেইভাবে ডেকে ওঠে কাকটা। ডাল-পাতা নড়বার শব্দ পাওয়া যায়—এক ডাল থেকে আর এক ডালে উড়ে বসল বোধ হয়। একটা শুকনো পাতা হাওয়ায় পাক খেতে খেতে নিচের ঘোলা জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে—সবচেয়ে বড় ব্যাঙটার নাকের সামনে। ব্যাঙটা নড়ে না—ড্যাবডেবে চোখ মেলে পাতাটার দিকে চেয়ে থাকে কেবল।

মোনা মাথা নাড়ে।

—হুঁ, নিশ্চয় কিছু বলছে কাগটা।

—কী বলছে বল্ তো ?

—আমি জানব কী করে ? তুই কাগ-চরিত্তির জানিস, তুই-ই বল্।

চিন্তের দৃষ্টি গোরুটার ওপর আটকে থাকে। ছাই-ছাই রঙের চোখের পাশ দিয়ে একটা জলের রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। মরবার আগে গোরুটা কেঁদেছে। কে কাঁদে না ?

আবার কর্কশ রব তোলে কাকটা। কেমন আধো আধো আহ্লাদে ভঙ্গিতে বলে—'গ-গ-গ'। হঠাৎ বিশ্রী রাগ হয়ে যায় চিন্তার। পিছন দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় মাথার ওপর।

—ভাগ্, শালা, ভাগ্।

ঝটপট করে কাক উড়ে পালায়—দূর থেকে তার আপত্তি শোনা যায়ঃ কা-কা-কা। ঢিলটা আকাশে অনেকখানি ছুটে গিয়ে কালভার্টের জলে ঝপাং করে নেমে আসে। থলাৎ থলাৎ করে ডুব দেয় চমক-খাওয়া ব্যাঙগুলো—আবার চার পা ছড়িয়ে ভেসে ওঠে।

—বেশ করেছিস।—মাথা নেড়ে সায় দেয় মোনা : ভারী জ্বালাচ্ছিল।

চিন্তে আবার আগের মতো সোজা হয়ে বসে। গোরুটার দিকে চেয়ে থাকে এক-ভাবে।

—কাগটা কী বলছিল জানিস মোনা?

—কী বলছিল?

—গোরুটা তো মরছে। এবার গিয়ে ওর চোখ দুটো ঠুকরে খাই। শালা!

—গো-মড়কে তো ওদেরই পাব্বন।

—আর শেয়ালের।

—আর মুচির। এখনো টের পায়নি। পেলেই ছুরি-ছোরা নিয়ে হাজির হবে।

এতক্ষণ পরে চিন্তে হেসে ওঠে। বাদামের পাতার মতো একটা শুকনো খসখসে আওয়াজ ওঠে তার গলায়। ভুরু দুটো একসঙ্গে জুড়ে যায় মোনার।

—হাসলি যে?

—ভাবছি, মুচি আসবে কোত্থেকে! সেই এক ঘর ছিল না গাঁয়ে? না খেয়েই তো মরল তায় সব কটা। শেষে সেই বুড়ো কিষ্টোদাস একদিন গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুলে পড়ল চালের আড়া থেকে।

—হুঁ, মনে পড়েছে।—স্মৃতিটা মোনার অস্বস্তি জাগায় : আমিও দেখতে গিয়েছিলুম। জিভটা আধ হাত ঝুলে গিয়েছিল—ইয়া আল্লা।

—একদম ওই গোরুটার মতো।

—একদম।

—আর নাক-মুখ-কান দিয়ে রক্ত নেমেছিল।

—তখনো ওইটুকুনি রক্ত ছিল গায়ে। ইচ্ছে করলে বুড়োটা আরো ক'দিন বেঁচে থাকতে পারত।

—তা পারত। ঘরেও তখনো খাবার ছিল।

—ছিল?—মোনা আশ্চর্য হয় : খাবার আবার কোথায় দেখলি তুই?

—কেন, একরাশ শুকনো জামের আঁটি পড়ে থাকতে দেখিসনি দাওয়ায়? ওইগুলো সেদ্ধ করে ছেঁচে নিয়ে—হি-হি-হি।

মোনার বিশ্রী লাগে। বিরক্ত হয়ে বলে, মানুষের মরণ নিয়ে হাসি-মশকরা করিস নে চিন্তে। ও-সব ভালো না।

—ভালো না কেন রে? এখন থেকে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। ভাখ না আর দু-এক মাস বাদে কী হয়। তোর-আমার বরাতে জামের আঁটিও জুটবে না।

আরো খারাপ লাগে কথাটা, কিন্তু মোনা জবাব খুঁজে পায় না। একটু পরে চিন্তেই

আবার বিড়বিড় করে ওঠে।

—গোরুটা কিন্তুক না খেয়ে মরেনি।

দুজনে আবার গোরুটার দিকে তাকায়। বিকেলের একঝলক লাল আলোয় গোরুটার মৃত্যুকে আরো করুণ, আরো নিষ্ঠুর দেখায়।

—না, অসুখ করেছিল।

—কী অসুখ করেছিল?—আলতোভাবে জানতে চায় চিন্তে।

—আমি কী করে জানব?—মোনা ব্যাজার হয়: আমি গো-বদ্যি নাকি?

—তোর বাপ তো অনেক ঝাড়-ফুঁক জানত।

—সে মানুষের, গোরুর নয়।

—গোরু আর মানুষে ফারাক আছে নাকি? দুই-ই মরে।

—কিন্তু গোরু না খেয়ে মরে না।

—না খেয়ে মরে না!—চিন্তার স্বর ঝাঁ করে ওঠে: ভারী পণ্ডিত এলেন উনি। খরা হয়ে মাঠের সব ঘাস পাতা শুকিয়ে গেলে—তখন? তোর যদি খোল-জাবনা কেনার পয়সা না থাকে, তখন?

—এই গোরুটা কিন্তুক বুড়ো হয়ে মরেছে।

—বলেছে তোকে।—চিন্তা শব্দ করে একরাশ থুথু ছুঁড়ে দেয় ব্যাঙগুলোর দিকে। খাবার ভেবে দুটো ব্যাঙ একটু এগিয়ে আসে—তারপর বোধ হয় বিরক্ত হয়েই চিন্তার দিকে তাকিয়ে থমকে যায়।

চিন্তা আবার হেসে ওঠে। মোনা চোখ তোলে।

—হাসলি যে?

—একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল।

—কথাটা কী?

—গোরুর গলায় দড়ি থাকে, কিন্তু না খেয়ে মরলেও গোরু কখনো গলায় দড়ি দিতে পারে না। হি-হি।

—বকিসনি।

কিছুক্ষণ চুপ। বাদামগাছের পাতায় হাওয়ার শব্দ হয়। একটা ফিঙে লাফাতে লাফাতে গোরুটার পাশে গিয়ে বসে, তারপরেই আবার কোথায় উড়ে চলে যায়। দুটো বোলতা মারামারি-জড়াজড়ি করতে করতে জলের কাছ পর্যন্ত গিয়ে আলাদা হয়ে যায়—একটা পালায়, আর একটা তাকে তাড়া করে। বিকেলের রাঙা আলোয় খুশি হয়ে এদিকে ওদিকে গোটাকয়েক পোকা কিট-কিট কির-কির করে ডাকে।

ঝুন-ঝুন-ঠিন-ঠিন করে আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে দূর থেকে। একটুক্ষণের জন্তে

—গারুটাকে ভুলে গিয়ে সেদিকে চোখ তোলে দুজন।

তিনজন লোক আসছে আধ-ছোটার ভঙ্গিতে। মালকোঁচা করে পরা ধুতি, কোমরে লাল গামছা বাঁধা, কাঁধে ঘুঙুর লাগানো ভারে দু-তিনটে করে ছোট ছোট তামা-পেতলের ঘটি। সেই আধ-ছোটার ভঙ্গিতে তারা এগিয়ে আসে, চিন্তে আর মোনাকে ছাড়িয়ে চলে যায়, ফিরেও তাকায় না তাদের দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভার থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যায়, চোখে পড়ে তাদের কোমরে বাঁধা লাল গামছা, তাদের পিঠের ছোট ছোট পুঁটলি দোল খায়, তামা-পেতলের ছোট ঘটিগুলো বিকেলের রোদে ঝিকমিক করে।

মোনা বলে, চিনিস?

চিন্তে জবাব দেয় : না।

—ভিন-গাঁয়ের লোক।

—সে তো দেখাই যাচ্ছে।

—তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে চলল, না?

—হুঁ।

—কী হবে তাতে?

—পুণ্যি।

—ধ্যাত্তোর পুণ্যি!—মোনা নাক কোঁচকায় : পুণ্যিতে পেট ভরে নাকি? বাবা তারকনাথ চালের কিলো নামিয়ে দিতে পারে বারো আনায়? ছটা বিড়ি দিতে পারে পয়সায়?

—অ্যাই—অ্যাই!—রাগ করার ভঙ্গিতে চিন্তে শাসায় : হিঁদুর ধম্মো-কম্মো নিয়ে কথা বলিসনি।

—ঘোড়াড্ডিম ধম্মো-কম্মো। আমি কাউকে ডরাই নে। পীর নবী আল্লা—সকলকে হক কথা শুনিয়ে দিতে পারি। জমিরুদ্দিন মোল্লা তো জমি বলদ বেচে হাজী হয়ে ফিরে এসেছিল। কী হল শেষটায়? পোকা-মারা বিষ খেয়ে মরে বাঁচল।

—চুপ কর্‌ মোনা, ভালো লাগে না।

মোনা একবার ঠোঁট কামড়ায়।

—ভালো কি আমারই লাগে নাকি? কিন্তুক এই সব দেখলে—

—ওরা বিশ্বাস করে যদি সুখ পায় তাতে তোর আমার ক্ষেতিটা কী বল্‌ দিকি?

—তা যা বলেছিস। বিশ্বেস করতে পারলে আমরাও বেঁচে যেতুম।

আবার চুপচাপ। মাঠের বাতাসটা যেন থেমে যায় হঠাৎ। রাঙা আলোর বিকেলটাকে আশ্চর্য রকম শান্ত আর নিঝুম মনে হয়। এতক্ষণে ওদের কানে কোঁসানির মতো একটা

আওয়াজ উঠে আসে। গোরুটার শ্বাস উঠছে—ঢেউ খেলে যাচ্ছে পাঁজরালার শরীরের ওপর দিয়ে। ছাই-ছাই চোখের সামনে ওনকির ঝাঁক আরো কালো হয়ে উঠেছে। কয়েকটা ডাঁশ উড়ছে—ওরা শেষ খাওয়া খেয়ে নিতে চায় বোধ হয়।

—গোরুটা বেশ সুলক্ষণে ছিল রে।—মোনাই কথা শুরু করে আবার।

—কী করে জানলি?

—কপালে কেমন চাঁদ রয়েছে দেখছিস না!

চিন্তে হাসে। বাদামের পাতার মতো শুকনো হাসিটা খসখস করে।

—আমি যখন জন্মেছিলুম, তখন আমার ঠাকুরমা কী বলেছিল, জানিস?

—কী বলেছিল?

—বলেছিল, আমি খুব ভাগ্যিমানী হবো। নিজের হাল-গোরু হবে, দশ-বিশ বিঘে জমি হবে।

—হয়নি?—মোনা মুখ টিপে হাসে।

—জালাসনি।—চিন্তে নিজেও একটু হাসতে চেষ্টা করে: আসলে বুড়ি বোধ হয় নাতিকে ঠাট্টা করেছিল একটুখানি। কিন্তু বাবা ছিল ভারী ক্যাব্‌লাটে ভালো মানুষ, সেই কথায় পেত্যয় করে আমার হাতে দু-তিনটে তাবিজ-কবচ বেঁধে দিয়েছিল—হি-হি-হি!

—গোরুটার কিন্তু কপালে—

—ওটা ভগবানের ঠাট্টা, বুঝলি? কী করে রাস্তার ধারে বেঘোরে মারা যাচ্ছে—ভাগ্‌। একটু পরে রাত হবে, তখনো হয়তো মহাপ্রাণটা বেরিয়ে যাবে না—আর সেই সময়ে শেয়ালেরা এসে জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে। গোরুটা নিজের গলায় দড়ি দিতে পারলে বেশ হত, না রে?

মোনা জবাব দেয় না। বিকেলের রোদে ছায়া পড়েছে—এতক্ষণ একমুঠো সোনার মতো জলছিল, এখন পুরনো তামার মতো রঙ ধরেছে। সেই ছায়া মোনার মনের ভেতরেও একটু করে ছড়াতে থাকে। দিনের আলোটা বেশ ভালো—তবু কোথায় একটা ভরসা থাকে, মনে হয় যা-হোক করে চলে যাবে, চালিয়ে যাব। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই—

চিন্তে শুরু করে: আমার মামার বাড়ির দেশে আর একটা গলায়-দড়ি দেখেছিলুম। ফুটফুটে একটা অল্পবয়সী বউ—

—তুই থাম্ দিকিনি।—মোনা এবার সত্যি সত্যিই ধমক দেয় চিন্তেকে: কী আরম্ভ করলি তখন থেকে? একটা ভালো কথাও মনে আসছে না?

—আসছে না রে। চোখের সামনে গোরুটাকে মরতে দেখে—

—তবে উঠে যা এখান থেকে, উঠে যা তুই।—মোনার স্বর কড়া হয়ে ওঠে: এখানে বসে থাকবার জন্যে তোকে দিব্যি দিয়েছে কে?

চিন্তে চুপ করে। মোনা বিকেলের তামাটে রোদের ভেতর অনেক দূরে চোখ মেলে দেয়

"রমজানেরই রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ—" হঠাৎ গুনগুনিয়ে বেসুরো গলায় গান শুরু করে মোনা।

হেসে উঠতে গিয়েও চিন্তে হাসে না। তার বদলে জিজ্ঞেস করে : ঈদ এলে বুঝি খুব খাওয়া-দাওয়া করবি ?

—হুঁ, কচু ঘণ্ট।

—তবে যে গান জুড়েছিস বড়ো ?

—খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাবতেও ভালো লাগে। মনে কর্—ভালো গোস্ত, পোলাও বিরিয়ানি, তিন রকমের কাবাব—

—ইস—ইস! ঘরে একেবারে নবাবের বাবুর্চিখানা!—মিটমিট করে তাকায় চিন্তে : ভাত খেয়েছিস কবে ?

—মঙ্গলবার।

—এই ক'দিন ?

—গম-টম।

—টম কাকে বলে ?

—কিচ্ছু জানিস নে—না ? তুই আমি দুজনেই তো ক্ষেতমজুর। টম বুঝতে পারিস নে ?

—বিলক্ষণ। আজই তো একবোঝা কলমী শাক তুলেছিল বউ। কটা কুচো চিংড়ি ছিল তার ভেতরে, আর একমুঠো গুগ্‌লি। দিব্যি খাওয়া হয়ে গেল।

—দু'দিন পরে আর কলমিও থাকবে না।

—তা থাকবে না।

—তখন কী খাবি ?

—এই গোরুটা যা খাচ্ছে এখন। খাবি।

নিজের রসিকতায় হাসেত যায় চিন্তা, কিন্তু আবার তাকে ধমক দেয় মোনা। গোরুটার কথা আর বলবি নে, খবরদার।

—আচ্ছা বলব না।

দুজনের চোখ আবার দূরে সরে যায়। বিকেলের রোদ আরো কালচে হয়ে এসেছে। খানিকটা সামনে দু-তিনটে বাবলাগাছ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে—নিচের শুঁড়িপানার ওপর ঝুরঝুর করে ফুল ঝরছে তাদের, যেন সবুজ চাদরের ওপর হলুদের নকশা কাটছে। আর

একটু এগিয়ে জলে-ভরা ধানের ক্ষেত। ছায়া নুয়ে পড়েছে তার ওপর, তবু দেখা যায়। সাদা জলের সঙ্গে কী বাহারই দিয়েছে নতুন ধানের! কোথাও ফিকে হলুদের রঙ-মাখা নতুন শীষের সার, কোথাও আর-একটু বড় হয়ে চমৎকার শ্যামলা, কোথাও চোখ-জুড়োনো ঘন সবুজ। তাকিয়ে থাকলে আর পলক পড়ে না। জল আর সেই ধানের ওপর এখন শেষ বেলার রাঙা মেঘের একখানা অদ্ভুত আভা পড়েছে—চেয়ে থাকতে থাকতে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে।

একটু পরে ধরা গলায় চিন্তে বলে, খুব ভালো ধান হবে এবার।

—হুঁ।

—গত দু'বছর এমন ফলন হয়নি।

—হুঁ।

—দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

—ওই প্রাণই ঠাণ্ডা হোক। পেটে পড়বে ক'দানা?

চিন্তের একটা মস্ত বড় দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

—আচ্ছা, কোথায় ধানগুলো যায় বল্ দিকিনি?

—কিচ্ছু জানিস নে, ন্যাকা একেবারে!

পেছনের পথটা দিয়ে আওয়াজ আর ধুলোর ঘূর্ণি তুলে জীপগাড়ি বেরিয়ে যায় একটা। নেমে আসা হালকা সন্ধ্যায় একটা লাল আলো অনেকটা দূর পর্যন্ত দপদপ করে। সেই আলোটা থেকে চোখ সরিয়ে এনে ওরা দেখে সামনে সন্ধ্যার তারাটা উঁকি দিয়েছে।

কী ঝপ্ করে বেলাটা ডুবে গেল!

আর বেলা ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধানের ক্ষেতটাও যেন সুদূর হয়ে যায়—রাঙা মেঘটাকে কে যেন হাত বাড়িয়ে মুছে নেয়, তখন মনে হয় ওই ফিকে হলুদ, ওই শ্যামলা, ওই ঘন সবুজে রঙের ধানগুলো—সামনের এই জলের ওপারে নয়, একটা প্রকাণ্ড নদীর ওধারে সরিয়ে দিয়েছে কেউ। গুঁড়িপানার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাবলাগাছগুলোকে কয়েকটা ভুতুড়ে মূর্তির মতো মনে হয় তখন।

একটা অর্থহীন অকারণ বিদ্বেষে দাঁতে দাঁতে কষকষ করে চিন্তা।

—ভোটের সময় অনেক জীপগাড়ি এসেছিল এ তল্লাটে।

মোনা বলে, হুঁ, এসেছিল। কেন আসবে না? পাকা সড়ক হয়েছে কি জন্যে? গাড়ি আসবে বলেই তো।

—তখন অনেক কথা শুনেছিলুম।

—কান আছে, শুনবি বইকি।

—চেঁচিয়েছিলুম।

—শোর তোলবার জন্তেই আল্লা গলা দিয়েছেন। বোবা হয়ে কী লাভ ?

ছায়া কালো হয় চারিদিকে। মোনার ভয় করে এখন। পেটের গম-টমগুলো কখন নিশ্চিহ্ন। একটা যন্ত্রণা পাক দেয় সেখানে। হঠাৎ একটা-কিছু আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে তার—এই রাত্রির স্রোতে নিরুপায় হয়ে ভেসে যাবার সময় আলোর মতো—ডালের মতো একটা-কিছু।

—কে যেন বলছিল পাঁচ কাঠা করে জমি দেবে আমাদের।

—পেয়ে নে।

আবার চুপচাপ। দুজনের ভেতরে যেন সন্ধ্যার একটা আড়াল নামে এখন। নিতান্ত বলবার জন্তেই মোনা বিড়বিড় করে যায় : আমার মেয়েটা বোধ হয় মরেই যাবে, বুঝলি।

—আমার বউটাও।—বিকৃতভাবে চিন্তা বলে, কিচ্ছু ভাবিসনি।

—না—ভাবনার কিছু নেই। মোনা নির্ভাবনা হতে চেষ্টা করে। চিন্তার হিংস্র ভাবে মনে হয়, দূরের ওই ধানক্ষেতটার ওপর অমন করে সন্ধ্যার আলোটা না পড়লেও পারত। তা না হলে সে বেশ ছিল, এত খারাপ তার লাগত না।

গোরুটার শ্বাসের শব্দ শোনা যায়। এখনো মরতে পারেনি। আবছা অন্ধকারে তার শরীরের রেখাটা অন্য রকম দেখায় এখন। আচমকা ওটাকে মানুষ বলে ভুল হয়ে যেতে পারে।

মোনা আস্তে আস্তে বলে, একটু পরে শেয়াল এসে ছিঁড়ে খাবে ওটাকে।

চিন্তা মাথা তোলে। তার চোখ জ্বলে।

—কী করতে চাস্ ?

—ইচ্ছে করছে, একটা লাঠি হাতে নিয়ে সারা রাত—

—সারা রাত শেয়াল তাড়াবি ? কটা শেয়াল তাড়াবি রে ?—হা-হা করে খানিকটা বেয়াড়া রকম হাসি শুরু করে চিন্তা। আরো ভয় পায় মোনা। বাদামগাছের ছায়ায় চারদিকটা তাদের অস্বাভাবিক কালো। কালভার্টের জলে থলাৎ করে একটা ব্যাঙ লাফ দেয়, সেই শব্দটা চিন্তার হাসির সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে চমকে দেয়, খিদের যন্ত্রণা-ভরা পেটের ভেতরটা কেমন গুরগুর করে ওঠে।

হাসি থামিয়ে, মোনার কাঁধে গাঁট-বের-করা শক্ত আঙুলে একটা চাপ দেয় চিন্তা।

—আর পাগলামি করতে হবে না, বাড়ি চল্ এখন।

জোলো ঘাসে ছাওয়া ছোট ডাঙাটার ওপরে লাল-সাদা গোরুটা শ্বাস টানে। মরতে-মরতেও মরতে চায় না। হয়তো শেয়ালে এসে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্তেই অপেক্ষা করে।

দোসর

'দুনিয়ার সবচেয়ে তাজ্জব চিজ—বুঝেছ, এই শুয়োর।'—রেল-ইস্টিশনের বাইরে, নোংরা একফালি মাঠের ভেতরে, একটা মাদী শুয়োর কতগুলো ছানাপোনা নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল, সেই দিকে তাকিয়ে—বাঁ চোখটা কুঁচকে আলতোভাবে কথাটা বলেছিল লোকটা।

তা—মানুষটাকে দেখলে কেমন যেন গা-শিরশির করে, একটু ভক্তি-টক্তিও হতে চায়। সাদায় কালোয় মাথার চুল, সাদার ভাগটাই বেশি। মোটা মোটা ভুরু দুটোও পাক-ধরা, তার নিচে একজোড়া জলজলে চোখ। মুখে খানিক এবড়ো-খেবড়ো সাদা দাড়ি, দেখলেই বোঝা যায়, দাড়িটা নিয়মিত রাখে না—খেয়ালমতো কমিয়ে ফেলে মধ্যে মধ্যে। নাকের বাঁ-দিকে একটা শুকনো কাটার দাগ—মনে হয় সাঁওতালী তীর কিংবা বল্লমের ঘা লেগেছিল কোনোকালে।

প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে গা এলিয়ে, পায়ের কাছে গামছার পুঁটলিটা রেখে, আধ-ঘণ্টা-লেট লোক্যাল ট্রেনটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে, একটু দূরের শুয়োরগুলোকে দেখে, বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে লোকটা বলছিল: 'হুঁ, যা বলেছি। দুনিয়ার সব চেয়ে তাজ্জব চিজ হল এই শুয়োর।'

পাশে বসে ভক্তিমানের মতো শুনছিল জন দুই চাষী গেরস্ত। কয়েক হাত দূরে স্যুটকেস পেতে বসে আমিও শুনছিলুম, কারণ আধ ঘণ্টা লেট হয়ে যে ট্রেনটা আসছে তাতে আমাকেও যেতে হবে। সামনের ফাঁকা রেলের লাইন, মাথার ওপর রাধাচুড়োর পাতায় হালকা বাতাসের শব্দ, ওদিকের সাইডিঙে খানতিনেক কালো কালো পুরনো ওয়াগন, মালগুদামের টিনের চালে চোখ-ধাঁধানো খানিক রোদের ঝিলিক আর থেকে থেকে কাকের ডাক আমার সারা শরীরে একটা ক্লান্ত ঝিমুনি নিয়ে আসছিল। লোকটার ভরাট আর ভাঙা-ভাঙা গলার আওয়াজে আমি নড়ে-চড়ে বসলুম।

ভক্তি সত্ত্বেও একজন চাষী অবাক হল একটু।

'এত জীব থাকতে শুয়োর সব চাইতে তাজ্জব হল কেন?'

'কখনো সুন্দরবনের তল্লাটে যাওয়া হয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'নদীগুলো যেখানে রাক্ষুসে হয়ে সাগরে পড়ে—সে-সব মোহনার খবর জানা আছে কিছু?'

'আজ্ঞে জানব কী করে? যাইনি তো কখনো।'

'সেই সব নোনা গাঙের ভেতর চর জাগল। এলোপাতাড়ি গাছ-গাছলাও গজালো খানিকটা। কিন্তু মানুষ গিয়ে থাকতে পারে না। একে তো নোনা—তার ওপর জোয়ারের সময় সব ডুবে যায়, কিলবিল করে সাপ—একটা পানবোড়া একবার ঠুকে দিলে তো শিবের অসাধ্যি।'

'আজ্ঞে সে তো বটেই।'

'তখন সে চরে সবচে' আগে কে যায় বলোদিনি?'

'জানি নে।'

'যায় শুয়োর।'—লোকটা এবার একটু হাসল, কুঁচকে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল বাঁ চোখটা।

'কোথেকে যায়?'

'অন্য চর থেকে, ডাঙা থেকে।'

'কী করে যায়?'

'কেন—সাঁতরে?'

'ওই গহীন গাঙ?'

'গহীন গাঙ বইকি। বাঘের অবধি সাহসে কুলোয় না—কিন্তু যাকে বলে শুয়োরের গোঁ। ওদের সাঁতরাতে দেখেছ কখনো? ঠিক কুকুরের মতো জলের ওপর নাকটা তুলে তুর তুর করে পেরিয়ে যায় দু-এক মাইল।'

'তা চরে গিয়ে কী করে শুয়োর?'—আর একজন চাষী একটা বিড়ি ধরাতে গিয়েও ভুলে গেল:

'সেখানে তো কচু-কন্দ নেই, খায় কী?'

'কেন—কাঁকড়া।'

'কাঁকড়া?'—এবার দুটি শ্রোতাই চমকালো এবং সেই সঙ্গে আমিও।

'বললুম না—দুনিয়ায় অমন আজব চীজ আর নেই? নোনা জলের অ্যাই বড়ো বড়ো কাঁকড়া দেখেচ তো? শুয়োর সেগুলো ধরে কড়মড় করে চিবিয়ে খায়।'

'শুয়োরে কাঁকড়া খায়?' একজন তখনো অবিশ্বাসী।

'তেমন তেমন হলে বাঘে ধান খায়, শোনোনি?'

'তা হলে পেটের চিন্তা নেই?'

'একেবারে না। আর জোয়ারের জল এসে চর ডুবে গেলে কী করে জানো? বুনো গাছ জাপটে ধরে—মানুষের মতো সোজা হয়ে—জলের ওপর নাক ভাসিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।'

'খুবই তাজ্জব বলতে হবে তা হলে।'—প্রথম চাষীটি একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে

ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল : 'আপনি এত সব জানলেন কী করে ?'

'খুলনা জেলার লোক না আমি ?'—এইবার লোকটি বিষণ্ণ হল একটু : 'চোখেই তো দেখা এ-সব। কিন্তু পাকিস্তান হয়েই—' একটা ছোট নিশ্বাস পড়ল : 'চারদিকে বানের কথা বলছিলে না তোমরা ? তাই শুয়োরগুলোকে মনে পড়ছিল আমার।'

বান-বান-বান। গ্রাম ডুবছে, শহর ডুবছে, মানুষ ডুবছে, ফসল ডুবছে। যেন রসাতলে যেতে বসেছে গোটা দেশটাই। সেই যন্ত্রণা আর দুর্ভাবনা সব কটি মুখেই ছড়িয়ে পড়ল, বেলা এগারোটার সময়েও—রাধাচূড়োর হালকা ছায়াটার তলায়, যেন একটুকরো বিষণ্ণ অন্ধকার নামল।

মনে হল, গোটাতিনেক নিশ্বাস পড়ল একসঙ্গে। চুপ করে কাটল কয়েক সেকেণ্ড। যে চাষীটি তখন থেকে বিড়িটা হাতে নিয়ে বসে ছিল, সে এবার সেটা এগিয়ে দিলে লোকটির দিকে। আমি দূরের চোখ-ধাঁধানো করোগেটেড্ টিনের চালাটার দিকে তাকিয়ে থেকেও দেশলাইয়ের আওয়াজ পেলুম, বুঝতে পারলুম ওরা তিনজনেই তিনটে বিড়ি ধরিয়েছে।

আমাকে ওরা চোখ দিয়ে দেখেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু মন দিয়ে কেউ দেখছিল না। ওরা দূরের সুন্দরবনে ছিল, নোনা গাঙের দেশে ছিল, ওরা গহীন গাঙে সাঁতার কাটতে দেখছিল বুনো শুয়োরকে, কড়মড় করে এই বড় বড় কাঁকড়া খেতে দেখেছিল। আমি সেখানে কেউ নই। ওসব আমার দেখবার কথা নয়।

একটু সময় কেটে গিয়েছিল, তবু ওদের একজন মনে করে আগের কথারই জের টানল। এই সব সাধারণ মানুষের যেমন করে বলা উচিত, তেমনি বোকা-বোকা ভঙ্গিতে বললে, 'তা বটে। শুয়োরের কথা মনে পড়ে যায় বইকি। মানুষ যদি শুয়োর হত, তা হলে অমন করে বানের তোড়ে তলিয়ে যেত না, নাক উঁচু করে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যেখানে হোক পাড়ি দিত।'

'কিংবা—' যে লোকটাকে দেখলে গা-টা একটু শিউরে শিউরে ওঠে, সাধারণ গেঁয়ো মানুষের কেমন যেন ভক্তি করতে ইচ্ছে যায়, কথা বলতে বলতে যার বাঁ চোখটা কুঁচকে যায় বার বার, একটু মোটা আর ভাঙা যার গলার আওয়াজ, সেই খুলনা জেলার মানুষটা আবার বললে, 'কিংবা হাতের কাছে দু-চারটে বুনো শুয়োর পেলে বেঁচেও যেত কেউ কেউ।'

'বুনো শুয়োর পেলে ? সে আবার কি রকম কথা ?'

সে আবার কি রকম কথা—আমিও এটা জিজ্ঞেস করতে পারতুম। কারণ—এই সে-দিন—উত্তর বাংলার বন্যার সময় আমিও তো ছিলুম এক বন্ধুর বাড়িতে। শেষ রাতে জল এল, হুড়মুড় করে তলিয়ে গেল টিনের ঘর—কে যে কোথায় উধাও হল, আমি জানিও না। লাফিয়ে বেরিয়ে একটা গাছে উঠে পড়েছিলুম, জল নেমে গেলে এক কোমর পলি

আর আতঙ্কে জমাট মৃত্যুর জগৎ ঠেলে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছি, বন্ধু, তার স্ত্রী—তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খবর নেবার সময় ছিল না, উপায়ও ছিল না। দিন সাতেক পরে—অনেক কষ্টে নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যাকে সামনে পেয়েছি—অনেক রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছি তাকে। আমি যদি একটা বুনো শুয়োর হতুম—এর বেশি কী আর করতে পারতুম আমি!

লোকগুলোর আলাপ-আলোচনায় আমার কেমন একটা অস্বস্তি হল, একবার ভাবলুম আমার পকেটে, ফ্লেশ-লাভার্স' বলে যে পেপারব্যাকটা আছে, সেটা বরং পড়ি—ট্রেনের তো এখনো চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তবু ওদের কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল, আমি ঠিক শুনতে চাইলুম না—তবু শুনে যেতে লাগলুম—করোগেটেড টিনের চালাটা চোখের সামনে ঝকঝক করে চলল।

তারপর সেই লোকটার গলা আরো গভীর হতে থাকল, স্মৃতির ভেতরে ডুবে গিয়ে মানুষ যেমন করে কথা বলে—কখনো স্বপ্ন দেখে—কখনো জাগে, কখনো বাইরেটাকে আবছা করে দেখে—কখনো দেখে না, তেমনি স্পষ্ট অথচ ছায়া-ছায়া ভঙ্গিতে ভাঙা মোটা আওয়াজে সে কথা কইতে লাগল। এখন তার স্বরে জোয়ারে ফেঁপে ওঠা রায়মঙ্গল নদী গম গম করতে লাগল, নোনা সমুদ্রের হাওয়ায় সুন্দরী-হেঁতাল-গোলপাতার মর্মর উঠতে লাগল। আমি এতক্ষণে কোথাও ছিলুম না—এবার ওই লোক দুটো, রেলের লাইন, রোদ-ঝলসানো টিনের চাল, রাধাচূড়োর ছায়া—সব মিলিয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকারের ভেতরে শুধু স্মৃতি জড়ানো একটা স্বর জেগে রইল কুয়াশামাখা আলোক-বৃত্তের মতো।

'দেশ-ঘর যখন গেল, তখন বউ আর দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি শেয়ালদা স্টেশনে। তারপর ক্যাম্পে। তারও পরে? বউটা মরল কলেরায়, ছেলেটা ভিক্ষুকের দলে মিশল, মেয়েটা একটু বড় হয়েছিল—সেটা যে কোন্ চুলোয় গিয়ে পৌঁছুল বোধ করি ভগবানও তা জানে না।

তা ভাই ছাড়ান দাও এ-সব কথা, এগুলো শুনে শুনে তো তোমাদের কান পচে গেছে। মোদ্দা—বছর না ঘুরতেই আমি হাত-পা ঝেড়ে সাফসুফ হয়ে গেলুম। তখন যেখানে যাই—যেখানেই থাকি, আমার আর কিসের ভাবনা! ঘুরতে ঘুরতে চলে এলুম বাংলা দেশের আর-এক মুলুকে।

কী না করেছি বছর দুই ধরে। সরকার থেকে লোন দিয়েছিল, ব্যবসা করতে গেলুম—ছ' মাসও টিকল না। জাত চাষীর ছেলে, সাতজন্মে করেছি ও-সব, না বুঝি কিছু! আসামের দিকে দল বেঁধে গিয়েছিলুম একবার—পাহাড়ের ঢালে বাস্তু বেঁধে জমিতে চাষ দিয়েছিলুম—বলব কী ভাই, সোনা ফলেছিল। কিন্তু থাকতে দিলে না, প্রথমে এল সরকারী

নোটিস, কিন্তু বন-বাদাড় থেকে এত কষ্টে ফসল করেছি—ছেড়ে যাব? তাতে দিলে হাতি লেলিয়ে। ঘরদোর ভেঙে আমাদের বুকের পাঁজরার সঙ্গে ফসল দলে-পিষে উৎখাত করে দিলে—হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিলে, এরা পাকিস্তানের চেয়েও সরেস।

ও-সব কথা থাক দাদা—আমাদের ছোট মুখে মানায় না। কাঁদতে কাঁদতে কে যে কোন্ দিকে ছটকে পড়ল বলতে পারি নে, আমি আসাম ছাড়িয়ে আবার বাংলা দেশে এলুম।

পৌঁছেছিলুম একটা ছোট শহরে। জনমজুর খাটলুম কিছু দিন, কিন্তু চাষীর রক্ত যাবে কোথায়! কারো কাঁধে লাঙল দেখলে, একপশলা বৃষ্টির পর ক'টা লাউ-কুমড়ো-পালঙের পাতা সবুজ হয়ে লকলক করতে দেখলে, যেন কান্না উছলে উঠত বুকের ভেতর।

সরকার থেকে তখন লোক পাঠাচ্ছিল আন্দামানে, জমি-টমি দেবে। কিন্তু সেই হাতির পর থেকেই আমার ভয় ধরেছিল, দাদা। সে তো কালাপানির দেশ—সেখানে আবার কী লেলিয়ে দেবে কে জানে! আমার আর কী আছে, মরি তো এই বাংলা দেশেই মরব।

চাষীর ছেলে—একটুখানি জমি চাই আমার। এক বিঘে না হয় দশ কাঠা, দশ কাঠা না জুটলে পাঁচ কাঠা। কিন্তু কে দেবে জমি—কোথায় জমি! এ তো আমাদের দেশ নয় যে বন কেটে আবাদ করব, বাঘ-কুমির-সাপ তাড়িয়ে মাটির দখল নেব।

তবু আবার জমি পেলুম।

শহরের বাইরে এক পাহাড়ী নদী। যত বড় নদী, চর তার চাইতেও বেশি। এই চড়া বোধ হয় সরকারী সম্পত্তি—কিন্তু তাতে এখন কাশ, শন আর ইকড়ার জঙ্গল। আগে বর্ষায় চড়াটা তলিয়ে যেত, কিন্তু দশ-বারো বছর ধরে তার খানিক জায়গা অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে, আর ডোবে না—সেখানে ঘাস-পাতা পচে বেশ জমি তৈরি হয়ে গেছে।

মানুষজন কেউ থাকে না—কার গরজ পড়েছে ওখানে থাকতে। নদীর খেয়া পেরিয়ে রাত-বিরেতে যারা চর পেরিয়ে আসে তারা হাওয়ায় ঘাসবনের শাঁই-শাঁই শব্দ শুনে মনে মনে রামনাম জপে। তা ছাড়া ভয় দেখাবার জন্যে দুটো-চারটে আলেয়া তো আছেই।

বিশ্বেস করবে কিনা জানি না, জমির খিদে আমি আর সইতে পারছিলুম না, কিছুতেই থামতে চাইছিল না বুকের কান্না, একটা ধানের ছড়া দেখলে, দুটো শাকের পাতা দেখলে যেন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার। শেষকালে খ্যাপার মতো আমি ওই চরে গিয়ে উঠলুম। হাতে যে দু-চারটে টাকা ছিল, তাই দিয়ে দা কিনলুম, কোদাল কিনলুম, খুঁটি-নাটি আরো কিছু কিনলুম। আমার জমি আমিই গড়ব।

একাই? একাই। আমার আর কে আছে—তা ছাড়া আর কেই বা আমার সঙ্গে যাবে ওই ভুতুড়ে চড়ায় জমি গড়তে? কোন্ ফসলটাই বা ফলবে ওখানে? বালি জমি,

ধান-পাট কীই বা হবে ?

কিন্তু কিছু না হোক, ক'টা শাক তো তুলতে পারব। পটোল হবে নিশ্চয়—দু'চারটে ফুটি-তরমুজও কি ফলাতে পারব না ?

আরো দশ ঘর উদ্বাস্তুর সঙ্গে আমারও একটা হোগলার ঝাঁপ ছিল শহরের এক টেরেয়। সেটা তুলে নিলুম। সবাই অবাক হয়ে বললে, "কোথায় চললে ?"

"নদীর চড়ায়।"

"সেখানে কী ?"

"জমি গড়ব।"

"মাথা খারাপ ? কী জমি হবে ওই কাশ আর শনের জঙ্গলে ?"

"জানি নে। চেষ্টা করে দেখব।"

ঠাট্টা করে কী বিশ্বাস করে বলতে পারি নে, একজন বললে, "ওই চড়ায় পেত্নী আছে।"

বললুম, "দেশ ছাড়বার পরে মরে তো ভূত হয়ে আছি, পেত্নীতে আমার কী করবে ?"

মরুক গে—সব কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যায়। আমি একাই বাস্তু বাঁধলুম নদীর চড়ায়। বয়েস অল্প ছিল, কবজিতে জোর ছিল, মাথার ভেতরে খ্যাপামি ধরে গিয়েছিল। লেগে গেলুম জঙ্গল কাটতে। গোটাকতক সাপ-খোপ মেরে শেষতক বিঘেটাক জমি সাফ হয়ে গেল।

তোমরাও তো চাষী, জানোই তো ভাই—মাটিতে মন থাকলে মাটি তোমায় কক্ষনো ঠকায় না। কিছু সে তোমায় দেবেই। শাক-সব্জী হল, পটোল হল, ফুটি ধরল বলে। তখন দিনের বেলা যারা চেয়েও দেখত না, আর রাত-বিরেতে চড়া পেরিয়ে যাওয়ার সময় রামনাম করত, তারাই দু-একজন করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

"বাঃ, বেশ পটোল হয়েছে তো তোমার !"

"এ মাটিতেও তো শাক-টাক হয় দেখছি !"

এক-আধজন বলত : "এই চড়ায় একলাটি থাকো, তোমার ভয় করে না ?"

"কিসের ভয় ?"

"মানে—জন-মনিষ্যি নেই, তেনাদের যাওয়া-আসা আছে—"

বলতুম, "তেনাদের তো কখনো দেখিনি। যদি আসেনই, আলাপ করে নেব।"

"তোমার সাহস আছে—বলতে হবে সে-কথা।"

"হুঁ। এখানে—এমন একলাটি থাকা—"

শুধু একজন একবার বলেছিল, "পাহাড়ে নদীর চড়ায় ঘর বাঁধলে হে ? এসব নদীকে বিশ্বাস করতে নেই। ইচ্ছে মতো খাত বদলায়—একদিন এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়তো।"

"বারো বছর যদি ঝাঁপিয়ে না পড়ে থাকে, আর পড়বে না।"

নদীতে আমার ভয় ছিল না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—প্রথম প্রথম রাত্তিরগুলোকে তেমন ইয়ে লাগত না। অন্ধকার থাকলে চারদিকটা কেমন থমথম করত, বাতাসে কাশ-শন-ইকড়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজে কেমন ভুতুড়ে কান্না শোনা যেত একটা। অনেক দূরে একটা শ্মশানঘাটা—তার চিতার আগুন দেখা যেত—আরো খারাপ লাগত তখন। অদ্ভুত আওয়াজ করে এক-আধটা পোকা ডাকত, অমন শব্দ এর আগে আর কখনো শুনিনি। যেদিন চাঁদ উঠত—সেদিন কেমন সাদা সাদা মড়া আলোয় ভরে যেত সবটা, মনে হত সমস্ত চড়াটা জুড়ে চিতার ধোঁয়ার মতো কী যেন জমাট হয়ে আছে, বাদুড়ের ডানার আওয়াজ শুনলে পর্যন্ত কেমন একটা কাঁপুনি জেগে উঠত বুকের ভেতরে।

কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেল। তারপর এমন হল যে আঁধার রাতে এই চড়ায় আমি একলা মানুষ বসে আছি—এইটে ভাবতেই ভালো লাগত আমার। ভাবতুম—আমি সব পারি—সব বন-বাদাড় কেটে এই ভুতুড়ে চড়ায় সমস্ত জমি উদ্ধার করে আনতে পারি—ফসলে ফসলে ভরে দিতে পারি। এ চর কারো নয়, কেউ এর মালিক নয়—আমি একে দখল করেছি, এ আমার, শুধুই আমার।

তখন চাঁদের আলোরও রঙ বদলাতে লাগল। চিতার ধোঁয়া নয়—জ্যোছ্না রাত্তিরে যেন দুধের বান ডেকে যেত। আমি দেখতে পেতুম, সেই আলোয় আমার ফসলগুলো শ্বাসে আর স্বাদে ভরে উঠছে—টিপ্ টিপ্ করে ঝরা শিশিরে আরো পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে ক'টা বেগুন, ক'টি ছাঁচিকুমড়ো। আর তখন আমার মনে হত—এখন যদি বউ থাকত, আমার ক'টা ছেলেমেয়ে থাকত—

এমনি একটা জ্যোছ্নার সন্ধ্যায়, আমার একলা ঘরের দাওয়ায় বসে এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি একদিন ভয়ানক চমকে উঠলুম।

একটু দূরেই ছায়া ফেলে গোল মতো কী একটা দাঁড়িয়ে।

বাছুর? আরে দূর—এখানে কার বাছুর আসতে যাবে? তা ছাড়া অমন চেহারা তার হতে যাবে কোন্ দুঃখে? এ অনেক মোটা, গোল, বেঁটে বেঁটে পা, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, গায়ে খাড়া খাড়া বড় বড় লোম, মুখের ডগাটা ছুঁচলো, আর তার ওপরে ওলটানো নখের মতো বাঁকা দাঁত দুটো। দেখেই বুক চমকে গেল, প্রকাণ্ড একটা মদ্দা বুনো শুয়োর।

অ্যাদ্দিন আছি এখানে—দেড়-দু বছর হয়ে গেল, এ মক্কেলকে তো এর আগে কখনো দেখিনি। গোটা চরটাই আমি ঘুরেছি, বন-বাদাড় ঠেঙিয়েছি, শন কেটে এনে ঘরে ছাউনি দিয়েছি—দু-একটা খরগোস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি এর আগে। সাপ অবিশ্যি আছে, তা যে তল্লাটের মানুষ আমি—সাপ নিয়ে তো নিত্যি ঘর করতুম। এ হতচ্ছাড়া

তো এখানে আগে ছিল না—থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যেত অনেক আগেই।

এল কোত্থেকে?

কিন্তু সে ভাবনা পরে। এখন তো বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। মদ্দা দাঁতাল শুয়োর—জানোই তো কী বজ্জাত জানোয়ার। আচমকা মুখোমুখি হয়ে গেলে তো আর কথা নেই—সোজা তেড়ে এসে নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। আমার এক পিসেমশাইকে শুয়োরে মেরেছিল—সে কথা মনে হলে এখনো গায়ের ভেতরে আমার ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে।

বেশ ছিলুম একলা চড়ায়—রাজার হালে। কোত্থেকে এই আপদটা এসে জুটল হে?

ঘরে একটা সাপমারা বল্লম ছিল। ভাবলুম, এনে তাক করে দিই ছুঁড়ে। তারপরেই মনে হল, যদি ফসকায়? প্রায় হাতির ছানার মতো চেহারা—তার ওপর যা বদখৎ মেজাজ! একেবারে ঘরসুদ্ধুই উড়িয়ে দেবে আমাকে।

আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই রইলুম ঠায় বসে, আর শুয়োরটাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার দিকে চেয়ে রইল। নড়া-চড়া কিচ্ছুটি নেই, যেন কাঠের পুতুল। আমি দেখতে লাগলুম জ্যোছ্‌নায় ওর ক্ষুদে চোখ দুটো মিটমিট করে জ্বলছে—একটা গোলমতন ছায়া জমে আছে ওর পায়ের কাছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে ও যে কী দেখছিল—সে ওই-ই বলতে পারে।

একটু পরে ফোঁস ফোঁস করে গোটা দুই শ্বাস ছাড়ল, ঘোঁৎ করে যেন আওয়াজও তুলল একটু, তারপর আস্তে আস্তে খুট খুট করে বেরিয়ে গেল ঘরের সামনে থেকে। আমি দেখতে পেলুম, একটু এগিয়ে ঢুকে গেল ঘাস বনের ভেতরে।

আপদ এখন তো গেল, কিন্তু গোটা রাত্তির আমি ঘুমুতে পারলুম না। এ তো মহা জ্বালা হল দেখছি। আর তো আমি ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘুরতে পারব না—বলতে পারব না, আমি এখানকার মালিক, এই চর আমার রাজত্বি। এ ব্যাটাচ্ছেলে কোন্‌খানে ঘাপটি মেরে থাকবে—কখন কে জানে এর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে—তারপর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়া লাগাবে—যাকে বলে শুয়োরের গোঁ। ঘাস-কাশের বন আর এবড়ো-খেবড়ো জমি আমি দৌড়েও পালাতে পারব না—ওই দাঁত দিয়ে একেবারে ফালা-ফালা করে ফেলবে আমাকে।

কোত্থেকে এসেছে এ-কথা ভেবে লাভ নেই। কোন্ দূরের জঙ্গল থেকে পথ ভুলে কিংবা তাড়া খেয়ে এই চড়ায় এসে নেমেছে সে ওই মক্কেলই বলতে পারে। কিংবা কে যে কোথা থেকে কোথায় যায়—ভগবানেরও কি জানা আছে সে খবর? আমিও কি জানতুম, সুন্দরবন, অথৈ গাঙ আর মেঘ-বরণ ধানের দেশ থেকে সোঁতের কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে আমি এই চরে এসে ঠেকব? আমি কি জানতুম এমন সন্ধ্যাও আমার আসবে যখন গাঁয়ের বিশালাক্ষীর মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ উঠবে না, নিমগাছের ছায়া

কাঁপবে না আমাদের উঠোনে, হাওয়ায় উঠবে না বুনো ফুল-গাছগাছালির সঙ্গে ফুটন্ত ভাত কিংবা তপ্ত খেজুর গুড়ের পাকে চিঁড়ের গন্ধ, শোনা যাবে না কীর্তনের গান ? আমিও কি ভেবেছিলুম, আমার একলা সন্ধ্যায় কেবল ঘাসবনে শন শন করবে হাওয়া, কেবল অদ্ভুত আওয়াজ তুলে পোকা আর ঝিঁঝি ডাকবে আর অনেক দূরের জ্বলন্ত চিতা থেকে কয়েকটা আগুনের পিণ্ড লাফাতে লাফাতে এসে আলেয়া হয়ে দপদপ করবে এখানে-ওখানে ?

তা হলে ওর দশা আমারই মতো। ওরও আলাদা জঙ্গল ছিল, বুনো ওল ছিল। হয়তো বা শুয়োরদেরও দেশ আলাদা হয়ে গেছে, তাড়া খেয়েছে সেখান থেকে। ও ব্যাটাচ্ছেলেও আমারই দলের—বাস্তুহারা।

বাস্তুহারা কথাটা মনে হতে একটু হাসি পেলো, কিন্তু বেশিক্ষণ হাসিটা থাকল না। বাস্তুহারা হোক আর নাই হোক—আদতে তো বুনো শুয়োর। মানুষের শত্তুর। যখন নিজের তালে আছে, বেশ আছে। কিন্তু যা মেজাজী জানোয়ার, একবার যদি ক্ষেপল তো—

পরদিন থেকে যা হোক একটা দা কিংবা বল্লম সব সময় রাখতুম হাতের কাছে। চলতে ফিরতে বার বার নজর রাখতে হত চারপাশে। আর বলব কি হে—দেখাও হয়ে যেত শুয়োরটার সঙ্গে।

কিন্তু দেখা হলেই দাঁড়িয়ে যেত ওটা। দিনের বেলায় দেখেছিলুম, রাতে যা ভেবেছি, জানোয়ারটা তার চেয়েও বড়। গা-ভর্তি ঝাঁটার মতন রোঁয়া—মস্ত দাঁতটা চকচক করছে সাদা, এখানে-ওখানে কাদার চাপড়া লাগানো ইয়া পেল্লায় শরীর। তেড়ে এলে মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। কিন্তু যেই মুখোমুখি হল কিংবা আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বোঁ করে—অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে গেল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। নড়া-চড়া নেই—কিছুই না—খানিকটা কেবল মিটমিট করে চেয়ে রইল, তারপর যেন কিছুই হয়নি—এমনি করে গা দুলিয়ে তুর তুর করে কোন্‌দিকে চলে গেল। অনেকবার ভেবেছি তুলি বল্লম—ধাঁ করে মেরে দিই, কিন্তু কিছুতেই হাত উঠত না। কেবল মনে হত—ও যখন আমায় কিছু বলে না, তখন খামোকা ওকে আমি মারতে চাই কেন!

দিনের বেলা আমার ঘর-দোরের দিকে ওকে কখনো আসতে দেখিনি। আমি ভেবেছিলুম, এই এল শুয়োর—আমার ক্ষেত-টেত খুঁড়ে কিছু আর রাখবে না—যে ক'টা ফুটি হয়েছে খেয়ে একেবারে শেষ করে দেবে।

তা গোড়ার দিকে এক-আধটু খোঁড়াখুঁড়িও করেছিল বইকি, শুয়োরের স্বভাব যাবে কোথায়। একদিন বেশি রাত্তিরে আওয়াজ শুনে বেরিয়ে দেখি—ওই কাণ্ড! কী মনে হল, হাঁক পেড়ে বললুম, "এই মক্কেল, কী হচ্ছে ওটা ?" দুড় দুড় করে ছুটে পালালো, তার-

পর থেকে আর ওসব করতে দেখিনি।

হতে পারে—দাঁতাল হলেও শুয়োরটা ভীতু, ভালো মেজাজ, হাঙ্গামা-হুজ্জৎ পছন্দ করে না। মানুষ তো কত রকমের হয়, জানোয়ারেরই কি রকমফের হতে পারে না? তবু আমার মনে হতে লাগল, ওটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেছে। এই নির্জন ভুতুড়ে চড়ায় ও-ও একা, আমিও একা। আমারও এক এক সময় বুকের ভেতর হু হু করে—মনে হয়, সব ছিল, ঘর ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল; তখন নিজের এই রাজত্ব—এই ক্ষেতটুকু—এই জমি গড়বার সুখ—সব ফাঁকা হয়ে যায়, মনে হয়—আমার কিছুই দরকার নেই, কিছুই না। তেমনি ওই শুয়োরটাও একা—ওরও চেনা জঙ্গলটা কোথায় হারিয়ে গেছে, ওরও আপনার জন ছিল, তারা কেউ নেই—কোথাও নেই। আমি যখন ফাঁকা মন নিয়ে কোনো অন্ধকার রাতে—কোনো জ্যোছ্‌নার ভেতর দাওয়ার ওপর চুপ করে বসে থাকি—তখন অন্ধকারটা এক জায়গায় আর একটু ঘন হয়, জ্যোছ্‌নায় কখনো একটা ছায়া পড়ে—ওই শুয়োরটা এসে দাঁড়ায়। তখন ওরও একা লাগে—ও-ও সঙ্গ খোঁজে। আলোয় হোক আর আঁধারে হোক—ওর চোখ দুটো চিকচিক করে জ্বলে, ও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। তারপর ফোঁস করে যেন একটা নিশ্বাস ফেলে, ঘোঁত করে একটু আওয়াজ হয়, কী একটা বুঝে নিয়ে ভারী শরীরটাকে একটু একটু দোলাতে দোলাতে আবার চলে যায় ঘাসবনের ভেতর।

তোমাদের অবাক লাগবে শুনলে, এর পর থেকে আমার আর ওটাকে ভয় লাগত না। কতদিন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেছে, কতবার দেখেছি কোথায় একটু কাদাজল জমেছে—খুশি হয়ে গড়াগড়ি করছে তার ভেতরে, কোনোদিন দেখেছি মাটি খুঁড়ছে নিজের মনে। আর রাত হলে, যখন চরের ওপর কেবল শাঁই শাঁই করছে হাওয়া, যখন দূরের শ্মশানে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে চিতার আগুন—এমন কি মড়া-পোড়ার গন্ধও ভেসে আসছে এক-আধটু, আর আমি ফাঁকা মন নিয়ে—বুকের ভেতরে একটা কান্না নিয়ে বসে আছি, তখন ও এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে, যেন বলতে চাইছে নিজের কথা, যেন সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

শেষে এমন হল, শুনলে হাসি পাবে তোমাদের, দু-একদিন ওটাকে দেখতে না পেলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। আমি চমকে উঠে ভাবতুম—যেমন নিজের খেয়ালে এসেছিল তেমনি করেই চলে গেল নাকি আবার? আর ভাবলেই আমার ভয় করত। যতদিন একা ছিলুম—বেশ ছিলুম। কিন্তু ওটা আসবার পরে কখন যেন দুজন হয়ে গেছি, ও আমাকে বুঝতে পারে, আমি ওকে বুঝতে পারি। তখন বেরোতুম খুঁজতে। হয়তো দেখতুম, অনেক দূরে, অনেকখানি জঙ্গলের ভেতর কোথাও খানিক জলকাদার ভেতরে হাত-পা মেলে শুয়ে আছে। তোমরা বলবে, আমাকে পাগলে পেয়েছিল। আমিও কি তা

ভাবিনি? কিন্তু সেই চড়ায় সব অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল, একটা আলাদা মন হয়ে গিয়েছিল আমার—আমিও একটা আলাদা জীব হয়ে গিয়েছিলুম যেন। জিজ্ঞেস করতুম, 'আসিসনি কেন?'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ তুলে ছুটে পালাতো। যেন লজ্জা পেতো মনে হয়।

বলবে, আমার এ-সব মনগড়া। যাকে বলে বুনো শুয়োর, বোকা, গোঁয়ার, কচু-কন্দ খুঁজে বেড়ায়, যখন-তখন যাকে ইচ্ছে তাড়া করে—তার বয়ে গেছে তোমার মনের কথা বুঝতে। নিশ্চয়—নিশ্চয়, সব মানি। তবু দেখতুম, সেই রাত্তিরে, কিংবা পরের রাত্তিরেই ওটা এসেছে। আমার দাওয়ার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছোট চোখ দুটো চিকচিক করছে জোনাকির মতো। কিছুক্ষণ থাকত ওইভাবে—যা হোক একটা কিছু বুঝে নিত—তারপর আবার আস্তে আস্তে চলে যেতো নিজের মনে।

শহরের বাজারে তরকারী বেচতে আমি নিজে যেতুম না, অন্য লোক এসে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যেত পাইকারি দরে। তারা আসত হপ্তায় দু-চারদিন, তা ছাড়া একটু দূর দিয়ে খেয়ার লোকজনের যাওয়া-আসা তো ছিলই। তাদেরই কারো চোখে পড়ে থাকবে। একদিন হঠাৎ দেখি শহর থেকে শোলার টুপি আর হাফপ্যাণ্ট পরে, কাঁধে বন্দুক নিয়ে দু-তিনজন ভদ্দরলোক এসে হাজির।

প্রথমটা ভেবেছিলুম—চরের ওদিকটায় এ-সময়ে, দু-চারটে চখাচখি পড়ে, তাই মারতে এসেছে। কিন্তু চলে এল আমার ঘরের দিকেই।

"তুমি এখানে থাকো?"

"আজ্ঞে।"

"এ-সব তরিতরকারি তোমার?"

"আজ্ঞে।"

"এ তো খাসমহল জমি। পত্তনি নিয়েছ?"

"আজ্ঞে না।"

"বে-আইনি। একদম বে-আইনি।"

কে জানে কাকে বলে আইন, কাকে বলে বে-আইন! এই ভুতুড়ে চড়ায় সরকারের নজর তো কোনোকালে ছিল না—আমিই এখানে একা হাতে মাটি গড়েছি, ফসল ফলিয়েছি। কিন্তু আইন বে-আইনের ভাবনা আমি আর ভাবতে পারি না। যেদিন হাতি এনে আসামের পাহাড়ে ফসলের সঙ্গে আমাদের বুকের পাঁজর অবধি দলে দেওয়া হয়েছিল, সেদিন থেকে ও-সব ভাবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বাবুদের একজন ফস করে একটা সিগ্রেট জ্বাললেন। বললেন, "যাক, সে-সব পরে হবে। এই চড়ায় বুনো শুয়োর আছে, তাই নয়?"

ধক্ করে উঠল আমার বুকের ভেতর। আমি তিনটে বন্দুকের দিকে তাকালুম।

"কে বললে আপনাদের?"

"আমরা খবর পেয়েছি।"

তোমরা শুনলে রাগ করবে কিনা জানি নে, আমি দেখেছি, হারামীর দিকে জানোয়ারের চেয়ে মানুষেরই ঝোঁক বেশি। তক্ষুণি মনে হল, বলি: "যান ওদিক পানে—কাদার মধ্যে বসে আছে দেখেছি একটু আগে, দিন সাবড়ে।" আর তক্ষুণি কে যেন কানে কানে বললে, "ছি ছি হে, তুমি শুয়োরের চাইতেও ছোটলোক হয়ে গেলে। ও তোমায় বিশ্বেস করে, তার এই প্রিতিদান!"

বললুম, "বাজে কথা। আড়াই বচ্ছর ধরে আমি আছি এখানে। চরের জঙ্গল ভেঙে চলাফেরা করি। কোনো শুয়োর কখনো আমার চোখে পড়েনি।"

"কিন্তু একজন যে বললে—"

"ভুল বলেছে। শেয়াল-টেয়াল দেখে থাকবে হয়তো।"

"তুমি ঠিক জানো?"

"আজ্ঞে এই চড়ার আমি বাসিন্দে। আমি জানি নে তো অন্য লোকে জানবে?"

বাবুরা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম, "তা খরগোস-টরগোস আছে দু-চারটে। খুঁজে দেখতে পারেন।"

"দুর, খরগোস অখাদ্যি। আর সেগুলো খুঁজে কে সময় নষ্ট করবে—কেই বা টোটা খরচ করতে যাবে?"

বাবুদের দুঃখ হয়েছে মনে হল: "বাজে লোকের কাছে উড়ো খবর শুনে হাঁটাহাঁটিই সার হল। চলো হে।"

শুয়োরটা সে রাতে এল না, এল পরের রাতে। বললুম, "তোকে বাঁচিয়েছি, বুঝলি? তিনটে বন্দুক ছিল—কিচ্ছু করতে পারতিস না।"

নিঃসাড়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বললুম, "এবার ক'টা কচু লাগাব ঠিক করেছি। খুঁড়ে-মুড়ে যেন বরবাদ করে দিসনি, তা হলে ঠিক বলে দেব বাবুদের।"

তেমনি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল।

দিন কাটছিল, এইভাবে কতদিন কাটত জানি না। কিন্তু সেই সকালে সরকারী পেয়াদা এসে আমাকে নোটিশ দিয়ে গেল। কেন আমি খাসমহলে জমি জবর-দখল করেছি, কেন আইন-মোতাবেক পত্তনি নিইনি, হুজুরে হাজির হয়ে আমায় তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সেই যে তিন বাবু এসেছিল, তারাই কেউ ফিরে গিয়ে এই উপকারটা করেছে আমার।

নোটিশ নিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম ঘরের দাওয়ায়। আগের দিন থেকেই টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, আজ আকাশ আরো ঘোলাটে, আরো অন্ধকার। ওদিকে নদীতে জল বাড়ছে, গোঁ গোঁ করে উঠছে তার ডাক। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে—চারদিকের ঘাসবনে ঢেউ উঠছে।

জল আসছে নদীতে। চরের খানিকটা ডুবে যাবে। কিন্তু আমি যেখানে আছি সেটা ডুববে না—আজ চৌদ্দ বছর ধরেও ডোবেনি। নদীর ভাবনা নেই, আমি মানুষের কথা ভাবছিলুম। এমনি একটা মেঘলা দিনেই যখন ধানের ক্ষেতে বাতাস ঢেউ দিয়েছিল, সেইদিনই ওরা হাতি এনে—

পত্তনি নিতে হবে, খাজনা দিতে হবে? কত চাইবে কে জানে? নাকি উচ্ছেদই করে দেবে? ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখলুম বৃষ্টিতে ভিজে চিকচিক করছে পটোলগুলো—হাওয়ার মাতন লেগেছে ঢলঢলে লাউয়ের পাতায়। চোখ জ্বালা করতে লাগল। সারাদিন কিচ্ছুটি খেতে ইচ্ছে করল না আমার—ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে রইলুম।

শুয়োরটার ভাগ্যি ভালো আমার চাইতে। ওকে খাজনা দিতে হয় না, পত্তনি দিতে হয় না, ওর উচ্ছেদের ভয় নেই। ভয় নেই? আমি যখন থাকব না—তখন ওরও তো পালা মিটে যাবে। তখন আবার তিনটে বন্দুক আসবে, হয়তো লোকজন নিয়ে ঘেরাও করবে জঙ্গল—তারপর আনন্দে বাবুরা—

সব বিশ্রী লাগছিল, সব ফাঁকা ঠেকছিল, অনেকদিন পরে বৌ আর ছেলেমেয়ের জন্যে আমার কান্না আসছিল। হাওয়া-বৃষ্টি-দুর্যোগের ভেতরে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যে যে কিভাবে কেটে গেল জানি না। তারপর রাতে ঘুম এল, আর তারো পরে—

জেগে উঠলুম বানের ডাকে। ঝড়-বৃষ্টির প্রায় মহাপ্রলয় তখন। কিন্তু কিছু আর ভাববার সময় ছিল না। চর ভাসিয়ে ছুটে এল পাহাড়ী নদী—মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ঘর, আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম—এক ঝটকায় আমাকে কুটোর মতো তলিয়ে নিয়ে চলল।

ডুবতে ডুবতেও টের পেলুম আমার কাছেই কেমন একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ। তা হলে দুজনেই ভেসেছি—দুজনেই আবার একসঙ্গেই বাস্তুহারা। কী করে কী হল জানি না—দু হাতে শুয়োরটাকে জাপটে ধরে মাথা জাগিয়ে তুললুম। আর সেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটা—যার স্বজাতেরা সুন্দরবনের গহীন গাঙ পেরিয়ে চলে যায়—যারা সমুদ্দুরের মতো রাক্ষুসে নদীকে ভয় পায় না—বাঘ-হরিণ পৌঁছুবার আগে যারা নতুন জাগা চরে গিয়ে বাস্তু বাঁধে, সে আমাকে টানতে টানতে—জলের ওপর নাক তুলে সাঁতার কাটতে কাটতে, সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল।

আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে খ্যাপা স্রোত মরণ-ঝাপট দিচ্ছিল। সইতে পারলুম না

—আমি জ্ঞান হারালুম।

যখন চোখ চেয়েছি, তখন সকাল। দেখি, জনতিনেক মানুষ আমায় সেঁকতাপ করছে। বললুম, "শুয়োরটা?"

তারা বললে, "কিসের শুয়োর? বানে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ডাঙায় ঠেকেছিলে, আমরা তুলে এনেছি তোমায়। কোথাকার লোক হে?"

শুয়োরটা কোথায় গেল জানি না। হয়তো আমায় কোনোমতে ডাঙায় ঠেলে দিয়ে সে নিজে আর উঠতে পারেনি, ভেসে গেছে। তোমরা হাসবে, পাগল বলবে আমায়—কিন্তু আমি ঠিক জানি, ও যদি বেঁচে থাকত কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ত না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার মতো ওরও তো কোনো দোসর নেই।'

সেই ভাঙা গভীর গলাটা থামল। নিঃশব্দে বসে থাকল দুটি চাষী, আমি করোগেটেড টিনের চালাটার দিকে চেয়ে রইলুম, আমার চোখ জ্বলতে লাগল, একটা ক্লান্ত কাক ডেকে চলল রাধাচুড়োর ডালে।

সেই লোকটা আবার বললে, "কখনো শুয়োর মানুষ হয়, বুঝেছ—কখনো আবার মানুষ—"

চমকে আমি উঠে দাঁড়ালুম—আমাকেই বলছে? স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম। ট্রেনের সিগন্যাল দিয়েছিল। আমি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী—আমার কামরাটা থাকবে আর একটু ওদিকে। গাড়ি ফাঁকা থাকলে বসে বসে পড়তে পারব 'ফ্লেশ-লাভার্স' বইটা ; আর তেমন যদি সহযাত্রী পাই তা হলে বেশ রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়ে উত্তর বাংলায় বন্যার গল্পও শোনাতে পারব তাদের। রেল-স্টেশনের এই উদ্ভট বাজে গল্পটা ভুলে যেতে আমার সময় লাগবে না তখন।

বিসর্জন

এমন যদি হত, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত ঘরের এক কোণায় ; যা সকলের জোটে তাই এক মুঠো খেয়ে চুপচাপ দিন কাটিয়ে দিত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই লালচ বাড়ছে বুড়ির। এখন যেন রাক্ষসের খিদে এসে পেটে জমা হয়েছে ওর। একরাশ গিলল, ঝিম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপরেই আবার ভাঙা গলায় চ্যাঁচাতে লাগল : 'ওরে—আমায় খেতে দে রে, খিদেয় যে আমি মরে গেলুম।'

তা-ও যদি পেটে রাখতে পারত!

ছেলেবেলায় একবার সখ করে একটা কোকিলের ছানা ধরে এনেছিল সুদাম। মনে মনে ভারী সাধ ছিল, ছানাটা বড় হবে, তারপর রাত-দিন 'কুহু-কুহু' করে গান গেয়ে

প্রাণ একেবারে মাতোয়ারা করে দেবে। হয়তো দিতও, কিন্তু বড় হওয়ার আগেই সে সুদামকে প্রায় পাগল করে দিলে। বাচ্চাটার খাঁই আর মেটে না। সব সময়ে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে চিৎকার আর লাল টুকটুকে একটা হাঁ সে মেলেই রয়েছে। ছাতুর গুলি, ময়দার পিণ্ডি—সেই হাঁয়ের ভেতরে ছেড়ে দিতেই টপ্ করে গিলে ফেলা, তারপরেই আবার কান-ফাটানো চ্যাঁচানি। যেন বিশ্বসংসার গিলে ফেলেও তার খাঁই মিটবে না।

ঠিক একরকম। বুড়িটার সঙ্গে কোকিলের ছানার কোনো তফাৎ নেই।

মেঘের আড়াল থেকে এক টুকরো ভাঙা আর জবুথবু চাঁদ উঠবে-উঠবে করছে, কিন্তু এখনো মুখ বার করতে পারছে না। মন-মেজাজ ভালো থাকলে সুদাম বেশ রস দিয়ে বলতে পারত: 'ঘোমটার আড়াল থেকে নতুন বৌ একবার দেখে নিতে চাইছে—কিন্তু সামনে থেকে খাণ্ডার শাশুড়িটে আর নড়ে না।' কিন্তু এখন আর রসিকতা করবার অবস্থা নয় তার। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে সুদামের মনে হল, আরো কিছুক্ষণ চারদিক এই-রকম থমথমে অন্ধকারে তলিয়ে থাকুক—সারা আকাশটা মেঘে ঢেকে যাক—এই ডিঙ্গি-টাকে পৃথিবীর কেউ যেন এখন দেখতে না পায়, কেউ না।

ক্যানালের গেরি-মাটি জল এই অন্ধকারে মেঠো শামুকের মতো রঙ ধরেছে। দু ধারের ঝোপ-জঙ্গলে চাপ বাঁধা অন্ধকারে ঝিকমিক করছে জোনাকি, এক-আধটা খড়ের ছাউনি কিংবা টিনের চালা ছায়া ছায়া হয়ে দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে আবার। এরই ভেতরে কোথায় একটা ছোট বাচ্চা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কেঁদে উঠল। সুদাম মনে মনে বললে, 'কাঁদো কাঁদো, এখন থেকেই গলায় জোর করে নাও। কান্নার এখুনি হয়েছে কী—দিন তো সামনে পড়েই রয়েছে।'

এক টুকরো আলোও কোথাও জ্বলছে না। কার দায় পড়েছে এই মাঝরাত্তিরে একটা লণ্ঠন জ্বেলে বসে থাকতে? কেরোসিন পেতে যা ঝঞ্ঝাট, আর যা তার দাম। কেবল ঝিল-মিল করে জোনাকি জ্বলছে। ওদের কোনো ভাবনা নেই, পয়সা দিয়ে ওদের কেরোসিন কিনতে হয় না।

সুদাম একবার আড়চোখে চেয়ে দেখল বুড়ির দিকে। মাথাটা হাঁটুর ভেতরে গুঁজে একটা ময়লা তামাকের পুঁটলির মতো বসে রয়েছে। না—ঘুমুচ্ছে না। সুদাম জানে, বুড়িটা কখনো ঘুমোয় না। রাত—রাত-দিন—সন্ধ্যা-সকাল—সব এখন একাকার হয়ে গেছে। যখন জেগে থাকে, তখন থাকে; যখন জেগে থাকে না, তখনো সম্পূর্ণ ঘুমোয় না; ঘুম আর জাগার মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত জায়গায় তার মন নানারকম ছবি দেখে—তিরিশ বছর আগে যে মরে গেছে সে এসে তার সামনে দাঁড়ায়; কোন্‌কালে কোন্ সধবা স্বামীপুত্রের সংসার রেখে চলে গিয়েছিল, তুলসীতলায় নামানো তার আলতা-রাঙানো পা দুখানা দেখতে পায় বুড়ি; কে যেন তাকে ডাক দিয়ে বলে, 'বাড়িতে দশ-সেরী রুই মাছ এয়েছে

গো—ও নতুন বৌ, কুটতে যাবে না?' আর এইসব ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্নের ভেতর তার খিদে পায়, যন্ত্রণায় তার পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যেতে থাকে, ঘোর ভেঙে গিয়ে বুড়ি হঠাৎ বিকট গলায় গোঁ-গোঁ করে ওঠে; 'এ বাড়িতে সব মরে-হেজে শেষ হয়ে গেল নাকি গো? আমাকে কেউ চাট্টিখানি খেতেও দেবে না?'

রাগে ঝন ঝন করে ওঠে সুদামের বৌ তুলসী।

'এ বাড়ির সব মরে শেষ না হয়ে গেলে তোমার খাঁই মিটবে কী করে? তুমি যে যমের খিদে নিয়ে এসেছ। নিজে তো আর মরবে না, তিন যুগের ভুষুণ্ডী কাগ হয়ে বসে রয়েছ।'

না, বুড়ি যে মরবে না, এ ব্যাপারে সুদামও নিঃসন্দেহ হয়েছে। তারও তো একদিন ঘর-সংসার সব ছিল। স্বামী, ছেলেমেয়ে সব। কী করে যে মরে-হেজে একাকার হয়ে গেল —সুদাম তার খবর রাখে না। তার ছেলেবেলা থেকেই বুড়িকে এ বাড়িতে সে দেখছে। সম্পর্কে তার মায়ের কি রকম যেন মাসী হয়—অনাথা দেখে তার মা এনে এখানে ঠাঁই দিয়েছিল। তখনই বুড়ির চুলে পাক ধরা। তবু খাটা-খাটুনি করত, ধান সেদ্ধ করত, গোরু দেখত। তারপর সুদাম বড় হল, বিয়ে-থা করল, মা-বাপ চলে গেল। কিন্তু বুড়ি সেই যে ঠায় যক্ষি বুড়ির মতো বসে রয়েছে—তার আর নড়বার নামটিও নেই। এ বাড়ির ওপর দিয়ে এতবার যমের আনাগোনা ঘটে গেল, কিন্তু ওর দিকে চেয়েও দেখল না একটিবার।

এখন না পারে চলতে ফিরতে, না পারে উঠে দাঁড়াতে। বছর দুই আগেও পিঠটাকে একেবারে সামনে ঝুঁকিয়ে, একটা লাঠি নিয়ে, এক-আধটু ঘুরে বেড়াত। এখন তা-ও পারে না। কখনও পিণ্ডি পাকিয়ে বসে থাকে, কখনো কুকুরের মতো কুণ্ডলী করে ঘুমোয়। না—ঘুমোয় না। ঘুম আর জাগার মাঝখানে একটা অদ্ভুত জগতে একরাশ ছায়ার মিছিল দেখে আর থেকে থেকে চমকে ওঠে: 'কে—কে ওখানে? আজ কি তোরা আমাকে এক মুঠো খেতেও দিবি নে?' অথচ একটু আগেই—হয়তো আধ ঘণ্টা আগেই তুলসী যে তাকে এক কাঁসি ভাত-তরকারী গিলিয়ে গেছে সে তার মনেও থাকে না।

শুধু তাই নয়। ভাঙা গলায় দাঁত পড়ে যাওয়া মুখের জড়ানো আওয়াজে শাপমন্তিও দিতে থাকে: 'হে ভগবান—এদের এত আছে, তবু এক মুঠো খেতে দেয় না আমাকে। তুমি এর বিচার কোরো।'

জলন্ত চোখে তুলসী বলে, 'শুনলে? শুনছ তো?'

'হুঁ।'

'তুমি আর কতটুকুন বাড়িতে থাকো? রাতদিন ওই শাপ-শাপান্ত আমাকে শুনতে হয়।'—রাগে দুঃখে তুলসীর চোখে জল আসে: 'ছেলেমেয়ের পেট মেরে সবাকে

খাওয়াই—এই তার প্রতিদান !'

সুদাম বলে, 'বুড়িটার গলা টিপে মেরে ফেলবে একদিন ।'

'আঃ, কী যে বকো !'

তবু সুদাম জানে, মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে কোথায় তুলসীর একটা মায়া আছে বুড়ির জন্যে। মন-টন ভালো থাকলে বলে, 'আহা—বলছে বলুক, ওর কি আর বোধভাষ্যি আছে কোনো ? এককালে তো বিস্তর করেছে তোমাদের। নতুন বৌ হয়ে যখন তোমাদের বাড়িতে এলুম, রাতদিন কাঁদতুম মার জন্যে, তখন কত আদর করত আমায়, চোখের জল মুছিয়ে দিত, লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টি এনে খাওয়াত। এখন অথর্ব হয়ে পড়েছে বলে—'

সুদাম তাকিয়ে থাকে তুলসীর মুখের দিকে। মেয়েদের মন বোঝা ভগবানেরও সাধ্যি নয়। একটু আগেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছিল : 'হয় বুড়িটাকে যেখানে হোক বিদেয় করো, নইলে আমিই বিদেয় হই'—এখন ঠিক উলটো সুর ভাঁজতে শুরু করেছে। বুড়িটাও নিশ্চয় তুলসীকে বোঝে। তাই মরতে মরতেও মরে না—রাতদিন কোকিলের ছানার মতো হাঁ করে থাকে, ভাবে—দুনিয়ায় যা কিছু খাওয়ার আছে এই বেলা তা পেট পুরে খেয়ে নিই !

না—সুদামের কোনো মায়া নেই বুড়ির জন্যে। এক বিন্দুও না। কবে বুড়ি তাকে আদর করে দু-চারটে নাড়ু-মোয়া খাইয়েছে কিংবা কোলে বসিয়ে রূপকথা শুনিয়েছে—সে-কথা ভেবে সুদামের মন মমতায় ভরে ওঠে না। এই সংসারে থেকেছ খেয়েছ, যে-টুকু করবার করেছ। তারপর মানে মানে, সময় থাকতে যদি চলে যেতে—তা হলে সুদাম ডাক-চিৎকার ছেড়ে কাঁদত তোমার জন্যে, কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যেত, এমন কি শ্রাদ্ধ-শান্তি করতেও তার আপত্তি হত না।

কিন্তু এ কী ব্যাপার ?

বাপ-ঠাকুর্দার আমলে যা ছিল, ছিল। কিন্তু সে সব দিন তো আর নেই। অবস্থা পড়ে গেছে। সামান্য যা জমি-জমা আছে, তাতে ছ'মাসের খোরাকির টানও উঠে আসে না। তরি-তরকারি বেচে, কখনও বা আরো দু-চারটে খুটখাট কাজ-কর্ম করে কোনোমতে চালিয়ে দিতে হয়—আষাঢ়-শ্রাবণের দুটো মাস একবেলার বেশি খাওয়াই হয় না। সামনে আরো আকাল আসছে, চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে সেটা। তিন টাকা ছাড়িয়ে উঠেছে চালের কিলো—আর ক'টা দিন বাদে গাঁয়ের আরো অনেক বাড়ির মতো তাকেও হয়তো মধ্যে মধ্যে উপোস দিতে হবে।

এর ভেতরে একটা বাড়তি পেট। কোনো আয় দেয় না—শুধু বাজে খরচ। দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যে—ঘোর ভাঙলেই মুখে কেবল খাই-খাই রব। সুদামের মাথার ভেতরে

আগুন ধরে যায়। একটা ধূমাবতী এসে ঘরে ঢুকেছে। কখনো কখনো তার মনে হয়—বাড়িসুদ্ধ সব মরে গিয়ে যখন শ্মশান হয়ে যাবে, পোড়া ভিটের ওপর গজিয়ে উঠবে সাপের জঙ্গল, দাওয়ায় গর্ত করে শেয়ালে বাসা বাঁধবে, তখনো সেই শেয়াকুল কাঁটা আর ধুতরো-আকন্দ-বুনো ওলের মাঝখানে ডাকিনীর মতো জিভ মেলে বসে থাকবে বুড়িটা। তার পাটের মতো চুলগুলোতে লাউডগা সাপ খেলে বেড়াবে আর সন্ধ্যার লালচে আকাশের দিকে চেয়ে সে ডাক ছাড়তে থাকবে: 'দে—দে—আরো খাই, আরো খাই।'

ভাবতে গিয়ে রক্ত হিম হয়ে আসে। সুদামের মনে হয়—সব বুড়িটার জন্যে। তারা তো মোটামুটি সচ্ছল গেরস্তই ছিল, কেন এমনভাবে একটু একটু করে সব যাচ্ছে? কেন দু'বছর আগে অমন দুধোল্ রাঙা গাইটাকে মা-মনসায় কেটে দিলে? ধানগুলোর অমন সর্বনাশ হয়ে গেল কেন, যে মাটিতে প্রতিবার কম করে একশো কুমড়ো ফলে—সেখানে এ বছর বিশ-পঁচিশটার বেশি হলই না?

আশ্চর্য—বুড়িটা মরেই না। বয়েস কত হল? সত্তর-পঁচাত্তর-আশী? কিংবা আরো বেশি? সুদাম জানে না। তুলসীই ঠিক বলেছিল—ওটা ভুষুণ্ডী কাগ। ওদের বয়েসও নেই, মরণও নেই।

আজ তিন মাস ধরে এই মতলবটা তার মাথায় এসেছে। তুলসীটা এমনিতে বুড়ির ওপর যতই গর্জাক, কিছুতেই এতে সায় দেবে না, বরং নিজের ভাত ক'টা নিয়ে গিয়ে বুড়ির মুখে গুঁজে দিয়ে আসবে। তাজ্জব মেয়েদের মন—ভগবানও বুঝতে পারেন না!

কিন্তু সুদামের ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। আর চলে না, চলতেই পারে না।

সুযোগ এসেছে তিন মাস পরে। কাল ছেলেমেয়ে নিয়ে তুলসী গেছে বোনের বাড়িতে—ফিরতে আগামীকাল সন্ধ্যে। অতএব এই বেলাই—

বুড়ির তো দিনও নেই, রাতও নেই। চোখে কিছু দেখতে পায় না, কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে না উঠলে শুনতেও পায় না। তাই সুদাম যখন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে, তখন বুড়ি বিড় বিড় করে বললে, 'কে ও? জগৎ নাকি!'

মা-কালীই জানেন জগৎ মানুষটা কে! কোন্ কালে কোথায় বেঁচে ছিল, কবে মরে শেষ হয়ে গেছে। হয়তো বুড়ি এখন সেই লোকটাকে দেখছিল বসে বসে। না চেঁচিয়ে, বুড়ির কানের কাছে ঝাঁ-ঝাঁ করে চাপা স্বরে সুদাম বললে, 'আমি সুদাম।'

'অ—সুদাম।'

বুড়িকে তুলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে সুদাম এগোতে লাগল। একেবারে ওজন নেই গায়ে, একেবারে পাখির মতো হাল্কা। জটাবাঁধা চুলগুলো সুদামের মুখে লাগছিল, একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে যাচ্ছিল—নাকের পাশ দিয়ে পিবৃ পিবৃ করে কী উঠে যাচ্ছিল—

নিশ্চয় বুড়ির চুল থেকে উকুন। অসম্ভব ঘেন্না করতে লাগল সুদামের। আশ্চর্য—এটাকে তুলসী নাওয়ায়-ধোয়ায়-খাওয়ায় কী করে! মেয়েরা সব পারে, ওদের অসাধ্যি বলে কিছু নেই।

বুড়ি বিড় বিড় করে বললে, 'আমাকে কোথায় নিয়ে চললি সুদাম?'

'তুমি যে শিমুলতলীর মন্দিরে যেতে চেয়েছিলে গো। তাই নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস বললি?'

'শিমুলতলীর মন্দিরে।'

'আহা—বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্।'—বুড়ির জড়ানো অস্পষ্ট আওয়াজ যেন খুশিতে দুলে উঠল একবার: 'আহা, কতদিন মাকে দশ্‌শন করিনি।'

এখনই যেন কত দর্শন করতে পারবে! চোখের মাথা তো খুইয়ে রেখেছে।—কথাটা মুখে এলেও সুদাম বলল না। বরং তার মনে হল, দর্শনের ব্যবস্থাটা পাকাপাকিই করে দিচ্ছি এবার। আমার ঘাড় থেকে নেমে সেখানে গিয়েই বাস্তু বাঁধো এখন।

মেঘে আধখানা আকাশ ঢাকা, চাঁদের ভাঙা টুকরোটা তাই ভেতর থেকে ফুটতে পারছিল না। সারা গ্রাম মাঝরাতেই ঘুমে নিথর। একটু হাওয়া নেই, একটা পাতা নড়ছে না, একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না কোথাও। মেঠো শামুকের মতো রঙ নিয়ে ক্যানালের গিরি-মাটি জল ভাঁটার টানে নদীর দিকে ছুটেছে। বুড়িকে নৌকোয় তুলে সুদাম স্রোতে ভেসে পড়ল।

সেই থেকে বুড়ি নিশ্চুপ। যেখানে বসিয়েছিল, সেইখানেই হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে একটা তামাকের ময়লা পুঁটলির মতো পড়ে আছে। আবার স্বপ্ন দেখছে হয়তো। অনেক-কাল আগেকার মরে-যাওয়া মানুষগুলো এখন একে একে সার দিয়ে তার মনের সামনে দিয়ে সরে যাচ্ছে। একটু পরেই হয়তো চেঁচিয়ে উঠবে: 'কে যায়, কে যায় ওখান দিয়ে? আজ কি তোরা আমাকে এক মুঠো খেতে দিবি নে?'

চাঁদটা উঠতে চেষ্টা করছে, উঠতে পারছে না; আশেপাশে, দূরে, অনেক দূরে—একটা আলোও জ্বলছে না—কার দায় পড়েছে আলো জ্বালবার, কেরোসিন তেল কি এতই সস্তা? জোনাকি ঝিলমিল করছে ঝোপ-জঙ্গলে, কিন্তু জোনাকির আলোয় কেউ কিছু দেখতে পায় না, জোনাকিরা কারো সাক্ষী থাকে না। এই ভালো। আজ এই অন্ধকারটাই সুদামের দরকার।

নৌকো নদীতে এসে পড়ল। ভাঁটার ডাক উঠেছে জলে। এতক্ষণ গুমোট ছিল, এবারে হঠাৎ খানিকটা হাওয়া যেন হা-হা করে উঠল। ডিঙিটা দুলতে লাগল অল্প অল্প, ফিকে সাদাটে জল চিক চিক করতে লাগল।

সুদাম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলে চারদিক। না—কোথাও কেউ নেই। দু মাইল দূরে

বাঁকের মুখে গঞ্জে এক-আধটা আলোর বিন্দু—দেখা যায় কি যায় না। এদিকে অন্ধকারে সাদাটে রঙের প্রকাণ্ড নদীটা ধূ-ধূ করছে—বাতাসে হা-হা করছে। আজ রাতে সুদামের এইটেই দরকার ছিল।

মনে মনে সে হিসেব করেই রেখেছে। চার-পাঁচ ঘণ্টা ভাঁটা আছে এখনো। একটা চড়ায় পৌঁছুতে কতক্ষণই বা। বুড়িকে তার ওপর নামিয়ে দিয়ে নিঃসাড়ে ফিরে আসা। তারপরে জোয়ার আসবে। তারও পরে—

বোঠে টানতে টানতে সুদাম যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে চাইল : কাজটা অন্যায়? কিন্তু কেন অন্যায়? মরবার সময় হলেও যে মরে না—সম্পূর্ণ অকারণে যে জ্যান্ত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়—এ ছাড়া আর কী করা যেতে পারে তার জন্যে? সুদাম জানে, সরকারী চাকরিরও একটা মেয়াদ আছে; সময় হলেই তোমাকে ছাড়িয়ে দেবে—সে তুমি হাকিমই হও আর পেয়াদাই হও। তেমনি বেঁচে থাকারও একটা সীমা থাকা দরকার—তারপরে তুমি আর কেউ নও, কোথাও তোমার আর দরকার নেই।

'সুদাম—সুদাম!'

সুদাম চমকে উঠল। প্রথমটা শুনতে পায়নি, কিন্তু শব্দটা এত অস্বাভাবিক, নদীর একটানা কলধ্বনির ভেতরে এমনই বেসুরো যে হঠাৎ যেন ওটা তার কানে গিয়ে ঘা মারল, হাত কেঁপে উঠল তার।

বুড়ি তাকে ডাকছিল।

ডাকছিল তার কাছ থেকে দু হাত দূরে বসেই। অথচ সুদামের মনে হল যেন আধ মাইলের ওপার থেকে ডাকটা তার কানে আসছে।

সুদাম বললে, 'হাঁ গা, বলছ কিছু?'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি—হাঁ রে সুদাম?'

'বললুম না, শিমুলতলীর মন্দিরে?'

'ঠিক, শিমুলতলীর মন্দিরে।'—বুড়ি বিড় বিড় করতে লাগল : 'কতদিন মাকে দশ্‌শন করিনি। কিন্তু—আচ্ছা সুদাম!'

'আবার কী হল?'

'বড়ো গাঙের মতো আওয়াজ পাই যেন! গায়ে ঠাণ্ডা লাগে যেন! ও সুদাম!'

'কী বাজে বকছ?'—সুদাম বিরক্ত হয় : 'একটু চুপ করে বসে থাকো দিকিনি।'

বুড়ি চুপ করে। হাঁটুর ভেতরে মাথাটা গুঁজে দিয়ে আবার তলিয়ে যায় সেই না-জাগার স্বপ্নের ভেতরে। সুদাম আস্তে আস্তে দাঁড় বাইতে বাইতে সেই স্বপ্নগুলোর কথা ভাবতে চেষ্টা করে। কারা বেঁচে ছিল অনেকদিন আগে, এখন আর নেই। কিন্তু বুড়ির মনের সামনে তারা এখনো আসে যায়, কেউ এই মাত্তর ধান কেটে ফিরল মাঠ থেকে; কেউ

কলমী শাক তুলছে একটা পুরনো পুকুর থেকে, নতুন জলে ভরা বর্ষার নদীতে কারা যেন নাইতে এসেছে দুপুরবেলা—নাকে নোলক আর ধানী রঙের শাড়ি পরে একটি নতুন বৌ এসেছে তাদের সঙ্গে—বুড়িই হয়তো। কে যেন নতুন বৌটার হাতে রাঙা রাঙা কাচের চুড়ি পরিয়ে দিতে দিতে বলছে, 'হাট থেকে অনেক খুঁজে নিয়ে এলুম তোর জন্যে—এমন হাতে এ চুড়ি না হলে কি মানায়!'

সুদামের হঠাৎ হাসি পায়। দুত্তোর, তাকেও তো আচ্ছা পাগলামিতে ধরল! বুড়ির মতো সেও কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে!

যে হাওয়াটা উঠে এসেছিল, আবার থেমে গেছে সেটা। নদীতে ঢেউ আছে কি নেই—শুধু ভাঁটার জলের কলকল ডাক শোনা যায়। চোখে পড়ে—অনেক দূরে উত্তরের আকাশটা এক-একবার লালচে হয়ে উঠেই আবার ঢেকে যাচ্ছে কালচে ছাইয়ের রঙে। ঈস্—এই রাত্তিরে আবার কার সুখের ঘরে আগুন লাগল হে!

'সুদাম!'—বুড়িটা নড়ে উঠল।

'কী হল তোমার?'

'আমার শীত করে।'

'শীত কোথায় এখন এই চত্তির মাসের রাত্তিরে? তোমার যত বাজে কথা।'

'আমার শীত করে সুদাম।'

ভালো জ্বালা। সুদাম বিরক্ত হল। বোঠে ছেড়ে দিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল বুড়ির দিকে, গিঁট বাঁধা ছেঁড়া আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে দিলে তার গায়ে। কিন্তু জড়াতে গিয়ে কি করে ফেঁসে গেল অনেকখানি। বুড়ির কাপড়টায় আর পদার্থ নেই, পচে গলে শেষ হয়ে গেছে একেবারে। কতদিন যে বুড়িকে কাপড় কিনে দেয়নি সুদাম, তা মনে করতে পারল না।

'সুদাম, আমার শীত যায় না।'

বুড়িকে নদীর চড়ায় নামিয়ে দিতে চলেছে বলে নয়, কতদিন—কতকাল তাকে একখানা কাপড় কিনে দেয়নি—হঠাৎ সেই কথাটা মনে হওয়ায় সুদামের নিজেকে কেমন অপরাধী বলে বোধ হয়। হতে পারে কাপড়ের অনেক দাম, কিন্তু—

'সুদাম, ভারী শীত লাগে আমার।'

অপরাধ-বোধটা তীব্র বিরক্তির ভেতরে বাঁক ঘুরল। 'তোমার শীত কোনোদিন আর যাবেও না'—মনে মনে দাঁত খিঁচোয় সুদাম। কোমরে বাঁধা বড় নতুন গামছাটা খুলে বুড়ির গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নাও—হল এবার?'

হল কিনা কে জানে, বুড়ি চুপ করল। আবার সেই হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে চুপ করে বসে থাকা। সুদাম বিড়ি ধরালো একটা। দেশলাইয়ের একটুখানি আলোতে হঠাৎ

কেমন একটা চমক লাগল তার। লাল গামছায় জড়ানো বুড়িটাকে একবারের জন্যে লাল শাড়িপরা ভারী ছেলেমানুষ একটা বৌয়ের মতো মনে হল। সুদামের মা বলত, বয়েসকালে নাকি বুড়ির চেহারা খুব সুন্দর ছিল।

সে কতকাল আগে, কে জানে! সুদাম অবশ্য সে-রকম কোনো চেহারা দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। ছেলেবেলা থেকেই দেখছে পাকধরা চুল, শুকনো মুখ, রোগা-রোগা হাত-পা নিয়ে হয় ধানসিদ্ধ করছে, নইলে গোরুর জন্যে জাবনা কাটছে, আর নয়তো দাওয়ায় মাটি লেপছে। অল্প বয়সে লাল শাড়ি পরলে তাকে কেমন লাগত সে আছে বুড়ির স্বপ্নের ভেতর, সুদাম তা দেখতে পাচ্ছে না।

'অ সুদাম!'

'আবার কী?'

'বৌয়ের গলা শুনি নে কেন? সে কোথায়?'

সুদাম ঝপাং করে জলে বোঠে ফেলল।

'কেন—তাকে কী দরকার আবার?'

'বাড়ি যে নিঝুম মেরে রয়েছে। সে গেল কোথায়?'

'কী জ্বালা! তোমাকে যে শিমুলতলীর মন্দিরে নিয়ে চলেছি। নৌকো করে যাচ্ছি যে। বৌ তো সঙ্গে আসেনি।'

বুড়ি মাথা তুলল। মাথাটা নড়তে লাগল থর-থর করে। বেশ জেগে উঠেছে এখন।

'বৌ কেন এল না সুদাম?'

'তার ঘর-সংসার আছে না? সব ফেলে সে কি বেরুতে পারে সব সময়?'—মিথ্যে কথার জের টানতে সুদামের খারাপ লাগছিল: 'তোমার অনেক দিনের শখ, তাই নিয়ে এলুম।'

'তবু নিয়ে আসতে হত।'—যেন পলকা একটা সুতোয় বাঁধা রয়েছে এইভাবে বুড়ির মাথাটা নড়-নড় করতে লাগল: 'বৌ মানুষ, মায়ের পূজো দিলে সোয়ামী-পুত্তুরের মঙ্গল হয়।'

'আর মঙ্গলে দরকার নেই, বেশ হয়েছে,'—সুদাম আস্তে আস্তে বললে। বুড়ি শুনতে পেল না।

নৌকোটা প্রায় নিঃশব্দে ছুটছে ভাঁটার টানে। সুদাম চোখ ছড়িয়ে দিলে অন্ধকার-ছড়ানো ধূ-ধূ নদীটার সাদাটে জলের ওপর। ভালো করে কিছু বোঝা যায় না—কিন্তু সুদামের সব চেনা, পুরো আন্দাজ আছে তার। আর বেশি দেরি নেই, যে চড়াটার কথা ভেবেছে, সেটা প্রায় এসে পড়ল বলে।

বিড়িতে একটা শেষ টান দিতে গিয়ে গলায় লাগল। খকখক করে কাশি এল খানিকটা।

বুড়ির বোধ হয় আবার ঝিম আসছিল, জেগে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'অ সুদাম!'

বাঁ হাতের তেলোয় মুখটা মুছে ফেলে সুদাম বললে, 'কী বলছ আবার?'

'তোর ভারী কাশি হয়েছে—না?'

'না, কিচ্ছু হয়নি।'

'হয়েছে বইকি, কাশছিস বলে মনে হল যে! 'চোখে তো দেখতে পাই নে দাদা, একটু কাছে সরে আয় দিকি, তোর বুকে একটু হাত বুলিয়ে দিই।'

'দরকার নেই, আমি বেশ আছি।'—সুদামের খুব খারাপ লাগল। বুড়িটা বুঝতে পেরেছে? তাই কি মায়া বাড়াতে চায়?

বুড়ি একটু চুপ করে রইল। তারপর ভাঙা গলায় বললে, 'তুই জানিস?'

'কী জানব আবার?'

'ঠিক কথা—তুই কী করে জানবি! তুই তখনো হোসইনি। তোর বাপের বুকে সেবার সর্দি বসে খুব কাশি হয়েছিল। আমাকে বলত, মাসী, তুমি আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও, তা হলেই আমার সব কষ্ট চলে যাবে।'—বলতে বলতে গলা জড়িয়ে গেল, খেই হারিয়ে গেল কথার, অনেকগুলো ছায়ার মিছিল এল চোখের সামনে: 'কী বিষ্টি—কী বিষ্টি সেবার! দশদিন ধরে একনাগাড়ে চলেছে,—থামেই না। মাঠ-ঘাট-পুকুর সব ভেসে গিয়েছিল। উঠোনে উঠে এসেছিল কী বড় বড় সব কই মাছ—তোর বাবা ধরছিল, পেরাণকেষ্ট একটা মস্ত বোয়াল গেঁথে তুলেছিল, ঘরের দাওয়ায় একজোড়া চন্দ্র-বোড়া সাপ—'

বুড়ির কথাগুলো আবছা হতে হতে স্বপ্নের ভেতর মিশে গেল। শুনতে শুনতে এক-বারের জন্য অন্যমনস্ক হল সুদাম। সেও হয়তো এমনি করে বুড়ো হয়ে অনেক—অনেক দিন, যতদিন তার বেঁচে থাকা ভালো—তারও চেয়ে ঢের বেশিদিন এই বুড়িটার মতো বেঁচে থাকবে। সেদিন তারও চোখ এমনি করে বাইরের জগৎ থেকে হারিয়ে গিয়ে ভেতরে তলিয়ে যেতে থাকবে—এমনিভাবেই আজকের চেনা মানুষ, চেনা দিনগুলো ছাড়া-ছাড়া, ছবি-ছবি হয়ে, আর—

আর সেদিনও কি তার ছেলে, কিংবা তার নাতি—মাঝরাতে তাকে এমনি করে নৌকোয় তুলে নিয়ে—দুত্তোর!

কী আজেবাজে ভাবনা হে! না, এমন করে বেঁচে থাকা তাদের বংশে নেই। তার বাপ মরেছিল খাটের ঘরে, তখনো ভারী জোয়ান ছিল সে, জ্বরে পড়বার দিনও সে সারাটা সকাল মাঠে লাঙল দিয়েছিল। সুদামের বেশ মনে আছে, বাড়িতে মা সেদিন বড় বড় লাল খেনো কাঁকড়ার ঝোল রেঁধেছিল। মাঠ থেকে ফিরে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে শুতে শুতে

বাবা বলেছিল, 'আজ আর কিছুটি খাব না সুদামের মা, শরীলটা যেন কেমন-কেমন লাগছে।' মার বয়েস কত হয়েছিল ? সুদাম জানে না। কিন্তু বাবা চলে যাওয়ার পর তিনটে বচ্ছরও সে রইল না। বড় ভালোবাসত বাবাকে।

ক্যাঁও—ক্যাঁও—ক্যাঁও—

সুদাম চমকে উঠল। কী বেয়াক্কেলে একটা বিচ্ছিরি পাখি হে! এই মাঝরাত্তিরে বাজখাঁই গলায় ডাকতে ডাকতে চলেছে, বুকের ভেতরটা যেন কাঁপিয়ে দিলে একেবারে! এতবড় নদীটা পড়েই রয়েছে দু ধারে, ঠিক মাথার ওপর দিয়েই ডাকতে ডাকতে না গেলেই আর চলছিল না ?

চমকে উঠল বুড়িও।

'অ সুদাম!'

'শুনছি, বলো।'

'তোর ছেলে কাঁদে কেন ?'

'আমার ছেলে নয়। ওটা পাখি।'

'না, লুকোচ্ছিস আমায়। চোখে তো কিছু দেখতে পাই নে, তাই মিথ্যে করে বলছিস। কী হয়েছে ছেলের ?'

'আচ্ছা জ্বালা তো। এই নৌকোয় ছেলে আসবে কোত্থেকে ? বললুম না—ওটা পাখি ?'

'নৌকো কেন সুদাম ? তুই আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ?'

'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না দিদিমা। বার বার করেই তো বলছি—তোমায় নিয়ে যাচ্ছি শিমুলতলীর বিশালাক্ষীর মন্দিরে।'

'হুঁ, মায়ের মন্দির। কতদিন বৌকে বলেছি, একবার নিয়ে চল্। বৌ বলে, এই শরীল্ নিয়ে তুমি যাবে কোথায় ? আমি বলি, বৌ—আমার দিন তো ফুরিয়ে এল, যা হোক করে নিয়ে চল্—শেষবার মায়ের পায়ে একটা পেন্নাম করে আসি।'

বোঠেটা একবারের জন্যে সুদামের হাতে আটকে গেল। বুড়িটাও তা হলে মরণের কথা ভাবে। ঠিক এই সময়, এই কথাটা শোনবার জন্যে সুদাম তৈরী ছিল না।

সেই বিড়িটার ধোঁয়া কী করে যেন গলায় আটকে আছে এখনো। আবার খানিকটা কাশি এল।

'তুই কাশছিস সুদাম।'

'না গো, ও কিছু নয়।'

'খুব পুরোনো ঘি আছে আমার কাছে। তোর ঠাকুর্দার ঠেঁয়ে চেয়ে নিয়েছিলুম। তোর বুকে একটু মালিশ করে দেব।'

আবার মায়া বাড়াচ্ছে বুড়িটা—সুদামের ভয়ঙ্কর খারাপ লাগল। কী একটা যন্ত্রণার

মতো চমকে গেল মনের ভেতর, বুড়ির ওপরে খানিকটা প্রবল বিদ্বেষ অনুভব করল সুদাম।

'আমার কিচ্ছু দরকার নেই—আমি বেশ আছি।'

কিন্তু মরণের ভাবনা বুড়িকে পেয়ে বসেছিল। এমনি করেই এক-একটা ভাবনার ঘোর ওর আসে। মরণের কথাটা মনে হলেই যেন এতদিনের জীবনটাতে যত মৃত্যু সে দেখেছে, সবাই—সবগুলো,—ছবির মতো ভিড় করে আসতে থাকে তার নেবা চোখের সামনে।

'তোর দাদামশাই হঠাৎ মরে গেল। বেশ বসে ছিল দাওয়ায়—কী যে হল, বললে, বুকটায় বড্ড ব্যথা করছে। কবিরাজ এল, কিছুই করতে পারল না। আগের দিন নতুন কাপড় কিনে এনেছিল, সেইটে দিয়ে ঢেকে শুইয়ে রাখল ছাতিমগাছটার তলায়। সুদাম, আমিও একদিন—'

চড়ায় নৌকো ভেড়াল সুদাম। চাঁদ এতক্ষণে বেরিয়ে এসেছে মেঘের আড়াল থেকে। লালচে আলোয় নদীর জলে কচি বাদামপাতার রঙ লেগেছে মনে হয়। চড়াটা পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা বোয়াল মাছের সাদা পেটের মতো।

বুড়ি বললে, 'সুদাম, আমিও একদিন অমনি করে মরে যাবো। একটা কথাও বলতে পারব না হয়তো। তা ছাড়া সবই তো ভুলে যাই। সুদাম, আমার বালিশটার ভেতরে দু কুড়ি রুপোর টাকা লুকোনো রয়েছে। মনে করে বার করে নিস কিন্তু। আর পারিস তো —আমাকে একখানা নতুন কাপড় দিয়ে—'

দাঁতে দাঁত চাপল সুদাম। বোঠে রেখে উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'দিদিমা, এসে গিয়েছি।'

কিছু না—কিছু না। ঘণ্টা দুই আরো বুড়িকে বসে থাকতে হবে ভিজে চড়াটার ওপর। তারপরে জোয়ার আসবে। তারও পরে আর কিছুই নেই।

তুলসীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে—গাঁয়ের লোকেও জানতে চাইবে। কিন্তু কী জানে সুদাম? হয়তো দোর খুলে রেখেছিল, শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে; হয়তো অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তারপর উঠোন ডিঙিয়ে কোন সময় খালে গিয়ে পড়েছে। সারাদিন খেটেখুটে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল সুদাম, এ সব কিছুই তার জানবার কথা নয়। সে তো আর রাত জেগে বসে চৌকি দিতে পারে না।

বুড়ি মরার কথা ভাবছিল। আবার কী একটা যন্ত্রণার মতো চমকে গেল সুদামের মাথার ভেতর দিয়ে। এত দিন তো কেটেছে—না হয় যেতোই আরো ক'টা দিন। বুড়ি, নিজেই হয়তো—

লগি দিয়ে নৌকোটাকে সরিয়ে আনতে আনতে সুদাম নিজের বিরুদ্ধেই প্রাণপণে মাথা

নাড়ল। না—মরবে না। ওই ভুষুণ্ডী কাগের মরণ নেই। তার ভিটের সব মানুষগুলোকে খেয়ে শেষ করবার পরে পোড়ো পোতার ওপর বুনো ওল, আকন্দ আর বিছুটি বনের মধ্যে ধূমাবতীর মতো লক্‌লকে জিভ মেলে আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকবে বুড়িটা—তার পাটের মতো চুলগুলোর ভেতরে খেলে বেড়াবে লাউডগা সাপ—

চড়ার দিকে কি রকম একটা আওয়াজ এল কানে। সুদাম ফিরে তাকালো। ভিজে বালির ওপর হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে বসে আছে বুড়িটা। জবুথবু ভাঙা চাঁদটা লালচে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো। সেই আলোয় লাল গামছা জড়ানো বুড়িকে ঠিক নতুন কনে-বৌয়ের মতো মনে হল।

আরে—চড়ার দিকে পোড়া কাঠের মতো ভেসে যাচ্ছে কী ওটা? তারই তো আওয়াজ পেয়েছিল সুদাম! মরা জ্যোৎস্নায় ওর ছুটো চোখ জলছে যে! শালা কুমির! বুড়িকে খেতে যাচ্ছে!

'হেই—হেই—হেই—'

জলের ওপর সজোরে বোঠে আছড়ালো সুদাম। তীরবেগে নৌকো ঘুরোল চড়ার দিকে। চোখের সামনে কুমিরে টেনে নিয়ে যাবে? ব্যাটাচ্ছেলে আর আধ ঘণ্টাও দেরি করতে পারল না?

কুমির ডুব মেরেছিল। সুদাম লাফিয়ে পড়ল চড়ার ওপর।

না, হল না। তুমি খুনী হতে পারো, কিন্তু চোখের সামনে আর একটা খুন সহ্য করবে কী করে?

আবার উজান ঠেলে ঠেলে ফিরে যাওয়া। ক্লান্তি, বিরক্তি আর না-ঘুমোনো রাতের অবসাদে পাড় ঘেঁষে হিংস্রভাবে লগি মেরে এগিয়ে চলল সুদাম। বুড়ি ডিঙির ওপর তেমনি পুঁটলি পাকিয়ে নিথর। হয়তো সব বুঝেছে—হয়তো কিছুই বোঝেনি। হয়তো আবার ওর চোখের সামনে দিয়ে ছায়ার মিছিল চলে যাচ্ছে।

হারামজাদা কুমির! আর আধ ঘণ্টাও দেরি করতে পারল না?

নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে শক্ত করে চেপে লগি ঠেলতে লাগল সুদাম। তার মনে পড়ল —এই এতক্ষণ ধরে বুড়ি একবারও খেতে চায়নি—একবারও বলেনি—'বো খিদেয় যে আমি মরে গেলুম।'

যদি বলত—পরাভূতের সুদামের মনে হল, তা হলে কুমিরটাও কিছু করতে পারত না।

কালপুরুষ

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আমাদের বার্ষিক উৎসবের প্রথম পর্যায় শেষ হল। এইবার আরম্ভ হবে আজকের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান 'কালপুরুষ'। কিন্তু তার জন্যে মঞ্চটি তৈরি করে নিতে একটু সময় লাগবে। অতএব সেই অবসরে 'কালপুরুষ' সম্পর্কে দু-একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

আমাদের সম্পাদকের বিবৃতিতে আপনারা শুনেছেন যে, এই নৃত্যের পরিকল্পনা এবং পরিচালনা যাঁর ছিল, সেই সৌম্যেন লাহিড়ী আর আমাদের মধ্যে নেই। একটি পথ-দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। আপনারাও এও শুনেছেন যে সেই কারণেই আমাদের এই বার্ষিক উৎসবটি প্রায় দু মাস পিছিয়ে দিতে হয়েছে। সৌম্যেন বেঁচে থাকলে আজ সে-ই এই নৃত্যনাট্যের ভাষ্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করত। কিন্তু সে নেই বলেই তার সহযোগী হিসেবে এই দায়িত্ব আমার ওপরে এসে পড়েছে।

কিন্তু দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ পালন করতে পারব না। কারণ, 'কালপুরুষে'র মধ্য দিয়ে সৌম্যেন ঠিক কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছিল, কোন্ সত্যটি তুলে ধরতে চেয়েছিল আমি নিজেও তা সম্পূর্ণ বুঝেছি এ দাবি করতে পারি না। যদি মনে করা যায় যে, আমরা প্রত্যেকে নানা রঙের কাচের আবরণ দিয়ে ঘেরা—তা হলে এই নাটকের যে একটা নিজস্ব আলো আছে, তা আলাদা রঙ নিয়ে আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হবে। অর্থাৎ এই নাটকের তাৎপর্য একার্থক নয়, তার একটা সার্বজনীন আর স্বীকৃত সীমারেখা নেই, আমরা সবাই নিজেদের মতো করেই একে গ্রহণ বা বর্জন করব। এ যেন সহস্র কোণিক—আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন কোণ থেকে একে দেখব, হয়তো একজনের দেখার সঙ্গে আর একজনের দেখার আদৌ মিল থাকবে না। সুতরাং এই নাটককে আমি কিভাবে বুঝেছি সে আলোচনা এখানে থাক। সৌম্যেন আমাকে যা বলেছিল, তারই প্রতিধ্বনি করে বলছি : আপনাদের নিজস্ব দর্পণগুলোতেই 'কালপুরুষ' তার ভালোমন্দ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হোক।

আর একটি কথা গোড়াতেই জানিয়ে রাখি। এটি মিশ্র-চরিত্রের নাটক। নৃত্যনাট্য আছে, মূকাভিনয়ও আছে। আপনারা দেখবেন—যখন-তখন নাচের তাল কাটবে, বাজনা বেসুরো হয়ে উঠবে, মঞ্চে আলোক-সম্পাতের মধ্যে পুরো শৃঙ্খলা থাকবে না। অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, এগুলো এই নাটকেরই অঙ্গ। সৌম্যেন বলেছিল, সত্য যদি তালকাটা হয়, নাচেও তাল থাকে না; সাইক্লোনের হাওয়া আসে অনিয়মের মতো—বাজনাতেই বা নিয়ম থাকবে কেন? অন্ধকার আর আলো যখন এ-ওকে ছিঁড়ে খেতে থাকে, তখন সেই বিদ্যুৎ-চমকানো ঝড়ের অরণ্যকে কোন্ নিয়ম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? এই কথাগুলো মনে রেখে—দয়া করে অন্তত আপনারা 'লাইট-লাইট' বলে আবেদন জানাবেন না। সব বিশৃঙ্খলার

ভেতরেও কোনো শৃঙ্খলা আছে কিনা, নাটক শেষ হলেই তার বিচার করবেন।

আমাদের যে 'সুভ্‌নির' আপনাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখবেন, 'কালপুরুষ' নাটকের বিষয়টি কী তা কিছুই সেখানে বলা হয়নি। সৌম্যেন বলেছিল, অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে সে নিজেই সেটি আপনাদের কাছে তুলে ধরবে। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য তার কথা সে আর কোনোদিন বলবে না। তাই অল্প কথায় আমিই সেটি উপস্থিত করছি। আগেই বলেছি—কোনো ভাষ্য আমি করব না। আমি কেবল বিষয়টি পেশ করছি—আপনারা আপনাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটিকে দেখুন এবং বিচার করুন।

নাটকের সূচনাতেই দেখবেন এর নায়ক—যার নাম জীবন—অথবা নামে কী আসে যায়—আপনারা যা খুশি বলে তাকে ভেবে নিতে পারবেন—সে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। তার পেছনে সবুজ আর সোনালীতে মেশানো একটা পটভূমি, মেঠো বাঁশির মতো একটা অস্পষ্ট সুরে ভরে রেখেছে তাকে। স্বপ্ন দেখছে জীবন। তারপরই আসছে একটি মেয়ে, তার গলায় শিউলি ফুলের মালা; আর একজন এল—তার হাতে নতুন ধানের একটি মঞ্জরী—তার নাচের ছন্দে মনে হবে যেন হেমন্তের ধানের খেতের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলে খেলে বয়ে যাচ্ছে; তারও পরে আরও একজন—তার পরিচয় আমি দেব না—দেখলেই তাকে চিনতে পারবেন—চিরদিন ধরে আমরা সবাই যাকে আমাদের রক্তের ভেতরে আসতে দেখেছি, যে মানুষের প্রথম ছবিতে রঙ লাগিয়েছে, প্রথম গানে সুর ফুটিয়েছে।

সুরে, আলোয়, অভিনয়ে নাটকের এই অংশটি সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক। দেখা যাচ্ছে—আমাদের নায়ক ধীরে ধীরে জেগে উঠল। তারপরে তার আনন্দ-নৃত্য। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ক্রমেই একটা লাল আভায় ভরে উঠল আকাশটা—কালো কালো দীর্ঘ ছায়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার ভেতরে। মিলিয়ে গেল তিনটি মেয়ে—মনে হল আমাদের নায়ককে ঘিরে ঘিরে কতগুলো লোহার গরাদ নেমে নেমে এসেছে।

সেই লালচে আলোটা পোড়া ছাইয়ের মতো বিমর্ষ হয়ে গেল—শুধু কয়েকটা আরক্তিম বিন্দু জেগে রইল এখানে ওখানে—যেন নিবে-যাওয়া চিতার কয়েক টুকরো অঙ্গার জ্বলছে এখনো। চিৎকার করে উঠল আমাদের নায়ক। চাবুকের আওয়াজের মতো শিসটানা তীক্ষ্ণ শব্দ উঠতে লাগল থেকে থেকে—চাবুকের মতোই লিকলিক করে যেতে লাগল এক-একটা আলোর বিদ্যুৎ। তারপর শব্দের কতগুলো ঘূর্ণি—কেউ আসছে—কেউ গোঙিয়ে উঠছে যন্ত্রণায়—কেউ বা কেঁদে উঠল বুক-ফাটা চিৎকারে—কোথায় যেন ডেকে উঠছে একপাল শিকারী কুকুর। তারই মধ্যে দেখতে পাবেন আমাদের নায়ককে—সে মাথা ঠুকছে, আকাশের দিকে হাত তুলে যেন অভিসম্পাত দিচ্ছে কাকে—অমানুষিক বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখ, চাবুকের মতো আলোর প্রত্যেকটা ঝলক যেন মর্মঘাতী আঘাত করছে

তাকে, একটু আগেই যে স্বপ্ন দেখছিল তাকে আর আপনারা চিনতে পারছেন না।

এর পরে সম্পূর্ণ অন্ধকার। শুধু সেই শব্দের ঘূর্ণি চলল কিছুক্ষণ। আবার ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে একটা আলোয় মঞ্চটা ভরে উঠল। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নায়ককেই। তার পেছনে এমন একটা পটভূমি—যা অসংলগ্ন-ছায়া ছেঁড়া-ছেঁড়া—আপনারা যে ধরনের স্যুররিয়্যালিস্টিক ছবি দেখে থাকেন, অনেকটা সেই রকম। নায়ককে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন তার দুটো মণিবন্ধে লোহার শেকলের মতো কী দুলছে, তাকে সাপের ছেঁড়া খোলস বলেও ভেবে নিতে পারেন।

সে কিছু একটা খুঁজছে। কী খুঁজছে? কারাগার থেকে পালিয়ে এসে কোথাও একটা জায়গা—যেখানে শিউলি ফুলের মালা পরে সেই মেয়েটি আবার এসে দেখা দেবে? সেই আর একজন বয়ে আনবে একটি পাকা ধানের মঞ্জরী—যাকে ঘিরে ঘিরে ঢেউ দিয়ে যায় শিশির-জড়ানো হেমন্তের হাওয়া? কিংবা সে খুঁজছে চিরকালের সেই তাকে—যে প্রথম ছবি, প্রথম গান—যাকে চিনিয়ে দিতে হয় না—আমাদের রক্তের কণাগুলো চিরদিন ধরে যাকে চিনে আসছে?

একদল মানুষ আসছে এরপর। তাদের জনতা বলতে পারেন, ভিড় ভাবতে পারেন—যা খুশি কল্পনা করতে পারেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক এক টুকরো ছেঁড়া সাপের খোলস। আমাদের নায়ককে ঘিরে ঘিরে তাদের নাচ চলবে। নায়ক সেই নাচের তালে দুলে উঠতে গিয়েও পা ফেলতে পারবে না—একটা অদ্ভুত শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণায় সে যেন ছিন্ন-বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে—তারপরে আস্তে আস্তে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। এইখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন তার মূকাভিনয়।

একটা ঝোড়ো-হাওয়ার পরিবেশ তৈরি করে বেরিয়ে যাবে নাচের দলটা। তাদের হাত দূরের আকাশের দিকে—সেখানে তারা কী যেন দেখছে, কী যেন একটা খুঁজে পেয়েছে। তারা চলে যাবার পর বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ উঠবে কয়েকটা। যেন সমুদ্রের গর্জন দুলে দুলে উঠবে কিছুক্ষণ। তারপর স্তব্ধতা। একটা নিঃসঙ্গ বেহালা কাঁদতে থাকবে একটানা। উঠে দাঁড়াবে আমাদের নায়ক।

তখনো তার পা টলছে। সে কোথায় যেতে চায়—যেতে পারছে না। একবার সামনে এগিয়ে আসবে, একবার পেছনে সরে যাবে; একবার ডাইনে যেতে চাইবে, একবার বাঁয়ের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াবে।

তখন আসবে কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি মূর্তি। তার মুখে দেখা যাবে সাদা দাড়ি—তার চোখের দিকে তাকালে দেখবেন সেখানে যেন অতলান্ত অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

আমাদের নায়ক মূকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাকে প্রশ্ন করবে, 'তুমি পথ জানো?'

সে মাথা নেড়ে বলবে, 'জানি।'

'তবে বলে দাও পথের নিশানা।'

সে হাত পেতে বলবে, 'তা হলে দক্ষিণা দাও।'

'আমার তো কিছুই নেই।'

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলবে : 'আছে তোমার বুকের ভেতরে।'

আমাদের নায়ক থমকে যাবে প্রথমটায়। তারপর ছিন্ন জামাটিতে হাত পুরে দিয়ে বুকের ভেতর থেকে বার করে দেবে একটি শিউলি ফুল।

কালো আলখাল্লায় ঢাকা বুড়ো আর দাঁড়াবে না। ফুলটি প্রায় কেড়ে নিয়ে, পেছনের সেই অবাস্তব—সেই স্যুররিয়্যালিস্টিক পটভূমিটির দিকে একবার হাত বাড়িয়ে দিয়েই সে চোরের মতো পালিয়ে যাবে।

সে যেতে না যেতেই আর একজন এসে হাজির হবে। বাজে-পোড়া মাটির মতো তার আলখাল্লার রঙ—যে রঙ দেখলে মনে হবে পৃথিবীর শেষ বিন্দু জলকেও সে শুষে নিয়েছে, তার তৃষ্ণায় ঘাসের বীজগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারও মুখে সাদা দাড়ি, তারও চোখ অন্ধকার।

'পথ জানো ?'

'জানি।'

'বলে দাও।'

সেও দক্ষিণা চাইবে। নিয়ে যাবে যুবকটির বুকের ভেতর থেকে একটি ধানের শিস। তারপর সেই অসংলগ্ন অবাস্তব—ছেঁড়া-ছেঁড়া পটভূমিটি দেখিয়ে দিয়ে সেও পালিয়ে যাবে।

তৎক্ষণাৎ আসবে তৃতীয় জন। রক্ত জমে এলে যে রঙ ধরে সেই রঙের আলখাল্লা তার। তারও পাকা দাড়ি, কোটরে-ডোবা অদৃশ্য চোখ, শুধু বাড়তির ভেতরে তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি—সে হাসি যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি কপট। সেও পথ দেখাতে চাইবে—তারপর হাত বাড়িয়ে বলবে : 'দাও—দাও—'

অনেকক্ষণ দ্বিধা করবে আমাদের নায়ক। এখানেও তার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করবেন আপনারা। একেবারে দেউলে হয়ে যাচ্ছে যেন, হারিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে সব। বিভ্রান্ত চোখে, মুখের প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় তার মনের অসংখ্য ভাঙচুর দেখতে পাবেন আপনারা। শেষে কাঁপা হাতে বুকের ভেতর থেকে সে বার করে আনবে একটি সোনার কৌটো। ঝলমল করে জলতে থাকবে সেটা।

কিসের কৌটো এটা ? সৌম্যেন থাকলে বুঝিয়ে বলতে পারত—আমি শুধু অনুমানই করতে পারি, আপনারাও তাই করবেন। হয়তো এ সেই সোনার ঝাঁপিটির প্রতীক—যার ভেতরে আমরা প্রথম রঙ, প্রথম গান আর প্রথম স্বপ্নকে সঞ্চয় করে রাখি। এই কৌটোটা তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে—যেন শেয়াল ডেকে উঠবে—যেন হা-হা

করে শ্মশানের হাওয়া বয়ে যাবে খানিকটা।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আমাদের নাটকের এই অংশে গ্রীক-পুরাণের একটি গল্পের কথা আপনাদের কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে। সেই রাজপুত্র আর তিন দিশারী শকুনের কাহিনী। আপনারা এও লক্ষ্য করবেন—বুড়োদের আলখাল্লা নাড়বার ভঙ্গিতে খানিকটা ডানা-ঝাপটানোর সাজেস্‌শন আসবে। আমিও সৌম্যেনকে সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। সে জবাব দেয়নি, একটু হেসেছিল কেবল। আমাদের সততার যাতে কোনো সংশয় আপনাদের না থাকে, সেই জন্যেই আমি এটুকু আপনাদের জানিয়ে রাখলুম।

এইখানেই আমাদের নাটকের তিন মিনিট বিরতি।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হলে দেখা যাবে যেন একটা পাহাড়ের চুড়োয় বসে আছে সে। এখানে একটা পরিচিত বিলিতি অর্কেস্ট্রা থেকে কয়েকটা সুরের টুকরো তুলে নিয়েছি আমরা। সে সুরে মনে হবে—যেন হাজার হাজার বছর আগে যারা মরে গেছে, তাদের স্মৃতি থমকে আছে এখানে, আশপাশে কয়েকটা ক্যাকটাসের আভাস পাবেন আপনারা—আচমকা মনে হবে যেন গভীর কোনো সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনা কতকগুলো শ্যাওলা-ধরা কঙ্কালের হাত বালি আর পাথরের মধ্যে পুঁতে রেখেছে কেউ; মনে হবে বহুকাল আগে মরে-যাওয়া সাগরের ঢেউ এখনো কেঁদে ফিরছে এই নগ্ন নির্জন বালির ওপর, চারদিকে যে ছাড়া ছাড়া পাথরগুলোকে দেখতে পাবেন—তারা কোন্ আদিম যুগের উল্কা, এইখানে আছড়ে পড়ে নিবে গেছে, কিন্তু তাদের সেই ভয়ঙ্কর জ্বালা এখনো স্তব্ধ হয়ে আছে এর চারদিকে। মাথার ওপর ধু ধু করবে একটা দীপ্ত দীর্ঘ আকাশ—সমুদ্রের তরঙ্গগুলো উতরোল কান্নায় চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাওয়ার পরে যে আকাশে একটি মেঘের বিন্দুও কখনো দেখা দেয়নি।

বিলিতী অর্কেস্ট্রার সঙ্গে কিছু দেশী সুর মিলিয়ে এই পরিবেশটি আমরা তৈরী করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের নায়ক এই চুড়োর ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। তারপরেই কী একটা যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করতে থাকবে—তার মুখে আত্মতৃপ্তির একটুকরো হাসি ছিল—ক্রমশ হতাশায় সেটা বিকৃত হয়ে যেতে থাকবে। নিজের বুকে হাত দিয়েই চমকে সরিয়ে নেবে—যেন কতগুলো ভাঙা কাচ ছিল কোথাও—তার আঙুল থেকে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়বে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

মাথার চুল ছিঁড়তে থাকবে—আকাশে দু হাত তুলে চিৎকার করে উঠবে, তারপর পাগলের মতো ছুটে নেমে আসবে সে; চোরাবালি তার পা টেনে নিতে চাইবে—শ্যাওলা-ধরা কঙ্কালের হাতের মতো ক্যাকটাসগুলো যেন তাকে আঁকড়ে ধরবে—মনে হবে নিজের সঙ্গে সে যুদ্ধ করতে চাইছে। বাজনা বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে—সব আলো এলোমেলো হয়ে যাবে—যেন সব কিছু দুলছে, টলমল করছে—যেন ভূমিকম্প ঘটে যাচ্ছে—আবার একটা

বীভৎস চিৎকার তুলবে নায়ক।

অন্ধকারে ডুবে যাবে মঞ্চ। আলো হলে দেখবেন, আর এক পৃথিবী। পেছনের পট-ভূমিতে এখানে আমরা কিছু ছায়া ব্যবহার করব। তা দেখে বুঝবেন—কোনো একটা বড় শহর—তার উঁচু উঁচু বাড়ি মাথা তুলে আছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনার, দেখা যাচ্ছে কারখানার চিমনি। ক্রেন উঠছে নামছে—গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—জাহাজের ভোঁ উঠছে।

এইখানে—কী বলব, কমিক রিলিফ? একটি ছোট মুখোশ-নৃত্য দেখতে পাবেন। দেখবেন নেকড়ে বাঘ হরিণের সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছে গোলাপ হাতে নিয়ে—বুকে ঘড়ি-বাঁধা ভালুক আসছে ঘুরতে ঘুরতে—দেখবেন শেয়াল আর মুরগী এর-ওর গলা জড়িয়ে রসালাপ করছে। কিন্তু এ সবের বিস্তৃত বিবরণ আমি দিতে চাই না—নিজেদের চোখেই দেখবেন আপনারা।

বাজনায় এরপর আপনাদের চেনা সুর শুনতে পাবেন। সে সুরে রক্তে নেশা ধরায়—মনকে মাতাল করে তোলে। আমাদের নায়ক একটি মেয়ের সঙ্গে নাচতে নাচতে আসবে মঞ্চে। এই নাচটি এতই স্পষ্ট যে, এর কথা আপনাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। মেয়েটির চোখে আগুন, সারা শরীরে লালসার ছন্দ। আমাদের নায়ককে মনে হবে মন্ত্রমুগ্ধ—একটি ক্ষুধিত হায়নার মতো সে মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে—বার বার সাপিনীর মতো পিছলে সরে যাচ্ছে মেয়েটি।

এই উদ্দাম নাচের ভেতর দিয়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবে তারা—সেই বাজনাই চলতে থাকবে, তারপর অন্য দিক দিয়ে তারা ফিরে আসবে আবার। কিন্তু এইবারে একটু বিশেষত্ব দেখা যাবে—মেয়েটির মুখ গাঢ় লাল একটা ওড়নায় ঢাকা। ছেলেটি তখন আরো বিহ্বল, আরো অসংযত হয়ে উঠেছে, তার তাল কাটতে থাকবে ঘন ঘন, যেন আকণ্ঠ নেশা করেছে এমনি মনে হবে তাকে। তারপর এক সময়—সম্পূর্ণ পরাভূতের মতো—টলতে টলতে সে মেয়েটির পায়ের কাছে বসে পড়বে।

তখন মুখের ওপর থেকে টকটকে লাল ওড়নাটি সরিয়ে দেবে মেয়েটি। একটু আগেই একখানা সুন্দর মুখ দেখেছিলেন আপনারা—তার চোখে তখন আগুন খেলছিল। এবার সেখানে দেখবেন একটা অদ্ভুত মুখোশ। কঙ্কালের? ঠিক তা নয়। সে মুখ সাদা মার্বেল পাথরের মতো—তার নাক নেই—চোখ নেই—ঠোঁট নেই—যেন একটা বন্ধ দেওয়ালের মতো; যদি মানুষের শরীর হয়—তার রক্তের শেষ কণাটি পর্যন্ত চুষে নিংড়ে খেয়েছে কেউ, যদি পাথর হয়—সে পাথর চিরকালের মতো মৃত—তার একটি ফাটল দিয়েও একটি জলের বিন্দু কোনোদিন নেমে আসেনি।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে নায়ক—যেন সেও পাথর হয়ে গেছে। চারদিকে উঠতে থাকবে শহরের শব্দ—গাড়ি চলছে, বিমান উড়ছে, ভোঁ বাজছে, ক্রেন ওঠা-নামা

করছে। নায়ককে এই অবস্থায় রেখে আমরা মঞ্চ অন্ধকার করে দেব।

এইবারে যা ফুটে উঠবে, তা একটি পোড়ো বাড়ি। আপনারা হানা বাড়িরই সুর শুনতে পাবেন। আলোয় অন্ধকারে দেখা যাবে—কোথাও তার ইট ধসে পড়েছে, কোথাও কালো কালো গর্ত রাক্ষসের করোটির শূন্য চোখের মতো তাকিয়ে আছে, কোথাও মাথা তুলেছে বটের চারা। মঞ্চের পেছন দিয়ে হিস হিস করতে করতে চলে যাবে একটা কালো রঙের প্রকাণ্ড সাপ। হয়তো দু-একবারের জন্য বুকের ভেতরে ছমছম করে উঠবে আপনাদেরও।

এইখানে—যন্ত্রের মতো পা ফেলে ঢুকবে আমাদের নায়ক। তার চলা দেখে মনে হবে—সে মানুষ নয়—যেন একটা 'রোবোট' এগিয়ে আসছে। সে এসে থেমে দাঁড়াবে। তখন সেই হানা বাড়ির একটা অন্ধকার গর্ত থেকে দুটো সার্চলাইটের মতো জ্বলে উঠবে এক-জোড়া চোখ। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না—একটা প্যাঁচার চোখ সে দুটো।

আমাদের নায়ক প্রশ্ন করবে, 'কে তুমি ?' উত্তর আসবে প্রতিধ্বনির মতো : 'তুমি।'

'আমি ?' 'হাঁ—হাঁ—হাঁ।'—শুধু প্যাঁচা নয়—বাজনার সুরে সুরে সারা বাড়িটা কথা কয়ে উঠবে—সাড়া দেবে প্রত্যেকটা ভাঙা ইট, রাক্ষসের করোটি চোখের মতো প্রত্যেকটা গর্ত-গহ্বর, প্রতিটি অশ্বত্থের চারা। সাপটাও থেমে দাঁড়িয়ে ফণা তুলে হিস্‌হিস্‌ করে উঠবে।

আমাদের নায়ক শুনবে : 'তুমি—তুমি—তুমি !'

'আমি !'

'তুমিই তো। চিনতে পারছ না নিজেকে ? কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছো—ভুলে গেলে সে কথা ?'

'কিন্তু—'

'আমি যে তোমারই দর্পণ !'—সার্চলাইটের মতো দুটো চোখের আলো নায়কের পাংশু মুখের ওপর এসে পড়বে—উদ্ভাসিত করে তুলবে তাকে। চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি উঠতে থাকবে : 'আমি যে তোমারই দর্পণ—হা-হা-হা।'

হা-হা-হা করে এই হাসির আওয়াজ আকাশ-বাতাস ভরে তুলবে—মনে হবে আপনাদেরও কান সেই শব্দে বধির হয়ে যাচ্ছে ! তারপর বেরিয়ে আসবে কতকগুলো ছায়ামূর্তি—তাদের চেনা যাবে না, দেখা যাবে না,—কখনো বোধ হবে কতকগুলো কবন্ধ প্রেত, কখনো মনে হবে কতকগুলো অদ্ভুত জীব—মানুষের আদল আসে অথচ তারা মানুষ নয় ; তারা আমাদের নায়ককে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, চলবে এক বেসুরো খেয়ালি তাণ্ডব—আলোর রঙ বদলাবে ঘন ঘন, বাজনায় কোনো সঙ্গতি থাকবে না।

আমাদের নায়ক হাহাকার করে জিজ্ঞাসা করবে : 'কারা—কারা তোমরা ?'

তারা সেই তাণ্ডব নাচের তালে-বেতালে সুরে-বেসুরে যেন জবাব দিতে থাকবে : 'তুমি—তুমি—তুমি !'

চিৎকার করে বলে উঠবে নায়ক : 'আমি তোমাদের হত্যা করব—আমি তোমাদের হত্যা করব।'

কোথা থেকে কে একখানা তলোয়ার এগিয়ে দেবে নায়কের হাতে। সে পাগলের মতো আঘাত করতে চাইবে ছায়ামূর্তিগুলোকে। কিন্তু সে আঘাত তাদের কাউকে স্পর্শ করবে না। শূন্যে তলোয়ার ঘুরতে থাকবে—লক্ষ্য খুঁজবে চারদিকে, কিন্তু কাউকে পাবে না—প্রত্যেকটা আঘাত যেন কারা ঘুরিয়ে দেবে তার দিকে—তারই তলোয়ার ঘুরে-ফিরে এসে বার বার তার বুকে-পেটে বিঁধতে থাকবে।

তালে-বেতালে নেচে যাবে ছায়ামূর্তিগুলো। বাজনায় ঝড় চলবে, অসংলগ্ন আলোয় তুফান ছুটবে উথাল-পাথাল। অন্ধকার কোটরের মধ্যে হা-হা করে হাসতে থাকবে প্যাঁচাটা—আর মূর্তিগুলো পরম আনন্দে ঘন ঘন করতালি দিয়ে বলতে থাকবে : 'তুমি—তুমি—তুমি!'

সেই তাণ্ডবের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসবে। যখন আলো হয়ে উঠবে, তখন আপনারা শুনতে পাবেন সেই প্রথম বাজনার সুর—যখন তিনটি মেয়ে এসেছিল শিউলি ফুল, ধানের মঞ্জরী আর চির-চেনা প্রাণরহস্যের সেই সোনার কৌটোটি নিয়ে।

কিন্তু এই মিউজিকের কনট্রাস্টে দেখা যাবে আমাদের নায়ক সেই ভাঙা বাড়ির মাটিতেই পড়ে আছে। সেই ছায়ামূর্তিরা নেই, সেই প্যাঁচার চোখও না। শুধু দেখা যাবে—হাতের তলোয়ারখানা তার বুকে বেঁধানো, সে মৃত। শুধু তার মাথার কাছে ফণা ধরে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই সাপটা।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, এই হল আমাদের নাটক 'কালপুরুষে'র বিষয়বস্তু। এ নাটক ট্র্যাজিডি কিংবা কমেডি, রূপক না প্রহসন—তা আমি জানি না, হয়তো সৌম্যেন জানত। কিন্তু সে আর বেঁচে নেই—তার কথা সে আর বলতে পারল না। বন্ধুগণ, আমার কথনো কথনো সন্দেহ জাগে, এ নাটক কি তারই আত্মকাহিনী ? কিংবা তার মতো আরো অনেকের—যাদের আমরা চিনি, যাদের আমরা চিনি না ?

কিন্তু আগেই বলেছি—আমি এর কোনো ভাষ্য করব না। একে যদি সহস্রকোণিক বলে ভাবি—তা হলে বিভিন্ন কোণ থেকে এ আপনাদের মনে প্রতিফলিত হোক, আপনারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী এর তাৎপর্য গ্রহণ করুন।

আমি আপনাদের অনেকখানি সময় নিয়েছি—সেজন্য আমাকে মার্জনা করুন। কিন্তু আমাদের মঞ্চ এবং শিল্পীরা প্রস্তুত—এখুনি অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

নমস্কার।